বেগম রোকেয়া রচনাবলী

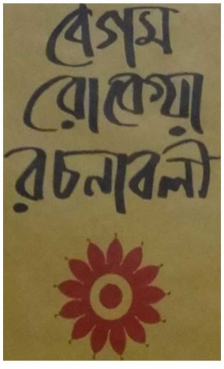
বেগম
রোকেয়া
রচনাবলী

বেগম রোকেয়া রচনাবলী

ভূমিকা ও সম্পাদনা

মোস্তফা মীর

বর্ণায়ন

বেগম রোকেয়া রচনাবলী
সম্পাদনা : মোস্তফা মীর

তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০০৫
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০০
প্রকাশক
কে এম লিয়াকত
বর্ণায়ন
৬৯ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ
বর্ণবিন্যাস
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

ISBN : 978-984-587-005-4

BEGUM ROKEYA RACHANABALI (complite works of Begum Rokeya) compalied and edited by Mostofa Mir. Published by K M Liaquat on be-half of BORNAYAN 69, Pyaridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100. Bornayan 1st edition Feb. 2000. 2nd edition-May 2005. 3rd edition-February 2010.

Price Tk. 400.00 only.

প্রাসঙ্গিক

এখন থেকে ঠিক একশত বিশ বছর আগে বেগম রোকেয়া জন্মেছিলেন, যখন এদেশে নারীশিক্ষা অনুমত ধর্মীয় শিক্ষার নামে কোরান শিক্ষায় সীমাবদ্ধ ছিলো, তবে সেটাও মক্তব কিংবা মাদ্রাসায় নয়, গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত পাড়ার মসজিদের মৌলভীরাই ছিলো এসব ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষাগুরু। বলতে গেলে মুসলমান নারীসমাজ তখন অন্ধকারে ডুবে ছিলো। বাইরের জগৎ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। কারণ গোটা মুসলমান সমাজই তখন নারী তো দূরের কথা পুরুষের জন্যও শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় মনে করতে শুরু করেনি। আর নারীকে ঘরের ভেতরে বন্ধ করে রাখাই ছিলো তৎকালীন প্রথা। এই প্রথা প্রচলনকারীরা মনে করতো এটাই হলো নারীর নিরাপত্তা বিধানের একমাত্র উপায়। ফলে পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়িতে নারীর প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। এমনকি পারিবারিক বাধানিষেধ এতই প্রবল ছিলো যে গৃহবন্দি নারীরা আপন বড়ভাইদের সঙ্গেও ইচ্ছা করলে যখন-তখন সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে পারতো না। সুতরাং বাইরের আলো দেখাই যাদের নিষেধ ছিলো তারা শিক্ষার আলো দেখবে কেমন করে—যা ছিলো বলতে গেলে নারী-নির্যাতনেরই নামান্তর।

অন্ধকারাচ্ছন্ন এই সময়ে জন্মে শুধুমাত্র শিক্ষার কারণেই বেগম রোকেয়া অনুভব করেছিলেন বন্দিত্ব ও দাসত্ব থেকে মুসলমান নারীদেরকে অব্যাহতি দিতে হলে প্রয়োজন, নারী-জাগরণ। কারণ ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক বাধানিষেধ অতিক্রম করতে না পারলে এই জাগরণ সম্ভব নয়। আর শিক্ষাই হচ্ছে সেই শক্তি, যা নারীকে পথ দেখাতে পারে, স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করতে পারে, জয় করতে পারে কুসংস্কারের অমূলক ভীতি, নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মানুষ হিসেবে। সে কারণে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন নারী-সংগঠন। ইংরেজি ও বাংলায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থে তিনি নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা বর্ণনা করার পাশাপাশি যেমন তুলে ধরেছেন নারী-নির্যাতনের চিত্র ও মাত্রা, তেমনি আহ্বান জানিয়েছেন নারীসমাজকে জেগে উঠতে। উপমা ও রূপকের সাহায্যে যথাযথ ও তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায়, আবার কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে কিংবা হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশিত নারীর লাঞ্ছনা ও দুর্দশার বাস্তব চিত্রের পাশাপাশি তিনি স্বপ্ন দেখিয়েছেন নারীজাতিকে এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য।

২

বেগম রোকেয়া অথবা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন এলাকার সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী। মায়ের নাম রাহাতুন্নেছা সাবেরা চৌধুরাণী। রোকেয়ার তিন ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় ভাই ইসরাইল সাবের ছোটবেলায় মারা যায়। বাকি দু'ভাইয়ের নাম ইব্রাহীম সাবের ও খলিল সাবের। দুজনেই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এই বড়ভাইয়ের প্রভাবই রোকেয়াকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করে আধুনিক চিন্তাভাবনা লালন করতে উদ্বুদ্ধ করে। রোকেয়া তার 'পদ্মরাগ' উপন্যাস বড়ভাইকে উৎসর্গ করে সেই ঋণ স্বীকার করেছেন। রোকেয়ার অন্য দু'বোনের নাম করিমুন্নেসা ও হোসনারা।

বড়বোন করিমুন্নেসার ভূমিকাও রোকেয়ার জীবনে এক বিশাল প্রেরণার উৎস। মতিচূর-১ম খণ্ডের উৎসর্গপত্রই তার প্রমাণ। ছেলেবেলায় বাংলা পড়ার প্রতি করিমুন্নেসার আগ্রহ লক্ষ্য করে তার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং নানার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বিয়ের আয়োজন চলতে থাকে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে করিমুন্নেসার বিয়ে হয়ে যায়। বেগম রোকেয়া লিখেছেন, এই বোনের কারণেই ভাগলপুর ও কলকাতায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর উর্দু স্কুল পরিচালনার সময় বাংলাভাষার পরিবেশ থেকে দূরে থেকেও বাংলা চর্চার অভ্যাস টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে প্রায় ১৪ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় (১৮৯৮ সাল)। এ সময় তিনি উড়িষ্যায় কনিকা স্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। সাখাওয়াত হোসেনের প্রাক্তন স্ত্রী অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তিনি বেগম রোকেয়াকে বিয়ে করেন। স্বামীর সংস্পর্শে এবং তার সহায়তায় ইংরেজি ভাষা এত ভালোভাবে রপ্ত করেন যে, স্বামীর সরকারি কাজে অর্থাৎ বিভিন্ন লেখালিখিতে তিনি স্বামীকে সাহায্য করতেন। ১৯০২ সালে রোকেয়া সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

রোকেয়া ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ভাগলপুরে মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতা বিষয়সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করলে তিনি বাধ্য হয়ে ১৯১০ সালে স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯১১ সালে কলকাতার অলিউল্লাহ লেনে আট জন ছাত্রী নিয়ে আবার নতুন করে স্কুল শুরু করেন। পরে এই স্কুল লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৫৩ বছর।

৩

বেগম রোকেয়ার সাহিত্যজীবন শুরু হয় ১৯০২ সালে। তাঁর প্রথম রচনার নাম 'পিপাসা'। এই প্রবন্ধের বিষয় হচ্ছে কারবালার কাহিনী। এই প্রবন্ধটি মতিচূর প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। রোকেয়ার গ্রন্থগুলি যথাক্রমে : মতিচূর-প্রথম খণ্ড (১৯০৪), মতিচূর-দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০৭), সুলতানাস ড্রিম (সুলতানার স্বপ্ন) (১৯০৮), পদ্মরাগ (১৯২৪) ও অবরোধ-বাসিনী (১৯৩১)। এছাড়া তাঁর একাধিক ছোটগল্প ও রম্যরচনা রয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রোকেয়ার অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যাও কম নয়।

মতিচূর-প্রথম খণ্ড, মূলত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। সবগুলি প্রবন্ধের বিষয়ই হচ্ছে তৎকালীন মৃত সমাজ। সেই সমাজের ক্ষতগুলি তিনি চিহ্নিত করেছেন এবং চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ায় আমরা তাঁর যে ক্ষমতার পরিচয় পাই তা সত্যিই অসাধারণ। তিনি নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থানও তুলে ধরেছেন, যে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ছিলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী-নির্যাতনের নামান্তর। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বলেন : 'সমাজ সংস্কার করা এক কথা আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজদেহে ক্ষত হইতে পারে। কিন্তু তদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন...। তিনি যদি বিদ্বেষহীন ভাষায় নারীজাতির দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে পারেন তাহা হইলে সমাজের রক্ষণশীলত্বের বন্ধন আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া আসিবে।' এ বক্তব্য থেকে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রে বেগম

রোকেয়া খুব সাহসের সঙ্গেই সত্য উচ্চারণ করেছিলেন। এই গ্রন্থে 'গৃহ' ও 'পিপাসা' প্রবন্ধে যে-সমাজচিত্রকে তুলে ধরা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থেই যথাযথ।

মতিচূর-দ্বিতীয় খণ্ডেও বর্ণিত হয়েছে নারীর ব্যথা ও দুর্দশার কথা। তর্কের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থে তিনি যেসব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তা যে কেবলই তর্ক নয় তা গ্রন্থটি পাঠ করলেই অনুধাবন করা সম্ভব। এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির মধ্যে *সুলতানার স্বপ্ন* একটি রূপকধর্মী ব্যাঙ্গাত্মক রচনা। প্রবন্ধ ছাড়াও এই গ্রন্থে রয়েছে একাধিক গল্প ও রূপক কাহিনী যেমন—ডেলিশিয়া হত্যা, সৌরজগৎ, জ্ঞানফল, নার্স নেলী, নারী সৃষ্টি, ও মুক্তিফল। 'নার্স নেলী' গল্পে জীবনের অন্য একটা দিক তুলে ধরে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সাবধান হওয়ার জন্য নারীকে সতর্ক করার পাশাপাশি সংসারের শান্তি ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে পরামর্শ। বাকি গল্পগুলিতে ঘোষিত হয়েছে নারীর মর্যাদা এবং তা রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছেন নারীর মনে শক্তি জোগাতে। কারণ রোকেয়া অনুভব করেছিলেন যে, নারীকে যদি যথাযথ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা না যায় তাহলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়।

'পদ্মরাগ' একটি উপন্যাস। আঠাশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক বিনয়ভূষণ সরকার লিখেছিলেন, 'কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রিস্টান সকল সমাজেরই অনেক ক্ষতস্থান দেখিয়া মর্মে ব্যথা অনুভব করিতে হইবে। গ্রন্থকর্ত্রী শুধু ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই আপনার কর্তব্য শেষ করেন নাই—তারিণীভবনের পরিকল্পনায় তিনি ব্যাধির সমাধানেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন।'

এই উপন্যাসে লেখিকা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ, কর্মপদ্ধতি ও শিক্ষা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা সত্যিই নিখুঁত, যা মানবজীবনের আদর্শ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রলোভনকে জয় করে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই হচ্ছে তারিণীভবনের শিক্ষা। আর শিক্ষার মুক্ত আবহাওয়ার ফলাফলই হচ্ছে এই উপন্যাসের সিদ্দিকার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শক্তি।

Sultana's Dream (সুলতানার স্বপ্ন) মূলত একটা রূপক কাহিনী যা গল্পের আদলে বর্ণিত হয়েছে। সুলতানা অন্তঃপুরে বন্দি এক নারী। বাইরের পৃথিবীর রূপ-সৌন্দর্য থেকে সে বঞ্চিত। অথচ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য ছিলো তার আয়ত্তের মধ্যে। সে স্বপ্ন দেখতে থাকে—এক অপরিচিত নারীর সঙ্গে সে ভ্রমণে বেরিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখে সে মোহিত হয়। কিন্তু ভীতি ও সংকোচ তাকে গ্রাস করতে চাইলে সেই অপরিচিতা তাকে জানায়, যে-স্থানকে তারা 'নারীস্থান' বলে সেখানে পুরুষেরা ঘরের ভেতরে বন্দি হয়ে থাকে, আর নারীরা বাইরে কাজ করে। সুলতানা পুরুষ-ভয়ে সংকুচিত হয়ে থাকলে সেই অপরিচিতা (ভগিনি) সারা তাকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, সেখানে রাস্তায় পুরুষের বেরুনোর অধিকার নেই। পুরুষ সেখানে নারীর কথা মেনে চলে। নারীর আইনই পুরুষকে চালায়।

নারীর জ্ঞান ও মেধার অপরূপ বিকাশ লক্ষ্য করে সুলতানা তার নিজের ভেতরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করে এবং পুরুষকে বন্দি করে রাখার কথা শুনে অবাক হয়। মূলত নারীর মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তিকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিলে প্রকৃত বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে—এটাই এই রূপকের প্রতিপাদ্য বিষয়। নারীর আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবত রচিত হয়েছিলো এই গ্রন্থ। চমৎকার বিশুদ্ধ ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থটি সুখপাঠ্য।

'অবরোধ-বাসিনী' হচ্ছে ভারতবর্ষের নারীলাঞ্ছনার খণ্ড খণ্ড ইতিহাসের একটি সংকলন। এইসব খণ্ড-ইতিহাসের ভেতরে পুরুষের আচরণ ও পুরুষকর্তৃক উদ্ভূত পরিবেশ কী হাস্যকর তা

পাঠকবর্গের দৃষ্টিতে পড়বেন, যে সাহস কেবলই পুরুষের নিরিখকাঠি মানে মাপতে পারে বলে। তাই লেখিকা হিসাবে বেগম রোকেয়ার যথার্থ মূল্যায়ন আজও হয়নি বলে মনে হয়।

উপন্যাস রচনাটি ছাড়া বেগম রোকেয়া *God gives Man rules & Educational Ideals for the Modern Indian Girls* শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি ও বাংলায় কিছু চিঠিপত্রও লিখেছেন। সেখানে তাঁর জীবনের আদর্শ ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

৪

বেগম রোকেয়া তাঁর সেখেছিলেন নারী-জাগরণের, তার পরিণতি তুলব নারী-স্বাধীনতা অর্জনে। তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষা পেলেই নারী শক্তিলাভ করিত্রে পারবে। আর তা সম্ভব হলে মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞান নিয়ে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করার পাশাপাশি নারী হবে স্বাধীন। তবে হবে নৈপুণ্য। তাই তিনি সমাজের সঙ্গে উপাত্তন করেছেন নারীর বন্দিত্বীকরণ ও শাস্ত্রুণার কাহিনী। তাকে এই সমাজ কুশিয়েছিলো তাঁর শিক্ষা, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও আত্মসম্মান।

বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত নারীসংগঠন 'আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' আজ আর নেই। তবে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি এখনও আছে। আর আছে বেগম রোকেয়ার ইতিহাসটি। শতাব্দীর শুরুতে বেগম রোকেয়া এদেশের নারীদের মনে জাগরণের যে ঢেউ তুলেছিলেন, শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ একশত বছর পর তা বৃক্ষরাজ একটা মহীরূহে পরিণত হয়েছে, তাকে আমরা যথাযথ পরিচর্যা করে একটা পূর্ণবৃক্ষে পরিণত করতে পারিনি।

রোকেয়া বীথি
ঢাকা
১৯.১২.২০০৩

সূচিপত্র

মতিচূর (প্রথম খণ্ড)	১৩
মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড)	৬১
অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলি	১৮৫
পদ্মরাগ (উপন্যাস)	২৬১
অবরোধবাসিনী	৩৬৭
ছোটগল্প ও রসরচনা	৩৯৯
অগ্রন্থিত কবিতা	৪৩৩
Sultana's Dream	৪৫১
প্রবন্ধ	৪৬২
চিঠিপত্র	৪৬৯
পরিশেষ (জীবনপঞ্জি)	৫০৭
গ্রন্থপঞ্জি	৫১৫
বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কীর্তি (আবদুল কাদির)	৫১৯
দুঃসাহসিকা (গোলাম মোস্তফা)	৫২২

নিবেদন

মতিচূরের কোন কোন পাঠকের সমালোচনায় জানা যায় যে তাঁহারা মনে করেন, মতিচূরের ভাব ও ভাষা অন্যান্য খ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পুস্তকের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য দর্শনে পাঠকদের ওরূপ প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অপরের ভাব কিম্বা ভাষা স্বায়ত্ত করিতে যে সাহস ও নিপুণতার প্রয়োজন, তাহা আমার নাই; সুতরাং তাদৃশ্য চেষ্টা আমার পক্ষে অসম্ভব। (কালীপ্রসন্নবাবুর "ভ্রান্তিবিনোদ" আমি অদ্যাপি দেখি নাই এবং বঙ্কিমবাবুর সমুদায় গ্রন্থ পাঠের সুযোগও প্রাপ্ত হই নাই। যদি অপর কোন গ্রন্থের সহিত মতিচূরের সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা।)

আমিও কোন উর্দ্দু মাসিক পত্রিকায় কতিপয় প্রবন্ধ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি—উক্ত প্রবন্ধাবলীর অনেক অংশ মতিচূরের অবিকল অনুবাদ বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে প্রবন্ধসমূহের লেখিকাগণ বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞা।

ইংরাজ মহিলা মেরী করেলীর "ডেলিশিয়া হত্যা" (The murder of Delicia) উপন্যাস খানি মতিচূর রচনার পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, অথচ তাহার অংশবিশেষের ভাবের সহিত মতিচূরের ভাবের ঐক্য দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেন এরূপ হয়? বঙ্গদেশ, পঞ্জাব, ডেকান (হায়দরাবাদ), বোম্বাই, ইংলন্ড—সর্ব্বত্র হইতে এ ই ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হয় কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলাবৃন্দের আধ্যাত্মিক একতা!

কতিপয় সহৃদয় পাঠক মতিচূরে লিখিত ইংরাজি শব্দ ও পদের বাঙ্গালা অর্থ না লেখার ত্রুটী প্রদর্শন করিয়াছেন। এবার যথাসম্ভব ইংরাজি শব্দসমূহের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল। যাঁহারা মতিচূরে যে কোন ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

মতিচূরে আর যে সকল ত্রুটী আছে, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যা বুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

মতিচূর

[প্রথম খণ্ড]

পিপাসা

মহরম

কাল বলেছিলে প্রিয়! আমারে বিদায়
দিবে, কিন্তু নিলে আজ আপনি বিদায়!

* * *

দুঃখ শুধু এই—ছেড়ে গেলে অভাগায়
ডুবাইয়া চিরতরে চির পিপাসায়!
যখন যেদিকে চাই, কেবলি দেখিতে পাই,—
'পিপাসা, পিপাসা' লেখা জ্বলন্ত ভাষায়।
শ্রবণে কে যেন ঐ 'পিপাসা' বাজায়।

প্রাণটা সত্যই নিদারুণ তৃষানলে জ্বলিতেছে। এ জ্বালার শেষ নাই, বিরাম নাই, এ জ্বালা অনন্ত। এ তাপদগ্ধ প্রাণ যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকে নিজের হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। পোড়া চক্ষে কিছুই দেখি না। পুষ্পময়ী শস্যশ্যামলা ধরণীর আনন্দময়ী মূর্তি আমি দেখি না। বিশ্বজগতের মনোরম সৌন্দর্য আমি দেখি না। আমি কী দেখি, শুনিবে? যদি হৃদয়ে ফটোগ্রাফ তোলা যাইত, যদি চিত্রকরের তুলিতে হৃদয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিবার শক্তি থাকিত—তবে দেখাইতে পারিতাম, এ হৃদয় কেমন! কিন্তু সে উপায় নাই।

ঐ যে মহরমের নিশান, তাজিয়া প্রভৃতি দেখা যায়, ঢাকঢোল বাজে, লোকে ছুটাছুটি করে, ইহাই কি মহরম? ইহাতে কেবল খেলা, চর্মচক্ষে দেখিবার তামাসা। ইহাকে কে বলে মহরম? মহরম তবে কী? কী জানি, ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। কথাটা ভাবিতেই পারি না—ও-কথা মনে উদয় হইলেই আমি কেমন হইয়া যাই—চক্ষে অন্ধকার দেখি, মাথা ঘুরিতে থাকে। সুতরাং বলিতে পারি না—মহরম কী!

আচ্ছা তাহাই হউক, ঐ নিশান তাজিয়া লইয়া খেলাই হউক; কিন্তু ঐ দৃশ্য কি একটা পুরাতন শোকস্মৃতি জাগাইয়া দেয় না? বায়ু-হিল্লোলে নিশানের কাপড় আন্দোলিত হইলে, তাহাতে কি স্পষ্ট লেখা যায় না—'পিপাসা, পিপাসা'? উহাতে কি একটা হৃদয়বিদারক শোকস্মৃতি জাগিয়া ওঠে না? সকল মানুষই মরে বটে—কিন্তু এমন মরণ কাহার হয়?*

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—স্বপ্নে মাত্র, যেন সেই কারবালায় গিয়াছি। ভীষণ মরুভূমি, তপ্ত বালুকা, চারিদিক ধুধু করিতেছে; সমীরণ 'হায় হায়' বলিয়া ঘুরিয়া

---

* একদা জয়নাল আবদীন (হোসেনের পুত্র) জনৈক কসাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছাগল জবেহ করিতে আসিয়াছ, উহাকে কিছু খাওয়াইয়াছ?' কসাই উত্তর করিল, 'হাঁ, ইহাকে এখনই প্রচুর জলপান করাইয়া আনিলাম।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি ছাগলটাকে প্রচুর জলাপানে তৃপ্ত করিয়া জবেহ করিতে আনিয়াছ, আর শিমর আমার পিতাকে তিনদিন পর্যন্ত জলাভাবে পিপাসায় দগ্ধ করিয়া জবেহ করিয়াছে।'
কারবালার যুদ্ধের সময় জয়নাল রোগে ভুগিতেছিলেন বলিয়া শহীদ (সমরশায়ী) হন নাই।

বেড়াইতেছে, যেন কাহাকে খুঁজিতেছে! আমি কেবল শুনিতে পাইলাম 'পিপাসা পিপাসা'! বালুকা-কণায় অঙ্কিত যেন 'পিপাসা পিপাসা'! চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সব শূন্য, তাহার ভিতর 'পিপাসা' মূর্তিমতী হইয়া ভাসিতেছে!

সে দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর—তথা হইতে দূরে চলিলাম। এখানে যাহা দেখিলাম, তাহা আরও ভীষণ, আরও হৃদয়বিদারক! দেখিলাম—মরুভূমি শোণিত-রঞ্জিত।** রক্তপ্রবাহ বহিতে পারে নাই—যেমন রক্তপাত হইয়াছে, অমনি পিপাসু মরুভূমি তাহা শুষিয়া লইয়াছে! সেই রুধির-রেখার লেখা—'পিপাসা, পিপাসা।'

নবীন যুবক আলী আকবর (হোসেনের পুত্র) যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পিতার নিকট পিপাসা জানাইতে আসিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন—'আল-আৎশ! আল-আৎশ!!' (পিপাসা, পিপাসা!) ঐ দেখ, মহাত্মা হোসেন স্বীয় রসনা পুত্রকে চুষিতে দিলেন, যদি ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয়! কিন্তু তৃপ্তি হইবে কি—সে রসনা যে শুষ্ক—নিতান্ত শুষ্ক। যেন দিক দিগন্তর হইতে শব্দ আসিল—'পিপাসা পিপাসা'।

মহাত্মা হোসেন শিশুপুত্র আলি আসগরকে কোলে লইয়া জল প্রার্থনা করিতেছে! তাঁহার কথা কে শুনে! তিনি দীন নয়নে আকাশপানে চাহিলেন—আকাশ মেঘশূন্য নির্মল—নিতান্তই নির্মল! তিনি নিজের কষ্ট—জলপিপাসা অম্লান বদনে সহিতেছেন। পরিজনকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়াছেন। সকিনা প্রভৃতি বালিকারা জল চাহে না—তাহারা বুঝে, জল দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু আসগর বুঝে না—সে দুগ্ধপোষ্য শিশু, নিতান্ত অজ্ঞান। অনাহারে জলাভাবে মাতার স্তন্য শুকাইয়া গিয়াছে—শিশু পিপাসায় কাতর।

শহরবানু (হোসেনের স্ত্রী) অনেক যন্ত্রণা নীরবে সহিয়াছেন—আজ আসগরের

** ধর্মগুরু মহাত্মা মোহাম্মদের (দ.) মৃত্যুর পর, ক্রমান্বয়ে আবুবকর সিদ্দিক, ওমর খাত্তাব ও ওসমান গনি 'খলিফা' হইলেন। চতুর্থ বারে আলি খলিফা হইবেন, কি মোয়াবিয়া খলিফা হইবেন, এই বিষয়ে মতভেদ হয়। একদল বলিল, 'মোয়াবিয়া হইবেন'; এক দল বলে, আলী মোহাম্মদের (দ.) জামাতা, তিনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। এইরূপে বিবাদের সূত্রপাত হয়।

অতঃপর মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ, আলির পুত্র হাসান ও হোসেনের সর্বনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। এজিদ মহাত্মা হাসানকে কৌশলে বিষ পান করাইয়া হত্যা করে। ইহার এক বৎসর পরে মহাত্মা হোসেনকে ডাকিয়া (নিমন্ত্রণ করিয়া) কারবালায় লইয়া গিয়া যুদ্ধে বধ করে।

কেবল যুদ্ধ নহে—এজিদের দল-বল ইউফ্রেতিজ নদী ঘিরিয়া রহিল, হোসেনের পক্ষের কোনো লোককে নদীর জল লইতে দেয় নাই। পানীয় জলের অভাবেই তাঁহারা আধমরা হইয়াছিলেন। পরে যুদ্ধের নামে একই দিন হোসেন আত্মীয়স্বজনসহ নিহত হইলেন। এ কথায় মতভেদ আছে; কেহ বলেন, তিন দিন যুদ্ধ হয়, কেহ বলেন একই দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে সমরশায়ী হইয়াছেন। নদীর জল হইতে হোসেনকে বঞ্চিত করিয়া এজিদ অশেষ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছে।

অষ্টাদশ বর্ষীয় নবীন যুবক কাসেম (হাসানের পুত্র) মৃত্যুর পূর্বরাত্রে হোসেনের কন্যা সকিনাকে বিবাহ করেন। কারবালা যখন সকিনাকে নববধূ বেশে দেখিল তাহার কয় ঘণ্টা পরেই তাঁহাকে নববিধবা বেশে দেখিয়াছিল! যেদিন বিবাহ, সেইদিনই বৈধব্য। হায় কারবালা! এ দৃশ্য দেখার চেয়ে অন্ধ কেন হও নাই? পুরুষগণ তো যুদ্ধ করিতেছিলেন, আর ললনাগণ কী করিতেছিলেন?—একজনের জন্য শোক করিতেছিলেন, আর একটির সমরশায়ী হওয়া সংবাদ পাইলেন!—কাসেমের জন্য কাঁদিতেছিলেন, আলি আকবরের মৃতদেহ পাইলেন! শোকোচ্ছ্বাস কাসেমকে ছাড়িয়ে আকবরের দিকে ধাবিত হইল—আকবরের মাথা কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন, শিশু আসগরকে শরবিদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন! এক মাতৃহৃদয়—আকবরকে কোল হইতে নামাইয়া আসগরকে কোলে লইল—কত সহ্য হয়? পুত্রশোকে আকুলা আছেন—কিছুক্ষণ পরে সর্বস্বধন হোসেনের ছিন্ন মস্তক (শত্রু উপহার পাঠাইল) পাইলেন, তাই দেখিতেছেন, ইতোমধ্যে (হোসেনের কন্যা) বালিকা ফাতেমা পিতার মাথা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, শহরবানু তাহার জন্য সান্ত্বনার উপায় খুঁজিতেই ছিলেন—ফাতেমার শ্বাসরোধ হইল! ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর বালিকা কত সহিবে? হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিল। শহরবানু এখন সকিনার অশ্রু মুছাইবেন, না ফাতেমাকে কোলে লইবেন?

যাতনা তাঁহার অসহ্য। তিনি অনেক বিনয় করিয়া হোসেনের কোলে শিশুকে দিয়া জল প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—'আর কেহ জল চাহে না; কেবল এই শিশুকে একটু জল পান করাইয়া আনো। শত্রু যেন ইহাকে নিজ হাতে জল পান করায়—জলপাত্রটা যেন তোমার হাতে নাই দেয়'!!

মাহাত্মা হোসেন স্ত্রীর কাতরতা এবং শিশুর দুরবস্থা দেখিয়া, জল প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কাতরস্বরে বলিলেন, 'আমি বিদেশী পথিক, তোমাদের অতিথি, আমার প্রতি যত ইচ্ছা অত্যাচার কর, সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ শিশু তোমাদের নিকট কোনো দোষে দোষী নহে। পিপাসায় ইহার প্রাণ ওষ্ঠাগত—একবিন্দু জল দাও! ইহাতে তোমাদের দয়াধর্মের কিছুমাত্র অপব্যয় হইবে না।' শত্রুগণ কহিল, 'বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র কিছু দিয়া বিদায় কর।'

বিপক্ষ হইতে শিশুর প্রতি জলের পরিবর্তে তীরবৃষ্টি হইল!!

'পিয়াস লাগিয়া জলদে সাধিনু, বজর পড়িয়া গেল।'

উপযুক্ত অতিথি-অভ্যর্থনা বটে! হোসেন শরবিদ্ধ আসগরকে তাহার জননীর কোলে দিয়া বলিলেন, 'আসগর চিরদিনের জন্য তৃপ্ত হইয়াছে! আর 'জল জল' বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদাইবে না! আর বলিবে না--'পিপাসা, পিপাসা'! এই শেষ!'

আহা! এত যে কেহই সহিতে পারিবে না! আমার শোকসন্তপ্তা পুত্রশোকাতুরা ভগিনীগণ তোমরা একবার শহরবানু ও জয়নবের শোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমরা একজনের শোকেই বিহ্বল হও—দশদিক অন্ধকার দেখ। আর এ যে শোকসমূহ! আঘাতের উপর আঘাত। তোমরা একসময় একজনের বিরহে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পার, তাঁহাদের সে অবসর ছিল না। এক জয়নব কী করিবেন বল, নিজের পুত্রের জন্য কাঁদিবেন, না প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিকে চাহিবেন, না সব ছাড়িয়া ভ্রাতা হোসেনের ক্ষত ললাটখানি অশ্রুধারায় ধুইবেন? সেখানে অশ্রু ব্যতীত আর জল তো ছিল না!

বীরহৃদয়! একবার হোসেনের বীরতা সহিষ্ণুতা দেখ! ঐ দেখ, তিনি নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া—আর কোনো যোদ্ধা নাই, সকলে সমরশায়ী, এখন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি একা। তিনি কোনোমতে পথ পরিষ্কার করিয়া নদী পর্যন্ত গিয়াছেন। ঐ দেখ অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিলেন, বুঝি পান করেন; না পান তো করিলেন না!—যে জলের জন্য আসগর তাঁহারই কোলে প্রাণ হারাইয়াছে, আকবর তাঁহার রসনা পর্যন্ত শুষিয়াছেন—সেই জল তিনি পান করিবেন? না—তিনি জল তুলিয়া দেখিলেন, ইচ্ছা করিলে পান করিতে পারেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নদীর জল নদীতেই নিক্ষেপ করিলেন। বীরের উপযুক্ত কাজ!!

* * *

মহরমের সময় সুন্নি-সম্প্রদায় শিয়া দলে আমোদের জন্য যোগ দেয় না। এ-কথা যে বলে, তাহার ভুল—শোচনীয় ভুল। আলী ও তদীয় বংশধরগণ উভয় সম্প্রদায়েরই মান্য ও আদরণীয়। তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যু স্মরণ সময়ে কোন্ প্রাণে সুন্নিগণ আমোদ করিবে? আমোদ করে বালকদল, সহৃদয় সুন্নিদল মহরমকে উৎসব বলে না।

শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর সুন্নিগণ ভালো মনে করেন না। বুকে করাঘাত করিলে বা শোকবস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা এই যে, শিয়াগণ হজরত আয়শা ফাতেমার বিমাতা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবিয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়শাকে নিন্দা করে। আমরা আয়শার (আলির সৎশাশুড়ি হওয়া ব্যতীত আর) কোনো দোষ দেখি না। চতুর্থ খলিফা কে হইবেন, ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দ.) তাঁহার নাম স্পষ্ট না বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি মোয়াবিয়া কিংবা আলি তাঁহারা উভয়ে একই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাই মতভেদ হইল। কেহ বলিল 'চতুর্থ খলিফা মোয়াবিয়া,' কেহ বলিল 'আলি'। আয়শা হিংসা করিয়া বলেন নাই, সিংহাসন মোয়াবিয়া পাইবেন। তিনি ঐ অনুমানের কথাই বলিয়াছিলেন মাত্র। সুন্নিগণ মাননীয়া আয়শার নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু কথার মতভেদ। এই বিষয় লইয়াই দলাদলি।

শহরবানু কী দেখিতেছেন? কোলে পিপাসু শরবিদ্ধ আসগর, সম্মুখে ক্ষুদিরা, কলেবের 'শহীদ' (সমরশায়ী) আকবর! অমন চাঁদ কোলে লইয়া ধরণী গর্বিত হইয়াছিল—যে আকবর ক্ষতবিক্ষত হইয়া, পিপাসায় কাতর হইয়া মৃত্যুকালে একবিন্দু জল পায় পাই! শোণিতধারায় যেন লেখা আছে 'পিপাসা, পিপাসা'! শহীদের মুদ্রিত নয়নদুটি নীরবেই বলে যেন 'পিপাসা, পিপাসা'!! দৃশ্য তো এইরূপ মর্মভেদী তাহাতে আবার দর্শক জননী!—আহা!!

যে ফুল ফুটিত প্রাতে—নিশীথেই ছিন্ন হল,
শিশিরের পরিবর্তে রুধিরে আপ্লুত হল!

আরও দেখিলাম—মহাত্মা হোসেন সমরশায়ী। সমরক্ষেত্রে কেবলই পিপাসী শহীদগণ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের শুষ্ক কণ্ঠ যেন অস্ফুট ভাষায় বলিতেছে 'পিপাসা, পিপাসা'। জয়নব (হোসেনের ভগিনী) মুক্ত কেশে পাগলিনী প্রায় ভ্রাতার নিকট বিদায় চাহিতেছেন। ডাকিয়া, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেছেন—'ভাই! তোমাকে মরুভূমে ফেলিয়া যাইতেছি! আসিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে—যাইতেছি তোমাকে ছাড়িয়া! আসিয়াছিলাম অনেক রত্নে বিভূষিত হইয়া—যাইতেছি শূন্য হৃদয়ে! তবে এখন শেষ বিদায় দাও! একটি কথা কও, তবে যাই। একটিবার চক্ষু মেলিয়া দেখ—আমাদের দুরবস্থা দেখ, তবে যাই!' জয়নবের দুঃখে সমীরণ হায় হায় বলিল—দূর-দূরান্তরে ঐ হায় হায় শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল!—

এখন আর স্বপ্ন নাই—আমি জাগিয়া উঠিয়াছি। দূরে শৃগালের কর্কশ শব্দে শুনিলাম—'পিপাসা, পিপাসা'! একি, আমি পাগল হইলাম নাকি? কেবল 'পিপাসা' দেখি কেন? কেবল 'পিপাসা' শুনি কেন?

আমার প্রিয়তমের সমাধিস্থানে যাইলাম। বনপথ দিয়া যাইতে শুনিলাম, তরুলতা বলে 'পিপাসা, পিপাসা'! পত্রের মর্মরশব্দে শুনিলাম 'পিপাসা, পিপাসা'! প্রিয়তমের গোর হইতে শব্দ আসিতেছিল—'পিপাসা, পিপাসা'! ইহা অতি অসহ্য! প্রিয়তম মৃত্যুকালে জল পায় নাই—চিকিৎসকের নিষেধ ছিল। সুতরাং পিপাসী মরিয়াছে।

আহা! এমন ডাক্তারি কে রচনা করিয়াছেন? রোগীর প্রতি (রোগ বিশেষে) জল-নিষেধ ব্যবস্থা কোন্ হৃদয়হীন পাষাণের বিধান? যখন রোগীকে বাঁচাইতে না পার, তখন প্রাণ ভরিয়া পিপাসা মিটাইয়া জল পান করিতে দিও। সে-সময় ডাক্তারের উপদেশ শুনিও না। নচেৎ আমারই মতো আজীবন পিপাসায় দগ্ধ হইবে।

কোনো রোগী মৃত্যুর পূর্বদিন বলিয়াছিল, 'বাবাজান! তোমারই সোরাহির জল দাও।' রোগী জানে, তাহার পিতার সোরাহির জল অবশ্যই শীতল হইবে। পিতা তাহার আসন্নকাল জানিয়া স্বহস্তে সোরাহি আনিয়া দিলেন। অন্যান্য মিত্ররূপী শত্রুগণ তাহাকে প্রচুর জল সাধ মিটাইয়া পান করিতে দেয় নাই। ঐ রোগীর আত্মা কি আজ পর্যন্ত কারবালার শহীদদের মতো 'পিপাসা পিপাসা' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না? না! স্বর্গসুখে পিপাসা নাই! পিপাসা—যে বাঁচিয়া থাকে, তাহারই! অনন্ত শান্তি-নিদ্রায় যে নিদ্রিত হইয়াছে, পিপাসা তাহার নহে! পিপাসা—যে পোড়া স্মৃতি লইয়া জাগিয়া থাকে, তাহারই!!

কিন্তু কী বলিতে কী বলিতেছি—আমার হৃদয়ানন্দ মৃত্যুর পূর্বদিন গোপনে জননীর নিকট জল চাহিয়াছিল। ডাক্তারের নিষেধ ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে জল দিত না। জননী ভয়ে ভয়ে অল্প জল দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর ও অধীর হইয়াছিল—হায়! না জানি সে কেমন পিপাসা!

হৃদয়নন্দ জানিত, আমি তাহাকে জল দিব না। আমি চিকিৎসকের অন্ধ আজ্ঞাবহ দাস, তাহাকে জল দিব না। তাই সে আমার উপস্থিত থাকা সময় জল চাহিতে সাহস করে নাই। কী মহতী সহিষ্ণুতা! জলের পরিবর্তে চা চাহিল। শীতল জলের পিপাসায় গরম চা!! চা তখনই প্রস্তুত হইয়া আসিল। যে ব্যক্তি চা পান করাইতেছিল, সে চা'র পেয়ালার কড়া ধরিতে পারিতেছিল না—পেয়ালা এত তপ্ত ছিল। আর সেই পিপাসী সে পেয়ালাটি দুই হস্তে (যেন কত আদরের সহিত জড়াইয়া) ধরিয়া চা পান করিতে লাগিল!! আহা! না জানি সে কেমন পিপাসা! অনলরচিত পিপাসা!! কিংবা গরলরচিত পিপাসা!!!

সে সময় হয়তো তাহার শরীরে অনুভবশক্তি ছিল না—নচেৎ অত গরম পেয়ালা ও-কোমল হস্তে সহিবে কেন? আট বৎসরের শিশু—ননীর পুতুল, তাহার হাতে গরম পেয়ালা!—আর সেই তপ্ত চা—স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে নিশ্চয় গলায় ফোস্কা হইত! আর ঐ মাখন-গঠিত কচি হাতদুটি জ্বলিয়া গলিয়া যাইত!! সেই চা তাহার শেষ পথ্য—আর কিছু খায় নাই।

আক্ষেপ এই যে, জল কেন দিলাম না। রোগ সারিবার আশায় জল দিতাম না।—রোগ যদি না সারিল, তবে জল কেন দিলাম না? এইজন্যই তো রাত্রিদিন শুনি—'পিপাসা, পিপাসা'! ঐজন্যই তো এ নরকযন্ত্রণা ভোগ করি। আর সেই গরম চা'র পেয়ালা চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায়, হৃদয়ে আঘাত করে, প্রাণ দগ্ধ করে! চক্ষু মুদ্রিত করিলে দেখি—অন্ধকারে জ্যোতির্ময় অক্ষর লেখা—'পিপাসা, পিপাসা'!

নিশীথ সময়ে গৃহছাদে উঠিলাম। আকাশমণ্ডল পরিষ্কার ছিল, কোটি কোটি তারকা ও চন্দ্র হীরকপ্রভায় জ্বলিতেছিল। আমার পোড়াচক্ষে দেখিলাম—ঐ তারকা-অক্ষরে লেখা—'পিপাসা, পিপাসা'। আমি নিজের পিপাসা লইয়া ব্যস্ত, তাহাতে আবার বিশ্বচরাচর পিপাসা দেখায়—পিপাসা শুনায়! বোধহয় নিজের পিপাসার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই মাত্র—আর কেহ পিপাসী নহে। এ অথবা বিশ্বজগৎ সত্যই পিপাসু!

কুসুমকাননে আমি কী দেখিতে পাই? কুসুম হেলিয়া দুলিয়া বলে—'পিপাসা, পিপাসা'। লতায় পাতায় লেখা—'পিপাসা, পিপাসা'! কুসুমের মনোমোহিনী মৃদু হাসি আমি দেখি না। আমি দেখি, কুমুদের সুধাংশু-পিপাসা।

বিহগ-কূজনে আমি কী শুনিতে পাই? ঐ 'পিপাসা, পিপাসা'! ঐ একই শব্দ নানাসুরে নানারাগে শুনি—প্রভাতে ভৈরবী, নিশীথে বেহাগ—কিন্তু কথা একই। চাতক পিপাসায় কাতর হইয়া ডাকে—'ফটিক জল'! কোকিল ডাকিয়া উঠে 'কুহু', ঐ কুহুস্বরে শত প্রাণের বেদনা ও হৃদয়ের পিপাসা ঝরে! একি, সকলে আমাকে পিপাসার ভাষা শুনায় কেন? আহা! আমি কোথায় যাই? কোথায় যাইলে 'পিপাসা' শুনিব না?

চল হৃদয়, তবে নদীতীরে যাই—সেইখানে হয়তো 'পিপাসা' নাই। কিন্তু ঐ শুন! স্নিগ্ধসলিলা গঙ্গা কুলকুল স্বরে গাহিতেছে। 'পিপাসা, পিপাসা' আপন মনে গাহিয়া

বহিয়া যাইতেছে! একি তুমি স্বয়ং জল, তোমার আবার পিপাসা কেমন? ঠিক পাইলাম, 'সাগর-পিপাসা'। আহা! তাই তো সংসারে তবে সকলেই পিপাসু? হইতে পারে, সাগরের—যাহার চরণে, জাহ্নবি! তুমি আপনার প্রাণ ঢালিতে যাইতেছ, তাহার পিপাসা নাই। তবে দেখা যাউক।

একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের তরঙ্গ গণনা করিতেছিলাম। ঊর্মিমালা কী যেন যাতনায়, কী যেন বেদনায় ছটফট করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল। এ অস্থিরতা, এ আকুলতা কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

তবে ওই সচঞ্চল লহরিমালায়
কিসের বেদনা লেখা?—পিপাসা জানায়।
পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল-কৃপায়,
বল হে জলধি! তব পিপাসা কোথায়?

আবার তাহার গভীর গর্জনে শুনিলাম, 'পিপাসা, পিপাসা'! হায়! এই পোড়া পিপাসার জ্বালায় আমি দেশান্তরে পলাইয়া আসিলাম, এখানেও ঐ নিষ্ঠুর কথাই শুনিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম—ঐ তরঙ্গে তরঙ্গে আর পিপাসা দেখিতে ইচ্ছা ছিল না। সমুদ্রে আবার গম্ভীর গর্জন করিল। এবারও তাহার ভাষা বুঝিলাম—স্পষ্ট শুনিলাম—'পিপাসা, পিপাসা'!!

'পিপাসা পিপাসা'—মূর্খ মানব! জানো না এ কিসের পিপাসা? কোথায় শুনিয়াছ সাগরের পিপাসা নাই? এ হৃদয়ের দুর্দান্ত পিপাসা করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল! এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? পিপাসা পিপাসা—এইটুকু বুঝিতে পার না? ধনীর ধন-পিপাসা, মানীর মান-পিপাসা, সংসারীর সংসার-পিপাসা। নলিনীর তপন-পিপাসা, চকোরীর চন্দ্রিকা-পিপাসা! অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে! আহা! এই মোটা কথা বুঝ না? পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কী লক্ষ্য করিয়া? আমার হৃদয়ে অনন্ত প্রণয়পিপাসা—যতদিন আছি, পিপাসাও থাকিবে! প্রেমিকের প্রেম-পিপাসা—প্রকৃতির ঈশ্বর-পিপাসা! এইটুকু কি বুঝিতে পার না?* * *

তাই বটে, এতদিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয় কেন সদা হু হু করে, কেন সদা কাতর হয়। এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি-পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী—ঐকতান সম্বন্ধীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী!!

আমি তবে বাতুল নহি। আমি যে পিপাসা দেখি, তাহা সত্য—কল্পিত নহে। আমি যে পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য—কল্পনা নহে। ঈশ্বরপ্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেমপিপাসু।

স্ত্রীজাতির অবনতি

পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনোদিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে আমরা কী? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা দাসী কেন?—কারণ আছে।*

আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।

আমাদের এ বিশ্বব্যাপী অধঃপতনের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি? সম্ভবত সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ। স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকলপ্রকার কার্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষপক্ষ হইতে যতই বেশি সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রীপক্ষ ততই অধিকতর অকর্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্মোদ্দেশ্যে যতই দান করিতেছে, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে। ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষাগ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না।

ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের—প্রকারান্তরে পুরুষের—দাসী হইয়াছি। ক্রমশ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে। এবং আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধহয় অঙ্কুরিতও হয় না। কাজেই পুরুষজাতি বলিতে সুবিধা পাইয়াছেন :

> 'The five worst maladies that afflict the female mind are : indocility, discontent, slander, jealousy and sillines, *** Such is the stupidity of her character, that it is incumbent on her, in every particular, to distrust herself and obey her husband' (Japan, the Land of the Rising Sun.)

---

* কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, নারী নরের অধীন থাকিবে, ইহা ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত—তিনি প্রথমে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে তাহার সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত নারীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ স্থলে আমরা ধর্মগ্রন্থের কোনো মতামত লইয়া আলোচনা করিব না—কেবল সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায়, তাহাই বলিব। অর্থাৎ স্বকীয় মত ব্যক্ত করিতেছি মাত্র।

*** ...Although the Japanese wife is considered only the *first servant her husband,* she is usually addressed in the house as the honorable mistress. Acquaintance with European customs has awakened among the more educated classes in Japan a desire to raise the position of women' (Japan.)

(ভাবার্থ : স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের পাঁচটি দুরারোগ্য ব্যাধি এই। কোনো বিষয় শিক্ষার। অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা এবং মূর্খতা। *** নির্দোষ স্ত্রীলোকের কর্তব্য যে প্রত্যেক বিষয়ে নিজেকে অবিশ্বাস করিয়া স্বামীর আদেশ পালন করে)।

তারপর কেহ বলেন 'অতিরঞ্জন ও মিথ্যা বচন রমণী-জিহ্বার অলঙ্কার!' আমাদিগকে কেহ 'নাকেস-উল-আকেল' এবং কেহ 'যুক্তিজ্ঞানহীন' (unreasonable) বলিয়া থাকেন। আমাদের 'এ সকল দোষ' আছে বলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। একটা উদাহরণ দেখুন। এদেশের জামাতা খুব আদরণীয়—এমনকি ডাইনিও জামাই ভালোবাসে। তবু 'ঘরজামাইয়ের' সেরূপ আদর হয় না। তাই দেখা যায়, আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিল না, তখন কাজেই তাহারা ভূস্বামী প্রভৃতি হইতে হইতে ক্রমে আমাদের 'স্বামী' হইয়া উঠিলেন।* আর আমরা ক্রমশ তাঁহাদের গৃহপালিত পশুপক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।

---

* ভাবার্থ : যদিও জাপানে স্ত্রীকে স্বামীর প্রধানা সেবিকা মনে করা হয় কিন্তু সচরাচর তাহাকে গৃহস্থিত অপর সকলে মাননীয় গৃহিণী বলিয়া ডাকে। যাহা হউক আশা ও সুখের বিষয় এই যে, এখন ইউরোপীয় রীতিনীতির সহিত পরিচিত শিক্ষিত সমাজে ক্রমশ রমণীয় অবস্থা উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতেছে।)

*** 'দাসী' শব্দে অনেক শ্রীমতী আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 'স্বামী' শব্দের অর্থ কী? দানকর্তাকে 'দাতা' বলিলে যেমন গ্রহণকর্তাকে 'গ্রহীতা' বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে 'স্বামী, প্রভু ঈশ্বর' বলিলে অপরকে 'দাসী' না বলিয়া আর কী বলিতে পারেন? যদি বলেন স্ত্রী পতি-প্রেমপাশে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হইয়াছেন, তবে ওরূপ সেবাব্রত গ্রহণে অবশ্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু পুরুষও কি ঐরূপ পারিবারিক প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতিপালনরূপ সেবাব্রত গ্রহণ করেন নাই? দরিদ্রতম মজুরটিও সমস্ত দিন অনশনে পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় দুই-এক আনা পয়সা পারিশ্রমিক পাইলে বাজারে গিয়া প্রথমে নিজের উদর-সেবার জন্য দুই পয়সার মুড়ি-মুড়কির শ্রাদ্ধ করে না। বরং তদ্দ্বারা চাউল ডাউল কিনিয়া পত্নীকে আনিয়া দেয়। পত্নীটি রন্ধনের পর 'স্বামী'কে যে একমুঠা—আধপেটা অন্নদান করে, পতি বেচারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। কী চমৎকার আত্মত্যাগ! সমাজ তবু বিবাহিত পুরুষকে 'প্রেম-দাস' না বলিয়া স্বামী বলে কেন? হ্যাঁ, আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল; যে সকল দেবী স্ত্রীকে 'দাসী' বলায় আপত্তি করেন এবং কথায় কথায় সীতা-সাবিত্রীর দোহাই দেন তাঁহারা কি জানেন না যে, হিন্দুসমাজেই এমন এক (বা ততোধিক) শ্রেণীর কুলীন আছেন, যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন। যাহাকে অর্থ দ্বারা 'ক্রয়' করা হয়, তাহাকে 'ক্রীতদাসী' ভিন্ন আর কী বলিতে পারেন? এস্থলে বরদিগের পাসবিক্রয়ের কথা, কেহ উল্লেখ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণে 'বর বিক্রয় হয়' এরূপ বলে না। বিশেষত বরের পাসই বিক্রয় হয়, স্বয়ং বর বিক্রীত হন না। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের কথায় এ যুক্তি খাটে না; কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার এমন বিশেষ কোনো গুণ বা 'পাস' থাকে না, যাহা বিক্রয় হইতে পারে। সুতরাং বালিকা স্বয়ং বিক্রীতা হয়। একদা কোনো সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণীর সহিত আলাপ প্রসঙ্গে ঐ কথা উঠায়, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'কেন ওঁদের সমকক্ষ কুলীন কি পাওয়া যায় না যে মেয়ে কিনতে হয়?' তদুত্তরে মহিলাটি বলিয়াছিলেন, 'পাওয়া যাবে না কেন? ওদের ঐ কেনা-ব্যাচাই নিয়ম। এ যেমন ওর বোন কিনে বিয়ে করলে, আবার এর বোনকে আর একজনে কিনে নিয়ে বিয়ে করবে।'
কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম বা বিশেষ কোনো দোষের উল্লেখ করিবার আমাদের আদৌ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিবারণের নিমিত্ত এইরূপ ক্রীতদাসী ওরফে দেবীর প্রমাণ দিতে বাধ্য হইলাম। এইজন্য আমরা নিজেই দুঃখিত। কিন্তু কর্তব্য অবশ্যপালনীয়।
পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শমস্-উল-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন— 'নথ নাকেল-এর (নাকাদড়ির)-ই রূপান্তর।'

সভ্যতা ও সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইলে সামাজিক নিয়মগুলি অবশ্য সমাজপতিদের মনোমতো হইল! ইহাও স্বাভাবিক! 'জোর যার মুলুক তার'। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের অবনতির জন্য কে দোষী?

আর এই-যে আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি—এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্যবর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল*। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দিগণ পায়ে লৌহনির্মিত বেড়ি পরে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণ বা রৌপ্যের বেড়ি অর্থাৎ 'মল' পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধহয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণশৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি 'হার পারিয়াছি'। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া 'নাকাদড়ি' পরায়, এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে 'নোলক' পরাইয়াছেন!! ঐ নোলক হইতেছে 'স্বামী'র অস্তিত্বের (সধবার) নিদর্শন! অতএব দেখিলেন ভগিনী! আপনাদের ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দাসত্বের নিদর্শন ব্যতীত আর কী হইতে পারে? আবার মজা দেখুন যাঁহার দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যগণ্য!

এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকুলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখসমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে! তাই দরিদ্র কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ি না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন সার্থক করে। যে (বিধবা) চুড়ি পরিতে অধিকারিণী নহে, তাহার মতো হতভাগিনী যেন এ জগতে আর নাই! অভ্যাসের কী অপার মহিমা! দাসত্বে অভ্যাস হইয়াছে বলিয়া দাসত্বসূচক গহনাও ভালো লাগে। অহিফেন তিক্ত হইলেও আফিংচির অতি প্রিয় সামগ্রী। মাদকদ্রব্যে যতই সর্বনাশ হইক না কেন, মাতাল তাহা ছাড়িতে চাহে না। সেইরূপ আমরা অঙ্গে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিয়াও আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করি—গর্বে স্ফীতা হই!

অলঙ্কার সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে কোনো কোনো ভগ্নী আমাকে পুরুষপক্ষেরই গুপ্তচর মনে করিতে পারেন। অর্থাৎ ভাবিবেন যে, আমি পুরুষের টাকা স্বর্ণকারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হয়তো এরূপ কৌশলে ভগ্নীদিগকে অলঙ্কারে বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহা নয়, আমি আপনাদের জন্যই দুকথা বলিতে চাই। যদি অলঙ্কারের উদ্দেশ্য পুরুষদের টাকার শ্রাদ্ধ করাই হয়, তবে টাকার শ্রাদ্ধ করিবার অনেক উপায় আছে। দুই-একটি উপায় বলিয়া দিতেছি।

আপনার ঐ জড়োয়া চিকটা বাড়ির আদুরে কুকুরটির কণ্ঠে পরাইবেন। আপনি যখন শকটারোহণে বেড়াইতে যান, তখন সেই শকটবাহী অশ্বের গলে আপনার বহুমূল্য হার পরাইতে পারেন। বালা ও চুড়িগুলি বসিবার ঘরের পরদার কড়া (drawing room-এর curtain ring) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবেই 'স্বামী' নামধারী নরবরের টাকার বেশ শ্রাদ্ধ হইবে!! অলঙ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য দেখানো বই তো নয়। ঐরূপে ঐশ্বর্য দেখাইবেন। নিজের শরীরে দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করিবেন কেন? উক্ত প্রকারে

* পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক শমস্-উল-ওলামা (জাকাউল্লা সাহেব) বলেন— 'নথ নাকেল-এর (নাকাদড়ির)-ই রূপান্তর।'

গহনার সদ্ব্যবহার করিলে প্রথম প্রথম লোকে আপনাকে পাগল বলিবে, কিন্তু তাহা গায়ে না করিলেই চলিবে।• এ পোড়া সংসারে কোন্ কাজটা বিনা ক্লেশে সম্পাদিত হইয়াছে? 'পৃথিবীর গতি আছে' এই কথা বলাতে মহাত্মা গ্যালিলিও (Galileo)-কে বাতুলাগারে যাইতে হইয়াছিল। কোন্ সাধুলোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এ জগতে ভালো কথা বা ভালো কাজের বর্তমানে আদর হয় না।

বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্যবর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্যবর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোনো বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে বলেন, 'আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব'! কবিবর সাদী পুরুষদের উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'আয় মরদাঁ বকুশিদ, জামা-এ-জানা এ পুষিদ'। অর্থাৎ 'হে বীরগণ! (জয়ী হইতে) চেষ্টা কর, রমণীর পোশাক পরিও না।' আমাদের পোশাক পরিলে তাহাদের অপমান হয়! দেখা যাউক সে পোশাকটা কী—কাপড় তো তাঁহাদের ও আমাদের প্রায় একই প্রকার। একখণ্ড ধুতি ও একখণ্ড শাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে কিছুমাত্র তারতম্য আছে কি? যে দেশে পুরুষ পা-জামা পরে, সে দেশে নারীও পা-জামা পরে। 'Ladies's jacket' শুনা যায়, 'Gentlemen's jacket'ও শুনিতে পাই! তবে 'জামা-এ-জানা' বলিলে কাপড় না বুঝাইয়া সম্ভবত রমণীসুলভ দুর্বলতা বুঝায়।

পুরুষজাতি বলেন যে, তাঁহারা আমাদিগকে 'বুকের ভিতর বুক পাতিয়া বুক দিয়া ঢাকিয়া' রাখিয়াছেন, এবং এরূপ সোহাগ আমরা সংসারে পাইব না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমরা তাই সোহাগে গলিয়া—ঢলিয়া বহিয়া যাইতেছি! ফলত তাঁহারা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমাদের সর্বনাশ হইতেছে। আমাদিগকে তাঁহারা হৃদয়পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া জ্ঞান-সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছেন, তাহাতেই আমরা ক্রমশ মরিতেছি। তাঁহারা আরও বলেন, 'তাহাদের সুখের সামগ্রী আমরা মাথায় বহিয়া আনিয়া দিব—আমরা থাকিতে তাহারা দুঃখ সহ্য করিবে কেন?' আমরা ঐ শ্রেণীর বক্তাকে তাঁহাদের অনুগ্রহপূর্ণ উক্তির জন্য ধন্যবাদ দিই; কিন্তু ভ্রাতঃ! পোড়া সংসারটা কেবল কবির সুখময়ী কল্পনা নহে—ইহা জটিল কুটিল কঠোর সংসার! সত্য বস্তু—কবিতা নহে :

'কাব্য উপন্যাস নহে—এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে—ইহা প্রকৃত ভবন—'

তাই যা কিছু মুশকিল!! নতুবা আপনাদের কৃপায় আমাদের কোনো অভাব হইত না। বঙ্গবালা আপনাদের কল্পিত বর্ণনা অনুসারে 'ক্ষীণাঙ্গী, কোমলাঙ্গী, অবলা, ভয়-বিহ্বলা—' ইত্যাদি হইতে ক্রমে সূক্ষ্ম শরীর (Aerial body) প্রাপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে অনায়াসে আকাশে বিলীন হইতে পারিতেন! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ সুখের নহে; তাই এখন মিনতি করিয়া বলিতে চাই—

'অনুগ্রহ করে এই কর, অনুগ্রহ কোরো না মোদের।'

• অলঙ্কার পরা ও উক্তরূপে টাকার শ্রাদ্ধ করা একই কথা। কিন্তু আশা করা যায় যে উক্ত প্রকারে টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া টাকার সদ্ব্যয় করাই অনেকে ন্যায়সঙ্গত মনে করিবেন।

বাস্তবিক অত্যধিক যত্নে অনেক বস্তু নষ্ট হয়। যে কাপড় বহু যত্নে বন্ধ করিয়া রাখা যায় তাহা উই-এর ভোগ্য হয়। কবি বেশ বলিয়াছেন—

কেন নিবে গেল বাতি?
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে,
জাগিয়া বাসর রাতি,
তাই নিবে গেল বাতি

সুতরাং দেখা যায়, তাঁহাদের অধিক যত্নই আমাদের সর্বনাশের কারণ। বিপদসঙ্কুল সংসার হইতে সর্বদা সুরক্ষিতা আছি বলিয়া আমরা সাহস, ভরসা, বল একেবারে হারাইয়াছি। আত্মনির্ভরতা ছাড়িয়া স্বামীদের নিতান্ত মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। সামান্য হইতে সামান্যতর বিপদে পড়িলে আমরা গৃহকোণে লুকাইয়া গগনভেদী আর্তনাদে রোদন করিয়া থাকি!! ভ্রাতৃমহোদয়গণ আবার আমাদের 'নাকি কান্নার' কথা তুলিয়া কেমন বিদ্রূপ করেন, তাহা কে না জানে? আর সে বিদ্রূপ আমরা নীরবে সহ্য করি। আমরা কেমন শোচনীয়রূপে ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, তাহা ভাবিলে ঘৃণায় লজ্জায় মৃতপ্রায় হই।*

---

* সেদিন (গত ৯ এপ্রিলের) একখানা উর্দু কাগজে দেখিলাম :
তুরস্কের স্ত্রীলোকেরা সুলতান-সমীপে আবেদন করিয়াছেন যে, 'চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা ব্যতীত আমাদের আর কোনো কাজ নাই। আমাদিগকে অন্তত এ পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হউক, যাহার সাহায্যে যুদ্ধের সময় আমার আপন আপন বাটি এবং নগর পুরুষদের মতো বন্দুক-কামান দ্বারা রক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা ঐ আবেদনে নিম্নলিখিত উপকারগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন :

১. প্রধান উপকার এই যে, নগরাদি রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি সৈন্য নিযুক্ত থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সংখ্যা কম হওয়ায় যে ক্ষতি হয়, তাহা আর হইবে না (যেহেতু 'আবলা'গণ নগর রক্ষা করিবেন।)
২. সন্তানসন্ততিবর্গ শৈশব হইতেই যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হইবে। পিতামাতা উভয়ে সেপাহি হইলে শিশুগণ ভীরু, কাপুরুষ হইবে না।
৩. তাঁহারা বিশেষ এক নমুনার উর্দি (uniform) প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে চক্ষু ও নাসিকা ব্যতীত মুখের অবশিষ্ট অংশ এবং সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ আবৃত থাকিবে।
৪. অবরোধপ্রথার সম্মান রক্ষার্থে এই স্থির হইয়াছে যে, অন্তত তিন বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক পরিবারের সৈনিক পুরুষেরা আপন আপন আত্মীয় রমণীদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিবেন। অতঃপর যুদ্ধশিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাগণ যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য ঘরে ঘরে দেখা দিবেন। উক্ত মহিলাগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, 'আমরা উর্দির (uniform-এর) খরচের জন্য গবর্নমেন্টকে কষ্ট দিব না। কেবল বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সরকার হইতে পাইতে আশা করি।' দেখা যাউক, সুলতান মহোদয় এ দরখাস্তের কী উত্তর দেন।

উপরোক্ত সংবাদ সত্য কি না, সেজন্য সেই পত্রিকাখানি দায়ী। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তুরস্ক-রমণীদের ওরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্বে তাঁহারা যুদ্ধ করিতেন। একটা যেমন-তেমন 'মুসলমানী পুঁথির' পাতা উল্টাইলেও আমরা দেখিতে পাই—(যুদ্ধ করিতে যাইয়া)—

'জয়গুন নামে বাদশাজাদী কয়েদ হইল যদি,
আর যত আরব্য সওয়ার' ইত্যাদি।

বলি, এদেশের যে সমাজপতিগণ 'লেডিকেরানি' হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে চমকাইয়া উঠেন (shocked হন)—যাঁহারা অবলার হস্তে পুতুল সাজানো ও ফুলের মালা গাঁথা ব্যতীত আর কোনো শ্রমসাধ্য কার্যের ভার দেওয়ার কল্পনাই করিতে পারেন না, তাঁহারা ঐ লেডিযোদ্ধা হওয়ার প্রস্তাব শুনিলে কী করিবেন? মূর্ছা যাইবে না তো?

ব্যাঘ্র ভল্লুক তো দূরে থাকুক, আরশুলা, জলৌকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গ দেখিয়া আমরা ভীতিবিহ্বলা হই। এমনকি অনেকে মূর্চ্ছিতা হন। একটি ৯/১০ বৎসরের বালক বোরখে আবদ্ধ একটি জলৌকা লইয়া বাড়িসুদ্ধ স্ত্রীলোকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া আমোদ ভোগ করে। অবলাগণ চিৎকার করিয়া দৌড়িতে থাকেন, আর বালকটি সহাস্যে বোরখা তুলে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এমন তামাশা আপনারা দেখেন নাই কি? আমি দেখিয়াছি আর সে-কথা ভাবিয়া ঘৃণায় লজ্জায় মরমে মরিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি, সে-সময় বরং আমোদ বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সে-কথা ভাবিলে শোণিত উত্তপ্ত হয়। হায়! আমরা শারীরিক বল, মানসিক সাহস, সব কাহার চরণে উৎসর্গ করিয়াছি? আর এই দারুণ শোচনীয় অবস্থা চিন্তা করিবার শক্তিও আমার নাই।

ভীরুতার চিত্র তো দেখাইলাম, এখন শারীরিক দুর্বলতার চিত্র দেখাইব। আমরা এমন জড় 'অচেতন পদার্থ' হইয়া গিয়াছি যে, তাঁহাদের গৃহসজ্জা (drawing room-এর ornament) বই আর কিছুই নহি। পাঠিকা! আপনি কখনো বেহারের কোনো ধনী মুসলমান ঘরের বউ-ঝি নামধেয় জড়পদার্থ দেখিয়াছেন কি? একটি বধূবেগম সাহেবার প্রতিকৃতি দেখাই। ইহাকে কোনো কোনো প্রসিদ্ধ জাদুঘরে (museum-এ) বসাইয়া রাখিলে রমণীজাতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একটা অন্ধকার কক্ষে দুইটি মাত্র দ্বার আছে, তাহার একটি রুদ্ধ এবং একটি মুক্ত থাকে। সুতরাং সেখানে (পরদার অনুরোধে?) বিশুদ্ধ বায়ু ও সূর্যরশ্মির প্রবেশ নিষেধ। ঐ কুঠরিতে পর্যঙ্কের পার্শ্বে যে রক্তবর্ণ বানাত মণ্ডিত তক্তপোশ আছে, তাহার উপর বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা, তাম্বুলরাগে রঞ্জিতাধরা, প্রসন্নাননা যে জড়পুত্তলিকা দেখিতেছেন, উহাই দুলহিনবেগম (অর্থাৎ বেগমের পুত্রবধূ)। ইহার সর্বাঙ্গে ১০২৪০ টাকার অলঙ্কার! শরীরের কোন্ অংশে কত ভরি সোনা বিরাজমান, তাহা সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

১. মাথায় (সিঁথির অলঙ্কার) অর্ধ সের (৪০ ভরি)।
২. কর্ণে কিঞ্চিত অধিক এক পোয়া (২৫ ভরি)।
৩. কণ্ঠে দেড় সের (১২০ তোলা)!
৪. সুকোমল বাহুলতায় প্রায় দুই সের (১৫০ ভরি)।
৫. কটিদেশে প্রায় তিন পোয়া (৬৫ ভরি)।
৬. চরণযুগলে ঠিক তিন সের (২৪০ ভরি) স্বর্ণের বোঝা!!

বেগমের নাকে যে নথ দুলিতেছে, উহার ব্যাসার্ধ চারি ইঞ্চি!* পরিহিত পা-জামা বেচারা সলমা চমুকির কারুকার্য ও বিবিধ প্রকারের (গোটা পাট্টার) ভারে অবনত! আর পা-জামা ও দোপাট্টার (চাদরের) ভারে বেচারি বধূ ক্লান্ত! ঐরূপ আট সের স্বর্ণের বোঝা লইয়া নড়াচড়া অসম্ভব, সুতরাং হতভাগী বধূবেগম জড়পদার্থ না হইয়া কী করিবেন? সর্বদাই তাঁহার মাথা ধরে; ইহার কারণ ত্রিবিধ—১. সুচিক্কণ পাটী বসাইয়া কষিয়া বেশবিন্যাস, ২. বেণি ও সিঁথির উপর অলঙ্কারের বোঝা, ৩. অর্ধেক মাথায় আটা-সংযোগে আফশাঁ (রৌপ্যচূর্ণ) ও চুমকি বসানো হইয়াছে, ভ্রূযুগল চমকি দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং কপালে রাঙের বিচিত্র বর্ণের চাঁদ ও তারা আটা-সংযোগে বসানো হইয়াছে। শরীর যেমন জড়পিণ্ড, মন ততোধিক জড়।

* কোনো কোনো নথের ব্যাস ছয় ইঞ্চি এবং পরিধি ন্যূনাধিক ১৯ ইঞ্চি হয়। ওজন এক ছটাক!!

এইপ্রকার জড়পিণ্ড হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ কোনোরূপ শারীরিক পরিশ্রম না-করায় বেগমের স্বাস্থ্য একেবারে মাটি হয়। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে তাঁহার চরণদ্বয় শ্রান্ত ক্লান্ত, ও ব্যথিত হয়। বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য। অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ তাঁহার চির সহচর। শরীরে স্ফূর্তি না থাকিলে মনেও স্ফূর্তি থাকে না। সুতরাং ইহাদের মন এবং মস্তিষ্ক উভয়ই চিররোগী। এমন স্বাস্থ্য লইয়া চিররোগী জীবন বহন করা কেমন কষ্টকর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

ঐ চিত্র দেখিলে কী মনে হয়? আমরা নিজের ও অপরের অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তা করিলে যে শিক্ষালাভ করি, ইহাই প্রকৃত ধর্মোপদেশ। সময় সময় আমরা পাখি শাখী হইতে যে সদুপদেশ ও জ্ঞানলাভ করি, তাহা পুঁথিগত বিদ্যার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একটি আতার পতন দর্শনে মহাত্মা নিউটন যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সে জ্ঞান তৎকালীন কোনো পুস্তকে ছিল না। ঐ বধূবেগমের অবস্থা চিন্তা করিতে গিয়া আমি আমাদের সামাজিক অবস্থার এই চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইলাম! যাহা হউক, আমি উক্ত বধূবেগমের জন্য বড় দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম, 'অভাগীর ইহলোক-পরলোক--উভয়ই নষ্ট'। যদি ঈশ্বর হিসাব-নিকাশ লয়েন যে, 'তোমার মন, মস্তিষ্ক, চক্ষু প্রভৃতির কী সদ্ব্যবহার করিয়াছ?' তাহার উত্তরে বেগম কী বলিবেন? আমি তখন সেই বাড়ির একটি মেয়েকে বলিলাম, 'তুমি যে হস্ত পদ দ্বারা কোনো পরিশ্রম কর না, এজন্য খোদার নিকট কী জওয়াবদিহি (explanation) দিবে?' সে বলিল, 'আপ্‌কা কহ্‌না ঠিক হ্যায়'—এবং সে যে সময় নষ্ট করে না, সতত চলাফেরা করে, আমাকে ইহাও জানাইল। আমি পুনরায় বলিলাম, 'শুধু ঘুরাফেরা করিলেই ব্যায়াম হয় না। তুমি প্রতিদিন অন্তত আধঘণ্টা দৌড়াদৌড়ি করিও।' দৌড়াদৌড়ি কথাটার উত্তরে হাসির একটা গররা উঠিল। আমি কিন্তু ব্যথিত হইলাম, ভাবিলাম, 'উল্টা বুঝলি রাম!' কোনো বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার শক্তিটুকুও ইহাদের নাই। আমাদের উন্নতির আশা বহুদূরে—ভরসা কেবল পতিতপাবন।

আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্যালোক প্রবেশ করে না, তদ্রূপ মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। যেহেতু আমাদের উপযুক্ত স্কুল-কলেজ একপ্রকার নাই। পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন—কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইবে কি? যদি কোনো উদারচেতা মহাত্মা দায় করিয়া আমাদের হাত ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে সহস্রজনে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করেন।

সহস্রজনের বাধা ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া একজনের কার্য নহে। তাই একটু আশার আলোকদীপ্তি পাইতে-না-পাইতে চির নিরাশার অন্ধকারে বিলীন হয়। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অধিকাংশ লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে যে, তাঁহারা 'স্ত্রীশিক্ষা' শব্দ শুনিলেই 'শিক্ষার কুফলের' একটা ভাবী বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লানবদনে ক্ষমা করিয়া থাকে, কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির ঐ 'শিক্ষার' ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শতকণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে 'স্ত্রীশিক্ষাকে নমস্কার'!

আজিকালি অধিকাংশ লোকে শিক্ষাকে কেবল চাকুরি লাভের পথ মনে করে। মহিলাগণের চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব, সুতরাং এইসকল লোকের চক্ষে স্ত্রীশিক্ষা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফাঁকা তর্কের অনুরোধে আবার কোনো নেটিভ খ্রিস্টিয়ান হয়তো মনে করিবেন যে, রমণীয় জ্ঞানপিপাসাই মানবজাতির অধঃপাতের কারণ! যেহেতু শাস্ত্রে (Genesis-এ) দেখা যায়, আদিমাতা হাভা (Eve) জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এবং আদম উভয়েই স্বর্গচ্যুত হইয়াছেন।*

যাহা হউক 'শিক্ষার' অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি—তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল 'পাস করা বিদ্যা'কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। দর্শনশক্তি বৃদ্ধি বা বিকাশ সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দিতেছি :

যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু ধূলি-কর্দম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, সেখানে (বিজ্ঞানের) শিক্ষিত চক্ষু অনেক মনোরম চমৎকার বস্তু দেখিতে পায়। আমাদের পদদলিত যে কাদাকে আমরা কেবল মাটি, বালি, কয়লার কালি ও জলমিশ্রিত পদার্থ বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান করি, বিজ্ঞানবিদ তাহা বিশ্লিষ্ট করিলে নিম্নলিখিত বস্তু চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইবেন। যথা—বালুকা বিশ্লেষণ করিলে শাদা পাথর বিশেষ (opal); কর্দম পৃথক করিলে চিনেবাসন প্রস্তুতকরণোপযোগী মৃত্তিকা, অথবা নীলকান্তমণি; পাথর-কয়লার কালি দ্বারা হীরক এবং জল দ্বারা একবিন্দু নীহার! দেখিলেন, ভগিনি! যেখানে অশিক্ষিত চক্ষু কর্দম দেখে, সেখানে শিক্ষিত চক্ষু হীরা-মাণিক দেখে! আমরা যে এহেন চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া রাখি, এজন্য খোদার নিকট কী উত্তর দিব?

মনে করুন, আপনার দাসীকে আপনি একটা সম্মার্জনী দিয়া বলিলেন, 'যা, আমার অমুক বাড়ি পরিষ্কার রাখিস!' দাসী সম্মার্জনীটা আপনার দান মনে করিয়া অতি যত্নে জরির ওয়াড়ে ঢাকিয়া উচ্চস্থানে তুলিয়া রাখিল—কোনোকালে ব্যবহার করিল না। এদিকে আপনার বাড়ি ক্রমে আবর্জনাপূর্ণ হইয়া বাসের অযোগ্য হইল। অতঃপর আপনি যখন দাসীর কার্যের হিসাব লইবেন, তখন বাড়ির দুরবস্থা দেখিয়া আপনার মনে কী হইবে? শতমুখী ব্যবহার করিয়া বাড়ি পরিষ্কার রাখিলে আপনি খুশি হইবেন, না তাহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিলে সন্তুষ্ট হইবেন?

বিবেক আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত অবনতি দেখাইয়া দিতেছে—এখন উন্নতির চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।

আমাদের উচিত যে, স্বহস্তে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করি। এক স্থলে আমি বলিয়াছি, 'ভরসা কেবল পতিতপাবন', কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলন না করিলে পতিতপাবনও হাত ধরিয়া তুলিবেন না। ঈশ্বর তাহাকেই সাহায্য করেন, যে নিজে নিজের সাহায্য করে ('God helps those that help themselves')। তাই

---

* পরন্তু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যে, Eve অভিশপ্তা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু যিশুখ্রিস্ট আসিয়া নারীজাতিকে সে অভিশাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'Through woman came curse and sin : and through woman came blessing and salvation also. তাৎপর্য : নারীর দোষে জগতে অভিশাপ ও পাপ আসিয়াছে এবং নারীর কল্যাণেই আশীর্বাদ এবং মুক্তিও আসিয়াছে। পুরুষ খ্রিস্টের পিতা হয় নাই, কিন্তু রমণী যিশুখ্রিস্টের মাতৃপদ প্রাপ্তে গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

বলি আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করিলে আর কেহ আমাদের জন্য ভাবিবে না। ভাবিলেও তাহাতে আমাদের ষোলআনা উপকার হইবে না।

অনেকে মনে করেন যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধহয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধনভোগে বাধ্য হয়, এবং সেইজন্যে তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচির্ক বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া পতি-পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্মণ্য পুরুষেরাই 'স্বামী' থাকে। আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন, তিনিও তো স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না।* ইহার কারণ এই যে, বহুকাল হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোনো বস্তু নাই—এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাই :

'অতএব জাগো, জাগো গো ভগিনি!'

প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে জানি; ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের) বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা তুষানলের ব্যবস্থা দিবেন, জানি!!** (এবং ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই, জানি!) কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতে হইবেই। বলিয়াছি তো, কোনো ভালো কাজ অনায়াসে করা যায় না। কারামুক্ত হইয়াও গ্যালিলিও বলিয়াছিলেন, 'কিন্তু যাহাই হউক পৃথিবী ঘুরিতেছে' ['but nevertheless it (Earth) does move']!! আমাদিগকেও ঐরূপ বিবিধ নির্যাতন সহ্য করিয়া জাগিতে হইবে। এস্থলে পারসি নারীদের একটি উদাহরণ দিতেছি। নিম্নলিখিত কতিপয় পঙ্‌ক্তি একখণ্ড উর্দু সংবাদপত্র হইতে অনূদিত হইল :

এই পঞ্চাশ বর্ষের মধ্যে পারসি মহিলাদের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বিলাতি সভ্যতা, যাহা তাঁহারা এখন লাভ করিয়াছেন, পূর্বে ইহার নাম মাত্র জানিতেন না। মুসলমানদের ন্যায় তাঁহারাও পরদায় (অর্থাৎ অন্তঃপুরে) থাকিতেন। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহারা ছত্র ব্যবহারে অধিকারিণী ছিলেন না। প্রখর রবির উত্তাপ সহিতে না পারিলে জুতাই ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেন!! গাড়ির ভিতর বসিলেও তাহাতে পরদা থাকিত। অন্যের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করিতে পাইতেন না। কিন্তু আজিকালি পারসি মহিলাগণ পরদা ছাড়িয়াছেন। খোলা গাড়িতে বেড়াইয়া থাকেন। অন্যান্য পুরুষের সহিত আলাপ করেন। নিজেরা ব্যবসায় (দোকানদারি) করেন। প্রথমে যখন কতিপয় ভদ্রলোক তাঁহাদের স্ত্রীকে (পরদার) বাহির করিয়াছিলেন, তখন চারিদিকে ভীষণ কলরব উঠিয়াছিল। ধবলকেশ

---

* বঙ্গীয় কোনো কোনো সমাজের স্ত্রীলোক যে স্বাধীনতার দাবি করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে—কাঁকা আওয়াজ মাত্র।

** সমাজের সকলদার (reasonable) পুরুষেরা প্রাণদণ্ডের বিধান নাও দিতে পারেন, কিন্তু 'unreasonable' অকলাসরুলাগণ (যাঁহারা যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না, তাঁহারা) শতমুখী ও আঁইস-বঁটির ব্যবস্থা নিশ্চয় দিবেন, জানি!!

বুদ্ধিমানগণ বলিয়াছিলেন, 'পৃথিবীর ধ্বংস-কাল উপস্থিত হইল'!

কই পৃথিবী তো ধ্বংস হয় নাই। তাই বলি, একবার একই সঙ্গে সকলে স্বাধী... পথে অগ্রসর হও,—সময়ে সবই সহিয়া যাইবে। স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় ... অবস্থা বুঝিতে হইবে!

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কী করিলে লুপ্ত রত্ন উদ্ধার হইবে? কী করিলে অ... দেশের উপযুক্ত কন্যা হইব? প্রথমত সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপা... চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এ... কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।

পুরুষের সমকক্ষতা* লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করি... যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তাহাই করি... আবশ্যক হইলে আমরা লেডি-কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি-ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি... ব্যারিস্টার, লেডি-জজ—সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডি Viceroy হই... এদেশের সমস্ত নারীকে 'রানী' করিয়া ফেলিব। উপার্জন করিব না কেন? আমাদে... কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা 'স্বামী'... গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?**

আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবে... করিব। ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলি... সুশিক্ষিতা করিয়া কার্যক্ষেত্রেও ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক... কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ শস্তায় বিক্রয় হয়... নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২৲ বেতন পায়, ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোকে... ১৲ পায়। চাকরের খোরাকি মাসিক ৩৲ আর চাকরানির খোরাকি ২৲। অবশ্য কখনে... কখনো স্ত্রীলোককে পারিশ্রমিক বেশি পাইতেও দেখা যায়।

যদি বল, আমরা দুর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী— সে দোষ কাহার? আমাদের... আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করি না বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন...

---

* আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ... উন্নতির তুলনা দিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও... কন্যায় যে-প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই! যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র... আমরা সমাজের কন্যা! আমরা ইহা বলি না যে, 'কুমারের মাথায় যেমন উষ্ণীষ দিয়াছেন... কুমারীর মাথায়ও তাহাই দিবেন।' বরং এই বলি, 'কুমারের মস্তক শিরস্ত্রাণে সাজাইতে যতখানি... যত্ন ও ব্যয় করা হয়, কুমারীর মাথা ঢাকিবার ওড়নাখানা প্রস্তুতের নিমিত্তও ততখানি যত্ন ব্যয়... করা হইক।'

কিন্তু আমাদিগকে তাহা করিতে হইবে কেন? কৃষক-প্রজা থাকিতে জমিদার কাঁধে লাঙল লইবেন... কেন? শুধু রাজার চাকর ছাড়া আর কিছু উচ্চদরের কার্য কি আমরা করিতে পারি না? কেরানি... ইত্যাদির কথা কেবল উদাহরণস্বরূপ বলা হইল। যেমন স্বর্গের বর্ণনায় বলিতে হয়-সেখানে শীত... নাই, গ্রীষ্ম নাই, কেবল চিরবসন্ত বিরাজমান থাকে। স্বর্গোদ্যানে মরকতলতিকায় হীরক-প্রসূন... ফোটে!! তাই আমাদের উচ্চ আশা বুঝাইবার নিমিত্ত লেডি-ভাইসরয় হইবার কথা না বলিলে... কিসের সহিত আমাদের সে উচ্চদের কার্যে উপমা দিব?

** আবার ইহাও বলি—লেডি-কেরানি হওয়ার কথা কেবল বঙ্গদেশে যেমন Shocking বোধ হয়, সেরূপ অন্যত্র বোধ হয় না। আমেরিকায় লেডি-কেরানি বা লেডি-ব্যারিস্টার প্রভৃতি বিরল নহে। এবং এমন একদিনও ছিল, যখন অন্যান্য দেশের মুসলমান সমাজে 'স্ত্রী-কবি, স্ত্রী-দার্শনিক, স্ত্রী-ঐতিহাসিক, স্ত্রী-বৈজ্ঞানিক, স্ত্রী-বক্তা, স্ত্রী-চিকিৎসক, স্ত্রী-রাজনীতিবিদ্' প্রভৃতি কিছুরই অভাব ছিল না। কেবল বঙ্গীয় মোসলেম-সমাজে ওরূপ রমণীরত্ন নাই।

দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না-করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না? এখন একবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখি তো এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।

পরিশেষে বলি, আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা-উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে—সর্বত্র আমরা যাহাতে তাঁহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক। প্রথমত উন্নতির পথে তাঁহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন—আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলাম। এখন তাঁহারা উন্নতিরাজ্যে গিয়া দেখিতেছেন সেখানে তাঁহাদের সঙ্গিনী নাই বলিয়া তাঁহারা একাকী হইয়া আছেন! তাই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইতেছেন এবং জগতের যে-সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিণী, সহধর্মিণী ইতাদি হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, এ-কথা নিশ্চিত।

ভরসা করি আমাদের সুযোগ্যা ভগ্নীগণ এবিষয়ে আলোচনা করিবেন। আন্দোলন না করিলেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

নিরীহ বাঙালি

আমরা দুর্বল নিরীহ বাঙালি। এই বাঙালি শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয়াসিক্ত বাঙালি কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা— এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া গঠিত হইয়াছে, আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরেজি ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা (drawing room) এবং বাঙালি তাহাতে সাজসজ্জা (Drawing room suit)। যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙালি তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙালি তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙালি পুরুষিকা!!* অতএব আমরা মূর্তিমান কাব্য।

---

* 'নায়িকা' বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ, অনেক বাঙালি পুরুষকে 'বেচারি' বলে। ঊর্দু ভাষায় পুরুষকে 'বেচারা' ও স্ত্রীলোককে 'বেচারি' বলে। যদি আমরা 'বেচারি' হইতে পারি, তবে 'পদ্মিনী', 'নায়িকা ও পুরুষিকা' হইলে দোষ কী?

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা, নবনী, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতি সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁঠাল—রসালো এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক—সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবে ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোশাক-পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বর অঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনিগঠিত সুকোমল, পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে বায়ুসঞ্চালনের (Ventilation-এর) কোনো বাধাবিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোর্টশার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কৃশাঙ্গীগণ তদনুকরণে ইংরাজ-ললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম 'হাওয়ার শাড়ি' পরেন! বাঙালির সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙালির গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসি, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই-চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়—বাণিজ্য ও কৃষি। বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্দবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াস-সাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জন করিয়াছি। এইজন্য আমাদের দোকানে প্রয়োজনীয় জিনিস নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানাপ্রকার রোগবর্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার, নকল হীরার আংটি, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটি সোনা-রুপা বা হীরা-জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষত আজিকালি কোন্ জিনিসটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক 'দীর্ঘকেশী' তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে 'হ্রস্বকেশী' তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ 'কৃষ্ণকেশী' তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা 'শুভ্রকেশী' বাহির করি। 'কুন্তলীনের' সঙ্গে 'কেশলীন' বিক্রয় হয়। বাজারে 'মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী' ঔষধ আছে, 'মস্তিষ্ক উষ্ণকারী' দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাস বিক্রয়। এই পাস বিক্রেতার নাম 'বর' এবং ক্রেতাকে 'শ্বশুর' বলে। এক-একটি পাসের মূল্য কত জানো? 'অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী'। এম. এ. পাস অমূল্যরত্ন, ইহা যে-সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত শস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙালি কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে

পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথার্সবস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।

এখন কৃষিকার্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি কৃষিভাগের কার্য (Agriculture) করা অপেক্ষা মস্তিষ্ক উর্বর (Brain culture) করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থবিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ! এবং কৃষিকার্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল *M.R.A.C.* পাস করা সহজ! আইনচর্চা করা অপেক্ষা কৃষি-বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতস্তত ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরামকেদারায় দুর্ভিক্ষ সমাচার (Famine Report) পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অর্থ উৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তাতে আমাদের কী?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য নির্বাহ করিয়া থাকি। যথা—

১. রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা 'রাজা' উপাধি লাভ সহজ।
২. শিল্পকার্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B.Sc. ও D. Sc. পাস করা সহজ।
৩. অল্পবিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোনো মহৎ কার্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা 'খাঁ বাহাদুর' বা 'রায় বাহাদুর' উপাধিলাভ জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।
৪. প্রতিবেশী দরিদ্রদের শোক-দুঃখে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড়লোকদের মৃত্যুদুঃখে 'শোকসভার' সভ্য হওয়া সহজ।
৫. দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।
৬. স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।
৭. স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য বর্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্ক গণ্ডে!) কালিডোর, মিল্ক অভ রোজ ও ভিনোলিয়া পাউডার (Kalydore, Milk of Rose ও Vinolia powder) মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।
৮. কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্তিমান আলস্য—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্ধাঙ্গীগণ কিরূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ, তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে ১. তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর ২. জবেহ কর, তারপর ৩. ফাঁসি দাও!! আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশি। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশি। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশি বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য

লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? 'ভগ্ন শূর্প', 'জীর্ণ কাঁথা', 'পু... চটিজুতা'—কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করি... যথা—'অতি শুভ্রনীলাম্বর', 'সাশ্রুসজল নয়ন' ইত্যাদি। শ্রীমতীদের ... বিলাপপ্রলাপপূর্ণ পদ্যের 'অশ্রুজলের' বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাই... সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।*

অর্ধাঙ্গী

কোনো রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমে রোগের অবস্থা জানা আবশ্যক। তে... অবলাজাতির উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবার পূর্বে তাহাদের অবনতির চিত্র দেখাই... হয়। আমি 'স্ত্রীজাতির অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধে ভগিনীদিগকে জানাইয়াছি যে আমাদের একটা রোগ আছে—দাসত্ব। সে-রোগের কারণ এবং অবস্থা কত... পরিমাণে ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করি... সেই রোগ হওয়ায় আমাদের সামাজিক অবস্থা কেমন বিকৃত হইয়াছে। ঔষধপথ্যে... বিধান স্থানান্তরে দেওয়া হইবে।

এইখানে গোঁড়া পরদাপ্রিয় ভগ্নীদের অবগতির জন্য দু-একটা কথা বলিয়া রা... আবশ্যক বোধ করি। আমি অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই নাই। কেহ যদি আমার 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে পরদাবিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে না পান, তবে আমাকে মনে করিতে হইবে, আমি নিজের মনোভাব উত্তমরূপে ব্যক্ত করিতে পারি নাই, অথবা তিনি প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই।

সে-প্রবন্ধে প্রায় সমগ্র নারীজাতির উল্লেখ আছে। সকল সমাজের মহিলাগণই কি অবরোধ বন্দিনী থাকেন? অথবা তাঁহারা পরদানশীন নহেন বলিয়া কি আমি তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ উন্নত বলিয়াছি? আমি মানসিক দাসত্বের (enslaved মনের আলোচনা করিয়াছি।

কোনো একটা নূতন কাজ করিতে গেলে সমাজ প্রথমত গোলযোগ উপস্থিত করে এবং পরে সেই নূতন চালচলন সহিয়া লয়, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ পারসি মহিলাদের পরিবর্তিত অবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে তাঁহারা ছত্র ব্যবহারেরও অধিকারিণী ছিলেন না, তারপর তাঁহাদের বাড়াবাড়িটা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, তবু পৃথিবী ধ্বংস হয় নাই। এখন পারসি মহিলাদের পরদামোচন হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক দাসত্ব মোচন হইয়াছে কি? অবশ্যই হয় নাই। আর ঐ যে পরদা ছাড়িয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের স্বকীয় বুদ্ধিবিবেচনার তো কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পারসি পুরুষগণ কেবল অন্ধভাবে বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া স্ত্রীদিগকে পরদার বাহিরে আনিয়াছে, ইহাতে অবলাদের জীবনীশক্তির তো কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না—তাঁহারা যে জড়পদার্থ, সেই জড়পদার্থই আছেন। পুরুষ যখন তাঁহাদিগকে

---

* গত ১৩১০ সালে 'নিরীহ বাঙালি' লিখিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, বর্তমান সালে আর বাঙালি 'পুরুষিকা' নহেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমন শুভ পরিবর্তন হইবে, ইহা কে জানিত! জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন আমরা সাহসী বাঙালি।

অন্তঃপুরে রাখিতেন, তাঁহারা তখন সেইখানে থাকিতেন। আবার পুরুষ যখন তাঁহাদের 'নাকের দড়ি' ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মাঠে বাহির করিয়াছেন, তখনও তাঁহারা পরদার বাহির হইয়াছেন! ইহাতে রমণীকুলের বাহাদুরি কী? এরূপ পরদাবিরোধ কখনোই প্রশংসনীয় নহে।

কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন লোকে তাঁহাকে বাতুল বলে নাই কি? নারী আপন স্বত্বস্বামিত্ব বুঝিয়া আপনাকে নরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে চাহে, ইহাও বাতুলতা বই আর কী?

পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি যতটুকু সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারি না। লোক কালী, শীতলা প্রভৃতি রাক্ষস-প্রকৃতির দেবীকে ভয় করে, পূজা করে, সত্য। কিন্তু সেইরূপ বাঘিনী, নাগিনী, সিংহ প্রভৃতি 'দেবী'ও কি ভয় ও পূজা লাভ করে না? তবেই দেখা যায় পূজাটা কে পাইতেছেন—রমণী কালী, না রাক্ষসী নৃমুণ্ডমালিনী?

নারীকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুলোকে সীতা দেবীকে আদর্শরূপে দেখাইয়া থাকেন। সীতা অবশ্যই পরদানশীন ছিলেন না। তিনি রামচন্দ্রের অর্ধাঙ্গী, রানি, প্রণয়িনী এবং সহচরী। আর রামচন্দ্র প্রেমিক, ধার্মিক—সবই। কিন্তু রাম সীতার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, একটি পুতুলের সঙ্গে কোনো বালকের যে-সম্বন্ধ, সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেইরূপ। বালক ইচ্ছা করিলে পুতুলকে প্রাণপণে ভালোবাসিতে পারে; পুতুল হারাইলে বিরহে অধীর হইতে পারে; পুতুলের ভাবনায় অনিদ্রায় রজনীযাপন করিতে পারে; পুতুলটা যে-ব্যক্তি চুরি করিয়াছিল, তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে; হারানো পুতুল ফিরিয়া পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করিয়াও পুতুলটা কাদায় ফেলিয়া দিতে পারে—কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ, হস্তপদ থাকা সত্ত্বেও পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ। বালক তাহার পুতুল স্বেচ্ছায় অনলে উৎসর্গ করিতে পারে, পুতুল পুড়িয়া গেল দেখিয়া ভূমে লুটাইয়া ধূলি-ধূসরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে পারে!!

রামচন্দ্র 'স্বামিত্বের' ষোলআনা পরিচয় দিয়াছেন!! আর সীতা?—কেবল প্রভু রামের সহিত বনযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা প্রকাশের শক্তি আছে। রাম বেচারা অবোধ বালক, সীতার অনুভব-শক্তি আছে, ইহা তিনি বুঝিতে চাহেন নাই, কেননা, বুঝিয়া কার্য করিতে গেলে স্বামিত্বটা পূর্ণমাত্রায় খাটানো যাইত না;—সীতার অমন পবিত্র হৃদয়খানি অবিশ্বাসের পদাঘাতে দলিত ও চূর্ণ করিতে পারা যাইত না!

আচ্ছা, দেশকালের নিয়মানুসারে কবির ভাষায় স্বর মিলাইয়া নাহয় মানিয়া লই যে, আমরা স্বামীর দাসী নহি—অর্ধাঙ্গী। আমরা তাঁহাদের গৃহে গৃহিণী, মরণে (নাহয়, অন্তত তাঁহাদের চাকুরি উপলক্ষে যথাতথা) অনুগামিনী, সুখদুঃখে সমভাগিনী, ছায়াতুল্যা সহচরী ইত্যাদি। কিন্তু কলিযুগে আমাদের ন্যায় অর্ধাঙ্গী লইয়া পুরুষগণ কিরূপ বিকলাঙ্গ হইয়াছেন, তাহা কি কেহ একটু চিন্তাচক্ষে দেখিয়াছেন? আক্ষেপের (অথবা 'প্রভু'দের সৌভাগ্যের) বিষয় যে, আমি চিত্রকর নহি—নতুবা এই নারীরূপ অর্ধাঙ্গ লইয়া তাঁহাদের কেমন অরূপ মূর্তি হইয়াছে, তাহা আঁকিয়া দেখাইতাম।

অক্লকেশ বুদ্ধিমানগণ বলেন যে, আমাদের সাংসারিক জীবনটা দ্বিচক্র শকটের

ন্যায় -ঐ শকটের এক চক্র পতি, অপরটি পত্নী। তাই ইংরাজি ভাষায় কথায় কথায় স্ত্রীকে অংশিনী ('partner'), উত্তমার্ধ ('better half') ইত্যাদি বলে। স্ত্রীর কর্তব্য অতি গুরুতর, সহজ নহে—

'সু-কঠিন গার্হস্থ্য ব্যাপার
সুশৃঙ্খলে কে পারে চালাতে?
রাজ্যশাসনের রীতিনীতি
সূক্ষ্মভাবে রয়েছে ইহাতে।'

বোধহয় এই গার্হস্থ্য ব্যাপারটাকে মস্তকস্বরূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারগণ পতি ও পত্নীকে তাহার অঙ্গস্বরূপ বলিয়াছেন। তবে দেখা যাউক বর্তমান যুগে সমাজের মূর্তিটা কেমন।

মনে করুন, কোনোস্থানে পূর্বদিকে একটি বৃহৎ দর্পণ আছে, যাহাতে আপনি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে পারেন। আপনার দক্ষিণাঙ্গভাগ পুরুষ এবং বামাঙ্গভাব স্ত্রী। এই দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখুন—

আপনার দক্ষিণ বাহু দীর্ঘ (ত্রিশ ইঞ্চি) এবং স্থূল, বামবাহু দৈর্ঘ্যে চব্বিশ ইঞ্চি এবং ক্ষীণ। দক্ষিণ চরণ দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি, বাম চরণ অতিশয় ক্ষুদ্র। দক্ষিণ স্কন্ধ উচ্চতায় পাঁচ ফিট, বাম স্কন্ধ উচ্চতায় চারি ফিট! (তবেই মাথাটা সোজা থাকিতে পারে না, বামদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে! কিন্তু আবার দক্ষিণ কর্ণভারে বিপরীত দিকেও একটু ঝুঁকিয়াছে।) দক্ষিণ কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ, বাম কর্ণ রাসভকর্ণের ন্যায় দীর্ঘ। দেখুন!—ভালো করিয়া দেখুন, আপনা মূর্তিটা কেমন! যদি এ মূর্তিটা অনেকের মনোমতো না হয়, তবে দ্বিচক্র শকটের গতি দেখাই। যে-শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে-শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না;—সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।

সমাজের বিধিব্যবস্থা আমাদিগকে তাঁহাদের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়াছে; তাঁহাদের সুখদুঃখ একপ্রকার, আমাদের সুখদুঃখ অন্যপ্রকার। এ-স্থলে বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নবদম্পতির প্রেমালাপ' কবিতার দুই-চারি ছত্র উদ্ধৃত করিতে ব্যধ্য হইলাম :

বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া?
কনে। পুষি মেনিটিরে ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

বর। কী করিছ বনে কুঞ্জভবনে?
কনে। খেতেছি বসিয়া টোপা কুল।

বর। জগৎ ছানিয়া, কী দিব, আনিয়া জীবন করি ক্ষয়?
তোমা তরে সখি, বল করিব কী?
কনে। আরো কুল পাড় গোটা ছয়।

বর। বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?
কনে। দেব পুতুলের বিয়ে।

সুতরাং দেখা যায় কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, যাহাতে সে স্বামীর ছায়াতুল্য সহচরী হইতে পারে। প্রভুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার দৌড় সচরাচর 'বোধোদয়' পর্যন্ত।

স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন! স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনির গতি নির্ণয় করেন। বলি জ্যোতিবেত্তা মহাশয়, আপনার পার্শ্বে আপনার সহধর্মিণী কই? বোধহয়, গৃহিণী যদি আপনার সঙ্গে সূর্যমণ্ডলে যান, তবে তথায় পঁহুছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিণীর না-যাওয়াই ভালো!!

অনেকে বলেন, স্ত্রীলোকদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। মেয়েরা চর্বচোষ্য রাঁধিতে পারে, বিবিধ প্রকার সেলাই করিতে পারে, দুই-চারিখানা উপন্যাস পাঠ করিতে পারে, ইহাই যথেষ্ট। আর বেশি আবশ্যক নাই। কিন্তু ডাক্তার বলেন যে, আবশ্যক আছে। যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ. এ. বি. এ. পাস হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে! তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষায় এ-কথার সত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে।*

আমার জনৈক বন্ধু তাঁহার ছাত্রকে উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি দিঙ্‌নির্ণয়ের কথা (Cardinal points) বুঝাইতেছিলেন। শেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন, যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত পশ্চিমে এবং বাম হস্ত পূর্বে থাকে, তবে তোমার মুখ কোন্ দিকে হইবে?' উত্তর পাইলেন, 'আমার পশ্চাৎ দিকে!'

যাঁহারা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট 'পাহল-ওয়ান' দেখিতে চাহেন কি না? তাঁহাদের দৌহিত্র ঘুসিটা খাইয়া থাপড়টা মারিতে পারে, এরূপ ইচ্ছা করেন না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধহয়,

---

* 'দাসী' পত্রিকা হইতে কতকগুলি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না—
প্রশ্ন : When was Cromwell born (ক্রম ওয়েলের জন্ম কখন হইয়াছিল)?
উত্তর : In the year 1649 when he was fourteen years old (১৬৪৯ সালে যখন তিনি চৌদ্দ বৎসরের ছিলেন)।
প্রশ্ন : Describe his continental policy (তাঁহার রাষ্ট্রীয় নীতি বর্ণনা কর)।
উত্তর : He was honest and truthful and he had nine children (তিনি সাধু প্রকৃতি এবং সত্যবাদী ছিলেন এবং তাঁহার নয়জন সন্তানসন্ততি ছিল)।
প্রশ্ন : What is the adjective of ass (গর্দভের বিশেষণ কী)?
উত্তর : Assansole (আসানসোল)।
প্রশ্ন : Who was Chandra Gupta (চন্দ্রগুপ্ত কে)?
উত্তর : Chandra Gupta was the grand daughter of Asoka (চন্দ্রগুপ্ত অশোকের দৌহিত্রী)।
'পরীক্ষারহস্য'। 'কলা ঝলসাইতে লাগিল' ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছিল। একজন ছাত্র লিখিয়াছেন, 'roasted some plantations'? আর একজন লিখিয়াছেন 'roasted some plantagenets'; অপর একজন লিখিয়াছেন, 'roasted some plaintiffs' কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কল্পিতউত্তর। সত্য সত্যই এরূপ উত্তর পাওয়া গিয়াছে।'

তাঁহারা সুকুমারী গোলাপ-লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!!! আর যদি ইচ্ছা করে যে দৌহিত্রও বলিষ্ঠ না হয়, বরং পয়জার-পেটা হইয়া নত মস্তকে উচ্চৈঃস্বরে বলে 'মাৎ মারো! চোট্ লাগ্‌তা হায়!' এবং পয়জার লাভ শেষ হইলে দূরে গিয়া প্রহারকর্তাকে শাসাইয়া বলে যে, 'কায় মারতা থা? হাম নালিশ করেগা!' তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে আমার বক্তব্য বুঝাইতে অক্ষম।

খ্রিস্টিয়ান সমাজে যদিও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট সুবিধা আছে, তবু রমণী আপন স্বত্ব ষোলআনা ভোগ করিতে পায় না। তাহাদের মন দাসত্ব হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী ও স্ত্রী কতক পরিমাণে জীবনের পথে পাশাপাশি চলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রত্যেক উত্তমার্দ্ধ (Better half) তাঁহার অংশীর ((partner-এর) জীবনে আপন জীবন মিলাইয়া তন্ময় হইয়া যান না। স্বামী যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া মরমে মরিতেছেন, স্ত্রী তখন একটা নূতন টুপির (bonnet-এর) চিন্তা করিতেছেন। কারণ তাহাকে কেবল মূর্তিমতী কবিতা হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—তাই তিনি মনোরমা কবিতা সাজিয়া থাকিতে চাহেন। ঋণদায়রূপ গদ্য (prosaic) অবস্থা তিনি বুঝিতে অক্ষম।

এখন মুসলমান সমাজে প্রবেশ করা যাউক। মুসলমানের মতে আমরা পুরুষের 'অর্ধেক', অর্থাৎ দুইজন নারী একজন নরের সমতুল্যা। অথবা দুইটি ভ্রাতা ও একটি ভগিনী একত্র হইলে আমরা 'আড়াই জন' হই। আপনারা 'মহম্মদীয় আইনে' দেখিতে পাইবেন যে বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে। এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ। যদি আপনারা একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কোনো ধনবান মুসলমানের সম্পত্তি বিভাগ করা দেখেন, কিংবা জমিদারি পরিদর্শন করিতে যান, তবে দেখিবেন, কার্যত কন্যার ভাগে শূন্য (০) কিংবা যৎসামান্য পড়িতেছে।

আমি এখন অপার্থিব সম্পত্তির কথা বলিব। পিতার স্নেহ, যত্ন ইত্যাদি অপার্থিব সম্পত্তি। এখানেও পক্ষপাতিতার মাত্রা বেশি। ঐ যত্ন, স্নেহ, হিতৈষিতার অর্ধেকই আমরা পাই কই? যিনি পুত্রের সুশিক্ষার জন্য চারিজন শিক্ষক নিযুক্ত করেন, তিনি কন্যার জন্য দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন কি? যেখানে পুত্র তিনটা (বি. এ. পর্যন্ত) পাস করে, সেখানে কন্যা দেড়টা পাশ (এন্ট্রান্স পাস ও এফ.এ. ফেল) করে কি? পুত্রদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা করা যায় না, বালিকাদের বিদ্যালয় সংখ্যায় পাওয়াই যায় না। যে-স্থলে ভ্রাতা 'শমস্-উল-ওলামা'* সে-স্থলে ভগিনী 'নজম্-উল-ওলামা' হইয়াছেন কি? তাঁহাদের অন্তঃপুরগগনে অসংখ্য 'নজম্‌ন্নেসা' 'শামসন্নেসা' শোভা পাইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা সাহিত্যগগনে 'নজম্-উল-ওলামা' দেখিতে চাই।

আমাদের জন্য এদেশে শিক্ষার বন্দোবস্ত সচরাচর এইরূপ : প্রথমে আরবীয় বর্ণমালা, অতঃপর কোরআন শরিফ পাঠ। কিন্তু শব্দগুলির অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হয় না, কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যে টিয়াপাখির মতো আবৃত্তি কর। কোনো পিতার হিতৈষণার মাত্রা বৃদ্ধি হইলে, তিনি দুহিতাকে 'হাফেজা' করিতে চেষ্টা করেন। সমুদয় কোরআনখানি যাঁহার কণ্ঠস্থ থাকে, তিনিই 'হাফেজ'। আমাদের আরবি শিক্ষা ঐ পর্যন্ত। পারস্য এবং উর্দু শিখিতে হইলে, প্রথমে 'করিমা ববখশা এবরহালে মা' এবং একেবারে (উর্দু) 'বানাতন্ নাস' পড়া।** একে আকার ইকার নাই, তাতে আবার

---

* 'শমস্-উল-ওলামা', পণ্ডিতদের উপাধি বিশেষ। ঐ শব্দগুলির অনুবাদ এইরূপ হয় : শমস্--Sun; ওলামা, ('আলম' শব্দের বহুবচন)— Learned men. এইরূপ নজম্-উল-ওলামা অর্থে the 'star' of the learned men (বা women) বুঝিতে হইবে।

আর কোনো সহজ পাঠ্যপুস্তক পূর্বে পড়া হয় নাই, সুতরাং পাঠের গতি দ্রুত হওয়া হয় না। অনেকের ঐ কয়খানি পুস্তক পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই কন্যাজীবন শেষ হয়। বিবাহ হইলে বালিকা ভাবে, 'যাহা হোক, পড়া হইতে রক্ষা পাওয়া গেল।' কোনো কোনো বালিকা রন্ধন ও সূচিকর্মে সুনিপুণা হয়। বঙ্গদেশেও বালিকাদিগকে রীতিমতো বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ উর্দু পড়িতে শিখে, কিন্তু কলম ধরিতে শিখে না। ইহাদের উন্নতির চরম সীমা সল্‌মা চুমকির কারুকার্য, উলের জুতা-মোজা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা পর্যন্ত।

যদি ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দ.) আপনাদের হিসাবনিকাশ লয়েন যে, 'তোমরা কন্যার প্রতি কিরূপ ন্যায়-ব্যবহার করিয়াছ?' তবে আপনারা কী বলিবেন?

পয়গম্বরদের ইতিহাসে শুনা যায়, জগতে যখনই মানুষ বেশি অত্যাচার-আনাচার করিয়াছে, তখনই এক-একজন পয়গম্বর আসিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়াছেন। আরবে স্ত্রী-জাতির প্রতি অধিক অত্যাচার হইতেছিল; আরববাসীগণ কন্যাহত্যা করিতেছিল, তখন হজরত মোহাম্মদ (দ.) কন্যাকুলের রক্ষকস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিনি কেবল বিবিধ ব্যবস্থা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, স্বয়ং কন্যা পালন করিয়া আদর্শ দেখাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ফাতেমাময় করিয়া দেখাইয়াছেন—কন্যা কিরূপ আদরণীয়া। সে আদর, সে স্নেহ জগতে অতুল।

আহা! তিনি নাই বলিয়া আমাদের এ দুর্দশা। তবে আইস ভগিনীগণ! আমরা সকলে সমস্বরে বলি :

'করিমা ববখ্‌শা-এ বরহালে মা।' করিম (ঈশ্বর) অবশ্যই কৃপা করিবেন। যেহেতু 'সাধনায় সিদ্ধি।' আমরা 'করিমের' অনুগহ লাভের জন্য যত্ন করিলে অবশ্যই তাঁহার করুণা লাভ করিব। আমরা ঈশ্বর ও মাতার নিকট ভ্রাতাদের 'অর্ধেক' নহি। তাহা হইলে এইরূপ স্বাভাবিক বন্দোবস্ত হইত—পুত্র যেখানে দশমাস স্থান পাইবে, দুহিতা সেখানে পাঁচ মাস! পুত্রের জন্য যতখানি দুগ্ধ আমদানি হয়, কন্যার জন্য তাহার অর্ধেক। সেরূপ তো নিয়ম নাই! আমরা জননীর স্নেহমমতা ভ্রাতার সমানই ভোগ করি। মাতৃহৃদয়ে পক্ষপাতিতা নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব, ঈশ্বর পক্ষপাতী? তিনি কি মাতা অপেক্ষা অধিক করুণাময় নহেন?

আমি এবার রন্ধন ও সূচিকার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আবার যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি সূচিকর্ম ও রন্ধনশিক্ষার বিরোধী। জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু অন্নবস্ত্র; সুতরাং রন্ধন ও সেলাই অবশ্য শিক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলিয়া জীবনটাকে শুধু রান্নাঘরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নহে।

স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতা বশত নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে। তাই বলিয়া পুরুষ 'প্রভু' হইতে পারে না। কারণ, জগতে দেখিতে পাই, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট কোনো-না-কোনো প্রকার সাহায্য প্রার্থনা না করে, যেন

** এইখানে একটি দশম বর্ষের বালিকার গল্প মনে পড়িল। পল্লিগ্রামে অনেকের বাড়ি ধান ভানিবার জন্য 'ভাননী' নিযুক্ত হয়। সেই বালিকা 'বানাতন্ নাস' পড়িতে যাইয়া হোসেন আরার মেজাজের কর্শনাটা হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষা ভাননীদের ধানভানা কাজটা সহজ মনে করিত। তাই সুযোগ পাইলেই সে ঢেঁকিশালে গিয়া দুই-এক সের ধান্যের শ্রাদ্ধ করিত। সে ধান্য হইতে তণ্ডুল পরিষ্কার পাওয়া যাইত না—তাহা 'whole meal' ময়দার ন্যায় ধান্য-তুষ-তণ্ডুল মিশ্রিত একপ্রকার অদ্ভুত সামগ্রী হইত। যে রোগীদের জন্য হোলমি ময়দার ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তাঁহাদের জন্য উক্ত হোল-মিল-তণ্ডুলচূর্ণ অবশ্যই উপকারী খাদ্য, সন্দেহ নাই।

একে অপরের সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্যপ্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর 'স্বামী', না কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর 'স্বামী'? এ স্বাভাবিক নিয়মের কথা ছাড়িয়া কেবল সামাজিক নিয়মে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা তাহাই দেখি।

কেহ সূত্রধর, কেহ তন্তুবায় ইত্যাদি। একজন ব্যারিস্টার ডাক্তারের সাহায্যপ্রার্থী, আবার ডাক্তারও ব্যারিস্টারের সাহায্য চাহেন। তবে ডাক্তারকে ব্যারিস্টারের স্বামী বলিব, না ব্যারিস্টার ডাক্তারের স্বামী? যদি ইহাদের কেহ কাহাকে 'স্বামী' বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে শ্রীমতীগণ জীবনের চিরসঙ্গী শ্রীমানদিগকে 'স্বামী' ভাবিবেন কেন?

আমরা উত্তমার্ধ (better halves)। তাঁহারা নিকৃষ্টার্ধ (worse halves); আমরা অর্ধাঙ্গী, তাঁহারা অর্ধাঙ্গ। অবলার হাতেও সমাজের জীবনমরণের কাঠি আছে, যেহেতু 'না জাগিলে সব ভারতললনা' এ ভারত আর জাগিতে পারিবে না। প্রভুদের ভীরুতা কিংবা তেজস্বিতা জননীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে কেবল শারীরিক বলের দোহাই দিয়া অদূরদর্শী ভ্রাতৃমহোদয়গণ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি না করেন।

আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না-পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। সমান সুবিধা পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না? আশৈশব আত্মনিন্দা শুনিতেছি, তাই এখন আমরা অন্ধভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করি। অনেক সময় 'হাজার হোক ব্যাটা ছেলে' বলিয়া ব্যাটা ছেলেদের দোষ ক্ষমা করিয়া অন্যায় প্রশংসা করি। এই তো ভুল।* আমি ভগিনীদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহাদের ধর্মবন্ধন বা সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে বাহির করিতে চাহি না। মানসিক উন্নতি করিতে হইলে হিন্দুকে হিন্দুত্ব বা খ্রিস্টানকে খ্রিস্টানি ছাড়িতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করিয়াও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই।

অনেকে হয়তো ভয় পাইয়াছেন যে, বোধহয় একটা পত্নীবিদ্রোহের আয়োজন করা হইতেছে। অথবা ললনাগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষকে রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেই পদগুলি অধিকার—শামলা, চোগা, আইনকানুনের পাঁজিপুঁথি লুঠিয়া লইবেন। অথবা সদলবলে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কৃষকগুলিকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের শস্যক্ষেত্র দখল করিবেন, হাল গরু কাড়িয়া লইবেন, তবে তাঁহাদের অভয় দিয়া বলিতে হইবে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুরুষগণ আমাদিগকে সুশিক্ষা হইতে পশ্চাৎপদ রাখিয়াছেন বলিয়া আমরা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছি। ভারতে ভিক্ষু ও ধনবান—এই দুই দল লোক অলস; এবং

---

* এ-স্থলে জনৈক নারীহিতৈষী মহাত্মার উর্দু গাথা মনে পড়িল। তিনি (১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের কোনো মাসিক পত্রিকায়) লিখিয়াছেন : 'জগতের তোমাদের নিন্দাগীতি এতদূর উচ্চরাগে গাওয়া গিয়াছে যে, শেষে তোমরাও জগতের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলে যে, 'আমরা বাস্তবিক বিদ্যালাভের উপযুক্ত নহি।' সুতরাং মূর্খতার কুফল ভোগের নিমিত্ত তোমরা নতমস্তকে প্রস্তুত হইলে।' কী চমৎকার সত্য কথা। জগদীশ্বর উক্ত কবিকে দীর্ঘজীবী করুন।

ভদ্রমহিলার দল কর্তব্য অপেক্ষা অল্প কাজ করে। আমাদের আরামপ্রিয়তা খুব বাড়িয়াছে। আমাদের হস্ত, মন, পদ, চক্ষু ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করা হয় না। [illegible] রমণীরত্ন একত্র হইলে ইহার উহার বিশেষত আপন আপন অর্ধাঙ্গের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করিয়া বাকপটুতা দেখায়। আবশ্যক হইলে কোন্দলও চলে।

আশা করি এখন 'স্বামী' স্থলে 'অর্ধাঙ্গ' শব্দ প্রচলিত হইবে।

সুগৃহিণী

ইতিপূর্বে আমি 'স্ত্রী-জাতির অবনতি' প্রবন্ধে আমাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি কিন্তু সত্য কথা সর্বদাই কিঞ্চিৎ শ্রুতিকটু বলিয়া অনেকে উহা পছন্দ করেন নাই।* অতঃপর 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে নারী ও নর উভয়ে একই বস্তুর অংশবিশেষ। যেমন একজনের দুইটি হাত কিংবা কোনো শকটের দুইটি চক্র, সুতরাং উভয়ে সমতুল্য, অথবা উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। এক চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তিকে লোকে কানা বলে।

যাহা হউক, আধ্যাত্মিক সমকক্ষতার ভাষা যদি স্ত্রীলোকেরা না বুঝেন, তবে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চভাবের কথায় কাজ নাই। আজি আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী? বোধহয় আপনারা সমস্বরে বলিবেন,

'সুগৃহিণী হওয়া'

বেশ কথা। আশা করি, আপনারা সকলেই সুগৃহিণী হইতে ইচ্ছা করেন, এবং সুগৃহিণী হইতে হইলে যে-যে গুণের আবশ্যক, তাহা শিক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপনাদের অনেকেই প্রকৃত সুগৃহিণী হইতে পারেন নাই। কারণ, আমাদের বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা আমরা লাভ করিতে পারি না। সমাজ আমাদের উচ্চশিক্ষা লাভ করা অনাবশ্যক মনে করেন। পুরুষ বিদ্যালাভ করেন অন্ন উপার্জনের আশায়, আমরা বিদ্যালাভ করিব কিসের আশায়? অনেকের মতে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন নাই। যেহেতু আমাদিগকে অন্নচিন্তা করিতে হয় না, সম্পত্তি রক্ষার্থে মোকদ্দমা করিতে হয় না, চাকরিলাভের জন্য সার্টিফিকেট ভিক্ষা করিতে হয় না, 'নবাব' 'রাজা' উপাধিলাভের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খোশামোদ করিতে হয় না, কিংবা কোনো সময়ে দেশরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে না--তবে আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ (অথবা Mental culture) করিব কিসের জন্য? আমি বলি, সুগৃহিণী হওয়ার নিমিত্তই সুশিক্ষা (Mental culture) আবশ্যক।

এই-যে গৃহিণীদের ঘরকন্নার দৈনিক কার্যগুলি, ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্যও তো বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন। চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই সমাজের হর্ত্রী ও কর্ত্রী বিধাত্রী, তাঁহারাই সমাজের গৃহলক্ষ্মী, ভগিনী এবং জননী।

---

* কেহ আবার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া সগর্বে বলিয়াছেন, 'ভারতে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী, তাঁহারা নারীরই উপাসক।' বেশ! বলি, হিন্দুর আরাধ্য দেবতা কোন্ জিনিসটি নহে? পূজনীয় বস্তু বলিতে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ ইহার কোন্ পদার্থটিকে বাদ দেওয়া যায়? হনুমান এবং গো-জাতিও কি উপাস্য দেবতা নহে? তাই বলিয়া কি ঐ সকল পশুকে তাঁহাদের 'উপাসক মানুষ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে?

ঘরকন্নার কাজগুলি প্রধানত এই :

ক. গৃহ এবং গৃহসামগ্রী পরিষ্কার ও সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা।

খ. পরিমিতব্যয়ে সুচারুরূপে গৃহস্থালি সম্পন্ন করা।

গ. রন্ধন ও পরিবেশন।

ঘ. সূচিকর্ম।

ঙ. পরিজনদিগকে যত্ন করা।

চ. সন্তানপালন করা।

এখন দেখা যাউক, ঐ কার্যগুলি এদেশে কিরূপ হইয়া থাকে এবং কিরূপ হওয়া উচিত। আমরা ধনবান এবং নিঃস্বদিগকে ছাড়িয়া মধ্যম অবস্থার লোকের কথা বলিব।

গৃহখানা পরিষ্কার ও অল্পব্যয়ে সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিতে হইলে বুদ্ধির দরকার। প্রথমে গৃহনির্মাণের সময়ই গৃহিণীকে স্বীয় সলিকা* (taste) দেখাইতে হইবে। কোথায় একটি বাগান হইবে, কোন্ স্থানে রন্ধনশালা হইবে ইত্যাদি তাঁহারই পছন্দ অনুসারে হওয়া চাই। ভাড়াটে বাড়ি হইলে তাহার কোন্ কামরা কিরূপে ব্যবহৃত হইবে, সে বিষয়ে সলিকা চাই—যেহেতু তিনি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু বলি, কয়জন গৃহিণীর এ জ্ঞান আছে? আমরা এমন গৃহিণী যে গৃহ-ব্যাপারই বুঝি না। আমাদের বিস্‌মেল্লায়ই গলৎ।

গৃহ নির্মাণের পর গৃহসামগ্রী চাই। তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখার জন্যও সলিকা চাই। কোথায় কোন্ জিনিসটা থাকিলে মানায় ভালো, কোথায় কী মানায় না, এসব বুঝিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। একটা মেয়েলি প্রবাদ আছে, 'সেই ধান সেই চাউল, গিন্নি গুণে আউল ঝাউল' (এলোমেলো)। ভাঁড়ারঘরে সচরাচর দেখা যায়, মাকড়সার জাল চাঁদোয়ারূপে শোভা পাইতেছে। তেঁতুলে তণ্ডুলে বেশ মেশামিশি হইয়া আছে, কোথাও ধনের সহিত মৌরী মিশিয়াছে। চিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে একঘণ্টা সময় লাগে। চারি দিক বন্ধ থাকে বলিয়া ভাঁড়ারঘরের দ্বার খোলামাত্র বদ্ধ বায়ুর একপ্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। অভ্যাসের কৃপায় এ-দুর্গন্ধ গিন্নিদের অপ্রিয় বোধ হয় না।

অনেক শ্রীমতী পান সাজিতে বসিয়া যাঁতির খোঁজ করেন; যাঁতি পাওয়া গেলে দেখেন পানগুলি ধোওয়া হয় নাই। পানেরডিবে কোন্ ছেলে কোথায় রাখে তার ঠিক নাই। কখনো বা খয়ের ও চূণের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পান থাকে ঘটিতে, সুপারি থাকে একটা সাজিতে, খয়ের হয়তো থাকে কাপড়ের বাক্সে। অবশ্য 'সাহেবে সলিকা'গণ এরূপ করেন না। তাঁহাদের পানের সমস্ত জিনিস যথাস্থানে সুসজ্জিত থাকে।

কেহ বা চা'র পাত্র (tea-pot) মৎস্যাধাররূপে ব্যবহার করেন, ময়দা চালিবার চালনিতে পটল, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি কুটিয়া রাখা হয়। পিতলের বাটিতে

---

* (Taste) উর্দু ভাষায় 'সলিকা' manner, taste, নিপুণতা, যোগ্যতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। সলিকা শব্দের ন্যায় মেয়েলি ভাষায় 'কাজের ছিরি' কথা চলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সলিকার সমুদয় ভাব প্রকাশ হয় না। তাই সুবিধার নিমিত্ত এ শব্দটাকে বাঙলায় প্রবেশ করাইতে চাই। 'আরজি' 'তহবিল' 'মাহসুল' (মাশুল) ইত্যাদি শব্দ বহুকাল হইতে বাঙলায় প্রচলিত আছে। 'সলিকা'ও চলুক। 'সাহেবে সলিকা' অর্থে যাহার সলিকা আছে (person of taste) বুঝায়।

তুলের আচার থাকে। পূর্বে মুসলমানেরা 'কোমাবা' (পারিবেশন, যাহাতে দুধ রাঁধিবার সরঞ্জাম থাকে) রাখিতেন, আজিকালি অনেকে toilet table বলেন। ইহাদের 'মোকাবায়' কিংবা টেবিলের উপর চিরুণি তৈল (toilet সামগ্রী) ও আরও অনেক জিনিস থাকে, যাহার সহিত কেশবিন্যাস সামগ্রীর (toilet-এর) কোনো সম্পর্ক নাই।

পরিমিত ব্যয় করা গৃহিণীর একটা প্রধান গুণ। হতভাগা পুরুষেরা টাকা উপার্জন করিতে কিরূপ শ্রম ও যত্ন করেন, কতখানি মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া এক-একটি পয়সার মূল্য (পারিশ্রমিক) দিয়া থাকেন, অনেক গৃহিণী তাহা একটু চিন্তা করিয়াও দেখেন না। উপার্জন না করিলে স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন, যথাসাধ্য কটুকাটব্য বলিবেন, কিন্তু একটু সহানুভূতি করেন কই? ঐ শ্রমার্জিত টাকাগুলি কন্যার বিবাহে বা পুত্রের অন্নপ্রাশনে কেবল সাধ (আমোদ) আহ্লাদে ব্যয় করিবেন, অথবা অলঙ্কার গড়াইতে ঐ টাকা দ্বারা স্বর্ণকারের উদরপূর্তি করিবেন। স্বামী বেচারা একসময় চাকরির আশায় সার্টিফিকেট কুড়াইবার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া, বহু আয়াসে সামান্য বেতনের চাকরিপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া যে টাকা কয়টি পত্নীর হাতে আনিয়া দেন, তাহার অধিকাংশ মল ও নূপুরের বেশে তাঁহার কন্যাদের চরণ বেড়িয়া রুনুঝুনু রবে কাঁদিতে থাকে। হায় বালিকে! তোমার চরণশোভন সেই মল গড়াইতে তোমার পিতার হৃদয়ের কতখানি রক্ত শোষিত হইয়াছে, তাহা তুমি বুঝ না।

স্বামীর আয় অনুসারে ব্যয় করাই অর্থের সদ্ব্যবহার। ইউরোপীয় মহিলাদের কথার মূল্য বেশি, তাই একজন কাউনটেসের (Countess) উক্তি উদ্ধৃত করা গেল :

> 'The first point necessary to consider in the arrangement and ordering of a lady's household, is that everything should be on a scale exactly proportionate to her husband's income'.
>
> (ভাবার্থ : বাড়িঘর সাজাইবার সময় গৃহিণী সর্বপ্রথমে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন যে, তাঁহার গৃহস্থালির যাবতীয় সামগ্রী যেন তাঁহার স্বামীর আয় অনুসারে প্রস্তুত হয়। তাঁহার গৃহসজ্জা দেখিয়া যেন তাঁহার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ঠিক অনুমান করা যাইতে পারে)।

সুশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে আমরা টাকার সদ্ব্যবহার শিখিব কিরূপে? গৃহিণীরা-যে স্বামীকে ভালোবাসেন না, আমি ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা স্বামীকে প্রাণের অধিক ভালোবাসেন, কিন্তু বুদ্ধি না-থাকা বশত প্রকৃত সহানুভূতি করিতে পারেন না। কবিবর সাদী বুদ্ধিহীন বন্ধু অপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বাস্তবিক স্ত্রীদের অন্ধপ্রেমে অনেক সময় পুরুষদের ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হয়।

কেহ আবার পরিমিত ব্যয় করিতে যাইয়া একেবারে কৃপণ হইয়া পড়েন, ইহাও উচিত নহে।

গৃহিণীর রন্ধনশিক্ষা করা উচিত, এ-কথা কে অস্বীকার করেন? একটা প্রবাদ আছে যে, স্ত্রীদের রান্না তাঁহাদের স্বামীর রুচি অনুসারে হয়। গৃহিণী যে-খাদ্য প্রস্তুত করেন, তাহার উপর পরিবারস্থ সকলের জীবনধারণ নির্ভর করে। মূর্খ রাঁধুনিরা প্রায়ই 'কালাই'* রহিত তাম্রপাত্রে দধি মিশ্রিত করিয়া যে কোরমা প্রস্তুত করে, তাহা বিষ

* 'কালাই' শব্দের বাঙালা কী হইবে? ইংরেজিতে Tinning বলে।

ভিন্ন আর কিছু নহে; মুসলমানেরা প্রায়ই অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ রোগে থাকেন, তাহার কারণ খাদ্যের দোষ ছাড়া আর কী হইতে পারে? এ সম্বন্ধে কাউনটেসের (Countess) উক্তি শুনুন :

'Bad food, ill-cooked food, monotonous food, insuffi food, injure the physique and ruin the temper. No should turn to the more tempting occupations or am ments of the day till she has gone into every detail of family commissariat and assured herself that it is as as her purse, her cook, and the season can make it,'

(ভাবার্থ : কোনো মহিলাই প্রথমে স্বীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের আহারের সুবন্দো এবং রন্ধনশালা পরিদর্শন না করিয়া যেন অন্যকোনো বিষয়ে মনোযোগ করেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থানুসারে খাদ্যসামগ্রী যথাসাধ্য সুরুচিকর হইয়া থা কি না, এ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। ষড়ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে আহার্যবস্তুরও পরিবর্তন করা অবশ্যক। ভোজ্য-দ্রব্য যথাবিধি রন্ধন না হই কিংবা সর্বদা একই প্রকার খাদ্য এবং অখাদ্য ভোজন করিলে শরীর দুর্বল এ নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে)।

সুতরাং রন্ধনপ্রণালীর সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর ডাক্তারি ও রসায়ন (Chemistr বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। কোন্ খাদ্যের কী গুণ, কোন্ বস্তু কত সময় পরিপাক হয়, কোন্ ব্যক্তির নিমিত্ত কিরূপ আহার্য প্রয়োজন, এ-সব বিষয়ে গৃহিণী জ্ঞান চাই। যদি আহারই যথাবিধি না হয়, তবে শরীরের পুষ্টি হইবে কিসের দ্বার অযোগ্য ধাত্রীর হস্তে কেহ সন্তান পালনের ভার দেয় না, তদ্রূপ অযোগ্য রাঁধুনি হাতে খাদ্যদ্রব্যের ভার দেওয়া কি কর্তব্য? রন্ধনশালার চতুর্দিকে কাদা হইলে সে স্থান হইতে সতত দূষিত বাষ্প উঠিতে থাকে; বাড়ির লোকেরা দুগ্ধ এবং অন্যান্য খাদ্যের সহিত ঐ বাষ্প আত্মসাৎ করে। কেবল আহারের স্থান পরিষ্কৃত হইলেই চলিবে না; যে-স্থানে আহার করা হয়, সে জায়গায় বায়ু (Atmosphere) পর্যন্ত যাহাতে পরিষ্কৃত থাকে, গৃহিণী সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

অনেকে শাকসবজি খাইতে ভালোবাসেন। বাজারের তরকারি অপেক্ষা গৃহজাত তরকারি অবশ্য ভালো হয়। গৃহিণী প্রায়ই শিম, লাউ, শশা, কুষ্মাণ্ড স্বহস্তে বপন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা উদ্যান প্রস্তুতপ্রণালী (Horticulture) অবগত থাকেন, তবে ঐ লাউ কুমড়ার কি সমধিক উন্নতি হইবে না? অন্তত কোন্ স্থানের মাটি কিরূপ, কোথায় শশা ভালো ফলিবে, কোথায় লঙ্কা ভালো হইবে, গৃহিণীর এ-জ্ঞানটুকু তো থাকা চাই।

অনেকেই ছাগল, কুক্কুট, হংস, পারাবত ইত্যাদি পালন করেন, কিন্তু সেই সকল জন্তু পালন করিবার রীতি অনেকেই জানেন না। উহাদের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থান না-থাকায় উহারা বাড়ির মধ্যেই ঘুরিয়া চরিয়া বেড়ায়। কাজেই বাড়িখানাকে পশুশালা বা পশুপক্ষীদের 'ময়লার ঘর' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহাতে এই জন্তুগুলি রুগ্ন না হইয়া হৃষ্টপুষ্ট থাকে এবং গৃহ নোংরা করিতে না পারে, তৎপ্রতি গৃহিণীর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। উহাদের বাসস্থানও পরিষ্কৃত এবং হাওয়াদার (airy) হওয়া উচিত। নচেৎ রুগ্ন পশুপক্ষীর মাংস খাওয়ায় অনিষ্ট বই উপকার নাই। তবেই দেখা যায়, এক রন্ধনশিক্ষা করিতে যাইয়া আমাদিগকে উদ্ভিদবিজ্ঞান, রসায়ন ও

উদ্যানতত্ত্ব (Horticulture, Chemistry ও Theory of Heat) শিখিতে হয়।

অন্নের পরই বস্ত্র— না, মানুষ বস্ত্রকে অন্ন অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করে শীতগ্রীষ্মানুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুত কিংবা সেলাই করা গৃহিণীর কর্তব্য। পূর্বে তাঁহারা চরকা কাটিয়া সূতা প্রস্তুত করিতেন। এখন কলকারখানার অনুগ্রহে কাপড় সুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজ নিজ taste (পছন্দ) অনুসারে সেলাই করিতে হয়। এজন্যও সুশিক্ষা লাভ আবশ্যক। আপনারা হয়তো মনে করিবেন যে, আমার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। এতকাল হইতে নিরক্ষর দরজিরা ভালোই সেলাই করিয়া আসিতেছে, সেলাই-এর সঙ্গে সুশিক্ষার সম্বন্ধ কী? সেলাই-এর সহিত পড়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে, কিন্তু আনুষঙ্গিক (indirect) সম্বন্ধ আছে। পড়িতে (বিশেষত ইংরাজি) না জানিলে সেলাইয়ের কল (sewing machine-এর) ব্যবস্থাপত্র পাঠ করা যায় না। ব্যবস্থা না বুঝিলে মেশিন (machine) দ্বারা ভালো সেলাই করা যায় না। কেবল হাতে সেলাই করিলে লেখাপড়া শিখিতে হয় না, সত্য। কিন্তু হাতের সেলাই-এর সহিত মেশিন-এর সেলাইয়ের তুলনা করিয়া দেখিবেন তো কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? তাহা ছাড়া মেশিন চালনা শিক্ষা করাই শ্রেয়। এতদ্ব্যতীত ক্যানভাস (Canvas)-এর জুতা, পশমের মোজা, শাল প্রভৃতি কে না ব্যবহার করিতে চাহেন? এই প্রকারের সূচিকার্য ইংরাজি (Knitting ও Crochet সম্বন্ধীয়) ব্যবস্থাপত্রের সাহায্য ব্যতীত সুচারুরূপে হয় না। ঐ ব্যবস্থাপুস্তক পাঠে শিক্ষয়িত্রীর বিনাসাহায্যে সূচিকর্মে সুনিপুণা হওয়া যায়; কাপড়ের ছাঁটকাট সবই উৎকৃষ্ট হয়। কাপড়ের কাটছাঁটের জন্যও তো বুদ্ধির দরকার। কাপড়, পশম, জুতা ইত্যাদির পরিমাণ জানা থাকিলে, একজোড়া মোজার জন্য তিন জোড়ার পশম কিনিয়া অনর্থক অপব্যয় করিতেও হয় না।

পরিবারভুক্ত লোকদের সেবাযত্ন করা গৃহিণীর অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেকের সুখসুবিধার নিমিত্ত নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ ত্যাগ করা রমণীজীবনের ধর্ম, এ-কার্যের জন্যও সুশিক্ষা (training) চাই। সচরাচর গৃহিণীরা পরিজনকে সুখ দিবেন তো দূরের কথা, তাঁহাদের সহিত ছোট ছোট বিষয় লইয়া কোঁদলকলহে সময় কাটাইয়া থাকেন। শাশুড়ির নিন্দা ননদিনীর নিকট, আবার ননদের কুৎসা যার-তার নিকট করেন, এইভাবে দিন যায়।

কেহ পীড়িত হইলে তাহার যথোচিত সেবা করা গৃহিণীর কর্তব্য, রোগীর সেবা অতি গুরুতর কার্য। যথারীতি শুশ্রূষাপ্রণালী (nursing) অবগত না হইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যায় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ রোগী ঔষধপথ্যের অভাব না হইলেও শুশ্রূষার অভাবে মারা যায়। অনেক স্থানে নিরক্ষর সেবিকা রোগীকে মালিশের ঔষধ খাওয়াইয়া দেয়। কেহ বা অসাবধানতাবশত বিষাক্ত ঔষধ যেখানে-সেখানে রাখে, তাহাতে অবোধ শিশুরা সেই ঔষধ খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভ্রমের জন্য চিরজীবন অনুতাপে দগ্ধ হইতে হয়। কেহ বা রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া পথ্য দান করে, কেহ অত্যধিক স্নেহবশত তিন-চারি বারের ঔষধ একবারে সেবন করায়। এরূপ ঘটনা এদেশে বিরল নহে। ডাক্তারি বিষয়ে সেবিকার উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এ-কথা কেহ অস্বীকার করেন কি? ডাক্তারি না জানিয়া শুশ্রূষা করিতে যাওয়া যা, আর স্বর্ণকারের কাজ শিখিয়া চর্মকারের কাজ করিতে যাওয়াও তাই!

কিন্তু ডাক্তারি জানো বা না-জানো, রোগীর সেবা সকলকেই করিতে হয়। এমন দুহিতা কে আছেন, যিনি অশ্রুধারায় জননীর পদ প্রক্ষালন করিতে করিতে ভাবেন না

যে, 'এত যত্ন পরিশ্রম সব ব্যর্থ হল; আমার নিজের পরমায়ু দিয়াও যদি ... বাঁচাইতে পারিতাম।' এমন ভগিনী কে আছেন, যিনি পীড়িত ভ্রাতার পার্শ্বে ... অনাহার দিনযাপন করেন না? এমন পত্নী কে, যিনি স্বামীর পীড়ার জন্য ... ভাবিয়া নিজে আধমরা হন না? এমন জননী কে আছেন, যিনি জীবনে কখনো পী... শিশু কোলে লইয়া অনিদ্রায় রজনীযাপন করেন নাই? যিনি কখনো এরূপ রো... সেবা করেন নাই, তিনি প্রেম শিখেন নাই। না কাঁদিলে প্রেম শিক্ষা হয় না।

বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব রক্ষা করা অতি আবশ্যক। এই গুণটা আমাদের অনেকেরই নাই। আমরা কেবল 'হায়! হায়!' করিয়া কাঁদিতে জানি! বোধহয় অনে... থাকে যে, অবলার চক্ষের জল দেখিয়া শমনদেব সদয় হইবে! অনেক সময় দেখা যায়, রোগী এদিকে পিপাসায় ছটফট করিতেছেন, সেবিকা ওদিকে বিলাপ করিয়া (নানা ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া) কাঁদিতেছেন! হায় সেবিকে, এ সময় রোগীর মুখে কি একটু দুধ দেওয়ার দরকার ছিল না? এ সময়টুকু-যে দুধ না-খাওয়াইয়া রোদনে অপব্যয়িত হইল, ইহার ফলে রোগীর অবস্থা বেশি মন্দ হইল।

এ-স্থলে একটি পতিপ্রাণা গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বামীদেবের বুকে ব্যথা হইয়াছিল; সেজন্য তিনি দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছিলেন। পরদিন প্রভাতে কবিরাজ আসিয়া বলেন, 'এখন অবস্থা মন্দ, রাত্রেই বুকে একটুকু সর্ষের তৈল মালিশ করিলে এরূপ হইত না।' গৃহিণী অনিদ্রায় নিশিযাপন করিলেন, একটু তৈলমর্দন করিলেন না। কারণ এ জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল না। ঐ অজ্ঞানতার ফলে ত্রিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইল : (১) স্বামীর স্বাস্থ্য বেশি খারাপ হইল; (২) নিজে অনর্থক রাত্রি জাগরণে অসুস্থ হইলেন; (৩) চিকিৎসকের জন্য টাকার অপব্যয় হইল। কারণ, রাত্রে তৈল মাখিলেই ব্যথা সারিয়া যাইত, চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না।

এখন যদি আমি বলি যে, গৃহিণীদের জন্য একটা 'জেনানা মেডিকেল কলেজ' চাই, তবে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না।

সন্তানপালন : ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার। সন্তানপালনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তানের শিক্ষা হইয়া থাকে। একজন ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, 'মাতা হইবার পূর্বে সন্তানপালন শিক্ষা করা উচিত। মাতৃকর্তব্য অবগত না হইয়া যেন কেহ মাতা না হন।' যে বেচারিকে ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে মাতা, ছাব্বিশ বৎসর বয়সে মাতামহী এবং চল্লিশ বৎসরে প্রমাতামহী হইতে হয়, সে মাতৃজীবনের কর্তব্য কখন শিখিবে?

শিশু মাতার রোগ, দোষ, গুণ, সংস্কার সকল বিষয়েরই উত্তরাধিকারী হয়। ইতিহাসে যত মহৎ লোকের নাম শুনা যায়, তাঁহারা প্রায় সকলেই সুমাতার পুত্র ছিলেন। অবশ্য অনেকস্থলে সুমাতার কুপুত্র অথবা কুমাতারও সুপুত্র হয়। বিশেষ কোনো কারণে ওরূপ হয়। স্বভাবত দেখা যায়, আতার গাছে আতাই ফলে, জাম ফলে না। শিশু স্বভাবত মাতাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালোবাসে, তাঁহার কথা সহজে বিশ্বাস করে। মাতার প্রতি কার্য, প্রতি কথা শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রতিফোঁটা দুগ্ধের সহিত মাতার মনোগত ভাব শিশুর মনে প্রবেশ করে। কবি কী চমৎকার ভাষায় বলিতেছেন :

'—দুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীর-গুণগাথা বিক্রম কাহিনী,
বীরগর্বে তার নাচুক ধমনী।'

তাই বটে, বীরাঙ্গনাই বীরজননী হয়! মাতা ইচ্ছা করিলে শিশু-হৃদয়ের বৃত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া তাহাকে তেজস্বী, সাহসী, বীর, ধীর সবই করিতে পারেন। অনেক মাতা শিশুকে মিথ্যা বলিতে ও সত্য গোপন করিতে শিক্ষা দেয়; ভবিষ্যতে সেই পুত্রগণ ঠগ, জুয়াচোর হয়। অযোগ্য মাতা কারণে-অকারণে প্রহার করিয়া শিশুর হৃদয় নিস্তেজ (spirit low) করে, ভবিষ্যতে তাহারা শ্বেতাঙ্গের অর্ধচন্দ্র ও সবুট পদাঘাত নীরবে—অক্লেশে সহ্য করে। কোনো মজুরের পৃষ্ঠে জনৈক গৌরাঙ্গ নূতন পাদুকা ভাঙিয়া ভগ্ন জুতার মূল্য আদায় না করায় সেই কুলি 'নৌতুন জুতা দিয়া মারল—দাম ভী লইল না' বলিয়া সাহেবের প্রশংসা করিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, অনেক 'ভদ্রলোকের' অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া থাকে!

অতএব, সন্তানপালনের নিমিত্ত বিদ্যাবুদ্ধি চাই, যেহেতু মাতাই আমাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ পুত্র লাভ করিতে হইলে প্রথমে মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইবে।

কেবল কাজ লইয়াই ১৬/৭৮ ঘণ্টা সময় কাটানো কষ্টকর। মাঝে মাঝে বিশ্রামও চাই। সেই অবসর সময়টুকু পরনিন্দায়, বৃথা কোঁদলে কিংবা তাস খেলায় না কাটাইয়া নির্দোষ আমোদে কাটাইলে ভালো হয় না কি? সেজন্য চিত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। যিনি এ বিষয়ে পারদর্শিনী হইতে চাহেন তাঁহাকেও বর্ণমালার সহিত পরিচয় করিতে হইবে। চিত্রের বর্ণ, তুলির বর্ণনা, সঙ্গীতের স্বরলিপি সবই পুস্তকে আবদ্ধ। অথবা সুপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নে কিংবা কবিতা প্রভৃতি রচনায় অবসর সময় যাপন করা শ্রেয়।

প্রতিবেশীর প্রতি গৃহিণীর কর্তব্য সম্বন্ধেও এ-ক্ষেত্রে দুই-চারিকথা বলা প্রয়োজন বোধ করি। অতিথি সৎকার ও প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারের জন্য এককালে আরব জাতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, আরবীয় কোনো ভদ্রলোকের আবাসে ইঁদুরের বড় উৎপাত ছিল। তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁহাকে বিড়াল পুষিতে উপদেশ দেওয়ায় তিনি বলিলেন যে, বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরগুলি তাঁহার বাড়ি ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিবেশীদিগকে উৎপীড়ন করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি বিড়াল পোষেন না!

আর আমরা শুধু নিজের সুখসুবিধার চিন্তায় ব্যস্ত থাকি, অপরের অসুবিধার বিষয় আমাদের মনে উদয় হয় না। বরং কাহারও বিপদের দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হইতে পারে কি-না, সেই কথাই পূর্বে মনে উদয় হয়! কেহ দুঃসময়ে কোনো জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ক্রেতা ভাবেন এই সুযোগ জিনিসটি বেশ সুলভে পাওয়া যাইবে! ঈদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে দৃষ্টি রাখা শিক্ষিত সমাজের শোভা পায় না। অথবা একজনে হয়তো ক্ষণিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তাঁহার ভালো চাকরানিটাকে বিদায় দিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ অপর একজন গৃহিণী সেই বিতাড়িতা চাকরানিকে হাত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আদর্শ গৃহিণী সেই স্থলে সেই পরিচারিকাকে পুনরায় তাহার প্রভুর বাড়ি নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পাইবেন। প্রতিবেশিনীর বিপদকে নিজের বিপদ বলিয়া মনে করা উচিত।

আর প্রতিবেশিনীর পরিধি বৃহৎ হওয়া চাই—অর্থাৎ প্রতিবেশী বলিলে যেন কেবল আমাদের দ্বারস্থিত গৃহস্থ না-বুঝায়। বঙ্গদেশের প্রতিবেশী বলিতে পাঞ্জাব, অযোধ্যা, উড়িষ্যা—এ-সবই যেন বুঝায়। হইতে পারে পাঞ্জাবের একদল ভদ্রলোক কোনো কারখানায় কাজ করেন, সেই কারখানার কর্তৃপক্ষকে তাঁহারা বিশেষ কোনো অভাবের

বিষয় জানাইতে বারম্বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় ধর্মঘট করিতে হইলেন। ঐ ধর্মঘটকে যেন উড়িষ্যা বা মাদ্রাজের লোকে নিজেদের কার্যের সুযোগ ভাবিয়া আহ্লাদিত না হন। সুগৃহিণী আপন পতি পুত্রকে তাদৃশ ধর্মঘট কার্যগ্রহণে বাধা দিবেন। আর স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসি বা খ্রিস্টিয়ান অথবা বাঙালি, মাদ্রাজি, মাড়ওয়ারি, বা পাঞ্জাবি নহি; আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী—তারপর মুসলমান, শিখ বা হিন্দু কিছু। সুগৃহিণী এই সত্য আপন পরিবার মধ্যে প্রচার করিবেন। তাহার ফলে তাঁহার পরিবার হইতে ক্ষুদ্রস্বার্থ হিংসাদ্বেষ ইত্যাদি ক্রমে তিরোহিত হইবে এবং তাঁহার গৃহ দেবভবনসদৃশ ও পরিজনতুল্য হইবে। এমন ভারতমহিলা কে, যিনি আপন ভবনকে আদর্শ দেবালয় করিতে না চাহিবেন?

দরিদ্রা প্রতিবেশিনীদিগকে নানাপ্রকারে সাহায্য করাও আমাদের অন্যতম কর্তব্য। তাহাদের সূচিশিল্প এবং চরকায় প্রস্তুত সূত্রের বস্ত্রাদি উচিতমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহাদের পরম উপকার করা হয়। এইরূপে এবং আরও অনেক প্রকারে তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে; বিস্তারিত বলা বাহুল্য মাত্র।

আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বালকবালিকাদিগকে ভৃত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সচরাচর দেখা যায়, বড় ঘরের বালকেরা ভারি দাম্ভিক হয়, তাহারা চাকরকে নিতান্ত নগণ্য কী-যেন-কী মনে করে। বেতনভোগী হইলেও ভৃত্যবর্গ যে মানুষ এবং তাহাদেরও স্বীয় পদানুসারে মান-অপমান জ্ঞান আছে, সুকুমারমতি শিশুদিগকে এ-কথা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। অনেক গৃহিণী নিজের পুত্রকন্যার দোষ বুঝেন না, তাঁহারা চাকরকেই অযথা শাসন করেন। ওরূপে শিশুকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়।

উর্দু 'বানাতন্ নাস' গ্রন্থে বর্ণিত নবাব-নন্দিনী হোসেন-আরা অন্যায় আদরে এমন দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার দৌরাত্ম্যে দাসী, পাচিকা প্রভৃতি সেবিকাবৃন্দ ত্রাহি-ত্রাহি করিত!* যাহাতে বালিকারা বিনয়ী এবং শিষ্টশান্ত হয়, এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

---

* হোসেন-আরার বালসুলভ ঔদ্ধত্যের বর্ণনা বেশ আমোদপ্রদ। পাঠিকাদিগকে একটু নমুনা উপহার দিই : হোসেন-আরা পিতামাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাহাকেই ভয় করিত না। সমস্ত বাড়ি তার মাথায় তুলিয়া রাখিত! একদিন তাহার বড় মাসি শাহজামানী বেগম তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছেন। পরিচারিকার দল হয়তো ভাবিল, ছোট বেগমের (হোসেন-আরার মাতার) নিকট অভিযোগে বিশেষ কোনো ফল হয় না; বড় বেগম নবাগতা, তাঁহাকে দেখিয়া হোসেন-আরার চপলতা কিঞ্চিৎ দমিয়া যাইবে। শাহজামানী বেগম শিবিকা হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ক্রমান্বয়ে দুই-চারি অভিযোগ উপস্থিত হইল।

নরগেস কাঁদিয়া আসিয়া বলিল, 'দেখুন, ছোট সাহেবজাদী (হোসেন-আরা) এমন পাথর ছুড়ি মারিয়াছেন ভাগ্যক্রমে আমার চক্ষু নষ্ট হয় নাই।'

সোসন আসিয়া বলিল, 'দেখুন, ছোট সাহেবজাদী আমায় বলিলেন, 'দেখি সোসন তোর জিহ্বা, বে আমি জিহ্বা বাহির করিলাম অমনি তিনি আমার চিবুকে এমন জোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন যে, আমা সমস্ত দাঁত রসনায় বিদ্ধ হইয়াছিল।'

গোলাপ চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'হায়, আমার কান রক্তাক্ত করিয়া দিলেন!'

রন্ধনশালা হইতে পাচিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, 'এই দেখুন, ছোট সাহেবজাদী তরকারির হাঁড়িতে মু ভরিয়া ছাই দিতেছে! ঐসব শুনিয়া বড় বেগম ডাকিলেন, 'হোসনা! এখানে আইস।' হোস তৎক্ষণাৎ আসিল তো; কিন্তু আসিয়া মাসিকে নমস্কার করিবে তো দূরের কথা,—হাতে ছাই, পা

হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও তাহাতে
e-এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে নির্লজ্জ
বিসর্জন ইত্যাদি শিক্ষণীয়। নতুবা নির্বোধ বন্ধু
ারিবে না। ধর্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষাদীক্ষার
ওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত'—অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে
আছে, 'মূর্খের উপাসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা
ণীর জন্য আজ পর্যন্ত যেসব কর্তব্য নির্ধারিত
প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের
lture) আবশ্যক, গৃহস্থালির জন্য গৃহিণীদেরও
lture) প্রয়োজনীয়।
মন-তেমনভাবে গৃহস্থালি করিলেও সংসার চলে
ণী বলা যায় না; এবং ঐসব ডোমচামারের
্যাভূষণ' বা 'তর্কালঙ্কার' হইবে এরূপ আশাও

। এখন সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা আপনাদের
দর জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য

বোরকা

াদের 'জঘন্য অবরোধ-প্রথা'ই নাকি আমাদের
ীদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই
বলি, উন্নতি জিনিসটা কী? তাহা কি কেবল
হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি

পরিশেষে বলি প্রেমিক হও, ধার্মিক হও বা নাস্তিক হও, যাই হইতে চাও তাহার জন্য তোমার মানসিক উন্নতির (mental culture-এর) প্রয়োজন। প্রেমিক হইতে গেলে সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা, মাশুকের** নিমিত্ত আত্মবিসর্জন ইত্যাদি শিক্ষণীয়। নতুবা নিরোধ হইলে কাহারই উপকার করিতে পারিবে না। ধর্মসাধনের নিমিত্ত শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন, কারণ, 'কে বে-ইল্‌মে নাতওয়াঁ খোদারা শেনাখত'—অর্থাৎ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরকে চেনা যায় না। অন্যত্র প্রবাদ আছে, 'মূর্খের উপাসনা ও বিদ্বানের শয়নাবস্থা সমান।' অতএব দেখা যায় যে, রমণীর জন্য আজ পর্যন্ত যেসব কর্তব্য নির্ধারিত আছে, তাহা সাধন করিতেও বুদ্ধির প্রয়োজন। অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত পুরুষদের যেমন মানসিক শিক্ষা (mental culture) আবশ্যক, গৃহস্থালির জন্য গৃহিণীদেরও তদ্রূপ মানসিক শিক্ষা (mental culture) প্রয়োজনীয়।

ইতর শ্রেণীর লোকদের মতো যেমন-তেমনভাবে গৃহস্থালি করিলেও সংসার চলে বটে, কিন্তু সেরূপ গৃহিণীকে সুগৃহিণী বলা যায় না; এবং ঐসব ডোমচামারের পুত্রগণ-যে কালে 'বিদ্যাসাগর', 'বিদ্যাভূষণ' বা 'তর্কালঙ্কার' হইবে এরূপ আশাও বোধহয় কেহ করেন না।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করিলাম। এখন সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা আপনাদের কর্তব্য। যদি সুগৃহিণী হওয়া আপনাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে স্ত্রীলোকের জন্য সুশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

বোরকা

আমি অনেক বার শুনিয়াছি যে, আমাদের 'জঘন্য অবরোধ-প্রথা'ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কী? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝিবে যে জেলেনী, চামারনী, কি ডুমনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে?

আমাদের তো বিশ্বাস যে, অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে এফ. এ. বি. এ পরীক্ষার জন্য পরদা ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (University Hall-এ) উপস্থিত হইতে হইবে। এ যুক্তি মন্দ নহে। কেন? আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (University) হওয়া এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কি অসম্ভব?

কাদা—এই অবস্থায় সে হঠাৎ মাসির গলা জড়াইয়া ধরিল। তিনি সাদরে বলিলেন, 'হোসনা! তুমি বড় দুষ্ট হইয়াছ।'

হোসনা তখন উপস্থিত দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'এই সম্বেল পেতনি বুঝি কোনো কথা আপনাকে লাগাইয়াছে?' এই বলিয়াই সে মাসির ক্রোড় হইতে লাফাইয়া উঠিয়া নির্দোষ সম্বেলের কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার আরম্ভ করিল। 'আঁ! ও কী কর!' কী কর!' বলিয়া বড় বেগম বারম্বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুই শুনিল না।

পরে হোসেনা-আরা জেনানা মক্তবে (পাঠশালায়) প্রেরিত হইয়া সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্বারা লেখক মহোদয় দেখাইয়াছেন, অমন অবাধ্য অনম্য বালিকাও শিক্ষার গুণে ভালো হয়।

** আমাদের বিশ্বাস সুশিক্ষা স্পর্শমণি, যাহাকে স্পর্শ করে সেই সুবর্ণ হয়।

মাশুক—যাহাকে ভালোবাসা যায় ; beloved object.

যতদিন এইরূপ বন্দোবস্ত না হয়, ততদিন আমাদের পাস-করা বিদ্যা না চলিবে।

অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। কেননা, পশুদের মধ্যে এ নিয়ম মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের সুবিধার জন্য গাড়ি পালকি প্রভৃতি নানা যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলেও অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের 'অস্বাভাবিক' সভ্যতার ফলেই অন্তঃপুর সৃষ্টি।

পৃথিবীর অসভ্য জাতিরা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। ইতিহাসে জানা যায়, অসভ্য ব্রিটেনেরা অর্ধনগ্ন থাকিত। ঐ অর্ধনগ্ন অবস্থার পূর্বে গায় রঙ মাখিত। ক্রমে সভ্য হইয়া তাহারা পোশাক ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

এখন সভ্যতাভিমানিনী (civilized) ইউরোপীয়রা এবং ব্রাহ্মসমাজের ভগ্নীরা মুখ ব্যতীত সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া হাটে-মাঠে বাহির হন। আর অন্যান্য দেশের মুসলমানেরা (ঘরের বাহির হইবার সময়) মহিলাদের মুখের উপর আরও একখণ্ড বস্ত্রাবরণ (বোরকা) দিয়া ঐ অঙ্গাবরণকে সম্পূর্ণ উন্নত (perfect) করিয়াছেন। যাঁহারা বোরকা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন।

কেহ কেহ বোরকা ভারী বলিয়া আপত্তি করেন। কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়াছে ইংরাজ মহিলাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারী নয়।

পরদা অর্থে আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি—কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালোমতো শরীর আবৃত না করাকেই 'বে-পরদা' বলি। যাঁহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা ভালোমতো পোশাক পরিয়া মাঠে-বাজারে বাহির হন তাঁহাদের পরদা বেশি রক্ষা পায়।

বর্তমান যুগে ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পরদা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে, এমনকি বসিবার ঘরেও কে বিনাঅনুমতিতে প্রবেশ করে না। এ প্রথা কি দোষণীয়? অবশ্য নহে। কিন্তু এদেশে যে ভগ্নীরা বিলাতি সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া পরদা ছাড়িয়াছেন, তাঁহাদের আছে ইউরোপীয়াদের মতো শয়নকক্ষের স্বাতন্ত্র্য (bedroom privacy), না ত আমাদের মতো বোরকা!

কেহ বলিয়াছেন যে, 'সুন্দর দেহকে বোরকা জাতীয় এক কদর্য ঘোমটা দি আপাদমস্তক ঢাকিয়া এক কিম্ভূতকিমাকার জীব সাজা যে কী হাস্যকর ব্যাপার যাঁ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন'—ইত্যাদি। তাহা ঠিক। কিন্তু আমা বিশ্বাস যে, রেলওয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঐরূপ কুৎসিত জীব সাজিয়া দর্শকের উদ্রেক করিলে কোনো ক্ষতি নাই। বরং কুলকামিনীগণ মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য দেখা সাধারণ দর্শকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করাই দোষণীয় মনে করিবেন।

ইংরাজি আদবকায়দাও (etiquette) আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় ভদ্রমহিলাগণ আড়ম্বর-রহিত (simple) পোশাক ব্যবহার করিবেন—বিশে

পদব্রজে ভ্রমণকালে চাকচিক্যময় বা জাঁকজমক-বিশিষ্ট কিছু ব্যবহার করা তাহাদের উচিত নহে!*

নিমন্ত্রণ ইত্যাদি রক্ষা করিতে যাইলে মহিলাগণ সচরাচর উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকেন। গাড়ি হইতে নামিবার সময় ঐ পরিচ্ছদ ও আভরণ কোচম্যান্ দ্বারবান প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য একটা শাদাসিধা (simple) বোরকার আবশ্যক হয়। রেলওয়ে ভ্রমণকালে সাধারণের দৃষ্টি (public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘোমটা কিম্বা বোরকার দরকার হয়।

সময় সময় ইউরোপীয়া ভগ্নীগণও বলিয়া থাকেন, 'আপনি কেন পরদা ছাড়েন না (why don't you break off purdah) ?' কী জ্বালা! মানুষে নাকি পরদা ছাড়িতে পারে? ইহাদের মতে পরদা অর্থে কেবল অন্তঃপুরে থাকা বুঝায়। নচেৎ তাঁহারা যদি বুঝিতেন যে, তাঁহারা নিজেও পরদার (অর্থাৎ privacy-র) হাত এড়াইতে পারেন না, তবে ওরূপ বলিতেন না। যদিও তাঁহাদের পোশাকেও সম্পূর্ণ পরদা রক্ষা হয় না, বিশেষত সান্ধ্য-পরিধেয় (evening dress) তা নিতান্তই আপত্তিজনক। তবু তাহা বহু কামিনীর একহারা মিহি শাড়ি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তারপর অন্তঃপুর ত্যাগের কথা—। অন্তঃপুর ছাড়িলে যে কী উন্নতি হয়, তাহা আমরা তো বুঝি না। প্রকারান্তরে উক্ত স্বাধীনা রমণীদেরও তো শয়নকক্ষরূপ অন্তঃপুর আছে।

মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোনো-না-কোনো রূপ অবরোধ-প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ-প্রথাকে যিনি 'জঘন্য' বলেন; তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।

সভ্যতা (civilization)-ই জগতে পরদা বৃদ্ধি করিতেছে। যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির উপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না ; অপেক্ষাকৃত সভ্যলোকে খাদ্যসামগ্রীর তিন-চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tray-তে) রাখিয়া উপরে একটা 'খানপোশ' বা 'সরপোশ' ঢাকা দেন : যাঁহারা আরও বেশি সভ্য তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি।

আজিকালি যে সকল ভগ্নী নগ্নপদে বেড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই আত্মীয়া সুশিক্ষিতা (Enlightened) ভগ্নীগণ আবার সভ্যতার পরিচায়ক মোজা জুতার ভিতর পদযুগল আবৃত করেন। ক্রমে হাত ঢাকিবার জন্য দস্তানার সৃষ্টি হইয়াছে। তবেই দেখা যায়—সভ্যতার (civilization-এর) সহিত অবরোধ-প্রথার বিরোধ নাই।

তবে সকল নিয়মেরই একটা সীমা আছে। এদেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশি কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পরদা করিতে বাধ্য থাকেন। কখনও কোনো প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে,

* ঐ উপদেশে আমরা কোরান শরিফের অষ্টাদশ 'পারার' 'সুরা নূরের' একটি উক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। যথা—'বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদিগকে বল, তাহারা যেন দৃষ্টি সতত নিচের দিকে রাখে (অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে ইতস্তত না-দেখে) এবং তাহারা যেন আভরণ (বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত) অন্য লোককে না-দেখায়।'

এই ভয়ে নবমবর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণে বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহের বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। দ্বিতীয়ত তাহাদের সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়, যেহেতু খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয়া আত্মীয়া ব্যতীত তাহারা অন্য কাহাকেও দেখিতে পায় না, তবে শিখিবে কাহার নিকট? নববধূদের অন্যায় পরদাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিবাহের পর প্রথম দুই-চারিমাস কেবল 'জড় পুত্তলিকা' সাজিয়া থাকিতে বাধ্য হন। ঐরূপ কৃত্রিম অন্ধ ও বোবা হইয়া থাকায় কেমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা যে সশরীরে ভোগ করে সেই জানে! কথিত আছে, কোনো সময় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নববধূর পৃষ্ঠে ঘটনাক্রমে বৃশ্চিক দংশন করে—তিনি সে যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন! তৃতীয় দিবস 'চৌথী'র স্নানের সময় অন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার পৃষ্ঠে ক্ষত দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিল! আজিকালি বৃদ্ধাগণ খুব প্রশংসার সহিত ঐ বধূটির উপমা দিয়া থাকেন! বোধহয় বৃশ্চিকটা খুব বিষাক্ত ছিল না!

যাহা হউক, ঐ সকল কৃত্রিম পরদা কম (modertate) করিতে হইবে। অনেক পরিবারে মহিলাগণ ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব ব্যতীত অপর কাহারও বাটী যাতায়াত করেন না। ইহাতে পাঁচরকমের স্ত্রীলোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা একেবারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরিকাদের পরস্পর দেখাশুনা বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুরুষেরা যেমন সকল শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, আমাদেরও তদ্রূপ করা উচিত। অবশ্য যাঁহাদিগকে আমরা ভদ্র-শিষ্ট বলিয়া জানি, কেবল তাঁহাদের সঙ্গে মিশিব, —তাঁহারা যে-কোনো ধর্মাবলম্বিনী (ইহুদি, নাসারা, বুৎপরস্ত বা যা-ই) হউন, ক্ষতি নাই। এই-যে 'গয়ের মজহব' বিশিষ্ট স্ত্রীলোকের সহিত পরদা করা হয়, ইহা ছাড়িতে হইবে। আমাদের ধর্ম তো ভঙ্গপ্রবণ নহে, তবে অন্য ধর্মাবলম্বিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা হইলে ধর্ম নষ্ট হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ কী?

আমরা অন্যায় পরদা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পরদা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন (ওরফে বোরকা) সহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য শৈলবিহারে বাহির হইলেও বোরকা সঙ্গে থাকিতে পারে। বোরকা পরিয়া চলাফেরায় কোনো অসুবিধা হয় না। তবে সেজন্য সামান্যরকমের একটু অভ্যাস (practice) চাই ; বিনা অভ্যাসে কোন্ কাজটা হয়?

সচরাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse) হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine)করিতে হইবে। জুতা কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশ উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়। যে বেচারা (বোরকা) সুদূর আরব হইতে এদেশে আসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ নির্বাসিত করিলেই কি আমরা উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠিব?

সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধ থাকার জন্য হয় নাই—শিক্ষার অভাবে হইয়াছে। সুশিক্ষার অভাবেই আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি এমন সঙ্কুচিত হইয়াছে। ললনাকুলের ভীরুতা ক্রমে বালকদের হৃদয়ে সংক্রমিত হইতেছে। পঞ্চমবর্ষীয় বালক যখন দেখে যে, তাহার মাতা পতঙ্গ দর্শনে মূর্ছিতা হন, তখন কি সে ভাবে না যে, পতঙ্গ বাস্তবিকই ভয়ানক কোনো বস্তু?

এইখানে বলিয়া রাখি যে, কীটপতঙ্গ দেখিয়া মূর্ছা যাওয়ার দোষে কেবল আমরা

দোষী নহি। সুসভ্যা ইংরাজ রমণীও এ অপবাদ হইতে মুক্তি পান না। 'গালিভারের ভ্রমণ' নামক পুস্তকে (Gulliver's Travels-এ) দেখা যায়, যখন ডাক্তার গালিভার 'ব্রবডিঙ্গন্যাগ' (Brobdingnag)-দের দেশে গিয়া শস্যক্ষেত্রে সভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন একজন ব্রবডিঙ্গন্যাগ তাঁহাকে হাতে তুলিয়া লইয়া আপন স্ত্রীকে দেখাইতে গেল! ইংরাজ-ললনা যেমন কীটপতঙ্গ বা মাকড়সা দেখিয়া ভীত হন, ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণীও তদ্রূপ ডাক্তার গালিভারকে দেখিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল! কারণ, দীর্ঘকায়া ব্রবডিঙ্গন্যাগ রমণী ডাক্তারকে একটি ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ মনে করিয়াছিল!! তাই বলি, পরদা ছাড়িলেও পতঙ্গ-ভীতি দূর হয় না।

পতঙ্গ-ভীতি দূর করিবার জন্য প্রকৃত সুশিক্ষা চাই, যাহাতে মস্তিষ্ক মন উন্নত (brain ও mind cultured) হয়। আমরা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে সমাজও উন্নত হইবে না। যতদিন আমরা আধ্যাত্মিক-জগতে পুরুষদের সমকক্ষ না হই, ততদিন পর্যন্ত উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদিগকে সকলপ্রকার জ্ঞানচর্চা করিতে হইবে।

শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্রস্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শী ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্বেও বলিয়াছি যে, 'নর ও নারী উভয়ে মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।' এখনও তাহাই বলি এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।

এখন ভ্রাতাদের সমীপে নিবেদন এই—তাহারা যে-টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া কন্যাকে জড় স্বর্ণ-মুক্তার অলঙ্কারে সজ্জিত করেন, ঐ টাকা দ্বারা তাহাদিগকে জ্ঞান-ভূষণে অলঙ্কৃতা করিতে চেষ্টা করিবেন। একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্বচনীয় সুখলাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ অমূল্য অলঙ্কার—

'চোরে নাহি নিতে পারে করিয়া হরণ,
জ্ঞাতি নাহি নিতে পারে করিয়া বণ্টন,
দান কৈলে ক্ষয় নাহি হয় কদাচন,
এ কারণে বলে লোকে বিদ্যা মহাধন।'

আমি আরো দুই চারি পঙ্‌ক্তি বাড়াইয়া বলি :

অনলে না পারে ইহা করিতে দহন,
সলিলে না পারে ইহা করিতে মগন,
অনন্ত অক্ষয় ইহা অমূল্য রতন—
এই ভূষা সঙ্গে থাকে যাবত জীবন!

তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা 'জেনানা স্কুলের' আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ-যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা হয় না। দুঃখের কথা কী বলিব—আমার ভগ্নীদিগকে বোধহয় একপ্রকার গৃহসামগ্রীর মধ্যে গণনা করা হয়! তাই টেবলটা যেমন ফুল-পাতা দিয়া সাজানো হয় ; জানালার

পরদাটা যেমন ফুলের মালা, পুঁতির মালা বা তদ্রূপ অন্যকিছু দ্বারা সাজানো সেইরূপ গৃহিণী আপন পুত্রবধূটিকেও একরাশি অলঙ্কার দ্বারা সাজানো আবশ্যক করিয়া থাকেন। সময় সময় ভ্রাতাগণ আমাদিগকে 'সোনা-রুপা রাখিবার (stand) বিশেষ' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেও ছাড়েন না। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম কাহিনী!'

যাহা হউক, পরদা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষায়িত্রীর অভাব আছে। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল-কলেজ হইলে যথাবিধি পরদা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে। প্রয়োজনীয় পরদা ত্যাগ করিয়া কোনো মুসলমানই বোধহয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন না।*

আশা করি, এখন আমাদের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা ভগ্নীগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।

গৃহ

গৃহ বলিলে একটা আরাম-বিরামের শান্তিনিকেতন বুঝায়—যেখানে দিবাশেষে গৃহী কর্মক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। গৃহ গৃহীকে রৌদ্র-বৃষ্টি-হিম হইতে রক্ষা করে। পশুপক্ষীদেরও গৃহ আছে। তাহারাও স্ব-স্ব গৃহে আপনাকে নিরাপদ মনে করে। ইংরাজ কবি মনের আবেগে গাহিয়াছেন :

Home, sweet home ;
There is no place like home.
Sweet sweet home.

পিপাসা না থাকিলে জল যেমন উপাদেয় বোধ হয় না, সম্ভবত সেইরূপ গৃহ ছাড়িয়া কতকদিন বিদেশে না থাকিলে গৃহসুখ মিষ্ট বোধ হয় না। বিরহ না হইলে মিলনে সুখ নাই। পুরুষেরা যদিও সর্বদা বিদেশে যায় না, তবু সমস্ত দিন বাহিরে সংসারক্ষেত্রে থাকিয়া অপরাহ্ণে গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য উৎসুক হয়—বাড়ি আসিলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

আবাস বিশ্লেষণ করিলে দুই অংশ দেখা যায়—এক অংশ আশ্রয়স্থান, অপরাংশ পারিবারিক জীবন (অর্থাৎ Home)। গৃহরচনা স্বাভাবিক ; বিহগ-বিহগী পরস্পরে মিলিয়া নীড় নির্মাণ করে, শৃগালেরও বাসযোগ্য গর্ত প্রস্তুত হয়! ঐ নিলয় ও গর্তকে আলয় বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত 'গৃহ' নয়। সে যাহা হউক—পশুদের

---

* এই সন্দর্ভটি লিখিত হইবার পর বর্তমান ছোটলাট Sir Andrew Fraser-এর 'The purdah of ignorance' শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষে দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিয়াছেন : Let the efforts of educationists be first directed to the instruction of our girls *within the purdah*, and let woman begin to exercise her chastening influence on society in spite of the system of seclusion, which only time can modify and violent efforts of shake which can only arouse opposition to female education, instead of doing any immediate practical good in the direction of emancipation of women' (গত ৮ই মার্চের 'Telegraph' সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত হইল।)

আমাদের মতের সহিত ছোটলাট বাহাদুরের মতের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়।

গৃহ আছে কি না, এস্থলে তাহা আলোচ্য নয়।

এখন আমাদের গৃহ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের সাধারণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখি, অধিকাংশ ভারত-নারী গৃহসুখে বঞ্চিত। তাহারা অপরের অধীনে থাকে, অভিভাবকের বাটীকে আপন ভবন মনে করিতে তাহাদের অধিকার নাই, গৃহ তাহাদের নিকট কারাগারতুল্য বোধ হয়। পারিবারিক জীবনে যে সুখী নহে, যে নিজেকে পরিবারের একজন গণ্য (member) বলিয়া মনে করিতে সাহসী নহে, তাহার নিকট গৃহ শান্তিনিকেতন বোধ হইতে পারে না। কুমারী, সধবা, বিধবা—সকল শ্রেণীর অবলার অবস্থাই শোচনীয়। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি অন্তঃপুরের একটু একটু নমুনা দিতেছি। এরূপে অন্তঃপুরের পরদা উঠাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখাইলে আমার ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত ব্যথিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু কী করি—নালিঘায় অস্ত্র-চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে রোগীর অতীব যন্ত্রণা হইলেও তাহা রোগীর সহ্য করা উচিত। উপরের চর্মাবরণ খানিকটা না কাটিলে ভেতরের ক্ষত দেখাইব কিরূপে? তাই ভ্রাতাদের নিকট অন্তঃপুরের কোনো কোনো অংশের পরদা তুলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি।

আমি ইহা বলি না যে, আমাদের সমাজের গুণ মোটেই নাই। গুণ অনেক আছে, দোষও বিস্তর আছে। মনে করুন, একজনের এক হাত ভালো আছে, অন্য হাতে নালিঘা হইয়াছে। এক হাত ভালো আছে বলিয়া কি অন্য হাতের চিকিৎসা করা উচিত নহে? চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক।

অদ্য আমরা সমাজ-অঙ্গের ক্ষতস্থলের আলোচনা করিব। সমাজের সুস্থ অংশ নিশ্চিন্ত থাকুক। আমাদের সমাজে অনেক সুখী পরিবার আছেন, তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে—তাঁহারা সুখে-শান্তিতে ঘুমাইতে থাকুন। আসুন পাঠিকা! আমরা লৌহ-প্রাচীর-বেষ্টিত অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষগুলি পরিদর্শন করি।

১. বলিয়াছি তো, কখনো বিদেশে না গেলে গৃহ-আগমন সুখ অনুভব করা যায় না। আমরা একবার (বেহারে) জামালপুরের নিকটবর্তী কোনো শহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে আমাদের জনৈক বন্ধুর বাড়ি আছে। সে বাটীর পুরুষদের সহিত আমাদের আত্মীয় পুরুষদের বন্ধুত্ব আছে বলিয়া শরাফত* উকিলের বাড়ির স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে আমাদের আগ্রহ হয়। দেখিলাম, মহিলা কয়টি অতিশয় শান্তশিষ্ট, মিষ্টভাষিণী, যদিও কূপমণ্ডুক! তাঁহারা আমাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। সেখানে শরাফতের পত্নী হাসিনা, ভগ্নী জমিলা, জমিলার কন্যা ও পুত্রবধূ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর জমিলাকে যখন আমাদের বাসায় যাইতে অনুরোধ করিলাম, তখন তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কোনোকালে বাড়ির বাহির হন না, ইহাই তাঁহাদের বংশগৌরব! কখনও ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কোনো যানবাহনে আরোহণ করেন নাই। শিবিকা-আরোহণের কথায় 'হাঁ' কি 'না' বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ঠিক মনে নাই। আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'তবে আপনারা বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ি যান কিরূপে? আপনার ভ্রাতৃবধূ আসিলেন কী করিয়া?' জমিলা উত্তর দিলেন, 'উনি আমাদের আত্মীয়-কন্যা—এ পাড়ায় কেবল আমাদেরই গোষ্ঠীর বাড়ি পাশাপাশি দেখিবে।' এই বলিয়া তিনি আমাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, 'এই

* এ প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামগুলি কল্পিত। বর্ণনার সুবিধার নিমিত্ত এরূপ নাম দেওয়া হইল।

আমার কন্যার বাড়ি ; এখন আমার বাড়ি চল'। তিনি আমাকে একটা [illegible] (ইহার একদিকে ঘরবাড়ি, অন্যদিকে উচ্চ প্রাচীর) ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া ফির[illegible] লইয়া গেলেন। তাঁহার সকল কক্ষ দেখাইলেন। কক্ষগুলি 'অসূর্যম্পশ্যা' বলিয়া [illegible] হইল। অতঃপর একটি দ্বার খুলিলে দেখিলাম, অপরদিকে হাসিনার পুত্রবধূ আছে[illegible] —জমিলা বলিলেন, 'দেখিলে, এই দ্বারের ওপার্শ্বে আমার ভাই-এর বাড়ি, এপার[illegible] আমার বাড়ি। ও-কক্ষে বৃ থাকেন বলিয়া এ দ্বারটি বন্ধ রাখি। আমাদের সওয়া[illegible] দরকার হয় না কেন, তাহা এখন বুঝিলে?' ঐরূপে সকল বাড়িই প্রদক্ষিণ করা যায়। সমস্ত মহল্লাটা পর্যটন করা আমার অভিপ্রেত না-থাকায়, আমরা গৃহতুল্য বাসরে ফিরিয়া আসিলাম। জমিলা বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই মক্কা শরিফ যাইবেন—এ পাপদেশে তাঁহার আর থাকিবার ইচ্ছা নেই! আমরা আশা করি, তিনি মক্কা শরিফ হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহ-আগমন সুখটা অনুভব করিবেন।

পাঠিকা কি মনে করেন যে, হাসিনা বা জমিলা গৃহে আছেন? অবশ্য না ; কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না। এদেশে বাসরঘরকে 'কোহবর' বলে, কিন্তু 'কবর' বলা উচিত! বাড়িখানা তো শরাফতের, সেখানে যেমন একপাল ছাগল আছে, হংস কুক্কুট আছে, সেইরূপ একদল স্ত্রীলোকও আছেন! অথবা স্ত্রীলোকদের 'বন্দিনী' বলা যাইতে পারে! যেহেতু তাঁহাদের পারিবারিক জীবন নাই। আপনার নিজের বাড়ির কথা মনে করুন! তাহা হইলে হাসিনার অবস্থা বুঝিবেন।

২. অনেক পরিবারের গৃহিণীদের সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে—'বাহার মিয়া হফত হাজারি, ঘরমে বিবি কাহাৎ কি মারী'—অর্থাৎ বাহিরে তো যথেষ্ট জাঁকজমক—যেন স্বামী সাত হাজার সেনার অধিনায়ক; আর অন্তঃপুরে গৃহিণী দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতা!! বাহিরে বৈঠকখানা আছে, আস্তাবল আছে—অনেক কিছু আছে, আর ভিতরে গৃহিণীর নামাজের উপযুক্ত স্থান নাই!

৩. এখন আমরা অন্তঃপুরের ক্ষতস্থল দেখাইব। সাধারণত পরিবারের প্রধান পুরুষটি মনে করেন, গৃহখানা কেবল 'আমার বাটী'—পরিবারস্থ অন্যান্য লোকেরা তাঁহার আশ্রিতা।* মালদহে কয়েকবার আমরা একজনের বাটীতে যাতায়াত করিয়াছি, গৃহস্বামী কলিমের স্ত্রীকে আমরা কখনও প্রফুল্লমুখী দেখি নাই। তাঁহার ম্লান মুখখানি নীরবে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি আকর্ষণ করিত। ইহার কারণ এই—কয় বৎসর অতীত হইল, কলিম স্বীয় ভায়রাভাই-এর সহিত বিবাদ করিয়াছেন ; তাহার ফলে কলিমের পত্নী স্বীয় ভগ্নীর সহিত দেখা করিতে পান না। তিনি এতটুকু ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না, 'আমার ভগ্নী আমার নিকট অবশ্য আসিবেন।' হায়! বাটী যে কলিমের! তিনি যাহাকে ইচ্ছা আসিতে দিবেন, যাহাকে আসিতে দিবেন না। আবার ওদিকে ও বাটীখানা সলিমের! সেখানে কলিমের পত্নীর প্রবেশ নিষেধ!

বলা বাহুল্য, কলিমের স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র বা অলঙ্কারের অভাব নাই। বলি, অলঙ্কার

---

* কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ কোনো ঘটনা আমাদের লক্ষ্য নহে। এদিক-ওদিককার সত্য ঘটনাসমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটা সাধারণ চিত্র অঙ্কিত হইল মাত্র। ইহাতে কোনো নদীর একধারে নবমুকুলিতে আম্রকানন, অন্য তীরে (আমেরিকার) নায়েগারা ফলস-এর তটস্থিত নীহারাবৃত পত্রহীন তরুরাজি দেখিয়া কেহ চিত্রকরকে আনাড়ি মনে করিবেন না—যেহেতু নদী, আম্রকানন, তুষারাবৃত তরু—এ সবই সত্য।

পিতৃমাতৃহীনা অবলার একমাত্র ভগ্নীর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভুলাইতে পারে? তিনিও সপত্নী-কণ্টক হইতেও বিমুক্ত নহেন! এরূপ অবস্থায় তাঁহার নিকট গৃহ কি শান্তিনিকেতন (sweet home)! বলিয়া বোধ হয়? তিনি কি নিভৃতে নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন না, 'আমার মতো হতভাগী নিরাশ্রয়া আর নাই।

৪. একস্থলে দুই ভ্রাতায় কলহ হইল—মনে করুন, বড়ভাইটির নাম 'হাম', ছোটভাইটির নাম 'সাম'। ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া হাম স্বীয় কন্যাকে বলিলেন, 'হামিদা! তুমি যতদিন আমার বাটীতে আছ, ততদিন জোবেদাকে (সামের কন্যা) পত্র লিখিতে পাইবে না।' পিতৃ-আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। কিন্তু হামিদা আশৈশব যে পিতৃব্য-তনয়াকে ভালোবাসিয়াছে, তাহাকে হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সহজ নহে। যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। —যে দুইটি বালিকার শৈশবের ধূলাখেলার স্মৃতি উভয়ের জীবনে বিজড়িত রহিয়াছে—দূরে থাকিয়াও যাহারা পত্রসূত্রে একত্র গ্রথিতা ছিল, আজ সেই একবৃন্তের কুসুম দুইটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া হাম গৃহস্বামিত্বের পরিচয় দিলেন! দুইটি অসহায়া অক্ষমা বালিকার কোমল হৃদয় দলিত ও চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া গৃহস্বামী স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন! বলা বাহুল্য, জোবেদাও হামিদাকে পত্র লিখিতে অক্ষম! যদি তাহারা কোনোপ্রকারে পরস্পরকে চিঠি পাঠায়--তবে হামিদার পত্র সাম আটক (intercept) করেন, জোবেদার পত্র হামের কবলে পড়িয়া মারা যায়! বালিকাদ্বয়ের রুদ্ধ-অশ্রু, হৃদয়বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস যবনিকার অন্তরালেই বিলীন হয়! শুনা যায়, আইন অনুসারে ১৮ (কিম্বা ২২) বর্ষীয়া কন্যার চিঠিপত্র আটক (intercept) করিতে পিতা অধিকারী নহেন। সে আইন কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পায় না! কবি বেশ বলিয়াছেন :

তোমরা বসিয়া থাকো ধরা-প্রান্তভাগে,
শুধু ভালোবাস। জানো না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার—

তাইতো আইন আছে, থাকুক, তাহাতে হামিদা বা জোবেদার লাভ কী? ঐরূপ কত পত্র দেবর-ভাশুর প্রভৃতি কর্তৃক অবরুদ্ধ (intercepted) হয়, কে তাহার সংখ্যা করে? বিধবা ভ্রাতৃবধূটি স্বীয় ভ্রাতা-ভগিনীর চিঠিপত্র লইয়া কোনোমতে কালক্ষেপ করেন—যদি আশ্রয়দাতা দেবরটি বিরক্ত হন, তবে আর তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীর পত্র পাইবার উপায় নাই। অসহায়া অন্তঃপুরিকাদিগকে ঈশ্বর ব্যতীত আর কে সাহায্য করিবে?

৫. আমরা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হইতে জানি। তিনি বিধবা ; সন্তান-সন্ততিও নাই। তাঁহার স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি আছে, দুই-চারিটি পাকা বাড়িও আছে। তাঁহার দেবর এখন সে-সকল সম্পত্তির অধীশ্বর। দেবরটি কিন্তু রমাকে একমুঠা অন্ন এবং আশ্রয়দানেও কুণ্ঠিত। আমরা বলিলাম, 'ইনি হয়তো দেবর-পত্নীর সহিত কোঁদল করেন।' এ-কথার উত্তরে একজন (যিনি রমাকে ১৪/১৫ বৎসর হইতে জানেন) বলিলেন, 'রমা সব করিতে জানে, কেবল কোঁদল জানে না। রমা বেশ জানে, কী করিয়া পরকে আপন করিতে হয় ; কেবল আপনাকে পর করিতে জানে না।'

'এতগুণ সত্ত্বেও দেবরের বাড়ি থাকিতে পান না কেন?'

'কপালের দোষ।'

হায় অসহায়া অবলা! তোমরা নিজের দোষকে 'কপালের দোষ' বল বটে, কিন্তু

ভুগিবার বেলা তোমরাই স্বকীয় কর্মফল ভুগিতে থাক! তোমাদের দোষ মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা ইত্যাদি। রমাসুন্দরী বলিলেন, 'বেঁচে থাকতে বাধ্য বলে আছি ; খেতে হয় বলে খাই—আমাদের সেই সহমরণ-প্রথাই বেশ ছিল! গবর্নমেণ্ট সহমরণ-প্রথা তুলে দিয়ে বিধবার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করেছেন!' ঈশ্বর কি রমার কথা শুনিতে পান না? তিনি কেমন দয়াময়?

৬. আমরা একটি রাজবাটী দেখিতে গিয়াছিলাম। অবশ্য রাজার অনুপস্থিতি সময় যাওয়া হইয়াছিল। তিনি উপাধিপ্রাপ্ত রাজা—রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৫,০০,০০০ টাকা।

বাড়িখানি কবি-বর্ণিত অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ঝলমল করিতেছ ; এদিকে-সেদিকে ৫/৭ খানা রজত-আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহ্বান করিতেছে! এককোণ হইতে রবির একটু ক্ষণরশ্মি একটি দর্পণে পড়িয়াছিল ; তাহার প্রতিরশ্মি চারিদিকে বেল্লুরের ঝাড়ে প্রতিভাত হইয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে! এক কক্ষে রাজার রৌপ্যনির্মিত পর্যঙ্কখানা মশারি ও শয্যায় পরিশোভিত হইয়া প্রবাসী রাজার অপেক্ষা করিতেছ। পাঠিকা হয়তো বলিবেন, 'খাটখানা রানি ব্যবহার করেন না কেন?' তাহা হইলে সমাগত লোকেরাও লক্ষ টাকার পর্যঙ্কখানা দেখিতে পাইত না যে!

বহির্বাটী পরিদর্শন করিয়া আমরা রানির মহলে গেলাম। রানির ঘর কয়খানাতেও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু তাহার উপর ধূলার স্তর পড়িয়াছে। রাজা কোনোকালে এসব কক্ষে পদার্পণ করেন বলিয়া বোধ হইল না। রানির শয্যাপার্শ্বে কয়েকখানা বাঙ্গালা পুস্তক এলোমেলোভাবে ছড়ানো রহিয়াছে।

রানিকে দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। কারণ, বৈঠকখানা দেখিয়া আমি রানির যেরূপ মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলাম, এ মূর্তি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি পরমা সুন্দরী (১৬/১৭ বৎসরের) বালিকা—পরিধানে সামান্য লালপেড়ে বিলাতি ধুতি : অলঙ্কার বলিতে হাতে তিন-তিনগাছি বেল্লুরের চুড়ি, মাথায় রুক্ষ কেশের জটা—অনুমান পনের দিন হইতে তৈলের সহিত চুলগুলির সাক্ষাৎ হয় নাই। মুখখানি এমনই করুণভাবে পূর্ণ যে, রানিকে মূর্তিমতী 'বিষাদ' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকের মতে চক্ষু মনের দর্পণস্বরূপ। রানির নয়ন দুইটিতে কী কী হৃদয়বিদারক ভাব ছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

রাজা সর্বদা বিদেশে—বেশিরভাগে কলিকাতায় থাকেন। সেখানে তাহার অপ্সরা, বিদ্যাধরীর অভাব হয় না, এখানে রানি বেচারি চিরবিরহিণী! বাড়িতে দাস-দাসী, ঠাকুর-দেবতা, পুরোহিত ইত্যাদি সবই আছে ; আনন্দ-কোলাহলও যথেষ্ট আছে, কেবল রানির হৃদয়ে আনন্দ নাই। গৃহখানা তাঁহার নিকট কারাগার স্বরূপ বোধ হইতেছে। রানি যেন একদল দাসীসহ নির্জন কারাবাসে দণ্ডভোগ করিতেছেন। আমাদের সঙ্গীয়া একটি মহিলা জনান্তিকে বলিলেন, 'এমন চমৎকার বাড়ি, আর ঘরে এমন পরী যাঁর, তিনি কী সুখে বিদেশে থাকেন!'

রানি বাঙ্গালা বেশ জানেন ; তিনি কেবল বই পড়িয়া দুর্বহ সময় কাটান। তিনি--মিতভাষিণী, বেশি কিছু বলিলেন না, কিন্তু যে দুই-একটি কথা বলিলেন, তাহা অতি চমৎকার। আমাদের একটি বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিলেন, 'তুমি রাজার রানি, তোমার এ বেশ কেন? এস আমি চুল বেঁধে দিই!' রানি উত্তর দিলেন, 'জানি না কী পাপে রানি

হইয়াছি।' ঠিক কথা! অথচ লোকে এই রানির পদ কেমন বাঞ্ছনীয় বোধ করে।

অন্তঃপুরের ঐ সকল ক্ষতকে নালিঘা না বলিয়া আর কী বলিব? এ রোগের কি ঔষধ নাই? বিধবা তো সহমরণ-আকাঙ্ক্ষা করে ; সধবা কী করিবে?

(৭) 'মহম্মদীয় আইন' অনুসারে আমরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হই—আমাদের বাড়ি'ও হয়। কিন্তু তাহা হইল কী হয়—বাড়ির প্রকৃত কর্তা স্বামী, পুত্র, জামাতা, দেবর ইত্যাদি হন। তাঁহাদের অভাবে বড় আমলা বা নায়েবটি বাড়ির মালিক! গৃহকর্ত্রীটি ঐ নায়েবের ক্রীড়াপুতুল মাত্র। নায়েব কর্ত্রীকে যাহা বুঝায়, অবোধ নিরক্ষর কর্ত্রী তাহাই বুঝেন।

গৃহকর্ত্রী মোহসেনা স্বীয় জামাতার সহিত কলহ করিয়া দুই-এক দিনের জন্য কোনো দূর-সম্পর্কীয় দেবর কাসেমের বাড়ি যান। এ বাড়িখানা মোহসেনার পৈতৃক সম্পত্তি—সুতরাং ইহা তাঁহার একান্ত 'আপন' বস্তু। কর্ত্রীর একমাত্র দুহিতাও মারা গিয়াছেন ; তবু তিনি জামাতাকে (দুই-চারিজন দৌহিত্রী ইত্যাদিসহ) বাড়িতে রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে জামাতা জামালকে শাশুড়ির আশ্রিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু তামাশা দেখুন—মোহসেনা গৃহে ফিরিয়া আসিলে, দ্বারবান তাঁহাকে জানাইল, এ বাড়িতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ! তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—'কি? আমার বাড়িতে আমারই প্রবেশ নিষেধ? পরদা কর, আমি (শিবিকা হইতে) নামিব।'

দ্বারবান : পরদা করিতে পারি না, মালিকের হুকুম নাই।

কর্ত্রী : কে তোর মালিক? একমাত্র মালিক তো আমি!

দ্বারবান : বেআদবি মাফ হউক ; হুজুর কি আমাকে তাঁহার পয়জার হইতে রক্ষা করিতে পারেন? হুজুর তো পরদায় থাকেন, আমরা জামাল মিয়াকেই জানি। আপনি মালিক, তাহা তো দুনিয়া জানে ; —কিন্তু আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি ফিরিয়া যান। আপনি এখানে নামিলে গোলামের উপর জুলুম হবে। হুজুরেরও অপমান হওয়ার সম্ভাবনা।

যাহা হউক, হুজুর ফিরিয়া গেলেন। তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন কি কোনো আইন নাই, যাহার দ্বারা আমার বাড়ি আমি দখল করিতে পারি?' কাসেম বলিলেন, 'আছে। আপনি নালিশ করুন, আমরা সাহায্য করিব।' ওদিকে জামাল এই নালিশের বিষয় জানিতে পারিয়া কাসেমের নিকট আসিলেন। সবিনয়ে মিষ্ট ভাষায় কাসেমকে বুঝাইলেন, 'আজ আপনি যদি আমার শাশুড়ির সাহায্য করেন, তবে তো অন্তঃপুরিকাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যদি কখনো আপনার এরূপ বিপদ ঘটে, তবে কেহ আপনার পরিবারের স্ত্রীলোকদের সাহায্য করিবে, আপনি কি তাহার পসন্দ করিবেন? ভাবিয়া দেখুন, এরূপ হওয়া কি ভালো? মিছা মিছা শত্রুতা পাতাইবেন কেন?'

কাসেম অন্তঃপুরে আসিয়া মোহসেনাকে বুঝাইলেন যে, মামলা-মোকদ্দমায় অনেক হেঙ্গাম ; ওসব গোলমাল না-করাই ভালো। অভাগিনী ক্রোধে, অভিমানে নীরবে দগ্ধ হইতে থাকিলেন!

ঐরূপ আরও কত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। খাদিজা প্রভৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তাঁহার স্বামী হাশেম দরিদ্র কিন্তু কুলীন বিদ্বান। হাশেম ছলে-কৌশলে সমস্ত জমিজমা আত্মসাৎ করিয়া লইলেন; খদিজার হাতে এক পয়সা নাই। খাদিজার পৈতৃক বাড়িতে বসিয়াই হাশেম আর দুই-তিনটা বিবাহ (?) করিয়া

তাঁহাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এরূপ না করিলে আর পুরুষের বাহাদুরি কী? ইহাতে যদি খদিজা সামান্য বিরক্ত প্রকাশ করেন, মহিলাগণ তাঁহার হৃদয়ে স্বামীভক্তির অভাব দেখিয়া নিন্দা করেন, কেহ জীর্ণ পুঁথি (মসলামসায়েলের বঙ্গানুবাদ) দেখাইয়া বলেন, 'স্বামী মাথা কাটিতে বলিতে নাই!' কেহ সুরযোগে আবৃত্তি করিলেন—

'নারীর মোর্শেদ[১] স্বামী সের্তাজ[২] জানিবে,
মোর্শেদের সম নারী পতিকে ভজিবে!'

যাহা হউক, খদিজার দুঃখে সহানুভূতি করিবে, এমন লোকটি পর্যন্ত নাই! ইহা নরক-যন্ত্রণা ভিন্ন আর কী বলিব? কোনো মৌলভী বক্তৃতা (ওয়াজ) করিতে বলিয়াছেন, 'স্ত্রীলোকে বেশি গুণা (দোষ) করে ; হজরত মেরাজে গিয়া দেখিয়া নরকে বেশিরভাগে স্ত্রীলোক শাস্তি পাইতেছে।' আমরা কিন্তু এই পৃথিবীতে দেখিতেছি—কুলকামিনীরা অসহ্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন।

৮. পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত কী কী উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? কোনো ভ্রাতা তাহা মুখ ফুটে বলেন না—বলিলে অবলাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে যে![৩] সুতরাং সে শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইতেছে ; কোনো স্থলে আফিংখোর, গাঁজাখোর, নিষ্কর্মা চিররোগী বৃদ্ধ—যে মোকদ্দমা করিয়া জমিদারির অংশ বাহির করিতে অক্ষম এই লোককে কন্যাদান করা হয়। অথবা ভগ্নীর দ্বারা বিবাহের পূর্বেই লা-দাবি লিখিয়া লওয়া হয় কিম্বা ভগ্নীদিগকে চিরকুমারী রাখা হয় ; এবং ভ্রাতৃবধূ ননদদিগকে দস্যু মতো ভাবেন! আর যদি কোনো পরিবারে পুত্র মোটেই না থাকে, কেবল এক অর্ধডজন কন্যাই থাকে, —তবে জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ভাগ্যবান স্বামীটি অবশিষ্ট শালিকা কয়টিকে চিরকুমারী রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহাই সমাজের নালিঘা! হায় মি. মোহাম্মদ (দ.)! তুমি আমাদের উপকারের নিমিত্ত পিতৃসম্পত্তিতে অধিকার করিয়াছ, কিন্তু তোমার সুচতুর শিষ্যগণ নানা উপায়ে কুলবালাদের সর্বনাশ করিতেছে! আহা! 'মহম্মদীয় আইন' পুস্তকের মসি-রেখারূপে পুস্তকেই আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই। আইন আমাদের ন্যায় নিরক্ষর অবলার নহে।

৯. নববিধবা সৌদামিনী দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ ভ্রাতার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছে। ৯/১০ মাস পরে তাঁহার (১৫ ও ১২ বৎসর) পুত্র দুইটি দশদিনের ভিতর মারা যায়। সৌদামিনীর ১০,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল।

যে সময় বিধবা সৌদামিনী পুত্রশোকে পাগলপ্রায় ছিলেন, সেই সুযোগে (অর্থাৎ বালকদ্বয়ের মৃত্যুর একমাস পরেই) ভ্রাতা নগেন্দ্র ঐ টাকাগুলি তাঁহারই নামে গচ্ছিত রাখিতে ভগ্নীকে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, 'স্ত্রীলোকের নামে টাকা জমা থাকা

---

১. মোর্শেদ : গুরু।

২. সের্তাজ : (সের—মাথা) মাথায় মুকুট,অর্থাৎ মুকুটতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ।

৩. স্ত্রীলোকদের দুঃখ-কাহিনীপূর্ণ একটি প্রবন্ধ কোনো উর্দু সংবাদপত্রে প্রকাশের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছিল। সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই—লিখিলেন যে, এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে সাধারণ পুরুষসমাজ চটিবেন। সুখের বিষয়, বাঙ্গালা কাগজগুলির অনেক সৎসাহস আছে, তাই বরং আমাদের দুঃখের কান্না কাঁদিবার উপায়ও থাকিত না।

গোলমাল হতে পারে। আমি তো আর তোমার পর নই।' ভগ্নীর মাথা ঠিক ছিল না, নগেন্দ্র যাহা লিখাইলেন তিনি তাহাই লিখিলেন। ভাবিলেন, 'অমন চাঁদ যদি গিয়াছে, তবে আর পোড়ার টাকা থেকে কী হবে? প্রতিভার বিয়ে তো নগেন্দ্র দিবেই। আমি এখন মলে বাঁচি।' নগেন্দ্র ক্রমে দুই-তিনটা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু প্রতিভার বিবাহের জন্য মোটেই ভাবেন না। তাহার বয়স ১২ বৎসর হইলে সৌদামিনী তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি যত তাড়া করেন, নগেন্দ্র ততই বলেন, 'বর পাওয়া যায় না!'

প্রতিভা ১৫ বৎসরের হইল—বিবাহ হইল না। ১০,০০০ টাকা দিয়া বর পাওয়া যায় না, এ-কথা কি পাঠিকা বিশ্বাস করেন? প্রতিবেশিনীরা নিন্দা করে, অভিশাপ দেয়, 'ছি ছি, কেমন মামা।' বলে, তাহাতে নগেন্দ্রের কি ক্ষতি হয়? পল্লিগ্রামে নিন্দা-অপবাদ চতুষ্পার্শ্বস্থিত শস্যক্ষেত্রেই বিলীন হয়। প্রকাণ্ড পাটক্ষেতে বড় বড় শূকর লুক্কায়িত থাকিতে পারে আর ঐ নিন্দাটুকু লুকাইতে পারিবে না?

এখন সৌদামিনী দেখিলেন তাঁহার স্বামীর কষ্টে উপার্জিত টাকা দ্বারা নগেন্দ্রের অবস্থা ভালো হইল, কন্যাদের বিবাহ হইল—কেবল তাহারই একমাত্র প্রতিভা কুমারী রহিল!!

ভগ্নী মানকুমারী বলিয়াছেন—

'কাঁদ তোরা অভাগিনী, আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি, ক' ফোঁটা নয়ন-বারি
ভগিনী! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব।
যখন দেখিব চেয়ে' অনূঢ়া, 'প্রাচীনা মেয়ে'
কপালে জোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব।
যখন দেখিব বালা সহিছে সতিনী-জ্বালা,
তখনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইব
সধবা বিধবা-প্রায় পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব,
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে, বোন! কিন্তু কী করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।'

আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কেবল 'কাঁদিয়া মরিতে' ব্যয় করিলেন! ব্যস! এরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়া ঢালিয়াই তো আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।

আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীগণ হয়তো মনে করিবেন যে, আমি কেবল ভ্রাতৃবৃন্দকে নরাকারে পিশাচরূপে অঙ্কিত করিবার জন্যই কলম ধরিয়াছি। তাহা নয়। আমি কোথাও ভ্রাতাদের প্রতি কটু শব্দ ব্যবহার করি নাই—কাহাকেও পাপিষ্ঠ, পিশাচ, নিষ্ঠুর বলিয়াছি কি? কেবল রমণীহৃদয়ের ক্ষত দেখাইয়াছি। ঐ যে কথায় বলে, 'বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়', এক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে—ভগ্নীর দুঃখ বর্ণনা করিতে ভ্রাতৃনিন্দা হইয়া পড়িয়াছে।

সুখের বিষয় আমাদের অনেক ভ্রাতা এরূপ আছেন, যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট শান্তিতে গৃহসুখে রাখেন। কিন্তু দুঃখের সহিত আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, অনেক

ভ্রাতা আপন বাটীতে অন্যায় স্বামিত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন।

এখন বোধহয় সুযোগ্য বুঝিবেন যে, 'এতবড় সংসারে আমরা নিরাশ্রয়' আমি ভুল করি নাই—ঐ কথার প্রতিবর্ণ সত্য। আমরা যে-কোনো অবস্থায় কেন, অভিভাবকের বাটীতে থাকি। প্রভুদের বাটী যে আমাদিকে সর্বদাই রৌদ্র হিম হইতে রক্ষা করে, তাহা নহে। তবু—

যখন আমাদের চালের উপর খড় থাকে না, দরিদ্রের জীর্ণতম কুটীরের চালখানা ঝঞ্ঝানীলে উড়িয়া যায়—টুপটাপ বৃষ্টিধারায় আমরা সমস্ত রাত্রি ভিজি থাকি—চপলা-চমকে নয়নে ধাঁধা লাগে—বজ্রনাদে মেদিনী কাঁপে, এবং আমাদের কাঁপে—প্রতি মুহূর্তে ভাবি, বুঝি বজ্রপাতে মারা যাই—তখনও আমরা অভিভাবকের বাটীতেই থাকি!

যখন আমরা রাজকন্যা, রাজবধূরূপে প্রাসাদে থাকি, তখনও প্রভুগৃহে থাকি আবার যখন ঐ প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা ভূমিকম্পে চূর্ণ হয়—সোপান অতিক্রম করিয়া অবতরণকালে আমাদের মাথা ভাঙে, হাতপা ভাঙে—রক্তাক্ত কলেবর হতজ্ঞান-প্রায় অবস্থায় গোশালায় গিয়া আশ্রয় লই—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!!

অথবা গৃহস্থের বৌ-ঝিরূপে প্রকাণ্ড আটচালায় বাস করিলেও প্রভুর আলয়ে থাকি আর যখন চৈত্র মাসে ঘোর অমানিশীথে প্রভুর বাটীতে দুষ্টলোক কর্তৃক লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হয়—সব জিনিসপত্রসহ ঘরগুলো দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে—আমরা এক বসনে প্রাণটি হাতে করিয়া কোনোমতে দৌড়াইয়া গিয়া দূরস্থিত একটা কুলগাছতলে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে থাকি—তখনও অভিভাবকের বাটীতে থাকি!!! (জ্বলন্ত না কবরের ভিতরও অভিভাবকের বাটীতে থাকা হয় কি না!!)

ইংরাজিতে Home বলিলে যাহা বুঝায়, 'গৃহ' শব্দ দ্বারা আমি তাহাই বুঝাইতে চাই। উপরে যে রানি, রমা, হামিদা, জোবেদা প্রভৃতির অবস্থা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি গৃহসুখ ভোগ করিতেছেন? শারীরিক আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন যাহা তাহাই গৃহ। বিধবা হইলে স্বামীগৃহ একরূপ বাসের অযোগ্য হয়; হতভাগিনী তখন পিতা, ভ্রাতার শরণাপন্ন হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার যে-দশা হয়, সৌদামিনী-চিত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। একটা হিন্দি প্রবাদ আছে—

'ঘর কি জ্বলি বন মেঁ গেয়ী—বন মেঁ লাগি আগ
বন বেচারা কেয়া করে—করম মেঁ লাগি আগ!'

অর্থাৎ 'গৃহে দগ্ধ হইয়া বনে গেলাম, বনে লাগিল আগুন; বন বেচারা কী করিবে (আমার) কপালেই লাগিয়াছে আগুন!'

তাই বলি, গৃহ বলিতে আমাদের একটিও পর্ণকুটির নাই। প্রাণিজগতের কোন্ জন্তুই আমাদের মতো নিরাশ্রয়া নহে। সকলেরই গৃহ আছে—নাই কেবল আমাদের

* আমাদের যে-সকল ভগ্নী গৃহসুখ ভোগ করেন, এ সন্দর্ভটি তাঁহাদের জন্য লিখা হয় নাই—গৃহহীনাদের জন্য।

মতিচূর

[দ্বিতীয় খণ্ড]

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

উৎসর্গ-পত্র

আপাজান!

আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে-বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবত এই উর্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি ; এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দু-ভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে-বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই,তাহা বোধহয় তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে। স্নেহ-ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব। এ পুস্তকে তোমার বড় সাধের 'ডেলিশিয়া হত্যা'ও দেওয়া হইয়াছে।

নিবেদন

মতিচূরের প্রথম খণ্ড পাঠক ও পাঠিকা সমাজে অতিশয় আদৃত হওয়ায় এবং পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা গেল। প্রথম খণ্ডে যে-সকল দোষ ছিল, তাহা যথাসাধ্য সংশোধন করা গিয়াছে। আর যে-সকল ত্রুটি আছে, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য এবং বহুদর্শিতার অভাব। গুণগ্রাহী পাঠক-পাঠিকাগণ এবারও তাহা মার্জনা করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

নূর-ইসলাম

মিসেস এ্যানি বেশান্তের 'ইসলাম' শীর্ষক বক্তৃতা পাঠ করিলে বাস্তবিক মোহিত হইতে হয়। 'ইসলাম' শব্দের সমভিব্যাহারে মিসেস বেশান্তের নাম শুনিয়া আপনারা কেহ ভীত হইবেন না। প্রথমে আমারও আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তিনি হয়তো তাঁহার 'থিয়োসফি' ধর্মের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া আমাদের একমাত্র সম্বল ইসলামের উপর খানিকটা হাত সাফ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমার সে-ভ্রান্তি দূর হইল। হাত সাফ করা তো অতি দূরে—ইহার প্রতি পত্র-প্রতি ছত্র সুপক্ব আঙুরের ন্যায় অতি মিষ্ট ভক্তিরসে পরিপূর্ণ! তিনি নূর-ইসলাম (বা ইসলাম-জ্যোতির) এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার তুলনা হয় না। —এমনকি, প্রিয় বঙ্গভাষায় ইহার মর্মোদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করিতে পরিতেছি না।

তবে কথা এই যে, অনুবাদ করিবার মতো ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধি সকলের থাকে না—বিশেষত আমার ন্যায় লোকের তাদৃশ চেষ্টা! তাহাতে আবার আমি বহু চেষ্টা করিয়া মিসেস এ্যানি বেশান্তের মূল ইংরেজি বক্তৃতা-পুস্তিকাখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমাকে উহার উর্দু অনুবাদের উপরেই নির্ভর করিতে হইতেছে। অনুবাদক মহোদয় অতি উচ্চ (সুফি ধর্মভাবাপন্ন) ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন! সুতরাং আমি যদি ঐ অনুবাদের অনুবাদ করিতে গিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের ভাব ব্যক্ত এবং বিকৃত ভাষা ব্যবহার করিয়া ফেলি, সে ত্রুটি মার্জনীয় বলিয়া ভরসা করি।

আর একটি কথা—মিসেস এ্যানি বেশান্ত যেমন হজরতের নাম উল্লেখ করিতে অত্যধিক সম্মানের ভাষা ব্যবহার না করিয়া, ভক্তের সরল ভাবপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অনুবাদক মৌ. হাসেনউদ্দীন সাহেবও তদ্রূপ করিয়াছেন ; যথা 'আব ওহ মহম্মদ সিরফ মহম্মদ হি না রহা বালকে ওহ পয়গম্বর আরব হুয়া' ইত্যাদি। ভাব ও ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমিও অনুবাদক মহাশয়ের প্রথা অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আর দিবাকরের সমুজ্জ্বল কান্তি দেখাইবার জন্য, অন্য আলোকের প্রয়োজন হয় না ; পুষ্পের সৌন্দর্য বর্ধনের নিমিত্ত অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক, আশা করি আড়ম্বরপূর্ণ সম্মানসূচক শব্দের বহুল প্রয়োগ বর্জন করায় দোষী হই নাই। এখন আপনারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন, মিসেস বেশান্ত কী বলিতেছেন :

ভ্রাতৃমহোদয়গণ !

প্রত্যেক দেশের জাতীয় উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতির যাবতীয় কারণসমূহের মধ্যে প্রধান কারণ হইতেছে—ধর্ম। ধর্ম ব্যতিরেকে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি কিম্বা সভ্যতা লাভ করিতে পারে না। যে দেশের সমুদয় অধিবাসী একই ধর্মাবলম্বী, যে দেশে সকলে একইভাবে একই ঈশ্বরের পূজা করে—তাঁহাকে সকলে একই নামে ডাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মনোভাব একই সূত্রে গথিত থাকে; সে দেশ অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার মতে যে দেশে এক ঈশ্বরকে লোকে বিভিন্ন নামে ডাকে ; একই ঈশ্বরের উপাসনা বিবিধ প্রণালীতে হয় ; একই

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট লোকে বিভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা করে, তথাপি সকলে এই মনে করে যে, আমরা সকলে একই গন্তব্যস্থানে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়াছি, এবং এতদ্রূপ পার্থক্যের মধ্যে একতা থাকে ; যদি কোনো দেশের ঐ অবস্থা হইত, (কিন্তু অদ্যাবধি এমন কোনো ভাগ্যবতী দেশের বিষয় জানা যায় নাই।) —আমার মতে সে দেশ নিশ্চয়ই ধর্মে প্রধান হইত।

অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী লোক আছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এই আদর্শের অদ্বিতীয় দেশ—ইহার তুলনা এ ভারত নিজেই। এদেশে এই সকল স্বতন্ত্র ধর্ম এবং এত পৃথক বিশ্বাসের লোক বাস করে যে, মনে হয় যেন ভারতবর্ষে পৃথিবীর ধর্মমতসমূহের প্রদর্শনী-ক্ষেত্র। এবং এই দেশই সেইস্থান, যেখানে পরস্পরের একতা, মিত্রতা এবং সহানুভূতির মধ্যে ধর্মের সেই আদর্শ—যাহাকে আমি ইতঃপূর্বে বাঞ্ছনীয় বলিয়াছি —পাওয়া যাইতে পারে।

আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, তিন-চারি বৎসর পূর্বে আমি আপনাদিগকে চারিটি প্রধান ধর্মের— অর্থাৎ বৌদ্ধ, খ্রিস্টীয়, হিন্দু এবং অনল-পূজার বিষয় বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনটি শ্রেষ্ঠধর্মের—অর্থাৎ ইসলাম, জৈনমত এবং শিখধর্মের আলোচনা রহিয়া গিয়াছিল। এই তিন ধর্ম—যাহা ভারতবর্ষের প্রধান সাতটি ধর্মের অন্তর্গত—ইহাদের পরস্পরের এত অনৈক্য দেখা যায় যে, ইহারা একে অপরের রক্তপিপাসু হইয়া উঠে এবং দুইজনের মনের মিলনের পক্ষে এই ধর্ম-পার্থক্য এক বিষয় অন্তরায় হইয়া আছে।

আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, ভারতবর্ষ হেন দেশে যদি সকলে চক্ষু হইতে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবরণ উন্মোচন করিয়া ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করত চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, 'আমরা প্রকৃতপক্ষে একই প্রভুর উপাসনা বিভিন্ন প্রণালীতে করিতেছি—একই প্রভুকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকিতেছি!'

পুরাও পুরাও মনস্কাম—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা?

ড. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সকলে তাঁরেই ডাকে, আমি যাঁরে ডাকি.
রাঙ্গা রবি নিয়া বুকে উষা ডাকে সোনামুখে
গোধূলি বালিকা ডাকে শ্যাম ছটা মাখি।

মানকুমারী বসু।

আর, একই স্থান হইতে আমরা আসিয়াছি এবং সেইখানে পুনরায় যাইতেছি। ইহার ফল এই হইবে যে, একে অপরের সহিত নিতান্ত আন্তরিক ও প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে মিশিতে পারিবে। একের দুঃখে অপরে দুঃখিত হইবে—সমুদয় ভারতবাসী একই জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকারপ্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু জগতের বড় বড় শক্তিপুঞ্জ ভারতসন্তানকে একজাতি বলিয়া স্বীকার করিবে। যখন হিন্দু-মুসলমান, পারসি-খ্রিস্টানে জৈন-ইহুদিতে এবং বৌদ্ধ-শিখে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আলিঙ্গন হইবে, তখন আমি মনে করিব যে, ধর্মের জয় এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পবিত্র নাম শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

অদ্য আমি ইসলাম সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিব এবং আগামীকল্য ও পরশ্ব অধিবেশনে দুই ধর্ম সম্বন্ধে, এবং অনন্তর সমুদয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম-সারতত্ত্ব অর্থাৎ সেই বিশ্বোত্তীর্ণ (বিশ্বজ্ঞান বা 'এলমে-এলাহি') সম্বন্ধে আলোচনা করিব, যাহাতে প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের সারভাগ আছে এবং যাহা সকলের উপর একই প্রকার অধিকার রাখে— যাহাকে কোনো বিশেষ ব্যক্তি তাহার নিজস্ব বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বলিতে পারে না; বরং তদ্বিপরীত যে-কোনো ধর্মবিশ্বাসের অধিকারী বলিতে পারে যে, ইহাই আমারও ধর্ম। অদ্য সমিতির সম্বাৎসরিক অধিবেশন দিনে আমার এই প্রার্থনা যে, বিশ্ব-সংসারে সমুদয় ধর্মগুরুদের পবিত্র-আত্মা আমাদের ও আমাদের কার্যকলাপের প্রতি তাঁহাদের আশীর্বাদপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন—যেন তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী একজন অপরকে ভালোবাসিতে পারেন। আমিন!

ইসলাম

কোনো ধর্ম পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে চারটি বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। সর্বপ্রথম সেই ধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস, যাহার প্রভাব তাহাতে (সেই ধর্মে) লুক্কায়িত থাকে। দ্বিতীয়, তাহার প্রকাশ্য বা বাহ্যিক মত অথবা শাখাপল্লব, যাহার সহিত সাধারণে সম্পর্ক রাখে। তৃতীয়, ধর্মের দর্শন, যাহা বিদ্বান এবং সুশিক্ষিত লোকদের জন্য। চতুর্থ, ধর্মের গূঢ় রহস্য, যাহাতে সাধারণত মানবের আপন অহং বা অস্তিত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারের সহিত মিশিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমি এই কষ্টিপাথরে ইসলামকে পরীক্ষা করিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে চাই যে, সর্বপ্রথমে আরব ও শামদেশের অবস্থার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দেখুন, সে দেশের কী দশা ছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন আরব, শাম ও আজমদেশে অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে কুসংস্কারের প্রবল ঝঞ্ঝানিল বহিতেছিল ; যুদ্ধ-কলহ ও পরস্পরের রক্তারক্তি এক দলকে অন্য দল হইতে পৃথক করিতেছিল; হিংসা-দ্বেষ এমন প্রবল ছিল যে, একই বিষয়ের ঝগড়া কয় পুরুষ পর্যন্ত চলিত*; যথা এক ব্যক্তি কোনো বিষয় লইয়া অন্য একজনের সহিত বিবাদ করিল, অনন্তর শত বৎসর পরে একের পৌত্র অপরের পৌত্রকে শুধু এই অজুহাতে হত্যা করিত যে, "ইহার পিতামহ আমার পিতামহের শত্রু ছিল!' ইহা সেই আরব দেশ—যেখানে কেবল এই কথায় যুদ্ধ আরম্ভ হইত যে, 'তোমার উষ্ট্র আমার উষ্ট্রকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল কেন?" ব্যস, এই সামান্য কারণে রক্তনদী প্রবাহিত হইত—শববরাশি স্তূপীকৃত হইত! এ সেই আরব দেশ—যেখানে নিষ্ঠুর পিতামাতার ক্রোড় হইতে শিশুকন্যাকে কাড়িয়া লইয়া গর্ত খনন করিয়া তাহাতে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া আসিত। আর হতভাগিনী নিরুপায় মাতা আপন স্বাভাবিক মাতৃস্নেহপূর্ণ হৃদয়ের অসহ্য বেদনা লইয়া মরমে মরিয়া থাকিত। স্ত্রীলোক হওয়ার দরুন পাষণ্ড স্বামীর ঐ নির্মম অত্যাচারে আপত্তি করিতে পারে, এতটুকু ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কাহাকেও জামাতা বলিতে না

* আশ্চর্যের বিষয়, এই সভ্যযুগেও বঙ্গীয় মুসলমানদের ঘরে ঐরূপ বংশানুক্রমে চিরস্থায়ী বিবাদ দেখা যায়। এইজন্য আমরা কলিকাতা হাইকোর্টে 'Hereditary enemy' শব্দ শুনিতে পাই। আহা! কবে আমাদের প্রতি খোদাতালার রহমত হইবে।

হয়, এইজন্য কন্যাহত্যা করা হইত। ইহা সেই দেশ, যেখানে ঘৃণিত পৌত্তলিকতা বিরাজমান ছিল- ঘরে ঘরে নূতন দেবতা ; এক ঠাকুর আবার অন্য ঠাকুরের প্রাণের প্রতিমার সম্মুখে নরবলিদান তো নিত্যক্রীড়া ছিল; যেখানে মানবজাতির প্রতি মমতার পরিবর্তে বিলাসিতা ও আত্মপরায়ণতা পূর্ণমাত্রায় রাজত্ব করিত। যে কোন প্রবল ব্যক্তি আপন দুর্বল প্রতিবেশীকে বিনা কারণে কিম্বা অতি সামান্য কারণে হত্যা করিয়া ফেলিত ; তাহার ঐ দুষ্ক্রিয়ায় বাধা দিবার লোক তো দূরে থাকুক, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবারও কেহ ছিল না।

তদানীন্তন আরবে বিলাসিতার ও অন্যান্য 'মকারাদি' কুক্রিয়ার অন্ত ছিল না ; এক স্বামী ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি পশুর ন্যায় অসংখ্য ভার্যা গ্রহণ করিত ; আর এই বিষয়ে গৌরব করা হইত যে, অমুক ধনী ব্যক্তি এত অসংখ্য স্ত্রীর স্বামী। ঈশ্বরের সৃষ্টি- স্ত্রীজাতি এমন জঘন্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা ছিল যে, তাহারা নিতান্ত অসহায় গৃহপালিত পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিত। মোটের উপর এমন কোনো নিকৃষ্ট পাপ ও জঘন্য দোষ নাই, যাহা তৎকালীন আরবে না ছিল।

সেই স্বার্থ, অত্যাচার ও আত্মপরতার পুঁতিগন্ধময় জলবায়ু পরিবেষ্টিত এক কোরেশ-গৃহে একটি শিশু (সে পবিত্র শিশুরত্নের উদ্দেশে সহস্র দরুদ) জন্মগ্রহণ করিলেন, যাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর তিনিও সেইরূপ পিতা ছিলেন, যিনি তদীয় পিতৃ কর্তৃক কোনো প্রতিমার সম্মুখে নরবলিরূপে আনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত দেবালয়ের সেবিকার কৃপায়—সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।** এই শিশু এমন একটি হতভাগিনী দুঃখিনী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ইনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই বিধবা হইয়াছিলেন,—আর দারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কয়েক মাস পরেই এ অবোধ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্বামীর অনুগমন করেন। ইহার ফলে এই পিতৃমাতৃহীন শিশু কিছুদিন স্বীয় পিতামহ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পিতামহও কয়েক বৎসর পরে দেহত্যাগ করিলেন। তখন সেই অসহায় বালক বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, স্বীয় পিতৃব্য আবু তালেবের আশ্রয়ে রহিলেন। ইহা তো অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইরূপ বিপদগ্রস্ত পিতৃমাতৃহীন সহায়-সম্পদশূন্য একটি অজ্ঞান বালক যে শিক্ষাদীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। বাস্তবিক কার্যতও তাহাই হইয়াছিল। শিক্ষা বা অধ্যয়ন বলিতে একটি অক্ষরের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হয় নাই, নীতি বা আচার-নিয়মের অনুশাসনের বাতাস পর্যন্ত তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তথাপি তাঁহার শৈশবকাল অতি পবিত্র জীবনের উচ্চ আদর্শ ছিল। তাঁহার নির্মল জীবনে মানবের বাঞ্ছনীয় যাবতীয় সদগুণরাজি—যথা দয়া, সৌজন্য, প্রেম, ধৈর্য, নম্রতা, বিনয়, শান্তিপ্রিয়তা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি স্বভাবত বিরাজমান ছিল। তিনি নানা গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া তিনি কৈশোরে উপনীত হইলেন। এখন জীবিকা-

---

** হজরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব যে স্বীয় পুত্র হজরত আবদুল্লাকে প্রস্তরমূর্তির নিকট বলিদান করিতে গিয়াছিলেন, এ-কথার সত্যতায় আমার একটু দ্বিধাবোধ হয়। আলেম ফাজেলগণ দয়া করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঙালা 'আমির হামজা' পুঁথিতে দেখিয়াছি—(হজরত আবদুল মুত্তালিবের অন্য পুত্র হজরত আমির হামজা পিতাকে বলিলেন)-

'কাফেরে খাজনা দিবে মোসলমান হৈয়া।
আমি এয়ছা বেটা তবে কিসের লাগিয়া ॥'

অজানার নিমিত্ত তিনি আপন কোনো বিধবা আত্মীয়ার গৃহে কর্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। উক্ত বিধবা খদিজা বিবি তাঁহাকে পণ্যদ্রব্যসহ বাণিজ্য উপলক্ষে শামদেশে প্রেরণ করিতেন। এই বিষয়কর্মে খদিজা বিবি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার এই নূতন কর্মচারী অতিশয় ধর্মভীরু, ন্যায়পরায়ণ, মিতব্যয়ী এবং অতি বিশ্বাসী। অতঃপর তিনি ইহার সহিত পরিণীতা হন।

ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই নবীন যুবক যাঁহার নাম মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) ছিল, সে সময়ে পয়গম্বর হন নাই। আর তাঁহার পত্নী হজরত খদিজাও তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের অনুবর্তিনী ছিলেন না ; তিনি স্বয়ং অল্পবয়স্ক তরুণ এবং তাঁহার জায়া তদপেক্ষা দ্বিগুণ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর তাঁহারা এমন সুখের দাম্পত্য-জীবন ভোগ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীতে তেমন মধুর দাম্পত্য-জীবনের উচ্চ আদর্শ আর কেহ দেখাইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ—আর তেমনই ভাবে তাঁহাদের জীবনের পূর্ণ ২৬ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার পর হজরত খদিজার মৃত্যু হইল। অতঃপর পয়গম্বর সাহেবের স্বভাব-চরিত্র ও কার্যকলাপ সর্বদাই অতি প্রশংসনীয় ছিল। যখন তিনি মক্কার সংকীর্ণ গলিকুচাতে যাতায়াত করিতেন, সে সময় তত্রত্য ক্রীড়ারত অবোধ শিশুগুণ তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিত, আর তিনি সততই তাহাদের সহিত স্নেহসিক্ত মিষ্টভাষায় কথা বলিতেন, তাহাদের মস্তকে হস্তামর্শন করিতেন। কেহ কখনও শুনে নাই যে, তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা বিপদগ্রস্তের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন ; বিধবা ও পিতৃহীন শিশুদের সান্ত্বনা ও প্রবোধদান তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। প্রতিবেশীবর্গ তাঁহাকে 'আমিন' (বিশ্বস্ত) বলিয়া ডাকিত। 'আমিন' শব্দের অর্থ বিশ্বাসভাজন—এমন উচ্চ ভাবপূর্ণ উপাধি কেবল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা বিশ্বজগতের নিকট প্রাপ্ত হইতে পারেন। এখন আপনারা একটু চিন্তা করিয়া দেখুন তো ; যে ব্যক্তির বাহ্যিক জীবন জগতের পক্ষে এমন উপকারী এবং সুখ-শান্তিপ্রদ ছিল, তাঁহার অভ্যন্তরীণ জীবন কেমন হইতে পারে। অহো! (সত্য তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত) তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার বন্যাস্রোতের তাড়না তাঁহাকে বনে ও জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি কতবার দিবানিশি অনশনে অনিদ্রায় বিপৎসঙ্কুল পর্বতকন্দরে বাস করিতেন। তিনি যেভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ঈশ্বর-অনুসন্ধান করিতেন, তাহা বর্ণনা করিবার উপযুক্ত ভাষা দুর্লভ ; অথবা ইহার মর্ম কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন, যাঁহারা একাগ্রচিত্তে খোদার পথে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ক্রমে হজরত মোহাম্মদের (দ.) এইপ্রকার ধ্যান-আরাধনা এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক দূরে—অতি দূরে—ঘোর অরণ্যে চলিয়া যাইতেন ; দুর্গম ও ভয়ঙ্কর গিরিগুহায় মাসাধিককাল পর্যন্ত বাস করিতেন—সেখানে শুধু সিজদায় (নতশিরে) পড়িয়া রোদন ও বিলাপ ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনো কাজ ছিল না। এমনকি, তিনি অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষ এইভাবে যাপন করিলেন—অবশেষে সেই শুভ মুহূর্ত আসিল, যখন দৈববাণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'উঠ! খোদায় পাকের (পবিত্র ঈশ্বরের) নাম উচ্চারণ কর!' কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না, সে শব্দ কাহার অথবা ঐ আকাশবাণী বাস্তবিকই বিশ্বাসযোগ্য দৈববাণী কি না? কারণ, তিনি বেশ জানিতেন যে, তিনি নিরক্ষর লোক ছিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইত যে, ইহা হয়তো তাঁহার ভ্রম বা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র—কিম্বা তাঁহার অহংজ্ঞান তাঁহাকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত ঐরূপ

শব্দ করিতেছে ; এবং সম্ভবত ইহা সেই দৈববাণী নহে, যাহা স্বয়ং খোদাতালার নিকট হইতে পয়গম্বরগণ শুনিতে পাইতেন, যাহাকে 'এলহাম' কিম্বা 'অহি' বলে।

অবেশেষে আর একবার যখন তিনি ঈশ্বরচিন্তায় অত্যন্ত আকুল ছিলেন, সহসা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব এক অলৌকিক স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, আর সেই আলোকরাশির মধ্যে একটি জ্যোতিষ্মান মূর্তি দেখা দিয়া বলিলেন, 'যাও, সত্য নাম উচ্চারণ কর!' এবার তিনি সাহসে ভর করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কাহাকে ডাকিব?' ইহার উত্তরে স্বর্গদূত ঈশ্বরের একত্ব, ফেরেশতাদের রহস্য, পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানবজাতির অস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করিলেন এবং তাঁহাকে সেই দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কর্মভারের (পয়গম্বরির) কথাও বলিলেন, যেজন্য তাঁহার জন্ম হইয়াছে। অর্থাৎ দেবদূত বলিয়া দিলেন যে, তাঁহাকে বিশ্বজগতের ধর্মপথ প্রদর্শক এবং উপদেষ্টার কার্যভার সমর্পণ করা হইয়াছে।

এদিকে দেবদূত অদৃশ্য হইলেন, ওদিকে হজরত মোহাম্মদ (দ.) যিনি এখন হইতে আরব দেশের পয়গম্বর নামে অভিহিত হইবেন, অত্যন্ত অস্থির ও ভীতিবিহ্বল চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। পতিপ্রাণা সতী হজরত খদিজা উপযুক্ত শুশ্রূষা সহকারে তাঁহার তাদৃশ বিহ্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে পয়গম্বর সাহেব আনুপূর্বিক সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, 'বোধহয় ইহা আমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ।' ইহাতে পতিপরায়ণা সাধ্বী রমণী অতিশয় সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বচনে তাঁহার নিস্তেজ হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়া বলিলেন, 'না, সত্যবাদী--বিশ্বাসী—আমীন; প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নবান; পিতৃহীনের প্রতি স্নেহবর্ষণ কর; দরিদ্র আতুর ও বিধবার প্রতি দয়া করিয়া থাকো—এমন লোককে বিশ্বপিতা কখনও অকালে নষ্ট করিবেন না। প্রভু খোদাতালা কখনও বিশ্বাসী ভক্তদিগকে প্রবঞ্চনা করেন না। উঠ, এখন সেই দৈববাণী—প্রকৃত সত্য দৈববাণীর প্রত্যাদেশ অনুসারে কাজ কর।'

সেই পুণ্যবতী মহিলা, যিনি সর্বপ্রথমে পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন—এমনই সঞ্জীবনী সুধাপূর্ণ প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিলেন যে তিনি—যিনি নিজের দুর্বলতায় জড়ীভূত ও নিরুদ্যম হইয়া সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বসিয়া ছিলেন,*** এখন পূর্ণ সাহসে ও উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে, একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! আর সে মোহাম্মদ কেবল মোহাম্মদ মাত্রই রহিলেন না—বরং প্রবল প্রতাপশালী পয়গম্বর হইয়া গেলেন! তিনি একটা অসভ্য, অরাজক দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং একটা জনপ্রাণীবিরল নগণ্য উপদ্বীপকে এক মহাসাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ইউরোপে ধর্ম ও জ্ঞানের আলোক লইয়া গেলেন, এই দুইটি বস্তু সেখানে প্রায় ছিলই না। তাঁহার অনুবর্তীগণ পৃথিবীতে বড় বড় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। তাঁহার সমবিশ্বাসীগণ এমন নিষ্ঠার সহিত ইলাহির ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হইলেন যে, তাহার আদর্শ অন্য কোনো ধর্মে পাওয়া সম্ভবপর কি না সন্দেহ। কারণ, আপনারা একটু চিন্তা করিলে এবং ন্যায়চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, অন্য কোনো ধর্ম এমন নাই, যাহাতে এমন অকপট হৃদয় সত্যবিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এই জ্ঞান-বিশ্বাস তাহারা (মুসলমানেরা) আরবের পয়গম্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

যদি বেন সাহেবের কথামতো ইহাই সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় যে, সাধারণ আচার-ব্যবহার হইতে ধর্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার ঐ ধর্মের অনুবর্তীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং ভাবিয়া দেখুন, তাঁহার (হজরতের)

*** ইহা মিসেস বেশান্তের অতিশয়োক্তি। —(আল-এসলাম সম্পাদক)

[illegible] তাহার শিষ্যবর্গের হৃদয়ে কেমন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে [illegible] পয়গম্বর হইতে যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস [illegible] যে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ স্থান পায় না।

একজন মুসলমান- যদ্যপি এমন কোনো স্থানে এমন কতকগুলি লোক দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ছুরিকায় খণ্ড খণ্ড করে এবং তাহার পয়গম্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে—নমাজে মস্তক অবনত করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না।*

আপনারা আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, পয়গম্বরের সুপারিশের (শাফা'আতের) প্রতি তাহাদের বিশ্বাস কেমন অটল যে, তাহারা মৃত্যুভয় একেবারে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। আফ্রিকার দরবেশবৃন্দের সৎসাহসের তুলনা কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন কি—যাঁহারা ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু তোপ-কামানের সম্মুখে স্থিরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবার জন্য এমনই আনন্দের সহিত অগ্রসর হইতেন, যেন বরযাত্রীরূপে কোনো বিবাহসভায় যাইতেছেন! এবং যে-পর্যন্ত তাঁহাদের দলের কয়েক ব্যক্তি শত্রুসেনা পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারিতেন, সে-পর্যন্ত দলে দলে কামানের গোলায় ধ্বংস হইতেন! সে কোন্ উদ্দীপনা ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে এমন ভীষণ মৃত্যুমুখে লইয়া যাইত? তাহা কেবল পয়গম্বরের—কোরআনের মহিমা এবং ইসলাম-প্রেম। আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, (তাঁহাদের) এই ভক্তি পৃথিবীতে ভবিষ্যতেও অটল রহিবে, বরং বর্তমান যুগ অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিবে। (আমিন)

ভদ্রমহোদয়গণ! এখন আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রমাণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাহা এই যে : পয়গম্বরের 'নবুয়তে' সর্বপ্রথমে বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্মিণী—তিনি তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সমুদয় রহস্য অবগত ছিলেন, আর তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার আশৈশব জীবনের স্বভাব-চরিত্র সমুদয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এই যদি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে, পয়গম্বরের সত্যপরায়ণতা সম্বন্ধে অতি জ্বলন্ত প্রমাণ পাইবেন। আপনারা নিজেরাই বেশ জানেন যে, কোনো বিজ্ঞ বক্তৃতানিপুণ ব্যক্তি কোনো সভা-সমিতিতে গিয়া বেশ ঝাড়া দুই ঘণ্টা উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রভাবে শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও চমৎকৃত করিয়া স্বমতে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারে—যেহেতু সে-সময় লোকে তাহাকে কেবল বক্তৃতা-মঞ্চেই দেখে; তাহার আভ্যন্তরীণ জীবনের অবস্থা কিছু জানে না। কিন্তু ইহা বড় কঠিন, এমনকি অসম্ভব যে নিজের স্ত্রী, কন্যা, জামাতা প্রভৃতি অতি-নিকটবর্তী আত্মীয়গণ তাহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করে—যদি সে ব্যক্তি বাস্তবিক তদ্রূপ নির্মল ও সত্যপর না হয়। আমাদের মতে ইহারই নাম 'পয়গম্বরি' এবং সত্য বলিতে কি এমন বিশ্বব্যাপী জয়লাভ হজরত মসিহের (যিশুর) ভাগ্যেও ঘটে নাই।**

আরবীয় পয়গম্বরের সমুদয় আত্মীয়-বান্ধবদের মধ্যে কেবল তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবই (?) এমন ছিলেন, যিনি কেবল নিজের একগুঁয়ে গোঁড়ামির জন্য তাঁহার ধর্মমতে (প্রকাশ্যে) বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশের দলপতি ছিলেন

---

* মিসেস এ্যানি বেশান্তের বর্ণিত মুসলমান কি আমরাই ? ছি! ছি! ধিক্ আমাদের! আমরা মুসলমান নামের কলঙ্ক। বঙ্গদেশে দড়ি কলসি একেবারে নাই কি?

** অল্পদিন হইল—মুসলমান গ্রন্থকারগণ ইংরাজি ভাষায় এসলাম-সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার পূর্বে ইউরোপে এসলাম সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্যই খ্রিস্টান মিশনের এজেন্সি হইতে সংগ্রহ করা হইত—কাজেই অজ্ঞ ইউরোপ এসলামের নামে একেবারে শিহরিয়া উঠিত।

বলিয়া আপন পুরাতন পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া নিজের পক্ষে মানহানিকর [illegible] করিতেন; নতুবা তাঁহার কার্যকলাপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত যে, তিনি পয়গম্বরের [illegible] সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, তিনি রসুলোল্লাহকে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন, 'হে পিতৃব্যপ্রাণ! তুমি অসঙ্কোচে আপন কর্তব্য পালন করিতে থাকো; [illegible] জীবদ্দশায় কাহার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কটাক্ষপাত করে?' একদিন আবু তালেব স্বীয় পুত্র হযরত আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর ধর্মবিশ্বাস কী? আর তুই মহম্মদ (দ.) সম্বন্ধ সম্বন্ধে কী মনে করিস?' হজরত আলী অত্যন্ত সম্মান অথচ উৎসাহের সহিত উত্তর করিলেন, 'পিতৃদেব! আমি একমাত্র অদ্বিতীয় আল্লাহকেই পূজনীয় মনে করি এবং মোহাম্মদকে আল্লাহতালার প্রকৃত প্রেরিত বলিয়া মানি। আর এইজন্য পয়গম্বরের সংস্রব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইব না।'

ঈদৃশ উত্তর শ্রবণে অসন্তুষ্ট হইবারই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহা তো হইল না! বরং তিনি বলিলেন, 'পিতৃপ্রাণ-পুত্তলি! আমি তোমাকে অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অনুমতি দিতেছি। যেহেতু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি তোমাকে সুপথ ছাড়া কুপথে পরিচালিত করিবেন না।'

নবুয়তের (পয়গম্বরি প্রাপ্তির) তিন বৎসর পর্যন্ত পয়গম্বর সাহেব নীরবে বিনা আড়ম্বরে আপন মিশনের কার্য করিতেছিলেন। সে-সময় তাঁহার প্রতি বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা মাত্র ৩০ জন ছিল। অতঃপর তিনি প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে আল্লাহতায়ালার একত্বের বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং নরবলিদান, বিলাসিতা ও সুরাপান যে অতি কদর্য, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ বক্তৃতার গুণে অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের জ্যোতি প্রদীপ্ত হইল এবং তাঁহার শিষ্যসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবন্ধকতা-বহ্নিও পয়গম্বর সাহেবের বিরুদ্ধে দেশময় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বিরোধীদলের হস্তে পয়গম্বর সাহেব যতপ্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও নিগ্রহ ভোগ করেন, সাধারণ মানব তাহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না।

বিধর্মী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেবের ভক্ত, বিশ্বাসী লোককে যখন যেখানে দেখিতে পাইত, তন্মুহূর্তেই হত্যা করিত। কাহারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন করিত। কাহাকে বা হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সূর্যের দিকে মুখ করিয়া মরুভূমিতে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ান করাইয়া তাঁহার বক্ষের উপর প্রস্তর চাপা দিয়া বলিত, 'তুই মোহাম্মদ ও তাহার আল্লাহকে অস্বীকার কর!' কিন্তু এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাঁহারা মোহাম্মদের কলেমা পড়িতে পড়িতে অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতেন।

একদা কোনো দুরাত্মা জনৈক মুসলমানকে ধরিয়া তাঁহার দেহ হইতে খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া ফেলিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'এ সময় তুই যদি নিজের পুত্র-পরিবারের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে ঘরে থাকিতিস, আর তোর স্থলে তোর মোহাম্মদ এইরূপ ছিন্নদেহে ভূমে লুটাইয়া ছটফট করিত তবেই বেশ ভালো হইত!' কিন্তু সেই সত্যধর্মপ্রাণ মুসলমান

এই অল্পদিনের চেষ্টায় কিরূপ ফল হইয়াছে, এই বক্তৃতা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। লর্ড হেডলি, খাজা কামালুদ্দিন, মি. এহয়া-উন-নাসর পর্কিসনস প্রভৃতি মুসলমান লেখকগণের চেষ্টায় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কিরূপ মত পরিবর্তন হইতেছে, 'Islamic Review' পত্র পাঠ করিলে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।
—(আল-এসলাম,—সম্পাদক)

[illegible] এই বলিয়াই উত্তর দিতেছিলেন, 'আমার গৃহ, পুত্র কন্যা [illegible]
[illegible] হজরত রসুলের পদতলে উৎসর্গ হউক! আমার সম্মুখে যেন তাঁহার চরণে একটি কণ্টকও বিদ্ধ না হয়।'*

অবশেষে বিরোধী শত্রুগণ পয়গম্বর সাহেব ও তদীয় শিষ্যবর্গকে এত অধিক ক্লেশ দিতে লাগিল যে,তাঁহারা শেষে রসুলের ইঙ্গিতে দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। পয়গম্বর সাহেবের একদল অনুবর্তী যখন শত্রু-তাড়নায় ব্যস্ত হইয়া হাবশ (আবিসিনীয়) দেশে গেলেন, তখন শত্রুগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সে দেশে উপস্থিত হইল এবং তত্রত্য খ্রিস্টান রাজাকে অনুরোধ করিল যে, মুসলমানদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। রাজা তখন হতভাগ্য প্রবাসীদিগকে ডাকিয়া তাহাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'রাজন! আমরা অজ্ঞতা ও দুষ্কৃতার সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা ঘৃণিত পৌত্তলিক ছিলাম; আমাদের জীবন দুর্দান্ত পশু-প্রকৃতি নরপিশাচের ন্যায় নীচ ও জঘন্য ছিল; নরহত্যা আমাদের দৈনন্দিন ক্রীড়া ছিল; আমরা জ্ঞানান্ধ, ঈশ্বরদ্রোহী ও ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত ছিলাম; পরস্পরের প্রতি স্নেহপ্রীতি বা মনুষ্যত্বের নামগন্ধ আমাদের মধ্যে ছিল না; অতিথিসেবা কিংবা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যপালন বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম; আমরা 'জোর যার মুলুক তার' ব্যতীত অন্য বিধিনিয়ম জানিতাম না। আমাদের এই ঘোর দুরবস্থার সময় আল্লাহতালা আমাদের মধ্যে এমন একজন মানুষ সৃষ্টি করিলেন—যাঁহার সত্যতা সাধুতা এবং সরলতার উজ্জ্বল চিত্র আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই ব্যক্তি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ এক, সর্ব কলঙ্ক হইতে পবিত্র, কেবল তাঁহারই উপাসনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; আমাদিগকে সত্য অবলম্বন এবং মিথ্যা বর্জন করিতে হইবে; প্রতিজ্ঞা পালনে, বিশ্বজগতের প্রাণিবৃন্দের প্রতি স্নেহ-মমতা প্রদর্শনে, প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনে যেন বিমুখ না হই; যেন জ্ঞাতির প্রতি সদ্ব্যবহার করি, পিতৃহীনের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করি, নিয়মমতো দৈনিক উপাসনা ও উপবাস (রোজা) ব্রত পালনে অবহেলা না করি। রাজন! আমরা এই ধর্মে বিশ্বাস রাখি এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি।'

ভদ্রমহোদয়গণ! পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের বিশ্বাস এবং ধর্মমত এমনই উচ্চ ছিল যে, তাঁহারা প্রাণ হেন প্রিয় বস্তু করতলে লইয়া বেড়াইতেন! আমি আরবীয় পয়গম্বরের সত্যতা ও অকপট হৃদয়ের প্রমাণস্বরূপ আর একটি বিষয় আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি।

একদা পয়গম্বর সাহেব আরবের কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় একজন অন্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, 'হে খোদার রসুল! আমাকে পথ দেখাইয়া দাও, আমি সত্যপথ লাভ করিবার আশায় আসিয়াছি।' পয়গম্বর সাহেব বাক্যালাপে অন্যমনস্ক থাকা বশত তাহার উক্তি শ্রবণ করেন নাই। সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, 'হে রসুলুল্লাহ! আমার কথা শুন, ধর্মপথ দেখাও!' তদুত্তরে তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত তাহাকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে সে অন্ধ ক্ষুণ্নচিত্তে চলিয়া গেল। পর দিবস পয়গম্বরের প্রতি যে 'অহি' (দৈবাদেশ) আসিয়াছিল, যাহা অদ্যাপি কোরআনে লিপিবদ্ধ আছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার

* মিসেস বেশান্ত এখানে দুইটি ঘটনা ভ্রমক্রমে এক বর্ণনার ভিতর ফেলিয়াছেন। অমুসলমানের পক্ষে এইরূপ ভ্রম মার্জনীয়—(আল-এসলাম—সম্পাদক।)

মর্ম এই : রসুলের নিকট এক অন্ধ আসিল, কিন্তু সে (রসুল) অবজ্ঞা করিল ... কথায় ভ্রূক্ষেপ করিল না। তুমি কী করিয়া জানো যে, সে পাপমুক্ত হইবে না গ্রহণ করিবে না এবং সে উপদেশে সে উপকৃত হইবে না? যে ব্যক্তি ধ... সহিতই তুমি সসম্ভ্রম সম্ভাষণ করিতেছ, যদ্যপি সে অবিশ্বাসী (ঈমানদার)... তজ্জন্য তুমি অপরাধী হইতে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বয়ং সরল হৃদয়ে সত্য ... অন্বেষণে আসিল, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে না। (ভবিষ্যতে যেন আ... এরূপ না হয়)।'

ঐ দৈবাদেশ পয়গম্বর সাহেবের মনে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়াছিল। তদবধি ... তিনি উক্ত অন্ধকে দেখিতেন, তখনই বলিতেন, ইহার আগমন শুভ। যেহেতু ... উপলক্ষে আল্লাহ আমাকে শাসন করিয়াছেন। পয়গম্বর সাহেব উক্ত অন্ধকে ... আদরযত্ন করিতেন এবং দুইবার তাঁহাকে মদিনায় কোনো উচ্চপদে ... করিয়াছিলেন। ফল কথা এই যে, পয়গম্বর সাহেব কেবল অপরকেই উপদেশ ... না, বরং নিজের আত্মাকে উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্তুত রাখিতে...

সচরাচর যেরূপ প্রত্যেক পয়গম্বরের সহিত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ অল্প... পয়গম্বরের বিরুদ্ধেও সাধারণের বৈরিতারূপ ঝঞ্ঝানিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প... লাগিল। ধর্ম-সংক্রান্ত শত্রুতা সাধনের নিমিত্ত পয়গম্বর সাহেবও তদীয় শিষ্যমণ্ড... বিরুদ্ধে নূতন বিপদের সূত্রপাত হইতে লাগিল! অবশেষে অবস্থা এমন ভীষণ ... দাঁড়াইল যে, পয়গম্বর সাহেব সমুদয় মুসলমানকে আপন আপন প্রাণ লইয়া য... পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন হজরতের নিকট মাত্র একজন ব্যতীত ... কেহই রহিল না। কিন্তু পয়গম্বর সাহেব স্বীয় কর্তব্য তেমনই নির্ভীকচিত্তে প... করিতে থাকিলেন। এই সঙ্কট সময়ে তাঁহার অরিকুল তাঁহার প্রাণবিনাশের সু... অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেব আর সহ্য করিতে না প... তাঁহাকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, 'হে পিতৃব্য-প্রাণ! কথা শুন, অমূল্য প্রাণ ... অবহেলায় হারাইস না। আরবের রক্তপিপাসু খঞ্জরসমূহ তোরই জন্য শ... হইতেছে! তুই নিবৃত্ত হ, তোর বক্তৃতা বন্ধ কর।'

তাঁহার কথায় পয়গম্বর সাহেব অতি সাহসের সহিত যে উত্তর দিয়াছিলেন, ... চিন্তা করিবার উপযুক্ত বটে। তিনি বলিলেন :

'পিতৃব্যদেব! আমি নিরুপায়। আমি তো কিছুই করি না, কে যেন আমার দ্... করাইতেছে। যদি বিধর্মীগণ আমাকে এক হস্তে সূর্য অপর হস্তে চন্দ্র দান করিয়া বলে... 'তুমি আপন কার্য পরিত্যাগ কর' তবু নিশ্চয় জানিবেন, আমি এ কার্য হইতে বি... হইব না—যে পর্যন্ত ঈশ্বরের সেরূপ ইচ্ছা না হয়। অথবা আমিই আমার এই সাধ... নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিব। তবে যদি আপনি নিজের জন্য ভয় করেন তো বলুন, ... এই মুহূর্তে আপনাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাই—আমার আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকিবে... এই বলিয়া পয়গম্বর সাহেব সাশ্রুনয়নে গমনোদ্যত হইলেন।

কিন্তু পিতৃব্যের স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, 'প্রাণাধি... আমি তোকে কিছুতেই ছাড়িব না, তোর অরিকুল হইতে তোকে রক্ষা করিব। ... নির্ভয়ে আপন কাজ কর।'

কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ! আরবীয় পয়গম্বরের এই স্নেহময় পিতৃব্য আর অধিক ... তাঁহার সহিত থাকিতে পারেন নাই। সেই ঘোর দুর্দিনে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

[illegible] তাঁহার পতিপ্রাণা বণিতা খাদিজা বিবিও প্রেমপাশে [illegible] করিয়া [illegible] করিলেন। এই সময় বাস্তবিক পয়গম্বর সাহেবের পক্ষে [illegible] করার [illegible] পরীক্ষার সময় ছিল! রসুলের শত্রুপথ এই সময় প্রবল হইতে [illegible] (আহা! বিপদ কখনও একা আইসে না)।

ক্রমে অবস্থা এমন ভয়ানক হইল যে, পয়গম্বর সাহেব মক্কা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তখন হজরত আলী এবং আবুবকর সিদ্দিক—মাত্র এই দুইজন ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কেহই ছিল না। তমোময়ী নিশীথে পয়গম্বর সাহেব হজরত আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এদিকে হজরত আলী তাঁহার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, যাহাতে শত্রুগণ নিশ্চিত থাকে। মোহাম্মদ সাহেবের দুর্ভাগ্যক্রমে যথাকালে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তথায় উপস্থিত হইল; বস্ত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল, একি! এ তো মোহাম্মাদ (দ.) নহেন। এ যে আলী শয়ান রহিয়াছেন! তাহারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া পয়গম্বর সাহেবের মস্তক আনয়নের নিমিত্ত বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিল।

পয়গম্বর সাহেব যৎকালে একমাত্র সঙ্গী আবুবকর সিদ্দিকসহ গমন করিতেছিলেন, তখন আবুবকর অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন, 'হে হজরত! আমরা তো মাত্র দুইজন!' তিনি উত্তর করিলেন, 'না, না! আমরা তিন জন—ইহাদের একজন অতিশয় প্রভাপশালী—সমুদয় বিশ্বজগৎ একদিকে, আর তিনি একা একদিকে।' আবুবকর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, 'হজরত। সে তৃতীয় জন দ্বারা আপনি কী বুঝাইতে চাহেন?' উত্তর হইল, 'সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত সঙ্গে রহিয়াছেন।' এ কথায় আবুবকর নিশ্চিত হইলেন।

পয়গম্বর সাহেব মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি আশাতীত যত্ন ও সমাদরে গৃহীত হইলেন। শত শত সমাজ-নেতা অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে আসিলেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। হজরতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনুচরবর্গও ক্রমে ক্রমে মদিনায় আসিয়া আশ্রয় গহণ করিলেন। কিন্তু পয়গম্বরের বিপক্ষগণ সেখানেও তাঁহাকে নিশ্চিত মনে তিষ্ঠিতে দিল না। তাহারা এবার সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করিয়া পয়গম্বর সাহেবকে আক্রমণ করিল। তখন পয়গম্বর সাহেবও কেবল আত্মরক্ষাকল্পে স্বীয় ক্ষুদ্র যোদ্ধাদল লইয়া বাহিরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন :

'জগৎ-পিতা! তুমি সমস্তই দেখিতেছ এবং সবিশেষ অবগত আছ। অদ্য যদি আমার ক্ষুদ্র সেনাদল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তোমার সত্য নাম প্রচার করিবার লোক আর কেহ থাকিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, তুমি সত্যের সহায় হইবে।'

অবশেষে এই প্রথম রক্ত-প্রবাহিনী যুদ্ধ—যাহা বদরের যুদ্ধ নামে বিখ্যাত হইয়া গেল। একদিকে তো সহস্র যোদ্ধা ধরাশায়ী হইল, এদিকে একশত বীরও ক্ষয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কার্যত ইহা সুস্পষ্টই বোধ হইতেছিল যে, মুসলমানদের পক্ষে কোনো অদৃশ্য শক্তি যুদ্ধ করিতেছিল, তাই স্বল্প সময়ের মধ্যেই মোসলেমগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। পয়গম্বর সাহেবের জীবনে এই প্রথম রক্তপাত—যাহা তিনি অনন্যোপায় হইয়া করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা তিনি এমন দয়ার্দ্রহৃদয় ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন যে, দুর্ধর্ষ লোকেরা তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিত। এইরূপে কয়েকবার আরবের

মোসলেম-বিদ্বেষীগণ মহাসমারোহে যুদ্ধায়োজন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ ক... পয়গম্বর সাহেব শুধু আত্মরক্ষা—শিষ্যমণ্ডলীর প্রাণ নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হ... সর্বদা সত্য ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার সঙ্গে থাকায় বিজয়ের উপর বিজয় লা... থাকিলেন এবং অযাচিত প্রভুত্ব লাভ করিলেন। এমনকি তিনি স্বাধীন রাজ... সমগ্র আরব উপদ্বীপে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এই সময় পয়গম্বরের অতীত ও বর্তমান জীবনে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হ... পূর্বে লোকে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদে... কামনায় প্রার্থনা করিতেন। এখন তিনি সৈন্য সেনানী ও যথাবিধি সমরায়োজন ক... বাধ্য হইলেন—যাহা একজন সম্রাটকে করিতে হয় এবং অপরাধীকে শা... করিতেও হইত। কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি অতি উচ্চ আদর্শের দয়া ও ন্যায়বিচার প্রদ... করিয়াছেন।

পয়গম্বর সাহেবের জন্মের পূর্বের অর্থাৎ যে সময়কে মুসলমানদের মূর্খতার যু... হয়, যুদ্ধে ধৃত বন্দগণের প্রতি এমন নৃশংস নির্যাতন করা হইত যে, তাহার তু... নিতান্ত অসভ্য বর্বর জাতির মধ্যেও পাওয়া কঠিন। কিন্তু পয়গম্বর সাহেবের স... যুদ্ধে ধৃত বন্দদিগের প্রতি যেরূপ সদয়, সুভদ্র ব্যবহার করা হইত, তাহার অ... অদ্যাপি কোনো অতি সভ্য দেশ ও সমাজে পাওয়া যাইবে কি না, সন্দেহ। এক... রণযাত্রা-কালে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে একদল বন্দি ছিল। খাদ্যসামগ্রীতে (রসু... আটা অল্প ছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল; তচ্ছ্রবণে রসুলোল্লাহ আদেশ দিলেন ... বন্দিদিগকে রুটি দান করা হউক, আর স্বাধীনেরা খর্জুর ভক্ষণ করুক। (কী মহত্ব

আর একবারের ঘটনা এই যে, যুদ্ধ জয়ের পর, লুণ্ঠিত দ্রব্য যখন বণ্টন করা হইত... তখন পয়গম্বর সাহেব স্বীয় নিকটবর্তী প্রিয় সহচরবৃন্দকে ভাগ লইতে দিলেন না... ইহাতে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন। পয়গম্বর সাহে... তাহা অবগত হইয়া সহচরদের ডাকিয়া বলিলেন, 'বন্ধুগণ! তোমরা জানো, পূ... তোমরা কিরূপ বিপন্ন ছিলে, আল্লাহ তোমাদের বিপদমুক্ত করিয়াছেন; তোমরা এ... অপরের রক্তপিপাসু ছিলে, প্রভু তোমাদিগকে এখন ভ্রাতৃপ্রেম দান করিয়াছেন; তোমর... কোফরের (অধর্মের) অন্ধকারে কারারুদ্ধ ছিলে, তিনি বিশ্বাসের নির্মল জ্যোতি... তোমাদের মন আলোকিত করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল অনুগ্রহ পুরস্কার কি তোমর... প্রাপ্ত হও নাই?' তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, আমাদের অবস্থা বাস্তবি... এইরূপই ছিল এবং এখন যে সুখ-সম্পদ ভোগ করিতেছি, আল্লাহতালারই অনুগ্র... এবং আপনার দয়ায় আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে।' তিনি উহাদের কথায় বাধা দি... বলিলেন, 'না, না, বল যে কেবল খোদার অনুকম্পা ছিল। আর যদি তোমরা এইর... বলিতে তো আমিও সাক্ষ্য দিতাম। আমার সম্বন্ধে তোমরা ইহা বলিতে পার যে, তু... এখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, আমরা তোমায় আশ্রয় দিয়াছি; তুমি দুঃখ-চিন্ত... ভারাক্রান্ত ছিলে, আমরা তোমায় সান্ত্বনা দিয়াছি' (এ কথায় তাঁহারা কোনো উত্ত... দিলেন না। তাঁহাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া) পুনরায় পয়গম্বর সাহে... বলিলেন, 'হে প্রিয় সহচরবৃন্দ! লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিনিময়ে কি তোমরা আমাকে পাই... ইচ্ছা কর না? খোদার কসম! খোদার সমস্ত রাজ্য বিপক্ষে দাঁড়াইলেও মোহাম্মদ আপ... সহচরদের পক্ষে থাকিবে, যেহেতু তাঁহারা বিনা স্বার্থে—শুধু ঈশ্বরোদ্দেশে কষ্ট স্বীক... করিতেছেন।'

পয়গম্বর সাহেবের এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার সুফল এমন হইল যে, উক্ত সহচরগণ যাহারা মরিতে ও মারিতে নির্ভীক, শৌর্য-বীর্যে সিংহতুল্য জাতি ছিলেন, এক্ষণে অবিরলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'হে রসুলোল্লাহ! আমাদের বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি।'

আমার হিন্দু ভ্রাতৃগণ! আপনারা বাস্তবিক আরবীয় পয়গম্বরের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহেন। আপনারা এ অলৌকিক ঐশিক শক্তি দেখিতে সক্ষম নহেন, যাহা তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্যকে কষ্ট স্বীকার তো তুচ্ছ—মৃত্যুর সম্মুখীন করিয়াছে; যাহা কোটি কোটি লোকের অন্তরে ঈশ্বরপ্রেম অঙ্কিত করিয়াছে। আপনারা আরবীয় পয়গম্বরের নিরহঙ্কার ভাব ও আত্মত্যাগের বিষয় একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন তো! তিনি অনুবর্তীগণকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, তাঁহাকে যেন কেহ দেবতা কিংবা অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান না করে। তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদেরই মতো মানুষ, এইমাত্র প্রভেদ যে, আমি তাঁহার (খোদার) দূত, তাঁহার সংবাদ তোমাদিগকে পৌঁছাই।' পয়গম্বর সাহেবের নিরভিমান ও সরলতার প্রমাণ এতদপেক্ষা বেশি আর কী হইতে পারে। যে সময় তিনি রাজাধিরাজ সম্রাট ছিলেন, তখন স্বহস্তে ছিন্ন বস্ত্রে চীরসংলগ্ন করিতেন—ছিন্ন পাদুকা স্বহস্তে সেলাই করিতেন! তাঁহার শান্ত স্বভাব সম্বন্ধে তদীয় ভৃত্য আনাস বলিয়াছিলেন, 'আমি দশ বৎসর তাঁহার নিকট ছিলাম, তিনি কদাচ অপ্রিয় বচন কহিবেন দূরে থাকুক, আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেন নাই।' (হাদিস শরিফে তুই শব্দের উল্লেখ নাই), ভ্রাতৃগণ! এমনই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ছিল সেই সম্রাটের যিনি ইচ্ছা করিলে পরিচর্যার জন্য সহস্রাধিক দাসদাসী রাখিতে পারিতেন।

আরবীয় পয়গম্বর যে 'মিশনে'র জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমাধা করিলে পর সেই (দারুণ) সময় আসিল, যখন একদিন (মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে) রোগক্লিষ্ট অবস্থায় তিনি বহু কষ্টে নামাজের নিমিত্ত মসজিদে আনীত হইলেন। (নামাজ শেষ হইলে) তিনি আপন পীড়িত ক্ষীণকণ্ঠ যথাশক্তি উচ্চ করিয়া বলিলেন, 'হে মুসলমানগণ! তোমরা সাধারণে ঘোষণা করিয়া দাও, যদি আমি এ জীবনে কাহারও প্রতি অবিচার করিয়া থাকি, তবে সে অদ্য আমা হইতে প্রতিশোধ লউক, পরলোকের ঋণ যেন স্থগিত না রাখে। যদি কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকে, সে ঋণশোধের নিমিত্ত আমার ঘরদ্বার তাহাকে সমর্পণ করিতেছি। অদ্য আমি সকল প্রকার জবাবদিহির জন্য উপস্থিত আছি।'

একজন বলিল, হজরতের নিকট তাহার ত্রিশ 'দেরেম' পাওনা আছে, তাহা রসুলোল্লাহ তন্মুহূর্তে শোধ করিলেন।* এই তাঁহার মসজিদে শেষ আগমন। অতঃপর

---

* মিসেস এ্যানি বেশান্ত এস্থলে 'আক্কাসের ত্যাজয়ানার' বিষয় উল্লেখ করেন নাই; আমার মনে হয় এজন্য 'প্রতিশোধ' বিষয়টি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। সে তাজিয়ানার কথা এই :
কোনো একদিন হজরত কোনো কারণে আক্কাস নামে এক ব্যক্তিকে এক ঘা কোড়া মারিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই আক্কাস মসজিদে আসিয়া সেই কোড়ার প্রতিশোধ পাইবার দাবি করিল, তখন রসুল সহচর হস্তে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সহচরবৃন্দ ও আত্মীয় বন্ধুবর্গ অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন, যেহেতু হজরত এমন পীড়িত অবস্থায় কোড়ার আঘাত কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহারা অনুনয়-বিনয় করিয়া আক্কাসকে নিবৃত্ত হইতে, অথবা রসুলের পরিবর্তে তাঁহাদের গাত্রে একাধিক কোড়া মারিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আক্কাস তাহাদের কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন তাঁহারা অতিশয় অধীর হইয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন আরবীয় পয়গম্বর নশ্বর মৃণ্ময় দেহত্যাগ করিলেন, যাতে তিনি উচ্চ অনন্তধামে গিয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন। (তাঁহার অতি উচ্চ, পবিত্র, বিস্ময়কর এবং বাস্তবিক খোদার পয়গম্বরের যোগ্য ছিল। সাধারণ মানবের জীবন এরূপ হওয়া অসম্ভব)।

ভদ্রমহোদয়গণ! এখন আমি আপনাদিগকে আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি যেসব দোষারোপ করা হয়, তাহার বিষয় বলিতেছি। অনভিজ্ঞতা ও ন্যায়ান্যায় জ্ঞান অথবা শুধু কুসংস্কারবশত রসুলের প্রতি ঐসব দোষারোপ করা হইয়া থাকে একতম দোষ এই বলা হয় যে, তিনি জীবনের শেষভাগে সর্বসুদ্ধ ৯ জন পাণিগ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু আপনারা বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, সেই যিনি ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কোনোপ্রকার 'মকারাদি' কু অবগত ছিলেন না, নিজের অপেক্ষা অনেক অধিক বয়স্কা একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে অতি সুখে জীবনের ২৬টি বৎসর যাপন করিলেন; তিনি শেষ বয়সে যখন মানুষ জীবনীশক্তি নির্বাপিত প্রায় হয়, শুধু আত্মসুখের জন্যই যে কতকগুলি বিবাহ করিবেন তাহা কি সম্ভব? যদি ন্যায়বিচারের সহিত বিবেচনা করেন, তবে আপনারা কে জানিতে পারিবেন—সে বিবাহের উদ্দেশ্য কী ছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে, তাঁহারা (হজরতের পত্নিগণ) কোন্ শ্রেণীর কুলবালা ছিলেন, আর কেনই বা তাঁহাদের রসুলের প্রয়োজন ছিল।—কতিপয় নারী এরূপ ছিলেন যে, তাঁহাদের বিবাহের ফলে রসুলের পক্ষে 'নূর-ইসলাম' প্রচারের সুবিধা হইল। আর কয়েকজন এরূপ ছিলেন যে, বিবাহ ব্যতীত তাঁহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের অন্য কোনো উপায় ছিল না।

আরবীয় পয়গম্বরের প্রতি আর একটি দোষারোপ এই করা হয় যে, তিনি রক্তপাতে প্রশ্রয় দিতেন এবং কারণে-অকারণে কাফের হত্যা করিতে আদেশ দিতেন। এখন এ সম্বন্ধে আপনারা আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। যখন আইনের দুই দফা প্রায় একই প্রকার হয় অর্থাৎ একটি কোনো শর্তের অধীন এবং অপরটি শর্তবিহীন, তখন শর্তহীন ধারাই সর্বদাও শর্তাধীন ধারা বলিয়া মানিতে হয়। মুসলমানদের শাস্ত্রকারগণ সর্বদা এ বিষয়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং কোরআনের বচনসমূহেও এ-কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা একস্থলে বলা হইয়াছে, 'কাফেরকে হত্যা', এবং অপর স্থলে বলা হইয়াছে 'হত্যা কর, যদি তাহারা তোমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেয়।' এখন আমি আপনাদিগকে সেই মূলবচনসমূহের—যাহা রসুলের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, শাব্দিক অনুবাদ শুনাইতেছি। আমি নিজের ভাষায় বলিব না, কারণ যদি আপনারা মনে করেন যে, আমি তাঁহাদের (মুসলমানদের) ধর্ম প্রচার করিতেছি। তবে শ্রবণ করুন : 'যদি তাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা করা যাউক। কিন্তু যদি

করিতে লাগিলেন—নিষ্ঠুর আক্কাস করে কী! হায় হায়, রসুল হত্যা করিবে! হজরত কিন্তু অবিচলিত চিত্তে আক্কাসকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত প্রতিশোধ লইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে বলিল, 'হজরত, অশ্ব নগ্নপৃষ্ঠে আপনার কোড়ার আঘাত পাইয়াছিলাম।' এতচ্ছ্রবণে রসুলে করিম তৎক্ষণাৎ গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া নগ্নদেহে কশাঘাত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন!!

বলি, আজ পর্যন্ত জগতে কেহ ঐরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস রসুলের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিতে দেখিয়া স্বর্গদূত (ফেরেশতা) পর্যন্ত কম্পিত হইয়াছিলেন! এরূপ মাহাত্ম্য আর কোনো মহাপুরুষ দেখাইতে পারিয়াছেন কি?

আক্কাস অবশ্য রসুলকে কোড়া মারিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিল না, তাহার উদ্দেশ্য ছিল হজরতের পবিত্র পৃষ্ঠ চুম্বন করা। সে উদ্দেশ্য সফল হইল—ক্রন্দনের রোলের মধ্যে ভক্তির জয়জয়কার ঘোষিত হইল। —লেখিকা

[illegible] তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে পূর্বকার [illegible] যেরূপ শাস্তি দেওয়া গিয়াছে সেইরূপ শাস্তি [illegible] তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যে পর্যন্ত উহারা পৌত্তলিকতা রক্ষা নিমিত্ত তোমাদের ধর্মাচরণে নিবৃত্ত না হয় এবং অদ্বিতীয় খোদার ধর্মকে অমান্য করে, যুদ্ধ করিতে থাকে। আর যদি তাহারা মানে তবে, নিশ্চয় জানিও আল্লাহ তাহাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু যদি তাহারা সত্যধর্মের বিরোধী হয়, তবে আল্লাহ তোমাদের সহায় হইবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অভিভাবক এবং সাহায্যকর্তা।'

আর একটি বিষয়, যাহা পয়গম্বরকে উপদেশ দানের নিমিত্ত কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনাদের শ্রবণগোচর করিতেছি :

'মনুষ্যদিগকে নম্র মৃদুভাষায় যুক্তিসহকারে উপদেশ দিয়া আল্লাহতালার ধর্মপথে আহ্বান কর; তাহাদের সহিত অতিশয় ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সহিত সদয়ভাবে তর্ক কর, কেননা উহাদের কে সত্যপথ ভুলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে এবং কে সত্যপথে আছে—তাহা আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন। যদি তুমি প্রতিশোধ লও, তবে লক্ষ্য রাখিও যে, তাহা তোমার প্রতি যে অত্যাচার অনাচার হইয়াছে (ন্যায়বিচার অনুসারে) তাহার সমান হয়; আর যদি তুমি প্রতিশোধ না লইয়া সহ্য কর, তবে সাবের (সহিষ্ণু) ব্যক্তির পক্ষে আরও ভালো কথা। সুতরাং ভালো হয়, যদি শত্রুদের প্রপীড়ন ধীরতার সহিত সহ্য কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও তোমার কার্যকলাপ তবেই সফল হইবে,যখন তাহার সহিত আল্লাহ্তালার অনুগ্রহ মিশ্রিত থাকিবে। কাফেরদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না, এবং উহাদের চাতুরী শঠতায়ও ব্যতিব্যস্ত হইও না, কারণ আল্লাহ তাহাদেরকেই সহায্য করেন যাহারা সাধু ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং তাহাকে ভয় করে।'

আর একটি উপদেশ শ্রবণ করুন,—'ধর্ম কর্ম ব্যাপারে অত্যাচার করিও না, যদি সে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে তবে বুঝিও আল্লাহ তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তবে যদি ধর্ম স্বীকার না করে, তবে আর কী করা—তোমার কাজ তো কেবল উপদেশ দান ও প্রচার করাই ছিল।'

আরও শ্রবণ করুন,—পয়গম্বর সাহেব কাফেরের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 'কাফের তাহারই যাহারা ন্যায়বিচারের বিপরীত কার্য করে; পাপী কেবল তাহারাই যাহারা ইসলাম- ধর্মের বাহিরে।' ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামধর্মের বৃত্তি তত সঙ্কীর্ণ নহে যে, কেবল পয়গম্বর সাহেবের শিষ্যবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

আর একস্থলে (প্রত্যাদেশে) আসিয়াছে যে, 'যদি তাহারা তোমাদের বিরোধী হইয়া যুদ্ধ করে কিন্তু তোমাদের সহিত যুদ্ধ-কলহ না করে আর তোমাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে, তবে তাহাদিগকে হত্যা করা কিংবা তাহাদের বশীভূত করিতে চেষ্টা করা ঈশ্বরাদেশের বিরুদ্ধ।'

উপস্থিত মহোদয়গণ, আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ইহা ন্যায়বিচারের কথা হইবে, আমরা পয়গম্বর সাহেবের তাদৃশ মিলনপ্রয়াসী শান্তিসূচক বচনসমূহের প্রতি—যাহা সেরূপ যুদ্ধ-কলহ এবং অত্যাচারের যুগে বলা হইয়াছিল, একটু মনোযোগ না করি, আর কেবল ঐ সকল বচন যাহা তিনি কোনো এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইবার সময় উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, সেগুলিকে ধরিয়া লই? আর আমার মতে যে-কোনো সেনাপতি এরূপ স্থলে থাকিলেন, তিনি এতদপেক্ষা অধিক যোগ্যতার কাজ আর কী করিতেন?

বেশ, এখন আপনারা সেই শান্তিপ্রিয়তা শিক্ষার আর একটি দৃষ্টান্ত, যাহা [illegible] সাহেবের স্বকীয় ব্যবহারে দেখা যায়, একটু সমালোচনা করিয়া দেখুন তো [illegible] এমন কোনো ছিল না, যাহা পয়গম্বরের প্রতি করা হয় নাই—আর তিনি তাহা [illegible] করিয়াছেন; কোনো নির্যাতন এমন হয় নাই, যাহা তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। হে ভ্রাতৃগণ! কোনো ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে তাঁহাকে [illegible] সেইভাবে দেখুন, যে অবস্থায় তিনি বাস্তবিক থাকেন, কুসংস্কারের চশমা [illegible] দেখিবেন না।

প্রত্যেক ধর্মেই কিছু-না-কিছু দোষ জন্মিয়াই থাকে; সমস্ত সাধু-প্রকৃতি লোকে কার্যকলাপে কোনো-না-কোনো দোষ থাকেই, বিধর্মী এবং মূর্খ শিষ্য একে আর বৃদ্ধি থাকে। কোনো ধর্ম দেখিতে হইলে সেই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে দেখা উচিত, তাহা না করিয়া কোনো নরাধমকে দেখিয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত বলিয়া ধারণা করা অন্যায়। তবেই আমরা একে অপরকে ভ্রাতার ন্যায় ভালোবাসিতে শিখিব এবং বন্য অসভ্যদের মতো একে অপরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না।

আমার দুঃখ হইতেছে যে, সময়াভাবে আমি ইসলামের শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। যদিও সে বিষয়টিও আপনাদের ভালো লাগিত কিন্তু তাহা তত প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া আমি এস্থলে সে বিষয় পরিত্যাগ করিলাম।

প্রত্যেক ধর্মেই বাহ্যিক অবস্থার পরে দর্শন থাকে। যদি এ-সময় ইসলামের বর্তমান অবস্থায় আমরা তাহার স্বল্পতা দেখিতেছি, (তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই) কারণ, আমরা যখন সেই সময়ে—যখন ইসলামের জ্যোতি আরম্ভ হইয়াছিল, দৃষ্টিপাত করি তাহার গুণ ব্যাখ্যার উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ পাই না।

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, আরবীয় পয়গম্বর তেরশত (১৩০০) বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কী বলিয়াছেন :—'বিদ্যা শিক্ষা কর; যে বিদ্যা শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্র হয়; যে বিদ্যার চর্চা করে সে ঈশ্বরের স্তব করে; যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা (এবাদত) করে; যে উহা শিক্ষা দেয় সেও উপাসনা করে। বিদ্যাই মানবকে ভালো ও মন্দ (সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ) জ্ঞান শিক্ষা দান করে; শিক্ষাই স্বর্গ প্রদর্শন করে; শিক্ষাই নির্জনে নির্বাসনে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে; বনবাসে সান্ত্বনা প্রদান করে; বিদ্যা আমাদিগকে উন্নতি-মার্গে লইয়া যায় এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। বন্ধুসভায় বিদ্যা আমাদের অলঙ্কার স্বরূপ; শত্রুসম্মুখে অস্ত্রস্বরূপ।* বিদ্যার দ্বারা আল্লাহতায়ালার বিপন্ন দাস পুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয়।'

পয়গম্বর সাহেবের নিম্নোক্ত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি ভক্তিপ্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তিনি বলিয়াছেন, 'বিদ্বানের (লিখিবার) মসি শহীদ (ধর্মযুদ্ধে সমরশায়ী)-দের রক্তাপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।' ভ্রাতৃগণ! বিদ্যার গৌরব কত এতদপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে? হজরত আলী যিনি পয়গম্বর সাহেবের [illegible]

* সুশিক্ষার কল্যাণে শত্রু জয় করা যায় এ-কথা ধ্রুব সত্য। ঐ কারণেই বোধহয় নারীবিদ্বেষী মহাশয়েরা স্ত্রীশিক্ষায় আপত্তি করেন। যেহেতু তাহা হইলে স্ত্রীলোকের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়। শুনিয়াছি করটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুমা জমরদন্নেসা খানম সাহেবা নাকি বলিয়াছিলেন, 'এখন মসি হাতে কলম; একবার জানানার হাতে কলম দিয়া দেখ।' ইংরাজি প্রবচন বলে : 'pen is mightier than sword'.

জামাতা ছিলেন, আর যাঁহার সম্বন্ধে পয়গম্বর সাহেব বলিয়াছেন যে, আমি জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ।' মুসলমানদের মধ্যে হজরত আলীই প্রথমে বিদ্যা প্রচার আরম্ভ করে। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হজরত আলীর যে সকল বচন আছে তাহা পাঠের উপযুক্ত। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধর্ম বক্তৃতা (খুতবা) পাঠ করিতেন।

বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে হজরত আলীর রচনাবলি হইতে কয়েকটি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

'অন্তর আলোকিত করিবার জন্য সুশিক্ষা উজ্জ্বল রত্ন; সত্য তাহার (বিদ্যার) লক্ষ্য, ঈশ্বরতত্ত্ব (এলহাম) তাহার পথপ্রদর্শক; বুদ্ধি (সুবোধ?) তাহাকে গ্রহণ করে; মানবের ভাষায় বিদ্যার যথোচিত প্রশংসা হইতে পারে না।'

ওদিকে মুসলমানেরা দেশ-সংক্রান্ত কর্তব্যসাধনে মগ্ন ছিলেন, এদিকে হজরত আলী শিষ্যবর্গ শিক্ষাবিস্তার করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা যেখানেই যাইতেন শিক্ষার মশাল সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাহার ফলে এই হইল যে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের শিশুদের হস্তে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রদীপ দেওয়া হইয়াছিল। যেখানে তাঁহারা দেশ জয় করিতেন, সেইখানেই পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ কাহেরা, বাগদাদ, হিসপানিয়া এবং কার্ডাভার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রদর্শন করিতেছি।*

ইংলন্ডের লোকদিগকে মুসলমানেরাই তাহাদের বিস্মৃত বিদ্যার বর্ণমালার পুস্তকাবলি অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ভারতবর্ষের সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অনুবাদ করাইয়াছেন; রসায়ন এবং অঙ্কশাস্ত্রের পুস্তকাবলি রচনা করিয়াছেন।

জনৈক পোপ (দ্বিতীয় মিসলউটিয়র) যিনি খ্রিস্টীয় ধর্মের অতি উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও গুরু ছিলেন, তিনি মুসলমানদেরই কর্ডোভা মাদ্রাসায় অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে লোকে তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া জনসমাজে অপদস্থ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে 'শয়তানের বাচ্চা' বলিয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, সে-সময় ইউরোপের খ্রিস্টীয় বিভাগ কেমন ঘোর মূর্খতায় তমসাচ্ছন্ন ছিল, আর কেবল ইসলামের অনুবর্তীগণই তাঁহাদিগকে (ইউরোপীয়দিগকে) জ্ঞানের আলোকরশ্মি দেখাইতেছিলেন।

মুসলমানেরা শিল্প এবং আবিষ্কারেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাঁহারাই নির্মাণ করেন; পৃথিবীর দৈর্ঘ-প্রস্থের পরিমাণ তাঁহারাই স্থির করেন। গ্রিকদের নিকট হইতে তাঁহারা অঙ্কবিদ্যা লাভ করেন; সঙ্গীত ও কৃষিবিদ্যাকে তাঁহারা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পর্যন্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বরং ধর্মের দর্শনতত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া 'ফানাফিল্লাহ'র গূঢ় তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, আল্লাহ অদ্বিতীয় এবং সমুদয় মানবজাতি একজাতীয় (মানবের মধ্যে জাতিভেদ নাই)। আর এই বিধান তাহারা অতি মনোরম ভাষায় বুঝাইয়াছেন।

* আমাদের সদাশয় বৃটিশপ্রভুরা দাবি করেন যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন বলিয়াই আমরা (বর্বরেরা) শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছি। আর আমরাও নত-মস্তকে স্বীকার করিয়া বলি যে,—'ইয়ে হয় আহলে মগরেবকে বরকৎ কদমকি' (ইহা পশ্চিম দেশবাসীদিগের শ্রীচরণের প্রসাদ)। কিন্তু মিসেস বেশান্ত তো বলেন যে, শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে মুসলমানেরাই ইউরোপের শিক্ষাগুরু।

হে হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা যদি ঐ শাস্ত্রবিধানসমূহের বিষয় চিন্তা করেন আপনারা উহাকে প্রকৃত (আসল) বেদান্ত স্বরূপ পাইবেন; মুসলমানদের মধ্যে ছয়শত বৎসর পর্যন্ত শিক্ষা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। অদ্য যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ নিজেদের ঐ সকল জগন্মান্য পূর্বপুরুষদের রচিত শিক্ষা-সংক্রান্ত পুস্তকাবলি আধুনিক প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়েন এবং সর্বসাধারণে ঐ শিক্ষা প্রচার করেন, তবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহারা ইসলাম দর্শনকে সমস্ত জগতের শীর্ষস্থানে তুলিতে সক্ষম হইবেন। আর ইসলামের আবালবৃদ্ধবণিতা (কচি কচি শিশুগণ)-ও ইসলামি দর্শন কণ্ঠস্থ করিতে পারিবে (যেমন হিন্দুগণ এখন আপন বেদান্ত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন)। আপনারা ভাবিয়া দেখিতে পারেন যে, তাঁহারা ইসলামের প্রকৃত গৌরব সৃষ্টিজগৎকে দেখাইবার জন্য কিরূপে ধর্মের সেবা করিয়াছেন।

হজরত মোহাম্মদ, হজরত ঈসা, মুসা, মহর্ষি বুদ্ধদেব—সকলে একই অট্টালিকায় আছেন। তাঁহারা এক জাতি হইতে অন্য জাতিকে ভিন্ন মনে করেন না। আর আমরা যে তাঁহাদের সামান্য শিষ্য, তাঁহাদের শিশুসন্তান—আমাদের উচিত যে, তাঁহাদের বিশ্বপ্রেমের সারতত্ত্ব লাভ করি। প্রেম দ্বারাই তাঁহারা আমাদের নিকটবর্তী হন। পয়গম্বর মোহাম্মদ সাহেব স্বেচ্ছায় শিষ্যের নিকটবর্তী হন না, যে পর্যন্ত শিষ্য মনের কঠোরতা দূর না করে এবং তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার না হয়।

হে আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! পয়গম্বর সাহেব আপনাদের সেইরূপ আমাদেরও আপন। যত পয়গম্বর মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের উপরই আমাদের দাবি (হক) আছে। আমরা তাঁহাদিগকে ভালোবাসি, তাঁহাদের সম্মান করি এবং তাঁহাদের সম্মুখে অতি নম্রভাবে ভক্তিসহকারে মস্তক অবনত করি।

খোদার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনি সকলেরই আল্লাহ;—তিনি আমাদিগকে এইরূপ বুঝিবার শক্তি দান করুন যে তাঁহার নামের জন্য যেন আমরা পরস্পরের ঝগড়া না করি—আমাদের শিশুসুলভ দুর্বল অধরে যে নামই উচ্চারিত হইক না কেন--কিন্তু তিনিই তো অদ্বিতীয় এবং সকলেরই উদ্দেশ্য (উপাস্য) একমাত্র তিনিই।*

---

* এই সকল বিষয়ের সহিত আমাদের মতানৈক্য নাই। মিসেস এ্যানি বেশান্ত মহোদয়া থিওসোফির একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক ও শিক্ষাগুরু। তিনি নিজের শিক্ষা ও ধর্মের দিক দিয়া এসলামের সমালোচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সব কথার সহিত আমাদের মতের মিল থাকিতে পারে না। ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এখনও বহুস্থলে অপ্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা যদি যথাযথভাবে ঐ স্বরূপটি জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি, তাহা হইলে প্রত্যেক ন্যায়দর্শী ও সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয়ই তাহার নিকট আত্মদান করিতে বাধ্য হইবে।

আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত ধর্মপ্রচারক যাহারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, মুসলমান মাত্রেরই মান্য ও নমস্য। তাঁহাদিগের উপর বিশ্বাস না করিলে কেহ মুসলমানই হইতে পারে না। আর আমাদের ধর্মশাস্ত্রে যে সকল পয়গম্বরের নামোল্লেখ হইয়াছে তাহা বাদে আরও অনেক পয়গম্বর আছেন, যাঁহাদের নাম হজরত মোহাম্মদ (দ.)-কে জ্ঞাত করা হয় নাই। অধিকন্তু প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির নিকট প্রেরিত পুরুষগণ আসিয়াছেন ও স্বর্গের বাণী শুনাইয়াছেন, এই সমস্ত কথার প্রত্যেকটি কোরআন শরিফের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা মিসেস মহোদয়ার মন্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছি।

(আল-এসলাম সম্পাদক)

সৌরজগৎ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারসিয়ঙ্গ পর্বতের দ্বিতল গৃহে অপরাহ্নে গওহর আলী স্ত্রী ও কন্যাদলে পরিবেষ্টিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়াছেন। তাঁহার নয়টি কন্যা যে-যেভাবে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, তাহা দেখিয়া স্বতঃই এ পরিবারটিকে সুখী ও সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে হয়। সর্বকনিষ্ঠা দুহিতা মাসুমা তাহার সর্বজ্যেষ্ঠা সহোদরা কওসরের ক্রোড়ে এবং অবশিষ্ট শিশুগুলি পিতামাতার দুই পার্শ্বে ছোট ছোট পাদপীঠে বসিয়াছে।

এইরূপে ভাগ্যবান গওহর আলী তারকাবেষ্টিত সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

কওসর পিতামহের অতি আদরের পৌত্রী। তিনি সাধ করিয়া ইহার নাম 'কওসর' রাখিয়াছেন। কওসর শব্দের অর্থ স্বর্গীয় জলাশয়, যেমন মন্দাকিনী।*

যে কক্ষে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছেন, সেটি কতক মুসলমানি ও কতক ইংরেজি ধরনে সজ্জিত; নবাবি ও বিলাতি ধরনের সংমিশ্রণে ঘরখানি মানাইয়াছে বেশ। ত্রিপদীর (টিপায়ের) উপর একটি ট্রেতে কিছু জলখাবার এবং চা-দুগ্ধ ইত্যাদি যেন কাহার অপেক্ষায় রাখা হইয়াছে।

গওহর আলীর হস্তে একখানি পুস্তক; তিনি তাহা পাঠ করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের আলোচ্য-বিষয় ছিল বায়ু। বায়ুর শৈত্য, উষ্ণতা, লঘুত্ব, গুরুত্ব, বায়ুতে কয় প্রকার গ্যাস আছে; কিরূপে বায়ু ক্রমান্বয়ে বাষ্প, মেঘ, সলিল এবং শীতল তুষারে পরিণত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রোতৃবর্গ বেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছে; কেবল সপ্তমা দুহিতা সুরেয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পিতার ধৈর্যগুণ পরীক্ষা করিতেছে। কখনও ছবি দেখিবার জন্য পিতার হস্ত হইতে পুস্তক কাড়িয়া লইতেছে। পিতা কিন্তু ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমোদ বোধ করিয়া হাসিতেছেন।

গৃহিণী নূরজাহাঁ একবার ঐ ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'ভাই এখনও আসিলেন না; চা তো ঠাণ্ডা হইতে চলিল।'

গওহর। তোমার ভাই হয়তো পথে লেপচাদরের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

বালিকা রাবেয়া বলিল, 'আমরা তাঁহাকে দ্বিতীয় বেঞ্চের নিকটা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এইটুকু পথ তিনি এখনও আসিতে পারিলেন না?'

সুরেয়া। বাব্বা! বেন্ কি অল্প পথ? আমি তো হাঁটিতে না পারিয়া আয়ার কোলে চড়িয়া আসিলাম।

রাবেয়া! ঈশ! আমি একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ হইতে এখানে আসিতে পারি।

গওহরও কন্যাদের কথোপকথনে যোগ দিয়া বলিলেন, 'আগে একদৌড়ে আসিতে পারিয়া দেখাও, পরে বড়াই করিও। কোনো কাজ করিতে পারার পূর্বে 'পারি' বলা উচিত নহে!'

---

* বালিকাদের নাম ও বয়স জানিয়া রাখিলে পাঠিকার বেশ সুবিধা হইবে। কওসরের ১৮, আখতরের ১৬, বদরের ১৪, রাবেয়ার ১২, মুশতরীর ১০, জোহরার ৮, সুরেয়ার ৬, নয়িমার ৪ এবং মাসুমার বয়স ২ বৎসর।

কওসর। এখান হইতে দ্বিতীয় বেঞ্চ প্রায় দুই মাইল হইবে, না আব্বা?

গও। কিছু বেশি হইবে। যাহা হউক, রাবু যখন বলিয়াছে, তখন তাহাকে একবার একদৌড়ে সে পর্যন্ত যাইতেই হইবে!

আখতর! রাবু একদৌড়ে যাইবে, না পথে বিশ্রাম করিবে, তাহা জানিবার উপায় কী?

গও। (বিস্ফারিত নেত্রে) জানিবার উপায়? রাবু যতদূর পর্যন্ত গিয়া ক্লান্তি বোধ করিবে, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিবে। সে নিজেই বলিবে, সে কতদূর গিয়াছিল। আমার কন্যা কি মিথ্যা বলিবে?

রাবু। (সোৎসাহে) না আব্বা! আমি মিথ্যা বলি না—বলিবও না।

আখু। আমি বেশ জানি, তুমি মিথ্যা বল না; তবে যদি মিথ্যা বাহাদুরির লোভে একটি ছোট মিথ্যা বলিয়া ফেলিতে!

রাবু। (সগর্বে) মিথ্যা বলার পূর্বে মরিয়া যাওয়া ভালো!

গও। ঠিক! তোমরা কেহ একটি মিথ্যা বলিলে আমার মর্মে বড়ই ব্যথা লাগিবে আশা করি, তোমরা কেহ আমাকে কখন এরূপ কষ্ট দিবে না।

কতিপয় বালিকা সমস্বরে বলিয়া উঠিল : —'আমরা মিথ্যা না',—'আমরা কষ্ট না' অথবা কী বলিল ঠিক শুনা গেল না!

এমন সময় সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। কওসর ও মাসুমা ব্যতীত অপর বালিকা কয়টি 'মাম্মা আসিলেন' বলিয়া পলায়নতৎপরা হইল। গওহর নয়িমাকে ধরিয়া বলিলেন, 'সেজন্য পলাইস কেন মা?'

নয়িমা। ও বাব্বা! আমি না—মাম্মা! (অর্থাৎ আমি থাকিব না—মাম্মা বকিবেন)।

ইতঃমধ্যে জাফর আলী গৃহে প্রবেশ করিলেন। পলায়নামানা বালিকাদের দেখিয়া তিনি গওহরকে সহাস্যে বলিলেন, Solar system (সৌরজগৎ)টা ভাঙিয়া গেল কেন?'*

গও। তুমি 'ধূমকেতু' আসিলে যে!

নূরজাহাঁ ভ্রাতার নিমিত্ত চা প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হইয়া গওহরকে বলিলেন, 'তুমি একটু সর, ভাইকে অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিতে দাও।'

জাফর। না, আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিব না। যে ক্লান্ত হইয়াছি, আমার সর্বাঙ্গ ঘর্মসিক্ত হইয়াছে। আমি এইখানেই বসি।

কওসের জলখাবারের ট্রেটা আনিয়া জাফরের সম্মুখে রাখিল, এবং তাঁহার ললাটে ঘর্মবিন্দু দেখিয়া স্বীয় বসনাঞ্চলে মুছিয়া দিল।

জাফর এক পেয়ালা চা শেষ করিয়া ভগিনীর হস্তে পেয়ালা দিয়া বলিলেন, 'নূরু আর এক পেয়ালা চা দে!'

গও। তোমার ভুল হইল। পেয়ালাটি লইবার জন্য তাঁহাকে এতদূর আসিতে হইল, ইহা অন্যায়! তুমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে পেয়ালা দিতে পারিতে।

নূরজাহাঁ অধোমুখে মৃদুহাস্য করিলেন। কওসরের খুব জোরে হাসি পাইল বলিয়া সে প্রস্থান করিল, এবং মাতার সাহায্যের নিমিত্ত বদরকে তথায় পাঠাইয়া দিল।

জাফ। দেখ ভাই! তোমার সাহেবিটা আমার সহ্য হয় না। তুমিই কি একমাত্র

* গুরুজনের কথোপকথনে দুই-একটি ইংরেজি শব্দের ব্যবহার পাঠিকারা ক্ষমা করিবেন। ব্রাকেটের ভিতর শব্দগুলির অনুবাদ দেওয়া গেল।

বিলাত-ফেরতা?

গও। না, তুমিও বিলাত-ফেরতা! তোমার গালি শুনিয়া আমোদ হয়, সেইজন্য সাহেবিভূতের দোহাই দিই! সে যাহা হউক, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? পথে পাহাড়িদের সহিত গল্প করিতেছিলে না কি?

জাফ। ভুটিয়াদের সহিব গল্প করিব কী, উহাদের ভাষাই বুঝি না; যে ছাই 'কানছু যানছু' বলে!

বদর তাহার পাহাড়ি ভাষার অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বলিল, 'যানছু মানে যাওয়া'।

নূরজাহাঁ তাহাকে বলিলেন, ইহাদের গল্পে যোগ দিয়া তোমার কাজ নাই মা! যাও তুমি কওসরের নিকট।'

গও। তবে কেন বিলম্ব হইল?

জাফ। প্রথম বেঞ্চে বলিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম তথা হইতে সমস্ত কারসিয়ঙ্গ শহরটা তো বেশ দেখা যায়। বাজার স্টেশন, কিছুই বাদ পড়ে না।

নূরজাহাঁ। হ্যাঁ ঐখানে বসিলে ধরাখানা সরাতুল্য বোধ হয়।

গও। আর যেদিন ইঁহারা পদব্রজে 'চিমনি সাইড'* পর্যন্ত আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেদিনই ইহাদের যে আনন্দ হইয়াছিল—সম্ভবত পোর্ট আর্থার এবং বালকটি ফ্লিট জয় করিয়াও জাপানিদের তত উল্লাস হয় নাই!!

নূর। জাপানিরা তত উল্লাসিত হইবে কিরূপে? তাহাদের কার্য এখনও যে শেষ হয় নাই। আর আমরা তো পদব্রজে ১২ মাইল ভ্রমণের পর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছিলাম!

জাফ। এখন বাকি আছে শ্রীমতীদের বেলুন আরোহন করা!

গও। সময়ে তাহাও বাকি থাকিবে না!

জাফ। তুমি সপরিবারে ইংলন্ড যাইবে কবে?

গও। যখন সুবিধা হইবে!

জাফ। হুঁ—কন্যাগুলি অক্‌স্‌ফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া এক-একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হইবে! সাধে কি তোমাদের সৌরজগৎ বলি? তোমার দুহিতা-কয়টি গ্রহ, আর তুমি সূর্য! উহাদের নামও তো এক-একটি তারকার নাম—মুশতরি, জোহরা, সুরেয়া!** তবে কেবল মঙ্গল, বুধ, শনি এ নামগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে কেন?

নূর। ভাই! তোমরা নিজেরা ঝগড়া করিতে বসিয়া মেয়েদের নাম লইয়া বিদ্রূপ কর কেন? আর এ নামও তো আমরা রাখি নাই, স্বয়ং কর্তা রাখিয়াছেন। তাঁহার পৌত্রীদের নাম, তিনি যেরূপ ইচ্ছা রাখিবেন, তাহাতে আমাদের কিছু বলিকার অধিকার কী?

জাফরকে আরও অধিক খেপাইবার জন্য গওহর বলিলেন, 'কেবল ইংলন্ড কেন, আমেরিকা যাইবারও ইচ্ছা আছে,—কওসর 'নায়েগারা ফলস্' দেখিতে চাহে।'

জাফ। তোমার এ সাধ অপূর্ণ থাকিবে। কওসরকে আর 'নায়োগারা' প্রপাত দেখাইতে হইবে না।

গও। কেন?

জাফ। আগামী বৎসর সে তোমার ক্ষমতার বাহির হইবে।

---

* চিমনি সাইড, স্থান বিশেষ; তথায় চায়ের কারখানায় এক প্রকাণ্ড চিমনি নির্মিত হইয়াছিল। সাধারণের বিশ্বাস সেই চিমনির নিকটবর্তী স্থানই কারসিয়ঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান।

** অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও কৃত্তিকা নক্ষত্র।

গও। আমার হাতের বাহির হইলেই বা কী, জামাতাসহ যাইব।

জাফ। জামাতা তোমারই মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ হইলে তো?

গও। তুমি তাঁহাকে অধিক জানো, না আমি?

জাফ। আমি সিদ্দিককে যতদূর জানি, তাহাতে আশা রাখি তিনি তোমার মতো Forward (অগ্রগামী) নহেন।

গও। আমিও আশা রাখি তোমার মতো backward (পশ্চাদগামী) নহেন। তিনি নিশ্চয়ই কওসরকে নায়োগারা প্রপাত দেখাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'মাম্মা আব্বার সহিত তর্জন-গর্জন করিতেছেন, চল আমরা শুনি গিয়া' এই বলিয়া বদর আখতারকে টানিতে লাগিল।

আখতর। আমরা সেখানে গেলে মাম্মা গর্জন ছাড়িয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিবেন।

বদর। আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইব না—পার্শ্বের ঘরে লুকাইয়া শুনিব।

কওসর। ছি বদু! লুকাইয়া কিছু শুনা উচিত নহে; সাবধান।

বদর। (ব্যগ্রভাবে) তবে আমি যে দুই-একটি কথা শুনিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপায় কী?

কও। যাহা হইবার হইয়াছে। আর কখনো এরূপ দোষ করিও না।

আখ। মাসুমা তো ঘুমাইয়াছে। যাও নয়িমু! তুমিও ঘুমাও গিয়া।

নয়িমা। না, আমি ধুম্‌না।—*

আখ। তবে আমি আর তোমায় কোলে রাখিব না!

কও। চল এখন আমরা পড়াশুনা করি গিয়া। যাও তো বোন মুশতরী, তুমি দেখিয়া আইস, আমাদের পড়িবার ঘরে অগ্নিকুণ্ডে কয়লা, আগুন—সব ঠিক আছে কি না।

জোহরা। আমরা ডাউহিল স্কুলে পড়িতে গেলে খুব ছুটি পাইব, না?

আখ। আরে! আগে যা তো ডাউহিল স্কুলে, তারপর ছুটি লইস!

বদর। আগে পাগলা ঝোরার** জলে ভালো করিয়া মুখখানা ধো!

রাবু। কেন আপা। আমাদের স্কুলে যাওয়া হইবে না কেন? তোমরাই তিনজনে যাইবে না—তোমরা বড় হইয়াছে। আমরা কেন যাইব না?

কও। ওরে, মাম্মা যাইতে দিলে হয়!

রাবু। মাম্মাটা ভালো লোক নহেন,—তাঁহার চক্ষু দেখিলে আমার যে ভয় হয়! এখন তিনি আসিয়াছেন, কেবল আমাদের স্কুলে যাওয়ায় বাধা দিতে!

সুরেয়া। আমি তো স্কুলে যাইবই—

জোহ। হাঁ, তুই একাই যাইবি—তুই বড় সোহাগের মেয়ে কি না!

বদ। রাবু। তোরা পাগলা ঝোরার সুশীতল নির্মল জলে বেশ ভালো করিয়া মুখ ধুইস! আমরা তিনজন টেকনিকাল স্কুলে ভরতি হইব।

---

* তিন চারি বৎসরের শিশুরা প্রায় ক-বর্গ স্থলে ত-বর্গ উচ্চারণ করে। গল্পের স্বাভাবিক ভাব রক্ষার্থে আমরাও নয়িমার ভাষায় ত-বর্গ ব্যবহার করিলাম।

** পাগলা ঝোরা কারসিয়ঙ্গের বৃহত্তম ঝরনা।

রাবু। তোমাদের মাম্মা বাধা দিলেন না?

কও। বাধা দিয়াছিলেন; এখন রাজি হইয়াছেন।

জোহ। আপা! সেখানে কেবল 'নান' আছে, নানা, নাই?

বদ। না, সে স্কুলে 'নানা' নাই—শব্দের পুংলিঙ্গ বুঝিতে হইবে। দুষ্টু বালিকারা সেন্ট হেলেনস টেকনিকাল স্কুলের নানদিগকে 'নানি' বলে। তা তাহাদের সাথ বুন মাফ! এই স্কুলে বালিকাদিগকে রন্ধন, সূচিকর্ম ও নানাপ্রকার বুনন গাঁথন (যাবতীয় ফ্যানসি ওয়ার্ক) শিক্ষা দেওয়া হয়।

জোহরা সাদরে আখতরের হাত ধরিয়া বলিল, 'আপা। তুমি আমার পুতুলের জন্য খুব সুন্দর শাল তৈয়ার করিয়া দিও।'

সুরেয়া কওসরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, 'আর তুমি অনেক মিঠাই তৈয়ার করিও।'

রাবু। হ্যাঁ, তাহা হইলে তুমি খুব মিঠাই খাও! (সকলের হাস্য)

মুশতরী আসিয়া জানাইল পাঠগৃহে সব প্রস্তুত। অতঃপর সকলে সেই কক্ষে গেল।

কওসর শিক্ষয়িত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে সকলকে সম্বোধন করত বলিল, 'আব্বা যে সন্ধ্যার সময় আমাদিগকে বায়ুর বিষয় বলিলেন, তাঁহার কোন্ কথা তোমরা কে বুঝিতে পার নাই? যে না-বুঝিয়া থাক, আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি বুঝাইয়া বলি।'

মুশ। আব্বা হাওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রধনুর বিষয় তো কিছু বলেন নাই। আমি কালি তাঁহাকে ইন্দ্রধনুর কথা জিজ্ঞাসা করিব।

জোহ। আমি আব্বাকে বলিব, আমায় একটা ইন্দ্রধনু আনিয়া দিতে।

সুরে। আমিও ইন্দ্রধনু লইব।

বয়োজ্যেষ্ঠারা হাসিল। মুশতরী বলিল, 'ওরে, ইন্দ্রধনু কি ধরা যায়?'

রাবু। ইন্দ্রধনু ধরা যায় না সত্য—কিন্তু যে উপায়ে বায়ু ধরিয়া কাচের নলে বন্ধ করা যায়, পরীক্ষা করা যায়, সেইরূপে ইন্দ্রধনুকে ধরাও অসম্ভব নহে।

কও। এ অকাট্য যুক্তি। (সকলের হাস্য)

রাবু। কেন, মন্দটা কী বলিলাম?

আখ। না রাবু! কিছু মন্দ বল নাই। টেলিফোন, গ্রামোফোন, ফনোগ্রাফ ইত্যাদিতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধরা গিয়াছে ও ধরা যায়, তবে ইন্দ্রধনু ধরা আর শক্তটা কি?

আবার হাসির গররা উঠিল।

কও। চুপ। চুপ। মাম্মা শুনিলে বলিবেন—'এইরূপে বুঝি পড়া হইতেছে?'

মুশ! (কষ্টে হাস্য সংবরণ) আব্বা তো আমরা হাসিলে কিছু বলেন না?

রাবু। না, বরং তিনিও হাসেন।

বদ। তোরা আর এক কথা শুনিয়াছিস? জাহেদ ভাই ও হুরন বুবুকে মাম্মা প্রহার করিয়া থাকেন!

জোহ। সত্য নাকি? বাবা! তবে আর আমি মাম্মার বাড়ি যাইব না। যখন নিজের ছেলে-মেয়েকে মারেন, তখন আমাদের তো আরও মারিবেন।

সুরে। আব্বা তো আমাদের কখনো মারেন না।

রাবু। আমাদের আব্বা ভালো, মাও ভালো, কেবল মাম্মাটি ভালো নহেন।

বদ। দাঁড়া। আমি মাম্মাকে বলিয়া দিব!

আখ। রাবু তাহার মুখের উপর বলিতে ভয় করে?

কওসর। ব্যস! এখন চুপ কর!

বদ। বায়ুর বিষয় ভালোরূপ বুঝিলাম কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন কর না, বড় মুশ,

কও। আমি কাল দিনের বেলায় মেঘমালা দেখিয়া ও দেখাইয়া প্রশ্ন করি, তোমরা এখন আমাকে প্রশ্ন করিয়া ভালো করিয়া বুঝিয়া লও।

রাবু। আমি কাল পোটাশিয়াম জলে ফেলিয়া তামাশা দেখিব।

মুশ। পোটাশিয়াম জলে ফেলিলে কী তামাশা হইবে?

বদ। কেন তোমার মনে নাই?—উহা জলে ফেলিবামাত্র আগুন জ্বলিয়া উঠিবে!

মুশ। হাঁ, মনে পড়িল। আমি খেলা করিব, সোডিয়াম ও গরমজল লইয়া।

নয়িমা। (নিদ্রাবেশে চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে) আল আমি? আমি তি খেলিব?

আখ। (সহাস্যে) তোমার এখন 'খেলিয়া' কাজ নাই! চল, তোমায় শয্যায় রাখিয়া আসি।

রাবু। মুশতরী! তোমার আগুন অপেক্ষা আমার আগুনের রঙ বেশি সুন্দর হইবে।

মুশ। কেন? সোডিয়াম গরম জলে ফেলিলে বেশি সুন্দর হলদে রঙের আগুন বাহির হইবে।

কও। তোমরা ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই জানো না? রাবুই বড় দুষ্ট—ওই ঝগড়া আরম্ভ করে।

রাবু। ক্ষমা কর, বড়আপা! এখন কাজের কথা বলি। আমরা যে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার তুষার দেখি, উহাও কি পূর্ব অবস্থায় বায়ু ছিল?

কও। হাঁ; এবং এখন আবার উপযুক্ত উত্তাপে বাষ্পীভূত হইতে পারে।

রাবু। তবে সূর্যোত্তাপে গলিয়া যায় না কেন?

কও। গলে বইকি! ঐ বরফ অল্প উত্তাপে স্থানভ্রষ্ট হইয়া নদীর মতো বহিয়া যায়; তাহাকে ইংরাজি 'গ্লেসিয়ার' বলে। আব্বা উহার নাম দিয়াছেন 'নীহারনদী।'

রাবু। বাহ্! বরফের নদীতে বড় সুন্দর দেখাইবে। চল আমরা একদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার নিকট নীহারনদী দেখিয়া আসি।

বদ। বটে? কাঞ্চনজঙ্ঘা বুঝি খুব নিকটে?

রাবু। নিকট না হউক, আমরা কি পথ চলিতে ভয় করি? একদিন চিমনি সাইডে উঠিয়াছিলাম—তাহা কি অল্প পথ ছিল? পাঁচ-ছয় মাইল আরোহণ ও অবতরণ কি সামান্য ব্যাপার? আবার সেদিন ডাউহিল ও ঈগলস ক্রেগের সন্ধিস্থলে নামিয়াছিলাম।

বদ। ডাউহিলের সন্ধিস্থলে অবতরণ করিয়া কেমন ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মনে নাই?

কও। রাবু তো বলিয়াছিল, আমি আর হাঁটতে পারি না; আমাকে ফেলিয়া যাও! আমায় ভল্লুকে খায় খাইবে।

রাবু। ডান্ডিটা* সময়ে না পাওয়া গেলে আসিতেই পারিতাম না।

কও। আব্বাই ডান্ডির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, অর্ধপথে বদু ও রাবুর বীরত্ব প্রকাশ পাইবে।

বদ। আমি তো ভাই রাবুর মতো অহঙ্কার করি না যে, কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত পদব্রজে যাইতে পারিব, একদৌড়ে দ্বিতীয় বেঞ্চ অতিক্রম করিব। হাঁ, ভালো কথা! আমি যে সেই ঈগলস ক্রেগের সন্ধিস্থলের বিজন অরণ্য হইতে ফুল আনিয়াছিলাম, তাহা

* ডান্ডি : বাহন বিশেষ; ইহা শিবিকার ন্যায় মানুষের স্কন্ধে বাহিত হয়।

কোথায় রাখিয়াছি? মনে তো পড়ে না।
কও। ফুলগুলি বনে ফিরিয়া গিয়া থাকিবে।
বদ। তবে তুমি তুলিয়া রাখিয়াছ। আর ভাবনা নাই।
কও। তোমার ফুল কিরূপ ছিল? আমার সংগৃহীত কুসুমরাজি হইতে তাহা বাছিয়া লইতে পার?
বদ। বেশ পারি—সে ফুল বকুলফুলের মতো; গন্ধ ও আকৃতি বকুলের, কেবল বর্ণ স্বতন্ত্র।
বাবু। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর ক্রেপের ওড়নার মতো পাতলা মেঘের গাঢ়-পেলাপি বেগুনি চাদর দেখিতে পাই, তাহা কোথা হইতে আইসে?
কও। সূর্যের উত্তাপে ঐ জমাট তুষার হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহাই মেঘের ওড়নারূপে কাঞ্চনের চূড়া বেষ্টন করিয়া থাকে।
আখ। আমি ভাবিয়াছিলাম, কাঞ্চনের ওড়নাগুলি বানারস হইতে আইসে।
সুরেয়া ধীরে ধীরে কওসরের নিকট আসিয়া বলিল, 'বড়আপা! আমাকে ইন্দ্রধনু দিবে না?'
কও। (সুরেয়ার মুখ চুম্বন করিয়া) আমি কাল তোমায় ইন্দ্রধনু দিব।
বদ। সে কি! তুমি ইন্দ্রধনু ধরিবে কেমন করিয়া?
কও। ঝাড়ের কলমে (ত্রিকোণ কাচখণ্ডে) ইন্দ্রধনু দেখা যায় তা জানিস না?
বদ। তবে তো ইন্দ্রধনু ধরিয়া দেওয়া বড় সহজ। হাঁ হাঁ!
আখ। বড় আপা যে 'কল্পতরু'। তিনি দিতে না পারেন কী?
কও। 'কল্পতরু' নহে—'কল্পলতা' বলিতে পার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নে নূরজাহাঁ চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া জাফর ও গওহরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

মাতার অঞ্চল ধরিয়া মুশতরী বলিল, 'কেন মা, আজি এখন কেন আমরা বেড়াইতে বাহির হইব না?'

নূরজাহাঁ। সকালে তোদের মাম্মা ভিকটোরিয়া স্কুল দেখিতে গিয়াছিলেন, এখন উনি বিশ্রাম করিবেন। তাঁহাকে একা রাখিয়া আমরা কিরূপে যাইব?

জোহরা। কেন? মাম্মা একা থাকিতে ভয় করিবেন না কি? তুমি না যাও, আমরা আব্বার সঙ্গে যাইব।

কর্তা সে কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মুশতরী ও জোহরা তাহাদের দরখাস্ত পেশ করিল। গওহর বলিলেন, 'বেশ চল্—অধিক দূর যাইব না, কেবল ঈগেলস ক্রেগে গিয়া ফিরিয়া আসি।'

জোহ। না, আব্বা! ঈগেলস ক্রেগ না! সে দিকে বড় জোঁক।

মুশ। না, ও জোঁকের ক্রেগে গিয়া কাজ নাই।

গও। ছি! তোরা জোঁক দেখিয়া ভয় করিস? (জাফরের পদশব্দ শুনিয়া) আচ্ছা চুপ কর্! তোদের মাম্মাকেও লইয়া যাইব। তাঁহাকে একা যাইতে বলিয়া আমরা পশ্চাতে থাকিব।

জোহ। (আনন্দে করতালি দিয়া) সে বেশ হইবে! পথে জোঁক ধরিলে তাঁহাকে ধরিবে।

মুশ। চুপ চুপ। মাম্মা!—

ইতঃমধ্যে জাফর আসিয়া চায়ের টেবিলে যোগদান করিলেন।

গও। ভাই! আজ আর একটু বেড়াইবে না?

জাফ। না; আমার পা বড় ব্যথা করিতেছে।

গও। তবু আজ একটু না হাঁটিলে কাল তুমি একেবারে খোঁড়া হইয়া যাইবে নহে—চল এই ঈগেলস ক্রেগ পর্যন্ত।

জাফ। আমি যে বুট পরিতে পারিব না।

গও। বুট পরিবার দরকার কী, স্লিপর লইয়াই চল না? সে তো প্রস্তরসঙ্কুল নহে; ঘাসের উপর চলিবে।

রাবু। (জনান্তিকে) স্লিপর পরিয়া গেলে জোঁক ধরিবার পক্ষে সুবিধা হইবে (বালিকাদের হাস্য)

জাফ। (বালিকাদের প্রতি) ছি! হাসিস কেন? তোরা বড় বেআদব; কেন নূরু, তুই কি একটা ধমক দিতেও পারিস না?

নূরু। দোষ বুঝাইয়া না দিলে ওরা ধমক মানে না।

গও। বিনা দোষে বিনা কারণে ধমক মানিবেই বা কেন? হাসিলে দোষ কী?

জাফ। বাস! গওহর তুমিই মেয়েদের মাথায় তুলিয়াছ।

গও। আচ্ছা, এখন তোমার যাওয়া ঠিক হইল তো?

জাফ। না—পথ কি বড় ঢালু? উপরে উঠিতে হইবে, না নিচে যাইতে হইবে?

গও। পথ তো একটু ঢালু হইবেই—এখানে সমতল স্থান কোথা পাইবে?

জফ। তবে আমি যাইব না—এ প্রকাণ্ড শরীর লইয়া গড়াইতে চাই না।

গও। ছি! তুমি পাথুরে পথকে ভয় কর, ঢালুপথে গড়াইতে চাও না,—ইহা তোমার womanishness (স্ত্রীভাব)!

নূর। 'womanish' শব্দে আমি আপত্তি করি। 'ভীরুতা' 'কাপুরুতা' বল না কেন?

জাফ। পিপীলিকার পক্ষ হইলে শূন্যে উড়ে। স্ত্রীলোকে শিক্ষা পাইলে পুরুষদের কথার প্রতিবাদ করে—সমালোচনা করে। তুমি কি গওহরকে ভাষা শিক্ষা দিবে?

গও। স্ত্রীলোকেরা আমাদের অনুপযুক্ত কথার প্রতিবাদ করেন, আমাদের গল্পে অংশ-গ্রহণ করেন, ইহা তো অতি সুখের বিষয়।

জাফ। তুমি এখনো মূর্খ!—তোমারই পক্ষপাতিত্ব করিয়া নূরুকে ধমক দিলাম, আর তুমি উল্টা আমারই কথার প্রতিবাদ কর?

গও। প্রবলের পক্ষ সমর্থনের আবশ্যকতা নাই। তুমি তোমার ভগিনীর পক্ষপাতিত্ব করিবে, ইহাই স্বাভাবিক এবং সমুচিত।

নূর। তাই আমার মত বা পক্ষ সমর্থন করিবেন কেন? আমি বেচারি তাঁহার কী কাজে লাগি?—আমি কি তাঁহাকে মোকদ্দমায় সৎপরামর্শ দিতে পারি? কি তাঁহার জমিদারি দাঙ্গার সময় পাঁচ-সাত জন লাঠিয়াল পাঠাইয়া সাহায্য করিতে পারি?

গওহর হাসিলেন। জাফর অন্য কথা তুলিলেন :

'সত্যিই নূরু এবার আমার সঙ্গে যাইবে না? আমি ভাবিয়াছিলাম, আগামী বর্ষে যাইতে পারিবে না, তখন কওসরুর বিবাহের ধুমধামে ব্যস্ত থাকিবে। এবার যাইবে

কেন? তুমি গুরুজি এই শিক্ষা দিয়াছ নাকি?'

আবার প্রবলবেগে হাসি পাওয়ায় বালিকাদল পলায়ন করিল।

গও। দোহাই তোমার! আমি কিছু শিক্ষা দিই না। উনি তো প্রতি বৎসর তীর্থদর্শনের ন্যায় তোমার সহিত পিত্রালয়ে যাইতেন। এবার কেন যাইতে অনিচ্ছুক, তুহাকেই জিজ্ঞাসা কর।

জাফ। বল নূরু! কেন যাইবে না?

নূর। আমি রাবুদের ডাউহিল স্কুলে ভরতি করিবার চেষ্টায় আছি।

স্কুল শব্দ শুনিবামাত্র জাফর বিস্ময়ে চমকাইয়া উঠিলন,—কী বলিলে? স্কুলে মেয়ে ভরতি করিবে? এখনও ভারত হইতে মুসলমানের নাম বিলুপ্ত হয় নাই—এখনও মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয় নাই। এখনই মেয়েরা স্কুলে পড়িবে? প্রথম অভিশাপ আমারই ভাগিনেয়ীদের উপর? প্রথম অধঃপতন আমাদেরই?

গও। তুমি ভালোরূপে কথাটা না শুনিয়াই বিলাপ আরম্ভ করিলে? ডাউহিল স্কুলে কেবল বালিকারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সেখানে সাত-আটজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছেন। তথায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তাদৃশ্য বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইলে দোষ কী?

নূর। সে স্কুলে পুরুষ মোটেই নাই। মেথরানি ও আয়াই স্কুলগৃহের যাবতীয় কার্য করে। কেবল বাবুর্চি ও খানসামা পুরুষ। পাচকের সঙ্গে স্কুলগৃহের কোনো সম্বন্ধ নাই। কেবল রন্ধনশালা হইতে খানা বাহিয়া আনে দুই-তিনজন চাকর। প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সহিত আমি কথা ঠিক করিয়াছি যে, ঐ খাদ্যদ্রব্য বাহিবার জন্য যদি আমি উপযুক্ত চাকরানি দিতে পারি, তবে তিনি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া পুরুষ কয়টিকে বরখাস্ত করিবেন। উক্ত শিক্ষয়িত্রীটি অতিশয় ভদ্রলোক—তিনি আমাদের পরদার সম্মান করিয়া থাকেন। সমস্ত স্কুলটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম—কোথাও একটিও চাকর ছিল না।

জাফ। তোমরা বল—আমি শুনি। আর ঐ স্কুলের পার্শ্বেই যে বালকদের স্কুল। ছুটির সময় বালক-বালিকারা একত্রে খেলা করিবে—

গও। বালক স্কুল হইতে বালিকা স্কুলের ব্যবধান এক মাইলেরও অধিক; এমত স্থলে তাহারা একত্রে খেলিবে কিরূপে?

জাফ। যদি তোমার চক্ষে কোনো পীড়া না হইয়া থাকে তবে স্টেশনের নিকট দাঁড়াইলেও দেখিবে—উভয় স্কুলের চূড়া পাশাপাশি।

নূরজাহাঁ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গওহর সহাস্যে বলিলেন, 'তোমার বুদ্ধিমত্তার বলিহারি যাই! আজি তুমি ভিক্টোরিয়া স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছ?'

জাফ। আমি স্কুলের ভিতর যাই নাই।

গও। (সবিস্ময়ে) তবে সকালে তিনঘণ্টা তুমি কোথায় ছিলে?

জাফ। তৃতীয় বেঞ্চে কতকক্ষণ বসিয়াছিলাম। তারপর স্কুল-সীমানায় প্রবেশ করিয়া দেখি, পথ আর ফুরায় না। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, স্কুল পৌঁছিতে আরও ১৫ turn (পেঁচ) বাকি। (অর্থাৎ পথ তো সোজা নহে, আঁকাবাঁকা; তাই আরও ১৫ বার ঘুরিলে স্কুল পাওয়া যাইবে)। তখন আমি ভাবিলাম, আজি আর পথ শেষ হইবে না, তাই ফিরিয়া আসিলাম।

নূরজাহাঁ আবার হাসিলেন। আর গওহর বলিলেন, 'বাস। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। তুমি স্কুলের দ্বারদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, ভিক্টোরিয়া স্কুলই দেখ নাই,

অথচ ডাউহিল স্কুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ! তুমি কি জানো বিদ্যালয় কোথায়? স্কুলগৃহের যে যুগল-চূড়া দেখা যায়, উহা এক ভিক্টোরিয়া স্কুলটি কি তুমি সামান্য গ্রাম্য পাঠশালা মনে করিয়াছ? উহা এক প্রকাণ্ড এবং উহা অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকদের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ প্রায় পাঁচ বিঘা জমি।'

নূর। এবং ডাউহিল স্কুল উহা অপেক্ষাও প্রকাণ্ড। একটি কক্ষে পঞ্চাশটি বালিকার শয্যা দেখিলাম; এবং প্রত্যেক পর্যঙ্ক অপর পর্যঙ্ক হইতে দুই হাত ব্যবধানে আন্দাজ কর তো কক্ষটা কত বড়?

জাফ। অতবড় ঘর এ প্রস্তরসঙ্কুল দেশে নির্মাণ করা কি সহজ না সম্ভব?

নূর। সহজ না হউক, সম্ভব তো। বড় বড় অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে তো। প্রথমে একটা টেনিসকোর্ট দেখিয়া আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল। কতগুলি কঠিন প্রস্তরের মস্তক চূর্ণ করিয়া ঐ সমতল প্রাঙ্গণখানি নির্মিত হইয়াছে, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। কেবল প্রস্তর ভাঙিতে হয় নাই, স্থানবিশেষে জোড়া দিয়া ভরাট করিতে হইয়াছে। অতখানি স্থান যে একেবারে গর্তশূন্য ছিল, তাহা হইতে পারে না। একদিকে মহাশিল্পীর পর্বত-রচনা কৌশল, অপরদিকে তাঁহারই প্রদত্ত মানববুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ—উভয়ের মিশামিশি বড় চমৎকার বোধ হয়।

গও। ভাই! তুমি দিনকতক এখানে থাকো, তাহা হইলে, তুমিও কবি হইতে পারিবে। কবিত্ব-জ্ঞান-রহিত অবলার মরুতুল্য হৃদয়েও যখন কবিত্ব-কুসুম ফুটিতেছে—

জাফ। আমি নূরুর অপেক্ষা কম Prosaic (অকবি) নহি! আমরা উভয় ভ্রাতা-ভগিনীই প্রসিদ্ধ Prosaic!

গও। কিন্তু এখানকার জলবায়ু এমন যে—

'বারেক দর্শন পেলে চিরমূক কথা কয়!
... মহামূর্খ কবি হয়!'

জাফ। কিন্তু তাহাতে লাভ কী? কবিত্বটা মস্তিষ্কের রোগবিশেষ! আমাদের কুলকামিনীরা পাহাড়ে ময়দানে বেড়াইয়া কবি হয়, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে।

গও। তবে কী বাঞ্ছনীয়?

জাফ। বাঞ্ছনীয় এই—তাহারা সুচারুরূপে গৃহস্থালি করে, রাঁধে, বাড়ে, খাওয়ায়, খায়, নিয়মিতরূপে রোজা-নমাজ প্রতিপালন করে।

গও। নমাজ কাহার উদ্দেশে?

জাফ। (আরক্ত লোচনে) কাহার উদ্দেশে?—খোদাতালার উদ্দেশে!

গও। বেশ ভাই ঠিক বলিয়াছ। তুমি অবশ্যই জানো, একটা পরস্য বয়েৎ আছে—'চিত্র দেখিয়া চিত্রকরকে স্মরণ কর।' আর ইনি এখনই মহাশিল্পী বলিয়া কাহার প্রশংসা করিলেন?

জাফ। মহাশিল্পী তো ঈশ্বরকে বলা হইয়াছে।

গও। তবে কবিত্ব ধর্মের বিরোধী হইল কিসে? ঈশ্বরের সৃষ্টি যতই অধিক দেখা যায়, ততই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির বৃদ্ধি হয়। চক্ষু, বর্ণ যথারীতি খাটাইয়া সৃষ্টিজগতের পরিচয় না লইলে স্রষ্টাকে ভালোমতে চিনিবে কিরূপে? পর্বতচূড়ায় দাঁড়াইলে আপনা হইতেই হৃদয়ে ভক্তি-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়;—তখন অজ্ঞাতে হৃদতন্ত্রে বাজিয়া উঠে—

'সই অদ্বিতীয় কবি আঁকিয়া এমন ছবি—
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায়?

জাফ। আমি ভালোমতো বাঙ্গালা বুঝি না।

গও। তবে বল—'জমীচঁমন গুল—'* জাফ। (বাধা দিয়ে) রাখো এখন তোমার কবিতা! কন্যাগুলি নিশ্চয় স্কুলে যাইবে?

গও। নিশ্চয়! কওসর, আখতর ও বদুর স্কুলে পড়িবার সময় গত হইয়াছে সেজন্য বড় আক্ষেপ হয়।

জাফ। তবে নূরজাহাঁনকেও ভর্তি কর!

গও। আমার আপত্তি নাই। ইনি তো বলেন যে, 'শিং কাটাইয়া বাছুরদলে মিশিতে ইচ্ছা হয়।'

জাফ। (সহোদরার প্রতি) মিশিলেই পার! তোমারও একান্ত ইচ্ছা নাকি শ্রীমতীদের খ্রিষ্টান করা?

নূর। মেয়েরা খ্রিষ্টান হইবে কেন? আমি অহঙ্কারের সহিত বলি—আমার মেয়েরা ধর্মভ্রষ্ট হইতে পারে না। ইহারা খাঁটি সোনা—অনলে সলিলে ধ্বংস হইবে না।

গও। আমিও সহঙ্কারে বলি, তোমার স্ত্রীর বিশ্বাস (ঈমান) টলিতে পারে কিন্তু আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অটল!

জাফ। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস অস্থায়ী হইল কিসে?

গও। যেহেতু তিনি আপন ধর্মের কোনো তত্ত্বই অবগত নহেন। কেবল টিয়াপাখির মতো নমাজ পড়েন, কোনো শব্দের অর্থ বুঝেন না। তাঁহাকে যদি তুমি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধা না রাখো, তবে একবার কোনো মিশনরি মেমের সহিত দেখা হইলেই তিনি মনে করিবেন, 'বাহ্! যিশুর কী মহিমা!' সুতরাং সাবধান! যদি পার তো লৌহসিন্দুকে বন্ধ রাখিও।

জাফ। আর নূরু বুঝি নমাজে ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থ জানে?

গও। জানেন কি না পরীক্ষা কর! তুমি কি মনে কর এই কুড়ি বৎসরের বিবাহিত জীবনেও আমি আমার অর্ধাঙ্গীকে আমার ছায়াতুল্যা সহচরী করিয়া তুলিতে পারি নাই?

জাফ। তবে দেখ, নূরু-যে স্কুলে পড়ে নাই সেজন্য কি আটকাইয়াছে? তবে মেয়েগুলোর মাথা খাও কেন?

গও। আমাদের পূর্বপুরুষেরা রেলপথে ভ্রমণ করেন নাই, টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠান নাই, সেজন্য তাঁহাদের কিছু আটকাইয়াছিল কি? তবে আমরা টেলিগ্রাম পাঠাই কেন, রেলগাড়িতে উঠি কেন?

জাফ। আমাদের তো ওসব আবশ্যক হয়।

গও। যাহা আমাদের জন্য আবশ্যক, তাহা আমাদের মহিলাদের জন্যও প্রয়োজন। তাঁহারা আমাদের আবশ্যক অনুযায়ী বস্তুই তো জোগাইয়া থাকে। গ্রাম্য চাষার স্ত্রীরা ঘড়ির কাজ জানে না, আচার মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানে না, কারণ চাষাদের তাহা আবশ্যক হয় না। ইউরোপীয় কামিনীরা পান সাজিতে জানে না; কারণ ইউরোপীয় পুরুষদের তাহা আবশ্যক হয় না। আবার আমাদের কুলবালারা চাষা স্ত্রীদের মতো ধান ঝাড়িতে জানেন না, যেহেতু আমাদের তাহা প্রয়োজন হয় না। ক্রমে আমরা কারি, কাটলেট, পুডিং খাইতে শিখিতেছি, আমাদের গৃহিণীরাও তাহা রাঁধিতে

* অর্থাৎ 'ধরণী-কানন-ফুল' বাকি অংশে তো ... উচ্চারিতই হয় নাই।

শিখিতেছেন। আমাদের ছাড়া তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কই? এবং তাঁহাদের ছাড়া আমাদেরও নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কই? স্কুল-কলেজের শিক্ষা যেমন আমাদের অবশ্যই তদ্রূপ তাঁহাদেরও প্রয়োজন। তোমার পারিবারিক জীবন অপেক্ষা আমার পার্থক্য জীবন অধিক সুখের, ইহা তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে। তোমার সমস্ত সুখ-দুঃখ তোমার স্ত্রী কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

জাফ। তাহা না পারুন; কিন্তু তিনি আমার মতের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন না। আমি যদি দিনকে রাত্রি বলি, তিনিও বলিবেন—'হ্যাঁ, রৌদ্র বড় প্রখর।'

গও। শাবাশ! (সকলের হাস্য)

জাফ। তা না তো কি! স্বামী-স্ত্রীর মত এক না হইলে দিবানিশি রুশ-জাপান যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

গও। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মত এক হইল কই? তুমি যেরূপ বলিলে তাহাতে কেবল তোমারই মত প্রকাশ পায়, তাঁহার তো মতামত জানাই যায় না। তিনি কদাচ নিজ মত ব্যক্ত করেন না। এবার যখন কোনো পশুশালায় যাইবে, অনুগ্রহ করিয়া পশুগুলির সমক্ষে কোনো বিশেষ মত প্রকাশ করিও, আর পশুগুলি উত্তর না দিলে বা মাথা নাড়িলে বুঝিয়া লইও পশুগণ তোমার সহিত একমত হইয়াছে।

জাফ। শুন, আর একটি কাজের কথা বলি; আগামী বৎসর তো কওসরুর বিবাহ, এখন তাহাকে লইয়া তোমরা পাহাড় পর্বতে বেড়াও, বরপক্ষীয় লোকেরা শুনিলে কী বলিবে?

নূর। বরপক্ষের ইহাতে আপত্তি নাই, জানি।

গও। বর তো শিমলাতেই কাজ করেন। আর স্বামীর সহিত স্ত্রী বেড়াইবে, পিতার সহিত কন্যা বেড়াইবে, তাহাতে অন্য লোকের আপত্তি করিবার অধিকার?

জাফ। বেশ, মঙ্গলময় তোমাদের মঙ্গল করুন। বরটিও তোমাদের মনোমতো পাইয়াছ। তাহা হইলে দেখিতেছি আমার নির্বাচিত পাত্রের সহিত আখতারের বিবাহ দিবে না?

গও। না। কওসরের ভাবী দেবরের সহিত আখতরের বিবাহ হইবে।

জাফ। তবে উভয় কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে দাও না কেন?

গও। তাহা হইলে ভালোই হইত কিন্তু সে ছেলেটি এখন বিলাতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ের ক্রোড়াস্থিত টুঙ্গ নামক স্থানে একটি ঝরনার ধারে কয়েক ব্যক্তি বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সর্বাপ্রেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা, সে বলিল—'মেজ আপা! দেখ তো এই ঝরনা কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে আবার কোথায় চলিয়াছে। তুমি বলিতে পার শেষে কোথায় গিয়াছে?'

আখতর। না, রাবু! আমি তো জানি না শেষে কোথায় গিয়াছে। আসিয়াছে পাহাড়ের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া।

রাবু। সামান্য জলধারা পাষাণ বিদীর্ণ করিল কিরূপে? তাহা কি সম্ভব?

কওসর। ঐ জলধারা কেবল পাষাণ বিদীর্ণ করিয়াছে, তাহাই নহে; কত প্রকা

প্রথম খণ্ড উহার চরণতলে গড়াইতে গড়াইতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া বালুকায় পরিণত হইয়াছে।

প্রকাণ্ড প্রস্তর বালুকায় পরিণত হওয়ার কথাটা রাবু সহজে ধারণা করিতে না পারিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্য আব্বা?'

গওহর কথা কহিবার পূর্বে জাফর বলিলেন, 'হ্যাঁ সত্য। তোরা যেমন পিতৃক্রোড়ে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিস, ঐ নির্ঝরগুলি সেইরূপ পাষাণময় পিতৃবক্ষে নৃত্য করিতেছে পিতা তবুও অটল। হিমাদ্রিও ঠিক গওহরেরই মতো সহিষ্ণু। আর শোন, স্টীমার হইতে যে বিশালকায়া জাহ্নবী দেখিয়াছিস, এইরূপ কোনো একটা শিশু-নির্ঝরই তাহার উৎস।'

রাবু। (আনন্দ ও উৎসাহের সহিত) তবে মাম্মা! বলুন তো ইহার কোনটা গঙ্গার উৎস?

জাফ। গঙ্গার উৎস এখানে নাই।

কও। কী ভাবিতেছ আখতর?

আখ। ভাবিতেছি—এই ক্ষীণাঙ্গি ঝরনাগুলি হিমালয়ের হৃদয়ে কেমন গভীর হইতে গভীরময় প্রণালী কাটিয়া কলকলস্বরে স্রষ্টার স্তবগান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—আলস্য ঔদাস্য নাই—অনন্ত অবারিত গতিতে চলিয়াছে!

রাবু। মেজ আপা। আমিও একটি নদীর উৎস আবিষ্কার করিলাম।

আখ। বটে?

কও। কী আবিষ্কার করিয়াছিস বল্ তো?

রাবু। কারসিয়ঙ্গের পাগলা ঝোরাই পাগলা নদীর উৎস!

আখ। দূর পাগলি!

বদর। রাবু কিন্তু কথাটা একবারে অসঙ্গত বলে নাই—ত্রিস্রোতে নদী তো দার্জিলিঙের আশপাশেই—

কও। ধন্য তোমাদের গবেষণায়। বদু তো বেশ পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বদু। যদি গবেষণায় ভুল হইয়া থাকে, তবে ও-কথা থাক; আর এক মজার কথা বলি—বেশ খেয়াল করিয়া দেখ তো, পাহাড়ের বুকের ভিতর দিয়া রেলপথ কেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—একদিকে সুউচ্চ পর্বত, অন্যদিকে নিম্নস্থিত অনুচ্চ পাহাড়ের স্তূপ—একটির পর অপরটি ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো দেখায়! ইহাকে পর্বত-তরঙ্গ বলিলে কেমন হয়?

কও। বেশ ভালো হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের কথা তোমার মনে আছে বোন?

বদু। না দিদি! মনে তো পড়ে না।

রাবু! মাম্মা! আমি ঐ ঝর্নার জল স্পর্শ করি গিয়া?

জাফ। যাবি কিরূপে? অবতরণের পথ যে দুর্গম।

রাবু। আপনি অনুমতি দিন—আমি যেমন করিয়া পারি, যাইব। সেজ আপা! তুমিও যাসিবে?

বদু। না, তুমি একাই যাও।

জাফর অনুমতি দিলেন। রাবু অতিকষ্টে অগ্রসর হইল; শেষে এক প্রকাণ্ড প্রস্তর তাহার গতিরোধ করিল। সেটি অতিক্রম না করিলে জলস্পর্শ করা হইবে না। উপর হইতে কওসর শাসাইল, 'দেখিস কাপড় ভিজে না যেন।' প্রায় হামাগুড়ি দিয়া অতি

সাবধানে রাবু সে প্রস্তর অতিক্রম করিল। শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে বদুর একটু হিংসা হইল। সে রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া বলিল, রাব্বু! স্বর্গে পঁহুছিয়াছিস যে? তোর আনন্দের সীমা নাই। তুই তবে থাক এখানে আমরা চলিলাম।

নূরজাহাঁও ডাকিলেন, 'আয় মা! বেলা যায়।'

সকলে আরও কতকদূর অগ্রসর হইলেন। ইহারা টুঙ্গ হইতে পদব্রজে কারসিয়াং চলিয়াছেন।

পথে দুই-তিনজন পাহাড়ি তাহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া একদিকে দাঁড়াইল।

গওহর জাফরকে বলিলেন, 'দেখিলে ভাই, ইহাদের শিভালরি (অবলার প্রতি সদয় প্রদর্শন)?'

জাফ। ইহা উহাদের অভ্যাস, অনেক সময় স্ত্রীলোকেরাও আমাকে সুপথ ছাড়িয়া দিয়া পথিপার্শ্বে দাঁড়ায়।

নূর। যেহেতু তাহারা 'নিচে কা আদমি'কে দুর্বল মনে করে।

জাফ। আমি কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট দুর্বলতা স্বীকার করি না।

গও। যে সকল, তাহার নিকট দুর্বলতা স্বীকার করায় দোষ কী?

জাফ। যাহাই হউক, স্ত্রীলোককে আমি কায়িক বলের শ্রেষ্ঠতা দিব না।

গও। কেন দিবে না? 'Give the devil even his due' (শয়তানকেও তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দান কর)

জাফ। কিন্তু আমি রমণীকে তাহার প্রাপ্য স্বত্ব দিতে অক্ষম।

গও। তবে একবার শর্টকাট পথে কোনো পাহাড়িনীর সহিত (বাজি) দৌড়াইতে চেষ্টা কর দেখি!

জাফ। শটকার্টে? তাহা মানুষের অগম্য!

নূর। তবে ঐ দুর্গম পথে যাহারা পৃষ্ঠে দুইমণ বোঝাসহ অবলীলাক্রমে আরোহণ করে, তাহাদের নিকট দুর্বল বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ কর কেন?

এস্থলে পার্বত্য শটকার্ট পথের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রস্তরসঙ্কুল গড়ানিয়া খাড়া সংক্ষিপ্ত পথকে Short cut বলে। শটকার্ট পথ বড়ই দুর্গম; কোথাও উচ্চ প্রস্তর, কোথাও গর্ত, কোথাও এমন ঢালু যে পা রাখা যায় না। পাথর কাটিয়া ভাঙিয়া অশ্বাদি, গাড়ি ও (নিচেকো) মানুষের জন্য গবর্নমেন্ট যে অপেক্ষাকৃত সমতল কিন্তু ক্রমোচ্চ সুগম পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাকে স্থানীয় ভাষায়, 'সরকারি সটক' বলে। ঐ সরকারি সটকগুলি অনেক দূর আঁকিয়া বাঁকিয়া যায়। সচরাচর গুর্খা ভূটিয়াগণ সরকারি ঘুরাও পথে না চলিয়া শর্টকাটে যাতায়াত করে। কারণ যেখানে শর্টকাটে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যায়, সেইখানে সরকারি সড়ক দিয়া গেলে প্রায় ২০-২৫ মিনিট লাগে এবং সাতবার ঘুরিতে হয়।

নূরজাহাঁ পুনরায় বলিলেন, 'এই অশিক্ষিত পাহাড়িদের শিভালরি অবশ্য অবশ্য প্রশংসনীয়।'

গও। উহাদের নিকট আমাদের ভদ্রতা শিক্ষা করা উচিত। আমরা বৃথা ভদ্রতা সভ্যতার বড়াই করি।

নূর। আর একটা বিষয় লক্ষ করিয়াছ, ভাই? পাহাড়ি বা ভূটিয়া [illegible] ভিক্ষা করে না।

জাফ। তাহাদের ভিক্ষার প্রয়োজন হয় না বলিয়া।

গও। প্রয়োজন না-হওয়াও তো প্রশংসনীয়।

এইরূপ কথাবার্তায় তাঁহারা পথক্লান্তি ভুলিতেছিলেন। কারসিয়ঙ্গ স্টেশনের নিকটে আসিয়া কওসর বলিল,—'কি রাবু! ক্লান্ত নাকি?'

রাবু। না, মোটেই না।

জাফ। আরও এক মাইল যাইতে হইবে, জানিস?

ক্রমে তাঁহারা একটা বেঞ্চের নিকট আসিলেন। তথায় কয়েকজন গুর্খা বসিয়াছিল, তাহারা ইঁহাদিগকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিল। নূরজাহাঁ বলিলেন, 'একটু বসা যাউক।'

জাফ। না, চল আর বেশি দূর নাই।

বদু। হাঁ মাম্মা! বসুন না! ঐ দেখুন আকাশে আগুন।

জাফর পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন, সত্যই আকাশে আগুন লাগিয়াছে। সবই যেন অগ্নিময়!

আখ। দেখ আপা! কাঞ্চনজঙ্ঘায়ও আগুন লাগিয়াছে।

জাফ। বাস্তবিক বড় চমৎকার দৃশ্য তো! এখান হইতেও কাঞ্চনজঙ্ঘার দুই-তিনটি শৃঙ্গ দেখা যায়। অস্তমান রবির সোনালি কিরণে সত্যই সে কাঞ্চনকান্তি লাভ করিয়াছে। বোধ হয় যেন দিনমণি পশ্চিম গগনে আত্মগোপন করিতে যাইতেছে—আর সুকুমার মেঘগুলি তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছে! প্রদোষে এমন শোভা হয়, পূর্বে লক্ষ করি নাই। ওদিকে অলকমালা রাঙ্গাকিরণে স্নান করিয়া স্বর্ণবর্ণ লাভ করিতেছে। মৃদুমন্দ সমীরণ যেন তাহাদের সহিত লুকোচুরি খেলিবার ছলে মেঘমালাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতেছে।

গও। সালাম ভাই। তুমি তো বল কবিত্ব মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ!

জাফ। তুমি বলিয়াছ যে, এখানকার জলবায়ুতে ঐ রোগটা আছে। পূর্ববঙ্গের জলবায়ুতে ম্যালেরিয়া, হিমালয়ের জলবায়ুতে কবিত্ব।

গও। কেবল কবিত্ব নহে, বৈরাগ্য—যোগশিক্ষা ইত্যাদিও! এইখানে বসিয়া স্রষ্টার লীলাখেলা দেখ—তোমার সান্ধ্য-উপাসনা ফলপ্রাপ্ত হইবে। এখানে নিজের ক্ষুদ্রত্ব বেশ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

নূর। বলিতে কি, অভ্যাসমতো উপসনায় এমন ভাবের আবেগ, ভক্তির উচ্ছ্বাস থাকে না।

গও। আর আমরা যে, সামাজিক নিয়মের বশবর্তী হইয়া স্ত্রীলোকদের এমন উপাসনা—অর্থাৎ স্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্শন হইতে বঞ্চিত রাখি, ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কী উত্তর দিব? যে চক্ষুর কার্য দর্শন করা, তাহাকে চিরঅন্ধ করিয়া রাখি—ধিক আমাদের সভ্যতায়। ইনি নাকি এখানে আসিবার পূর্বে কখনও উষার প্রথম আলোক ও সূর্যোদয় দেখেন নাই।

জাফ। সম্ভবত আমিও দেখি নাই—সেজন্য আমি তো একবারও বিলাপ করি না।

গও। কিন্তু তুমি মাঠে বাহির হইলেই দেখিতে পাইতে; তোমার গতি তো অবারিত। আর মনে রাখিও, যথাসাধ্য জ্ঞানোন্মেষ ধর্মেরই এক অঙ্গ।

জাফ। জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে লোক নাস্তিক হয়, এইজন্য কুললনাবৃন্দকে জ্ঞান দূরে রাখা আবশ্যক।

গও। যত অভিশাপ কুলবালার উপর! ইহা তোমার বিষম ভ্রম। জ্ঞানের ধর্মের বিরোধ নাই। বরং জ্ঞান ধর্মের এক প্রধান অঙ্গ।

আরও অনেক কথা হইল। এদিকে বালিকার দলও নীরব ছিল না। [illegible] মৃদুস্বরে বলিল, 'দেখ আপা! ওদিকে দূরে উচ্চ গিরিচূড়ে চায়ের শ্যামল ক্ষেত্রগুলি সান্ধ্য রবিকিরণের তরল স্বর্ণবর্ণে স্নান করিয়া কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আবার কেমন ধীরে ধীরে ঈষৎ ধূমল বর্ণের বাষ্পরূপী ওড়নায় নিজ নিজ স্বর্ণকায় আবৃত করিতেছে!'

কও। ঠিক বলিয়াছ, বোন। আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। সৃষ্টিকর্তার কী অপার মহিমা! তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের বলিহারি যাই!

বদু। চল এখন বাসায় যাই!

আখ। যাওয়ার জন্য এত ব্যস্ততা কেন, দিদি?

বদু। আর এখানে থাকিয়া কী দেখিবে? ঐ দেখ ক্রমে সন্ধ্যাসমাগমে বুঝি শীতবোধ হওয়ায় চা-বাগানগুলি অন্ধকার লেপে শরীর ঢাকিতেছে। আর তো কিছুই দেখা যায় না।

কও। চা-বাগানের শীতবোধ হইক না হউক, বদুর শীতবোধ হইতেছে। কারণ বদু ভ্রমক্রমে শাল আনে নাই।

সকলে বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা পর গওহর আলী দুহিতাদিগকে পাঠগৃহে বসিয়া তাহাদিগকে পড়াইতেছেন। পাঠ শেষ হইলে তিনি অর্ধঘণ্টাকাল তাহাদের সহিত গল্প করেন। গল্পচ্ছলে তিনি তাহাদিগকে কখনো ঐতিহাসিক কখনো ভৌগোলিক বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। অদ্য তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় সৌরজগৎ।

মুশতরী। ভালো কথা, আব্বা। মাম্মা কেন আমাদিগকে সৌরচক্র বলেন? আমরা কি আকাশে ঘুরি?

গও। তিনি বিদ্রূপ করিয়া আমাদের সৌরজগৎ বলেন। কিন্তু আইস আমরা ঐ বিদ্রূপ হইতে একটা ভালো অর্থ বাহির করিয়া লই।

কও। জানো না? আঁস্তাকুড়ের আবর্জনার ভিতরও অনেক সময় মূল্যবান বস্তু লুক্কায়িত থাকে!

গও। হাঁ, অদ্য আমরা ঐ বিদ্রূপ-আবর্জনা হইতে একটা মূল্যবান জিনিস বাহির করিতে চেষ্টা করি। কওসর, তুমি চেষ্টা করিবে, মা?

কও। আপনিই চেষ্টা করুন।

গওহর আরম্ভ করিলেন, 'বলিয়াছি তো প্রত্যেক গ্রহই নিয়মমতো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা যেমন গ্রহগণের কর্তব্য, তদ্রূপ তাহাদিগকে আলোক প্রদান ও তাহাদের প্রত্যকটিকে যথাবিধি আকর্ষণ করা এবং সদে [illegible]

নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরা সূর্যের কর্তব্য। এই সৃষ্টিজগতে প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য পালন করিতেছে। কাহারও কর্তব্য সাধনে ত্রুটি হইলে সমষ্টির বিশৃঙ্খলা ঘটে।

মনে কর প্রত্যেক লোকের গৃহই একটি সৌরজগৎ এবং গৃহস্থের আত্মীয়স্বজনেরা এ সৌরপরিবারের এক-একটি গ্রহ। গ্রহদের কর্তব্য গৃহস্থের অবস্থানুসারে তাহারই মনোনীত পথে চলা। এবং গৃহস্থেরও কর্তব্য পরিবারস্থ লোকদিগকে স্নেহরশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করা, তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখা—এমনকি (দারিদ্র্যবশত) খাদ্যের অপ্রতুলতা হইলে, প্রথমে শিশুদের, অতঃপর আশ্রিত পোষ্যবর্গকে আহার করাইয়া সর্বশেষে তাহার ভোজন করা উচিত। যদি এই পরিবারের একটি লোকও স্বীয় কর্তব্য পালনে অবহেলা করে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া পরিবারটি নানাপ্রকার অশান্তি ভোগ করিবে।

'যেমন কোনো গ্রহ যদি আপন কক্ষকে অতিক্রম করিয়া দূরে যায়, তবে সূর্যের আকর্ষণ বিমুক্ত হইলে, সে অন্য কোনো গ্রহের সহিত টক্কর খাইয়া নিজে চূর্ণ হইবে এবং অপর গ্রহকেও বিপদগ্রস্ত করিবে। সুতরাং যাহার যে কক্ষ, তাহাকে সেই কক্ষে থাকিয়া স্বীয় কর্তব্যবত্মে চলিতে হইবে।'

ঠিক এই সময় জাফর আসিয়া বলিলেন, 'সালাম ভাই। পথে আসিয়াছ। আমিও তো তাহাই বলি, যাহার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট আছে, সে তাহা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। সমাজরূপ সৌরজগৎ স্ত্রীরূপ গ্রহদের জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করিয়াছে, সে সীমা উল্লঙ্ঘন করা স্ত্রীলোকদের উচিত নহে।'

গও। মাফ কর ভাই! আমাকে আগে আমার বক্তব্য বলিতে দাও। তুমি আসন গ্রহণ কর।

আখতর। (জনান্তিকে কওসরকে) মাম্মা কথা বলিবার ভঙ্গিও জানেন না। 'সমাজরূপ সৌরজগৎ' আর 'স্ত্রীরূপ গ্রহ' বলা হইল।

কও। তাইতো! সমাজটা নিজে সৌরজগৎ হইলে গ্রহদের সীমা নির্দিষ্ট করিবার অধিকার কী? ঈশ্বর স্বয়ং সকলের সীমা নির্দেশ করিয়াছেন। আচ্ছা এখন উঁহাদের কথা শুনি।

জাফর আসন গ্রহণ করিলে পর বালিকারাও আসন গ্রহণ করিল। জাফরকে দেখিয়া উহারা সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়াছিল।

গওহর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'কেবল অবলারা সীমা অতিক্রম করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহাই নহে, পুরুষেরাও স্বীয় কক্ষ লঙ্ঘন করিলে বিশৃঙ্খলা ঘটে।'

জাফ। পুরুষদের গন্তব্যপথ তো সীমাবদ্ধ নহে, তাহাদের আর কক্ষচ্যুত হওয়া কী?

গও। পুরুষেরাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহাদেরও কর্তব্য আছে। তুমি কি স্ত্রীকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া কোথাও যাইতে পার?

জাফ। না।

গও। তবে কিরূপে বল, তোমার পথ সীমাবদ্ধ নহে?

জাফ। তবু আমার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে।

গও। কর্তব্যে অবহেলা করিবার ক্ষমতা নাই।

বৃশ। আব্বা। আমরা তো সকলেই নিজ নিজ কর্তব্যকার্য করি, কিন্তু নয়িমু ও রুমা তো কিছু করে না?

জাফ। তাহারা এত ছোট যে তাহাদের কর্তব্য কিছুই নাই।

গও। তাহাদেরও কর্তব্য আছে বইকি? নয়িমুর কর্তব্য যথানিয়মে [illegible] পালন করা ও খেলা করা। মাসুমার কর্তব্য খাওয়া, নিদ্রা যাওয়া, হাসা এবং [illegible] শিখা।

রাবু। ইশ! ভারি তো কর্তব্য ! উহারাও কাজ না করিলে আমাদের এখানে [illegible] কী বিশৃঙ্খলা ঘটিবে?

কও। উহারা এখনও তোমাদের মতো দুষ্টামি শিখে নাই; তাই উহারা যথানিয়মে স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করে। যদি মাসুমা না হাসে বা নয়িমা না খায়, তবে বুঝিতে হইবে তাহাদের অসুখ হইয়াছে। তখন তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আমাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে।

গও তাহাদের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত থাকিলে আমাদের দৈনিক কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে কি না?

রাবু। হাঁ—বুঝিলাম।

গও। আর এক কথা মনোযোগের সহিত শুন। আমি বলিয়াছি, গ্রহমালা স্ব-স্ব কক্ষে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণকার্যে গ্রহদের সাদৃশ্য ও একতা আছে অর্থাৎ সকলেই ঘুরে, এই হইল সাদৃশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল গ্রহই একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে বসে, তাহা নহে! (জাফরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) তাহাদের আবার 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা আছে। জাফর ভাই যে বলেন, সৌরপরিবারের অবলারূপ গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা নাই, ইহা তাঁহার ভ্রম।

জাফ। ভ্রম নহে—ঠিক কথা। অবলাকে কোনোপ্রকার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। তুমি হয়তো মাদ্রাজের Christian Tract Society-প্রকাশিত Indian Reform সম্বন্ধীয় পুস্তিকাসমূহ হইতে এ-স্বাধীনতার ভাব গ্রহণ করিয়াছ। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ যাহা বলেন, তোমার নিকট তাহা আভ্রান্ত সত্যরূপেই পরিগণিত হইয়াছে।

গও। আমি আজি পর্যন্ত উক্ত পুস্তিকার একখানিও পাঠ করি নাই। খ্রিস্টানদের নিকট কিছু শিখিতে যাইব কেন? ঈশ্বর কি আমাকে বুদ্ধি দেন নাই? আর আমি তো এই কারসিয়ঙ্গ শৈলে আছি, এই সময় তুমি আমার বাড়ি অনুসন্ধান কর গিয়া, যদি আমার বাড়িতে 'Christian Tract Society-প্রকাশিত পুস্তিকা' একখানিও দেখিতে পাও, তবে আমি তোমাকে হাজার (১০০০.০০) টাকা দিব।

জাফ। হাজার টাকার বাজি?

গও। হাঁ—লাগাও বাজি—এক হাজার নূতন টাকা। আর যদি পুস্তিকা না পাও, তবে তুমি দিবে ১০০০.০০ টাকা।

জাফ। না, বাজি এইরূপ হউক যে, হারজিত, উভয় অবস্থাতেই তুমি টাকা দিবে। হা। হা। হা।

গও। ব্যস। ঐখানেই বীরত্বের অবসান।

এই সময় নূরজাহাঁ আসিয়া কওসরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বদর। আব্বা গ্রহদের 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা কেমন?

গও। যেমন সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে বুধের প্রায় ৩ মাস, শুক্রের ৮ মাস, বৃহস্পতির ১২ বৎসর এবং শনির ৩০ বৎসর লাগে। ইহাই তাহাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বা স্বাধীনতা। শনিগ্রহকে কেহ আরক্তনেত্রে আদেশ করিতে পারে না যে, 'তোমাকেও বুধের মতো ৩ মাসেই সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতে হইবে।' এবং এতদ্ব্যতীত আরও অনেক

বৈষম্য আছে, তাহা তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না।

কও। আর অত কথা এককালে বলাও তো সম্ভব নহে।

গও। হাঁ সম্ভবও নহে। এইরূপ মানবের সৌরপরিবারের ও পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য আছে এবং কতকগুলি বৈসাদৃশ্যও আছে।

জাফ। যথা গওহর আলীর সহিত আমার চক্ষুকর্ণের similarity (সাদৃশ্য) আছে এবং মতামতের dissimilarity (বৈসাদৃশ্য) আছে। (সকলের হাস্য)

কও। তরুলতার গঠনপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও আমরা বৈষম্য ও সাদৃশ্য পাশাপাশি বিদ্যমান দেখিতে পাই। বদু! সেদিন তোমাকে নানাজাতীয় fern-এর (টেকিগুল্মের) সাধারণ আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং পত্রগত সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখাইয়াছিলাম, মনে আছে তো?

বদু। হাঁ। ঠিক একরকমের দুইটি পাতা বাহির করিতে পারি নাই।

গও। তাই তো। জাফর ভাই যেমন মনে করেন সংসারে তিনি ছাড়া আর কে—বিশেষত স্ত্রীলোক কথা কহিবে না, তিনি ব্যতীত আর কেহ স্কুলে পড়িবে না ইত্যাদি ইত্যাদি, ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে।

জাফ। আমি কি লোককে কথা বলিতেও নিষেধ করি?

গও। নিষেধ কর না বটে, কিন্তু তুমি এমনভাবে বলা আরম্ভ কর যে, আর কাহারও কথা কহিবার সুবিধা হয় না। ইনি তোমাকে তিনদিন কন্যাদের বালিকা স্কুলে পড়িবার কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তুমি একদিনও ধৈর্যের সহিত শুন নাই। তুমি যেভাবে মহিলাদের কথায় বাধা দিয়া নিজের বাগ্মিতা প্রকাশ কর, তাহা তোমার ন্যায় বিলাত-ফেরতার পক্ষে কদাচ শোভনীয় নহে।

জাফ। আমি অধিক কথা বলি, তোমরাও বল না কেন?

গও। আমরা অত বকিতে পারি কই? আমি দুইশত টাকা পুরস্কার দিব, যদি কেহ তোমাকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারে।

নূর। কেবল বাকযুদ্ধ নহে—বাগডাকাতিও বটে!

জাফ। নূরু! তুইও বিপক্ষে গেলি?

নূর। না, ভাই! ক্ষমা কর—আমি তো এমন কিছু বলি নাই!

গও। ঠিক, —বাগ্মিতা, বাকচাতুর্য, বাকচৌর্য, বাগডাকাতি এবং বাকযুদ্ধে যে ব্যক্তি আমার জাফর দাদাকে পরাস্ত করিবে, সে ২০০.০০ টাকা পুরস্কার পাইবে।

নূর। সভয়ে আর একটি কথা বলি—ভাই দুই ঘণ্টা ধরিয়া কথা বলেন, কিন্তু কী যে বলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য!

গও। কেবল বকেন—লক্ষ্য ছাড়িয়া দিয়া কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে—নানাস্থানে ঘুরেন। কিন্তু বকেন! অপরের বক্তব্য শুনেন না, কেবল নিজে বকেন। যাহা হউক, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে। জাফর দিনকে রাত্রি বলিলে যে তাঁহার বাড়ির সকলকেই 'দিব্যজ্যোৎস্না' বলিতে হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। অবলাদেরও চক্ষুকর্ণ আছে, চিন্তাশক্তি আছে, উক্ত শক্তিগুলোর অনুশীলন যথানিয়মে হওয়া উচিত। তাহাদের বাকশক্তি কেবল আমাদের শিখানো বুলি উচ্চারণ করিবার জন্য নহে।

জাফ। উঠ এখন; আজি যথেষ্ট বকিলে!

গও। আর দুই-এক কথা বলিতে দাও—তোমার কথা নহে। সৌরচক্রের গ্রহমালা

যেমন সূর্যকে লক্ষ করিয়া আপন কক্ষে ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ আমাদেরও সত্য অর্থাৎ ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস সহকারে নিজ-স্ব-স্ব কর্তব্যপথে চলি। যে-কোনো অবস্থায় সত্য ত্যাগ করা উচিত নহে হইলেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সত্যরূপ কেন্দ্রে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কও। আমরা সকলেই সৌরপরিবারের এক-একটি ক্ষুদ্র তারা, পরমেশ্বর সূর্য।

গও। ঠিক এবং যাহারা উক্ত সৌরপরিবারের ন্যায় সুখে জীবনে অতিবাহিত করে তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।

কও। পরস্পরে একতা থাকাও একান্ত আবশ্যক।

গও। হাঁ, কিন্তু এই ঐক্য যেন সত্যের উপর স্থাপিত হয়। একতার মূলে একটি মহৎ গুণ থাকা আবশ্যক।

জাফ। আমি বলি, একতার ভিত্তি ন্যায় বা প্রেম হইলে আরও ভালো হয়।

গও। ন্যায়পরায়ণতা এবং প্রেমও সদগুণ বটে, কিন্তু উহাদের মাত্রাধিক্যে আবার অনিষ্টের সম্ভাবনা। যেমন সময়-সময় কঠোর ন্যায় কোমল প্রেমের বিরোধী হয়; আবার প্রেমের আধিক্য ন্যায়কে দলিত করে। বিচারক অত্যন্ত দয়ালু হইলে চলে না, আবার ন্যায়বিচারে প্রকৃত প্রমাণ অভাবে অনেক সময় নির্দোষীর দণ্ড হয়। সত্যের কিন্তু অপর পৃষ্ঠা নাই—উহা স্বচ্ছ সুনির্মল। এই জন্য বলি—একতার ভিত্তি সত্য হউক

জাফ। বেশ! নমাজের সময় হইল—চল এখন তোমার কক্ষে!

গও। চল! নামাজে কিন্তু তুমি ইমাম হইবে।

জাফ। না, তুমি তো আমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কর না—সুতরাং তুমি ইমাম হইবে

গও। তবে মনে রাখিও—সকল বিষয়ে আমি নেতা, তুমি অনুবর্তী।

জাফ। না, তাহা হইবে না।

গও। তবে 'ব্যক্তিগত' স্বাধীনতা অবলম্বন কর।

জাফ। তথাস্তু! তুমি তোমার কক্ষে উপাসনা কর—আমি আমার কক্ষে।

জাফর ও গওহর চলিয়া গেলে পর বদর বলিল, 'মাম্মা আমাদিগকে সৌরজগৎ বলিয়া বিদ্রূপ না করিলে এত কথা জানিতে পারিতাম না।'

আখ। ঠিক! অদ্য আব্বা আমাদের জন্য কয়লা হইতে কোহেনুর বাহির করিয়াছেন।

কও। মনে রাখিও—আমরা সকলে সৌরপরিবারের তারা!

সুলতানার স্বপ্ন*

একদা আমার শয়নকক্ষে আরামকেদারায় বসিয়া ভারত-ললনার জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলাম—আমাদের দ্বারা কি দেশের কোনো ভালো কাজ হইতে পারে না? এইসব ভাবিতেছিলাম। সে-সময় মেঘমুক্ত আকাশে শারদীয় পূর্ণিমার শশধর পূর্ণগৌরবে শোভমান ছিল; কোটি লক্ষ তারকা শশীকে বেষ্টন করিয়া হীরক-প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল। মুক্ত বাতায়ন হইতে কৌমুদীস্নাত উদ্যানটি স্পষ্টই আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। এক-একবার মৃদুস্নিগ্ধ সমীরণ শেফালি-সৌরভ বহিয়া আনিয়া দেখানি আমোদিত করিয়া দিতেছিল। দেখিলাম, সুধাকরের পূর্ণকান্তি, সুমিষ্ট কুসুমের সুমিষ্ট সৌরভ, সমীরণের সুমন্দ হিল্লোল, রজতচন্দ্রিকা, ইহারা সকলে মিলিয়া আমার সাধের উদ্যানে এক অনির্বচণীয় স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়া ফেলিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম, যেন জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম! ঠিক বলিতে পারি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না—কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, আমার বিশ্বাস আমি জাগ্রত ছিলাম।

সহসা আমার পার্শ্বে একটি ইউরোপীয় রমণীকে দণ্ডায়মানা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি কী প্রকারে আসিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে আমার পরিচিতা 'ভগিনী সারা' (Sister Sara) বলিয়া বোধ হইল। ভগিনী সারা 'সুপ্রভাত' বলিয়া আমাকে অভিবাদন করিলেন! আমি মনে মনে হাসিলাম—এমন শুভ্র জোছনাপ্লাবিত রজনীতে তিনি বলিলেন, 'সুপ্রভাত।' তাঁহার দৃষ্টিশক্তি কেমন? যাহা হউক, প্রকাশ্যে আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—

'আপনি কেমন আছেন?'

'আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ। আপনি একবার আমাদের বাগানে বেড়াইতে আসিবেন কি?'

আমি মুক্তবাতায়ন হইতে আবার পূর্ণিমাচন্দ্রের প্রতি চাহিলাম—ভাবিলাম, এ সময় যাইতে আপত্তি কী? চাকরেরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন; এই অবসরে ভগিনী সারার সমভিব্যাহারে বেড়াইয়া বেশ একটু আনন্দ উপভোগ করা যাইবে।

দার্জিলিং অবস্থানকালে আমি সর্বদাই ভগিনী সারার সহিত ভ্রমণ করিতাম। কত দিন উদ্ভিদকাননে (বোটানিকাল গার্ডেনে) বেড়াইতে বেড়াইতে উভয়ে লতাপাতা সম্বন্ধে—ফুলের লিঙ্গ নির্ণয় সম্বন্ধে কত তর্কবিতর্ক করিয়াছি, সে-সব কথা মনে পড়িল। ভগিনী সারা সম্ভবত আমাকে তদ্রূপ কোনো উদ্যানে লইয়া যাইবার নিমিত্তে আসিয়াছেন; আমি বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

ভ্রমণকালে দেখি কী—এ তো সে জোছনাময়ী রজনী নহে!—এ যে দিব্য প্রভাত! নগরের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে, রাজপথে লোকে লোকারণ্য! কী বিপদ! আমি দিনের বেলায় এভাবে পথে বেড়াইতেছি! ইহা ভাবিয়া লজ্জায় জড়সড় হইলাম—যদিও পথে একজনও পুরুষ দেখিতে পাই নাই।

* বর্তমান লেখিকার Sultana's Dream গত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে *Indian Ladies Magazine*-এ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পথিকা স্ত্রীলোকেরা আমার দিকে চাহিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছিল তাহাদের ভাষা না বুঝিলেও ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, তাহাদের উপহাসের লক্ষ্য আমিই। সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

'উহারা কী বলিতেছে?'

উত্তর পাইলাম—'উহারা বলে যে, আপনি অনেকটা পুরুষভাবাপন্ন।'

'পুরুষভাবাপন্ন। ইহার মানে কী?'

'ইহার অর্থ এই যে, আপনাকে পুরুষের মতো ভীরু ও লজ্জানম্র দেখায়!'

'পুরুষের মতো লজ্জানম্র!' এমন ঠাট্টা! এরূপ উপহাস তো কখনো শুনি নাই ক্রমে বুঝিতে পারিলাম, আমার সঙ্গিনী সে দার্জিলিংবাসিনী ভগিনী সারা নহেন—ইঁহাকে আর কখনো দেখি নাই! ওহো! আমি কেমন বোকা—একজন অপরিচিতার সহিত হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! কেমন একটু বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইলাম। আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঈষৎ কম্পিত হইল। তাঁহার হাত ধরিয়া চলিতেছিলাম কিনা, তিনি আমার হস্তকম্পন অনুভব করিয়া সস্নেহে বলিলেন—

'আপনার কী হইয়াছে? আপনি কাঁপিতেছেন যে!'

এরূপে ধরা পড়ায় আমি লজ্জিত হইলাম। ইতস্তত করিয়া বলিলাম, 'আমার কেমন একটু সঙ্কোচবোধ হইতেছে; আমরা পরদানশীন স্ত্রীলোক, আমাদের বিনা অবগুণ্ঠনে বাহির হইবার অভ্যাস নাই।'

'আপনার ভয় নাই—এখানে আপনি কোনো পুরুষের সম্মুখে পড়িবেন না। এদেশের নাম 'নারীস্থান'* এখানে স্বয়ং পুণ্য নারীবেশে রাজত্ব করেন।'

ক্রমে নগরের দৃশ্যাবলি দেখিয়া আমি অন্যমনস্ক হইলাম। বাস্তবিক পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দৃশ্য অতিশয় রমণীয় ছিল। সুনীল অম্বর দর্শনে মনে হইল যেন ইতিপূর্বে আর কখনো এত পরিষ্কার আকাশ দেখি নাই! একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর দেখিয়া ভ্রম হইল, যেন হরিৎ মখমলের গালিচা পাতা রহিয়াছে। ভ্রমণকালে আমার বোধ হইতেছিল, যেন কোমল মসনদের উপর বেড়াইতেছি—ভূমির দিকে দৃকপাত করিয়া দেখি, পথটি শৈবাল ও বিবিধ পুষ্পে আবৃত! আমি তখন সানন্দে বলিয়া উঠিলাম, 'আহা! কী সুন্দর!'

ভগিনী সারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এসব পছন্দ করেন কি?' (আমি তাঁহাকে 'ভগিনী সারা'ই বলিতে থাকিলাম এবং তিনিও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতেছিলেন।)

'হ্যাঁ এসব দেখিতে বড়ই চমৎকার। কিন্তু আমি এ সুকুমার কুসুমস্তবক পদদলিত করিতে চাই না।'

'সেজন্য ভাবিবেন না, প্রিয় সুলতানা! আপনারা পদস্পর্শে এ-ফুলের কোনো ক্ষতি হইবে না। এগুলি বিশেষ একজাতীয় ফুল, ইহা রাজপথেই রোপণ করা হয়।'

দুইধারে পুষ্পচূড়াধারী পাদপশ্রেণী সহাস্যে শাখা দোলাইয়া দোলাইয়া যেন আমার অভ্যর্থনা করিতেছিল। দূরাগত কেতকী-সৌরভে দিক-পরিপূরিত ছিল। সে সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য—আমি দুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিলাম, 'সমস্ত নগরখানি একটি কুঞ্জভবনের মতো দেখায়! যেন ইহা প্রকৃতিরানির লীলাকানন! আপনাদের উদ্যান-রচনা-নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়।'

* "পরিস্থান" শব্দের অনুকরণে "নারীস্থান" বলা হইল। ইংরাজিতে "লেডী ল্যান্ড" বলা গিয়াছে।

'ভারতবাসী ইচ্ছা করিলে কলিকাতাকে ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর [illegible] করিতে পারেন।'

'তাঁহাদিগকে অনেক গুরুতর কার্য করিতে হয়, তাঁহারা কেবল উন্নতিকল্পে অধিক সময় ব্যয় করা অনাবশ্যক মনে করিবেন।'

'ইহা ছাড়া তাঁহারা আর কী বলিতে পারেন? জানেন তো অলসের অর্থ হয়!'

আমার বড় আশ্চর্যবোধ হইতেছিল যে, দেশের পুরুষেরা কোথায় থাকে? রাজপথে অতিরিক্ত ললনা দেখিলাম, কিন্তু পুরুষ বলিতে একটি বালক পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। শেষে কৌতূহল গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পুরুষেরা কোথায়?'

উত্তর পাইলাম, 'যেখানে তাহাদের থাকা উচিত সেইখানে, অর্থাৎ তাহাদের উপযুক্ত স্থানে।'

ভাবিলাম, তাহাদের 'উপযুক্ত স্থান' আবার কোথায়—আকাশে না পাতালে? পুনরায় বলিলাম, 'মাফ করিবেন, আপনার কথা ভালোমতো বুঝিতে পারিলাম না। তাহাদের 'উপযুক্ত স্থানের' অর্থ কী?'

'ওহো! আমার কী ভ্রম!—আপনি আমাদের নিয়মআচার জ্ঞাত নহেন, এ-কথা আমার মনেই ছিল না। এদেশে পুরুষজাতি গৃহাভ্যন্তরে অবরুদ্ধ থাকে।'

'কী! যেমন আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেইরূপ তাঁহারাও থাকেন নাকি?'

'হাঁ, ঠিক তদ্রূপই।'

'বাহ্! কী আশ্চর্য ব্যাপার!' বলিয়া আমি উচ্চহাস্য করিলাম। ভগিনী সারাও হাসিলেন। আমি প্রাণে বড় আরাম পাইলাম;—পৃথিবীতে অন্তত এমন একটি দেশও আছে, যেখানে পুরুষজাতি অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকে! ইহা ভাবিয়া অনেকটা সান্ত্বনা অনুভব করা গেল!

তিনি বলিলেন, 'ইহা কেমন অন্যায়, যে নিরীহ রমণী অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, আর পুরুষেরা মুক্ত, স্বাধীনতা ভোগ করে। কী বলেন, সুলতানা, আপনি ইহা অন্যায় মনে করেন না?'

আমি আজন্ম অন্তঃপুরবাসিনী, আমি এ-প্রথাকে অন্যায় মনে করিব কিরূপে? সোদ্যে বলিলাম—'অন্যায় কিসের? রমণী স্বভাবত দুর্বলা, তাহাদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাহিরে থাকা নিরাপদ নহে।'

'হাঁ, নিরাপদ নহে ততদিন—যতদিন পুরুষজাতি বাহিরে থাকে। তা কোনো বন্য জন্তু কোনো একটা গ্রামে আসিয়া পড়িলেও তো সে গ্রামখানি নিরাপদ থাকে না। কি বলেন?'

'তাহা ঠিক; হিংস্র জন্তুটা ধরা না-পড়া পর্যন্ত গ্রামটি নিরাপদ হইতে পারে না।'

'মনে করুন, কতকগুলি পাগল যদি বাতুলাশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়ে, আর তাহারা অশ্ব, গবাদি—এমনকি ভালো মানুষের প্রতিও নানাপ্রকার উপদ্রব উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তবে ভারতবর্ষের লোকে কী করিবে?'

'তবে তাহারা পাগলগুলিকে ধরিয়া পুনরায় বাতুলাগারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইবে।'

'বেশ! বুদ্ধিমান লোককে বাতুলালয়ে আবদ্ধ রাখিয়া দেশের সমস্ত পাগলকে মুক্তি

দেওয়াটা বোধহয় আপনি ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, না?'

'অবশ্যই না! শান্তশিষ্ট লোককে বন্দি করিয়া পাগলকে মুক্তি দিবে কে?'

'কিন্তু কার্যত আপনাদের দেশে আমরা ইহাই দেখিতে পাই! পুরুষের নানা প্রকার দুষ্টামি করে, বা অন্তত করিতে সক্ষম, তাহারা দিব্য স্বাধীনতা আর নিরীহ কোমলাঙ্গী অবলারা বন্দিনী থাকে। অশিক্ষিত অমার্জিতরুচি পুরুষ বিনাশৃঙ্খলে থাকিবার উপযুক্ত নহে। আপনারা কিরূপে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন?'

'জানেন, ভগিনী সারা! সামাজিক বিধিব্যবস্থার উপর আমাদের কোনো হাত নাই। ভারতে পুরুষজাতি প্রভু—তাহারা সমুদয় সুখসুবিধা ও প্রভুত্ব আপনাদের জন্য হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে, আর সরলা অবলাকে অন্তঃপুর রূপ পিঞ্জরে রাখিয়াছে! উড়িতে শিখিবার পূর্বেই আমাদের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়—তদ্ব্যতীত সামাজিক রীতিনীতি কতশত কঠিন শৃঙ্খল পদে পদে জড়াইয়া আছে।'

'তাই তো! আমার বলিতে ইচ্ছা হয়—'দোষ কার, বন্দী হয় কে!' কিন্তু বলি আপনারা ওসব নিগড় পরেন কেন?'

'না পরিয়া করি কী? 'জোর যার মুলুক তার'; যাহার বল বেশি, সেই স্বামিত্ব করিবে—ইহা অনিবার্য।'

'কেবল শারীরিক বল বেশি হইলেই কেহ প্রভুত্ব করিবে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। সিংহ কি বলেবিক্রমে মানবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? তাই বলিয়া কি কেশরী মানবজাতির উপর প্রভুত্ব করিবে? আপনাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনারা সমাজের উপর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া একাধারে নিজের প্রতি অত্যাচার এবং স্বদেশের অনিষ্ট দুই-ই করিয়াছেন। আপনাদের কল্যাণে সমাজ আরও উন্নত হইত—আপনাদের সাহায্য অভাবে সমাজ অর্ধেক শক্তি হারাইয়া দুর্বল ও অবনত হইয়া পড়িয়াছে।

'শুনুন ভগিনী সারা! যদি আমরাই সংসারের সমুদয় কার্য করি, তবে পুরুষেরা কী করিবে?'

'তাহারা কিছুই করিবে না—তাহারা কোনো ভালো কাজের উপযুক্ত নহে। তাহাদিগকে ধরিয়া অন্তঃপুরে বন্দি করিয়া রাখুন।'

'কিন্তু ক্ষমতাশালী নরবরদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দি করা কি সম্ভব, না সহজ ব্যাপার? আর তাহা যদিই সাধিত হয়, তবে দেশের যাবতীয় কার্য যথা রাজকার্য, বাণিজ্য ইত্যাদি সকল কাজই অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবে যে!'

এবার ভগিনী সারা কিছু উত্তর দিলেন না, সম্ভবত আমার ন্যায় অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন অবলার সহিত তর্ক করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন।

ক্রমে আমরা ভগিনী সারার গৃহতোরণে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, বাড়িখানি একটি বৃহৎ হৃদয়াকৃতি উদ্যানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এ ভাবটি কী চমৎকার!—ধরিত্রী জননীর হৃদয়ে মানবের বাসভবন। বাড়ি বলিতে একটি টিনের বাঙ্গালা মাত্র; কিন্তু সৌন্দর্যে ও নৈপুণ্যে ইহার নিকট আমাদের দেশের বড় বড় রাজপ্রাসাদ পরাজিত। সাজসজ্জা কেমন নয়নাভিরাম ছিল; তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নহে—তাহা কেবল দেখিবার জিনিস।

আমরা উভয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। তিনি সেলাই করিতে আরম্ভ

[illegible] কী কাজে লেগেছে তা জানি না। আমি বলিলাম,
'আমরা অন্তঃপুরে থাকি, সেলাই ব্যতীত অন্য কাজ জানি না।'
'কিন্তু ফ্রান্সের অন্তঃপুরবাসীদের হাতে আমরা কারচোবের কাজ [illegible] দেখিতে পাই না।' এই বলিয়া তিনি হাসিলেন, 'পুরুষদের এতখানি সংকীর্ণ [illegible] ধৈর্যের সহিত ছুঁচে সুতা পরাইবে?'
তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'তবে কি কারচোবের কাজগুলি সব আপনারা করিয়াছেন?' তাঁহার ঘরে বিবিধ ত্রিপদীর উপর নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূচীকার্যখচিত বস্ত্রাবরণ ছিল।
তিনি বলিলেন, 'হাঁ, এ-সব আমারই স্বহস্ত প্রস্তুত।'
'আপনি কিরূপে সময় পান? আপনাকে তো অফিসের কাজও করিতে হয়, না?' 'কী করেন?'
'হাঁ। তা আমি সমস্তদিন রসায়নাগারে আবদ্ধ থাকি না। আমি দুই ঘণ্টায় দৈনিক কর্তব্য শেষ করি।'
'দুই ঘণ্টায়। আপনি এ কী বলেন?—দুই ঘণ্টায় আপনার কার্য শেষ হয়! আমাদের দেশে রাজকর্মচারীগণ—যেমন মাজিস্ট্রেট, মুন্সেফ, জজ প্রমুখ প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকেন।'
'আমি ভারতের রাজপুরুষদের কার্যপ্রণালী দেখিয়াছি। আপনি কি মনে করেন যে, তাহারা সাত-আট ঘণ্টাকাল অনবরত কাজ করেন?'
'নিশ্চয়, বরং এতদপেক্ষা অধিক পরিশ্রমই করেন।'
'না প্রিয় সুলতানা। ইহা আপনার ভ্রম। তাঁহারা অলসভাবে বেত্রাসনে বসিয়া যেখানে সময় অতিবাহিত করেন। কেহ আবার অফিসে থাকিয়া ক্রমাগত দুই-তিনটি চুরুট ধ্বংস করেন। তাঁহারা মুখে যত বলেন, কার্যত তত করেন না। রাজপুরুষেরা যদি কিছু করেন, তাহা এই যে, কেবল তাঁহাদের নিম্নতম কর্মচারীদের ছিদ্রান্বেষণ। মনে করুন একটি চুরুট ভস্মীভূত হইতে অর্ধঘণ্টা সময় লাগে, আর কেহ দৈনিক ১২টি চুরুট ধ্বংস করেন, তবে সে ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ধূমপানে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।'
তাই তো। অথচ ভ্রাতৃমহোদয়গণ জীবিকা অর্জন করেন, এই অহঙ্কারেই বাঁচেন না। ভগিনী সারার সহিত বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। শুনিলাম, তাঁহাদের নারীস্থান কখনো মহামারী রোগে আক্রান্ত হয় না। আর তাঁহারা আমাদের ন্যায় হুলধর মশার দংশনেও অধীর হন না! বিশেষ একটি কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম—নারীস্থানে নাকি কাহারও অকাল-মৃত্যু হয় না। তবে বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা হইলে লোকে অপ্রাপ্ত বয়সে মরে, সে স্বতন্ত্র কথা। ভগিনী সারা আবার হিন্দুস্থানের অসংখ্য শিশুর মৃত্যু সংবাদে অবাক হইলেন! তাঁহার মতে যেন এই ঘটনা সর্বাপেক্ষা অসম্ভব! তিনি বলিলেন, যে প্রদীপ সবেমাত্র তৈল সলিতা যোগে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কেন (তৈল বর্তমানে) নির্বাপিত হইবে! যে নব কিশলয় সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছে, সে কেন পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে ঝরিবে!
ভারতের প্লেগ সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল, তিনি বলিলেন, 'প্লেগ-টেলেগ কিছুই নহে—কেবল দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকেরা নানা রোগের আধার হইয়া পড়ে। একটু

অনুধাবন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গ্রাম অপেক্ষা নগরে প্লেগ বেশি—নগরের ধনী অপেক্ষা নির্ধনের ঘরে প্লেগ বেশি হয় এবং প্লেগে দরিদ্র পুরুষ অপেক্ষা দরিদ্র নারী অধিক মারা যায়। সুতরাং বেশ বুঝা যায়, প্লেগের মূল কোথায়—মূল কারণ অন্নাভাব। আমাদের এখানে প্লেগ বা ম্যালেরিয়া আসুক তো দেখি!'

তাই তো, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিংবা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন, প্লীহা-ক্ষীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পরদা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধনগৃহ, না নন্দনকানন! রন্ধনশালার চতুর্দিকে সবজিবাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারির লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোনো চিহ্ন নাই—মেজেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তরে নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত। আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

'আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও তো অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?'

তিনি বলিলেন, 'সূর্যোত্তাপে রান্না হয়।' অতঃপর কীপ্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে তিনি তৎক্ষণাৎ একপাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধনপ্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কী প্রকারে?'

ভগিনী বলিলেন, 'কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারানি সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামত রানি ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজ্য-শাসন করিতেন।

'মহারানি বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞানচর্চা করিতে ভালোবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল যে, তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হউক। মহারানির খেয়াল—সে খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল! অচিরে গভর্নমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা স্কুল স্থাপিত হইল)। এমনকি পল্লিগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয় স্রোত-প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোনো কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না—এই আইন হইল। আর এক-কথা—এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মতো কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।'

'এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!' এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

'কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান সেই প্রকারই আছে! কতদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।'

'আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারানি—আর কি কোনো অভাব থাকিতে পারে

সকলে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা প্রিন্সিপ্যাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন; সেই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করা হইল—বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল—এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন। বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ঐ বেলুনের সাহায্যে জলগ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডি প্রিন্সিপ্যাল প্রাকৃতিক ঝড়বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।'

'বটে? তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দম দেখিলাম না।' কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না—নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর কিরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব। তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি—তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোনো পুরুষে পরিচয় নাই। সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোনোমতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

'দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল—অতিহিংসায়* তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। প্রিন্সিপ্যাল মনস্থ করিলেন যে, এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই, যাহাতে কাদম্বিনী বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্দ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামতো যথাতথা বিতরণ করিতে পারেন।

যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে পাইলেন যে, জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জল গ্রহণ করিতে এবং সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমনকি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে 'স্বপ্নকল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।'

আমি বলিলাম, 'আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কী প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দি করিলেন? কোনোরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন নাকি?'

ভগিনী বলিলেন, 'না'।

'তাঁহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও তো সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দি হইবে কোন্ পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনোরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।'

'হাঁ, তাই বটে'।

'কে প্রথমে পুরুষ-প্রবরদের পরাভূত করিল—সম্ভবত কতিপয় নারীযোদ্ধা?'

---

* হিংসা বৃত্তিটা কি বাস্তবিক বড় দোষণীয়? কিন্তু হিংসা না থাকিলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা হয় কই? এই হিংসাই তো মানবকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে। তবে দেশকাল ভেদে ঈর্ষায় পতন হয়, সত্য। তা যে-কোনো মনোবৃত্তির মাত্রাধিক্যেই অনিষ্ট হয়; সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

'না এদেশের পুরুষদের বাহুবলে পরাস্ত করা হয় নাই।'

'হাঁ ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্ব...

তবে? 'মস্তিষ্ক-বলে।'

'তাহাদের মস্তিষ্কও তো রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?—কী বলেন...

'মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কী? হস্তীর মস্তিষ্কও তো মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ...তবু তো মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে।'

'ঠিক তো। কিন্তু কী প্রকারে কর্তারা বন্দি হইলেন, এ-কথা জানিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন, আর বিলম্ব সহে না।'

'স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ-কথা অনেকেই স্বীকার করে পুরুষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে—অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনাচিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্নকল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যালদ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।'

'ভারি আশ্চর্য!' আমি অতিআনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, 'এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্নকল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন।'

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

'কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোনোপ্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি কেবল স্বামিত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারানিকে ঐ আসামি ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারানি তো দয়াপ্রতিমা জননীর জাতি—সুতরাং তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

'আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বিরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল, রক্তগঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লানবদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।

'কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈ শনৈ পশ্চাদবর্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশ অগ্রসর হইল।

'কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর-ভদ্র—সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমনকি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরক্ষেত্রে হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল। অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানীর

মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর দুই-চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবেন।

এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জন-কতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কী করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।

কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমতো যুদ্ধ করিতে করিতে যাইবেন, অন্যদল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব—কারণ একে তো অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ তাহাতে দুবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন যে, যুদ্ধনৈপুণ্য দূরে থাকুক—রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।'

মহারানি বলিলেন, 'যদি আপনারা বাহুবলে দেশরক্ষা করিতে না পারেন, তবে স্বাস্থবলে দেশরক্ষার চেষ্টা করুন।'

সকলে নিরুত্তর, সভাস্থল নীরব। মহারানি মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি ধর্ম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।'

এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডি প্রিন্সিপ্যাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণে নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন—এখন অতি ধীরে গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশাভরসা তো নাই—শত্রু প্রায় দ্বারোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন—যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে তো সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই—তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রুজয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা—যদি এই উপায়ে কৃতকার্য হওয়া না যায়, তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহারা কিছুতেই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবেন না। সেই নিশীথের নিস্তব্ধ রজনীতে মহারানির সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা ধ্বনিতে পুন পুন প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, 'আত্মহত্যা করিব!' সে যেন ততোধিক তোজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'বিদেশীয় অধীনতা স্বীকার করিব না।'

সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন এবং লেডি প্রিন্সিপ্যালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।

লেডি প্রিন্সিপ্যাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পরদার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।' মহারানি উত্তর করিলেন, 'অবশ্য! তাহা তো হইবেনই।'

পর দিন মহারানির আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা হইল যে অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সেজন্য সমস্ত নগরে পরদা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।

অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না, পরে ভাবিলেন, মন্দ কী? তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত ছিলেন—যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারানির এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত শুভআশীর্বাদ মনে করিলেন। মহারানিকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনাবাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, দেশরক্ষার কোনো আশা নাই—মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাহাদের এই অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কী? শেষটা কী হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।'

'অতঃপর লেডি প্রিন্সিপ্যাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যাহারে সমরক্ষেত্রে [illegible] করিলেন।'

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'দেশের পুরুষদিগকে তো পরদার অনুরোধে বন্দি করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পরদার আয়োজন করিলে, উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন নাকি?'

'না ভাই! বন্দুক-গুলি তো নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না—অস্ত্রদ্বারা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর [illegible] পরদার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না—যেহেতু তাহারা অনেক দূরে [illegible] বিশেষত তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।'

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম—'হয়তো রণভূমে মূর্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভাবে তাহাদেরই নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল—'।

'তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়—স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে।'

'বটে? কী প্রকারে? আর আপনারা বিনাঅস্ত্রে যুদ্ধ করিলেন কিরূপে?'

'যোদ্ধার সঙ্গে সেই সূর্যোত্তাপ-সংগ্রহের যন্ত্র ছিল মাত্র। আপনি কখনো স্টিমারের সার্চলাইট (search light) দেখিয়াছেন কি?'

'দেখিয়াছি।'

'তবে মনে করুন, আমাদের সঙ্গে অন্যূন দ্বি-সহস্র সার্চলাইট ছিল—অবশ্য সে যন্ত্রগুলি ঠিক সার্চলাইটের মতো নয়, তবে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, কেবল আপনাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে 'সার্চলাইট' বলিতেছি। স্টিমারের সার্চলাইটে উত্তাপের প্রখরতা থাকে না, কিন্তু আমাদের সার্চলাইটে ভয়ানক উত্তাপ ছিল। ছাত্রীগণ যখন সেই সার্চলাইটের কেন্দ্রীভূত উত্তাপরশ্মি শত্রুর দিকে পরিচালিত করিলেন—তখন তাহারা হয়তো ভাবিয়াছিল, একি ব্যাপার! শত-সহস্র সূর্য মর্ত্যে অবতীর্ণ। সে উগ্র উত্তাপ ও আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুগণ দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। নারীর হস্তে একটি লোকেরও মৃত্যু হয় নাই—একবিন্দু নরশোণিতেও বসুন্ধরা কলঙ্কিতা হয় নাই—অথচ শত্রু পরাজিত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে পর তাহাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র সূর্যকিরণে দগ্ধ করা গেল।'

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলাম, 'যদি বারুদ দগ্ধকালে ভয়ানক দুর্ঘটনা হইত, আপনাদের কোনো অনিষ্ট হইত!'

'আমাদের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না, কারণ বারুদ ছিল বহুদূরে। আমরা রাজধানীতে থাকিয়াই সার্চলাইটের তীব্র উত্তাপ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তবু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য জলধর বেলুন সঙ্গে রাখা হইয়াছিল। তদবধি আর কোনো প্রতিবেশী রাজা-মহারাজা আমাদের দেশ আক্রমণ করিতে আইসেন নাই।'

'তারপর পুরুষ-প্রবরেরা অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে চেষ্টা করেন নাই কি?'

'হাঁ, তাঁহারা মুক্তি পাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কতিপয় পুলিশ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে মহারানি সমীপে আবেদন করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে অকৃতকার্য হওয়ার দোষে সমর বিভাগের কর্মচারীগণই দোষী, সেজন্য তাঁহাদিগকে বন্দি করা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু অপর রাজপুরুষেরা তো কদাচ কর্তব্যে অবহেলা করেন নাই, তবে তাঁহারা অন্তঃপুর কারাগারে বন্দি থাকিবেন কেন? তাঁহাদের পুনরায় [illegible]

কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।'

মহারানি তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি আবার কখনো রাজকার্যে তাঁহাদের সহায়তার আবশ্যক হয়, তবে তাঁহাদিগকে যথাবিধি কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন।

'আমরা এই প্রথাকে 'জেনানা' না বলিয়া 'মর্দানা' বলি।'

আমি বলিলাম, 'বেশ তো। কিন্তু এক-কথা—পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি তো মর্দানায়' আছেন, আর চুরি ডাকাতির তদন্ত এবং হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি অত্যাচার দুরাচারের বিচার করে কে?'

'যদবধি 'মর্দানা' প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তদবধি এদেশে কোনোপ্রকার পাপ কিংবা অপরাধ হয় নাই, সেইজন্য আসামি গ্রেফতারের নিমিত্ত আর পুলিশের প্রয়োজন হয় না—ফৌজদারি মোকদ্দমার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটেরও আবশ্যক নাই।'

'তাই তো আপনারা স্বয়ং শয়তানকেই* শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, আর দেশে শয়তানি** থাকিবে কিরূপে। যদি কোনো স্ত্রীলোক কখনো কোনো বেআইনি কাজ করে, তবে তাহাকে সংশোধন করা আপনাদের পক্ষে কঠিন নয়। যাহারা বিনারক্তপাতে যুদ্ধ জয় করিতে পারেন—অপরাধ ও অপরাধীকে তাড়াইতে তাঁহাদের কতক্ষণ লাগিবে?'

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রিয় সুলতানা! আপনি এখানে আরও কিছুক্ষণ বসিবেন, না আমার বসিবার ঘরে চলিবেন?'

আমি সহাস্যে বলিলাম, 'আপনার রান্নাঘরটি রানির বসিবার ঘর অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। কিন্তু কর্তাদের কাজ বন্ধ করিয়া এখানে আমাদের বসা অন্যায়; আমি তাঁহাদের বে-দখল করিয়াছি বলিয়া হয়তো তাঁহারা আমাকে গালি দিতেছেন।'

আমি ভগিনী সারার বসিবার ঘরে যাইবার সময় ইতস্তত উদ্যানের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম—'আমার বন্ধুবান্ধবেরা ভারি আশ্চর্য হইবেন, যখন আমি দেশে গিয়া নারীস্থানের কথা বলিব—নন্দনকাননতুল্য নারীস্থানে নারীর পূর্ণ আধিপত্য, যৎকালে পুরুষেরা মর্দানায় থাকিয়া রন্ধন করেন, শিশুদের খেলা দেন, এক-কথায় যাবতীয় স্ত্রীকার্য করেন। আর রন্ধনপ্রণালী এমন সহজ ও চমৎকার, যে, রন্ধনটা অত্যন্ত আমোদজনক ব্যাপার। ভারতে যে সকল বেগম খানম প্রমুখ বড়ঘরের গৃহিণীরা রন্ধনশালার ত্রিসীমায় যাইতে চাহেন না, তাঁহারা এমন কেন্দ্রীভূত সৌরকর পাইলে স্বয়ং রন্ধনকার্যে আপত্তি করিতেন না।'

'ভারতের লোকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সূর্যোত্তাপ লাভের উপায় করিতে পারেন। উত্তল একখণ্ড কাচ (convex glass) দ্বারা যেমন রবিকর একত্রিত করিয়া কাগজাদি দগ্ধ করা যায়, সেইরূপ কাচবিশিষ্ট যন্ত্র নির্মাণ করিতে অধিক বুদ্ধি ও টাকা ব্যয় হইবে না।'

'জানেন ভগিনী সারা। ভারতবাসীর বুদ্ধি সুপথে চালিত হয় না—জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। আমাদের সবকার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়, সিদ্ধি করতালি লাভে। কোনো দেশ আপনা হইতে উন্নত হয় না, তাহাকে উন্নত করিতে হয়। নারীস্থানে কখনও স্বর্ণবৃষ্টি হয় নাই—কিংবা জোয়ারের জলেও মণিমুক্তা ভাসিয়া আইসে নাই।'

---

* পুরুষ জাতিকে
** পাপ

তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'না।'

'তবেই দেখুন, ত্রিশ বৎসরে আপনারা একটা নগণ্য দেশকে সুসভ্য করিলেন, প্রকৃতপক্ষে দশ বৎসরেই আপনারা এদেশকে স্বর্গতুল্য পুণ্যভূমিতে পরিণত করিতে পারিলেন। আর আমরা একটা সুসভ্য রত্নগর্ভা দেশকে ক্রমে উন্নত করিব দূরের কথা –বরং ক্রমশ তাহাকে দীনতমা শ্মশানে পরিণত করিতে বসিয়াছি।'

'পুরুষের কার্যে ও রমণীর কার্যে এই প্রভেদ। আমি যে বলিয়াছিলাম পুরুষেরা কোনো ভালো কাজ সুচারুরূপে করিবার উপযুক্ত নয়, আপনি বোধহয় এতক্ষণে সে-কথাটা বুঝিতে পারিলেন।'

'হাঁ এখন বুঝিলাম, নারী যাহা দশ বৎসরে করিতে পারে, পুরুষ তাহা শত শত বর্ষেও করিতে অক্ষম। আচ্ছা ভগিনী সারা, আপনারা ভূমিকর্ষণাদি কঠিন কার্য করেন কিরূপে?'

'আমরা বিদ্যুৎসাহায্যে চাষ করিয়া থাকি। চপলা আমাদের অনেক কাজ করিয়া দেয়—ভারী বোঝা উত্তোলন ও বহনের কার্যও সে-ই করে। আমাদের বায়ুশকট ও তদ্দ্বারা চালিত হয়। দেখিতেছেন, এদেশে রেল-বর্ত্ম বা পাকা বাঁধ সড়ক নাই, কেবল পদব্রজে ভ্রমণের পথ আছে।'

'সেইজন্য এখানে রেলওয়ে দুর্ঘটনার ভয় নাই—রাজপথেও লোকে শকটচক্রে পেষিত হয় না। যে-সব পথ আছে, তাহা তো কুসুমশয্যা বিশেষ। বলি, আপনারা কখনো কখনো অনাবৃষ্টিজনিত ক্লেশ ভোগ করেন কি?'

'দশ-এগার বৎসর হইতে এখানে অনাবৃষ্টিতে কষ্ট পাইতে হয় না। আপনি ঐ যে বৃহৎ বেলুন এবং তাহাতে সংলগ্ন নল দেখিতে পাইতেছেন—উহা দ্বারা আমরা যত ইচ্ছা বারিবর্ষণ করিতে পারি। আবশ্যকমতো সমস্ত শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। আবার জলপ্লাবনেও আমরা ঈশ্বর কৃপায় কষ্টভোগ করি না। ঝঞ্ঝাবাত এবং বজ্রপাতেরও উপদ্রব নাই।'

'তবে তো এদেশ বড় সুখের স্থান। আহা মরি! ইহার নাম 'সুখস্থান' হয় নাই কেন? আপনারা ভারতবাসীর ন্যায় ঝগড়াকলহ করেন কি? এখানে কেহ গৃহবিবাদে সর্বস্বান্ত হয় কি?'

'না ভগিনী। আমাদের কোঁদল করিবার অবসর কই? আমরা সকলেই সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকি—প্রকৃতির ভাণ্ডার অন্বেষণ করিয়া নানাপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা আহরণের চেষ্টায় থাকি। অলসেরা কলহ করিতে সময় পায়—আমাদের সময় নাই। আমাদের গুণবতী মহারানির সাধ—সমস্ত দেশটাকে একটি উদ্যানে পরিণত করিবেন।'

'রানীর এ-আকাঙ্ক্ষা অতি চমৎকার। আপনাদের প্রধান খাদ্য কী?'

'ফল।'

'ভালো কথা, আপনারাই তো সব কাজ করেন, তবে পুরুষেরা কী করেন?'

'বড় বড় কল কারখানায় যন্ত্রাদি পরিচালিত করেন, খাতাপত্র রাখেন—এক-কথায় বলি, তাঁহারা যাবতীয় কঠিন পরিশ্রম অর্থাৎ যে-কার্যে কায়িকবলের প্রয়োজন সেইসব কার্য করেন।'

'আমি হাসিয়া বলিলাম—'ওহ্। তাঁহারা কেরানি মুটে মজুরের কাজ করিয়া থাকেন।'

'কিন্তু কেরানি ও শ্রমজীবী বলিতে ঠিক যাহা বুঝায় এদেশের ভদ্রলোকেরা তাহা

নহেন। তাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশিক্ষায় আমাদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহেন। আমরা শ্রম বণ্টন করিয়া লইয়াছি—তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, অস্ত্র নির্মাণ করেন। নরনারী উভয়ে একই সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গ—পুরুষ শরীর, রমণী মন।'

'তা বেশ। কিন্তু ভারতবাসী পুরুষেরা এ-কথা শুনিলে খড়্গহস্ত হইবেন। তাঁহাদের মতে তাঁহারা একাই এক সহস্র —'তনমন' সব তাঁহারা নিজেই। আমরা তাঁহাদের 'ছাই ফেলিবার জন্য ভাঙাকুলা' মাত্র। আপনাকে আর-একটি কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, আপনারা গ্রীষ্মকালে বাড়িঘর ঠাণ্ডা রাখেন কিরূপে? আমরা তো বৃষ্টিধারাকে স্বর্গের অমিয় ধারা মনে করি।'

'আমাদেরও সুস্নিগ্ধ বৃষ্টিধারার অভাব হয় না। তবে আমরা পিপাসী চাতকের ন্যায় জলধরের কৃপা প্রার্থনা করি না, এখানে কাদম্বিনী আমাদের সেবিকা—সে আমাদের ইচ্ছানুসারে শীতল ফোয়ারায় ধরণী সিক্ত করিয়া দেয়। আবার শীতকালে সূর্যোত্তাপে গৃহগুলি ঈষৎ উত্তপ্ত রাখা হয়।'

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহার স্নানাগার দেখাইলেন। এ-কক্ষের ছাদটা বাক্সের ডালার মতো। ছাদ তুলিয়া ফেলিয়া ইচ্ছামতো বৃষ্টিজলে স্নান করা যায়। প্রত্যেকের গৃহপ্রাঙ্গণে বেলুনের ন্যায় বৃহৎ জলাধার আছে—আদি বেলুনের সহিত ঐ জলাধারগুলির যোগ আছে। আমি মুগ্ধভাবে বলিলাম, 'আপনারা ধন্য। স্বয়ং প্রকৃতি আপনাদের সেবাদাসী, আর কী চাই! পার্থিব সম্পদে তো আপনারা অতিশয় ধনী, আপনাদের ধর্মবিধান কিরূপ—জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

'আমাদের ধর্ম—প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসিতে ধর্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্যত্যাগ করিতে পারি না। যদি কালেভদ্রে কেহ মিথ্যা বলে ....'

'তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়?'

'না, প্রাণদণ্ড হয় না। আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিজগতের জীবহত্যায়, বিশেষত মানবহত্যায় আমোদবোধ করি না। কাহারও প্রাণনাশ করিতে অপর প্রাণীর কী অধিকার? অপরাধীকে নির্বাসিত করা হয়, এবং তাহাকে এদেশে কিছুতেই পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।'

'কোনো মিথ্যাবাদীকে কখনো ক্ষমা করা হয় না কি?'

'যদি কেহ অকপট হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়, তাহাকে ক্ষমা করা যায়।'

'এ-নিয়ম অতি উত্তম। এখানে যেন ধর্মই রাজত্ব করিতেছে। ভালো, একবার, মহারানিকে দেখিতে পাইব কি? যিনি করুণাপ্রতিমা, নানা গুণের আধার, তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য হয়।'

'বেশ চলুন।' এই বলিয়া ভগিনী সারা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। একখণ্ড তক্তায় দুখানি আসন স্ক্রু দ্বারা আঁটা হইল। পরে তিনি কতিপয় গোলা আনিলেন। গোলা কয়টি দেখিতে বেশ চক্‌চকে ছিল, কোন্ ধাতুতে গঠিত তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, আমার মনে হইল উৎকৃষ্ট রোপ্য-নির্মিত বলিয়া। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ওজন কত। আমি জীবনে কোনোদিন ওজন হই নাই, কাজেই

নিজের গুরুত্ব আমার জানা ছিল না, ভগিনী বলিলেন 'আসুন তবে আপনাকে ... করি। ওজনটা জানা প্রয়োজন।'

আমি ভাবিলাম, একি ব্যাপার! যাহা হউক ওজনে আমি একমণ ... হইলাম। শুনিলাম, তিনি আটত্রিশ সের মাত্র। তবে ভগিনী সারার অপেক্ষা ... কোনো গুণে না হউক আমি গুরুত্বে বেশি তো।

তারপর দেখিলাম, ঐ চকচকে গোলার ছোটবড় দুইটি গোলা এই তক্তায় সংযোগ করা হইল। আমি প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, সে-গোলা হাইড্রোজেন পূর্ণ। তাহারই সাহায্যে আমরা শূন্যে উত্থিত হইব। বিভিন্ন ওজনের বস্তু উত্তোলনের নিমিত্ত ছোটবড় বিবিধ ওজনের হাইড্রোজেন গোলা ব্যবহৃত হয়। এখন বুঝিলাম, এইজন্য আমার ওজন অবগত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর এই অপরূপ বায়ুযানে দুইটি পাখার মতো ফলা সংযুক্ত হইল, শুনিলাম ইহা বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা উভয়ে আসনে উপবেশন করিলে পর তিনি ঐ পাখার কল টিপিলেন। প্রথমে আমাদের 'তখ্‌তে রওয়াঁ'খানি* ধীরে ধীরে ৭/৮ হাত উর্ধ্বে উত্থিত হইল, তারপর বায়ুভরে উড়িয়া চলিল। আমি ভাবিলাম, এমন জ্ঞানেবিজ্ঞানে উন্নত দেশের অধীশ্বরীকে দেখিতে যাইতেছি, যদি আমার কথাবার্তায় তিনি আমাকে নিতান্ত মূর্খ ভাবেন—এবং সেইসঙ্গে আমাদের সাধের হিন্দুস্থানকে 'মূর্খস্থান' মনে করেন? কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না—সবে তখ্‌তে রওয়াঁ শূন্যে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে আর অমনই দেখি, আমরা চপলাগতিতে রাজধানীতে উপনীত। সেই বায়ুযানে বসিয়াই দেখিতে পাইলাম, সখী-সহচরী পরিবেষ্টিতা মহারানি তাঁহার চারি বৎসর বয়স্কা কন্যার হাত ধরিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। সমস্ত রাজধানী যেন একটি বিরাট কুসুমকুঞ্জ বিশেষ, তাহার সৌন্দর্যের তুলনা এ-জগতে নাই।

মহারানি দূর হইতে ভগিনী সারাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, 'বা! আপনি এখানে।' ভগিনী সারা রানিকে অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে তখ্‌তে রওয়াঁ অবনত করিলে আমরা অবতরণ করিলাম।

আমি যথাবিধি মহারানির সহিত পরিচিতা হইলাম। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। আমার যে আশঙ্কা ছিল, তিনি আমাকে কী যেন মনে করিবেন, এখন সে ভয় দূর হইল। তাঁহার সহিত রাজনীতি সম্বন্ধে বিবিধ প্রসঙ্গ হইল। বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্বন্ধেও কথা উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, 'অবাধ বাণিজ্যে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু যে-সকল দেশে রমণীবৃন্দ অন্তঃপুরে থাকে অথবা যে-সব দেশে নারী কেবল বিবিধ বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ জীবনে বহন করে, দেশের কোনো কাজ করে না, তাহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত নারীস্থানে আসিতে বা আমাদের সহিত কাজকর্ম করিতে অক্ষম। এই কারণে অন্য দেশের সহিত আমাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিতে পারে না। পুরুষেরা নৈতিক জীবনে অনেকটা হীন বলিয়া আমরা তাহাদের সহিত কোনোপ্রকার কারবার করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা অপরের জমিজমার প্রতি লোভ করিয়া দুই-দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না, অথবা একখণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না—যদ্যপি তাহা কোহেনুর অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ হয়, কিংবা কাহারও ময়ূরসিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে

* ইংরেজিতে 'Travelling throne' বলা যাইতে পারে।

ঢুঁড়িয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে আমরা তাহাই ভোগ করি। তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্তে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।'

মহারানির নিকট বিদায় লইয়া আমি সেই সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দেখিতে গেলাম, এবং কতিপয় কলকারখানা, রসায়নাগার এবং মানমন্দিরও দেখিলাম।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ পরিদর্শনের পর আমরা পুনরায় সেই বায়ুযানে আরোহণ করিলাম। কিন্তু সেই আমাদের তখতে রওয়াঁখানি ঈষৎ হেলিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, আমি কী জানি কিরূপে আসনচ্যুত হইলাম—সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি, আমি তখনো সেই আরামকেদারায় উপবিষ্ট।

ডেলিশিয়া-হত্যা*

'হত্যা' শব্দ শুনিয়া পাঠিকা ভগিনী ভয় পাইবেন না যে ইহা সত্যই ছোরা তরবারি বা বন্দুক পিস্তল দ্বারা রক্তারক্তি বিশিষ্ট হত্যাকাণ্ড! প্রসিদ্ধা গ্রন্থকর্ত্রী মিস মেরি করেলি 'ডেলিশিয়া হত্যা' নামক এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। ডেলিশিয়া কাহিনীর সহিত আমাদের নারীসমাজের এমন চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে, গ্রন্থখানি পাঠকালে অবাক হইয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

এ পোড়া ভারত অন্তঃপুরের কথা
জানিল কী ছলে মেরি করেলি।

অদ্য আমরা ইংলন্ডের সামাজিক অবস্থার সহিত আমাদের সমাজের দুরবস্থার তুলনা করিয়া দেখিব, অবলা পীড়নে কোন্ সমাজ কিরূপ সিদ্ধহস্ত।

ইংরাজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাহারা স্বাধীন, বিদূষী পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা—তাঁহাদের আরও কত কী সুখ-সৌভাগ্যের চাকচিক্যময় মূর্তি মানস-নয়নে দেখি। কিন্তু একবার তাহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা। দূরের ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর। সভ্যতা ও স্বাধীনতার লালনভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত 'ডেলিশিয়া বধকাব্য' নিত্য অভিনীত হয়। রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা!!

সংবাদপত্রসমূহে কোনো কোনো বিখ্যাত ইংরাজ-দম্পতির প্রতিকৃতি দেখিলে আমাদের মনে হয়—লর্ড অমুক তো বেশ প্রতিপত্তিশালী, জগতের চক্ষে ধাঁধা লাগান, কিন্তু লেডি অমুকের বুকখানি চিরিয়া দেখিলে জানিতে পারিতাম তাহাতে সুখ কতখানি।

গ্রন্থকর্ত্রী মেরি করেলি স্বয়ং অবলা, তাই ডেলিশিয়ার মর্মবেদনা অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। এবং অবলা পাঠিকারাই সম্যকরূপে 'ডেলিশিয়া বধের' মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন। এই চমৎকার উপন্যাসের অবিকল অনুবাদ করা সহজ ব্যাপার নহে, তবু উহার গল্পাংশের অনুবাদ পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

* প্রকৃত উচ্চারণ 'ডিলিশিয়া', কিন্তু বঙ্গভাষায় 'ডেলিশিয়া' শ্রুতিমধুর বোধহয় বলিয়া আমরা 'ডেলিশিয়া' লিখিলাম।

গ্রন্থকর্ত্রী উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, সামাজিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে 'ডেলিশিয়া' চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। অনেক সত্য ঘটনা আমাদেরও জানা আমরা ভারতের সেই প্রপীড়িতা অবলাদের একটি নমুনা (representative) চ নাম রাখিলাম 'মজলুমা'। 'ডেলিশিয়া'র প্রতিচ্ছত্রে প্রতিবর্ণে যেন 'মজলুমা'রই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

'মজলুমা' চিত্রটি ডেলিশিয়া চিত্রের পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইব—ইংলণ্ডের নারী-সমাজের সহিত ভারত-ললনা সমাজের কী চমৎকার সাদৃশ্য। আর কোথায় কি প্রকার পার্থক্য আছে, তাহাও দেখা যাইবে।

ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুরবন্দিনী নহেন; আর মজলুমা পরাধীনা, প্রজার জাতি এবং কঠোর অপরাধে বন্দিনী। কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়—উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্মপীড়িতা কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর—এই একটা ভারী পার্থক্য আছে। সুশিক্ষিতা ডেলিশিয়া জীবনসমরপ্রাঙ্গণে অমিততেজা বীরার ন্যায় (স্বামীরূপ) গুপ্তঘাতকের শরাঘাতে নিহত হয়, যৎকালে অশিক্ষিতা মজলুমা নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অত্যাচারী স্বামীর পদতলে মর্দিতা হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তেজস্বিনী ডেলিশিয়া পিস্তলহস্তে স্বামীকে স্পষ্ট বলিলেন, 'তুমি আমার নিকট আর একপদ অগ্রসর হইলে আমি তোমাকে গুলি করিব।' অভাগিনী মজলুমা সেরূপ কথা বলিবেন দূরে থাকুক—তিনি বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুকাইয়া নাকি কান্না ধরিবেন—বলিবেন, 'প্রভো। দাসীর কী অপরাধ হইয়াছে?' অথবা 'দাসীর প্রতি সদয় হও।' শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণযুগল ধুইতে বসিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন—ডেলিশিয়া ও মজলুমায় এই প্রভেদ।

ডেলিশিয়ার আত্মমর্যাদাজ্ঞান আছে, মজলুমার তাহা নাই। নির্যাতিতা প্রপীড়িতা হইলেও ডেলিশিয়ার কেমন একপ্রকার মহীয়ন গরীয়ান ভাব আছে, অত্যাচারী কর্তৃক তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইতেছে কিন্তু অবনত হইতেছে না। তিনি গর্বোন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া মরিবেন, কিন্তু নতশিরে যুক্ত করে প্রাণভিক্ষা চাহিবেন না। এই মহান ভাবটা যেন মজলুমার নাই। ইহার কারণ এদেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, 'তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম।' সুতরাং তাহার আত্মা পর্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না—পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারংবার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদলেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা ডেলিশিয়ার ও পরাধীনা মজলুমায় এই প্রভেদ।

এদেশের গ্রন্থকারেরা নারীচরিত্রকে নানা গুণভূষায় সজ্জিত করেন বটে; বেশিরভাগে অবলা হৃদয়ের সহিষ্ণুতা বর্ণনা করা হয় (কারণ রমণী পাষাণ-প্রায় সহিষ্ণু না হইলে তাহার প্রতি অত্যাচারের সুবিধা হইত না যে!) কিন্তু এসব পুস্তকে নায়িকার আত্মাগরিমার অস্তিত্ব দেখা যায় না।

এখন ডেলিশিয়া কাহিনীর গল্পাংশ অনুবাদ করা যাউক :

• • •

ডেলিশিয়া বাল্যকাল হইতে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। যখন তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল। তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাবলি পাঠকসমাজে যথেষ্ট আদৃত হইত। এইরূপে প্রতিভাশালিনী ডেলিশিয়া বে

খ্যাতি লাভ করিলেন এবং পুস্তক বিক্রয়ের ফলে যথেষ্ট অর্থলাভ করিতে লাগিলেন। শুধু এইসঙ্গে তাঁহার অনেক শত্রুরও সৃষ্টি হইল। দেশের অপর লেখকবৃন্দ হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে পুস্তকরচনা কেবল পুরুষের কার্য। রমণীগণ কেবল নানাপ্রকার বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া বিলাসপঙ্কে নিমজ্জিতা থাকিবে। আর যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তবে যে-নারীর বয়স নাই, রূপ নাই, যে অতি বিশ্রী কদাকার কুৎসিতা সেই লেখনী ধারণ করুক। ডেলিশিয়ার ন্যায় নিরুপমা রূপসী কিশোরী তাঁহাদের যশোপ্রভা ম্লান করিবে, ইহা যে একেবারে অসহ্য।

সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রমে ডেলিশিয়ার বিবাহ হয়। এ দীর্ঘ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রতিভাশালিনী, অর্থশালিনী, সৌন্দর্যের রানি, ডেলিশিয়া যে অবিবাহিতা ছিলেন, তাহার কারণ প্রধানত এই যে, সাধারণ পুরুষ-সমাজ তাঁহাকে কেমন একপ্রকার ঘৃণাভক্তি ও স্থলবিশেষে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। নিজের বেশভূষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসিনী, সতত পুস্তক রচনায় নিযুক্তা রমণীকে বিবাহ করিয়া দাম্পত্যজীবনে সুখী করিতে পারিবেন, এরূপ ভরসা হয়তো কেহ করিতে পারেন নাই। (আমাদের দেশে তো 'পুস্তকলেখিকা' নাই বলিলেই হয়, তবু 'পুস্তক পাঠিকা'কেও 'নভেল পাণি' জ্ঞানে অনেকে বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হন!)

মিস্টার উইলফ্রেড কারলিঅন উচ্চবংশজাত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পিতার ইচ্ছায় সৈনিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। 'ছিল' বলিতে মি. কারলিঅনের ছিল ছয় ফুট দীর্ঘাকৃতি, সৌম্যমূর্তি আর বুনিয়াদি বংশমর্যাদা। আয় এত অল্প যে তাহা ধর্তব্য নহে। মি. কারলিঅন দেখিলেন, ডেলিশিয়া-শিকার মন্দ নহে। একে তো তিনি আভরণহীনা গোলাপ-মুকুল; দ্বিতীয়ত বিপুল অর্থশালিনী। অবেশেষে একদিন ডেলিশিয়ার জন্য সেই শুভমুহূর্ত আসিল—যে মুহূর্ত মানবজীবনে (? না, নারীজীবনে) মাত্র একবার আসে; যাহা ভগ্ন তরঙ্গের বাষ্পকণার মতো ক্ষণস্থায়ী—যাহা আকাশে উল্কার ন্যায় প্রতিভাত হয়, চাহিয়া দেখিতে-না-দেখিতে চির অন্তর্হিত হয়! ডেলিশিয়ার জীবনে সেই স্মরণীয় মুহূর্ত আসিল। সেদিন ডেলিশিয়া কোনো বড়লোকের গৃহে নৈশভোজে নিমন্ত্রিতা ছিলেন; মি. কারলিঅনও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

'ডেলিশিয়া!' মি. কারলিঅন ডেলিশিয়ার হস্তধারণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ডেলিশিয়া, আমি তোমায় ভালোবাসি!'

* * *

ডেলিশিয়ার বিবাহের দিন গির্জার বাহিরে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল—একপক্ষে সৌন্দর্যদেবতা অপরপক্ষে সাহিত্যের দেবী—এ বিবাহকে কার্তিক এবং সরস্বতীর মিলন বলা যাইতে পারে—এ নবদম্পতিকে দেখাই চাই। জনতার অনেকে যে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ ডেলিশিয়া প্রাপ্ত হইলেন।

সচরাচর বলা হয় 'বর কন্যাকে বিবাহ করিল,' কিন্তু এক্ষেত্রে বলিতে হইবে—কন্যা বরকে বিবাহ করিলেন। কারণ ডেলিশিয়াই মি. কারলিঅনের অন্নবস্ত্র ইত্যাদি জোগাইবার ভার লইলেন! মজলুমার বেলায় আবার এরূপ বলা খাটে না, সেস্থলে বলিতে হইবে—জমিদারি ধনদৌলত সহ দাসী স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন! ফল কথা, ডেলিশিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র নির্মাণ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার স্বামী নিষ্কর্মা (drone) মক্ষীর ন্যায় মধু ভোগ করিতে লাগিলেন।

বিবাহের দিন অলঙ্কার বলিতে ডেলিশিয়া একগুচ্ছ সদ্য প্রস্ফুটিত [illegible] পরিয়াছিলেন। উহাতে রমণীমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। নবপরিণীতা ডেলিশিয়ার গহনা নাই। কী আশ্চর্য! ওমা! ঠিক যেন আমাদের নারীসমাজ! ৫/৭ জন [illegible] নবীনা একত্র হইলে, তাঁহারা কেবল অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচার করেন। যেই কোন নববধূতা নববধূ আইসে, উপস্থিত রমণীবৃন্দ অমনি তাহার নাক কান ও গলদেশের খানাতল্লাশি আরম্ভ করে—কোথায় কী গহনা আছে। কর্ণাভরণ দেখিবার জন্য বেচারীর কান লইয়া যত টানাটানি হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ভারত-বধূর ন্যায় ডেলিশিয়ার কর্ণ ধরিয়া টানাটানি হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ণকুহর (শ্রবণশক্তি) লইয়া মুখরগণ যথেষ্ট টানাটানির প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

প্রৌঢ়া মহিলাসমাজ আন্দোলন আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, বেচারা কারলিঅন এমন সুশ্রী সুপুরুষ—তিনি বিবাহ করিলেন একটা 'স্ত্রী গ্রন্থকর্ত্রী'কে (female authoress)!

পক্ষান্তরে মি. কারলিঅন বন্ধুমহলে ডেলিশিয়া সম্বন্ধে বলিতেন, 'তিনি স্বাভাবিক গোলাপফুল—কৃত্রিম রঙ, কলপ, পরচুলা (যাহা স্ত্রী-কয়েদিদের মাথা হইতে কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়), এসেন্স পাউডার —এ সকল কিছুরই ধার ধারেন না।'

তচ্ছ্রবণে জনৈক বন্ধু বলিলেন, 'ভাগ্যবান কুকুর (lucky dog)! তুমি এমন পুরস্কারের যোগ্য নহে।'

'সম্ভবত নহি; কিন্তু—' বলিয়া মি. কারলিঅন বন্ধুর দিকে মধুর দৃষ্টিপাত করিলেন সেই চাহনিতেই তাঁহার কথার বাকি অংশ সমাপ্ত হইল। তিনি তাঁহার ঐ সুন্দর কটাক্ষ-বাণেই তো ডেলিশিয়াকে বিদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুগণ আমোদ করিয়া তাঁহাকে 'বিউটি কারলিঅন' (Beauty Carlyon) বলিয়া ডাকিতেন।

ডেলিশিয়ার বিবাহ-জীবনের প্রায় তিন বৎসর একরূপ নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তিনি সামাজিক আমোদ-উৎসবে বড় একটা যোগদান করিতেন না; অধিকাংশ সময় সাহিত্য-সেবায় যাপন করিতেন। লেখকেরা নির্জনতাই ভালোবাসে। যে আধ্যাত্মিক ভাবের আস্বাদ পাইয়াছে, সে বহির্জগতের অন্তঃসারহীন আমোদ-আহ্লাদে বৃথা সময় নষ্ট করিতে চাহে না। উইলফ্রেড কারলিঅন কিন্তু 'বল'নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অসার আমোদ বড় ভালোবাসিতেন। তিনি প্রায় প্রতিদিনই দুই-তিনটা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন।

এই সময় ডেলিশিয়ার সুখের বাসায় এক স্ফুলিঙ্গ-অগ্নি আসিয়া পড়িল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। অগ্নিকণা তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে দাহক্রিয়া আরম্ভ করিল।

দুই-একজন পরিচিত লোক তাঁহাকে ঐ অগ্নির বিষয় জানাইতে চেষ্টা করিলেন, ডেলিশিয়া তাহা শুনিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'লোকগুলো অনর্থক আমাদের দাম্পত্যজীবনে অশান্তি আনিতে চায়। পরনিন্দা করিয়া উহারা কী সুখ পায়?' তিনি সময়ে সাবধান হইলে হয়তো অভিনয় এতদূর গড়াইত না। স্বামীকে সংশোধন করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর প্রতি অন্ধ অনুরাগবশত তিনি তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিলেন না।

মি. কারলিঅন একদিন বলিলেন, 'সাহিত্য-সেবিকা মহিলারা কোনোরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হয় না, ইহা বড় অন্যায় এবং দুঃখের বিষয়। যাহা হউক ডেলিশিয়া, আমি তোমাকে একটি উপাধি দিতেছি—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় এখন আমি পৈতৃক লর্ড উপাধির উত্তরাধিকারী হইয়াছি।'

...ভাসাশয়া ফাঁকা উপাধি প্রাপ্তিতে হাসিয়া ফেলিলেন। বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, 'প্রভো আমি আপনার দীনতমা সেবিকা।'

লেডি শব্দ কি ডেলিশিয়ার সম্মান বৃদ্ধি করিবে? তিনি লেখিকারূপে যে যশোলাভ করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এ লেডি পদবি কী? অমন কত লেডি জগতে অপরিচিত অবস্থায় মরে বাঁচে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু 'গ্রন্থকর্ত্রী ডেলিশিয়া' নামটি অমর থাকিবে।

আর একদিন লর্ড কারলিঅন বলিলেন, 'আমি মনে করি, সেই প্রাচীনকাল ভালো ছিল।'

'বটে? যখন পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রাখিত—যেমন গবাদিপশুকে খোঁয়াড়ে রাখা হয়'*—এবং তাদের বিবেচনায় যতটুকু খাদ্য রমণীদের পাওয়া উচিত মনে করিত, তাহাই তাহাদের দিত--আর নারীগণ অবাধ্য হইলে তাহাদের প্রহার করিত? হইতে পারে, সে-কাল সুখের ছিল, কিন্তু আমি তাহার পক্ষপাতী নাহি। আমি জগতের ক্রমোন্নতি দেখিতে চাই--আমি চাই সভ্যতা--যাহাতে নারী ও পুরুষ সুশিক্ষা লাভ করে।'

* * *

কারলিঅন বলিলেন, 'আমার মতে উন্নতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। আমি ইহার গতি মন্দ হওয়ার পক্ষে ভোট দিতে চাই।'**

পরশ্রীকাতর লোকেরা কাহারও সুখ-সুখ্যাতি সহ্য করিতে পারে না। ডেলিশিয়ার পতিব্রতাজীবন মোটের উপর অত্যন্ত সুখের ছিল—তিনি কেবল একবার একটি শিশুর মৃত্যুশোক পাইয়াছিলেন, এ শোক তো পাবক--ইহাতে হৃদয় পবিত্র হয়। জনীহৃদয়ের ঐ জ্বালাটুকু ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোনো অশান্তি বা দুঃখ ছিল না। সাহিত্যজগতেও তিনি বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এতখানি সুখ হিংসুকের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টায় ছিল। ডেলিশিয়া সংসার চিনিতেন, তাই সতর্কতাবশত লোকনিন্দায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি নিন্দুকের মিথ্যানিন্দা এড়াইতে গিয়া বন্ধুর কথায়ও কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার ন্যায় সতীলক্ষ্মীর স্বামী পথভ্রষ্ট হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। আহা! ইহার কী সরল বিশ্বাস ছিল!

তাঁহার জনৈক বন্ধু মি. পল ভালডিস নানা ইঙ্গিতে ডেলিশিয়াকে সতর্ক করিতে চাহিলেন, তাহাতে ডেলিশিয়া চটিলেন! মি. ভালডিস ডেলিশিয়ার প্রিয় কুকুর স্পার্টানের গায় সাদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'লেডি কারলিঅন, আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু বলিতে এখন কেবল একজন আছে।'

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনি স্পার্টানের কথা বলেন, না আপনার নিজের?'

ভালডিস বলিলেন, 'স্পার্টানের কথা বলি!'

ক্রমে কথাপ্রসঙ্গে যখন মি. ভালডিস বলিলেন, লর্ড কারলিঅন নগণ্য কিছুই নহেন,

---

* মিস করেলি সম্ভবত কখনো ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তাই তিনি চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধা রমণীদের অবস্থাকে 'অতীতকালের' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আমরা অন্তঃপুরকে 'খোঁয়াড়' বলিয়া স্বীকার করি না। কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়? --এটর্ড থ্র তটর্ড!!

** সময়ের গতি যে কাহারও ভোটের অপেক্ষা করে না, তাই রক্ষা। ইংলিশম্যানের যখন এই মত, তবে আর ভারতবাসীর নিকট কী আশা করিব!

তখন ডেলিশিয়া বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ মি. ভালডিসকে বিদায় দিলেন
পতিপ্রাণা সত্যি কি পতিনিন্দা সহিতে পারেন?

ডেলিশিয়ার ব্যবহারটা যেন স্পার্টানের পছন্দ হইল না--সে তাঁহার মুখ
লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই--'তুমি মি. ভালডিসকে তাড়াইয়া দিলে কেন,
আমার পরম বন্ধু।' ডেলিশিয়া কুকুরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,
তিনি আমাদের প্রভুর নিন্দা করিতেছিলেন যে, তাঁহাকে আর আমরা নিকটে
দিব না।' স্পার্টান কিন্তু কর্ত্রীর এ-কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না।

যাহাদের কবিতা, রচনা প্রভৃতি ডেলিশিয়ার গ্রন্থের ন্যায় আদৃত হইত না,
হিংসায় দগ্ধ হইতে লাগিল। 'বোহেমিয়ান' ক্লাবে ৮/১০ জন ভদ্রলোক। একত্র
তাহাদের অধিকাংশ লোক ডেলিশিয়ানিন্দা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতে
একজন কবি বলিলেন, 'স্ত্রীলোক এমন লিখিতে পারিবে কেন, অধিকাংশ পুস্তক
স্বামী লিখিয়া দেন।' মি. ভালডিস বলিলেন, 'মিথ্যা কথা! তাঁহার স্বামী আপনার
মতো মস্ত গাধা!'

'আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিলেন মিস্টার ভালডিস! আর আমাকে গা
বলিতেও ছাড়েন নাই!'

ভালডিস বলিলেন, 'হাঁ! আমি লর্ড কারলিঅনের স্বহস্ত-লিখিত পত্র দেখিয়াছি
তিনি প্রতি শব্দে বানান ভুল করেন, প্রতিছত্রে ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেন। আপনি যদি
মনে করেন যে, এই বিদ্যা লইয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর পুস্তক লিখেন, তবে আপনি
অবশ্যই গাধা! কিন্তু আপনি বাস্তবিক তাহা মনে করেন না, কেবল একজন মহিলার
যশোপ্রভা দর্শনে হিংসাদগ্ধ হইয়া এমন কথা বলেন।'

কতক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর কবি বলিলেন, 'জানেন মি. ভালডিস, লেখনীর ধার
অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ!'

ভালডিস তুচ্ছভাবে হাসিয়া বলিলেন, 'ওহো! বুঝিলাম আপনি অর্ধপেনি মূল্যের
সংবাদপত্রে আমাকে গালি দিবেন।'

* * *

একদা ডেলিশিয়া তাঁহার প্রভুর জন্য অনেকগুলি জিনিস ক্রয় করিতে দোকানে
গিয়াছেন। লর্ডের ফরমাইশ ছাড়া আরও বিশেষ কোনো বস্তু ক্রয় করিবারও ইচ্ছা
ছিল। তাঁহাদের বিবাহের বার্ষিক উৎসব হইবে, সেই শুভদিনে তিনি লর্ড কারলিঅনকে
কিছু উপহার দিবেন। প্রেম তো অশরীরী, তাহা ব্যক্ত করিবার জন্য জড়বস্তুর
অবলম্বনই চাই। পতিব্রতা সতী তাঁহার অকৃত্রিম পতিভক্তি একটি অঙ্গুরীয় বা একসেট
বোতামের আকারে স্বামীকে উপহার দিবেন। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরিয়া একস্থানে
জানালার বাহির হইতে একজোড়া বোতাম দেখিয়া ডেলিশিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বোতাম ক্রয়ের নিমিত্ত ডেলিশিয়া সেই-দোকানে প্রবেশ করিলেন। মণিকার
তাঁহাকে ধনবতী ভাবিয়া সযত্নে অনেক মণিমুক্তার অলঙ্কার দেখাইতে আরম্ভ করিল
ডেলিশিয়া মাত্র সেই বোতাম পছন্দ করিলেন, আর কিছু ক্রয় করিলেন না।

এত অল্প বিক্রয়ের পর জহুরি ক্রেতাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে কেন? সে বহুমূল্য
রত্নভাণ্ডার খুলিয়া তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। তন্মধ্যে হীরকখচিত একটি

...কোকে 'যুগনু'× বড় সুন্দর ছিল। কপোতের চঞ্চুপুটে একটি ...একটি শ্লোক (মটো) পদ্মরাগে খচিত ছিল। ডেলিশিয়া ...
...বলেন, 'এ যুগনুটি তো বড় চমৎকার! ইহাতে কবিত্ব ও শিল্প নৈপুণ্য দুই ...
...কিন্তু এটি বিক্রয় হইবে না। ইহা লর্ড কারলিঅনের বিশেষ ফরমাইশ অনুসারে ...
...হইয়াছে।'

ডেলিশিয়া ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। এবার হয়তো বিবাহের বার্ষিক উৎসবের ...লর্ড কারলিঅন ডেলিশিয়াকে এই যুগনু উপহার দিবেন; তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই ...যুগনুটি ডিবে হইতে বাহির করিয়া সূর্যকিরণে ধরিল—যাহাতে মণিগুলি বেশ ...করে! সে ডেলিশিয়াকে চিনিত না। বেশ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল--

...কপোতের জন্য লর্ড কারলিঅনকে পাঁচশত পাউন্ডের কিছু বেশি (প্রায় ৮০০০ ...দিতে হইবে। তা ভদ্রলোকে যখন কোনো মহিলা-বিশেষকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা ...তখন এরূপ ব্যয়বাহুল্যে কুণ্ঠিত হন না। এক্ষেত্রে সে মহিলাটি যে ...রিঅনের পত্নী নহেন, তাহা অবশ্যই আপনি বুঝিতে পারেন।'

ডেলিশিয়া বলিলেন, 'আমি সেরূপ কিছু মনে করিব কেন? আমি তো বুঝি ইহাই ...ধিক যে, কোনো ভদ্রলোক তাঁহার সহধর্মিণীকে উপহার দিবার জন্য এরূপ যুগনু ...ণ করাইবেন।'

জহুরি বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বটে? কিন্তু ফলত আমরা ইহাই দেখিতে ...যে, যখনই কোনো ভদ্রলোক কোনো বিশেষ ফরমাইশ দেন, সে বস্তু কখনোই ...হার ধর্মপত্নীর হাতে পড়ে না। আমরা সর্বদাই ইহাতে দুঃখিত হই যে, আমাদের ...যত্নে প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ মহিলারা প্রাপ্ত হন না।... নচেৎ এই বহুমূল্য হীরক-...পোতটি কেন লেডি কারলিঅনের নিকট না যাইয়া নর্তকী লা-মেরিনার নিকট ...ইতেছে?'

অ্যাঁ। মণিকার এ কী বলিল? ডেলিশিয়ার মাথা ঘুরিয়া গেল!

* * *

...শেষে জহুরী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, —'আপনি লেডি কারলিঅনের গ্রন্থাবলি পাঠ ...করিয়াছেন কি? তিনি সাহিত্যজগতে 'ডেলিশিয়া ভাহান' নামে পরিচিত।'

ডেলিশিয়া বলিলেন, 'হাঁ—মনে হয়, পড়িয়াছি।'

জহুরী। তা বেশ। তিনি বাস্তবিক অতি যশস্বিনী রমণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার ...মী তাঁহার বিষয় একটুও ভাবেন না। ...শুনিতে পাই লর্ড কারলিঅন যে টাকার ...ন অপব্যয় করেন, তাহা তাঁহার পত্নীর; তাঁহার নিজের এক পয়সাও নাই। যদি এ-...থা সত্য হয় তবে কী লজ্জাকর বিষয়! অবশ্য লেডি কারলিঅন না-জানিয়াই মেরিনার ...লঙ্কারের মূল্য দিয়া থাকেন! ... তবে আপনি এই বোতামজোড়া লইবেন তো?

ডেলিশিয়া। হাঁ, ধন্যবাদ। এগুলি ভদ্রলোককে উপহার দিবার উপযুক্ত।

জহুরী। ঠিক। ইহার কারুকার্যে প্রগলভতা মোটেই নাই, অথচ সৌন্দর্য আছে। ইহা

× আমাদের দেশে পাচনরি বা সাতনরি মুক্তামালার মধ্যস্থলে যে জড়াও 'ধুকধুকি' থাকে তাহাকে ফল্তচটর্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু যণভটটর্ত বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকে বেহার অঞ্চলে 'যুগনু' বলে। বঙ্গদেশে কেবল 'ধুকধুকি' নিজে কোনো অলঙ্কার নয়; বেহারে কিন্তু 'যুগনু' নিজেই একটি অলঙ্কার। এইজন্য আমরা 'যুগনু' শব্দ ব্যবহার করিলাম।

ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সন্দেহ নাই, কিন্তু (ঈষৎ হাস্য) 'ভদ্রলোক' [illegible] হইতেছেন।

ডেলিশিয়া স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণিকারের প্রমুখাৎ অনেক কথাই শুনিল। কথা তিনি বন্ধুবান্ধবকে বলিতে দিতেন না,—মণিকার সেই-কথা অতি নিষ্ঠুর শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিল!

এই চিত্র বঙ্গললনার কেমন বোধ হয়? ইহা কি দর্পণের ন্যায় মজলুমার প্রতিবিম্বিত করে না? মজলুমার কণ্ঠ হইতে কণ্ঠহার মোচন করিয়া কোনো বিলাসিনী না পরাইলে আর পুরুষপ্রবরের বাহাদুরি কী?

বাড়ি ফিরিয়া ডেলিশিয়া তাঁহার স্বামীর টেলিগ্রাম পাইলেন—'ডিনারের সময় ফিরিব না; আমার জন্য অপেক্ষা করিও না।'

ক্রোধে-ক্ষোভে জর্জরিতা ডেলিশিয়া স্বীয় পাঠাগারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। সঙ্গে কেবল স্পার্টান ছিল। তাহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'স্পার্টান, মনে হয় আমি যেন বিষ খাইয়াছি—'

স্পার্টান সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল, —তাঁহার সেই নির্বাক দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, 'তুমি মানুষকে বিশ্বাস কর কেন? কুকুরজাতি পুরুষাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য!'

স্পার্টান ডেলিশিয়ার ভালোবাসার যতখানি প্রতিদান দিতেছিল, লর্ড কারলিঅন ততটুকুও দিতে পারিলেন না! ডেলিশিয়া নানা চিন্তা করিতেছিলেন, —তাঁহার কঠোর শ্রমার্জিত টাকাগুলি লা-মেরিনাকে অলঙ্কার পরাইতে ব্যয়িত হইবে, ইহা কি ন্যায়সঙ্গত?

ডেলিশিয়ার টাকায় ও মজলুমার টাকায় প্রভেদ আছে। মজলুমার যে টাকা অত্যাচারী কর্তৃক অপব্যবহৃত হয়, সে টাকা মজলুমার স্বউপার্জিত নহে, —তাহা তাঁহার পূর্বপুরুষের সঞ্চিত, অর্থাৎ পুরুষেরই উপার্জিত। একজন পুরুষেরই সঞ্চিত ধন অপর-পুরুষে ধ্বংস করে, ইহা বরং সহ্য হয়। কিন্তু ডেলিশিয়ার স্বউপার্জিত টাকার অপব্যবহার অসহ্য—এরূপ কাপুরুষতা ক্ষমাযোগ্য নহে। এ-বিষয়ে মজলুমার তুলনায় ডেলিশিয়ার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অথচ ইংরাজ সমাজ সভ্যতার দাবি করে! ইহাই কি সভ্যতা? ইহাই কি শিভালরি?

ডেলিশিয়া বলিলেন, 'আমার একটি প্রতিমা স্বর্ণবেদিতে স্থাপিত ছিল, অদ্য তাহা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছে; মূর্তিটা এখনো ভাঙিয়া যায় নাই, কেবল ভূমিতলে পড়িয়া আছে।'

মূর্তির পতনের সহিত ডেলিশিয়ার প্রেমের মৃত্যু হইল। অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস, —ভাবিতে হৃদয় দ্বিধা হয়—কোথায় সে বিবাহের সম্বৎসরিক উৎসব, কোথায় এ প্রেমের সমাধি!

লর্ড কারলিঅন প্রায় ১টা রাত্রিতে বাড়ি ফিরিলেন। প্রায় সব কক্ষই অন্ধকার দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইলেন। ডেলিশিয়ার অত্যধিক আদরযত্নে তিনি 'আদুরে' হইয়া উঠিয়াছিলেন! এ সামান্য অবহেলায় তাঁহার মানহানি হইল যে! প্রতি রাত্রি তাঁহার অপেক্ষায় আলো জ্বালিয়া রাখা হইত, অদ্য অন্ধকার কেন? তিনি নিজেই টেলিগ্রামে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সে-কথা ভুলিয়া গেলেন! না, তাঁহার ভাবটা এই—'আমি নিষেধ করিলেও ডেলিশিয়ার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

তিনি ডেলিশিয়ার শয়নকক্ষের দ্বারে আঘাত করিয়া সাড়াশব্দ না পাওয়ায়ও বিরক্ত

[illegible]। এত শীঘ্র ডেলিশিয়া ঘুমাইয়াছেন? তিনি সর্বদাই [illegible]
[illegible]তেন, অদ্য এ অনাদর কেন?

তিনি অধীরভাবে পুন পুন দ্বারে আঘাত করায় স্পার্টান বিরক্তির সহিত [illegible]
[illegible]লেন, 'গো—!' সে কর্ত্রীর শয়নকক্ষের বহির্দ্বারে শয়ন করিয়াছিল। তাহার [illegible]
[illegible]কিলে বোধহয় সে স্পষ্টই বলিত, 'পাজি! তুমি এখানে কেন? কর্ত্রী ঘুমাইতেছেন,
[illegible]হাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। যাও তুমি জাহান্নামে!' স্পার্টানের সেই অব্যক্ত
[illegible]ধ্বনিতে সত্যই কারলিঅন যেন অপমান বোধ করিলেন! তিনি কুকুরকে ধমক দিয়া
[illegible]ন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

[illegible]দ্য তাঁহার মনটা খারাপ ছিল,—তিনি জুয়াখেলায় অনেক টাকা (ডেলিশিয়ার
[illegible]) হারিয়াছেন; লা-মেরিনাও ভালো ব্যবহার করে নাই।* এখন ডেলিশিয়ার দুটি
[illegible]মোবা কথা শুনিলে প্রাণটা শীতল হইত; তা ডেলিশিয়ার যে গাঢ়নিদ্রা—!

[illegible]রদিন প্রভাতে ডেলিশিয়া অশ্বারোহণে বেড়াইয়া আসিলেন। গৃহে ফিরিয়া শুনিলেন,
[illegible] তখনো নিদ্রিত। প্রাতঃকালীন মুক্ত বায়ুসেবনে তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল; এখন মনে
[illegible]র, বন্ডস্ট্রিটে মণিকারের নিকট যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা দুঃস্বপ্নমাত্র! প্রিয়জনের
[illegible]দ্ধে কোনো অপ্রিয় কথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছে হয় না—লোকে যথাসাধ্য
[illegible]প্রবঞ্চনা করিয়া সুখী থাকে! ডেলিশিয়া রমণী বই তো নহেন!

লর্ড সম্মুখে আসিবামাত্র ডেলিশিয়া সুস্মিতবদনে অভিবাদন করিলেন, 'উইল! তুমি
[illegible]ক্ষণে উঠিলে? গতরাত্রে অনেক বিলম্বে আসিয়াছিলে, না?'

লর্ড কিন্তু এ-কথায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে হইল অদ্য
[illegible]লিশিয়ার কী যেন নাই! কেন? লর্ড সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, কেন? ডেলিশিয়া
[illegible]ত সাবধানে দূরে দূরে থাকিতেছেন, কেন? ডেলিশিয়ার মৃদুহাস্যটুকুতে যেন প্রাণ
[illegible]ই; যদিও তাঁহার ব্যবহারের কোনো ত্রুটি ধরা যাইতে পারে না, তবু ডেলিশিয়ার
[illegible]টা যেন প্রাণহীন বোধহয়। ...।

লর্ড বলিলেন, 'ডেলিশিয়া! তোমার নূতন পুস্তকের কোনো কোনো অংশ বড়ই
[illegible]র্ত্তজনক হইয়াছে। গতরাত্রিতে একজন আমাকে এই কথা বলিতেছিল!' ...

ডেলিশিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে সে? আমার রচনার অংশবিশেষ হয়তো তাঁহার
[illegible]নো ক্ষতস্থান স্পর্শ করিয়াছে!'

কারলিঅন। তিনি ফিটজহাফ। তুমি তাঁহাকে তুমি জানো। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি
[illegible]র ভগিনীদিগকে কিছুতেই তোমার পুস্তক পাঠ করিতে দিবেন না। তাঁহার কথা
[illegible]ত বড় বিরক্তিকর বোধ হইয়াছিল।

[illegible]. কারলিঅন কথিত ফিটজহাফ-এর কথাগুলি কি আমাদের সমাজের উক্তিরই
[illegible]ধ্বনি নহে? যে-সকল পত্রিকায় উদারতাসূচক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়, সে-সব
[illegible]ও অন্তঃপুর প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। কেবল বঙ্গে নহে, সুদূর পশ্চিমদেশেরও
[illegible]নো পত্রিকা (যাহা অবলাদের জন্য প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহার অধিকাংশ প্রবন্ধই
[illegible]লা রচিত) অনেক পাঠক তাঁহাদের আত্মীয়া মহিলাদের দৃষ্টিগোচর হইতে দেন না!
[illegible]তা পুরুষের হাতে কিনা! ডেলিশিয়া উত্তরে কী বলিতেছেন, তাহাও

---

*লা-মেরিনা মাতাল হইলে তাহার প্রণয়ীদিগকে বোতল ছুড়িয়া মারিয়া থাকে। অদ্য লর্ড কারলীঅন [illegible] মাতলামির আস্বাদ পাইয়া আসিয়াছেন।

মনোযোগপূর্বক শুনুন—

'তুমি তো আমার পুস্তক পাঠ করিয়াছ; কাপ্তেন ফিটজহার্ফ যে-বিষয়ে করেন, সেরূপ কোনো কথা কি তুমি সে পুস্তকে দেখিয়াছ?'

লর্ড। এখন আমার ঠিক মনে হয় না।

কাপ্তেন ফিটজহার্ফ অনেক দিন সমাজের প্রকাশ্য নিন্দাপাত্র ছিলেন কলঙ্কের কথা ডেলিশিয়া তুলিলেন! এবং তাঁহার ভগিনীরাও সাধ্বী নহেন। এই আবার ডেলিশিয়ার গ্রন্থের নিন্দা করেন! 'যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!'

• • •

ডেলিশিয়ার নূতন পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ ৮০০০ পাউন্ডের অর্ধেক লর্ডের নামে জমা হইয়াছে। ডেলিশিয়া যত টাকা প্রাপ্ত হইতেন, তাহার অর্ধেক স্বামীকে দিতেন।

সেইদিন অপরাহ্ণে মিসেস ক্যাবেনডিশ ডেলিশিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়া তাঁহাকে নৈশভোজনের এবং ভোজনান্তে সঙ্গীতালয়ে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি ডেলিশিয়াকে বাল্যকাল হইতে জানেন এবং তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। ডেলিশিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন—যেহেতু ব্যথিতহৃদয়ে নির্জনে দুশ্চিন্তা ভারবহন করা নিতান্ত অসহ্য। ভাবিলেন, এই ছলে কতক্ষণ স্নেহময় বন্ধুদের সংসর্গে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকা যাইবে।

অদ্য শহরে বিজ্ঞাপনের ভারি ধুমধাম, —'প্রজাপতির জন্ম—লা-মেরিনা (অভিনেত্রী)।' লা-মেরিনাকে দেখিবার জন্য হয়তো ডেলিশিয়ার একটু কৌতূহল ছিল—যাহার জন্য তাঁহার সুখগৃহ দগ্ধ হইতে চলিল—যে তাঁহার ধ্বংসের কারণ তাহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

যথাসময় ডেলিশিয়া মিস্টার ও মিসেস কাবেনডিশ-এর সহিত সঙ্গীতালয়ে (অপেরা হাউসে) উপস্থিত হইলেন। 'এম্পায়ার' অদ্য লোকে লোকারণ্য। লর্ড কারলিসল আসিয়াছেন।

• • •

প্রজাপতির জন্ম হইল—এখন লা-মেরিনা প্রজাপতিরূপে নৃত্য করিতেছিল। ডেলিশিয়া দেখিলেন, লা-মেরিনার বক্ষস্থলে সেই কপোত—যাহা তিনি পূর্বদিন বন্ডস্ট্রিট মণিকারের দোকানে দেখিয়াছিলেন। সেই হীরক-কপোত—কপোতের চঞ্চুপুটে পদ্মরাগে লিখিত শ্লোক সুবর্ণলিপি! আর সন্দেহের স্থল কই। আর মণিকারের কথা অবিশ্বাস করা যায় কিরূপে? সেই আলোকমালা পরিশোভিত-রঙ্গালয় সহসা ডেলিশিয়ার চক্ষে ঘোর অন্ধকার বোধ হইল। অকস্মাৎ দারুণ শীতে যেন তাঁহার হস্তপদ অসাড় হইল!

ডেলিশিয়াকে বিবর্ণা দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা মিসেস ক্যাবেনডিশ ব্যস্ততার বলিয়া উঠিলেন—

'একি ডেলিশিয়া। তোমার কি অসুখ হইয়াছে? (মি. ক্যাবেনডিশের প্রতি) রবার্ট তুমি ইহাকে একটু বাতাসে লইয়া যাও—ইনি যেন মূর্ছা যাইবেন।'

মর্মাহতা ডেলিশিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'আমি এখনই ভালো হইব—চিন্তা নাই বোধহয় এ কামরার গরম আমার সহ্য হইতেছে না। আমার জন্য আপনারা ব্যস্ত হইবেন না

হায় ডেলিশিয়া। তুমি কক্ষের উষ্ণতায় বিচলিত হইতেছ, না অন্তর্দাহের উত্তাপে? 'এম্পায়ার' হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ডেলিশিয়া লর্ড কারলিঅনকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি ভৃত্য রবনসনকে দিয়া বলিলেন, 'যেন লর্ড পার্কে প্রত্যাবর্তনমাত্রই তাঁহাকে পত্রখানি দেওয়া হয়।'

অতঃপর শয়নকক্ষে গিয়া ডেলিশিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এমিলি, আমি সমুদ্রতীরে যাইব। জিনিসপত্র ঠিক কর যেন আমরা আগামীকল্য দশটার সময় ব্রাইটস্টেয়ার্স যাইতে পারি। স্পার্টানকে সঙ্গে লইব।'

এমিলি তাঁহার চুলের বেনি খুলিতেছিল—তিনি (আন্তরিক ব্যাকুলতায় অস্থিরভাবে) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমিলি সবিস্ময়ে বলিল, 'ও লেডি, আপনার কী হইল?'

'না কিছু নয়' বলিয়া ডেলিশিয়া মৃদু হাসিতে চেষ্টা করিলেন।...

'না এমিলি! ভয় নাই; আমি অসুস্থ নই—কেবল শ্রান্ত হইয়াছি। তুমি যাও, আমি একা থাকিলে ভালো হইব। দেখিও, তুমি সমুদ্রউপকূলে যাত্রার জন্য সময়ে প্রস্তুত হবে।'

ডেলিশিয়া 'এম্পায়ারে' যে-দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা সহজে পরিপাক করা ডেলুমার সাধ্যাতীত—যদিও ভারত রমণী ধৈর্যগুণে অতুলনীয়া। আর স্বাধীন ডেলিশিয়ার পক্ষে তো ইহা বজ্রাঘাত তুল্য।

• • •

ডেলিশিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না।—নতজানু হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'ও প্রভো। এতদিন বুঝিলাম আমি কী হারাইয়াছি। প্রেম আমাকে সর্বস্বান্ত করিয়া স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল—চির অন্তর্হিত হইল! আহা! 'আছে' বলিতে রহিল কেবল যশোরূপ কণ্টক-মুকুট।'

হায়! মজলুমার ন্যায় ডেলিশিয়াও নির্জনে রোদন করিলেন। ইহা অশ্রু, না সুহৃদয়ের শোণিতধারা?

'আমি তাঁহাকে বড় ভালোবাসিতাম—তাঁহাকে উপাস্য মূর্তি মনে করিতাম। আমার পাপের (পৌত্তলিকতার) যথেষ্ট শাস্তি হইল।'

• • •

'হায় প্রেম!—প্রেম কী কোমল আহা! কঠোরস্পর্শে ইহা চিরতরে চূর্ণ হয়! উচ্চ আকাঙ্ক্ষা একবার নষ্ট হইলে আবার জাগিয়া উঠে—কিন্তু প্রেম—ইহা, 'এলো' ফুলের মতো—শত বৎসরে একবার মুকুলিত হয়। এ জীবন লইয়া এখন আমি কী করি?'

'কী আর করিবে?—মৃত্যু-সাগরে বিসর্জন দাও। তুমি নিজের প্রেমজ্যোতিতে তোমার লর্ডকে জ্যোতির্ময় দেখিতে। কারলিঅন বাস্তবিক জ্যোতির্ময় ছিলেন না। যে চক্ষু আলোকে থাকে, সে অন্ধকারের কিছু দেখিতে পায় না।

'আহা! ডেলিশিয়া কী ভুল করিয়াছেন। তিনি স্বামীকে কেমন অনিন্দ্য দেবতা মনে করিতেন। তাঁহাকে কেমন অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিতেন। যে মোহিনী-মূর্তিটিকে ডেলিশিয়া অমূল্য ভক্তিরত্নখচিত হৃদয়-সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ঈশ্বর তাঁহারই নয়নসমক্ষে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন! ডেলিশিয়া! তুমি সে পুতুলের ভগ্ন খণ্ডগুলি কুড়াইয়া তুলিও না।

পৌত্তলিকেরা যখন মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজা করে, তখন তাহাদের বিশ্বাস থাকে যে [illegible] দেবতা অবতীর্ণা আছেন- পূজা শেষে যখন মনে করে, দেবতা স্ব-স্থানে ফি[illegible] গিয়াছেন, তখন প্রতিমাটি বিসর্জন দেয়। কেবল মাটিজ্ঞানে কে পুতুল পূজা করে? [illegible] যদি জানিতে পায় যে প্রতিমায় দেবতার পরিবর্তে ভূত-পিশাচ আবির্ভূত ছিল, [illegible] তবে আর কি পূজা করিতে পারে? কেবল তাহাই নহে, দেবতা ভ্রমে পিশাচের [illegible] করা হইয়াছে, এ চিন্তা—এ লজ্জা অসহ্য!

ডেলিশিয়া কী ভয়ানক প্রতারিতা হইয়াছেন—প্রেমিক স্বামীজ্ঞানে বিশ্বাসঘা[illegible] পিশাচের পূজা করিয়াছেন! কাঞ্চন ভ্রমে কর্দমের আদর করিয়াছেন! এতদিন ভ্রমবশত ডেলিশিয়া শূন্যে যে সুখের অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, অদ্য সে প্রাসাদ চূর্ণ হইয়াছে; মর্মাহতা ডেলিশিয়া সেই চূর্ণ প্রাসাদের আবর্জনা ও ধূলিরাশিতে বিলুণ্ঠিতা!

ভক্তিভাজন ভক্তির উপযুক্ত নহেন; নরাকারে পিশাচ—এই আবিষ্কারে ভক্তহৃদয়ে যে বজ্রাঘাত হয়, তাহা ভুক্তভোগী হতাশ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে? সেরূপ হতাশের বৃশ্চিকদংশন যে সশরীরে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে সে জ্বালা কেমন তীব্র। স্বপ্নরাজ্যে কল্পিত লতাপত্র পুষ্পাবৃত পথে অন্ধভক্ত নিশ্চিন্তমনে চলিতেছিল, সহসা কে তাহাকে জাগ্রত করিয়া বলিয়া দিল,—ঐ কুসুমাবৃত স্থানে গভীর গর্ত আছে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী। হায়! সে জাগরণ কী কষ্টকর। জাগিবার পূর্বেই ভক্ত মরিল না কেন? হায় সত্য! এমন সত্য কে জানিতে চাহিয়াছিল? এ-সত্য জানিবার পূর্বে মৃত্যু হইল না কেন? যাঁহাকে ষোলআনা বিশ্বাস করা গিয়াছিল, তিনি এককড়া বিশ্বাসেরও উপযুক্ত নহেন, নরদেবতাজ্ঞানে যাঁহার চরণে এতদিন ভক্তি কুসুমাঞ্জলি দান করা গিয়াছিল, তিনি নরপশু—এ আবিষ্কার ভক্তের অসহ্য।

হায়? এমন যে নিষ্ঠুরভাবে প্রতারিতা হওয়া গিয়াছিল! ঈশ! কী যন্ত্রণা! ডেলিশিয়া, তুমি যে-দেবতার আরাধনা করিতে, তিনি সৈনিক বিভাগের 'গার্ডস অফিসার ও ভদ্রলোক' মাত্র—আর কিছুই নহেন!

অবিশ্বাসীকে পশু বলিলেও ঠিক হয় না। কোন্ পশু তেমন নীচ? সিংহ শার্দুল বলিলে 'বীর' বলিয়া প্রশংসা করা হয়; কুকুর বলিলে অতি কৃতজ্ঞ অতি বিশ্বস্ত বন্ধু বলা হয়; অশ্ব? সেও অপেক্ষাকৃত ভালো; গর্দভ? সে বোকা কিন্তু হিংস্র প্রকৃতির নয়; মহিষ, গণ্ডার, শূকর-না, মানুষের তুলনায় কোনো জন্তুই নিকৃষ্ট নয়! কোনো পশুই ভক্তহৃদয় পদদলিত করে না।

অবশ্য অবলাহৃদয় দগ্ধ হইল বা চূর্ণ হইল, তাহাতে কর্তাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; প্রপীড়িতার নীরব যন্ত্রণার তপ্তদীর্ঘনিশ্বাসে ক্ষমতাশালী পুরুষের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু বলি, অকপট ভক্তির কি কিছু মূল্য নাই? সেই অমরবাঞ্ছিত দুর্লভ ভক্তি হারাইয়া—বেদিভ্রষ্ট হইয়া প্রভুরা কি বড় সুখে থাকেন? মজলুমা অত্যাচারীর অন্ন-বস্ত্র বন্ধ করিতে পারে না, সত্য; অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু অন্ধভক্তি ফিরাইয়া লইতে পারে তো? মানসদেবতাকে ঘৃণা না করিলেও দয়ার পাত্র জ্ঞান করিতে পারে তো? অবলার কৃপাপাত্র হওয়া কি সবলের পক্ষে বড় গৌরবের বিষয়?

ডেলিশিয়া অব্যক্ত যাতনায় পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গীর ন্যায় ছটফট করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যেন উচ্চারিত হইতেছিল—

বড় ভালো বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম
ভালো প্রতিদান নাথ পাইলাম তার!

আবেগের উচ্ছ্বাস কথিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রোরুদ্যমানা ডেলিশিয়া তন্দ্রাভিভূতা হইলেন।

মজলুমা! ডেলিশিয়ার বিলাপ কি আপনারই হৃদয়বিদারী বিলাপের প্রতিধ্বনি নয়? ডেলিশিয়ার দগ্ধ প্রাণের হা-হুতাশ কি আপনারই হতাশ প্রাণের হা-হুতাশের অনুরূপ নয়? প্রভেদ এই যে, ডেলিশিয়ার স্বামীর অত্যাচারকে চুরি বলা যাইতে পারে, আর মজলুমার স্বামীর অত্যাচার ডাকাতি!

লর্ড কারলিঅন আইনের বিষয় অবগত ছিলেন—তিনি জানিতেন, আইন তাঁহারই অনুকূলে!—নারীহন্তা ভদ্রলোকের জন্য কোনো দণ্ড নাই।

ডেলিশিয়া যদি 'তালাকপ্রাপ্তির জন্য নালিশ করেন?—তিনি কি 'তালাক' পাইবেন? না। কারণ তিনি লর্ডের নীরবতা প্রমাণ করিতে পারেন না; অমন একটা কেন, এক ডজন মেরিনার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা আইনের চক্ষে অত্যাচার নয়। সহধর্মিণীর অর্জিত টাকা মেরিনার জন্য অপরিহার্য করাও আইনমতে দোষ নয়! তালাক লইতে হইলে ডেলিশিয়াকে প্রমাণিত করিতে হইবে—স্বামী বিশ্বাসঘাতক এবং দুই অধিকাল হইতে তিনি ইহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন; ডেলিশিয়া ইহা প্রমাণিত করিতে পারিবেন না। 'ডেলিশিয়া আমা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না' —এইকথা (আইনের এই ধারা) স্মরণ করিয়া কারলিঅন অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। হায়রে আইন! পুরুষরচিত আইন—পুরুষের সুবিধার নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি! অবলাহৃদয় দলন করা—তাহার জীবন মাটি করা—তাহাকে জীবন্তে হত্যা করা আইনানুসারে অত্যাচার নয়!

* * *

ব্রোডস্ট্রেয়ার্সে আসিয়া ডেলিশিয়াও সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। কাহাকে শারীরিক কষ্ট দিলে, খুন-জখম করিলে, অপরাধীর শাস্তি আছে; কিন্তু রমণীহৃদয় বিদীর্ণ করিলে, শতধা করিলে রমণীপ্রেমের জীবন্ত সমাধি করিলে, কোনো দণ্ড নাই!

'তাই বলি', ডেলিশিয়া ভাবিলেন, 'তিনি যদি আমাকে প্রহার করেন কিম্বা আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়েন—তবেই আমি তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি—নচেৎ না।'

অপরাহ্ণে সমুদ্রতীরে পদব্রজে ভ্রমণ কবিতে করিতে ডেলিশিয়া তাঁহার ভগ্ন পুতুলের চিন্তা করিতেছিলেন। প্রতিমা বেদিভ্রষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু বেদিতে তাঁহার স্থিতিচিহ্ন এখনো বর্তমান! ফুল ঝরিয়া যায় কিন্তু বৃন্তস্থলে তাহার অবস্থিতির চিহ্ন বিদ্যমান থাকে! সব যায়—কেবল স্মৃতিযন্ত্রণা থাকে। অনিবার অশ্রুস্রোত বাধা মানিতেছিল না—ডেলিশিয়ার নয়নদ্বয় বাহচ্ছন্ন হওয়ায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—গগন সৈকত, সাগরের বীচিমালা—এসব কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমন সময় স্পার্টান সানন্দে ডাকিয়া উঠিল এবং কে একজন বলিল—

'লেডি কারলিঅন, আপনার সঙ্গে দুই-চারিটি কথা বলিতে পারি কি?'

ডেলিশিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মি. পল ভালডিস।

যেদিন ডেলিশিয়া ব্রোডস্ট্রেয়ার্সে আইসেন, তাহার পূর্বদিন 'অনেসটি' নামক

সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি ডেলিশিয়ার অতি জঘন্য মিথ্যানিন্দা লিখিয়াছিল। পল ভালডিস সে লেখককে যথেষ্ট কশাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি ডেলিশিয়াকে এই শুভসংবাদ শুনাইতে আসিয়াছেন।

অন্যমনস্ক থাকা বশত ডেলিশিয়া প্রথমে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। পরে সহাস্যে বলিলেন, 'সংবাদপত্রের মতে যিনি একাধারে দ্বিতীয় শেক্সপিয়ার ও মিল্টন—ওহো! সেই ব্যক্তিকে আপনি প্রহার করিয়াছেন!'

* * *

ভালডিস বলিলেন, 'লেডি কারলিঅন আপনাকে বড়ই বিমর্ষ দেখায়।'

ডেলিশিয়া উত্তর করিলেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। আমি বড়ই বিষণ্ন—আমি আমার স্বামীর প্রেম হারাইয়াছি।'

'তবে আপনি সবই শুনিয়াছেন।'

'কী! কেবল আমি ব্যতীত শহরের সকলেই এ-কথা জানে না কি?'

'বলুন তো ইহা কি সম্ভব যে লর্ড কারলিঅন এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন যে, তিনি প্রকাশ্যে লা-মেরিনার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত নহেন; এইরূপে তাঁহার পত্নীকে সমাজের বিদ্রূপ ও দয়ার পাত্রী করিয়াছেন?'

এ-দেশে তো স্বামীর অধঃপতনের জন্য স্ত্রীকে লজ্জিত হইতে দেখা যায় না বরং স্ত্রীর সামান্য পদস্খলনে স্বামীর লজ্জা হয়। ইংলন্ডে স্বামীর পতনে স্ত্রীও অপমান বোধ করেন। এ-দেশে ও সে-দেশে এ-এক প্রভেদ।

ভালডিস উত্তর করিলেন, 'লেডি কারলিঅন, আপনার বন্ধুরা আপনাকে সতর্ক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন আপনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যখন আমি ইঙ্গিতে বলিয়াছিলাম যে আপনার বিশ্বাস অপাত্রে ন্যস্ত, সেদিন আপনি আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। অবশ্য সেরূপ করা আপনার অন্যায় হইয়াছিল আমি এরূপ বলি না। আপনি পতিপ্রাণা সতীর উপযুক্ত কাজই করিয়াছিলেন। এখন আপনি সবই জানিতে পারিয়াছেন—'

'এখন আমি জানিতে পারিয়াছি; কিন্তু জানিয়া ফল কী? আমি কী করিতে পারি? স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে অবলার কোনো উপায় নাই। আমি প্রহারচিহ্ন দেখাইতে পারি না—তাঁহার কোনো দুর্ব্যবহার প্রমাণিত করিতে পারি না! আইন বলিবে, ফিরে যাও বোকা মেয়ে! তোমার স্বামী যাহাই করুন না কেন, তিনি যদি তোমার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করেন, তবে তুমি তাঁহার হইতে স্বতন্ত্র হইতে না! ইত্যাদি ইত্যাদি।'

এ উক্তি ইংরাজ ললনার।—কী বুকভাঙা কথা! যে অনলে মজলুমা দগ্ধ হন, সেই অনল ডেলিশিয়াকেও দগ্ধ করে!

ডেলিশিয়া আবেগভরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'পল ভালডিস। আপনি থিয়েটারে আবেগের অভিনয় করিতে পারেন,* দুঃখের স্বরূপ অনুকরণ করিতে পারেন; কিন্তু আপনি কোনোকালে অবলার ভগ্ন হৃদয়ের অসহ্য মূক যন্ত্রণার ভয়াবহ গভীরতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন কি? না আমার বিশ্বাস, আপনার অতি সুন্দর কল্পনাশক্তিও ততদূর পৌঁছিতে পারে না! আপনি জানেন, আমি কেন সহসা

* মি. পল ভালডিস থিয়েটারের একজন বিখ্যাত অভিনেতা।

...এখানে এই সাগর তীরে আসিয়াছি? আমি জানি, আমার [illegible]
...নিষ্ঠ সমুদ্র আমাকে তাহার অতলবক্ষে স্থান দিতে আপত্তি করিবে [illegible]
আমি ডুবিব না! কিন্তু আপনি জানেন? আপনি অনুমান করিতে [illegible]
সদা আমার স্বামীর সহিত দেখা না করিবার অভিপ্রায়ে এখানে [illegible]
আসিয়াছি?...আমার আশঙ্কা ছিল দেখা হইলে আমি তাঁহাকে হত্যা করিতাম।

ডেলিশিয়া নিভৃতে চিন্তা করিতেছেন, এখন কী করা কর্তব্য? পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া নিত্যনূতন জ্ঞানার্জন করিবেন; অথবা অবিশ্রান্ত ভ্রমণে যদি শরীর অবসন্ন হয়, তবে স্কটল্যান্ডের হাইল্যান্ডস্থিত নির্জন প্রদেশে অথবা আয়র্লন্ডের মনোরম উপত্যকায় একটি বাড়িতে থাকিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবনের অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করিবেন।

তাহাতে সমাজ ভালোমন্দ বলিবে যে? 'লেডি কারলিঅনের নির্জনবাসের কারণ কী? হয় তো তাঁহাদের কোনো মন্দ অভিপ্রায় আছে।'

তাই তো! যতদিন আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহাদের পদলেহন করিতে পার, ততদিন তুমি ভালো। যদি তুমি আত্মগরিমা প্রকাশ কর, আপনসম্পত্তি রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া উকিল-মোক্তারের সহিত পরামর্শ কর, স্বাধীনতার ভাব দেখাও, আত্মীয়দের সহিত বনে না বলিয়া স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকো—তবে কি আর রক্ষা? তবে সমাজের মতে তুমি অধঃপাতে গিয়াছ! ডেলিশিয়া ঠিকই বলিয়াছেন, 'এ জীবন লইয়া এখন আমি কী করি?' বিধবা হইলে সমাজে গঞ্জনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পূর্বে ভারতললনা মৃতস্বামীর চিতায় প্রবেশ করিয়া আত্মঘাতিনী হইত। ডেলিশিয়াকেও জীবনভার লইয়া বেশিদিন ভাবিতে হয় নাই, তিনি শীঘ্রই মৃত্যুর শান্তিক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

যে-দিন 'এম্পায়ারে' লা-মেরিনার বক্ষে কারলিঅন প্রদত্ত প্রেমচিহ্ন দেখিয়া আসিলেন, সেইদিনই ডেলিশিয়ার প্রকৃত মৃত্যু হয়, অর্থাৎ তাঁহার হৃদয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু ও প্রেমের মৃত্যু একই কথা। জীবন্মৃতা ডেলিশিয়া তবু-যে দেহভার বহন করিতেছেন, তাহা কেবল জীবনের এক গুরুতর কর্তব্যপালন বাকি আছে বলিয়া।

ডেলিশিয়া ১৫ দিন পরে ব্রোডস্টেয়ার্স হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৃত্য রবসনের প্রমুখাৎ স্বামীর অনেক কলঙ্ক-কথাই শুনিলেন। ক্রোধে-লজ্জায় ডেলিশিয়ার দেহলতা কম্পিত হইল—তাঁহার নিজের ভৃত্যও তাঁহাকে দয়ার পাত্রী ভাবিল। রবসনের কথার ভাবে করুণা ছিল! সমবেদনা ছিল!!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের জন্য ডেলিশিয়া শয়নকক্ষে গেলেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপাধানের প্রতি চাহিয়া ডেলিশিয়া ভাবিলেন, 'আমার এই উপাধানে লা-মেরিনার মস্তক ন্যস্ত হইয়াছিল?' শয্যার নিকট যাইতে তাঁহার মনে হইল যেন একটি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। সেই যন্ত্রণায় ডেলিশিয়া মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। তাঁহার পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া এমিলি দৌড়িয়া আসিল।••• ডেলিশিয়া চক্ষু মেলিলে, দেখিলেন, এমিলি তাঁহার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। ••

গৃহে লর্ডের সহিত দেখা হইবার পূর্বেই ডেলিশিয়াকে সন্ধ্যায় লেডি ডেক্সটারের নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। তথায় স্বকর্ণে স্বামীর মুখে তাঁহার নিন্দা শুনিতে পাইলেন। অবশ্য ডেলিশিয়াকে না, দেখিয়াই তিনি নিন্দা করিতেছিলেন! তাঁহার কথা শেষ হইলে ডেলিশিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কঠোর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন। মুহূর্ত পরে

তিনি নীরবে সরিয়া গেলেন। লেডি ব্রানসুইথ (ইঁহারই সঙ্গে কারলিঅন [illegible] করিতেছিলেন) সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উনি কে?'

কারলিঅন কিঞ্চিত ভীতভাবে বলিলেন, 'উনি ডেলিশিয়া—আমার স্ত্রী।' লেডি ব্রানসুইথ বলিয়া উঠিলেন, 'তিনি! সেই সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা! আমার ধারণা ছিল না যে তিনি এমন সুন্দরী। তিনি সে-সব কথা অবশ্যই শুনিয়াছেন।'

• • •

সে রাত্রি লর্ড কারলিঅন গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র রবসন তাঁহাকে জানাইল যে, কর্ত্রী তাঁহার জন্য পাঠাগারে অপেক্ষা করিতেছেন।

ডেলিশিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লর্ডের যেন হৃৎকম্প হইল। দ্বারের পরদার নিকট দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া তিনি কক্ষে প্রবেশ করিলেন! (যেন রানির সম্মুখে খুনি আসামি—বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে।)

লর্ড আরম্ভ করিলেন, 'ডেলিশিয়া, আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি—'

ক্রোধে ডেলিশিয়ার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছিল, তিনি মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'থামো, আর মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন নাই! এখন আমি তোমার নিজমূর্তি দেখিয়াছি—তোমার সে মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে; মুখোশটা আর তুলিয়া লওয়ার চেষ্টা বৃথা!'

প্রভু স্তম্ভিত হইলেন, একটু হাসিতে বৃথা চেষ্টা করিলেন।

ডেলিশিয়া তাঁহার নিকট স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'আজি রাত্রে তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ।**'

'আমি তোমাকে বলি নাই' লর্ড আত্মরক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন, 'আমি বলিয়াছি, প্রায় সকল বিদুষী নারীই রমণীসুলভ কোমলভাবে হারাইয়া থাকে।'

'ক্ষমা কর,' ডেলিশিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, 'তুমি বলিয়াছ, স্ত্রীলোকেরা যাঁহারা পুস্তক লিখেন, যেমন আমার স্ত্রী'; ঠিক এই কথাগুলি বলিয়াছ। ** যৎকালে আমি পরম আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে তোমার উপাসনা করিতেছিলাম, তুমি আমাকে প্রতারণা করিতেছিলে! তুমি এইরূপে আমাকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিলে!'

• • •

কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর ডেলিশিয়া বলিলেন, "আমার বক্তব্য এই-- এখন হইতে আমরা স্বতন্ত্র থাকিব। কারণ আমি অভিনেত্রীদের অলঙ্কারের ব্যয়ভার বহন করিতে চাই না। আর তোমার-বদান্যতা--অর্থাৎ লেডি ব্রানসুইথের 'বিল' শোধ করার ইচ্ছাও আমি অনুমোদন করি না।"

• • •

শেষে কারলিঅন বলিলেন, 'ডেলিশিয়া তুমি কী প্রলাপ বকিতেছ! তুমি বাস্তবিক স্বতন্ত্রবাসের ইচ্ছা কর না? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কী করিবে?'

'আমি জীবিত থাকিব, অথবা মরিব, সেজন্য ভাবি না।'

লর্ড ভাবিলেন, এখন বোধহয় ডেলিশিয়ার রাগ কম হইয়াছে। তাই তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইলেন।

ডেলিশিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পিস্তল তুলিয়া বলিলেন, 'সাবধান। আমার নিকট আসিও না—'

লর্ড একটু হাসিলেন, 'তুমি পাগল হইয়াছ ডেলিশিয়া? পিস্তল, [illegible]
টা ভরা নয়। তবু তোমার হাতে পিস্তল ভালো দেখায় না।'

'না, ভালো তো দেখায় না; কিন্তু পিস্তলটা ভরা! তোমার আসিবার পূর্বেই [illegible]
টা ভরিয়া রাখিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আর একপদ অগ্রসর
হও—আমি তোমাকে গুলি করিব!'

ডেলিশিয়া শেষ বিদায়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন, 'বিদায় ইউল। [illegible]
তোমাকে বড় ভালোবাসিতাম। কিছুদিন পূর্বে তুমি আমার হৃদয়সর্বস্ব ছিলে। সেই
প্রেম, যাহা অকস্মাৎ চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে—মরিয়া গিয়াছে, তাহারই খাতিরে এখন
আমরা শান্তির সহিত বিদায় লই।'

কিন্তু লর্ড ডেলিশিয়ার হস্তস্পর্শ করিলেন না; তিনি এতশীঘ্র বিদায় লইবেন না।
তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন!

ডেলিশিয়া আর কিছু না বলিয়া লিখিতে বসিলেন।

'তুমি শুনিতেছ?' লর্ড পুনরায় বলিলেন, 'আমি বিদায় গ্রহণ করিব না।'

ডেলিশিয়া নিরুত্তর। তিনি নিজে স্থির ছিলেন, কেবল তাঁহার লেখনী নড়িতেছিল।

লর্ড কারলিঅন বলিলেন, 'গবর্নমেন্ট স্ত্রীলোকের বেশি স্বাধীনতায় বাধা দিয়া ভালোই করেন। যদি তোমাদের ইচ্ছামতো সব অধিকার তোমরা পাইতে, তবে তোমাদের অত্যাচারের সীমা থাকিত না। রমণীর উচিত নম্র শান্ত হওয়া; যদি সৌভাগ্যবশত তাহারা ধনবতী হয়, তবে সে টাকা তাহাদের স্বামীদের উপকারের জন্য ব্যয় করা উচিত। ইহাই সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক নিয়ম—রমণী পুরুষের সেবিকারূপে সৃষ্ট হইয়াছে—যখন সে তাহা (দাসী) হইতে চায় না, তখনই গোলমাল হয়।'

বাহবা! যদি ইংলন্ড-নিবাসীর এই উক্তি, তবে আর আমরা গোটাকতক ইংলন্ড-প্রত্যাগত লোকের সংকীর্ণচিত্ততা দেখিয়া আশ্চর্য হই কেন? যাহারা বিলাতি বিদ্যালাভের নিমিত্ত সে দেশে যান, তাঁহারা দুই-চারিটা 'কারলিঅন'-এর সংশ্রবে পড়িয়া বিষাক্ত হন, ইহা অসম্ভব নহে। তাই তো গবর্নমেন্ট কেন স্ত্রীলোকগুলিকে কামানে উড়াইয়া দেন না? অতগুলি গোলাগুলি কামান-বন্দুক আছে কিসের জন্য? অথবা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সমুদয় অবলাকে একটা বারুদের ঘরে বন্ধ করিয়া বারুদে অগ্নি দিলে সব আপদ চুকিয়া যায়! তাহা হইলে আর 'ডেলিশিয়া ট্রাজেডি' বা 'মজলুমা-বধ-কাহিনী' লিখিবার জন্য কেহ জীবিত থাকিবে না!!*

সুখের বিষয়, ইংলন্ডে 'কারলিঅন'এর সংখ্যা (দুই-এক শতের) অধিক নহে। যেখানে কারলিঅন হেন নীচাশয় কাপুরুষ আছেন, সেখানে মি. ক্যাবেনডিশ ও পল ভাল্‌ডিসের ন্যায় মহানুভব লোকও আছে। মোটের উপর সহৃদয় পুরুষই বেশি। এবং আমাদের দেশেও (অধিক না হইলেও) অল্পসংখ্যক মহাশয় পুরুষ আছেন। বিশাল কণ্টক-অরণ্যে যে মুষ্টিমেয় ফুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য।'

ডেলিশিয়া তবু কিছু না বলিয়া পূর্ববৎ লিখিতে থাকিলেন।

পরিশেষে লর্ড বলিলেন, 'আমি এখন শয়ন করিতে যাই; শুভরাত্রি, ডেলিশিয়া!'

---

* 'Murder of Delicia'র ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—Edward Fitzgerald wrote of one of England's greatest poets thus :—Mrs. Barrett Browning is dead. Thank God we shall have more "Aurora Leighs!" It is the usual manner assumed by men who have neither the brain nor the feeling to write an 'Aurora Leigh' themselves."

এবার ডেলিশিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'শুভরাত্রি'।

এই তাঁহাদের শেষ বিদায়! এই শেষ দেখা! কারলিঅন চলিয়া যাইবামাত্র ডেলিশিয়া উঠিয়া কপাট বন্ধ করিলেন।

যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ জ্বরের উত্তেজনায় রোগী একরূপ সবল থাকে; সেদিন জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়, সেদিন রোগী হঠাৎ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে।

যতক্ষণ লর্ড কারলিঅন উপস্থিত ছিলেন, ক্রোধ-খেদের উত্তেজনা ছিল, ততক্ষণ ডেলিশিয়ার হৃদয় সবল ছিল; কারলিঅন চলিয়া গেলে পর ডেলিশিয়া যেন ভাঙিয়া পড়িলেন—ক্রমে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল,—তিনি মূর্ছিত হইলেন।

পরদিন ডেলিশিয়ার উত্থানশক্তি ছিল না, তিনি ভগ্নহৃদয়, ভগ্নশরীর লইয়া সমস্তদিন শয়নকক্ষেই থাকিলেন। সেইদিন প্রাতে কারলিঅন প্যারিস যাত্রা করিলেন। তিনি যাত্রাকালে ডেলিশিয়াকে ছোট একখানি পত্র লিখিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন-ডাকে একরাশি পত্র আসিয়াছিল, সে-পত্রগুলি পাঠকালে ডেলিশিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

'তাহারা (পত্রলেখকেরা) জানে না যে আমি মরিয়াছি!'

ডেলিশিয়া চরিত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই—সমাজ এবং আইন তাঁহার প্রতিকূলে থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাসঘাতক স্বামীর কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন। ইহাতে তাঁহার নৈতিক সাহসের প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার পবিত্র হৃদয় কত উচ্চ।—তাঁহার মনোভাব যে কী মহান—যে ব্যক্তি লা-মেরিনাকে ভালোবাসেন, তাঁহার ভালোবাসায় ডেলিশিয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি স্বামীকে এ-কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন—' তোমার যে হস্ত লা-মেরিনাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে কলুষিত হস্ত আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না!'

কেহ বলিতে পারেন যে, ডেলিশিয়ার অর্থবল ছিল বলিয়া তিনি স্বামী হইতে পৃথক হইতে পারিলেন; স্বামীর অন্নাশ্রিতা হইলে ওরূপ করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমরা তেজস্বিনী ডেলিশিয়ার যে আত্মসম্মানজ্ঞানের পরিচয় পাই, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি একেবারে কপর্দকশূন্য হইলেও পৃথক হইতেন। তিনি লর্ড কারলিঅন-এর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোনো স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হইতেন; কিংবা কাহারও বাড়িতে গবর্নেস হইতেন অথবা কোনো আতুরাশ্রমে অতি সামান্য বেতনে সেবিকা হইতেন। স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া তিনি অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, জীবনের যে কয়টা দিন যাপনের জন্য ডেলিশিয়া উপার্জনের কোনো পথ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া লইতেন। ইচ্ছা অতিপ্রবল থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।

ডেলিশিয়ার এই ভাব—এই মৃত্যু সমাজের পক্ষে অতীব কল্যাণকর। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমকে ডেলিশিয়ার ন্যায় সমরশায়িনী হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এ জগতে কখন কোন্ ভালো কাজটি হইয়াছে?×

ঐরূপ উচ্চভাব ও সুমার্জিত রুচি লাভ করিতে হইলে সুশিক্ষার প্রয়োজন। কবে মজলুমা ডেলিশিয়ার মতো বীর নারী হইতে পারিবেন?

মৃত্যুর পূর্বে ডেলিশিয়া উইল করিলেন, যেন তাঁহার স্বামী আজীবন মাসিক তিনশত টাকা (বার্ষিক ২৫০ পাউন্ড) বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট ছয় লক্ষ (৬০০০০০.০০) টাকা দীনদুঃখীদের দান করা হইল। এবং ভবিষ্যতে তাঁহার পুস্তক বিক্রয়ের টাকাও অনাথ আতুরদিগকে দান করা হইবে।

• উপক্রমণিকায় ঐভাবের কথা আছে।

লর্ড কারলিঅন প্যারিসে থাকিতেই ডেলিশিয়ার মৃত্যু হইল। তিনি হৃদ্‌রোগে (হৃৎপিণ্ড সহসা স্তম্ভিত হওয়ায়) মারা গিয়াছেন।

ডেলিশিয়া-হত্যা কাহিনীর এই শেষ কী দারুণ নৈরাশ্য! হতাশপ্রণয়ের ডেলিশিয়ার জীবনরবি মধ্যাহ্নে অস্ত গেল—পূর্ণ বিকাশের সময় কুসুম শুকাইয়া গেল।

এইরূপ কত মজলুমা ভগ্নহৃদয়ে আমাদের দেশে অন্তঃপুরের নিভৃতকোণে নিহতা হন, কে তাঁহার সন্ধান লয়? সে তাপদগ্ধা অভাগিনীদের উদয়বিলয় কোনো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকে না।

দাম্পত্যজীবনের অবস্থা যাহাই হউক, ডেলিশিয়া সামাজিক জীবনেও সুখী ছিলেন না। ডেলিশিয়া সমাজে যথেষ্ট আদরপ্রাপ্তা হন নাই কেন? যেহেতু তিনি নিজে ভালো লোক ছিলেন! যেহেতু তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা ছিলেন! সাহিত্যক্ষেত্রে যশোবিজয়ে লেখকদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। স্ত্রীলোকের এতটা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা?—ইহা সমাজের অসহ্য। শেষে সান্ত্বনালাভের জন্য সমাজ বলিত, 'অধিকাংশ রচনা কারলিঅন লিখেন।' লেখার সুখ্যাতিটা নিতান্ত না দিলে নয়—তবে তাহা ডেলিশিয়াকে না দিয়া কারলিঅনকে দেওয়া যাউক!

ডেলিশিয়ার জন্য অকপট হৃদয়ে শোক করিল কে?—স্পার্টান। কুকুর স্পার্টানের বাকশক্তি থাকিলে সে বলিত—'যদি সত্য, বিশ্বস্ততা এবং বিশুদ্ধভক্তি সদগুণ হয়, তবে কুকুর পুরুষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যদি স্বার্থপরতা, ধূর্ততা ও কপটাচারকে সদগুণ বলা যায়, তবে অবশ্য পুরুষজাতি কুকুরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ!'

এ-কথার উত্তরে আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতৃসমাজ কী বলিতে চান? এ উক্তি একজন ইংরাজ মহিলার। তাঁহাকে কিছু বলা এ-দেশীয় কর্তাদের ক্ষমতাতীত! কিছু বলিলেও ইহাদের কণ্ঠস্বর সাতসমুদ্র পার হইয়া লেখিকার শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিবে না। তবে আর কী করিবেন ভ্রাতৃগণ! নীরবে রোদন করুন!

পাঠিকা! এ দীর্ঘ উপন্যাস পাঠে আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছেন, জানি, কিন্তু তবু আপনাকে 'ডেলিশিয়া-হত্যা'র শেষ উক্তিটি না-শুনাইয়া ছুটি দিতে পারি না! শেষ কথার ভাবার্থ এই —

পৃথিবীর রাজা-মহারাজার নিকট ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আশা নাই। তবে একদিন স্বয়ং সর্বশক্তিমান বিশ্বপতি সুবিচার করিবেন—তখন তিনি সতীসাধ্বী অবলার প্রতিবিন্দু অশ্রুর জন্য, রমণীর নীরব যন্ত্রণার প্রত্যেকটি দীর্ঘনিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীকে শাস্তি দিবে। আমাদের এই একমাত্র ভরসা, এই আশায় বিশ্বাস করিয়া আমরা ধৈর্যধারণ করিব—নতুবা (যদি ঐ বিচারের আশা না থাকে) মনে করিতে হয়, ঈশ্বর নিজেই—এবং জগৎ তাঁহার নরক!*

কথা কয়টি বড় নৈরাশ্যে বুক ভাঙিয়া উচ্চারিত হইয়াছে! আহা!

---

* শেষ উক্তিটি এমনই মর্মস্পর্শী যে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না: 'Not a tear not a heart-throb of one pure woman wronged shall escape the eyes of Eternal justice, or fail to bring punishment upon the wrong-doer! This we may belive-this we must believe—else God Himself would be a demon and the world His Hell!

জ্ঞানফল*

[রূপকথা]

আদম ও হাভা পূর্বে ইডেন-উদ্যানে থাকিতেন। তাঁহারা প্রভু পরমেশ্বরের অতিথিরূপে পরম সুখে স্বর্গে ছিলেন; তাঁহাদের কোনো অভাব ছিল না। পরমেশ্বর আদমদম্পতিকে কেবল একটি বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা হাভা স্বর্গোদ্যানের সুকুমার জাফরানমণ্ডিত পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই নিষিদ্ধ তরুর ছায়াতলে আসিয়া পড়িলেন। তিনি মুগ্ধনেত্রে কাননের সৌন্দর্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। শাখাস্থিত বিহগের মধুর কাকলি শুনিতে শুনিতে তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সেই বৃক্ষের কয়েকটি ফল চয়ন করত একটি ভক্ষণ করিলেন।

ফল ভক্ষণ করিবামাত্র হাভার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা যদিও রাজ-অতিথিরূপে রাজভোগে আছেন, তথাপি তাঁহার প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাঁহার বরঅঙ্গে একখানি চীর পর্যন্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ আজানুলম্বিত কেশদামে সর্বাঙ্গ আবৃত করিলেন। কেমন একপ্রকার অভিনব মর্মবেদনায় তাঁহার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হইল।

এই সময় তথায় আদম গিয়া উপস্থিত হইলেন। হাভা তাঁহাকে স্বীয় হস্তস্থিত ফল খাইতে অনুরোধ করিলেন। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল ভক্ষণে আদমেরও জ্ঞানোদয় হইল। তখন তিনি নিজের দৈন্যদশা হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিতে লাগিলেন।–এই কি স্বর্গ? প্রেমহীন, কর্মহীন অলস জীবন—ইহাই স্বর্গসুখ? আরও বুঝিলেন তিনি রাজবন্দি, এই ইডেন-কাননের সীমানার বাহিরে পদার্পণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই! তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের ইষ্টক এবং (সুরকি মশলার স্থলে) প্রবাল মুক্তাচূর্ণ নির্মিত সুরম্য প্রাসাদে থাকেন, অথচ 'আপন' বলিতে এক কড়ার জিনিস তাঁহার নাই—এমনকি পরিধানের একখণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত নাই! এ কেমন রাজভোগ? এখন অজ্ঞতারূপ স্বর্গসুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল—জ্ঞানের জাগ্রত অবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং মোহ ও শান্তির স্থলে চেতনা ও অশান্তি দেখা দিল! তিনি হাভাকে বলিলেন, 'এতদিন কী মোহে ভুলিয়াছিলাম! আমাদের এই অবস্থায় কত সুখী ছিলাম!'

হাভা উত্তর দিলেন, 'তাই তো। এই-যে সৌন্দর্যের ললামভূমি—সুগন্ধি জাফরান কুসুমশয্যা যাহাতে দুর্বারূপে বিরাজমান; এই-যে হীরক-প্রসূন ভূষিতা ললিতা বল্লরী; এই যে মরকত কিশলয়-শোভিত তরুরাজি-শীর্ষপদ্মরাগ ফুল—ইহারা নয়ন রঞ্জন করে বটে কিন্তু ইহাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে কই? 'কওসর' জলাশয়ের মকরন্দ প্রতিম অমিয় বারি তৃষ্ণা নাশ করে বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ের পিপাসা মিটে কই? এসব স্বর্গীয় ঐশ্বর্যে আমাদের কী প্রয়োজন?' কোনো এক অজ্ঞাত পরিবর্তন লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন।

---

* এস্থলে কোরানশরিফ বা বাইবেলের বর্ণিত ঘটনার অনুসরণ করা হয় নাই।

পরমেশ্বর উদ্যানভ্রমণে আসিয়া দেখিলেন, আদমদম্পতি তাঁহাকে দেখিয়া বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে ডাকিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষোভে অভিমানে, লজ্জায়, বিভুসমীপে যাইতে পারিলেন না। সর্বজ্ঞ জগদীশ্বর সকলই অবগত ছিলেন. তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোরা স্বাধীনতা চাহিস? যা তবে দূর হ! পৃথিবীতে গিয়া দেখ স্বাধীনতায় কত সুখ!'

আদমদম্পতি সেই দিন পতিত হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। এখানে তাঁহারা অভাব-স্বাচ্ছন্দ্য, শোক-হর্ষ-রোগ, আরোগ্য, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি বিবিধ আলো-আঁধারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃত দাম্পত্যজীবন লাভ করিলেন। হাভা কন্যাদিগকে অধিক ভালোবাসিতেন; তিনি আশীর্বাদ করিলেন। কন্যাকুল দীর্ঘায়ু হইবে, সুখেশান্তিতে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবে; প্রেমের অক্ষয়ভাণ্ডার তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকিবে।

আদম আবার পুত্রদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি তাদৃশ প্রবল না-থাকায় তিনি তনয়দিগকে বিশেষ কোনো বর দান করেন নাই।

জননী হাভার আশীর্বাদ মতে তাঁহার দুহিতানিচয় জন্মে একগুণ, বাড়ে দ্বিগুণ, দীর্ঘায়ু হয় চতুর্গুণ! আর আদমের প্রিয় তনয় জন্মে একগুণ, অতি সোহাগে প্রতিপালিত হয় বলিয়া রোগ ভোগ করে দ্বিগুণ, মরে চতুর্গুণ! স্বাভাবিক মৃত্যু না হইলে তাঁহারা যুদ্ধচ্ছলে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরে! একদল কারাগারে পচে, অবশিষ্ট নানা ক্লেশ ভোগ করে!

স্বর্গচ্যুত হাভা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট যে-জ্ঞানফলটি পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন, তাহার বীজে ধরণীর পূর্বাংশে এক বিশাল মহীরুহ জন্মিল। সময়ে শাখাটি ফুলেফলে পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু সে দেশের লোকে তৎকালে ইহার যথেষ্ট আদর করিতে জানিত না। তরুতলে রাশি রাশি সুপক্ব ফল পড়িয়া থাকিত, শৃগাল ও কাক তদ্বারা উদরপূর্তি করিত। অবশিষ্ট ফল নিকটবর্তী শান্তানদীর বেলায় পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল, কতক গড়াইয়া নদীগর্ভে পড়িল!

জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত নদীজল যথাকালে বিরাট সাগরে গিয়া মিশিতেছিল। বিরাট সাগরে পরপারে পরীস্থান।

পরীস্থানের নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর; কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য ব্যতীত বড়াই করিবার উপযুক্ত আর বিশেষ কিছু তাহাদের ছিল না; সে দেশে কেবল মাকালের বন; উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রীর একান্ত অভাব। জিনগণ× নানা কৌশলে অতি যত্ন পরিশ্রমেও কর্কশ অনুর্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত না। পরীগণ অমরাবতীতুল্য বিলাসভবনে বাস করে,নানাপ্রকারে পরীগণ বিলাস-সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত থাকে; তাহাদের ঐশ্বর্যও প্রচুর, তথাপি তাহারা জঠরানলের জ্বালায় ক্লেশ পায়! বিধাতার লীলা এমনই চমৎকার!

একবার কতিপয় জিন অবগাহনকালে ক্ষুধার তাড়নে আকুল হইয়া বিরাট সাগরের কূলবায়ু খানিকটা গলাধঃকরণ করিল। জলপান করিবামাত্র তাহাদের অজ্ঞাতরূপ আবরণ অপসারিত হইল। এতকাল তাহারা যে অনুচিন্তারূপ জটিল সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই, এখন সে মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। জ্ঞানের দিব্যচক্ষে তাহারা সব দেখিতে পাইল।

× জিন--নর। পরী--নারী।

সেইদিন উক্ত জিনগণ মনস্থ করিল, তাহারা নানা দেশে গিয়া বাণিজ্য [illegible] করিবে। অতঃপর তাহারা মাকাল ফলে জাহাজ বোঝাই করিয়া বাণিজ্য-[illegible] যাত্রা করিল। জিনদের জাহাজখানি নানাস্থান ঘুরিয়া বিরাট সাগরের [illegible] কনকদ্বীপের এক বন্দরে উপনীত হইল। কনকদ্বীপে একজাতি সুবর্ণকায় মানব বসতি ছিল।

কনকদ্বীপের সমৃদ্ধশালী নগর দেখিয়া জিন-বণিকের চক্ষু স্থির হইল। তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের দেশের মতো ঐশ্বর্যশালী দেশ আর নাই, তাহারা 'ধূলামুঠা ধরিলে, সোনামুঠা' হয়। কিন্তু কনকদ্বীপের ভূমি রত্নগর্ভা! এখানে নানাজাতি সুস্বাদু ফলের গাছ আছে, তন্মধ্যে আম্রকানন প্রধান। এখানকার সুসভ্য ঋষিপ্রকৃতি লোকেরা প্রধানত ফল ভক্ষণে জীবনধারণ করে। জিন-বণিক মনে করিল, কোনোরূপে একবার ইহাদিগকে ভুলাইতে পারিলে হয়। তখন তাহারা কনকদ্বীপবাসীদের নিকট হইতে মাকাল বিনিময়ে কতকগুলি সোনামুখী, আঁধারমাণিক প্রভৃতি আম্র লইল। এইরূপে প্রতি বৎসর মাকাল বোঝাই জাহাজ লইয়া আসিত আর আম্রপূর্ণ জাহাজ লইয়া যাইত। ক্রমে বাণিজ্য বেশ পাকিয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কনকদ্বীপে আম্রফলের দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল।

পর বৎসর বণিকেরা বিপণীতে আম্রের অভাব দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাহারা নগর ছাড়িয়া পল্লিগ্রামে আম্রের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল। গ্রামে গিয়া তাহারা দেখিল, হৈমন্তিক ক্ষেত্রসমূহ সুবর্ণ ধাণ্যে পরিপূর্ণ! তদ্দর্শনে জিনেরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল--'ইহারা ক্ষুধার যন্ত্রণা জানে না।' অতঃপর কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া বণিক কৃষকের নিকট মাকাল বিনিময়ে ধান্য প্রার্থনা করিল। কৃষক তাহার ভাষা বুঝিল না; অদূরে ছোট ছোট হৃষ্টপুষ্ট বালক-বালিকার দল সবিস্ময়ে জিনদের সুন্দর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল! বণিক মনে মনে ভাবিল, 'এ কী রঙ্গ। আমরা এই কৃষকশিশুদের তামাশার বিষয় হইলাম দেখি!'

যাহা হউক, কোনোপ্রকারে কৃষককে বণিকেরা নিজেদের মনোভাব জ্ঞাপন করিল। কৃষক প্রথমে মাকালের পরিবর্তে ধান্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল; কিন্তু তাহার পুত্র বলিল, 'আহা! দাও, ওরা ক্ষুধার্ত। আমাদের এত ধান আছে!'×

জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত পরীস্থানে প্রতিবৎসর বাণিজ্যতরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখন আর খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা নাই, সুতরাং পরীদিগের আর কোনোপ্রকার কষ্ট নাই। তাহারা মনের সাধে ঐন্দ্রজালিক রথারোহণে সময়-সময় কনকদ্বীপে ভ্রমণ করিতে আসিত। তাহাদের সহিত কনকদ্বীপবাসিনী ললনাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইল। ফলে তাহারা পরীদের বেশভূষার অনুকরণ প্রয়াসী হইতে লাগিল। বাকি রহিল কেবল পরীর পাখা দুইটির অনুকরণ!

পূর্বে দুই-একখানা জাহাজে বৎসরে একবার মাত্র মাকালের আমদানি হইত, এখন অসংখ্য তরীপূর্ণ মাকাল বৎসরে তিন-চারিবার কনকদ্বীপে আসিতে লাগিল। আর রাশি রাশি ধান্য পরীস্থানে রপ্তানি হইতে চলিল। মাকালের মায়া এমনই যে, কৃষক আর কিছুতেই আত্মসংযম করিতে পারিতেছিল না। আর কৃষক সম্বৎসরের জন্য ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে না, ক্রমে এমন হইল, অদ্য যে ধান্য ক্ষেত্র হইতে কর্তন করিয়া আনে, কল্য তাহা মাকাল

× আহারে!-- 'নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।'

...য়ে বিক্রয় করে। সুতরাং কনকদ্বীপে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসিয়া ঘর বাঁধিল
...ই মাকাল-বাণিজ্যের সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। বিরাট
...তীরে একটি অপরূপ পেয়ারাগাছ হইয়াছিল। জ্ঞানফলের রসমিশ্রিত জল দ্বারা
...হওয়ায় ঐ পেয়ারা ফল কিছু কিছু জ্ঞানফলের গুণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জিনপরীগণ ঐ
...রা নিজেদের জন্য সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু একদিন বণিকেরা যৎকালে
...জে মাকাল তুলিতেছিল, সেই সময়ে দৈবাৎ তরুচূড়া হইতে গোটাকত পেয়ারা
...জে পড়িল। সেই পেয়ারা মাকালের সহিত কনকদ্বীপে আনীত ও বিক্রীত হইল।
কনকদ্বীপবাসী দুই-চারিজন ভাগ্য-বানব্যক্তি পরীস্থান হইতে আনীত পেয়ারা ভক্ষণ
...য়া তাহার বীজ ফেলিয়া দিলেন। সেই বীজ কনকদ্বীপেও পেয়ারাগাছ হইল।
...ই শতাধিক বৎসর অতীত হইল।

* *

...রা ফলের কল্যাণে কতিপয় কনকদ্বীপবাসী ভদ্রলোক এখন ভ্রান্তস্বপ্ন হইতে
...য়া উঠিলেন। দীর্ঘকালের—শত শত বৎসরের মোহনিদ্রার পর এ কী তীব্র
...রণ! অন্ধ চক্ষুপ্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকারে পড়িলেন! তাহারা বিস্ময়ে বিস্ফারিত
...নে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জিনগণ এক মাকাল ফলের পরিবর্তে
...শের সর্বস্ব লইয়া গিয়াছে; এখন জলৌকার ন্যায় তাঁহার বুকের অবশিষ্ট রক্ত শোষণ
...রিতেছে! জনকের দৈন্যদুর্দশা দেখিয়া তাহাদের হৃদয় শতধা হইতে লাগিল।
আর সে আম্রকানন নাই; কোনো স্বাদুফল গাছেই আর ফল নাই; ক্ষেত্রে স্বর্ণশস্য
...ই, রত্নগর্ভা ধরণী ধূলিগর্ভা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে 'হা অন্ন হা অন্ন!' আর্তনাদ
...য়াছে। পূর্বের মতো কৃষকের আর কান্তিপুষ্টি নাই; তাহার দেহ কঙ্কালসার,
...বিধানে শতগ্রন্থি চীর! কনকদ্বীপবাসীর আর কিছুই নাই, আছে কেবল মাকাল আর
...কাল। নগরে রাজপথে দ্বিধারে পণ্যবীথিকায় মাকাল; গ্রামে হাটে-বাজারে মাকাল,
...মুদির দোকানে মাকাল—সমুদয় দেশ মাকালে আচ্ছন্ন! এখন উপায়?
কনকদ্বীপবাসী শাপে বরপ্রাপ্ত হইয়াছে, মাকালের সহিত জ্ঞানপেয়ারা লাভ
...রিয়াছে, সুতরাং উপায় ভাবিতে আর বিলম্ব হইবে না; তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আর
...কাল গ্রহণ করিবে না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে একযোগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল,
...হারা আর মাকালের মায়ায় ভুলিবে না। তাহারা এখন যে নব উৎসাহ, প্রবল শক্তি
...ভ করিয়াছে—মাকালে নাকাল না হইলে এতশীঘ্র তাহা লাভে সমর্থ হইত না।
...জন্য তাহারা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে জিনদিগকে শতবার ধন্যবাদ দিল।
এদিকে যথানিয়মে জিন-সওদাগর পূর্বঅভ্যাস মতো জাহাজ বোঝাই মাকাল লইয়া
...ন্দরে পৌঁছিল। কিন্তু এবার আর মাকাল বিক্রয় হইল না। যখন কিছুতেই বণিকেরা
...সোতির কূলকিনারা করিতে পারিল না, এবং ভারে ভারে নয়নরঞ্জন মাকাল পচিয়া
...ষ্ট হইতে লাগিল, তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া পরীস্থানে এই দুঃসংবাদ প্রেরণ
...রিল!
পরীস্থানে বণিক-সভায় এবিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল—আন্দোলন
...লয়ে বিরাট সাগরের সুগভীর শান্ত জল পর্যন্ত আলোড়িত হইল। পরিশেষে জনৈক
...লিতদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ বলিলেন, 'অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কনকদ্বীপবাসী কেন
...কালে বিরাগী হইল।'

বণিকদল কনকদ্বীপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া, নানাপ্রকার জনরব শুনিয়া অবশে
হইল যে, যাঁহারা পেয়ারার আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই মাকালে বিরক্ত
সওদাগর এই সন্দেশ মায়াবলে এক নিমিষেই পরীস্থানে প্রেরণ করিল। সেইখানে
বণিকনেতা আদেশ দিলেন, 'কনকের পেয়ারা-তরু সমূলে উৎপাটন কর।'

পুনরায় বণিকেরা মায়াসন্দেশবহ দ্বারা তাহাদের নেতাকে জ্ঞাপন করিল, অতএব
মহীরুহ সমূলে উৎপাটন করা অসম্ভব। অতএব কী আদেশ? বণিকনেতা তৎক্ষণাৎ
আজ্ঞা দিলেন, 'উহার মূল ছেদন কর!'

পেয়ারা-তরুর মূলে শত শত শাণিত কুঠারের আঘাত পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে
কনকদ্বীপবাসী প্রথমে তো অবাক হইল, পরে বুঝিল, ব্যাপারখানা কী! তাহারা প্রথমে
অনুনয়বিনয় দ্বারা জিন-বণিককে বৃক্ষচ্ছেদনে বাধা দিল—পরে সওদাগরের প্রদপ্রান্তে
লুণ্ঠিত হইয়া সরোদনে নিষেধ করিল। কিন্তু জিনেরা কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। তখন
কনকদ্বীপে ভয়ানক হৈচৈ পড়িয়া গেল, শান্তিপূর্ণ দেশটির দিকে দিকে অশান্তি-অনল
জ্বলিয়া উঠিল!. জিন তবু নাছোড়বান্দা। তাহারা বরং সুবর্ণকায়দিগকে বুঝাইতে চেষ্টা
করিল :

'ঈশ্বর যখন জ্ঞানফল মানবের পক্ষে নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ফল গ্রহণদোষেই
আদিমাতা স্বর্গবিচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয় জানিও এ-ফল মানবের অতীব
অনিষ্টকারী। অতএব তোমাদের পরম উপকারের জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করিয়া
এ গাছ কাটিতেছি।'

দেশের লোকেরা যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর ফাঁকাতর্কে ভুলিবার
পাত্র নয়। তাহারা বলিল, 'তবে তোমরা ও ফল খাও কেন? আগে পরীস্থানের
পেয়ারাগাছ কাট গিয়া, পরে আমাদের গাছ কাটিও। আর আদিজননী যখন ঐ ফল
বিনিময়ে স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিয়াছেন, তখন ও ফলের মূল্য কত, তাহা সহজেই অনুমেয়।
স্বর্গ হইতে আনীত ফল মর্ত্যে অবশ্য অবশ্য অতি যত্নে রক্ষণীয়।' কিন্তু সে-কথা শুনে
কে?—এ যে আঁতে ঘা।

বৃক্ষকর্তন উপলক্ষে কনকে কিছুকাল খুব বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই সময়
কোনো অশীতিপর পণ্ডিত বলিলেন, 'এ বিকৃত পেয়ারাগাছের জন্য তোমরা বৃথা কলহ
কর কেন? ইহা তো সে আদি জ্ঞানফলের রূপান্তরিত ফল মাত্র। তোমরা হাভা কর্তৃক
রোপিত সেই আদিবৃক্ষের অনুসন্ধান কর। শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, তাহা পৃথিবীর
পূর্বাংশে আছে। চল, আমরা তাহারই সন্ধানে যাই।' বৃদ্ধের কথামতে সকলে বর্তমান
ছাড়িয়া অতীতের সন্ধানে চলিল। বৃদ্ধ পণ্ডিত কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলেন না—তিনি
উপদেশ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন।

অনেক দিনের পর্যটনে নদনদী, জনপদ, পর্বত, প্রান্তর এবং অরণ্য অতিক্রম করিয়া
কনকবাসীরা যথাস্থানে একটি সুবৃহৎ মৃত তরু সন্নিকটে উপস্থিত হইল। অনেক শাস্ত্র
দেখিয়া, বহু কিংবদন্তি শুনিয়া তাহারা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে, এই শুষ্ক
তরুই আদি জ্ঞানবৃক্ষ। তখন মর্মান্তিক ক্ষোভে, দুঃখে, হতাশে তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ
হইতে লাগিল! তাহারা এত পরিশ্রম করিয়া, দীর্ঘ প্রবাসে আহার-নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া, এত
কষ্ট সহিয়া এদেশে আসিল এই মৃত তরুর জন্য? স্থানীয় লোকেরা বলিল, প্রায় দ্বি-
শতাধিক বৎসর হইল গাছটি মরিয়াছে। জনৈক আগন্তুক তদুত্তরে বলিল, 'তবু ভালো,
তোমরা যে অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে ইন্ধনরূপে অনলে উৎসর্গ কর নাই, তাই রক্ষা!!'

এখন কী করা যায়? কী উপায়ে জ্ঞানবৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হইবে? কেহ বলিল, প্রাণপণে জল সেচন কর; কেহ বলিল, অশ্রুসেক কর; কেহ বলিল, হৃদয়ের শোণিত দান কর ইত্যাকার নানা প্রস্তাব উত্থাপিত হইতে লাগিল। এমনকি দুই-একজন মানবের প্রাণ বিনিময়ে যদি তরুবর সঞ্জীবিত হয়, তবে তাহারা তাহাতেও কুণ্ঠিত নয়। সকলে শুষ্ক তরুর নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিল,—অশ্রুধারা, রক্তধারা কিছুই দিতে কুণ্ঠিত হইল না। কিন্তু মৃত কবে সঞ্জীবিত হয়? সমুদয় চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাহারা মর্মাহত হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিল। রোদনে ক্লান্ত হইয়া এক ব্যক্তি তরুমূলে শয়ন করিয়াছিলেন; তিনি তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন কোনো সন্ন্যাসী বলিতেছেন :

'বৎস! ক্রন্দনে কোনো ফল হইবে না। দুই-একটি কেন, দুইলক্ষ নরবলি দান করিলেও জ্ঞানবৃক্ষ পুনরুজ্জীবিত হইবে না। দুইশত বৎসর হইল এই দেশের অদূরদর্শী কর্ণধার পণ্ডিতমূর্খেরা ললনাদিগকে জ্ঞানফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে; কার্যক্রমে ঐ নিষেধ সামাজিক বিধানরূপে পরিগণিত হইল এবং পুরুষেরা এ-ফল নিজেদের জন্য একেটিয়া করিয়া লইল। রমণীবৃন্দ এ-ফলের চয়ন ও ভক্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এ-গাছের সেবা-শুশ্রূষায় বিমুখ হইল। কালে নারীর কোমল হস্তের সেবাযত্নে বঞ্চিত হওয়ায় জ্ঞানবৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে! যাও, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও; এখন সেই পেয়ারার বীজ বপন কর গিয়া। জিনগণ যে গাছ কাটিতে চাহে, কাটুক; তোমরা তাহাদের বাধা না দিয়া গোপনে বীজ সঞ্চয় করিয়া রাখিও। এখন তোমরা নরনারী উভয়ে মিলিয়া নবরোপিত পেয়ারা-চারার যত্ন করিও, তাহা হইলে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। সাবধান আর কন্যাজাতিকে পেয়ারায় বঞ্চিত করিও না। নারীর আনীত জ্ঞানফলে নারীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এ-কথা অবশ্য স্মরণ রাখিবে।' নিদ্রাভঙ্গে তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গীদিগকে বলিলেন; তাহারা ইহা শুনিয়া সকলে একবাক্যে বলিল, চল তবে ফিরিয়া যাই। জনৈক উদারহৃদয় ভদ্রলোক বলিলেন, 'তাই তো! পুরুষেরা নদী পার হইয়া কুমিরকে কলা দেখাইয়াছিল—নারীর আহৃত জ্ঞানে নারীকেই বঞ্চিত করিয়াছিল—তাহার ফল হাতে হাতে!'

কনকদ্বীপের উদ্যমশীল বালকেরা উদ্যানের এককোণে খানিকটা স্থান পরিষ্কার ও চিহ্নিত করিল, পরে বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আইস ভগিনী। তোমরা যোগদান কর। আমরা কোদালি দ্বারা ভূমি প্রস্তুত করি, তোমরা স্বহস্তে বীজ বপন কর। আজি কী শুভদিন, এখন হইতে আমাদের নিজের গাছ হইবে।' বিস্ময়স্তম্ভিত জিনেরা নীরবে দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিল, কনকবাসীর এ-শুভকার্যে তাহারা বাধা দিতে পারিল না। নব উৎসাহে অনুপ্রাণিত কনকবাসীদের এ মহৎকার্যে—জিন দূরে থাকুক, দৈত্যও এখন বাধা দিতে অক্ষম।

অতঃপর কনকদ্বীপ পুনরায় দ্বিগুণ-ত্রিগুণ ধনধান্যে পূর্ণ হইল; অধিবাসীগণ পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহারা আর কোনোপ্রকার ইন্দ্রজালে ভুলিবার পাত্র নয়। কারণ এখন ললনাগণ জ্ঞানকাননের অধিষ্ঠাত্রী হইয়াছেন।

কনকের রূপকথা অমৃত সমান,
মৃতব্যক্তি যদি শুনে পায় প্রাণদান!

নারী-সৃষ্টি

[পৌরাণিক উপাখ্যান]

[কিছুদিন হইল কোনো ইংরাজি সংবাদপত্রে নারীসৃজন সম্বন্ধে একটি চমৎকার কৌতুকপূর্ণ পাঠ করিয়াছিলাম। আমার ভগিনীদিগকে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। পূর্বেই বলিয়া রাখি, আমি স্কুলের ছাত্রীর জন্য শাব্দিক অনুবাদ করিব। মূল বিষয়ের মর্মোদ্ধার করিব। সুতরাং কেহ মূলের সহিত অনুবাদের বৈষম্য দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না।]

কর্নেল ইঙ্গারসোল (Ingersoll) 'মুসার ভ্রম' শীর্ষক বক্তৃতা দানকালে নারী বিষয়ক পুরাকালের একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতে ভালোবাসিতেন। তিনি ইহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেন যে, বাইবেলের নারীসৃষ্টির ইতিহাস অপেক্ষা এ গল্পের ভাব কত উচ্চ এবং কত উদার। কিন্তু জানি না, তিনি নিম্নলিখিত পৌরাণিক আখ্যায়িত শ্রবণ করিলে ইহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতেন কি না।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই প্রাচীন পুস্তকখানি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হয়। জনৈক ইংরাজ-লেখক মি. বেন (Mr. Bain) ইহা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন। অতঃপর উহা 'চিকাগো টাইমস হেরাল্ড' (উদধডটথম কধবণ্র ঔণরটফঢ) পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। গল্পটি এই প্রকার :

আদিকালে যখন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা আদি কিছুই ছিল না—ছিল কেবল অন্ধকার—ত্বস্তি নামক হিন্দুদেবতা এই বিশ্বজগৎ সৃজন করিলেন। সর্বশেষে রমণীসৃষ্টির পালা, তখন বিশ্বস্রষ্টা ত্বস্তি দেখিলেন যে, তিনি পুরুষ সৃজনকালেই সব মালমশলা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। আর ঘন কিংবা শক্ত কোনো বস্তুই অবশিষ্ট নাই। ত্বস্তিদেব নৈরাশ্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, উপায়ান্তর না-দেখিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন।

ধ্যান ভঙ্গের পর ত্বস্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ পদার্থের সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, যথা : (১) পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব; (২) সর্পের বক্রগতি; (৩) লতিকার তরুশাখা অবলম্বন; (৪) তৃণের মৃদু কম্পন; (৫) গোলাপ লতার কণ্টক; (৬) কুসুমের সৌকুমার্য; (৭) কিশলয়ের লঘুত্ব; (৮) হরিণের কটাক্ষ; (৯) সূর্যের ঔজ্জ্বল্য; (১০) কুয়াশার অশ্রু; (১১) সমীরণের চাঞ্চল্য; (১২) শশকের ভীরুতা; (১৩) ময়ূরের বৃথা গর্ব; (১৪) তালচঞ্চু পক্ষীর পাখার কোমলতা; (১৫) হীরকের কাঠিন্য; (১৬০ মধুর স্নিগ্ধ স্বাদ; (১৭) ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা; (১৮) অনলের উত্তাপ; (১৯) তুষারের শৈত্য; (২০) ঘুঘুর ললিত স্বর; (২১) নীলকণ্ঠের কিচির মিচির গান—

ঐ পর্যন্ত অনুবাদ লিখিবার পর অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হওয়ায় আমি কলম লইয়াই টেবিলে ন্যস্ত বামহাতে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। জানি না আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কি না। সহসা আমার কক্ষটা অতিশয় আলোকিত উঠিল—বোধ হইল যেন ঘরের ভিতর দুই-চারিটি সূর্য উদয় হইয়াছে। সম্মুখে দেখি, আলোস্তম্ভের ন্যায় অতি উজ্জ্বল একটি মূর্তি দণ্ডায়মান। সেদিকে দেখিতে নয়নদ্বয় ঝলসিয়া গেল। আমি তখনই চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। আমার

সেই সময় মূর্তিটি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'শুন বৎসে! আমি বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা তোমার নারীসৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিতেছ দেখিয়া সুখী হইলাম। আমি সর্বসুদ্ধ বত্রিশটি উপাদানে নারী রচনা করিয়াছি। ইংরাজ লিপিকার মি. বেন এই উপকরণ সংস্কৃত হইতে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিবার সময় ভ্রমক্রমে ১২টি উপকরণের নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। অদ্য আমি সেই ভ্রম সংশোধন করিতে আসিয়াছি। কেননা পৌরাণিক ইতিহাসে কোনোপ্রকার ভুলভ্রান্তি থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আমি সেই দ্বাদশ বস্তুর নাম বলিয়া যাই, তুমি লিখ।' আমি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় বিহ্বলচিত্তে কলমটা কালিতে ডুবাইয়া লইয়া অলসভাবে লিখিতে লাগিলাম :

(২২) তেঁতুলের অম্লত্ব (২৩) লবণের লাবণ্য; (২৪) মরিচের ঝাল; (২৫) ইক্ষু রসের মিষ্টতা'—ভ্রম হইতেছে ভাবিয়া আমি থামিলাম, ক্ষণকাল পরে সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলাম, 'মহাত্মন! এ যে চাটনির মশলা—'

তৃপ্তি স্মিতমুখে অথচ দৃঢ়স্বরে কহিলেন, 'আমি যাহা বলি নির্বিবাদে লিখিয়া যাও।' আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যন্ত্রচালিতার ন্যায় লিখিলাম :

(২৬) কুইনাইনের তিক্ততা; (২৭) যুক্তিজ্ঞানহীনতার কূটতর্ক; (২৮) কলহপ্রিয়তার মুখরতা; (২৯) দার্শনিকের অন্যমনস্কতা; (৩০) রাজনৈতিকের ভ্রান্তি; (৩১) পাষাণের সহিষ্ণুতা; (৩২) সলিলের তারল্য এবং (৩৩) নিদ্রার মোহ।'

পাঠিকা ভগিনী হয়তো বড্ড রাগ করিয়াছেন, গল্পের তালভঙ্গ এবং রসভঙ্গ হইল দেখিয়া। তা কী করি, বলুন, দেখি। পরের লেখা অনুবাদ করিতে গেলে নিজের স্বাধীনতা খাটানো যায় না। বিশেষত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে কল্পনা বেচারিকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখিতে হয়। যাক, এখন পুনরায় অনুবাদ চলুক। না, আমি আবার গোড়া হইতে বলি, অনুবাদ ও দৈববাণী একত্রে মিশাইয়া বলি।—

ধ্যানভঙ্গের পর তৃপ্তি চক্ষু মর্দন করিয়া দাঁড়াইলেন এবং কতিপয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের সারভাগ সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন, তথা :

(১) পূর্ণচন্দ্রের গোলত্ব; (২) সর্পের বক্রগতি; (৩) লতিকার তরুশাখা অবলম্বন; (৪) তৃণদলের মৃদু কম্পন; (৫) গোলাপ লতার ক্ষীণতা; (৬) কুসুমের সৌকুমার্য; (৭) কিশলয়ের লঘুত্ব; (৮) হরিণের কটাক্ষ; (৯) সূর্যরশ্মির ঔজ্জ্বল্য; (১০) কুয়াশার অশ্রু; (১১) সমীরণের চাঞ্চল্য; (১২) শশকের ভীরুতা; (১৩) ময়ূরের বৃথা গর্ব; (১৪) খঞ্জনচক্ষু পক্ষীর পাখার কোমলতা; (১৫) হীরকের কাঠিন্য; (১৬০ মধুরস্নিগ্ধ স্বাদ; (১৭) ব্যাঘ্রের নিষ্ঠুরতা; (১৮) অনলের উত্তাপ; (১৯) তুষারের শৈত্য; (২০) ঘুঘুর ললিত স্বর; (২১) নীলকণ্ঠের কিচির মিচির গা ; (২২) তেঁতুলের অম্লত্ব; (২৩) লবণের লাবণ্য; (২৪) মরিচের ঝাল; (২৫) ইক্ষুরসের মিষ্টতা; (২৬) কুইনাইনের তিক্ততা; (২৭) যুক্তিজ্ঞানহীনতার কূটতর্ক; (২৮) কলহপ্রিয়তার মুখরতা; (২৯) দার্শনিকের অন্যমনস্কতা; (৩০) রাজনৈতিকের ভ্রান্তি; (৩১) পাষাণের সহিষ্ণুতা; (৩২) সলিলের তারল্য; (৩৩) নিদ্রার মোহ।

তৃপ্তিদেব উপরোক্ত তেত্রিশ উপাদান একত্র মিশ্রিত করিয়া ললনা রচনা করিলেন। (Egg beater দ্বারা উত্তমরূপে ফেটিয়া!) বলাবাহুল্য রমণী সৃজন করিতে সৃষ্টিকর্তাকে অত্যধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে অনেক গবেষণা, অনেক চিন্তা, গভীর ধ্যান ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। লোকে যে-জিনিসটি প্রস্তুত করিতে অধিক মাথা ঘামায়, তাহা নিশ্চয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কোনো বস্তু নির্মাণ করিয়া হাত পাকিলে পর

সর্বশেষে যাহা প্রস্তুত করা হয়, তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হয়। সুতরাং রমণী যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, ইহাতে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতঃপর তুষ্টি সেই নির্মিতা অঙ্গনা পুরুষকে উপহার দিলেন।'* অষ্টম দিবস পরে পুরুষ তাহার উপস্থিত হইয়া বলিল—'হে প্রভো! আপনি যে জীবটি আমাকে উপঢৌকন দিয়াছি সে তো আমার জীবন বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে যে অবিরত বকবক করে; সে আমাকে এক তিল অবকাশ দেয় না; সে যে বিনাকারণে বিলাপ করে; কথায় সে যারপরনাই মন্দ।' তুষ্টি অবলাকে ফিরাইয়া লইলেন।

অষ্টাহ অতীত হইলে পর পুরুষ পুনর্বার দেবতা-সমীপে উপনীত হইয়া বলিল—'হে দেব! আপনার প্রদত্ত জীবটিকে প্রত্যাখ্যান করা অবধি আমার জীবন অতিশয় নিরস ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে। আমার স্মরণ হয়, সে কী সুন্দর! আমার সম্মুখে নাচিয়া গাহিত, খেলিত! মনে পড়ে তাহার সেই কটাক্ষ—মরি মরি! সে কেমন করিয়া আমার নয়নে আমার দিকে চাহিত! সে আমার খেলার সহচরী ছিল; আমার জীবনসঙ্গিনী ছিল। তাহার বিরহ আমার অসহ্য।'

তুষ্টি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে পুনরায় সে রমণী প্রদান করিলেন।**

চতুর্থ দিবসে আবার তুষ্টিদেব দেখিলেন যে, পুরুষ বনিতাসমভিব্যবারে তাঁহার নিকট আসিতেছে। ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পুরুষ বলিল, 'দেব! আমায় ক্ষমা করুন। আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, নারী আমার আনন্দের কারণ, না, বিরক্তির কারণ। তাহাকে লইয়া আমার সুখশান্তি অপেক্ষা কষ্টের ভাগই অধিক! অতএব প্রভো! আপনি কৃপাবশত আমাকে ইহা হইতে মুক্তিদান করুন!'

এবার দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'যাও, তোমার যাহা ইচ্ছা কর গিয়া!'

পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিল, 'এ যে আমার কালস্বরূপ, ইহার সঙ্গে জীবনযাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যে কিছুতেই ইহার সঙ্গে থাকিতে পারি না!'

তুষ্টি উত্তর দিলেন, 'তুমি তো ইহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে পার না।'

পুরুষ নিরূপায় হইয়া মনের দুঃখে খেদ করিতে লাগিল, 'কী আপদ! এ রমণীকে রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না!'

তদবধি নারী অভিশাপরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে!!!

---

* উপহারটা যেন বানরের গলায় মতির হার।

** নারীও যেন প্রাণমনহীন, বুদ্ধিবিবেকহীন একটা কাঠের পুতুল বিশেষ--পুরুষ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিজেকে অপমানিতা বোধ করে নাই, আবার ফিরাইয়া লইতে আসিলেও সে অনুতপ্ত বোধ করে নাই। তুষ্টিদেব অবশ্যই জানিতেন, এইরূপ নির্বাক 'কাঠের পুতুল' গৃহিণীই পুরুষের বাঞ্ছনীয়।

নার্স নেলি

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

১

আমার ছোট ননদ খুকি তিন বৎসর যাবৎ রোগে ভুগিতেছেন। অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। তাঁহার যত্ন করিবার জন্য আমিও সঙ্গে আসিয়াছি। আল্লাহ রাখে, আমাদের কাফেলার অনেক লোক, খুকির স্বামীপুত্র প্রভৃতি সকলেই ছিল।

আমাদের জনৈক বন্ধু হেমবাবুও লক্ষ্ণৌতে ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বিমলা দেবী পীড়িত হইয়া জানানা হাসপাতালে আছেন শুনিয়া, আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি শয্যাশায়িনী ছিলেন। তাঁহার বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দেয় নার্স; তাঁহার বাহুর ক্ষতস্থলে পটি বাঁধে নার্স। এক-কথায়, তাঁহার সমুদয় কার্য নার্সগণই করে। আমি প্রায় দুই-ঘণ্টাকাল তথায় ছিলাম, ততক্ষণে বিভিন্নকার্যের জন্য গোটা-পাঁচ নার্সকে আসিতে যাইতে দেখিলাম। কিন্তু রক্তপুঁজপূর্ণ বালতি লইয়া যে-নার্সটি, তাঁহার চেহারাটা আমার চক্ষে যেন কেমন বোধ হইল।

আমি একদিন-অন্তর-একদিন হেমবাবুর স্ত্রীকে দেখিতে যাইতাম। সত্য কথা বলিতে কি, বিমলাকে দেখিবার আগ্রহ তত ছিল না: তাঁহার সেই জীর্ণশীর্ণ রুগ্নকায়া মলিনবদনা—বিষাদের প্রতিমূর্তি নার্সটিকেই দেখিতে যাইতাম। তাহার সেই যেন চিরপরিচিত মুখখানি; অথবা চিনি-চিনি চিনিতে পারি না মুখখানি আমার কেমন যেন লাগিল। একদিন বিমলা বলিলেন, 'হাঁ ভাই, তুমি নার্স নেলির দিকে অমন করে চেয়ে থাকো কেন?'

আমি মনোভাব গোপন করিয়া বলিলাম, 'ওর ঐ শুকনো মুখখানা দেখে বড় মায়া লাগে।'

বিমলা। হ্যাঁ, ওর বড় দুক্ষু, আমারও বড্ড মায়া করে। কিন্তু উপায় কী? ওকে দু-চার টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবার জো নাই। ছ-টাকা মাইনে পায়—খেয়েই পেট ভরে না। প্রথম প্রথম আমি নার্স নেলিকে সিকিটা-আধুলি দিতুম, কিন্তু পরে জানতে পাল্লুম, সিসটার রিভা সব কেড়ে নিয়ে হাসপাতালের যত চাকর আছে, সবাইকে ভাগ করে দেন—হয়তো নেলির ভাগেও একটা পয়সা কখনো পড়ে। সিসটার রিভার কী অন্যায় দেখ দেখি। যত নোংরা কাজ, সব নেলি করে, অথচ সে একটু ভালো খাবার খেতে পায় না।

আমি। নেলি কি জাতে মেথর?

বিমলা। না, বাঙালি খ্রিস্টান। শুনেছি, এককালে সেও গেরস্থঘরের বউ-ঝি ছিল। পাদরিমাগীরা ফুসলিয়ে খ্রিস্টান করে ওকে ঘরের বার করেছে। তার আগেকার নাম বদলে নেলি নাম রাখা হয়েছে। নেলি বাংলা জানে বলে তাকে আমাদের, অর্থাৎ বাঙালি রোগিণীদের সেবায় রাখা হয়েছে। মুসলমান মেয়েদের কোয়ার্টারে নেলিকে মোটেই যেতে দেয় না, ভয়, পাছে কেউ তাকে মুসলমান করে ফেলে। আর-এক কথা শুনেছ, নেলি নাকি দিব্বি কোরান পড়তে পারে!

নেলি কোরানশরিফ পাঠ করিতে পারে, শুনিয়া আমার মনে আরো কেমন খটকা লাগিল। না জানি সে কোন্ মুসলমান কুলে কালি দিয়া পতিত হইয়াছে! হায়! কোরান শরিফের এই অবমাননা! খ্রিস্টান নেলি—মেথরানি নেলি—যে হস্তে ঘৃণিত রক্ত পূঁজ পরিপূর্ণ বালতি পরিষ্কার করে, সেই হস্তে কোরান শরিফ স্পর্শ করে। কার্যত নেলি মেথরের কাজ করে, কিন্তু হাসপাতালের কর্ত্রীগণ তাহাকে নার্স নেলি বলিয়া ডাকেন।

বিমলাকে দেখিবার ছলে হাসপাতালে যাইতাম বটে, কিন্তু একদিনও নেলির সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুবিধা পাইতাম না। নেলিও কাজের ছলে আমাদের নিকট যখন-তখন আসিত—অথবা দূর হইতে তাহার সুন্দর ডাগর চক্ষুদুটি আমার দিকেই ন্যস্ত রাখিত। হঠাৎ আমি দেখিতে পাইলে চক্ষু অবনত করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইত। এখন আমার ফিকির হইল, কিরূপে নেলির সান্নিধ্য লাভ করা যায়। কালেভদ্রে সুযোগ পাইয়া নেলিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কেবল দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিত। যাহা হউক, নেলিকে আমাদের নিকট পাইবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল।

খুকির অস্ত্রচিকিৎসা করাই স্থির হইল। কিন্তু আমি তো কিছুতেই খুকিকে হাসপাতালে যাইতে দিব না। এজন্য দুলামিয়ার (খুকির স্বামীর) সঙ্গে অনেক বাকবিতণ্ডা হইল—তিনি আমাকে হাসপাতালের উপকারিতা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন; সমুদয় ন্যায়শাস্ত্র আবৃত্তি করিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হেমবাবুর স্ত্রীর নজির পেশ করিলেন। কিন্তু হাসপাতাল একবার আমার যে সর্বনাশ করিয়াছে, তাহাতে আমার প্রাণ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে। আমার সে দগ্ধক্ষত এখনো আরোগ্য হয় নাই। দুলামিয়াকে আর সে-সব কথা খুলিয়া বলিলাম না। শেষে আমারই জয় হইল। 'ধন্য স্ত্রীলোকের কুসংস্কার!' বলিয়া দুলামিয়া অস্ত্র (যুক্তিঅস্ত্র) ত্যাগ করিলেন। বাসাতেই অস্ত্র হইবে, ঠিক হইল।

যথাসময়ে হাসপাতালের বড় ডাক্তার মিস ফলি তাঁহার দলবলসহ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই-তিনটা নার্সও ছিল। আমরা সকলে বাঙালি, 'হিন্দি কা চিন্দি' বুঝি না, তাই আমাদের ভাষা বুঝাইতে নার্স নেলিকে আসিতে হইয়াছিল। কার্যশেষে সকলে চলিয়া গেলেন। কেবল রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য দুইজন সেবিকা—নেলি এবং লিজি রহিল।

পরদিন যথাসময় সকলের স্নান আহার এবং খুকিকে ঔষধপথ্য খাওয়ানো শেষ হইলে পর আমি অবসর ও সুযোগ পাইয়া নির্জনে নেলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'নার্স, তোমার বাড়ি কোথায়?'

তদুত্তরে সে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল—বহুকষ্টে উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল, 'বুবুজান। আমাকে চিনিতে পারেন নাই?'

অ্যাঁ! আমার মাথা ঘুরিয়া গেল! আমি মেঝেতে বসিয়া পড়িলাম। হাঁ, চিনিলাম তো। অহো! কী নিষ্ঠুর সত্য—কী দারুণ সত্য আবিষ্কার করিলাম।

... নেলি তাহার দুর্দশার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করিল। ইতিহাসের প্রত্যেকটি অক্ষর অশ্রুবিধৌত ছিল।

২

... পুর গ্রামে আমার পিত্রালয়। পিতামহের মৃত্যুর পর আমার পিতা ও পিতৃব্য সম্পত্তি সমভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। পিতৃব্যের সংসারে (চাকর, চাকরানি ব্যতীত) মাত্র

একটি পাণী তিনি, তাঁহার ভার্যা এবং তাঁহাদের একমাত্র কন্যা নয়ীমা [illegible]
সংসারে আমরা পাঁচ ভাই-ভগিনীসহ মোট সাতজন। তবু শুনিলাম, চাচাজের [illegible]
টাকা নাই। তাঁহার অনেক দেনা আছে, ইত্যাদি।

আমাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল—আমরা পরম সুখে খাইয়া পরিয়া [illegible]
সাজিয়া থাকিতাম! আমাদের এ নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত বাড়ির তুলনা কোথায়? সাড়ে তিন শত বিঘা লা-খেরাজ জমির মাঝখানে কেবল আমাদের এই সুবৃহৎ বাটি। বাড়ির চতুর্দিকে ঘোর বন, তাহাতে বাঘ, শূকর, শৃগাল—সবই আছে। আমাদের এখানে ঘড়ি নাই, সেজন্য আমাদের কোনো কাজ আটকায় না। প্রভাতে আমরা ঘুঘু, 'বউ কথা কও', 'ও খুকি, ও খুকি', 'চোক গেল' প্রভৃতি পাখির ভৈরবী আলাপে শয্যাত্যাগ করি। সন্ধ্যাকালে শৃগালের 'হুয়া হুয়া ক্যা হুয়্যা' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারি মগরেবের নামাজের সময় হইয়াছে। রাত্রিকালে কুরুয়া পাখির 'কা-আক্-কা-আক্-কু' ডাক শুনিয়া বুঝিতে পারি, এখন রাত্রি তিনটা। আমাদের শৈশবজীবন পল্লিগ্রামের নিবিড় অরণ্যে পরমসুখে অতিবাহিত হইয়াছে।

কিছুকাল পরে চাচিজান একমাত্র তিন বৎসরের কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। চাচাজান চক্ষে আঁধার দেখিতে লাগিলেন। কন্যার প্রতিপালনই তাঁহার প্রধান সমস্যা। আমার মাতা তাঁহাকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, তুমি অত ভাবছ কেন? নয়ীমার মা মরেছেন, আমি তো মরি নাই। যে কোলে আমার তিন মেয়ে জোবেদা, হামিদা, আবেদা মানুষ হয়েছে, সে কোলে কি নয়ীমার জায়গা হবে না?'

পিতৃব্য যেন অকূলসাগরে ডুবিতে ডুবিতে কূল পাইলেন। পরদিন তিনি নয়ীমাকে পাঁচজন দাসীসহ আমাদের বাড়িতে রাখিয়া গেলেন।

নয়ীমা আমাদের সব ভাইবোনের চেয়ে ছোট বলিয়া আমরা তাহাকে অতিশয় ভালোবাসিতাম। আমার পিতামাতা তাহাকে আমাদের সকলের চেয়ে অধিক ভালোবাসিতেন। এইরূপে নয়ীমা রাজকুমারীর মতো স্নেহযত্নে বর্ধিত হইতে লাগিল। পল্লিগ্রামে আমরা উচ্চশিক্ষার ধার ধারিতাম না। সামান্য পড়ালেখা যাহা আমরা জানিতাম, তাহা নয়ীমাও শিক্ষা করিল। শিকা গাঁথা, কেণী প্রস্তুত করা, সুপারির ফুল, সুপারি কাটা, নারিকেলের চিড়া, জিরা কাটা, সুজনী সেলাই ইত্যাদি যাহা কিছু শিক্ষণীয় ছিল, নয়ীমা সে-সমস্তই ক্রমে শিখিয়াছিল। আমাদের আত্মীয়স্বজনের মতে, মেয়ে-মানুষের পড়ালেখা শেখার মতো অকেজো জিনিস যেন পৃথিবীতে আর নাই।

সাতবৎসর হইতে নয়ীমা আমাদের সঙ্গে আছে। চাচাজানও পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আপন ভাগের সম্পত্তি সব অপব্যয়ে উড়াইয়া দিয়াছেন; কেবল নয়ীমার মাতার অলঙ্কারগুলি নষ্ট করেন নাই, তাহা আমার পিতাকে দিয়াছেন।

কিছুদিন হইল আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জামাল আহমদ সাহেব প্রায় আট-দশ বৎসর পরে বিদেশ হইতে ট্রান্সফার হইয়া এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করিয়া বাড়ি আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আমি শ্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছি; এবং আরও কতিপয় আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছেন। এ-সময় আমাদের বাড়িটা লোকের ভিড়ে বেশ গমগম করিতেছিল।

একদিন আমরা চারি ভগিনীতে গল্পগুজব করিতেছিলাম, এমন সময় ভাইজান তথায় আসিলেন। তিনি আমাদের লক্ষ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা লেখাপড়ার চর্চা কর না, এমন আঁধার মন নিয়ে কী করে থাকো? হ্যাঁ নয়ীমা! তুমি কিছু পড়াশুনা কর না?'

নয়ীমা উত্তর দিল, 'আমি কোরানশরিফ খতম করিয়াছি। এখন বড়মাপার [illegible] কোরানশরিফের তরজমা আর রাহে নাজাত পড়ি।'

ভাইজান হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যস, এই! আর কিছু পড় না—একটু বাংলা, একটু ইংরাজি?'

আমি আমার (১৮বৎসর বয়সের) জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, 'ভাইজান! আপনি বাংলা, ইংরাজি অনেক পড়ে বিলাত গিয়ে, শেষে এতদিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, না, কালেক্টর হয়েছেন। নয়ীমার ইংরাজি পড়ে কী হবে? কোন্ জেলায় কালেক্টরি করতে যাবে?'

ভাই। নয়ীমার ভালো লেখাপড়া শিখলে কালেক্টরের স্ত্রী হতে পারবে। ভালো বর পাবে; ভালো ঘরে বিয়ে হবে।

আমরা সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমি তখনই ভাইজানের সৃষ্টিছাড়া কথা মাতাকে গিয়া জানাইলাম। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম। 'ভাইজান বলেন, লেখাপড়া শিখলে নয়ীমা কালেক্টরের বউ হবে।'

মাতা আমার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'হুঁ—আচ্ছা, তাই হবে।'

৩

আমাদের বাড়িময় ভারি ধুম পড়িয়া গিয়াছে—ভাইজানের সঙ্গে নয়ীমার বিবাহ। আমাদের আনন্দের সীমা নাই—আমাদের খেলার পুতুল নয়ীমা এখন আমাদের বড় ভাবীজান হইবে! আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাগিনী আবেদার ভারি রাগ, সে কিছুতেই নয়ীমার পা ছুঁইয়া সালাম করিবে না, কারণ নয়ীমা তাহার অপেক্ষা দুই-বৎসরের ছোট। সকলে আবেদাকে ঐ কথা লইয়া খেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিল! একদিকে ভাইজানও যারপরনাই বিরক্ত—ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়াছেন। তিনি বিলাত ফেরা, বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী—তিনি কি একটা দশবৎসরের বালিকা বিবাহ করিয়া-দেশ হাসাইবেন? তিনি বঙ্গের সভ্যসমাজে কিরূপে মুখ দেখাইবেন? তিনি আমাকেই সব দোষ দেন যে, 'জোবেদাই সব নষ্টের গোড়া! আমি সেদিন তাচ্ছিল্যভাবে কী একটা কথা বলেছি, তাই ও গিয়ে মাকে লাগিয়েছে। তারপর এই মহাবিভ্রাট!'

ভাইজান রাগ করুন, আর যাহাই করুন, তাঁহার একটা মস্তগুণ এই যে, তিনি পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়স্বজনের কথার অবাধ্য ছিলেন না। মাতার দুটি মিষ্টিকথা, পিতার উপদেশ তাঁহাকে সহজেই সম্মত করিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে তিনি বড় যত্নে মানুষ করিয়াছেন, তাহাকে পরের ঘরে যাইতে দিবেন না, ইত্যাদি। ভাইজান আর উচ্চবাক্য করিলেন না। নিরীহ সুবোধ বালকটির মতো বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমাদের দূরসম্পর্কীয়া এক ভাবীসাহেবা ভাইজানকে শুনাইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কী লো, বিলাতফেরা সাহেবকে মেহদি উবটন লাগান হবে না?'

ভাইজান রুদ্ধক্রোধে বলিলেন, 'যা আপনার মরজি! আমি উবটন বা তার চেয়ে জঘন্য কিছু মাখলে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, তবে আমার আপত্তি নাই। আমি তো নীরবে মাথা পেতে দিয়েছি—যত ইচ্ছা অত্যাচার করুন।'

আমি তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে মেহদি বাটিয়া আনিয়া তাঁহার দুইহাত ভরিয়া লাগাইয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল না ভাইয়ের হাতে অধিকক্ষণ মেহদি রাখা, কিন্তু আমি কার্যান্তরে

...য়া সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বোধ হয় ভাইজান তখনো হাত দুইটি ইজিচেয়ারের দুইবাহুতে রাখিয়া উদাসীনভাবে বসিয়া আছেন। আমি তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাঁহার হাত ধুইতে বসিলাম। লাল টকটকে হাত দেখিয়া ভাইজান তো রাগিয়া অস্থির। তিনি অনেক বিদ্যালাভ করিয়াছেন, এবং উদ্ভিদতত্ত্ব (Botany) পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মেহদির মাহাত্ম্য জানিতেন না। তিনি আমার হাত হইতে সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তখনই স্বীয় স্নানাগারে গিয়া অনেকটা সাবান ও স্পঞ্জের সদ্ব্যবহার করিলেন। কিন্তু মেহেদি তো নাছোড়বান্দা!

৪

.... নগরের জানানা হাসপাতালে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা দুইমাস হইতে আছেন। তাঁহার ছয়মাসের শিশুপুত্র জাফরও সঙ্গে আছে। এখানে তাঁহার আদরযত্নের সীমা নাই। হাসপাতালের বড় ছোট লেডি ডাক্তার ও সেবিকাগণ পালাক্রমে সর্বদা তাঁহার সেবায় নিযুক্তা থাকে। এক-কথায়, তিনি এখানে রাজভোগে আছেন। তাঁহার স্বামী ও দেবর প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা জমিলাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শ্বশ্রূ মহোদয়াও সময় সময় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। রোগিণি আমার ভ্রাতৃবধূ নয়ীমা।

আমার মাতা নয়ীমাকে হাসপাতালে পাঠাইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু ক্রমেই যখন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন অগত্যা ভাইজান মাকে বলিলেন, 'মা! আমি এ পর্যন্ত কদাচ তোমার কথার অবাধ্য হই নাই; এখন একজনের জীবনমরণ হাসপাতালের চিকিৎসার উপর নির্ভর করিতেছে, এ সময় বাধা দিও না। আজ তোমার কথা রাখিতে পারিব না।' ভাইজান এই একদিন মাতৃউপদেশ লঙ্ঘন করার জন্য যাজীবন অনুতাপ করিয়াছেন।

অপরপক্ষে কতিপয় মিশনারি রমণী গল্প ও হাস্যপরিহাস করিতেছেন। একজন বলিলেন, 'এইবার দেখিব। পোড়া সমালোচকেরা আর বলিতে পারিবে না যে, আমরা কেবল দুর্ভিক্ষপীড়িত অন্নক্লিষ্ট পথের কাঙ্গাল ধরিয়া কনভার্ট করি!'

দ্বিতীয় রমণী। এমন শিকার পাইলে কলিকাতার বিশপ বাহাদুরও কৃতার্থ হইতেন!

তৃতীয়া! ইশ! ভারি তো তোমাদের বাহাদুরি—একটা ১৯ বৎসরের বালিকা (হোক না সে দুই ছেলের মা, আমি তাকে বালিকাই বলি) ভুলাইয়া খ্রিস্টান করা কোন্ বড় শক্তকথা!

১মা। শক্তকথা না হউক, কিন্তু ... কাঁপিয়া উঠিবে—এমনকি সমুদয় বঙ্গদেশ তোলপাড় হইবে। একজন কালেক্টরের স্ত্রীকে হাত করা কি সহজ ব্যাপার?

২য়া। সন্ধ্যা হইল, এখন চল নয়ীমা বিবির কামরায় আজ আমি ভজন গাহিব। তিনি আরো একমাস হাসপাতালে থাকিবেন। সুতরাং আমাদের যথেষ্ট সময় আছে।

দুই-চারিজন মিশনারি-ললনা সর্বদা নয়ীমার নিকট আসাযাওয়া করিতেন। রোগী সেবা এবং রোগীর সেবাই তাহাদের পরম ধর্ম। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ অমায়িক ভালোবাসায় নয়ীমা মোহিত হইয়াছেন। তাহারা সন্ধ্যার সময় ভজন গাহিয়া যিশুর কৃপার মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে অনন্ত নরক হইতে রক্ষা পাইবার পথপ্রদর্শন করিতেন। নয়ীমা নিজের ধর্ম সম্বন্ধীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস কিছুই জানেন না—

তাহার নির্মল অন্তরে যিশুমহিমার গভীর রেখা অঙ্কিত হইল। তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর কলুষিত হইতে আরম্ভ করিল। সে কখনও আলোক দেখে নাই, তাহার নিকট জোনাকির আলোই সর্বশ্রেষ্ঠ বোধহয়। পল্লীর দশাও সেইরূপ।

৫

তিনমাস পরে নয়ীমা—না, আমার ভাবীজান হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু এখন তাঁহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি আর সে প্রিয়ভাষিণী মধুরহাসিনী নয়ীমা নহেন। তিনি কাহারও সহিত ভালোমুখে কথা কহেন না। ইহাতে সকলেই ভাবিলেন যে, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়া তাঁহার মেজাজ খিটখিটে হইয়াছে। ভাইজান তাঁহাকে মাতার সহিত দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, পল্লিগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে নয়ীমার চিত্ত স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি হাসপাতালের সঙ্গিনীদের অদ্যাপি ভুলিতে পারেন নাই; জঙ্গলা বাতাস আর তাহার ভালো লাগে না।

নয়ীমা একদিন শাশুড়ির নিকট কৈফিয়ত তলব করিলেন যে, তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় নাই কেন? তাঁহাদের কিসের অভাব ছিল, কী বাধা ছিল? তিনি অবাক হইয়া বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। পরে সহাস্যে বলিলেন, 'পাগলের মেয়ে বলে কী?'

নয়ীমা। বলি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! আমাকে একটা আস্ত জানোয়ার করে রেখেছেন। একঅক্ষর পড়ালেখা শিখান নাই যে, আজ ভদ্রসমাজে বসবার উপযুক্ত হতেম। উনি আমায় লেখাপড়া শেখাতে বললেন, আপনি তা শুনে সাত তাড়াতাড়ি আমায় বিয়ে দিয়ে পাশে বাঁধলেন।

মা। তুমি তো বাছা এমন মুখরা ছিলে না। এ-সব কথা তুমি কোথায় শিখলে? তোমায় তিনবছর বয়স থেকে মানুষ করলুম। এত যত্নের ধন তুমি—তোমাকে পরের হাতে না দিয়ে নিজের ঘরে রেখেছি। তারই নাম কি বেঁধে ফেলা?

ন। মূর্খ লোকেরা শিক্ষার মর্ম কী বুঝবে? তাই আপনারা সেটা আবশ্যক বোধ করেননি। বুঝেছিলেন কেবল বিয়ে।

মা। বাছা! এখন নিজের মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে, এলে বিয়ে (এল.এ., বি.এ.) পাস করিয়ে কেমন মেমসাহেব সাজাও দেখব! আমি পড়ালেখা শেখা মন্দ বলছি না; কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ে থেকে সুবিধা করতে পারিনি। মেয়েদের জন্য স্কুল নেই, মক্তব নেই, পাঠশালা নেই। ঘরে পড়াবার জন্যও ভালো শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যায় না। এখন তোমরা শহরে বেড়িয়ে যদি পড়ালেখার সুবিধা করতে পার, ভালো।

তাহাই হইল। দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত না-থাকায়—আর যদিও বা মরুভূমে ওয়েসিসের ন্যায় দুই-একটি উপযুক্ত মুসলমান বালিকা বিদ্যালয় আছে, তাহাতে তো 'শরিফগণ' কন্যা পাঠাইবেন না। বিশেষত মফস্বলবাসীগণ কী করিবেন? সুতরাং জমিলার জন্য পালাক্রমে কতকগুলি মিশনারি রমণী নিযুক্তা হইলেন। তাঁহারা নিজের নিয়ম অনুসারে প্রথমে বাইবেল হইতে গল্প বলিয়া পরে অন্যকাজ আরম্ভ করিতেন।

ইহাতেও ভালো সুবিধা হইল না। শেষে একজন ইউরোপিয়ান গবর্নেস নিযুক্তা

[illegible]। তিনি ধীরে ধীরে স্বীয়প্রভাব বিস্তার করিয়া একাধারে আমার [illegible] [illegible] (Companio), জমিলার শিক্ষয়িত্রী এবং এ-সংসারের গৃহিণী হইলেন। [illegible] মিস লরেন্স এ বাড়িতে সর্বেসর্বা। তিনি মিষ্টকথায় বাড়িসুদ্ধ সকলকে একরূপ ভুলাইয়া রাখিয়াছেন।

* * *

৬

বড় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। অদ্য ... নগরের আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য।... পরগণায় যত লোক ছিল—তাহারা প্রায় সকলেই উপস্থিত। ব্যাপার কী? ব্যাপার?—জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. জামাল আহমদের স্ত্রী মোসাম্মত নয়ীমা খাতুন প্রায় ২৫,০০০.০০ টাকার অলঙ্কার এবং নগদ ১৭,০০০.০০ টাকা লইয়া লালকুঠি মিশনহাউসে পলাইয়া গিয়াছেন। একমাস যাবৎ এই জটিল মোকদ্দমা চলিতেছে। উভয়পক্ষেই বড় বড় ব্যারিস্টার নিযুক্ত আছেন। নয়ীমা পালকি করিয়া এজলাশে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য বিচারকের রায় প্রকাশ হইবে।

সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ উপস্থিত হইয়াছেন, এমন লোমহর্ষক সংবাদ প্রকাশ করিলে তাঁহাদের পত্রিকা অতিশয় লোকরঞ্জন হইবে।

একদল লোক আসিয়াছে তামাশা দেখিয়া হাততালি দিতে। কেহ আসিয়াছে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করিতে। কেহ এই অবসরে খানিকটা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বক্তৃতা ঝাড়িয়া লইবেন। কেহ স্ত্রীশিক্ষার কুৎসা গাহিলেন। কেহ কাটাঘায়ে লবণের ছিটা দিয়া বিলাতফেরা মি. জামাল আহমদকে, তাঁহার কন্যা সুশিক্ষা—উচ্চশিক্ষার চরমে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মোবারকবাদ দিলেন।

কেহ বাস্তবিক দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছেন। কেহ সান্ত্বনা দিতেও আসিয়াছেন।

কেহ কেহ আপনচিন্তায় শঙ্কিত হইয়াছেন যে, এরকম হইলে তো ঘরে বউ-ঝি রক্ষা করা দায়! আজ এতবড় কালেক্টর সাহেবের বিবি মিশনারিদের কথায় ঘরের বাহির হইলেন, তবে আমাদের তো কথাই নাই।

নয়ীমা নিজমুখে বলিলেন যে, তিনি স্ব-ইচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহত্যাগ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁহার শাশুড়ি ও স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু গৃহে যথাবিধি দীক্ষিতা হইবার সুবিধা ছিল না বলিয়া মিশনহাউসে আসিয়াছেন। তিনি কেবল ধর্মের জন্য—একমাত্র যিশুর জন্য—স্বামী, কন্যা, পুত্র, গৃহ—এক-কথায় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিচারক একরূপ রফা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, এখন তো দীক্ষাগ্রহণ করা হইয়াছে তবে আপনি বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু মিস লরেন্স সাধারণত অন্তঃপুরের দুর্দশা এবং বিশেষত নয়ীমার অন্তঃপুরের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া দীর্ঘবক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিলেন। তিনি দশবৎসর যাবৎ বিহার ও কলিকাতার বিভিন্ন অন্তঃপুরে যাতায়াত করিয়া অন্তঃপুর রহস্য সবিশেষ অবগত হইয়াছেন।

শেষ নিষ্পত্তি এই হইল যে, টাকা ও অলঙ্কার যাহা নয়ীমা সঙ্গে আনিয়াছেন তাঁহারই থাকিবে; আর পুত্র ও কন্যা পিতার নিকট থাকিবে। নয়ীমা পুত্রলাভের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই।

৭

নয়ীমা এখন লালকুঠিতে মিশনারি রমণীদের সঙ্গে আছেন। তাঁহার আদরযত্নের ত্রুটি নাই। মাথায় রাখিলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখিলে পিঁপড়ায় খায়—এ হেন আমেদ মেম সাহেবকে তাহারা রাখিবে কোথায়? উনিশবৎসরের বালিকার এই ধর্মানুরাগ, এ মহান আত্মত্যাগ, কি কম প্রশংসার বিষয়? ইনি মিশনহাউসে আদর্শরমণী। সকলের মাথার মুকুট, কণ্ঠের মণি—এই আমেদ মেমসাহেবা! অত্যধিক প্রশংসা ও তোষামোদে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমেদ মেমসাহেবা এত পূজা পাইয়াও এমন বিমর্ষ কেন?

যিশুর জন্য যথাসর্বস্ব পরিত্যাগ ততক্ষণই সুখকর বোধ হইতেছিল, যতক্ষণ সোনার সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। ক্রমে যখন মোকদ্দমার গতি কুপথে চলিল, যখন স্বামী ও সন্তানদের সহিত ইহজীবনে দেখা হওয়ার আশার শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু নিবিয়া গেল, তখনই নয়ীমার প্রফুল্লতা তিরোহিত হইল। বিচারালয় হইতে বিজয়গর্বে ফিরিবার সময় হইতেই তিনি অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পালকি হইতে নামিয়াই মূর্ছিতা হইলেন; মিশনারি ভগিনীগণ 'ভারি গরম!' বলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। হাঁ, গরমই বটে, এ যে প্রাণ পোড়ার গরমী!

জ্ঞান হওয়া মাত্র নয়ীমা তওবা করিলেন; বারম্বার প্রাণ ভরিয়া কলেমা পড়িলেন; আল্লাহকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এ-সব বৃথা। গভীর রজনীতে মনে করিতেন, পলাইয়া যাই—যাই স্বামীর পা জড়াইয়া ধরি গিয়া। কিন্তু পথ যে চিনেন না। লালকুঠি হইতে কালেক্টর সাহেবের কুঠি কতদূর? কোন্‌দিকে? কে পথ বলিয়া দিবে? হায় হায়। কেউ না!

যতদিন ছলেবলে কৌশলে নয়ীমার সমস্ত অলঙ্কার ও টাকাগুলি হস্তগত না হইয়াছিল, ততদিন মিশনারি ভগিনীগণ তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহারা সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছেন। এখন 'আছে' বলিতে নয়ীমার হাতে দু-গাছি কাচের চুড়ি আর পরনে একখানা বিলাতি মোটা ধুতি। এখন তাহারা নয়ীমাকে পদব্রজে গির্জা যাইতে বলেন, নয়ীমা তাহাতে স্বীকৃত নহেন।

শেষে নয়ীমাকে একমুষ্ঠি অন্নদান করাও তাঁহাদের পক্ষে ভার বোধ হইতে লাগিল। এখানে সকলেই খাটিয়া খায়, বাড়ি বাড়ি পড়াইতে যায়, প্রচার করিতে যায়। কেবল নয়ীমা বসিয়া খাইবে কেন? শেষে তাঁহারা নয়ীমাকে হাসপাতালে নার্সাগিরি করিতে দিলেন। কিন্তু এই বঙ্গদেশে তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া নয়ীমাকে বহুদূরে, লক্ষ্ণৌ পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

নয়ীমা তাঁহার কোরানশরিফখানি সঙ্গে আনিয়াছিলেন—যে অকাট্য যুক্তি দ্বারা তাহার প্রত্যেকটি আয়েত খণ্ডন করিয়া জগৎকে দেখাইবেন মুসলমান ধর্ম কেমন অসার, অন্ধ বিশ্বাসীর ধর্ম!—তাঁহার সে-সব কল্পনা জাহান্নামে গিয়াছে। এখন সেই কোরানশরিফখানি তাঁহার একমাত্র দুঃখের সঙ্গী। সকলে শয়ন করিলে পর গভীর

নিশীথে উঠিয়া তিনি ওজু করিয়া অতিযত্নে কোরানশরিফ লইয়া বসেন। পাঠ করিতে করিতে দরদরিগলিত অশ্রুধারায় ভিজিয়া যায় বলিয়া প্রতিপত্রে শাদা প্রতিপত্র কাগজ রাখিয়াছেন। অনুতাপে দগ্ধ হইলে রোদনে এত শান্তি পাওয়া যায়, সুখের ক্রোড়ে পালিতা নয়ীমা এতদিন তাহা জানিতেন না।

স্বামীচিন্তা এখন নয়ীমার জীবনের সার হইয়াছে। পতি ধ্যান, পতি জপমালা হইয়াছে। এয়া আল্লাহ! আর একবার—মাত্র একটিবার অভাগিনীকে স্বামীর চরণে পৌঁছাইয়া দাও। তুমি সর্বশক্তিমান, সব করিতে পার!—পার না কেবল এইটুকু? এখনো তওবার দ্বার রুদ্ধ হয় নাই, নয়ীমার তওবা গ্রহণ কর, প্রভু গফুরর রহিম।

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে আসিয়া নয়ীমা নার্স নেলি হইয়াছেন। দিবাভাগে রোগীসেবা করিতে হয়, নামাজ ও কোরানশরিফ পাঠের সুবিধা হয় না। সঙ্গে থাকে কেবল নিরবার অশ্রুধারা। প্রথম প্রথম অন্যান্য নার্স, এমনকি লেডি ডাক্তারেরাও তাঁহাকে নানাপ্রকার আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহার দ্বীন দুনিয়া-ইহকাল পরকাল—দুই-ই রসাতলে গিয়াছে, যে-স্বয়ং সার্বভৌম সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য মেথরানি সাজিয়াছে, যে স্বহস্তে সোনার নীড়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, তাহার সান্ত্বনা কোথায়? অতঃপর আর কেহ নেলিকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করে নাই।

এইরূপে সুদীর্ঘ সাতবৎসর অতীত হইয়াছে। এই সাতবৎসরের সাত বারো চৌরাশি মাসের দুইহাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন দিবসের একটি দিনও নেলির বিনাক্রন্দনে অতিবাহিত হয় নাই। তিনি কোনোমতে স্বীয় অস্থিচর্মসার দেহখানিকে বহন করিয়া জীবনের দিন গণনা করিতেন। রজনীর প্রতীক্ষায় কোনোরূপে দিবা অতিক্রম করিতেন। রাত্রিকালে নামাজ ও কোরানশরিফ পাঠের সুবিধা হইবে, তাহাই যাহা কিছু সান্ত্বনা। কিন্তু যে-দিন রাত্রির কাজ (night duty) থাকিত, সেদিন নেলির ভাগ্যে নামাজের মুখটুকুও ঘটিত না। সোবহান আল্লাহ! রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়ায়—অশ্রুপ্লাবনে সেজদার স্থান ভিজাইয়া দেওয়ায় এত শান্তি লাভ হয়!

নেলির ঐরূপ কঙ্কালসার দেহখানি দেখিয়া প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারি নাই। সে যখন বলিল, 'বুবুজান! আমাকে চিনিতে পারেন নাই?' তখন আর কোনো সংশয় রহিল না, আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। আমি তাই মেজেতে বসিয়া পড়িলাম। যে আমার মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই পিতৃব্যজাতা ভগিনীকে চিনিব না? তাই তো! কোরানশরিফ পাঠ করিতে পারে, এমন বাঙালি খ্রিস্টান ভূ-ভারতে কয়টা আছে? কিন্তু হায়! নন্দন কাননের পারিজাত নয়ীমাকে কীট নেলিরূপে কে দেখিতে চাহিয়াছিল? যে নয়ীমা শৈশবে পাঁচজন দাসীসহ আমাদের বাড়ি আসিয়াছিল, সে আজ পরের সেবাদাসী!

'হায় রে নিয়তি! তুমি কত খেলা খেল,
সুখের শিখরে নিয়া দুঃখ-কূপে ফেল!'

৮

নেলির ইতিহাস শ্রবণকালে আমি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই। বারম্বার মনকে বলিতেছিলাম যে, নয়ীমা স্বকৃত পাপের ফল ভোগ করিতেছে—ইহা তো তাহার ন্যায্যপ্রাপ্য, তাহাতে আমার দুঃখিত হইবার কারণ কী? কিন্তু নেলির আত্মগ্লানিপূর্ণ

মর্মন্তুদ ভাষায় পাষাণ শতধা হইত, মানুষ কোন ছার?
নেলি আত্মকাহিনী সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিরামের পর তাঁহার স্বামী ও পুত্রকন্যার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অতি সংক্ষেপে যথাসম্ভব সংযত ভাষায় সমস্ত বলিলাম। বলিলাম—'যেদিন ভাইজান মোকদ্দমা হারিয়া বিচারালয় হইতে অধোবদনে গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন, তখনই 'হায়-নয়ীমা!' বলিয়া মাতা শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণাব্যঞ্জক হা-হুতাশ ও দীর্ঘনিশ্বাসের বুলি ছিল, 'হায় নয়ীমা! ভাইজান পুরুষমানুষ, কোনোপ্রকার বাহ্যিক কাতরতা প্রকাশ করিতেন না; তিনি কেশরীয় ন্যায় নীরবে সে অপমান, লজ্জা, ক্রোধ, খেদ রুদ্ধ নিশ্বাসে সহ্য করিতে লাগিলেন।

মাস দুই পরে মা দেহত্যাগ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই অভাগিনী জমিলা জ্বর হইল। পিতার গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সে তাঁহার নিকট যাইতে সাহস করিত না, তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন 'দাদিআম্মা'। তাঁহাকে হারাইয়া মাতৃহীনা বালিকা একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িল।

জ্বরের বিকারে 'মা' 'মা' বলিয়া প্রলাপ বকিত। কাঁদিয়া বলিত, 'মা তুই আমার হাসপাতালে গেলি কেন? আয় ফিরে আয়। জাফর তোর জন্য বড় কাঁদে, আয়! দাদি আম্মাও নাই!' জমিলা অধিক দিন কষ্ট পায় নাই, মৃত্যু তাহাকে শান্তিক্রোড়ে স্থান করিয়াছে।

পক্ষকাল মধ্যে মাতা ও কন্যাকে হারাইয়া ভাইজান শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সহ্যগুণেরও সীমা আছে। বেচারা জাফরেরও কান্না বাড়িয়া গেল। ভাইজান তাহাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখিতেন কিন্তু মাত্র একবৎসরের শিশু মাতৃহারা হইয়া আর কতদিন সুস্থ থাকিবে? একমাসের মধ্যে সেও ইহধাম ত্যাগ করিল।
ভাইজান অদ্যাবধি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার সোনার সংসার সত্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তাঁহার 'আছে' বলিতে একমাত্র ভগিনী আমিই আছি।' 'নয়ীমা! একবার মানসচক্ষে তোমার নিজহাতে গড়া ঐ গোরস্থানের প্রতি—তোমার শ্মশানবাসী স্বামীর প্রতি চাহিয়া দেখ তো!' আমার মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে মূর্ছিতা নয়ীমা ভূপতিত হইল।

আমি নেলির চোখেমুখে একটু জলের ছিটা দিব মনে করিতেছি, এমন সময় দুলামিঞা আমার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠা কন্যা সিদ্দিকা দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে আর আমি নেলিকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইলাম না! সিদ্দিকা আমার হাত ধরিয়া তাহার মাতার নিকট লইয়া গেল।

৯

খোদার ফজলে খুকি আরোগ্যলাভ করিলে পর আমরা দেশে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে পশ্চিমের আরো কয়েকটি নগর, বিশেষত দিল্লি, আগ্রা ও লাহোর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। লাহোরে আনারকলির সমাধিমন্দির দর্শনে একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবরের প্রভূত ক্ষমতা, অন্যদিকে যুবরাজ সেলিমের অনাবিল প্রেম—এ চিত্র যেন মানসনয়নে প্রত্যক্ষ করিলাম।*

* যুবরাজ সেলিমের প্রণয়িনী আনারকলি সম্রাট আকবরের আদেশে জীবন্ত সমাহিতা হইয়াছেন।

আগ্রায় তাজমহল দেখিয়া আরো একটি কথা মনে উদয় হইল। নারীদ্বেষী পুরুষগণ
[illegible]কার বিরুদ্ধে যতই দীর্ঘ বক্তৃতা ঝাড়ন-না কেন, সত্যের জয় অনিবার্য। শিক্ষা—
[illegible]লোক পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদান করে বলিয়া কি
[illegible]নো গৃহস্থ অগ্নি বর্জন করিতে পারে?

তাজমহল সৌধটি জগদ্বিখ্যাত; পৃথিবীর সপ্তআশ্চর্য বস্তুর অন্যতম আশ্চর্য।
[illegible]জমহলের নাম না-জানে এমন লোক ধরাতলে অতি অল্প। কিন্তু ভুবনবিখ্যাত
[illegible]জমহলের অভ্যন্তরে যিনি সমাহিতা আছেন, সে মমতামহলকে কয়জনে চিনে? ঐ
[illegible]মন নয়নরঞ্জন মর্মর প্রস্তর নির্মিত অনিন্দ্যসুন্দর তাজমহলও তৎগর্ভস্থা মহিষীকে
[illegible]স্মরণীয়া করিতে পারে নাই। আর নূরজাহাঁ বেগম? তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য
[illegible]মাত্র আয়োজন করা হয় নাই। তাঁহার নগণ্য সামান্য সমাধিমন্দির লাহোরের
[illegible]র্ত এক ক্ষুদ্র অজ্ঞাত স্থান শাহতারায় বনাবৃত অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।
[illegible]কে সে কবরস্থানের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে না। কিন্তু নূরজাহাঁ বেগম চিরস্মরণীয়া
[illegible]য়া আছেন। সে কী বস্তু, যাহা নূরজাহাঁকে অমর করিয়াছে? ঐ শিক্ষা। সুশিক্ষার
[illegible]প্রসাদে জগজ্জ্যোতি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। খোদা না-খাস্তা, ভূমিকম্পে কিম্বা কোনো
[illegible]শত্রুর কামানে তাজমহল ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু নূরজাহাঁ বেগমের স্মৃতির
[illegible]নাই!

যাক, আমার ধান ভানিতে শিবের গানে প্রয়োজন নাই। গৃহ প্রত্যাগমন করিয়াও
[illegible]মি নেলির সনির্বন্ধ অনুরোধ ভুলিতে পারি নাই। তিনি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া
[illegible]য়া বলিয়াছিলেন, ভাইজানকে অনুরোধ করিয়া যেন আমি তাঁহাকে বাড়ি আনাই।
[illegible]ন এখন পতিগৃহে সামান্যা চাকরানি কিম্বা অধমতমা মেথরানিরূপে জীবনের
[illegible]শিষ্ট সময় যাপন করিতে চাহেন। অত্যধিক রোদনে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছে,
[illegible]গিনী আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

পূজার ছুটিতে আমি পিতৃগৃহে—না, এখন তো পিতা নাই—সুতরাং ভ্রাতৃগৃহে
[illegible]লাম। একদিন ভাইজানকে একটু প্রফুল্ল দেখিয়া সেই সুযোগে তাঁহার পায়ের নিকট
[illegible]য়া—ধীরে ধীরে বলিলাম, 'ভাইজান! তোমার পা টিপে দি?' তিনি প্রসন্নবদনে
[illegible]লিলেন, 'আচ্ছা। কিছু মতলব আছে নাকি?'

আবার সেই সুখের শৈশব মনে পড়িল। বাক্যকালে ভাইজানের অনুগ্রহ লাভ
[illegible]তে হইলে, তাঁহার পায়ের তলা টিপিয়া দিতাম, পায়ের আঙুল ধরিয়া টানিতাম।
[illegible]আজও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু মতলব আছে নাকি? আমি বহুকষ্টে
[illegible]সহজ ও সরল ভাষায় আমার মতলব প্রকাশ করিলাম। নয়ীমার প্রাণপোড়া
[illegible]কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলাম, 'অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া প্রতিপ্রাণা নয়ীমা এখন
[illegible]দগ্ধ বর্ণের ন্যায় পবিত্রা হইয়াছেন।'

সমস্তটা শ্রবণান্তে ভাইজান বলিলেন : 'তাহা হইলে নয়ীমাকে দেখিবার আশা
[illegible]তে পারি? তাহাকে জীবনে আর একটিবার দেখিব বলিয়া আমিও এখন পর্যন্ত মরি
[illegible]। আমার সব মনে আছে—এ দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসরে কিছুই ভুলি নাই। মনে
[illegible]—যেদিন 'হায় নয়ীমা' বলিয়া জননী শয্যাগ্রহণ করিয়া আর ওঠেন নাই। মনে
[illegible], জমিলা আমার বুকে মুখ লুকাইয়া তাহার মাতার জন্য কাঁদিত। আমার সম্মুখে
[illegible]নাম উল্লেখ করিতে সাহস পাইত না—দুঃখিনী বালিকা অব্যক্ত যন্ত্রণায় এটাওটা
[illegible]তা ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিত। শেষে আমারই কোলে তাহার মাতা সম্বন্ধে প্রলাপ

বকিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে! আরো মনে আছে—জাফর, আমার অন্ধের যষ্টি ও
আমার জীবনের শেষ অবলম্বন জাফর, যেদিন আমার বুকে মাথা রাখিয়া
অভিভূত হইয়াছে! আমার বক্ষ না হইলে সে ঘুমাইত না—শেষনিদ্রার সময়
আমারই বুকে লুটাইয়া পড়ে!'

* * *

'এতখানি লাঞ্ছনার পরেও যে বেহায়া জীবনযাপন করিতেছি, তাহা কেবল নয়ীমাকে
একবার দেখিব বলিয়া। চাকুরি ছাড়িলে কর্মহীন জীবনে স্মৃতি আমাকে পাইয়া বসিত
অচিরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় হয়তো এতদিন মরিয়া যাইতাম। যেদিন জাফর প্রাণত্যাগ
করিল, সেইদিন এই পিস্তলে গুলি পুরিয়াছিলাম, আত্মহত্যা করিব বলিয়া—'

ভাইজান বুকের পকেট হইতে একটি ছয়নলী পিস্তল বাহির করিয়া আমার সম্মুখে
ধরিলেন। তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন :

'কিন্তু আত্মহত্যা করি নাই। এই-যে স্মৃতির বৃশ্চিকদংশন সহ্য করিয়া, এত লাঞ্ছনা গঞ্জনা
সহিয়া বাঁচিয়া আছি—কেবল জীবনে আর-একবার নয়ীমাকে দেখিবার আশায়—'

আমি কিঞ্চিৎ উৎসাহে ও আশায় ভাইজানের মুখের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম
বুঝি অভাগিনী নেলির কপাল ফিরিল—বুঝি সে আবার স্বামীপদে আশ্রয় লাভ করিবে।
কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি হতাশ হইলাম। তাঁহার মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর;
হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। দৃঢ়মুষ্টিতে পিস্তলটি ধরিয়া বলিলেন
'কোনোরূপ নয়ীমাকে একবার আমার সম্মুখে আনিতে পার? তাহা হইলে তাহার
আমার জীবনে শেষ দেনাপাওনা শোধ করিয়া লইব। আমার জীবনের এই
আকাঙ্ক্ষা, জোবেদা! আর কিছু চাহি না। নয়ীমাকে—না, হাঁ, কী বলিলে, সে
'নেলি' হইয়াছে?--বেশ, তবে সেই নেলিকে এই পিস্তলে গুলি করিয়া হত্যা করি
একটি একটি করিয়া এই ছয় গুলি ছুড়িয়া নেলিকে হত্যা করিয়া আমি ফাঁসিকা
ঝুলিব। কিন্তু না, ওহ্ ! তাহা তো হইবে না! নয়ীমা যে তওবা করিয়া পুনঃ
মুসলমান হইয়াছে; তবে তো সে অবধ্যা। মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করি
নাই।' এই বলিয়া তিনি পিস্তলটি ভূতলে রাখিলেন।

ঠিক এই সময় তাঁহার বালকভৃত্য একটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাম আনিয়া দি
ভাইজান পাঠ করিলেন :

লক্ষ্ণৌ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছেন: 'কবর প্রস্তুত রাখো, নার্স নে
শবদেহ প্রেরিত হইল।'

শিশু-পালন*

...স্থিত ভদ্রমহিলাগণ!

...র উপর নিত্য যে মহামারী, বিশেষত শিশুহত্যা দেখতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে দুচার ...বলা আবশ্যক মনে করি। ভাববার বিষয়, গতবৎসর কেবল বাংলাদেশে ষোল লক্ষ ...শ হাজার একশত এগারজন লোক মারা গেছে—তার মধ্যে দশ বছরের কম ...র ছেলেমেয়ে ছয়লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশ' পঞ্চান্নজন ছিল। ঐ সোয়া ছয় লক্ষ ...র মধ্যে এক বছরের কম বয়সের শিশু দুইলক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশ সত্তর জন ...ফল কথা, সাড়ে ষোললক্ষ লোকের তিনভাগের একভাগ ছেলেমেয়ে ছিল। ...মেয়েই তো ভবিষ্যৎ—তারা যদি এমন হু হু করে মরে যাবে, তবে আমাদের আর ...কী? আর সব জায়গার বিষয় ছেড়ে শুধু কলিকাতায় দেখছি, গত বৎসর ৬০০০ ...দৈনিক ১৬ জন করে আঁতুড়ে শিশু মারা গেছে। যদি যত্ন করা যেত, তাহলে রোজ ...জন করে ছেলে বাঁচানো যেতে পারত। ২৫ বৎসর আগে এই শহরে যত ছেলে জন্মাত, ...শতকরা ৫০ জন শিশু একবৎসরের মধ্যেই মারা যেত। ১৮৯৫ সনে শতকরা ৪৮ ...ছেলে মরেছে। তারপর শহরের জলবায়ুর কিছু উন্নতি হয়ে ১৯০০ সনে শতকরা ৪৪ ...করে মরেছে। আর গত বছর শতকরা ৩০/৪০ জন করে মরেছে। তার মধ্যে রোজ ...জন করে শিশু কেবল মা ও ধাইয়ের অযত্নে বলি দেওয়া হয়েছে। অযত্নে ছেলে মারা ...ছে, এর অর্থ এই যে, পোয়াতিরা ঠিকমতো যত্ন করতে জানে না। কারণ যাই হউক, ...শিশুহত্যা তো সহজ নয়, এর প্রতিকার করতে হবে।

...আমাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাচ্ছে যে, পুরাকালে আমাদের অতিবৃদ্ধা ...মা, দিদিমারা যা করেছেন, সে-সব ব্যবস্থা মন্দ ছিল—তার কিছুই ভালো নয়। ...জন্য তার উল্টো করতে হবে। একটু পরিষ্কার করে বলি, ধরুন, যেমন দিদিমার ...হিন্দু পোয়াতিকে ৯ দিন থেকে ২১ দিন আর মুসলমান পোয়াতিকে ৪০ দিন ...ঘরে বন্ধ থাকতে হত, এখন তার উল্টো করতে গিয়ে দুইদিনের পোয়াতি ...) মোটরগাড়িতে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোবে বা সংসারের কাজকর্মে ...দিবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বোকা ছিলেন না; তাঁরা যা ব্যবস্থা করেছিলেন, ...নিখুঁৎ ছিল, তাই তাঁরা নির্বিবাদে ৯০/৯৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে গেছেন।। ...তো আমাদের 'বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশ!' দশ বছর বয়সে চশমা ...হয়। মাঝখান থেকে আমরা সেই নিয়মের বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে হিতে ...করে ফেলেছি! আবার সুশিক্ষিতা ভগিনীগণ! আপনারা পুরাকালের, বিশেষত ...নিয়মের সঙ্গে এখনকার ডাক্তারি ব্যবস্থার তুলনা করে দেখবেন।* এই

...৬ এপ্রিল ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা টাউনহলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে পঠিত হয়। ...সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি অতি সহজ ও সরলভাষায় লিখিতে বাধ্য ...হইলাম।

দেখুন না, আমাদের ব্যবস্থা বলে :

১. প্রসূতিকে যথাসম্ভব নির্জন ঘরে রাখবে।
২. ঘরের দরজার কাছে কাঠ কয়লার আগুন রাখবে।
৩. বাহিরের যে-লোক ঘরে আসবে সে হাত পা ও কাপড় আগুনে গরম করে আসবে।
৪. মুসলমানি মতে ৪০ দিন আর হিন্দু মতে ২১ দিন পর্যন্ত পোয়াতি শুয়ে বসে থাকবে, বেশি নড়াচড়া করবে না।
৫. আঁতুড় ঘরে অতিরিক্ত বাহুল্য জিনিস ('অশুচ' হওয়ার ভয়েই বলুন, আর যে জন্যই বলুন) রাখবে না।

আর আধুনিক ডাক্তার কী বলেন? তিনি বলেন :

১. রোগীর কামরায় মানুষের ভিড় বা গোলমাল হওয়া উচিত নয়। (পোয়াতি তো রোগী বিশেষ?)
২. কয়লার আগুন পাবক, অর্থাৎ বাতাসকে পরিষ্কার করে। (তবে সে জিনিস পোয়াতির ঘরে থাকবে দোষ কী?)
৩. বাহিরের লোকের কাপড়চোপড়ে রোগের কীটাণু থাকা সম্ভব; আর আগুনের উত্তাপে রোগের জীবাণু মারা যায়।
৪. ছয়সপ্তাহ পর্যন্ত প্রসূতির পেটের ভিতরের অংশবিশেষ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং সে-সময় নড়াচড়া করা উচিত নয়। এমনকি বিছানা ছেড়ে উঠতে নাই। (ছয় সপ্তাহ অর্থে বিয়াল্লিশ দিন, তবে আমাদের মুসলমানীব্যবস্থা চল্লিশ দিন ঘরে থাকতে বলেও কী পাপ করলে?)
৫. রোগীর কামরায় অতিরিক্ত জিনিস, এমনকি বই, কাগজ ইত্যাদিও রাখা উচিত নয়। কারণ সেগুলো infected অর্থাৎ অশুচি হয়।

আমরা যদি এখন কাঠ কয়লার ধোঁয়া রাখি; ঘরটা গরম রাখতে হবে বলে সব দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে পাতকুয়া করে ফেলি; কিংবা ছাগলের ঘরে পোয়াতিকে রাখি, সে-দোষ কার—আমাদের না ব্যবস্থার?

আমাদের দেশের পোয়াতিদের প্রধান দোষ এই যে, তারা পরিষ্কার বাতাসের মূল্য বোঝে না। চারিদিকের দোরজানালা একেবারে বন্ধ করে রাখে। পাড়াগাঁয়ে দরজা

• কিছুদিন হইল ডাক্তার মিস বি. এম. বোস, এম. বি. মহোদয়া গ্রীয়ার পার্কে সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা দানকালে খাদ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'দেখ মেয়েরা! তোমরা এক তরকারি দিয়ে ভাত খাবে। সাত রকম তরকারি খেলে পেটে অসুখ হয়। মনে রেখো, এক সময়ে এক তরকারির বেশি খাবে না।' গত ১৩২৫ সালের শ্রাবণ মাসে 'আল এসলাম' পত্রিকার ১৯৮ পৃষ্ঠায় 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মোহাম্মদ (দ.)' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাই--'হজরত মোহাম্মদ (দ.) এত দূরদর্শী ছিলেন যে, তিনি বিশুদ্ধ ভোজন এবং অতি ভোজন দোষ দূর করিবার জন্য এক তরকারী দিয়া আহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আজ যদি মানবমণ্ডলী এক তরকারি দিয়া আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে উদরাময়, আমাশয়, ... (প্রভৃতি) বহু সংখ্যক ব্যাধি একবারে দূরীভূত হইয়া পৃথিবী স্বর্গে পরিণত করিতে পারে।'

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন : বেচারা গরিব মানুষেরা কেবল শাকভাত বা ডালভাত খায় বলে তাদের অসুখবিসুখ বড়লোকদের তুলনায় অনেক কম হয়। বড়লোকেরা নানা রকম চর্ব্যচোষ্য খেয়ে-খেয়ে ব্যাধির আধার হয়ে পড়েন।

কিংবা চেঁচাড়ির বেড়া দেওয়া খড়ের ঘরে অমন করে দোর বন্ধ করলে ভয় নাই, কারণ বেড়ার ফাঁক দিয়ে কোনোরকমে ঘরে বাতাস আসতে পারে। কিন্তু কলকাতার পাকা বাড়িতে কিংবা মাটির দেয়ালের ঘরে দোরজানালা বন্ধ করলে কিছুতেই বাইরের বাতাস আসতে পারে না। এক ঘরে অনেক বেশি লোকের শোয়া উচিত নয়; তাতে ঘরের বাতাস খারাপ হয়। শোবার ঘরে রোদের আলো যেন যেতে পারে। দিনের বেলা সব দরজা খুলে রাখা উচিত।

খাস কলকাতায় এত শিশু নষ্ট হওয়ার আর-একটি প্রধান কারণ এই যে, প্রসূতির যত্নের ভালো না-থাকায় শিশু মায়ের দুধ পায় না। গাইয়ের দুধ আর নানারকম গুঁড়ুমাটি খাইয়ে শিশুকে একরকম গলা টিপে মারা হয়। কেবল শিশুরক্ষার চেষ্টা করলে কোনো ফল হবে না—শিশুর মাদের স্বাস্থ্যেরও যত্ন করা দরকার। একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেছেন, মায়ের কতর্ব্য কী, তা না-জেনেশুনে কেউ যেন মা না হয়। মায়ের প্রধান কর্তব্য সন্তান পালন করা, এ-কথা অবশ্য কাউকে বলে দিতে হবে না, ইতর পশুপক্ষীও এ-কর্তব্য পালন করে থাকে। কিন্তু পশুতে ও মানুষে প্রভেদ আছে বলেই মানুষকে তার কর্তব্য ঠিক করে শিখে নিতে হয়। পশুরা তাদের কাজে ভুল করে না; আমরা মানুষ কি না, তাই আমাদের পদে পদে ভুল।

নোংরামির জন্যও অনেক আঁতুড়ে ছেলে মারা পড়ে। নাওয়া ঠিক মতো হয় না; সর্দি লাগবার ভয়ে নাওয়ানো হয় না। যে ছেলেরা মায়ের দুধ পায় না, তাদের জন্য যে দুধ বা ফুড তৈরি করা হয়, তার বাসনপাত্র ঠিকমতো পরিষ্কার থাকে না। একবার অনেকখানি দুধ তৈরি করে ফেলে, সেই ঠাণ্ডাদুধ তিন-চারবার খাওয়ানো হয়। এরকম আরও কত অত্যাচার হয়, তা আর কত বলব! 'সর্বঅঙ্গেই ব্যথা, ঔষধ দিবে কোথা!'

শিশুকে রোজ একবার নাওয়াতে হবে। জলটা একটু গরম, শিশুর বগলে হাত দিলে যেমন গরম লাগে কিংবা মায়ের কনুইতে যে গরম জল গা-সহ্য বোধহয়, ততটুকু গরম হলেই হবে। শীতকালে খোলা জায়গায় বা যেখানে ঝাপটা বাতাস লাগে, এমন জায়গায় নাওয়াবে না। নাওয়াবার আগে বেশ করে সর্ষের তেল মালিশ করে নেবে, কিন্তু এসময় দুধ খাওয়াবে না। কোনোরকম উগ্র সাবান ব্যবহার না করে বরং ডালের বেশন মাখলে চলে। স্নান শেষ হলে তাড়াতাড়ি গরম তোয়ালে কিংবা পরিষ্কার পুরনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেশ করে শিশুর গা মুছে দিতে হবে। শরীরের কোনো অংশ—যেমন কানের পীঠ, বগল, কুঁচকি যেন ভিজা না থাকে। নচেৎ ঐসব জায়গায় ঘা হবে।

নাওয়া শেষ হলে তাড়াতাড়ি শিশুকে কাপড় পরাবে। হালকা ফ্লানেল কিংবা সেইরকম কাপড় পরানো চাই। কাপড় খুব ঢিলেঢালা হওয়া চাই। উলেন টুপি আর মোজা কোনোকালে পরানো উচিত নয়। কাপড় খুব পরিষ্কার আর শুকনো চাই। কোনোরকম ভিজে, এমনকি ঘামে ভিজা কাপড়ও গায়ে রাখতে নাই।

তারপর শিশুর খাওয়া—এইটেই সবচেয়ে বড় কথা। একবছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ সবচেয়ে ভালো; তা যদি একান্তই না পাওয়া যায়, গাইয়ের দুধে অনেকটা জল মিশিয়ে মায়ের দুধের মতো পাতলা করে খাওয়াবে। এজন্য দুধ খাওয়া শিশি (feeding bottle) ব্যবহার করা প্রশস্ত। ঝিনুকে কিংবা চামচে দিয়ে দুধটা একেবারে গলায় ঢেলে দিলে শিশুর পক্ষে সেটা হজম করা কষ্টকর হয়। মাই কিংবা ফিডিং বোতলের

বোঁটা চুষে চুষে খেলে দুধের সঙ্গে শিশুর মুখের লালা কতক পরিমাণে পেটে ঐ লালায় এমন একটা গুণ আছে, যাতে দুধ কিংবা যে-কোনো খাদ্য সহজে হয়। ঐ রূপে জল মিশিয়ে ছাগলের কিংবা গাধার দুধও খাওয়ানো যেতে পারে এ-কথা মনে রাখা উচিত যে, মানুষের জন্য মানুষের দুধই সবচেয়ে ভালো সর্বদা মনে রাখবে যে, গাই কিংবা ছাগলের দুধে মানুষের দুধের চেয়ে মিষ্টি কম থাকে। তিনমাসের ছেলেকে দেড় ছটাক খাঁটি দুধ, আধ ছটাক ননী, দেড় ছটাক পানি আর-একটু মিছরি একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এরসঙ্গে একটু চুনেরপানি মিশিয়ে দিলে আরও ভালো হয়। তাহলে ছেলের পেট ফাঁপার ভয় থাকে না। যদি দেখা যায়, এতে শিশু ভালো থাকে না, অর্থাৎ মোটাতাজা হয় না, তবে ননীর ভাগ কম করে দুধ মিছরির ভাগ বাড়িয়ে দিবে। বিলাতি অর্থাৎ টিনের ঘনদুধ খাওয়াতে হলে, টাট্‌কা তৈরি করে খাওয়াতে হবে। একসঙ্গে অনেকখানি তৈরি করে, তাই সাতবার খাওয়াবে না। এ-দুধ এই নিয়মে তৈরি হয়;—আধছটাক দুধ, আধছটাক ননী, একপোয়া (কিংবা সাড়ে-চারছটাক) জল। এর চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেকে মেলিক্স ফুড দেওয়া যেতে পারে। এতেও দুধ এবং ননী মিশিয়ে দিতে হবে। এইরূপে এলেনবেরি ও বেঞ্জার সাহেবের তৈরি ফুড এবং হরলিক সাহেবের মলটেড মিল্ক দেওয়া যেতে পারে।* ক্রমে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াবে এবং দুধ যাতে বেশি খায়, সে দিকে নজর রাখবে। মনে রাখা দরকার, ছেলেকে কখনো ঠাণ্ডা দুধ বা ফুড খাওয়াতে নাই।

ঘুম—শিশুকে নাওয়াবার পরেই খাওয়াবে, তারপর তাকে ঘুম পাড়াবে। দুধ খাওয়া আঁতুড়ে ছেলের জন্য প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টা, দুই বছরের ছেলের জন্য ১৪ ঘণ্টা এবং চার বছরের ছেলের জন্য ১২ ঘণ্টা ঘুমের দরকার। শিশুর মুখে চুষনি দিয়ে রাখা অভ্যাস ভালো নয়। কেউ কেউ আবার ছেলেকে শান্ত রাখার জন্য আফিম খাওয়ায়, এ অভ্যাসও ভালো নয়। ছেলেদের দোলায় শোয়াবার অভ্যাস করতে নাই। দোলা দোলাতে গিয়ে মায়ের বৃথা সময় নষ্ট হয়, আবার শিশুরও শরীর মাটি হয়। ছেলের শোবার ঘরে যেন পরিষ্কার বাতাস খেলতে পারে। ঘরে বাতাস আসবে, কিন্তু ছেলের গায়ে যেন জোরে বাতাস না লাগে। ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগবার ভয় খুব বেশি। প্রায়ই দেখা যায়, শিশু ভিজা বিছানায় শুয়ে থাকে। বিশেষত ঘুমের সময় যদি ভিজা বিছানায় থাকে কিংবা ঠাণ্ডা বাতাস আদুল গায়ে লাগে, তবে বিপদের ভয়। ফ্লানেলের টুকরে দিয়ে ছেলেকে ঢেকে রাখবে। শোবার ঘরে কেরোসিনের আলো রাখতে নাই। এককোণে সর্ষের তেলের একটা প্রদীপ রাখবে।

যদি সম্ভব হয়, শিশুকে আলাদা বিছানায় শোয়ানো ভালো। তাহলে সে স্বাধীনভাবে নড়তে চড়তে পারবে। মায়ের সঙ্গে শুলে সে ততটা পরিষ্কার বাতাস পায় না, মায়ের

---

* শিশুকে হর্লিক্স মিল্ক ও বেনজারস ফুড প্রভৃতি কৃত্রিম দুগ্ধ খাওয়ানো সম্বন্ধে একটি উর্দু কবিতা মনে পড়ল, যথা :

'তিফিল মেঁ বু আয়ে কেয়া মা বাপ কে আতওয়ার কী?
দুধ তো ডিব্বে কা হায়, তালিম হায় সরকারি কী!!'

অর্থাৎ বেচারা শিশু পিতামাতার স্বভাবের গন্ধ লাভ করিবে কোথায় হইতে? সে তো টিনের ডিবের কৃত্রিম দুধ খায়, আর শিক্ষা লাভ করে গবর্নমেন্টের! সত্যই তো মাতৃস্তন্য পান না করিলে শিশু মাতার স্বভাবের প্রভাব লাভ করিবে কেমন করিয়া?

স্তনদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
স্তনাও সন্তানে স্তনাও তখনি—'

ইত্যাদি চিরসত্য কথাও মিথ্যা হইয়া যায়।

নিঃশ্বাসের বাতাসে তার অনিষ্ট হয়। মশামাছির উপদ্রব থেকে শিশুকে রক্ষা করবার জন্য মশারী খুব দরকার। ঘরের মেজেতে বা কোনো পাত্রে জল খোলা থাকলে তাতে মশা জন্মায়; ঘরে আবর্জনা থাকলে মাছি হয়। যাতে মশা ও মাছি না জন্মাতে পারে সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখা চাই। তার ঔষধ কেবল পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা। কাপড় প্রতিদিন রৌদ্রে দেওয়া চাই; রোদ না থাকলে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিংবা কাঠকয়লার আগুনে বিছানার গরম কাপড় গরম করে নেবে।

শিশুর সামান্য অসুখ হলেও যত্ন করা চাই। ছেলেদের পরিপাক, অর্থাৎ হজম ঠিক হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। কাঁদলেই দুধ খাওয়াবে না, বরং অন্যকোনো অসুবিধা আছে কি না তা তদন্ত করতে হবে। ঔষধ ব্যবহার যথাসাধ্য কম করবে। ঔষধের অভ্যাস ভালো নয়। খুব দরকার না পড়লে ডাক্তার ডাকবে না। আর যখন ডাক্তার ডাকবে, তখন ডাক্তারের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি জানি, অনেক সময় গিন্নীরা ডাক্তারকে ফাঁকি দেন; অর্থাৎ ডাক্তারের উপদেশ মানেন না; পরে ডাক্তারকে মিথ্যা কথা বলেন যে, হ্যাঁ, ঠিক সময়মতো ঔষধ দিয়েছি; ঐ পথ্য ছাড়া আর কিছু খায়নি। এতে অনিষ্ট কার—ডাক্তারের, না গিন্নীদের—আপনারই ভেবে দেখুন। নাওয়া, খাওয়া, ঘুম ঠিক নিয়মমতো হলে শিশুদের বেশি অসুখ না হওয়াই সম্ভব। পরিষ্কার বাতাস সবচেয়ে দরকারী জিনিস। মানুষ খেতে না পেলে ১৩ দিন, জল না পেলে ৩ দিন বাঁচাতে পারে, কিন্তু বাতাস না পেলে ৩ মিনিটের অধিকক্ষণ বাঁচতে পারে না। আমরা ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র সর্বপ্রথম বাতাস খেতে অর্থাৎ নিঃশ্বাস নিতে আরম্ভ করি, আর জীবনের শেষমুহূর্তে নিঃশ্বাস নেওয়া ছাড়ি। তাই বলি, পরিষ্কার বাতাসটা সবচেয়ে বিশেষ দরকারী।

কেবল যে আমাদের দেশেই বেশি লোক মারা যাচ্ছে তা নয়। মানবজাতির এই যে ভয়ানক অধঃপতন—এটা প্রথমে ইংলন্ড ১৮৯৯ ও ১৯০২ সনে বুয়র যুদ্ধের সময় অনুভব করেন। সৈন্য সংগ্রহ করবার সময় ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে যখন একে একে অনেক লোককে সেপাই হবার উপযুক্ত নয় বলে বাদ দিতে লাগলেন, তখন কর্তাদের চৈতন্য হল যে, শিশু রক্ষার উপায় করতে হবে, নচেৎ সমস্ত দেশের লোক অধঃপাতে যেতে বসেছে।

এবারের যুদ্ধের সময় ফ্রান্স বুঝতে পারলেন যে, তাঁর লোকবল কমে যাচ্ছে; তাই শুনেছি তাঁরা আইন করেছেন যে, গবর্নমেন্ট দেশের পোয়াতিদের প্রত্যেক ছেলের জন্য একটা করে বৃত্তি দিবেন, যাতে শিশুর যত্ন হয়। যে-ঘরে চারিটি ছেলেমেয়ে আছে, সে স্থলে ছেলের বাপকেও একটা আলাদা বৃত্তি দেওয়া হয়। ফল কথা, ইউরোপ মানুষরক্ষা সম্বন্ধে সাবধান হয়েছেন, এখন আমাদের সাবধান হবার পালা।

আমার মনে হয়, এ শিশু মহামারীর আর-একটা বিশেষ কারণ আমাদের দেশের বাল্যবিবাহ। ডাক্তার ভারতচন্দ্র বলেছেন, 'মায়ের কর্তব্য না শিখে কেউ যেন মা না হয়।' যে নিজেই ১২/১৩ বছরের বালিকা, সে আর কর্তব্য শিখতে সময় পেল কখন? উক্ত ডাক্তার মহাশয়ের মতে কুড়িবছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ দিতে নাই।

মেয়েদের শরীর যাতে ভালো থাকে, সেদিকেও নজর রাখা দরকার। বালিকাস্কুলে মেয়েদের শরীর ভালো রাখবার জন্য ব্যায়াম করার ব্যবস্থা আছে বটে, তা তো কাজে পরিণত করবার যোটি নেই। কারণ ছাত্রীর মা-বাপ ড্রিল করতে বারণ করেন। মেয়েরা ১২ বছর বয়স পর্যন্ত জড়ভরত হয়ে বসে থাকবে, তারপর তাদের বিয়ে হবে; ফল—

ছেলে বাঁচে না, কপাল মন্দ!

আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, আজ আমি যা বলছি, তা এই প্রথম বলা নয়। প্রায় ১৪ বছর পূর্বে বলেছিলাম, 'যাঁরা কন্যার ব্যায়াম করা অনাবশ্যক মনে করেন, তাঁহারা দৌহিত্রকে হৃষ্টপুষ্ট 'পাহলোয়ান'দেখিতে চাহেন কি না? যদি সেরূপ ইচ্ছা করেন, তবে বোধহয়, তাঁরা সুকুমারী-গোলাপ লতিকায় কাঁঠাল ফলাইতে চাহেন!' ইত্যাদি (মতিচুর প্রথম খণ্ড—৪৯ পৃষ্ঠা) যা হউক, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার জন্য দুটি বিষয় দরকারী হয়ে পড়েছে দেখছি। প্রথম. স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার; দ্বিতীয়. বাল্যবিবাহ রহিত করা। অর্থাৎ মেয়েদের বেশ করে পড়ালেখা শিখাতে হবে, যাতে তারা নিজের শরীরের যত্ন করতে শিখে; আর অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের বিয়ে বন্ধ করতে হবে। আপনারা ভেবে দেখেছেন, সধবা মেয়েমানুষ বেশিরভাগে মরে কেন? কারণ তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় বলে। এখন দেখছি, শিশুরক্ষা করতে হলে আগে শিশুর মাদের রক্ষা করা দরকার। ভালো ফসল পেতে হলে গাছে সার দেওয়া দরকার। বুঝলেন? মেয়েদেরও খাওয়াদাওয়ার একটু যত্ন করবেন। মেয়ের বিয়েতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় বলে বেচারীদের শুকিয়ে মারবেন না। তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ গৃহের গৃহিণী; তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী।

মুক্তিফল

[রূপকথা]

কাঙ্গালিনী বহুদিন হইতে পীড়িতা। তাঁহার জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে—কাঙ্গালিনী বুঝি এখন মরেন। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা হইতে পারে না—চিকিৎসা দূরে থাকুক, দিনান্তে একবার আহার্যও জোটে না, একমাত্র জীর্ণকন্থা দারুণ শীত ও লজ্জা নিবারণের সম্বল। যিনি এককালে ভোলাপুরের রানি ছিলেন তিনি অদ্য কাঙ্গালিনী!

কাঙ্গালিনী তরুতলে শ্যামল দুর্বাশয়নে শায়িতা। অসংখ্য মশামাছি তাঁহার ক্ষত অঙ্গ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছে। তিনি রোগে ভুগিয়া এত দুর্বল হইয়াছেন যে, মশামাছিও তাড়াইতে পারেন না। তাঁহার বালকপুত্র নবীন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছে! সে কখনো দুর্বা লইয়া খেলা করে, কখনো বা তাহার ক্ষুদ্রহস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া মাছি তাড়ায়। কাঙ্গালিনী যখন অসহ্য যাতনায় অস্থির হন, মুদ্রিত নয়নে অশ্রু বিসর্জন করেন, নবীন তখন তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বারা মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলে, 'মা! আমি বড় হইলে তোমাকে এতএত ভাত আনিয়া দিব, তোমায় বানারসী শাড়ি পরাইব!' —নবীনের বালকসুলভ বাচালতায় তিনি আপনযন্ত্রণা ভুলিয়া মৃদু হাস্য করেন।

তরুশাখায় বসিয়া একটি পাখি মধুরস্বরে বলিতেছিল—'চৌদ্দপুত—এত দুখ!'*

তাহা শুনিয়া কাঙ্গালিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'পাখিটা আমারই দুঃখগাথা গাহিতেছে! আমি শতশত পুত্রের জননী হইয়া এত কষ্ট ভোগ করিতেছি! হায়! আমার এ দুঃখ অমানিশা কি কখনো পোহাইবে?'

দর্পানন্দ নূতন বুটজুতা পায়ে মচ্‌মচ্‌ করিয়া আসিয়া কাঙ্গালিনীকে সহাস্যে বলিলেন, 'মা! আর তোমার দুঃখদারিদ্র্য রহিবে না, আমি তোমার জন্য সোনার মল গড়াইতে দিয়াছি!' কাঙ্গালিনী অতিকষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, বাবা আগে প্রাণে বাঁচি তো! ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত'—

দর্প। (বিরক্তির সহিত) তোমার দুর্নিবার ক্ষুধার তৃপ্তি কিসে হইবে, আমি তো জানি না। বুড়া মানুষদের লইয়া বড় জ্বালাতন সইতে হয়। তুমি বিফ-টি ও এরারুট বিস্কিট খাইতে চাও না, তবে খাইবে কী?

কাঙ্গালিনী। আমি গরিব মানুষ, একমুঠা মুড়িমুড়কি পাইলে বাঁচি।

দর্প। ও-সব অসভ্য লোকের কুখাদ্য। তুমি যদি পনীর, বিস্কিট, মার্মালেড ও দুধের মোরব্বা না খাও, তবে উপবাসে মর। আমি আর তোমার জন্য কিছু করিতে পারিব না। দেখি তোমার জ্বর সারিয়াছে কি না, এই নাও একমাত্রা কুইনাইন খাও।

কাঙ্গালিনী। আমার রোগ কুইনাইনে সারিবার নহে।

'তবে মরিতেছ মর!' —এই বলিয়া দর্পানন্দ চলিয়া গেলেন।

---

* যেমন কতিপয় পাখির স্বরে 'চোখ গেল' 'বউ কথা কও' ইত্যাদি শুনা যায়, সেইরূপ একটি পাখির ডাক 'চৌদ্দপুত এত দুখ' এই কথার অনুরূপ।

কাঙ্গালিনীর অন্যতম পুত্র প্রবীণ আসিয়া মাতার নিকট বসিলেন। তিনি সস্নেহে জননীর হাত ধরিয়া বলিলেন, 'মা! তুমি দিনদিন বড়ই রোগা হইতেছ।'

কাঙ্গালিনী দর্পানন্দের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়াছিলেন, এখন অভিমান করিয়া বলিলেন, 'সেজন্য তোর ভাবনা কেন? তোদের 'শেরি', 'শ্যাম্পেনের' অভাব না হইলেই হইল।'

প্রবীণ। বন্ধুবান্ধবসহ 'শেরি', 'শ্যাম্পেন' পান করেন তোমার ধনবান পুত্র দর্পানন্দ; সে কথা আমাকে বল কেন মা? আমি তো সুরা স্পর্শ করি না, কেবল বিস্কিট খাই। আর এ কী কথা বল মা—তোমার জন্য আমরা ভাবিব না? আমরা তোমার এতগুলো সন্তান থাকিতে তুমি অনাহারে বিনাচিকিৎসায় মারা যাইবে?

এই সময়ে শাখাস্থিত পাখিটা আবার ডাকিয়া উঠিল—'চৌদ্দপুত—এত দুখ'। প্রবীণ তদুত্তরে বলিলেন, 'না পাখি, আর এত দুঃখ থাকিবে না—আমরা মায়ের দুঃখ দূর করিব।'

কাঙ্গালিনী। হাঁ, মরিলে তো দুঃখ দূর হয়ই—এখন আমি মরিতে প্রস্তুত।

নবীন মাতা ও ভ্রাতার কথোপকথন বুঝিতে না পারিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মাতার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিল, আর এক-একবার ভ্রাতার মুখপানে চাহিতেছিল। মা মরিবেন, এই কথা শুনিবামাত্র সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঙ্গালিনী পুত্রকে আদর করিয়া বলিলেন, 'তুই কাঁদিস না, আমি মরিব না। তোর দাদার সঙ্গে খেলা করিতে যা।'

নবীন। এই তো আমি বড় হইয়াছি, আর খেলা করিব না। চল দাদা, মার জন্য ওষুধ আনি গিয়া।

প্রবীণ। আমাদের সাধ্যমতে যে ঔষধ আনি তাহাতে মায়ের উপকার হয় না। মা! তুমি কি ঔষধ খাও না?

কাঙ্গালিনী। থাক বাবা! আমার জন্য আর ভাবিও না। এখন আমার মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়! তোমরা দীর্ঘজীবী হও, তোমাদের বালাই লইয়া আমি মরি!

নবীন। (সজল নয়নে) তুমি মরিলে আমি বড় কাঁদিব! মা গো! তোমায় মরিতে দিব না।

কাঙ্গালিনী। ওরে হতভাগা ছেলে! তোরই জন্য মরিতে পারি না। যেদিন সিংহাসনচ্যুত হইলাম, যেদিন রাজরানির পদ হারাইয়া কাঙ্গালিনী হইলাম, সেইদিন মরিতে চাহিয়া ছিলাম; কিন্তু তোরা অসহায় শিশু ছিলি বলিয়া মরি নাই! তোমাদের এই অবস্থায় ফেলিয়া মরিতেও কষ্ট হয়। নচেৎ মরণে ভয় করি না—এমন ঘৃণিতজীবন বহন করা অপেক্ষা শতবার মৃত্যু শ্রেয়।

নিন্দুককে সঙ্গে লইয়া দর্পানন্দ এই সময় আবার আসিয়া বলিলেন, 'ঔষধপথ্য না খাইলে মানুষ বাঁচে কীরূপে? মা! তুমি এমন অবোধ মেয়ে কিছু বুঝ না। আমি সুবর্ণমল পরাইয়া তোমার চরণ উজ্জ্বল করিতে চাই, তবু তুমি সন্তুষ্ট হও না। আবার বলি কুইনাইন খাও।'

কাঙ্গালিনী। দেখ দর্প! আমাকে আর জ্বালাতন করিস না। আমি দীনদুঃখিনী অনুভিখারিনি, তোমার স্বর্ণমল আমার পক্ষে উপহাস মাত্র। আর আমার রোগ ঔষধে সারিবার নহে। যাহাতে এ রোগ সারে, সে-কার্য তোমার ন্যায় আনাড়ি পুত্রের অসাধ্য। তুমি নিজের সুখসুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখিও, আর চাই কী?

নিন্দুক। যাহাতে মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়, এমন কার্য দর্পানন্দ কখনো করে নাই, এখন

সুবর্ণবেড়ি পরাইয়া মায়ের চরণ উজ্জ্বল করিতে চাহিয়াছিল, বেচারার সে-সাধও অপূর্ণ রহিল! অবশেষে কুইনাইন খাওয়াইয়া মায়ের মুখ তিক্ত করাও হইল না!

কাঙ্গালিনী। যাও নিন্দুক! তোমার কথা শুনিলে আমার গা জ্বলে।

প্রবীণ। কী করিলে মা তোমার রোগ সারিবে, আমি প্রাণপণে সে-সাধনা করিব। যদি তোমার রোগ ক্লেশ নিবারণ করিতে না পারি, ধিক আমার জীবনে! ধিক আমার শিক্ষা-দীক্ষায়!

নিন্দুক। বাস! আর ভাবনা নাই! প্রবীণ আমার অদ্বিতীয় বাকপটু—বাক্যেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে!

নবীন। তোমার পায়ে পড়ি, বল মা! কী করিলে তুমি ভালো হইবে!

কাঙ্গালিনী। বলিলে লাভ কী? তুই কি সে ঔষধ আনিতে পারিবি?

প্রবীণ। আমি আনিতে পারিব—আমি থাকিতে তোমার চিন্তা কী মা?

কাঙ্গালিনী। তবে শুন। বহুদিনের কথা—জনৈক সন্ন্যাসী আমার বাড়ি অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, আমি পুত্রকন্যার প্রতি তুল্য ব্যবহার করি না। তিনি বিদায় লইয়া যাইবার সময় আমাকে বলিলেন, 'বৎসে তুমি পুত্রকে অধিক স্নেহ কর, কন্যাকে একটুও আদর যত্ন কর না, ইহা বড় অন্যায়। পরিণামে তুমি এই অতি আদুরে পুত্রের দ্বারা কষ্ট পাইবে।' আমি ভাবিলাম, কন্যার প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শন করিলে লাভ কী? কন্যা কি আমার ভোলাপুর রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে? প্রকাশ্যে ব্যস্তভাবে বলিলাম, 'প্রভো! আমায় শাপ দিলেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি শাপ দিব কী, যে যাহা করে তাহাকে সে কর্মফল ভোগ করিতেই হয়। কণ্টক বপন করিয়া কেহ কুসুম চয়ন করে কি? অযোগ্য পুত্রের জননী হওয়া এবং অপত্যস্নেহে পক্ষপাতিতা করিবার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে।' আমি পুনরায় তাঁহার পদযুগল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদিনে আমার শাপাবসান হইবে?' তদুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'কৈলাসশিখরে মুক্তিফলের গাছ আছে, যে-দিন কেহ তোমাকে সেই গাছের ফল আনিয়া খাওয়াইবে, সেইদিন তুমি শাপমুক্ত হইবে।'

প্রবীণ। আমি এখনই তোমাকে মুক্তিফল আনিয়া দিতেছি।

দর্প। কৈলাস পর্বত এখন মায়াপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত। সুতরাং মুক্তিফল আনয়ন সহজ নয়। মা! তুমি এমন কথা বল যাহা মানবের সাধ্যাতীত।

নিন্দুক। কোনোকার্যই মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

প্রবীণ। আমি মায়াপুরের রাজার চরণে ঐ ফল ভিক্ষা চাহিব। আমি সম্রাটের চরণ উদ্দেশে চলিলাম—

কাঙ্গালিনীর দুহিতা শ্রীমতা কাঁদিয়া বলিলেন,'আহা! মা আমাদের প্রতি অনাদর অবহেলা করার জন্য শাপগ্রস্তা হইয়াছেন। তাই আমরা কি মায়ের কাজ করিব না? চল দাদা, আমিও তোমার সঙ্গে রাজদ্বারে ভিক্ষা চাহিতে যাইব।'

দর্প। তুমি আবার কোথায় যাইবে? তুমি যেখানে আছ, সেইখানে থাক, আর একপদ অগ্রসর হইও না।

নিন্দুক। (করতালি দিয়া) শ্রীমতী আর ফাটকে আটক রহিবে না। আর মায়ের চিন্তা কী?—এইবার শ্রীমতী মুক্তিফল আনিবে।

শ্রীমতী। (স্বগত) দর্পদাদা অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিবেন না, নিন্দুক দাদার বিদ্রূপবাণ ততোধিক অসহ্য! যদি ঈশ্বর সহায় হন, তবেই মায়ের সেবা করিতে পারিব।

(প্রকাশ্যে) নিন্দুক দাদা! তোমার বিদ্রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, বরং তোমার দুর্মতির জন্য আমার দুঃখ হয়—আমি তোমারই জন্য ব্যথিত।

নিন্দুক। নেহাল হইলাম! শ্রীমতী আমার প্রতি দয়া করেন, আর চাই কী?

প্রবীণ। শ্রীমতী, তোমার রচিত দুই-চারিটি গানের নকল আমাকে দাও দেখি, ভিক্ষা প্রার্থনার সময় গানের প্রয়োজন হয়।

শ্রীমতী। ঐজন্যই তো আমি তোমার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলাম—আমিও গান গাইতাম—

প্রবীণ। না বোন, তোমাকে কৈলাস পর্যন্ত যাইতে দিতে পারি না। তুমি আমার সহিত গল্প কর, উপন্যাস পাঠ কর, আমার সঙ্গে পারমার্থিক গান গাও—এই পর্যন্তই যথেষ্ট; ইহাপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা বা সমকক্ষতা দিতে পারি না।

নিন্দুক। সীমা লঙ্ঘন করিও না, শ্রীমতী, লোক হাসাইও না।

দর্প। দেখ তো সুমতি কেমন সরল মেয়ে, সে তো কুটিরের বাহিরে পদার্পণ করে না।

শ্রীমতী। সুমতি বোকা, তাই কোণের ভিতর লুকাইয়া থাকে। আর তাহার বাহিরে আসিবার সাহস কই?

সুমতি কাজ না পাইয়া কুটিরাভ্যন্তরে বসিয়া জীর্ণকন্থা সংস্কার করিতে ছিলেন এবং নীরবে সকলের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন; তিনি শ্রীমতীর শেষ কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, 'আমি বোকা হই বা ভীরু হই, কিন্তু যথাবিধি শক্তি সঞ্চয় না করিয়া দিদির মতো হঠাৎ বাহিরে যাইব না। দিদি বাহির হইয়াই এমন কী দিগ্বিজয় করিয়াছেন? কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন?—ঐ উপন্যাস পাঠ করা আর দাদার সহিত সুর মিলাইয়া গান করা—বাস? এই পর্যন্তই তো?'

দর্প। সুমতি বোকা বলিয়াই তো আমরা উহাকে একটু কৃপাচক্ষে দেখি।

শ্রীমতী। বেশ। দেখিব, সুমতি আর কতদিন তাহার মস্তিষ্কের অস্তিত্ব গোপন রাখে। কিন্তু দাদা, আমাদিগকে মস্তক উত্তোলন করিতে না দিলে তোমাদেরও বলবৃদ্ধি হইবে না যে!

নিন্দুক। চুপ কর শ্রীমতী, তোমার বক্তৃতা শুনিতে চাই না। তুমি নিজের কাজ দেখ, হাঁড়িবাসন ধোও গিয়া।

২

কৈলাস পর্বত শিখরে মায়াপুরের রাজার প্রমোদকানন। আঠার হাজার দৈত্য মুক্তকৃপাণ হস্তে উদ্যান রক্ষা করিতেছে। মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু দূরে থাকুক—পক্ষী, মক্ষিকা, পিপীলিকা পর্যন্ত সে-কাননে প্রবেশ করিতে পারে না।

মায়াপুরের বৃদ্ধ রাজা দিবাশেষে রাজাকার্য সমাধা করিয়া কর্মচারীবৃন্দকে একেএকে বিদায় দিলেন। এখন রাজকুমার মন্ত্রী এবং কতিপয় প্রধান কর্মচারী মাত্র আছেন। এমন সময় একজন দৈত্য রাজসভায় আসিয়া যুক্তকরে নিবেদন করিল, 'মহারাজ! ভয়ে বলি কী নির্ভয়ে বলি?'

রাজা। নির্ভয়ে বল।

দৈত্য। কৈলাসশিখরে জিনকুল চূড়ামণি মহারাজার প্রমোদকাননে মুক্তিফলের গাছ আছে—

মন্ত্রী। হাঁ, তাই কী?

দৈত্য। সে অমর-বাঞ্ছিত বৃক্ষে শত বৎসরে একটি ফল হয়।

জনৈক কর্মচারী। হাঁ জানি। আবার তাহাতে ফল ধরিয়াছে, ইহাও আমরা শুনিয়াছি। তোমার বক্তব্য শীঘ্র বল, দীর্ঘ ভূমিকায় প্রয়োজন নাই।

দৈত্য। (ভয়কম্পিত কলেবরে) জনশ্রুতি শুনিতে পাই, ভোলাপুর হইতে মানবনন্দন মুক্তিফল চয়ন করিতে আসিতেছে—

যুবরাজ। অসম্ভব। মিথ্যা জনরব।

মন্ত্রী। যদিই জনশ্রুতি সত্য হয়,তবে তোমরা আঠার হাজার দৈত্য আছ কিসের জন্য?

কর্মচারী। তোমাদের ন্যায় ভীমকায় জাগ্রত থাকিতে ভয় কী? বিশেষত পৃথিবীতে ভোলাপুর অতিভ্রান্ত নগণ্য দেশ, তথাকার মানবসন্তান কি তোমাদের অপেক্ষা অধিক বলবান?

দৈত্য। না মহাশয়! আমি কেবল রাজধানীতে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আমরা সকলে সশস্ত্রে প্রস্তুত আছি—আবশ্যক হইলে কৈলাস ভূধরে মানবরক্তের নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইবে।

মন্ত্রী। বীরের উপযুক্ত কথা! এখন তুমি যাইতে পার।

যুবরাজ। (আসন ত্যাগ করিয়া) আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সকলে। আপনি বলুন।

যুবরাজ। আমি রাজকার্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার আস্পর্ধা রাখি না। কিন্তু এ-সময় মন্ত্রিবরের কথার প্রতিবাদ না-করিয়া থাকিতে পারি না। তিনি দৈত্যদিগকে মানবরক্তের নদী প্রবাহিত করিতে উৎসাহ দিয়া বুদ্ধিমানের কার্য করেন নাই। ভোলাপুরের নির্বীর্য মানব ধ্বংস করা আমাদের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত জাতির পক্ষে কিছুমাত্র বীরত্বের পরিচায়ক নহে। পরন্তু, মায়াপুররাজ দয়ালু ও ন্যায়পরায়ণ নামে জিনজগতে বিখ্যাত। মায়াপুর রাজ্যে নরশোণিত পাত হইলে আমাদের প্রতিবেশী জিনরাজগণ কী বলিবেন? সমস্ত পরীস্থান আমাদিগকে বীর না বলিয়া কাপুরুষ বলিবে না কি?

মন্ত্রী। যুবরাজের কথা অতি যুক্তিসঙ্গত। মানবরুধিরে আমাদের সুনাম কলঙ্কিত হইবে, এমনকি সমগ্র পরীস্থান কলুষিত হইবে। কিন্তু মানবের আস্পর্ধাও তো অসহ্য! তাহারা মুক্তিফল লইতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বাধা দিবার কী উপায়?

কর্মচারী। যুবরাজ অবশ্যই উপায় ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রাজা। বৎস! তোমার যুক্তি অতি সারবান। তুমি পরীস্থানের মুকুটতুল্য মায়াপুর সাম্রাজ্যের আসন্ন কলঙ্ক মোচন করিলে। এখন যাহাতে কার্যসিদ্ধ হয় তাহাই কর। তুমি কৃতকার্য হইলে তোমাকে রাজ্যদান করিয়া আমি বানপ্রস্থ লইব।

সকলে। যাহাতে সাপ মরে, লাঠিও না ভাঙে, তদ্রূপ ব্যবস্থা হওয়া চাই।

যুবরাজ। কথিত আছে, মানবজাতি অতিশয় মূর্খ এবং জিনজাতি ও দৈত্যগণ মায়াবিদ্যায় পারদর্শী। অজ্ঞ বিবেক হীন মানবকে ইন্দ্রজালে বশীভূত করা অতিসহজ ব্যাপার। মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর করুণ সুরে সহানুভূতিসূচক মোহন মুরলী বাজাইলে, তাহা শুনিয়া মানবগণ তালে তালে নৃত্য করিবে। তখন অন্যান্য জিন-গায়কেরা তাহাদের বলিবে, চল আমরা তোমাদিগকে মুরলীধরের নিকট লইয়া যাই। তাহাতে মানুষেরা সম্মত হইলে জিন ও দৈত্যগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে।

উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী করতালিসহকারে যুবরাজের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

অতঃপর যুবরাজ প্রধান প্রধান দৈত্য, প্রহরী ও মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধরকে [illegible] কয়েকদিন গোপনে পরামর্শ করিয়া সমস্ত ঠিক করিলেন।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, দৈত্যগণ কোনোপ্রকারে মানবের অনিষ্ট করিবে। তাহারা কেবল মানুষের গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং যথাকালে মায়াপুরে [illegible] সংবাদ প্রেরণ করিবে।

বহুদিন পূর্বেই কৈলাস পর্বতের চতুর্দিকে কণ্টক রোপণ করা হইয়াছিল। জিন, পরী ও দৈত্যগণ মায়াযানে ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে।

৩

লায়েক দিবানিশি জননীর সেবা করিয়া ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। নিজের আহার-নিদ্রায় উদাসীন থাকায় তাঁহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। তিনি মাতার পদপ্রান্তে নীরবে বসিয়া তাঁহার পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে ছিলেন। পুত্রের সস্নেহ করস্পর্শে কাঙ্গালিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, 'লায়েক! তুমি এখানে! তাই তো, লায়েক ভিন্ন অভাগিনী মায়ের ব্যথায় আর কে ব্যথিত হইবে? তা বাছা! তোমার যত্নে আমার বিশেষ কিছু উপকার হইবে না। মুক্তিফল প্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত আমি ব্যাধিমুক্ত হইব না।'

শ্রীমতী ছোট একটি থালায় কিছু খাবার আনিয়া মাতাকে বলিলেন, 'মা, তুমি বড়ই দুর্বল হইয়াছ। এখন কিছু একটু মুখে দাও, তবে একটু সবল হইবে।'

কাঙ্গালিনী। মুক্তিফলের পূর্বে আর কিছু ভক্ষণ করিতে পারি না।'

লায়েক। প্রবীণ কবে না-কবে ফল আনিবে! এদিকে তুমি-যে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছ, মশামাছি তাড়াইবার সামর্থ্যও তোমার নাই।

শ্রীমতী। দাদার ফল আনয়নের পূর্বেই হয়তো মা মারা যাইবেন। হায়! রোগীর মৃত্যুর পর ঔষধ আসিলে লাভ কী?

কাঙ্গালিনী। আমার জন্য ভাবিস না মা। আমি মরিব না—আমি মরিলে জগতে ক্লেশ-ভার কে বহন করিবে? উপবাসে থাকিয়া নানাব্যাধির আধার হইয়া অশেষ লাঞ্ছনাগঞ্জনা সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে। এই-যে পরিধানে জীর্ণ কন্থাখণ্ড—ইহার একপ্রান্ত মায়াপুর রাজ্যের জিনদের হস্তে, অন্যপ্রান্ত আমি অভাগিনী অর্ধউলঙ্গিনী দ্রৌপদীর ন্যায় প্রাণপণে ধরিয়া কটিদেশে বেষ্টন করিয়া কোনোমতে লজ্জা নিবারণ করিতেছি! এত অপমান সহিয়াও আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে! হে আল্লাহ! আমায় ক্ষমা কর।

ইতিমধ্যে লায়েক রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীমতী শশব্যস্তে দৌড়িয়া ভ্রাতার নিকট আসিলেন। সহোদরের আসন্নকাল বুঝিতে না পারিয়া শ্রীমতী দীননয়নে মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—'দেখ মা! দাদা এমন হইলেন কেন?'

কাঙ্গালিনী তখন কোনোরূপে উঠিয়া মুমূর্ষু পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, 'লায়েক! লায়েক! বাপ! তুই আমারে ছাড়িয়া চলিলি! হায়! এ দুর্দিনে তুই আমার সহায় ছিলি! আমার মরণ লইয়া তুই মরিলি!'

লায়েক অর্ধনিমীলিত লোচনে বলিলেন, 'মা, তুমি কাতর হও কেন? জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মায়ের সেবা করিতে গিয়া মরিতেছি। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয়

আর কী আছে? যে নিজের জন্য মরে তাহার মৃত্যু [illegible] আত্মবলিদান করে—' এইমাত্র বলিয়াই লায়েক প্রাণত্যাগ করিলেন।

কাঙ্গালিনী। এইজন্য লায়েককে আমার শুশ্রূষা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। [illegible] দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া লায়েক মারা গেল। হায়! অভিশপ্তার [illegible] মোচন করে, কাহার সাধ্য! পুত্রগুলিকে অধিক ভালোবাসিতাম—অতি সোহাগে তাহাদের কেহ হইল দর্পানন্দ, কেহ হইল কৃতঘ্ন, কেহ হইল নিন্দুক, কেহ হইল মাতৃদ্রোহী। আর যে মানুষ নামের উপযুক্ত হইল, সে সোনার চাঁদ লায়েক শমনকবলে পড়িল। আর আমার আশাভরসা কোথায়?

শ্রীমতী। মা, নৈরাশ্যে আকুল হইও না—এখনো ধীমান দাদা, প্রবীণ দাদা ও নবীন আছেন; আমিও তোমার দীনতমা সেবিকা আছি। আশা ছাড়িতে পারি না। তোমার এ-দুর্দশা দূর হইবে এরূপ আশা করি।

কাঙ্গালিনী। দর্পানন্দের এই ঐশ্বর্য থাকিতে আমি দীনহীনা, এ-দুঃখ কাহাকে বলিব?

নবীন লায়েকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকাডাকি করিল। লায়েকের সাড়াশব্দ না পাইয়া, দ্রুতপদে শ্রীমতীকে গিয়া বলিল, 'দিদি, লায়েক দাদা এ-সময় ঘুমাইলেন কেন?'

শ্রীমতী। আমাদের লায়েক দাদা ঘুমান নাই—অমর হইয়াছেন।

নবীন। আমিও অমর হইব, দিদি!

কাঙ্গালিনী। বেশ! যা, এখন বকিস না, খেলা কর গিয়া।

নবীন। একাএকা খেলা ভালো লাগে না, প্রবীণ দাদা কখন ফিরিবেন?

কাঙ্গালিনী। প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিবেন।

নবীন। দাদা মুক্তিফল আনিতে পারিবেন না, আমি আনিতে যাই।

শ্রীমতী। তুমিও তো এখন এতবড় হইয়াছ, বেশ তো যাও না—ফল লইয়া শী[illegible] ফিরিও—আমরা প্রতীক্ষায় রহিলাম।

৪

প্রবীণ কৈলাস ভূধরের পাদমূলে বসিয়া প্রতিদিন মায়াপুরের রাজাকে সম্বোধন করি[illegible] আবেদনের পাণ্ডুলিপি লিখেন। আবেদন লিখিতে ইতিমধ্যে ঝাড়া সাতমণ মসি ব[illegible] হইয়াছে; লেখনীর জন্য দেশের সমুদয় খাগড়াবনের খাগড়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া[illegible] কাগজে আর কুলায় না, এখন মানকচুর পাতায় আবেদন লিখা হয়। এদিকে আ[illegible] মানকচুপত্রের বিনাশ দেখিয়া মানকচুর দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় বরাহকুল অনুন[illegible] দেবতার নিকট অভিযোগলিপি প্রেরণ করিয়াছে।

প্রবীণ এক-একবার এক-এক দৈত্যের দ্বারা আবেদনলিপি প্রেরণ করেন, [illegible] আবেদনের কোনো উত্তর আর প্রাপ্ত হন না। মায়াবী গায়কেরা তাঁহাকে এই বি[illegible] আশ্বাস দেন যে, রাজা স্বহস্তে মুক্তিফল চয়ন করিয়া তোমাদিগকে দিবেন, তুমি নি[illegible] থাকো।

প্রবীণ! (মায়াবীর প্রতি) আমি তো নিশ্চিন্ত আছিই। কিন্তু বাড়ি গেলেই দর্প[illegible] বাতাকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, 'তোমার গুণধর পুত্র মুক্তিফল আনিল কই?' ইদানীং নবীন বড় হইয়াছে, তাহার তাড়া আরো অসহ্য বোধহয়। সে আ[illegible]

কিছুতেই স্থির থাকিতে দেয় না, নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করে।

মায়াবী। নবীনটাকে কোনোরূপে জব্দ করিতে পারেন না।

প্রবীণ। পঁচিশ-ত্রিশজন দৈত্য প্রহরী সহায় হইলে নবীনকে জব্দ করা কঠিন ব্যাপার নয়।

মায়াবী। নবীনের ধরা পাইলে হয়—সে বড় দাম্ভিক, সে দৈত্যদের নিকট আসিয়া ফল প্রার্থনা করে না এবং আমাদের কাছে মোটেই ঘেঁষে না, সর্বদা দূরে দূরে থাকে। আর দর্পানন্দের বিদ্রূপের জন্য ভাবিবেন না, তিনি একপ্রকার আমাদের হাতেই আছে। তিনি বানর সাজিতে চাহেন, যেজন্য লাঙ্গুলের প্রয়োজন। সেই লাঙ্গুল লাভের জন্য তিনি এখন জিনের সাধনা করিতেছেন।* এবার আমরা তাঁহাকে লাঙ্গুল বন্ধনে বাঁধিব, তিনি আর নড়িতে পারিবেন না—তাঁহার মুখে কথাটি ফুটিবে না। এ-বৎসর যুবরাজের জন্মোৎসবের দিন দর্পানন্দ লাঙ্গুলাবদ্ধ হইবেন।

প্রবীণ। (স্বগত) আমিও লাঙ্গুল লাভ করিতে পরিতাম, কিন্তু এখন নবীন হাসিবে সেই ভয়ে লাঙ্গুলের লোভ সম্বরণ করিলাম। দর্পানন্দের তো লাজ নাই, কাজেই ল্যাজেও আপত্তি নাই! (প্রকাশ্যে) ঐ দেখুন, দর্পানন্দ সবান্ধবে আসিতেছেন।

মায়াবী। আসুন, আপত্তি নাই, উনি আমাদের বন্ধু।

দর্প। (মায়াবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া) কুশলে আছেন তো?

মায়াবী। আসুন, বসুন। আপনার সংবাদ কেমন?

দর্প। আমাদের সবই মঙ্গল। আমার লাঙ্গুলের কথাটা বোধহয় জিনকুল চূড়ামণি মহারাজের স্মরণ আছে?

মায়াবী। অবশ্য স্মরণ আছে। কিন্তু এক-কথা, আপনিও মুক্তিফলের প্রার্থী নাকি?

দর্প। না মহাশয়, আমি কি পাগল? যাহাতে পূজ্যপাদ মায়াপুররাজ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজ আমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব; সে-কথা আমার যমজভ্রাতা প্রবীণকে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রবীণ। (সভয়ে) আমি কী করিয়াছি? আমি কি বলপূর্বক মুক্তিফল আনিতে যাইতেছি? আমি কেবল রাজার চরণকমলে সবিনয় করপুটে ভিক্ষা চাহিতেছি—দাতার ইচ্ছা হইলে ভিক্ষা দিবেন।

মায়াবী। তাহাই ঠিক। আপনারা রাজার বদান্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। রাজা অবশ্যই আপনাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। মুক্তিফল পাকিতে এখনো অনেক বৎসর বিলম্ব আছে, ফলটি পাকিবামাত্র আমরা আপনাদিগকে সাধিয়া আনিয়া দিব।

দর্প। সে-ফলে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধা মাতা মরিতেছেন, মরুন। আমি এবং আমার একশত ছয়জন বন্ধু জিনরাজার অতিশয় ভক্ত—সুতরাং আমরা মুক্তিফল চাই না। (বন্ধুদের প্রতি) তোমাদের রচিত সেই স্তব গানটি গাও দেখি।

দর্পানন্দ প্রভৃতি একশত সাতজন সেতার বাজাইয়া সমস্বরে গাহিলেন :

'আমরা ক-জন সবে একশত সাত
অতি অকপট জিন-ভকত নেহাত!
হৃদয়ের অন্তস্তলে
যে প্রবল বেগে চলে

* পার্থিব কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিবার আশায় অনেকে জিনের সাধনা (আমল) করিয়া থাকে। মানবের সাধনাবলে জিন বশীভূত হয়। আলাদিনের প্রদীপের কথা প্রায় সকলেই জানে।

শীতল বিমল জিনভক্তির প্রপাত,
দিগন্ত কাঁপায়ে ওঠে তার কলনাদ!
ধারি না কাহার ধার
ভগিনী ভ্রাতার মার—
ক্ষুধায় মরুক মাতা, নাই দৃকপাত!
জিনরাজ-ভক্ত মোরা একশত সাত!'

প্রবণে মায়াবী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বাহবা দর্পানন্দ। বাহবা!! আপনারা
কল বুদ্ধিমান, নিজের সুখস্বার্থ বেশ বুঝিয়াছেন। তবে আর বুড়িটার জন্য চিন্তা কী?'
র্প। না, বুড়িমায়ের জন্য আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই; আমাদের সুখশান্তি বজায়
কলেই হইল।
প্রবীণ। (স্বগত) আমাকে হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া নবীন সুখশান্তি ভোগ করিতে দিবে না।
ন দাদাও বারম্বার তাড়া দিতেছেন। তিনি বলেন, মুক্তিফল প্রাপ্ত না-হওয়া পর্যন্ত
র নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না। আমি কেবল মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য মুখে
ছিলাম, ফল আনিয়া দিব, কিন্তু নবীন সত্য-সত্যই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।
(প্রকাশ্যে) তাই তো ভাই, আপনি বাঁচিলে বাপের নাম।
মায়াবী। দেখুন, আপনারা ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবেন না। আমরা ব্যাধিক্লিষ্টা
জিনীর জন্যই মুক্তিফল রক্ষা করিতেছি। নতুবা আমাদের আর কী স্বার্থ?
র্প ও প্রবীণ। তাই তো আহা! আপনাদের কী দয়া।
মায়াবী। প্রবীণ! আপনাকে আমরা যৎপরোনাস্তি ভালোবাসি, আপনি সতত আমাদের
ছে কাছে থাকিবেন।
প্রবীণ। (অনুচ্চস্বরে) যে আজ্ঞা, আপনারা আমাকে চোখে চোখে রাখিবেন।

[মায়াবীর প্রস্থান]

নিন্দুক বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া সকলের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। মায়াবী প্রস্থান
রিলে পর তিনি সমক্ষে আসিয়া সহাস্যে প্রবীণকে বলিলেন, 'কি প্রবীণ! মুক্তিফল
ইলে?'
প্রবীণ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, 'পাই নাই, পাইবার আশা তো আছে।
ধৈর্য ধারণ কর, অধীর হইও না—আমি নিশ্চিত মাতাকে মুক্তিফল আনিয়া দিব। নবীন
তের সন্নিকটস্থিত অরণ্য খানিকটা পরিষ্কার করিয়াছে, সেইপথে একটু অগ্রসর হইয়া
র, কৈলাস কতদূর।'
র্প। সাবধান! ও-পথে পদার্পণ করা উচিত নয়, দৈত্যগণ দেখিতে পাইলে অনর্থ
টিবে।
প্রবীণ। নবীন যে আমাকে ঐদিকে সোপান নির্মাণ করিতে বলে। সে এত কঠিন
শ্রম করিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতেছে, আর আমি একটু যাইয়া দেখিব না?
র্প। তা দেখ, কিন্তু নবীন যেরূপ অবিমৃষ্যকারী, সে ইহার ফলে বিপন্ন হইবে।
নিন্দুক মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'নবীন ও প্রবীণের কৈলাস আরোহণ,
ফল চয়ন—এসব কার্য অতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, কারণ দৈত্যগুলি নাক ডাকাইয়া
াইতেছে কি না!'
প্রবীণ। আমি আত্মগোপন করিতে জানি, আমি নবীনের মতো অসতর্ক নই। আমি

উভয়কুলের মনরক্ষা করিয়া চলি; নবীনকে বলি, হাঁ সোপান প্রস্তুত করিব, দে... আমি কিছুদূর অগ্রসর হইয়া থাকি, যেই তোমার উপর হইতে মুক্তিফল ... অমনি লুফিয়া লইব।

নিন্দুক ও দর্পানন্দ উচ্চহাস্য করিলেন। প্রবীণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন।

৫

মায়াপুর রাজসভায় পাত্রমিত্র সকলে উপস্থিত। মহারাজ অসুস্থতানিবন্ধন সভায় আ... পারেন নাই, তিনি অন্তঃপুরে পরীমহলে বিশ্রাম করিতেছেন। যুবরাজ ... করিতেছেন।

জনৈক কর্মচারী মুরলীধরকে বলিলেন, 'কই, আপনার বংশীরবে মানব ভুলি...

মুরলীধর। আমার মাননীয় বন্ধু সম্ভবত পৃথিবীর সমাচার অবগত নহেন; ... ভুলিয়াছে বইকি!

কর্মচারী। প্রবীণের কথা একরূপ, কার্য অন্যরূপ। তিনি মুখে বলেন, 'হাঁ হাঁ, রা... চরণে শুধু ভিক্ষা চাই', কার্যত কিন্তু তিনি গোপনে নবীনের সহিত কৈলাস প... আরোহণের নিমিত্ত সোপান নির্মাণ করিতেছেন, এসব সংবাদ মুরলীধর অবগত আ... কি?

অন্য কর্মচারী। তবে তো চিন্তার বিষয়!

মুরলী। (সহাস্যে) আপনারাও ভালো, প্রবীণের সোপান রচনা ছেলেভুলানো ম... প্রস্তর দ্বারা সোপান প্রস্তুত করিতেছেন, তাও আবার বৎসরে এক ধাপের অধিক নি... হয় না।

যুবারাজ। কথা কাটাকাটির কাজ কী. প্রধান গায়ককে ডাকিয়া সমাচার জিজ্ঞাস... যাউক।

প্রধান গায়ক তৎক্ষণাৎ মায়াযানে আগমন করিলেন।

মুরলী। বলুন কবিবর, ধরণীর কী সংবাদ? প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া গিয়াছেন?

গায়ক। প্রবীণ মুক্তিফল লইতে পারিবেন, তবে এত দৈত্য প্রহরী আছে কেন? ... ভবিষ্যতে মানুষেরা কৈলাস আরোহণে কৃতকার্য হইতেও পারেন।

মন্ত্রী। অসম্ভব! অতি অসম্ভব।

যুবরাজ। গায়ক কিরূপে জানিলেন, প্রবীণ কৈলাসশিখরে আরোহণে সক্ষম হইবে...

গায়ক। প্রবীণ কৈলাসারোহণ করিতে পারিবেন না; সে-বেচারা এতদিন কে... আবেদন লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু এখন নবীনের প্ররোচনায় ... সোপান প্রস্তুত করিতে চাহেন। নবীন তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দেন না—নবীনই ... অকাণ্ডের মূল।

মন্ত্রী। তথাপি আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। নবীন, প্রবীণ, ধীমান, নিন্দুক, দর্প... প্রমুখ সকলে মিলিয়া সমবেত চেষ্টা না করিলে, তাঁহারা কৈলাসারোহণে কৃতকার্য হ... পারিবেন না; অথচ তাঁহাদের পরস্পরে কখনো একতা স্থাপিত হইবে না, সুত... আমাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই। তদ্ব্যতীত কাঙ্গালিনী পুত্র বলিদান না ক... মুক্তিফল পাইবেন না। আর তিনি অপত্যবাৎসল্যহেতু পুত্র বলি দিতে পারিবেন ... ইহাও আমরা জানি।

[illegible] তাহা সত্য, কিন্তু লায়েক স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করিয়াছে।

[illegible] (সবিস্ময়ে) বটে? কাঙ্গালিনীর অক্ষম ভীরুপুত্র জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছে?

[illegible]?

[illegible]। হাঁ, লায়েকের আত্মত্যাগ সত্য ঘটনা, আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি।

[illegible] সভাসদ। তাহা হইলে বেচারি কাঙ্গালিনীকে মুক্তিফলে বঞ্চিত করা অন্যায়।

[illegible] (ব্যঙ্গ ভাষায়) বটে? তবে আমরা কৈলাসগিরি হইতে আঠার হাজার হাতি সরাইয়া লই—মানব অনায়াসে নির্বিঘ্নে অপক্ক মুক্তিফল খাইয়া দেখুক, তাহার কেমন?

[illegible]। (একবাক্যে) না, না। আহা, এমন কাজ করিতে নাই। অবোধ মানবনন্দন ভালোমন্দ বুঝে না, তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। আমরা থাকিতে তাহারা অপক্ক [illegible] তক্ষণে বিপন্ন হইবে, ইহা আমাদের দয়াসুধাসিক্ত সুকোমল প্রাণে সহিবে না। [illegible] আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করিয়া রাজসভাস্থিত সকলে এক-এক ঘটি অশ্রু [illegible] করিলেন।

[illegible]রোজ। (প্রথমে বহুকষ্টে অশ্রুসম্বরণ পূর্বক) গায়ক কি বিশ্বাস করেন, [illegible]দর্শী নবীন পর্বতারোহণ করিয়া এখন মুক্তিফল চয়নে কৃতকার্য হইবেন?

[illegible]। না, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। কেবল নবীনের আস্ফালন উল্লম্ফন দেখিয়া [illegible] করিতে পারি না।

[illegible] জ্যোতিষশাস্ত্রে জানা যায়, যতদিন কাঙ্গালিনীর কন্যাগণ তাহাদের ভ্রাতৃবর্গের [illegible]হায়তা না করিবে, ততদিন কেহই মুক্তিফল লইতে পারিবে না। আর কাঙ্গালিনীর [illegible] কী প্রকার নগণ্য ও অকর্মণ্য, তাহা আপনারা সকলে অবগত আছেন।

[illegible]কলে। তবে আমরা বহু বৎসর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

[illegible] অবশ্য। এই তো নবীন ও প্রবীণে, সোপান প্রস্তুত ব্যাপারই দেখুন না! নবীন [illegible] 'একধাপ উচ্চে নির্মাণ করি', প্রবীণ বলেন, 'না, নিচে নামিয়া আর-একধাপ [illegible] করি।' নবীন বলেন, 'উপরে উঠি'; প্রবীণ বলেন, 'নিচে নামি'—এই বিষয় লইয়া [illegible]তায় কেবল বাকবিতণ্ডা চলিতেছে।

[illegible]নেক পারিষদ! (সহাস্যে) আমার বন্ধু মহোদয়গণ কাঙ্গালিনীর এইসব অযোগ্য [illegible] আস্ফালন দেখিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইতে বলেন। যদি কেহ শূন্যগর্ভ বক্তৃতা [illegible] শঙ্কিত হন, তিনি কোকিলের কাকলি শ্রবণেও মূর্ছা যাইতে পারেন।

(সভাসদগণের উচ্চহাস্য)

[illegible] বাস্তবিক উৎকণ্ঠার কারণ নাই, কেবল কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি দৈত্য মিথ্যা সংবাদ [illegible]রিয়া আমাদিগকে এখন বিরক্ত করিতেছে।*

[illegible]রাজ। এখন আমরা নিরুদ্বেগ হইলাম। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমানের [illegible]; মুরলীধর যথাবিধি মায়াবংশী বাজাইতে থাকুন।

[illegible]ৎপর মুরলীধর দ্বিগুণ উৎসাহে মায়াবংশী বাদন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মোহন [illegible]লিত সুর শুনিয়া সপ্তসাগর স্তম্ভিত হইয়া গভীর গর্জন ভুলিল; সদাগতি সমীরণ [illegible]ল; তরুলতা স্থাবর জঙ্গম—সকলে উৎকর্ণ হইল; গগনবিহারী বিহগকুল [illegible]লি ভুলিয়া গেল—তখন বাঁশির সুরে প্রবীণ ভুলিবেন না কেন? তিনি তো মানুষ

কৈলাসের উপত্যকায় নবীন, প্রবীণ, ধীমান ও নিন্দুক উপস্থিত। ধীমান [illegible] করিতে উপদেশ দিতেছেন, নবীন তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া কাঁচাবাঁশের মই প্রস্তুত করিতেছে। প্রবীণ অতি ধীরে ধীরে প্রস্তর সোপান উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন। নিন্দুক কার্য করিতে আসেন নাই, কর্মোৎসাহী ভ্রাতাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে আসিয়াছেন। নিন্দুক সুবিধা বুঝিয়া নবীনের প্রতি শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, কখনোবা প্রবীণকে [illegible] নাকানিচোবানি খাওয়াইতেছেন। এইরূপে ভ্রাতৃচতুষ্টয় মাতৃকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নবীন। (প্রবীণের প্রতি) দাদা, তোমার দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া গা জ্বলে। আজ তোমার উপকরণই সংগৃহীত হইল না—কবে সিঁড়ি হইবে, তবে তুমি উঠিবে? [illegible] আনা তোমার কাজ নয়!

প্রবীণ। ইস! আমি ২২/২৩ বৎসর হইতে মাতৃসেবা করিয়া আসিতেছি, কৈলাস উঠিতে চেষ্টা করিতেছি, আজ তুই তিন-দিনের ছোঁড়া বলিস কি না, 'মুক্তিফল তোমার কাজ নয়!' তুই বুঝি মনে করিস, ঐ ভাঙা বাঁশের মই দিয়া উঠা যাইবে? তো পদচাপে মই ভাঙিয়া যাইবে, দ্বিতীয়ত. ঝড়বৃষ্টি শিলাপাত হইতে রক্ষা পাইব উপায়?

নবীন। পাথরের সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিতে গেলে তুমি বৃষ্টি জলে ভিজিবে না?

প্রবীণ। আমি কি তোমার মতো অর্বাচীন যে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া হইব? আমি প্রতি ধাপ সিঁড়ির নিচে এক-একটি চোরকুঠরি নির্মাণ করিব, আর হইলে—চপলা-চমক দেখিলে তাহার ভিতর লুকাইব।

ধীমান। নিজের সুখসুবিধা সম্বন্ধে অত ভাবিতে গেলে পরমায়ু শেষ হইবে, অথচ কিছুই হইবে না।

প্রবীণ। পথে বিস্তর কাঁটা আছে, তাহা জানো দাদা?

ধীমান। কাঁটার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। কেবল কাঁটা কেন, পথ অরণ্যসঙ্কুল পথে সর্প-বৃশ্চিকও আছে, আরও ঊর্ধ্বে শিলাবৃষ্টি বজ্রপাতও আছে, সে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

নবীন। না, ওসব কিছু মানিব না—বাইকাটা অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে ভয় কিসের? (প্রবীণের হাত ধরিয়া) দাদা চল!

প্রবীণ। (স্বগত) আমার সাহসে কুলায় না। (প্রকাশ্যে) তোমার মইটা তো মজবুত নয়, উঠিতে পা কাঁপে যে!

নবীন। বাইকাটা অস্ত্রে ভর দিয়া—কোনোমতে লম্ফ দিয়া একবার উঠিলে হইল।

প্রবীণ। বাইকাটা অস্ত্রখানি লুকাইয়া সঙ্গে রাখিতে হইবে, নচেৎ প্রহরী দৈত্যগণ দেখিলে খেপিবে। আর আমার আবেদনলিপিগুলিও অবশ্য সঙ্গে থাকিবে।

• সাধারণত মুসলমানেরা ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না, কিন্তু জিনপরী ও দৈত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস প্রবাদ আছে, জিনেরা মানবদের সহিত অল্পবিস্তর হিংসা করে এবং স্থলবিশেষে আবার জিন নরনারীর সহিত বিবাহও করিয়া থাকে! আর দৈত্যদানবও জিনজাতির সহিত শত্রুতা রাখে মতে দৈত্য ভীমকায় ও অত্যন্ত বলবান হইয়াও জিনের অধীন থাকে। প্রায় শুনা যায়—জিন দৈত্য প্রজা; অমুক পরীর অন্তঃপুরের রক্ষক প্রহরী দৈত্য ইত্যাদি। যাহা হউক, সামান্য সুবিধা পাইলেই দৈত্য জিনকে সার্থক বিরক্ত করিয়া বৈরসাধন করে।

নবীন। তোমার আবেদন লিখিতে যতগুলি মানকচুপত্র ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা [illegible] গাড়ির বোঝা—সেগুলি বহিয়া লওয়া অসম্ভব। না দাদা, আবেদন নিবেদনে [illegible]

প্রবীণ। না নবীন, ঐ শুন মেঘগর্জন। অর্ধপথে ভিজিতে হইবে।

নবীন। ভিজিলেই ক্ষতি কী?

(তিনজন মায়াবী গায়কের প্রবেশ)

১ম গায়ক। আপনারা কোথায় চলিয়াছেন?

প্রবীণ। নবীন কৈলাস গিরিচূড়া আরোহণ করিতে চাহে।

নবীন। (জনান্তিকে) প্রবীণ কেমন চতুর! তাড়াতাড়ি সে নবীনের যাত্রার কথা বলিল, নিজেও যে ঐ পথের পথিক সে-কথা আপাতত গোপন রহিল!

২য় গায়ক। ঐ মই দিয়া উঠিবেন? আপনারা বাতুল নাকি? আর বাইকাটা অস্ত্রে [illegible] ওটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

৩য় গায়ক। চলুন, আমরা পথ দেখাইয়া দিব, সুন্দর পাকারাস্তা আছে।

প্রবীণ। চল নবীন, উহারা পথ প্রদর্শন করিবেন।

নবীন। না, আমরা অপরের সাহায্য গ্রহণ করিব না।

প্রবীণ। শুনিয়াছি মায়াপুররাজ্যে মুরলীধরের বসতি, তিনি নাকি কল্পদ্রুমবৎ সকলের [illegible] পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১ম গায়ক। হাঁ, যদি বলেন তো আমরা আপনাদিগকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই। [illegible] স্বহস্তে আপনাদিগকে মুক্তিফল দান করিবেন।

প্রবীণ। কি বল নবীন, চলিবে না?

নবীন। অমন অনেক কল্পতরু দাতার প্রশংসা শুনা গিয়াছে। কিন্তু ভিক্ষায় আর [illegible] দের কুলাইবে না।

প্রবীণ। নিশ্চয় জানিও, মুরলীধরের ন্যায় উদার হৃদয় কল্পদ্রুম দ্বিতীয় আর নাই।

নবীন। আমার তো বিশ্বাস হয় না।

[দূরাগত বংশীধ্বনি]

তোমরা কী চাও নরনারী—
সব দিতে পারে বংশীধারী।
এস গো প্রবীণ! (দূরে যা নবীন,
তোর মুখ দেখিতে না পারি)—
এস বন্ধু নিকটে আমারি।
মুক্তিফল ছার— কত ফুল আর
কোটি ফলে আমি অধিকারী।
রবি যদি চাও, দিব আমি তা' ও,
তারা-হার পাইতে পারি!
চাহিও না কিন্তু পূর্ণিমার ইন্দু,
শুধু সুধাকর দিতে নারি।
এস গো প্রবীণ, তাড়াতাড়ি।

প্রবীণ। আর কী দেখ নবীন, চল ইঁহাদের সঙ্গে—

নবীন। আমি যাইব না, মুরলীধর তো আমাকে ডাকেন নাই। তিনি ডাকিলেও

যাইতাম না।

'তবে তুমি থাক, আমি চলিলাম'—এই বলিয়া প্রবীণ নবীনকে তাড়িয়া দে জিনগণ তাঁহাকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরো গভীর অরণ্যে লইয়া গে তাঁহারা প্রবীণকে বুঝাইলেন যে, প্রবীণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে মুক্তি স সবই পাবেন। এমনকি জিনেরা তাঁহাকে সমস্ত পৃথিবীর রাজত্ব দান করিবেন

প্রবীণ। (আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে) আমাকে সসাগরা ধরণীর রাজা করিবেন, ব অধমের প্রতি আপনাদের এত অনুগ্রহ!

মায়াবী। শুধু সসাগরা বসুন্ধরা কেন, সৌরজগতের রাজত্বগুলিও ক্রমে ক্র আপনাকে দিব। শনির সাম্রাজ্য অতি বিশাল, তাহা জয় করিতে আমাদিগকে কি অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে।

প্রবীণ। আহা! আপনাদের দয়ার বালাই লইয়া মরি! আমাকে একেবারে রাজা করিয়া আপাতত মন্ত্রী করিলেও চরিতার্থ হইব।

নেপথ্যে। দাদা, দাদা! কোথায় তুমি! আর কত দূর গেলে দাদার দেখা পাই?

প্রবীণ। একি জ্বালা! নবীন এখানেও আসিল! আমি কিন্তু সাড়া দিব না।

ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া প্রবীণ ত্বরিত পদে একটি গুহার ভিতর লুকাইলেন। নবীন সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া প্রবীণকে দেখিলেন।

নবীন। একি দাদা! তুমি এ-সুড়ঙ্গের ভিতর কেন? এদিকে আমি তোমাকে খুঁজি খুঁজিয়া ক্লান্ত হইলাম! আমি দিবানিশি পথ চলিয়া তিনদিন পরে অদ্য তোমার ধ পাইলাম।

প্রবীণ। তুমি মই দিয়া কৈলাসে উঠিতে চাও, তাহা আমি পারিব না।

নবীন। বেশ দাদা! তুমি যাহাই বল, আমি তাহাই মানিব। চল, তোমারই প চল, আমি কেবল আমার স্বদেশী বাইকাটা অস্ত্রখানি সঙ্গে লইব।

প্রবীণ। (স্বগত) তুমি যাহাই বল, আমি আর তোমাকে আমার সঙ্গে কিছুতে মিশিতে দিব না। (প্রকাশ্যে) তোমারই দোষে আমার সিঁড়ি প্রস্তুত হইল না, নতু এতদিন আমি অর্ধপথে উঠিতাম।

নবীন। এখনই কী হইয়াছে, সিঁড়ি প্রস্তুত কর না? কোথায় ইট, পাথার, সব লই চল।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবীণ চক্ষুলজ্জার দায়ে নবীনকে সঙ্গে লইয়া পর্বতগা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দুই-একধাপ সোপান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। সেই স মায়াবী গায়কেরা অদূরে থাকিয়া সমস্বরে মধুর রাগে গাহিতে আরম্ভ করিলেন—

ঐ শুন ঐ শুন মুরলী বাজে—
করিছ সময় নাশ বৃথা কী কাজে?

• প্রবাদ আছে, জিনেরা নাকি সহজে মানবের বশীভূত হইতে চাহে না, তাই সাধারণত লো সাধনায় তাহারা নানাপ্রকারে বাধা দিয়া থাকে; কখনো সাধককে বিকট মূর্তি দেখাইয়া ভয় প্রদ করে, কখনো বা ছলে কৌশলে ভুলাইয়া বনে লইয়া গিয়া সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে। বা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ব্যাসদেবও বড় দুঃখে তাঁহার আরাধ্য দেবীকে বলিয়াছেন—

'শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া,
কী গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া!'

দুর্গাদেবী কী চমৎকার কৌশলে ব্যাসদেবকে 'গর্দভ বারাণসী' বরদান করিয়াছেন।

আবেদন লয়ে হাতে
চল আমাদের সাথে,
লয়ে যাব তোমা বংশীধরের কাছে।
এস ত্বরা ঐ শুন মুরলী বাজে!

প্রবীণ উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে শুনিতে আত্মবিস্মৃত হইলেন; ভাবিলেন, নবীন সঙ্গে থাকিলে পশ্চাৎপদ হওয়া অসম্ভব, মুরলীধরের নিকট কদমতলায় যাওয়া অসম্ভব, অথচ নবীন আমাকে ছাড়ে না—কী করি! নবীনকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিই।

অতঃপর প্রবীণ সোপান প্রস্তুত করা ছাড়িয়া নবীনকে সবলে ধাক্কা দিলেন—ধাক্কার বেগ সম্বরণ করিতে না-পারায় নিজেও তাহার সঙ্গে পড়িলেন, উভয়ে গড়াইতে গড়াইতে নিম্ন উপত্যকায় আসিয়া পড়িলেন।

অনন্তর উভয়ে গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিন্দুক করতালি দিয়া হাসিতে লাগিলেন। ধীমান হাসিলেন না, অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রবীণ নবীনকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'তোমারই দোষে আমরা পড়িলাম।'

নবীন। বাহ্ দাদা! তুমি ধাক্কা দিলে!

প্রবীণ। আমি কী জানি? তুমিই আমাকে লইয়া পড়িলে।

নবীন। বেশ বল, উলটা চোর কোটাল শাসে! তুমি ধাক্কা না দিলে আমরা পড়িতাম কিরূপে?

প্রবীণ। যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে তোমাকে ধাক্কা দিলে আমি পড়িতাম কেন?

নবীন। যেহেতু তুমি ধাক্কার ধাক্কা সামালাইতে পার নাই।

প্রবীণ। সমস্ত জগৎ সাক্ষী—কেহ বলুক তো যে-ব্যক্তি ধাক্কা দেয়, সে কি পড়ে?

নবীন। সমস্ত জগৎ তোমার চাতুরী বুঝিয়াছে। এক্ষেত্রে তুমিই আমাদের পতনের কারণ।

প্রবীণ। চুপ কর মিথ্যাবাদী! আমি আজ ২২/২৩ বৎসর হইতে সোপান রচনা করিয়া আসিতেছি, আর আজ কিনা আমিই পতনের কারণ হইলাম।

নবীন। অকথ্য ভাষায় গালি দিলেই কেহ বড় হয় না। কে মিথ্যাবাদী, তাহাও সকলে বিদিত আছে।

প্রবীণ। তুমি আমার ২৩ বৎসরের পরিশ্রম মাটি করিলে। হায়! আজীবন মায়ের সেবা করিয়া আসিলাম—সমুদয় যত্ন পরিশ্রমের ফল এক-মুহূর্তে ব্যর্থ হইল! চল তো মায়ের নিকট—

নবীন। চল না! মাও বুঝেন, তাঁহার কোন্ পুত্র কেমন।

৭

কাঙ্গালিনী ঘোরতর পীড়িতা—জীবনের আশা প্রায় আর নাই। শ্রীমতী ও সুমতি মাতৃসেবায় নিযুক্তা। মাতার কঙ্কালসার দেহ ও পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া এক-একবার শ্রীমতী নিরাশ হইয়া কাঁদেন, আবার ভাবেন, এই দাদা মুক্তিফলসহ আসিলেন আর কী! পাতাটি নড়িলে, সামান্য কিছু শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে শ্রীমতী আশায় উৎফুল্ল হন—এই বুঝি দাদা আসিলেন!

দুরাশায় উদগ্রীব হইয়া সুমতি পৌষমাসের সুদীর্ঘ রজনী জাগিয়া [illegible] করিয়াছেন।

প্রভাত হইল, অদ্য নবীন, প্রবীণ প্রভৃতি মুক্তিফলসহ গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। আহা! আজি কী সুখের দিন! সুমতি জননীর মুখহাত ধোয়াইয়া, ছিন্নবস্ত্র পরিবর্তন করাইয়া জীর্ণ কুটিরের দ্বারদেশে বসিয়া স্থিরনয়নে পথপানে চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

অপর ভ্রাতাদের আগমনের পূর্বে নিন্দুক দ্রুতপদে আসিয়া ভগিনীদিগকে বলিলেন প্রবীণ মুক্তিফল লইয়া আসিয়াছেন।

সুমতি। (ব্যাকুলভাবে) আমার তো বিশ্বাস হয় না—আমার মাথার দিব্য, সত্য বল দাদা!

নিন্দুক। তোমার চুলের দিব্য, সত্য বলিতেছি। ধীমানদাদা মায়ের জন্য স্বর্ণথাল ভরিয়া খাবার আনিতেছেন, আর নবীন মায়ের জন্য বারাণসী শাড়ি আনিতেছে।

শ্রীমতী। আহা! সকলে শীঘ্র আসুন! এদিকে মা আমার রোগেশোকে জীবন্মৃত হইয়াছেন। হায়! দাদারা কতক্ষণে আসিবেন।

নিন্দুক। অধীর হইও না, শ্রীমতী, ধৈর্যধারণ কর। ঐ দেখ প্রবীণ আসিতেছে।

প্রবীণকে দূর হইতে দেখিয়া প্রথম সুমতি দৌড়িয়া আসিলেন, 'কই দাদা, ফল কই?'

প্রবীণ। তোমার সাধের কনিষ্ঠ নবীনকে জিজ্ঞাসা কর। নবীন না-গেলে আমি আনিতে পারিতাম।

নবীন। তবে এতদিন আনো নাই কেন?

সুমতি। শেষে তোমরা কী করিয়া আসিলে? এদিকে মায়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ফল না আনিয়া তোমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলে কোন্ মুখে!

প্রবীণ। আমাকে অনুযোগ করা বৃথা—সব দোষ নবীনের।

নবীন। ধর্ম জানেন, সব দোষ দাদার। তিনি আমাকে ফেলিয়া দিলেন—

প্রবীণ। পতনের জন্য নবীন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল—

নবীন। দাদা পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমাকে ধাক্কা দিবেন—

প্রবীণ। মিথ্যা বলিয়া আর পাপভার বাড়াও কেন?

নবীন। তুমি বৃদ্ধবয়সে এত মিথ্যা—

ধীমান। মাতার জীবন সঙ্কটাপন্ন, এই কি তোমাদের কলহের সময়? অকৃতকার্য হইয়া আসিয়াছ, এই লজ্জাই কি যথেষ্ট নয়?।

কাঙ্গালিনী। (স্বগত) ধরণী! দ্বিধা হও—তোমার বক্ষে মুখ লুকাই। (প্রকাশ্যে) শ্রীমতী মা, তোর ভাইয়েরা বড় শ্রান্ত, তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে বল।

সুমতি। নিন্দুক দাদা, তুমি ধর্মত বল দেখি, কে কাহাকে ধাক্কা দিয়াছে?

নিন্দুক। কী বলিব বোন—মোহন বাঁশির স্বরে যার মন তিষ্ঠে না ঘরে, যাহাকে মায়াবিদ্যাবিশারদ মুরলীধর আপনপার্শ্বে কদম্বতরুর ছায়াতলে ডাকিতেছেন, সে-ই অন্যমনস্কভাবে ধাক্কা দিয়াছে। ফলে উভয়ে পতিত হইয়াছে।

নবীন। নিন্দুক দাদা এইবার সত্য বলিয়াছেন।

প্রবীণ। তবে আমি কি এতদিন কেবল অরণ্যেরোদন করিলাম?

শ্রীমতী। দাদা! তুমি ২৩ বছর অরণ্যেরোদন করিয়াছ, অথবা কী করিয়াছ, তাহা

আমরা জানি না আমরা তোমার কার্যফল দেখিতে চাই। মায়ের কুটিরের [illegible]
কৈলাস গিরির সীমা পর্যন্ত যে-বিজন অরণ্য ছিল, তাহা পরিষ্কার করিয়াছে কে?

ধীমান। সে ঘোর বন নবীন ২৩ বৎসর ধরিয়া পরিষ্কার করিয়াছে

নিন্দুক। প্রবীণ তো সেই বিজন বনে বসিয়া কেবল আবেদন লিখিতেছিল

সুমতি। যাহা হউক, তোমরা এখন থাম। ঐ দেখ, মায়ের কুটিরে [illegible]
লাগিয়াছে, চল শীঘ্র নিবাইতে যাই।

কাঙ্গালিনী ভূমিশয্যায় পড়িয়া নীরবে নয়নজলে মাটি ভিজাইতেছিলেন লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমানে তাঁহার হৃদয় শতধা হইয়াছিল। সুমতি তাঁহাকে ধরিয়া দাহ্যমান কুটিরের বাহির করিতে চেষ্টা করায় তিনি বলিলেন, 'কে ও সুমতি? আর আমাকে টানাটানি করিস কেন মা?—পুড়িয়া মরিতে দে!'

শ্রীমতী। না, মা! আমরা থাকিতে তুমি মরিবে, ইহা অসহ্য।

কাঙ্গালিনী। অভাগীর মেয়ে! তোরা জানিস, মুক্তিফল না পাইলে আমি শাপমুক্ত হইব না, তবে আমাকে শুধু প্রাণে বাঁচাইতে রাখিয়া বৃথা কষ্ট দিস কেন?

নবীন। মাগো! তুমি রাগ করিও না। আমি মুক্তিফল আনিতে আবার চেষ্টা করিব। এবার কৈলাসে উঠিতে পারি নাই, পুনরায় আরোহণের চেষ্টা করিব।

শ্রীমতী ও সুমতি। এবার আমরাও সঙ্গে যাইব, পথ কি বড় দুর্গম?

নবীন। একেবারে দুর্গম নয়—কতকদূর মই দিয়া উঠা যাইতে পারে—

শ্রীমতী। বুঝিয়াছি—থাক, মইয়েরও প্রয়োজন নাই। চল নবীন শীঘ্র, আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

নিন্দুক। অবাক করিলে শ্রীমতী—নবীন তো তবু মই সংগ্রহ করিয়াছে তুমি তাহার উপরও নির্ভর কর না।

শ্রীমতী। কেন দাদা, আপনার পায়ের উপর নির্ভর করিব। পার্বত্য লতাগুল্ম ধরিয়া উঠিব—তাহাতে না কুলাইলে হামাগুড়ি দিয়া, বুকে ভর দিয়া—যে-কোনো প্রকারে হউক, উঠিব।

প্রবীণ। যেখানে পর্বত অত্যন্ত ঢালু সে-স্থান অতিক্রম করিবে কিরূপে?

নিন্দুক। সেখানে উভয় ভগিনী উঠিতে চেষ্টা করিব!

সুমতি। এত বিদ্রূপ কর কেন দাদা? কোনো উপায় তো হবেই। এ-জগতে কিছুই স্থায়ী নয়, হয় আরোগ্য নয় মৃত্যু—কিন্তু রোগ চিরকাল থাকে না।

ধীমান। কেবল কথায় কাজ নাই, এখন সকলে মিলিয়া আবার যাত্রা করি।

প্রবীণ। হাঁ চল—দুই-একখানা আবেদন সঙ্গে লইয়া আমিও আসিতেছি।

শ্রীমতী। আমি এই চুল খুলিলাম—আমরা সকলে জননীকে মুক্তিফল আনিয়া দিতে না-পারা পর্যন্ত আমি আর চুল বাঁধিব না! হে প্রভু পরমেশ্বর! সহায় হও!

কাঙ্গালিনী। এ কী দেখি, আমার কোমলাঙ্গী ননীরপুতুল দুহিতা ক্ষুদ্রস্বার্থে—সাংসারিক ভোগবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত হইল। শ্রীমতী ও সুমতি যখন তাহাদের ভ্রাতাদের কার্যে যোগদান করিতে বদ্ধপরিকর হইল, তখন আমার ভরসা হয় সম্ভবত আমার সুদীর্ঘ নিরাশযামিনী প্রভাত হইবে!—এতদিনে হয়তো আমার সন্তানসন্ততি মুক্তিফল আনিতে পারিবে। —আশা মায়াবিনী।

সৃষ্টিতত্ত্ব

সেদিন গল্প করিতে করিতে আমাদের অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল : জিন, পরী, ভূত। কেহ শ্বেতশ্মশ্রু জিনকে নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন, কেহ দেখিয়াছেন সিতবসনা পরী এবং কেহ ভূতকে মাছভাজা খাইতে দেখিয়াছেন! মিস ননীবালা দত্ত ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমি একটা সোফায় বসিয়াছিলাম। জাহেদা বেগম আমাকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া ল্যাম্প নিবাইয়া আপন কামরায় চলিয়া গেলেন। শিরীন বেগম আপন কামরায় না গিয়া আমারই পর্যঙ্কে শয়ন করিলেন। ল্যাম্প নিবিল, কিন্তু এককোণে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে গৃহসজ্জা বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বলিতে পারি না, আমি তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিলাম কিনা, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমি জাগ্রত ছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভয়ানক একটা শব্দ হইল, তাহাতে ননীবালা চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'কিসের শব্দ হল।'

'বলতে পারি না। কিছুদিন হল আমি সংবাদপত্রে ছবি দেখেছিলুম, বিলেতে একটা এরোপ্লেন এঞ্জিন ভেঙে কোনো বাড়ির ছাদের উপর পড়ে গিয়েছিল, আর এরোপ্লেনের আরোহী ভাঙা ছাদ গলিয়ে অক্ষত শরীরে একেবারে কামরার ভিতর পালঙ্কের উপর গিয়ে পড়েছিল! আমাদের এ উলু-খাওয়া ভাঙা ছাদের উপরও কারুর এরোপ্লেন-ট্রেন এসে পড়েনি তো? জানালা খুলে দেখুন না?'

মিসেস বীণাপাণি ঘোষ যথাবিধি পর্যাঙ্কে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, 'বিছানা ছেড়ে উঠুন শিগ্‌গির!'

আমার কথা শেষ হইতে না-হইতে তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কী? আমি ননীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

ননী বলিলেন, 'যে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, জানালা খুলব কী করে? তাছাড়া আমার ভয় করে। আপনারা যত সব ভূতের গল্প বলেছেন!'

'আচ্ছা, আমি জানালা খুলে দেখছি',—বলিয়া বীণা গবাক্ষ খুলিয়া ফেলিলেন।

বাতায়ন খুলিবামাত্র এক-ঝাপটা বাতাস ও বৃষ্টিজল আসিয়া আমাদের ভিজাইয়া দিল—তৎসঙ্গেই মস্ত এক উলকাপিণ্ড প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমাদের তো চক্ষু স্থির। গোলমাল শুনিয়া শিরীন জাগিয়া উঠিয়াছেন, অন্য কক্ষ হইতে আফসার দুলহিন দৌড়িয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও নির্বাক! আমরা চিৎকার করিয়া বাড়িময় সকলকে জাগাইয়া তুলিব, না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সেই অগ্নিস্তূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অগ্নিস্তূপ ক্রমে এক জ্যোতির্ময় মনুষ্যমূর্তিতে পরিণত হইল। আমার মনে হইল, এই মহাপুরুষকে কোথায় যেন কখন দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কারণ, মানুষের মুখ চিনিয়া রাখা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য অনেক সময় অপ্রস্তুতও হইতে হইয়াছে। আগন্তুক অগ্নিমূর্তি বলিলেন—

'বৎসে! তোমরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছ? আমি অভয় দিতেছি, কোনো ভয় নাই।'

শিরীন। সেদিন আমাদের এখানে একটা টিকটিকি বোবাফকির সাজিয়া আসিয়াছিল, আপনি তাহাদেরই কেহ নাকি?

ননী। আপনারা মওলানা সাহেবের বাড়ির কাছে বাসা নিয়াছেন, তাই ওর টিকটিকির উপদ্রব।

অগ্নিমূর্তি। (সতেজে) না, মা! আমি সেসব কিছু নই। আমি বিশ্বস্রষ্টা ত্বষ্টি।

'ত্বষ্টি' নাম শ্রবণ করিবামাত্র বীণা ও ননী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তখন আমারও স্মরণ হইল, কলিকাতায় 'নারীসৃষ্টি' লিখিবার সময় আমি এই জ্যোতির্ময় মহাত্মার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। আমরা সসম্মানে ত্বষ্টিদেবকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। বীণা বলিলেন, 'অসময়ে নরলোকে পদধূলি (বর্ষাকালে 'ধূলি' না বলিয়া 'পদকর্দম' বলিতে হয়!) দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?'

ত্বষ্টি। কারণ? (আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) কারণ ঐ মেয়েটা।

আমি সবিস্ময়ে, সভয়ে, সবিনয়ে বলিলাম, 'মহাত্মা বলেন কী! আমি?

ত্বষ্টি। হ্যাঁ, তুমি! তুমি আমার নারীসৃজনের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গোলমাল বাধাইয়াছ। তা, তোমারই বা দোষ দিব কী; কতক দোষ 'সওগাত' আফিসের।

ননী। সে কীরকম?

ত্বষ্টি। তাহা এই : ইনি 'নারীসৃষ্টি' লেখাটা 'সওগাত' নামক মাসিক পত্রিকায় দিয়াছিলেন। সে-সময় সম্পাদক মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না; অফিসের গণ্ডমূর্খগুলা ইঁহার লিখিত পাদটীকা দুইটি বাদ দিয়া তাহা প্রকাশ করে। পাদটীকা-অভাবে রচনাটি স্থলবিশেষে দুর্বোধ হইয়াছে। সুতরাং সুবোধ পাঠকেরা উহা সম্পূর্ণ বুঝিতে না-পারায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না! তখন তাঁহারা বলেন, 'ডাক ব্যাটা ত্বষ্টিকে, ইহার কোথায় কী ভ্রান্তি আছে, বুঝাইয়া দিয়া যাউক!' তাই দেখ না, সময় নাই, অসময় নাই, একটা প্ল্যানচেট পাইলেই ইহারা আমাকে সুরলোক হইতে ডাকিয়া আনিয়া বিরক্ত করে। অদ্যকার ঘটনা শুন; কতকগুলি যুবক 'সত্যগ্রহ' ব্রত লইয়া মাতিয়াছে। রাজপুরুষেরা বলেন, 'সত্যগ্রহ' ছাড়িয়া 'মিথ্যাগ্রহ' গ্রহণ কর।' কিন্তু উহারা অবোধ বালক, হিতোপদেশ মানে না। 'মিথ্যাগ্রহণ' না-করার ফলে পুলিশের তাড়াহুড়া খাইয়া দুইজন উকিলবাবু পলাইয়া রাঁচি আসিয়াছেন। তোমাদের বাড়ির অদূরেই তাঁহাদের বাসা। কিন্তু জানো, 'চোর না শুনে ধরম কাহিনী।' রাঁচির এই অবিরাম বৃষ্টি কাদাতেও তাঁহাদের শান্তি নাই। তাঁহারা আদাজল খাইয়া, দিনের বেলা বালি কাঁকর কাদা জল মাখিয়া 'মিথ্যাগ্রহণ'-এর বিরুদ্ধে সত্যপ্রচার প্রয়াসে লেকচার দিয়া দিয়া দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া বেড়ান; আর রাত্রিকালে দুই বন্ধুতে প্ল্যানচেট লইয়া দেবলোকের শান্তিভঙ্গ করেন। রাত্রি ১২টা-১টা পর্যন্ত উকিলবাবুদের ডাকাডাকির জ্বালায় অস্থির থাকিতে হয়। তোমাদের নরলোকে যাহোক শান্তিনেশে যুবকদের শান্তি দিবার জন্য সি.আই.ডি. আছে : কিন্তু সুরলোকে তাহাদের জব্দ করিবার জন্য কোনো ব্যবস্থাই নাই। তাই দেখ না, এতরাত্রে উকিলবাবুদের বাসা হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় আমার বাষ্পরথ তোমাদের ছাদের কলসে আটকাইয়া পড়ে, আমিও সশব্দে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছি। বৃদ্ধ বয়সে বৃষ্টিভেজা সহ্য হয় না, তাই যেমনই বীরবালা বীণা বাতায়ন খুলিয়াছেন, অমনি আমি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছি।

ননী। কিন্তু দেব! বাতায়নে লোহার গরাদ আছে যে!

ত্বষ্টি। আরে, রাখ তোমার উইদষ্ট গরাদ। বিশেষত আমাকে আটকায় কে?

ননী। দেব। আপনি কী কী উপাদানে পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিতে বড় কৌতূহল হয়।

ত্বস্তি। না, বাছা! আমার সময় নাই। এখন আমি আসি। তোমরা ঘুমাও।

কিন্তু আমরা সকলেই তাঁহাকে বেশ করিয়া ধরিয়া বসিলাম। পুরুষসৃষ্টির রহস্য শুনিয়া তাঁহাকে কিছুতেই যাইতে দিব না।

শিরীন। আপনি অনেকক্ষণ বৃষ্টিজলে ভিজিয়াছেন, এক-পেয়ালা গরম চা খাবেন আপনি গল্প বলুন, আমি চা প্রস্তুত করিতে বলি। (অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন) মারো—

ত্বস্তি। (সচকিতে) সে কী? কাহাকে মারিবে?

শিরীন হাস্য সম্বরণ করিতে না-পারিয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন

ত্বস্তি। উনি লাঠিয়াল ডাকিতে গেলেন না কি?

বীণা। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) না, তিনি চাকরানি ডাকিতে গেলেন। উহার চাকরানির নাম 'মারো'!* আপনি এখন গল্প বলুন। ঐ দেখুন, শিরীন বেগম সাহেবাও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ত্বস্তি। তোমরা নেহাত ছাড়িবে না, তবে আর কী করা। তোমরা মেয়েরাও দেখিতেছি উকিলবাবুদের চেয়ে কম নও! তাঁহারা তবু আইনকানুনের দোহাই মানেন, তোমরা কিছুই মানো না। শুনিলে তো তোমাদের মনে থাকিবে না। তবে ননী, তুমি কাগজকলম লইয়া বস। আমি বলিয়া যাই, তুমি তাড়াতাড়ি লিখ। দেখ, খুব দ্রুতগতি লিখিবে।

ননী যতক্ষণ কলম দোয়াত অন্বেষণ করিতেছিলেন, ততক্ষণে বীণা কাগজ পেন্সিল হস্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেব! সময়ের অল্পতার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি বলুন, আমি শর্টহ্যান্ডে লিখিয়া ফেলিতেছি। আমি মিনিটে শর্টহ্যান্ডের তিনশত শব্দ লিখিতে পারি।' ইহা শুনিয়া মহাত্মা ত্বস্তি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলেন, বীণা লিখেন, আর আমরা নীরবে শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, বেচারা ত্বস্তিদেব নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। তিনি কখনোবা হাই তুলিয়া ঘুমে ঢুলুঢুলু নয়নে অনুচ্চস্বরে বলিতেছিলেন; আবার কখনো চক্ষুমর্দন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিলেন এবং বীণা ঠিক লিখিয়াছেন কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। ভুল থাকিলে তাহা কাটিয়া পুনরায় লিখাইতেছিলেন। তিনি যে নিদ্রা-কাতর নহেন, এতখানি বাগাড়ম্বর দ্বারা যেন তাহাই প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন! একবার তিনি গর্জনস্বরে বলিলেন—

'জানো বৎসেগণ।! কন্যা রচনার সময় আমার হস্তে কোনো বস্তুই ছিল না, সুতরাং আমাকে কোনো দ্রব্যের গন্ধ, কোনো বস্তুর স্বাদ এবং কোনো পদার্থের বাষ্প মাত্র সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পুরুষ নির্মাণের সময় আমাকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় নাই। আমার ভাণ্ডারে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ছিল—হস্ত প্রসারণ করিলে যাহা হাতে

---

* বেচারি চাকরানির সুন্দর 'মরিয়ম' নামটি বিকৃত হইয়া 'মারো'তে পরিণত হইয়াছে। আমি বেহার অঞ্চলে থাকাকালীন অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কতিপয় মহিলার নাম শ্রবণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। যথা—'হাশো', 'লাতো', 'দল্লু', 'উল্লু', 'জুব্বা' ইত্যাদি। নামগুলির স্বরূপ না দেখাইলে উহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পাঠিকা ভগিনীও ত্বস্তিদেবের মতো ভীত হইতে পারেন। তবে শুনুন, 'হাশমত আরা', 'লতিফুন্নেসা', 'দৌলতন্নেছা' 'অলিউন্নেসা' এবং 'জোবেদা'।

থাকবাছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। যথা—দন্ত নির্মাণের সময় সর্পের বিষদন্ত আনুল লইয়াছি, হস্ত পদ নখ প্রস্তুত করিতে শার্দূলের সমস্ত নখর লইয়াছি, মস্তিষ্কের কোষসমূহ (cells) পূর্ণ করিবার সময় গর্দভের গোটা মস্তিষ্কটাই ব্যবহার করিয়াছি নারী সৃজনকালে আমি শুধু অনলের উত্তাপ লইয়াছিলাম। পুরুষের বেলায় একেবারে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়াছি। বাছা! তুমি তাহাই লিখ।'

বীণা লিখিলেন (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

তৃপ্তি। বৎসে! মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর, রমণীর বেলায় আমি তুহিনের শৈত্যটুকু মাত্র লইয়াছিলাম, পুরুষের বেলায় তুষার খণ্ড, —এমনকি আস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা ব্যবহার করিয়াছি। তাহা কি তুমি লিখিয়াছ, বীণা?

বীণা কাগজ দেখাইলেন— (তুষার, কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

শিরীন। আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস (গন্ধকশধল্র) এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা যে পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই আমরা পুরুষের নিজের ভাষায়ই বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাই যে এখনই—

'জ্বলিল ললাট-বহ্নি প্রদীপ্ত শিখায়
বহ্নিময় হৈল সেই শূন্যব্যাপী দেশ,
ধরিল সংহার-মূর্তি, রুদ্র ব্যোমকেশ
গর্জিয়া সংহার-শূল করিলা ধারণ।'

আবার পর-মুহূর্তেই (অবশ্য 'পার্বতী বাক্যেতে রুদ্র ত্যজি উগ্রভাব')—

'সহাস্য বদনে ইন্দ্রে সম্ভাষি কহিলা
আ-খণ্ডল, বৃত্রবধ অনুচিত মম।'

শ্রুতলিপি শেষ হইলে মহাত্মা তৃপ্তি বলিলেন, 'দেখ বাছা! তুমি ইহা সহজভাষায় লিখিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবে, যেন একটি শব্দ, এমনকি একটি ছেদ পর্যন্তও এদিক-ওদিক না হয়।'

বীণা। তাহাই হইবে, আপনি ভাবিবেন না। আমি বেশ সাবধানে লিখিব। নচেৎ প্রভুর অত্যন্ত কষ্ট হইবে—এখন তো কেবল পুরুষেরা ডাকাডাকি করে, তখন মেয়েরাও জ্বালাতন করিয়া মারিবে!

অতঃপর তৃপ্তিদেব বিদায় হইলে সকলে যে যাহার শয্যা আশ্রয় করিলেন। কিন্তু আমি শয়ন করিতে যাইবার সময় কী জানি কিরূপে পড়িয়া গেলাম। সেই পতনে আমি চমকিয়া উঠিলাম। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি, আমি তখনো সোফায় বসিয়া গৃহকোণে মোমবাতিটা মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর শিরীন ও বীণা মড়ার সহিত বাজি রাখিয়া ঘুমাইতেছেন! দূরাগত কুক্কুটধ্বনি শ্রবণে বুঝিলাম, রজনীর অবসান হইয়াছে। তবে কি এতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?

অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলি

সুফিয়া কামাল

রসনা-পূজা

ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে ভিন্নভিন্ন বস্তু পূজা করিয়া থাকে। কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ সূর্যের উপাসক কেহ জড়পুত্তলিকা উপাসক, ইত্যাদি। কেবল নিষ্ঠাবান মুসলমান দ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো বস্তুর উপাসনা করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ রসনাপূজা করিয়া থাকেন। যদি আমি ইহাদিগকে 'রসনা-পরস্ত' (রসনা-উপাসক) বলি, তবে বোধহয় অন্যায় হইবে না এবং নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সমাজে 'বৃতপরস্তি'-ও যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।১ যেহেতু তাহাদের অনুকরণে অনেকগুলি পীরের নাম শুনা যায়—এক-একপ্রকার বিপদে এক-একজন পীরের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত 'নজর ও নেয়াজ' দিতে হয়! যাহাকে ক্ষিপ্ত কুকুর দংশন করে, সে বেচারা 'কোত্তা (কুকুর) পীরের দরগাহে' (মন্দিরে?) গিয়া 'নজর' (মানী) মানস করিয়া আইসে! হঠাৎ কোনো বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কোনো এক (হঠাৎ) পীরের' উদ্দেশে রোজা রাখা হয়!! সম্ভবত পা খোঁড়া হইলে 'লঙ্গর পীরের দরগাহে' 'শিন্নী' লইয়া যাইতে হয়!!২

ঈশ্বর ব্যতীত অন্যকোনো বস্তুর পূজা করিলে আত্মার অধঃপতন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকার অবনতিও হয়। আমাদের দুর্গতি ও অবনতির কারণ অনেকে একেকরূপে অনুমান করেন, আমার বোধহয় রসনাপূজা ইহার অন্যতম কারণ। মেয়েরা ঐ পূজার আয়োজনে সমস্ত সময় ব্যয় করেন। অন্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহাদের অবসর থাকে না। সমস্ত দিন ও অর্ধরাত্রি তো তাঁহাদের রন্ধনের চিন্তায়ই অতিবাহিত হয়, পরে নিদ্রায় স্বপ্ন দেখেন—'যাহ্! মোরব্বার সিরা (চিনির রস) জ্বলিয়া গেল!'

আমরা আহার ব্যতীত জীবনধারণ করিতে পারি না, সত্য। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। মনে রাখিবেন—ভোজনের উদ্দেশ্য শরীরের পুষ্টিসাধন। কিন্তু সচরাচর আমাদের খাদ্যসামগ্রী যেরূপ হয়, তাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন হওয়া দূরে থাকুক, বরং মান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া শরীরের ধ্বংস সাধন হয়। আমাদের ভক্ষ্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—খাদ্যগুলি কেবল রসনাদেবের তৃপ্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয়। জনৈক ডাক্তার একদা কোনো ধনী মুসলমান কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : 'আপনার বাড়ি একদিন খেয়ে আমি তিনদিন খেতে পারি নাই। এরকম খাবার আপনারা সর্বদাই খেয়ে থাকেন, কাজেই আপনাদের অসুখ ছাড়ে না।' ডাক্তারবাবু ঠিক বলিয়াছেন। আবার মজা এই যে, চিররুগ্‌ণ জীবন বহন করাই ভদ্রের লক্ষণ! কুশল প্রশ্ন করিলে কেহ সহসা উত্তর দেয় না, 'সম্পূর্ণ ভালো আছি।' কিন্তু চিররুগ্‌ণ অবস্থা রমণী-সুলভ কোমলতা ('নাজাকৎ!') বলিয়া প্রশংসিত হয়। কেবল চাষা-স্ত্রীলোকেরা সবল সুস্থ থাকে।

আহারের অত্যাচার যে কেবল ধনবানের গৃহে হয়, তাহা নহে, দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরেও সুযোগ অনুসারে রসনাপূজা হইয়া থাকে।

১. যদ্যপি তর্কের অনুরোধে এবং গলাবাজির জোরে অস্বীকার করা হইয়া থাকে, সে ভিন্ন কথা!
২. হিন্দুদের নৈবেদ্যের সহিত উক্ত প্রকার 'নজর ও নেয়াজে'র সাদৃশ্য নাই কি?

শুনিতে পাওয়া যায়, কোনো ডেপুটি কালেক্টর নাকি বলিতেন, '[illegible] মুসলমান আমি বেশ চিনি। যদি কাহারও মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারি, তার বাড়ি গেলে আর চিনিতে বাকি থাকে না। কুলীনের লক্ষণ এই—

'কাহারও বাড়ি গেলে দেখিবে, চালের উপর খড় নাই, ঘরখানার চারিদিক [illegible] বসিবার একটু স্থান নাই, মাথার উপর (চালে) মাকড়সার জাল ঝুলিতেছে—এই [illegible] হীন অবস্থা। কিন্তু জলখাবার সময় দেখিবে অতি উৎকৃষ্ট পারাটা, কোর্মা, কাবাব [illegible] –আমাদের সাতদিনের খাবার খরচ তাঁহার একদিনে ব্যয় হয়।'

যদি উক্ত কালেক্টর মহাশয় কখনো কাহার বহির্বাটী দেখিয়া কুলীন চিনিতে পারেন, তবে তিনি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামীর কৌলীন্য সম্ব তাঁহার সন্দেহ থাকিবে না! কিন্তু সে ডেপুটি কালেক্টরের ভাগ্যে অন্তঃপুর দর্শন অসম্ভব। অতএব আমরা একটু নমুনা দেখাই,—

প্রথমে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হউন—দ্বারদেশে পচা কাদা; হংস, কুক্কট ইত্যা সেই (পচা ফেনমিশ্রিত) কাদা ঘাঁটিতেছে, তাহার দুর্গন্ধে আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয় ত্রাহি করিবে।[৩] কিন্তু পশ্চাৎপদ হইবেন না—কোনোমতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি কেহ বাটনা বাটিতেছে, কেহ কুটনা কুটিতেছে, কেহ কেওড়া বা গোলাপ জাফরান ভিজাইতেছে ইত্যাদি। এখানকার সুগন্ধ এতই আনন্দপ্রদ (inviting) ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িতে ইচ্ছা হইবে! পারাটা, সমোসা ভাজার সৌরভ কী চমৎক বলিহারি যাই। এখানকার সৌন্দর্য দেখিলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে যায়, তৃপ্তি হয়, আ তো দূরে থাকুক। এখানে দাঁড়াইয়া আপনার বোধ হইবে–'আহ্ মরি! মরি! এ সৌরভরাজ্যে আসিয়া পড়িলাম!—এ স্বর্গ না কি!!'

আমাদের খাদ্য সম্বন্ধীয় পরিচ্ছন্নতা সময় সময় সীমা লঙ্ঘন করে। যেমন, ম এত ধোওয়া হয় যে, তাহার বলকারক গুণ থাকে না। গরম জলে মাংস ধুইলে মা আর থাকে কী? অন্যান্য বস্তুও প্রায় প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিষ্কার করা হয়। এইপ্র খাদ্য দ্বারা কেবল জড় রসনার পূজা হয়।

আমরা কেবলই রসনাপূজায় সময় কাটাই। আধ্যাত্মিক জীবন আমাদের বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জ্ঞানচর্চা তো আমরা জানিই না। সামান্য সূচিকর্ম রন্ধন-প্রণালী কেবল আমাদের শিক্ষণীয়। ৫০০ রকমের আচার চাটনি, ৪০০ প্র মোরব্বা প্রস্তুত করিতে জানিলেই সুগৃহিণী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারা যায়। র রাঁধুনিরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং মরণে বাবুর্চি-জীবনলীলা সাঙ্গ করে। আমাদের সু চরম সীমা সচরাচর উপাদেয় খাদ্য রাঁধিতে শিক্ষা করা ও বিবিধ অলঙ্কার ব্যবহার পর্যন্ত!

এইরূপ অত্যধিক রসনাপূজায় বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়। এস্থলে রসনাপূজার ত্রিবিধ অনিষ্টের উল্লেখ করা গেল :(১) ব্যয়বাহুল্য বা অপব্যয়, (২) শ্রমবাহুল্য (৩) স্বাস্থ্য নষ্ট। ময়দার পারাটা ও মশলা-বহুল কোর্মা সহজে পরিপাক হয় না, দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া অসম্ভব। কারণ ঐ দুষ্পাচ্য খাদ্যের পরিপাক আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলিকে অতিরিক্ত শক্তিপ্রয়োগ করিতে হয়। ঐ শক্তি যোগাইতে শরীরের অন্যান্য যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়ে। তাদৃশ অখাদ্য রাঁধিতে গৃহিণীদের অন সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করা হয়।

৩. অভ্যাসের কৃপায় গৃহিণী বা গৃহস্বামীর নিকট ঐ দুর্গন্ধ অপ্রিয়বোধ হয় না।

...রোগ-পুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আহার করিতে গেলে রসনাপূজা ত্যাগ
...তে হইবে। প্রতিদিন অত ছাইভস্ম না-খাইয়া কেবল যথানিয়মে উপযুক্ত পরিমাণে
...না খাইলেই আহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। মোহনভোগ ফিরনি ইত্যাদির পরিবর্তে
...বা দুধ খাওয়া যুক্তিসিদ্ধ।
...ক্ত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিতে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে। ব্যয়ও পরিমিত
...ঐ অবসরটুকু অন্য সৎকার্যে ব্যয় হইতে পারে।
...আমরা রসনাপূজা করিতে বসিয়া অধঃপাতে গিয়াছি। দিল্লির সম্রাটগণ
...রাস্রোতে ভাসিয়াই দিল্লি হারাইয়াছেন। এ-স্থলে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ
...করিল। দিল্লিশ্বর মোহাম্মদ শাহের সহিত নাদির শাহ যুদ্ধ করিতেছিলেন। মোহাম্মদ
...ছিলেন বিলাসী—সর্বদা নানাবিধ সুস্বাদু বস্তু দ্বারা রসনাপূজা করিতেন, তাই পরাস্ত
...সিংহাসন হারাইলেন, আর নাদির শাহ রসনা-উপাসক ছিলেন না—কেবল শুষ্ক
...ও কাবাব খাইতেন, তাই বিজয়ী হইয়া মোহাম্মদ শাহের মুকুট ও সিংহাসন
...পারিলেন। দেখুন তো শুষ্ক রুটির গুণ ক্ষমতা কত! অতীতের পুরাতন কথা
...দিলে, বর্তমানে রুশ-জাপান যুদ্ধেও তাই দেখা যায়। রুশীয়দের অপেক্ষা
...দিগের ভোজনের আড়ম্বর কম, অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষুদ্র জাপান অমিত তেজের
...দিতেছে। তাই দেখুন, কেবল আহার করিলে বলবৃদ্ধি হয় না। খাদ্য পরিপাক
...লাভ, নচেৎ না।
...আহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না, বরং পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অনেকে ইহা পরীক্ষা করিয়া
...ছেন। কোনো কোনো রোগে অন্য চিকিৎসা না করিয়া কেবল আহার পরিমিত
...রোগীকে আরোগ্যলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে : 'যা না
...বৈদ্যে, তা করে পৈথ্যে।' রসনা সংযত করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।
...কটা বচন আছে : 'মৃত্যুর পূর্বে মরিয়া থাক।' এ-মরণের অর্থ ত্যাগ স্বীকার,
...া ইত্যাদি। মানুষ ত্যাগ না করিলে মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমেক্রমে সংযম
...ন করিলে হঠাৎ বৈরাগ্য শিক্ষা হয় না। একলাফে কে গাছের আগায় উঠিতে
...ক্রমশ এক-পা দুই-পা করিয়া উঠিতে হয়।
...জা (উপবাস) ব্রত আমাদিগকে সংযম শিক্ষা দিয়া থাকে। এই রোজা
...মে পালন করিলে সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণ হয়।
...মাত্রেরই সংযম শিক্ষা আবশ্যক। এইজন্য দেখা যায়, 'পৃথিবীর প্রায় সমুদয়
...ধর্মের মধ্যে কোনো-না-কোনো প্রকারের উপবাসব্রত বর্তমান রহিয়াছে।'[৪]
...মানুষ জানে না, কী প্রকার খাদ্য কী পরিমাণে খাওয়া উচিত।
...ক্ষেপের বিষয়, রমজান মাসে আমাদের খাদ্যসামগ্রীর ধুমধাম সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি
...সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য হইতে বিরত থাকিয়া নির্মল চিত্তে উপাসনা করা তো
...কূক, 'ইফতারি' (সান্ধ্যাকালীন খাবার) প্রস্তুত করিতেই দিন শেষ হয়। কোথায়
...সংযত হইবে, না আরও রসনার সেবা বৃদ্ধি পায়। প্রকারান্তরে রোজার নাম
...রসনাপূজার মহা-আড়ম্বর হয়। পূর্বে মহাপুরুষেরা সামান্য ফলমূল বা শাকরুটি
...সন্ধ্যায় জলপান (ইফতার) করিতেন। রাত্রিতে কী খাইবেন, দিবাভাগে খোদাকে
...সে-চিন্তাও করিতেন না। ধর্মগুরু মোহাম্মদ (দ.) নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বরের ধ্যান

৪ এই প্রবন্ধ রচনাকালে মৌলভী মকবুল আলী বি. এ. প্রণীত 'রোজা' নামক পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশটুকু 'রোজা' হইতে গৃহীত।

করিবার আশায় সমস্ত দিন পানভোজন ত্যাগ করিয়া নির্জন স্থানে থাকি... এদেশের মুসলমানেরা তাঁহার উপযুক্ত (?) শিষ্য কিনা,—'ধর্ম ধর্ম' বলিয়া ... গগনমেদিনী কাঁপাইয়া তোলেন, তাই বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণে ও সন্ধ্যা... আয়োজনে সমস্তদিন ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকেন!! ইহাতে রোজার উদ্দেশ্য ... সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

যত প্রকার উপবাসব্রত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আমাদের রোজাব্রতই শ্রেষ্ঠ... যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি প্রতিপালিত হয়। ইহা দ্বারা যত উপকার ... তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝে।

খ্রিস্টীয় রোজার (গুড ফ্রাইডের) সময় ধর্মপরায়ণ খ্রিস্টানগণ শুধু পানভোজ... ব্যতীত পার্থিব সমুদয় কার্য হইতে বিরত থাকেন।[৫] সে-সময় তাঁহারা কাহাকে... নিমন্ত্রণ করেন না এবং নিজেরাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না, নূতন কাপড় পরেন ন... একান্ত প্রয়োজন না হইলে কোনো বস্তু ক্রয়বিক্রয় করেন না—এক-কথায়, সকলপ্রকা... আমোদ, আহ্লাদ, ভোগ, বিলাস ত্যাগ করেন। ঐ ত্যাগ স্বীকার করায় যে-অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা ঈশ্বরের তুষ্টির জন্য সদ্ব্যয় করেন! আমাদের 'এতেকাফ'-এর[৬] সহিত ... ব্রতের কিছু সাদৃশ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, 'এতেকাফের' সময় মসজিদে ব... মুসলমানের ক্রয়বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। (মৌলভী নইমুদ্দীন প্রণীত 'জোদ্দ... মসায়েল' দ্রষ্টব্য।) আর খ্রিস্টানদের তাহা নিষিদ্ধ। (তবে দায়ে পড়িলে ভিন্ন কথা... এবং আমাদের 'ফেতরা' দানের সময়ও ঘরের (অতিরিক্ত) পয়সা বাহির করিতে হয়... মহাত্মা মোহাম্মদ (দ.) হয়তো বলিয়াছিলেন যে, রোজার সময় আহার পরিমিত করা... যে-খরচ বাঁচিয়া যায়, তাহা দ্বারা আপন দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য কর ('ফেতরা... দাও), কিন্তু বঙ্গীয় মোসলেমগণ তাঁহার ভক্তশিষ্য, তাই উল্টা চাল চালেন, তাঁহা... উপদেশের বিপরীত কার্য করেন।[৭]

সুতরাং অন্যান্য মাসের ব্যয় অপেক্ষা রমজান মাসে তাঁহাদের ব্যয় বৃদ্ধি হয়... আমার এই কথা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নাই... পাঠিকাগণ আপন আপন জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিবেন—অন্যান্য মাসের তুলনা... রমজান শরিফের খরচ বেশি কিনা।[৮]

হিন্দুগণ সময় সময় ভীম (বা নির্জলা) একাদশী করিয়া থাকে তাহাতে তাহাদে... স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবারা প্রায় দীর্ঘজীবী হয় এ-কথা কেহ অস্বীকার করেন ন... বিধবাদের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ এই যে, তাঁহারা রসনা সংযত রাখেন—এক সন্ধ্... আহার করেন।

পাদরিগণ বলিয়া থাকেন যে, মুসলমানের রোজায় স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যতীত কোনে... ফললাভ হয় না, এ-কথাটি যুক্তিহীন। প্রমাণ—হিন্দু বিধবার স্বাস্থ্য। তবে 'মুসলমান... নামধেয় জীবগণ যদি রোজার সব নিয়মগুলি যথাবিধি পালন না করে, সে দো...

---

৫. অনেকে উপবাসও করিয়া থাকেন। কেহ সর্বদাই প্রতি শুক্রবারে উপবাস করেন।

৬. এতেকাফ' ব্রত বিশেষ। ধর্মোদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব কার্য হইতে বির... থাকা।

৭ ঈদ-উৎসবের দিন যে দান করা হয়, তাহাকে 'ফেতরা' বলে।

৮ রোজা ধর্মের পাঁচটি প্রধান অঙ্গের (কলেমা, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্ব) এক অঙ্গ। রোজা যাহারা ঐরূপে পালন করেন, অথচ 'ইসলাম' 'ইসলাম' বলিয়া শতকণ্ঠে চিৎ... করেন, তাঁহারা ' মুসলমানই বটে। তাঁহাদের নামাজও সেইরূপ!

...দের রোজার নহে। সকলপ্রকার সাংসারিক বস্তু ত্যাগ করাই প্রকৃত রোজা' ...বা 'ধর্ম হয় না করলে উপবাস।') কিন্তু সচরাচর মুসলমানেরা এই পবিত্র রোজার ...ভয়ানক অবমাননা করিয়া থাকেন!!

আমাদিগকে মুসলমান বলিলেও 'মুসলমান' শব্দটির অপমান করা হয়। সুতরাং ...মাদের ভণ্ড রোজার সম্বন্ধে যে পাদরীগণ বলেন 'ঘদর্টণশণর ধ্র থটধভণঢ ঠহ তর্ট্রধভথ. ধ্র ...হ তর্ণর্ট্রধভথ' (অর্থাৎ, দিনে রোজার দ্বারা যে পুণ্য হয়, তাহা রাত্রির অতিভোজনে ...য়) তাহা ঠিক। আমাদের রোজার উদ্দেশ্য কেবল রসনাপূজার মহা ঘটা!

কবে মুসলমান 'মানুষ' হইবে? রসনাপূজা ছাড়িয়া ঈশ্বরপূজা করিতে শিখিবে? ...তের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভালোমন্দ বুঝিয়াছে, কেবল ইহাদের ...নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখন তো আমাদের আব্রু সে 'জরির মসনদ', তাকিয়া বা ...ফেননিভ শুভ্র কুসুমকোমল 'শাহানা বিছানা' নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন্ সুখে? ...দের অবস্থা এখন এইপ্রকার—'ঝোপ্‌ড়ী মেঁ রহনা ও মহলকা খাব দেখ্‌না!' অর্থাৎ, ...মানে কুড়েঘরে থাকি এবং অতীতের অট্টালিকার স্বপ্ন দেখি!! একজন কবি ...য়াছেন :

I slept and dreamt life was beauty,
I woke and found life is duty.

...ই তো জীবনটা খেলা নহে।

পরিশেষে বলি, জীবনধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় ...বনধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমজানশরিফে আপনারা ...ধান থাকিবেন।

...ক
...র্ষ, ৮ম সংখ্যা,
...ত্রায়ণ, ১৩১১ সন।

ঈদ-সম্মিলন

সংবৎসর পরে আবার ঈদ আসিল। আজি আনন্দের দিন উৎসবের দিন সমগ্র মোসলেম সমাজের সম্মিলনের দিন!

সারা বৎসরের অবসাদের পর আজি উৎসাহের দিন আসিয়াছে। যেমন বসন্তসমাগমে মানবের গৃহরূপ কাননে অসংখ্য প্রীতিকুসুম ফুটিয়াছে! বালকবালিকার দল তো মনে করে, ঈদ না-জানি কী! আর তাহাদের অভিভাবকেরাও কি আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহাদের আনন্দকোলাহলে যোগদান করেন না? আজিকার এ আনন্দপ্রবাহে ধনীর অট্টালিকা ও দরিদ্রের দীনতম কুটির একইভাবে প্লাবিত।

ঈদের নামাজের মূলে কী মহান ঐক্য লক্ষিত হয়! সহস্র সহস্র লোক এক কাবাশরিফ লক্ষ্য করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নামাজে দাঁড়াইয়াছে;—সকলে একই সঙ্গে ওঠে, একই সঙ্গে বসে—একই সঙ্গে সহস্রাধিক মস্তক প্রভুর উদ্দেশে আনত হয়। তারপর? তারপর, নামাজ সমাপ্ত হইলে পর সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। কী সুন্দর ভ্রাতৃভাব! যাহারা প্রতিবেশীর প্রতি এতদিন কোনোরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিত, তাহারা অজি সে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছে। আজি মসজিদে ছোটবড় ধনীনির্ধন একযোগে সম্মিলিত হইয়াছে—এ-দৃশ্য কী চমৎকার! এ-দৃশ্য দেখিলে চক্ষু পবিত্র হয়; ক্ষুদ্র স্বার্থ, নীচ ঈর্ষা লজ্জায় দূরীভূত হয়; নিরানন্দ, মৃতপ্রায় প্রাণে সঞ্জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়। জাপানে একতা আছে সত্য, কিন্তু আমাদের এ-অপূর্ব একতার তুলনা কোথায়? বৎসরের শুভদিনে এমন শুভসম্মিলন কোথায়?

কালের আবর্তনে এইরূপ আরো অনেক ঈদ আসিয়াছে; আরো অনেকবার মোসলেম ভ্রাতৃগণ এমনই ঈদের নামাজে যোগ দিয়াছেন, আরো অনেক বৎসর ঈদের নবীন চন্দ্র তাঁহাদের প্রাণে এমনই করিয়া ঐক্য জাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দিবাশেষে ঈদরবির অস্ত গমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃভাবও ম্লান হইয়াছে। যেন প্রতি বৎসর ঐক্যরূপ অমূল্য রত্নটি আমরা মসজিদ-প্রাঙ্গণে রাখিয়া আসি! অথবা একতা যেন মসজিদ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকে! বলি, এ বৎসর এ বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগেও কি আমাদের ঈদ-সম্মিলন দিবাশেষে বিস্মৃতির গর্ভের বিলীন হইবে? না, এবার আমরা একতা সযত্নে রক্ষা করিব।

একতা মহাশক্তি, একতা আমাদের ধর্মের মূল—আমাদের সমুদয় ধর্মকর্মেই ঐক্য নিহিত আছে। জানি না, কোন্ দস্যু (আমাদিগকে অজ্ঞান-তিমির নিশীথে নিদ্রিত পাইয়া) আমাদের মহামূল্য একতানিধি অপহরণ করিয়াছে। জানি না, কাহার অভিশাপে আমরা অভিশপ্ত হইয়াছি। তাই এখন আমরা সহোদরের সহিত মল্লযুদ্ধ করি, সহোদরের সহিত হিংসা করি, পুত্রকন্যার অমঙ্গল কামনা করি। আমাদের ঘরে ঘরে আত্মকলহ লাগিয়া আছে। যাহাদের গৃহে পিতাপুত্রে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, তাহারা সমস্ত সমাজটিকে 'আপন' ভাবিতে পারিবে কিরূপে?

ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ-যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নবআশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য

ক্ষুদ্রস্বার্থ পদদলিত হউক। বলিয়াছি তো, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।

আর এক-কথা। এমন শুভদিনে আমরা আমাদের হিন্দুভ্রাতৃবৃন্দকে ভুলিয়া থাকি কেন? ঈদের দিন হিন্দুভ্রাতৃগণ আমাদের সহিত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ আশা কি দুরাশা? সমুদয় বঙ্গবাসী একই বঙ্গের সন্তান নহেন কি? অন্ধকার অমানিশার অবসানে যেমন তরুণ অরুণ আইসে, তদ্রূপ আমাদের এখানে অভিশাপের পর এখন আশীর্বাদ আসুক; ভ্রাতৃবিরোধের স্থানে এখন পবিত্র একতা বিদ্যমান থাকুক। আমীন!

আবার বলি, আজি কী সুখের দিন—আশীর্বাদ ও সুসংবাদ লইয়া শুভ ঈদ আসিয়াছে!!

নবনূর
৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা,
পৌষ, ১৩১২ সন।

সিসেম ফাঁক

আলিবাবার নিকট দস্যুদের গুপ্ত ধনাগারে সন্ধান পাইয়া কাসেম তথায় গেল। 'সিসেম ফাঁক' বলিবামাত্র ধনাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে বিস্মিত হইল। যক্ষের ধন দেখিয়া কাসেমের চক্ষুস্থির! সে দুইহস্তে প্রবাল, মুক্তা, মরকত, পদ্মরাগ, হীরক প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর সংগ্রহ করিতে লাগিল। থলিয়া ভরিয়া আশরফি লইল। সে জীবনে এত ধন কখনো দেখে নাই; আজি তাহার ভারি আনন্দ। সে বহুমূল্য সাটীন, কিঙ্খাপ ইত্যাদি রেশমিবস্ত্রে বস্তা বোঝাই করিয়া রাখিল। অদ্য সে উট্টপৃষ্ঠে ধন বহিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু সবই তো হইল; এখন বাহির হইবার উপায় কি? কাসেম তো মূলমন্ত্র—অর্থাৎ উক্ত চারি শব্দ : 'সিসেম ফাঁক', ভুলিয়া গিয়াছে! রাশিকৃত ধন লইয়া, ধনস্তূপে থাকিয়া, মণিমুক্তায় পরিবেষ্টিত হইয়া সে যে বন্দি—মুক্তির উপায় নাই। পরিশেষে কাসেম উন্মত্তের ন্যায় দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া 'গোধূম ফাঁক', 'উচ্ছে ফাঁক' ইত্যাদি অনেক শব্দ উচ্চারণ করিল; কিন্তু সকল বৃথা—আসল কথা, 'সিসেম ফাঁক' সে ভুলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার মুক্তির পথ রুদ্ধ।

আজি ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে—চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; নানাপ্রকার সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা কাসেমের ন্যায় 'অল ইন্ডিয়া মোসলেম লীগ' 'সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন', 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্স', অমুক ইনস্‌টিটিউশন, অমুক এসোসিয়েশন ইত্যাদি বহুবিদ ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদুহাস্য করিতাম। মনে মনে বলিতাম, ভ্রাতঃ! যাহাই করুন-না কেন—এ রত্নসম্ভার লইয়া সওগাত দিতে যাইবেন কোথায়? দ্বার যে বন্ধ। গৃহে যে গৃহিণী, ধর্মে যে সহধর্মিণী, ভাবী বংশধরের যে জননী, ভবিষ্যৎ আশাভরসার যে রক্ষয়িত্রী ও পালনকর্ত্রী তাহাকে সঙ্গে না লইলে আপনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবেন না! গরিবের কথা বাসি হইলে ফলে; আমার কথাও (১০/১২ বৎসরের) বাসি হইয়া ফলিয়াছে।

এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছে, স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই। তাই তাঁহারা আর শুধু ভ্রাতৃসমাজ লইয়াই ব্যস্ত নহেন। চতুর্দিকে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হইতেছে ও জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এখানে মুসলমান মহিলা সমিতি, সেখানে মহিলা ক্লাব প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান আমাদের শ্রুতিগোচর ও নয়নগোচর হইতেছে। এমনকি, গত বর্ষের 'অল ইন্ডিয়া এডুকেশনাল কনফারেন্সের' অধিবেশনে পরদানশীন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ভ্রাতৃগণ এখন ভগিনীদের চিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, 'না জাগিলে সব ভারতললনা' এ-ভারত আর জাগিবে না।

সওগাত
১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা,
অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

চাষার দুক্ষু

'ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরি, রে ভাই
পাছায় জোটে না ত্যানা।
বৌ-এর পৈছা বিকায় তবু
ছেইলা পায় না দানা।'

শুনিতে পাই, দেড়শত বৎসর পূর্বে ভারতবাসী অসভ্য বর্বর ছিল—এই দেড়শত বৎসর হইতে আমরা ক্রমশ সভ্য হইতে সভ্যতর হইতেছি। শিক্ষায়, সম্পদে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির সমকক্ষ হইতে চলিয়াছি। এখন আমাদের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য দেখিবার স্থান নাই।—সত্যই তো, এই যে অভ্রভেদী পাঁচতলা পাকাবাড়ি, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, স্টিমার, এরোপ্লেন, মোটর লরি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পোস্টাফিস, চিঠিপত্রের সুনিয়মিত ডেলিভারি, এখানে পাটকল, সেখানে চটকল, অট্টালিকার চূড়ায় বড় বড় ঘড়ি, সামান্য অসুখ হইলে আট-দশজন ডাক্তারে টেপে নাড়ি, চিকিৎসা, ঔষধ, অপারেশন, ইনজেকশন, ব্যবস্থাপত্রের ছড়াছড়ি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় জনতার হুড়াহুড়ি লেমলেন্ড জিঞ্জারেন্ড, বরফের গাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান, অনারেবলের গড়াগড়ি (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বাড়াবাড়ি)—এসব কি সভ্যতার নিদর্শন নহে? নিশ্চয়! যে বলে 'নহে', সে ডাহা নিমকহারাম।* কিন্তু ইহার অপর পৃষ্ঠাও আছে—কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়: চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। তবে আমার 'ধানভানিতে শিবের গান' কেন? অবশ্যই ইহার কারণ আছে। আমি যদি প্রথমেই পল্লিবাসী কৃষকের দুঃখদুর্দশার কান্না কাঁদিতে বসিতাম তবে কেহ চট করিয়া আমার চক্ষে আঙুল দিয়া দিয়া দেখাইতেন যে, আমাদের মোটরকার আছে, গ্রামোফোন আছে, ইত্যাদি। ভালোর ভাগ ছাড়িয়া কেবল মন্দের দিকটা দেখা কেন? সেইজন্য ভালোর দিকটা আগে দেখাইলাম। এখন মন্দের দিকে দেখা যাউক।

ঐ যে চটকল আর পাটকল;—এক-একটা জুট মিলের কর্মচারীগণ মাসিক ৫০০-৭০০ (পাঁচ কিংবা সাতশত) টাকা বেতন পাইয়া নবাবী হালে থাকে, নবাবী চাল চালে, কিন্তু সেই জুট (পাট) যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের অবস্থা এই যে—'পাছায় জোটে না ত্যানা!' ইহা ভাবিবার বিষয় নহে কি? আল্লাহতালা এত অবিচার কিরূপে সহ্য করিতেছেন?

সমগ্র ভারতের বিষয় ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। একটি চাউল পরীক্ষা করিলেই হাঁড়িভরা ভাতের অবস্থা জানা যায়। আমাদের বঙ্গভূমি সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা—তবু চাষার উদরে অন্ন নাই কেন? ইহার উত্তর শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন: 'ধান্য তার বসুন্ধরা যার।' তাই তো, অভাগা চাষা কে?

* অনেক আলেমের মতে লিবারপুলের লবণ হারাম। যে ব্যক্তি লিবারপুলের নুন খাইয়া সভ্যতার দেশ না মানে, সে 'নিমকহারাম' বই কী।

...কেবল 'ক্ষেতে ক্ষেতে পুইড়া মরিবে', হাল বহন করিবে, খাব পাড়ি করিবে। তাহা হইলে চাষার ঘরে যে 'মরাই-ভরা ধান ছিল, গোয়াল ভরা গরু উঠান ভরা মুরগি ছিল'--এ-কথার অর্থ কী? ইহা কি শুধুই কবির কল্পনা? না, কল্পনা নহে; কাব্য উপন্যাসও নহে; সত্য কথা। পূর্বে ওসব ছিল, এখন নাই এখন-যে আমরা সভ্য হইয়াছি! ইহাই কি সভ্যতা? সভ্যতা কী করিবে, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, তা বঙ্গীয় কৃষকের কথা কি?

আমি উপর্যুক্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, কারণ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ তো মাত্র সাত বৎসরের ঘটনা। ৫০ বৎসর পূর্বেও কি চাষার অবস্থা ভালো ছিল? দুই-একটি উদাহরণ দেখাই—বাল্যকালে শুনিতাম, টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, আর টাকায় ৪ সের ঘৃত। যখন টাকায় ৮ সের সরিষার তৈল ছিল, তখনকার একটা গল্প এই :

'কৃষক কন্যা জমিরনের মাথায় বেশ ঘন ও লম্বা চুল ছিল, তার মাথায় প্রায় আধ পোয়াটাক তেল লাগিত। সেইজন্য যেদিন জমিরন মাথা ঘষিত, সেদিন তাহার মা তাকে রাজবাড়ি লইয়া আসিত, আমরা তাকে তেল দিতাম।' হা অদৃষ্ট! যখন দুইগণ্ডা পয়সায় এক সের তৈল পাওয়া যাইত, তখনো জমিরনের মাতা কন্যার জন্য এক পয়সার তেল জুটাইতে পারিত না।

এই তো ৩০/৩৫ বৎসর পূর্বে বেহার অঞ্চলে* দুই সের খেসারি বিনিময়ে কৃষক-পত্নী কন্যা বিক্রয় করিত! পঁচিশ বৎসর পূর্বে উড়িষ্যার অন্তর্গত কণিকা রাজ্যের অবস্থা এই ছিল যে, কৃষকেরা 'পখাল' (পান্তা) ভাতের সহিত লবণ ব্যতীত অন্য কোনো উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিত না। শুঁটকি মাছ পরম উপাদেয় ব্যঞ্জন বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন সেখানে টাকায় ২৫/২৬ সের চাউল ছিল। সাত ভায়া নামক সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামের লোকেরা পখাল ভাতের সহিত লবণও জুটাইতে পারিত না তাহারা সমুদ্রজলে চাউল ধুইয়া ভাত রাধিয়া খাইত রংপুর জেলার কোনো কোনো গ্রামের কৃষক এত দরিদ্র যে, টাকায় ২৫ সের চাউল পাওয়া সত্ত্বেও ভাত না পাইয়া লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি ও পাটশাক, লাউশাক ইত্যাদি সিদ্ধ করিয়া খাইত! আর পরিধান করিত কি, শুনিবেন? পুরুষেরা বহুকষ্টে স্ত্রীলোকদের জন্য ৮ হাত কিম্বা ৯ হাত কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজেরা কৌপিন ধারণ করিত! শীতকালে দিবাভাগে মাঠে মাঠে রৌদ্রে যাপন করিত; রাত্রিকালে শীত অসহ্য বোধ হইলে মাঝে মাঝে উঠিয়া পাটখড়ি জ্বালিয়া আগুন পোহাইত। বিচালী (বা পোয়াল খড়) শয্যায় শয়ন করিত। অথচ এই রংপুর ধান্য ও পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। সুতরাং দেখা যায়, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সহিত চাষার দারিদ্রের সম্পর্ক অতি অল্পই। যখন টাকায় ২৫ সের চাউল ছিল, তখনো তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—এখন টাকায় ৩/৪ সের চাউল হওয়ায়ও তাহারা অর্ধানশনে থাকে :—

এ কঠোর মহীতে
চাষা এসেছে শুধু সহিতে;
আর মরমের ব্যথা লুকায়ে মরমে
জঠর-অনলে দহিতে!

---

* ১৬ বৎসর পূর্বে বেহার ও উড়িষ্যা বঙ্গের অঙ্গীভূত ছিল।

নাচিল, ত্রিশ বৎসর পূর্বের চিত্র তো এই, তবে 'মরাই ভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল, ঢাকা-মসলিন কাপড় ছিল' ইত্যাদি কোন সময়ের অবস্থা? মনে হয়, অন্তত শতাধিক বৎসর পূর্বের অবস্থা। যখন—

কৃষকরমণী স্বহস্তে চরকায় সূতা কাটিয়া বাড়িসুদ্ধ সকলের জন্য কাপড় প্রস্তুত করিত। আসাম এবং রংপুর জেলায় একপ্রকার রেশম হয়, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'এন্ডি' বলে। এন্ডি রেশমের পোকা প্রতিপালন ও তাহার গুটি হইতে সূতা কাটা অতি সহজসাধ্য কার্য। এই শিল্প তদ্দেশবাসিনী রমণীদের একচেটিয়া ছিল। তাহারা এ উহার বাড়ি দেখা করিতে যাইবার সময় টেকো হাতে লইয়া সূতা কাটিতে কাটিতে বেড়াইতে যাইত। এন্ডি কাপড় বেশ গরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইহা ফ্লানেল হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে, অথচ ফ্লানেল অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী। একখানি এন্ডি কাপড় অবাধে ৪০ (চল্লিশ) বৎসর টেকে। ৪/৫ খানি এন্ডি চাদর থাকিলে লেপ, কম্বল, কাঁথা—কিছুরই প্রয়োজন হয় না। ফল কথা, সেকালে রমণীগণ হাসিয়া-খেলিয়া বস্ত্রসমস্যা পূরণ করিত। সুতরাং তখন চাষা অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল ছিল না। তখন কিন্তু সে অসভ্য বর্বর ছিল। এখন তাহারা সভ্য হইয়াছে, তাই—

শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ
ঢেকে রাখে টাক্।

কিন্তু তাহাদের পেটে নাই ভাত। প্রশ্ন হইতে পারে সভ্যতার সহিত দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইবার কারণ কী? কারণ : যেহেতু আপা-সুলভ মূল্যে বিবিধ রঙ্গিন ও মিহি কাপড় পাওয়া যায়, তবে আর চরকা লইয়া ঘর্ঘর করিবে কেন? বিচিত্র বর্ণের জুট ফ্লানেল থাকিতে বর্ণহীন এন্ডি বস্ত্র ব্যবহার করিবে কেন? পূর্বে পল্লিবাসিনীগণ ক্ষার প্রস্তুত করিয়া কাপড় কাচিত; এখন তাহাদের কাপড় ধুইবার জন্য হয় ধোপার প্রয়োজন, নয় সোডা। চারি পয়সার সোডায় যে-কার্য সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য আর কষ্ট করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে কেন? এইরূপে বিলাসিতা শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিষে জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। ঐ যে 'পাছায় জোটে না ত্যানা' কিন্তু মাথায় ছাতা এবং সম্ভবত পায়ে জুতা আছে তো! 'বৌ-এর পৈছা বিকায়' কিন্তু তবু 'বেলোয়ারের চুড়ি' থাকে তো! মুটেমজুর ট্রাম না হইলে দুই পদ নড়িতে পারে না। প্রথম দৃষ্টিতে ট্রামের ভাড়া পাঁচটা পয়সা অতি সামান্য বোধ হয়—কিন্তু ঐ যাহ্, যাইতে-আসিতে দশপয়সা লাগিয়া গেল! এইরূপে দুইটি পয়সা, চারিপয়সা করিয়া—ধীরে ধীরে সর্বস্বহারা হইয়া পড়িতেছে।

নিজ অন্ন পর কর পণ্যে দিলে,
পরিবর্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে!

বিলাসিতা ওরফে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনুকরণপ্রিয়তা' নামক আর-একটা ভূত তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া আছে। তাহাদের আর্থিক অবস্থা সামান্য একটু সচ্ছল হইলেই তাহারা প্রতিবেশী বড়লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে। তখন চাষার বৌ-ঝির যাতায়াতের জন্য সওয়ারি চাই; ধান ভানিবার জন্য ভারানী চাই, ইত্যাদি। এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে :—

সর্ব অঙ্গেই ব্যথা,
ঔষধ দিব কোথা?

আর –

এ বহ্নির শত শিখা
কে করিবে গণনা?

অতঃপর শিবিকাহাহকগণ পালকি লইয়া ট্রামে যাতায়াত করিলেই সভ্যতার চূড়ান্ত হইবে!

আহার মজা দেখুন, আমরা তো সুসভ্য হইয়া এন্ডি কাপড় পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু ঐ এন্ডি কাপড়ই 'আসাম সিল্ক' নামে অভিহিত হইয়া কোট, প্যান্ট ও স্কার্ট রূপে ইউরোপীয় নরনারীদের বরঅঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল! ক্রমে পল্লিবাসিনীর সভ্যতার মাত্রাধিক্য হওয়ায় (অর্থাৎ আর এন্ডি পোকা প্রতিপালন করা হয় না বলিয়া) এখন আর হোয়াইট এ্যাওয়ে লেন্ডলর দোকানে 'আসাম সিল্ক' পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে, আসাম হইতে এন্ডি গুটি বিদেশে চালান যায়—তথা হইতে সূত্ররূপে আবার আসামে ফিরিয়া আইসে। এই তো সেদিনের কথা—বঙ্গের গভর্নর লর্ড কার্মাইকেল একখানি দেশী রেশমী রুমালের জন্মস্থানের অনুসন্ধান করেন, কেহই বলিতে পারিল না, সেরূপ রুমাল কোথায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু লর্ড কার্মাইকেল ইংরাজ বাচ্চা—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি রুমালটার জন্মভূমি আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। পূর্বে মুর্শিদাবাদের কোনো গ্রামে ঐরূপ রেশমী রুমাল প্রস্তুত হইত, এখন আর হয় না, কারণ সে গ্রামের লোকেরা সুসভ্য হইয়াছে! ফল কথা, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশী শিল্পসমূহ ক্রমশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সুখের বিষয়, সম্প্রতি পল্লিগ্রামের দুর্গতির প্রতি দেশবন্ধু নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কেবল দৃষ্টিপাতই যথেষ্ট নহে, চাষার দুক্ষু যাহাতে দূর হয়, সেজন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। আবার সেই 'মরাইভরা ধান, ঢাকা মসলিন' ইত্যাদি লাভ করিবার একমাত্র উপায় দেশী শিল্প—বিশেষত নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার। জেলায় জেলায় পাটের চাষ কম করিয়া তৎপরিবর্তে কার্পাসের চাষ প্রচুর পরিমাণে হওয়া চাই এবং চরকা ও এন্ডি সূতার প্রচলন বহুলপরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আসাম এবং রংপুরবাসিনী ললনাগণ এন্ডি পোকা প্রতিপালনে তৎপর হইলে সমগ্র বঙ্গদেশের বস্ত্র-ক্লেশ লাঘব হইবে। পল্লিগ্রামে সুশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হওয়া চাই। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আর ঘরে ঘরে চরকা ও টেকো হইলে চাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা
৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা,
বৈশাখ, ১৩২৮

এন্ডি শিল্প

ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা রত্ন-প্রসবিনী ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে নানা রেশম কীট জন্মিয়া থাকে, তাহা অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন। কোনোপ্রকার কীট কূলপত্র, কোনো কীট তুতপত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোষ বা গুটি দ্বারা বিবিধ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। অদ্য আমরা 'এন্ডি' নামক একপ্রকার রেশমের জন্ম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এন্ডি গুটি প্রধানত আসাম অঞ্চলে এবং রংপুর জেলায় আবাদ হয়।

এন্ডি গুটি আবাদ করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না, পরিশ্রমও নগণ্য বলিলেই হয়। ইহার খাদ্য এরন্ড পত্র। রংপুরে এরন্ড গাছের কোনো মূল্য নাই, যেখানে সেখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া জঙ্গল হয়। সম্ভবত 'এরন্ডপত্র' খায় বলিয়া এ রেশমের নাম 'এন্ডি' এরন্ডি', ক্রমে মধ্যস্থলের 'র' লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় ('এন্ডি') হইয়াছে। সুতরাং রংপুরে এন্ডি পোকার খাদ্য সংগ্রহ কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। সম্ভবত চারিআনার ডিম ক্রয় করিয়া যে পরিমাণ পোকার গুটি লাভ হয়, তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে একখানা ১১ হাত লম্বা ও ৪৪ উঞ্চি বহরের কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে। পাঁচিশ বৎসর পূর্বে এই প্রকার একখানা কাপড়ের মূল্য ৬ (ছয়) টাকা ছিল, এখন (যদি পাওয়া যায়) তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১৬/১৭ টাকা। যে গুলি সূতা পূর্বে এক পয়সায় পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য ছয় পয়সা! অতএব এন্ডি ধুতির মূল্য এখন ৩৬ হইলেও আশ্চর্যের বিষয় হইত না। ঠিক চারিআনার ডিমে ৫/৬ কাহন (অর্থাৎ একখানি ১১ হাতি ধুতির উপযোগী) গুটি লাভ হয় কিনা তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। কারণ এখন রংপুর জেলায় এন্ডি শিল্প বিলুপ্ত হওয়ায় আমি বহু চেষ্টা করিয়াও এ-সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি নাই। এন্ডি সম্বন্ধে বঙ্গের প্রসিদ্ধ লেখক কবিবর মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহেব লিখিয়াছেন :

'এন্ডির তুলির জন্য এখানে (রংপুরে) ২/৪ জনের কাছে অনুসন্ধান লইলাম, যাঁহারা সখের জন্যে পোকা পুষিয়া থাকেন, এমন ২/১ জনকেও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু দর জানা ব্যতীত আর কোনোই উপকার হইল না। ২০ গণ্ডা গুটির দাম ১৫ পয়সা মাত্র। এখানে কাহারো ঘরে উহা বিক্রয়ের জন্য মৌজুদ নাই।'

গুটির হিসাব এই প্রকার—২০ গণ্ডায় এক পণ; ১৬ পণে এককাহন। তাহা হইলে দেখা যায়, এককাহন গুটির মূল্য মাত্র চারিআনা। তিনকাহন গুটিতে যে পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা ৬ হাত লম্বা ও তিনহাত চওড়া একখানি চাদর প্রস্তুত হইতে পারে। এইরূপ একখানি চাদরের মূল্য পূর্বে ৩/৪ ছিল, এখন ৯ হইতে ১৩ পর্যন্ত।

আমাদের বাল্যকালে যখন এন্ডি কাপড় দেখিতাম, তখন শুনিতাম যে উহা ভদ্র লোকের ব্যবহার্য নহে; উহা কেবল চাষারা ব্যবহার করে। সুতরাং এন্ডি বস্ত্রকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিতাম। দরিদ্র চাষী স্ত্রীলোকেরাই এন্ডি পোকা পোষণ করিত, এন্ডি সূতা কাটিত এবং ইহার কাপড় ব্যবহার করিত। তাহারা স্বহস্তে কাপড়ের তানা পর্যন্ত করিয়া দিত, বাকি কার্য তন্তুবায়গণ করিত। আমরা তো এইরূপে লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিলাম, কিন্তু ইহার আদর-কদর করিল কাহারা? আমরা যাঁহাদের পদলেহন—না, তাঁহার ধূলি লেহন করিয়া ধন্য হই!

আসাম অঞ্চলে এই এন্ডি বস্ত্র বহুলপরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া আমাদের গুরু
দেড়শত বৎসরের গুরু ইউরোপীয়গণ ইহাকে 'আসাম সিল্ক' বলিয়া অতি
সহিত ইহা দ্বারা কোট, স্কার্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি
আমরাও হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডলর দোকান হইতে 'আসাম সিল্ক'-এর 'সুট' ক্রয় করিয়া
পরিধান করা ফ্যাশান মনে করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এই মূল্যবান শিল্পের
উন্নতির কোনো চেষ্টা করিলাম না। ক্রমে রংপুরের চাষা ও আসামের বন্য পাহাড়ী
স্ত্রীলোকেরা এন্ডি সূতা কাটা ভুলিয়া গেল। ফলে এখন আসাম হইতে গুটি বিদেশে
রপ্তানি হয়, তথা হইতে কলে সূতা প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসামে আইসে। স্থানীয়
তন্তুবায়গণ সেইসূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, পরে সেই 'আসাম সিল্ক' কলিকাতার কোনো
কোনো দোকানে বিক্রিত হয়। কিন্তু এখন সে অবস্থাও নাই, অর্থাৎ 'আসাম সিল্ক' আর
সহজে (অন্তত লেডলর দোকানে) পাওয়া যায় না! সংবাদপত্রে যে আসামী এন্ডির
বিজ্ঞাপন দেখা যায় তাহা খাঁটি বস্তু কিনা সন্দেহ। কারণ 'কাশী সিল্ক' নামে যে রেশমী
কাপড় বাজারে দেখা যায়, তাহা জার্মানী হইতে আমদানি করা খোঁটা মাল।

বর্তমানে স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে খদ্দর কাপড়ের কি মূল্য ছিল? তাহা কেবল পশ্চিম অঞ্চলের কোল, সাঁওতাল, জোলা, ধুনয়া প্রভৃতি লোকেরা ব্যবহার করিত। এখন তো খদ্দর আমাদের মাথায় উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগে খদ্দর, এন্ডি ও অপরাপর রেশমী বস্ত্রের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়। শুনিতেছি, একা খদ্দর আমাদের দেশের ষোলআনা অভাব পূরণ করিতে পারিবে না। তাহা হইলে ভারতের বিবিধ পট্টবস্ত্র অগ্রসর হইক। এন্ডি খদ্দরের তুলনায় কয়েকটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; ১. দীর্ঘকাল স্থায়ী (১০ বৎসর-এর পূর্বে ছিন্ন হইবার আশঙ্কা নাই); ২. খদ্দর অপেক্ষা ওজনে হালকা ৩. ফ্লানেলের ন্যায় গরম; ৪. ইহাতে কোনোপ্রকার ভেজালের আশঙ্কা নাই। খদ্দরের তানায় মিলের সূতা ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহাকে খাঁটি স্বদেশী বা হস্তনির্মিত বলা যায় না। তাহা ছাড়া 'জাপানী খদ্দর' না কী বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে! এন্ডি বস্ত্রের এসব বালাই নাই। আরও এক মজার কথা এই যে, যাবতীয় কাপড় নূতন অবস্থায় নয়নরঞ্জন চকচকে থাকে,—দুই-তিনবার ধুইলে বিশ্রী হয়, পুরাতন হইলে একেবারে অকর্মণ্য হয়। এন্ডি কাপড় ইহার বিপরীত—নূতন অবস্থায় বিশ্রী থাকে, প্রথম দর্শনে গ্রাহক বা ক্রেতাকে উহার প্রতি আকৃষ্ট করিবার মতো মনোহর গুণ উহার নাই। কিন্তু এ কাপড় যতই ধোয়া যায়, যতই পুরাতন হয়, ততই সুশ্রী এবং ব্যবহারের আরামদায়ক, মসৃণ ও দেখিতে চিকচিকে হয়।

দুঃখের বিষয়, রংপুরের এন্ডি শিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সময় সময় সংবাদপত্রে 'আসামজাত এন্ডি' কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেখা যায়, কিন্তু রংপুরের সহিত এন্ডির কোনো সম্পর্ক আছে বা ছিল বলিয়া কেহ জানে না। ঝাড়া ছয়মাস পর্যন্ত রংপুরের কতিপয় ভদ্রলোককে পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিয়া আমি মাত্র একটি গ্রাম আবিষ্কার করিয়াছি, যেখানে এখনো এন্ডি শিল্পের শেষ নিঃশ্বাসটুকু বহিতেছে। কিন্তু এইসবে ধন নীলমণি বেলকা গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও এখন এন্ডিপোকা পোষণ করে না। কেহ কেহ নিতান্ত দারিদ্র্য-পেষণে অনন্যোপায় হইলে পোকা পুষিয়া কিছু উপার্জনের চেষ্টা করে। এসময় এই নাতিশ্বাসটুকু রক্ষা না করিলে ইহারও অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

বেলকা হাই ইংলিশ স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় অতিশয় দেশহিতৈষী উৎসাহী লোক। তিনি ঐ স্কুলে ছাত্রদের জন্য একটি বয়ন ক্লাস খুলিয়াছেন। তাঁহার বয়নযন্ত্রে এন্ডি বস্ত্র বয়ন করা হয়। কিন্তু সূতার জন্য তাঁহাদিগকে অপরের ওপর নির্ভর করিতে

যায় বলিয়া বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সূতা লাভের সহজ উপায় স্কুলে পোকাপোষণ করা। কিন্তু উৎসাহ, সহায় ও সহকর্মীর অভাবে তিনি পোকা প্রতিপালন করিতে অক্ষম।

গুটি আবাদের প্রণালী এই :—

১. হাট হইতে কতকগুলি পোকার বীজ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। বীজ অর্থে কতকগুলি ডিমোলা প্রজাপতি ও ডিম বুঝিতে হইবে।
ডিমগুলি একখণ্ড পরিষ্কার নেকড়ায় বাঁধিয়া একটা ডালাতে শিকায় তুলিয়া রাখা হয়।

৩. সপ্তাহ বা দুই-সপ্তাহ কাল পরে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হইলে এরণ্ডের খুব কচি পাতা ছিঁড়িয়া খাইতে দিতে হইবে।

৪. প্রত্যহ পোকার বাসস্থান একবার পরিষ্কার করিতে হইবে; পিপীলিকা ও মাছি ইহার পরম শত্রু। সেজন্য কেহ কেহ নেটের ন্যায় পাতলাকাপড় দ্বারা পোকা ঢাকিয়া রাখে।

৫. দুই-চারিদিন কচিপাতা খাইয়া পোকাগুলি একটু বড় হয়, ইহার পর একদিন দেখিবেন, পোকাগুলি অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে, নড়েও না, পাতাও খায় না, তখন উহাদের মৃত জ্ঞানে ফেলিয়া দিবেন না! এই অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় 'পোকার ঘুম' বলে। এক অহোরাত্রি কিম্বা ততধিক কাল ঘুমাইবার পর পোকাগুলি একটু বড়পাতা অধিক পরিমাণে খাইতে আরম্ভ করে, এখন আর পাতা ছিঁড়িয়া দিতে হয় না।

৬. কিছুদিন পরে পোকা আবার ঘুমাইবে। এইরূপে পোকা তিন কিম্বা চারিবার ঘুমায়।

৭. শেষবারের ঘুমের পর পোকাগুলি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ ইঞ্চি হয়, রংটাও এরণ্ড পত্রের অনুরূপ হয়! এখন ইহারা রাক্ষসের মতো পাতা খাইতে আরম্ভ করে। সে-সময় ইহাদের পাতা খাওয়ার খস্‌খস্ শব্দ শোনা যায়। এখন বড় বড় পাতা গোছা বাঁধিয়া পোকার মাচার উপর একটা বাঁশের আড়ে ঝুলাইয়া দিতে হয়। দিনে তিন-চারিবার প্রচুরপরিমাণে পাতা দিতে হইবে এবং দুইবার পোকার বাসস্থান মাচা পরিষ্কার করিতে হইবে।

৮. ইহার ৩/৪ দিন পরেই পোকা গুটি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, এ অবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় 'জরা' বলে। পোকা জরিতে আরম্ভ করিলে আর খায় না, বরং পাতার গায়ে যেখানে-সেখানে জরিয়া থাকে।

৯. অতঃপর এই জরিত গুটির যেগুলি বীজের জন্য রাখা হইবে, সেইগুলি ব্যতীত অপর গুটিগুলিকে গরম ক্ষারের জলে ডুবাইয়া তাহাদের ভিতরকার পোকা মারিয়া ফেলা হয়। ঐরূপ না করিলে কিছুদিন পর পোকাগুলি গুটি কাটিয়া প্রজাপতি রূপে বাহির হইয়া পড়ে। তখন ঐ ছিদ্রযুক্ত গুটি হইতে ভালো সূতা হয় না—হইলেও সে-সূতা মজবুত হয় না।

১০. ক্ষারে সিদ্ধ করিবার পর গুটিগুলিকে উল্টাইয়া আভ্যন্তরীন মৃত কীট ফেলিয়া দিয়া ধুইয়া লওয়া হয়।

এক ফসল গুটি—অর্থাৎ ডিম ফুটা হইতে আরম্ভ করিয়া পোকা জরা পর্যন্ত

যাবতীয় ক্রিয়া ২/৩ মাসে সম্পন্ন হয়। তাহা হইলে দেখা যায়, ...
অন্তত তিন ফসল শুটি আবাদ করা যাইতে পারে।

১১. এন্ডি সূতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, চরকা দ্বারা তূলার সূতা এবং ...
রেশমী শুটি হইতে সূতা প্রস্তুত করার পদ্ধতি হইতে অনুরূপ। ক্ষারে ...
করা শুটির ৫টি হইতে ১০টি পর্যন্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কিম্বা একখণ্ড ক...
উপর পরে পরে সাজাইয়া রাখা হয়, ইহাকে তুলি বলে। এই তুলিগুলি...
রৌদ্রে শুকাইয়া তুলিয়া রাখা হয়। সূতা কাটিবার সময় ইচ্ছামতো ...
তিনটি তুলি শীতল জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া পরে একটি কাঠিতে এক...
তুলি রাখিয়া লোহার কিম্বা বাঁশের টোকোর সাহায্যে সূতা কাটা হয়...
টোকোর অগ্রভাগ দেখিতে কতকটা ক্রুশের সুচের মতো। টোকো...
নিম্নদিকে একটা পাথরের চাকতি। এই চাকতির উপর টোকোতে সূ...
জড়াইতে হয়। মাঝে মাঝে তুলিটা জলে ভিজাইয়া লইতে হয়। ব...
বামহস্তে তুলির কাঠি, দক্ষিণ হস্তে টেকো—বসিয়া, দাঁড়াইয়া হাঁ...
বেড়াইয়া—যেরূপে ইচ্ছা সূতা কাটা যায়।

পূর্বে পল্লিগ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বধূগণ সখ করিয়া স্বহস্তে অ...
সূক্ষ্ম সূতা কাটিতেন। সে এন্ডি সূতা, রেশমী সূতার সহিত প্রতিযোগি...
করিত। এখন আর সেদিন নাই, সুতরাং এখন কুলবালা দূরে থাক...
মধ্যবিত্তশ্রেণীর বউ-ঝিও আর টেকো হাতে লয় না।

পূর্বে নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলা পূজা করিবার সময় পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন, এব...
তাঁহাদের পুরোহিতের জন্য পৈতা আইসে জার্মানী হইতে! অধঃপতনের চূড়ান্ত আ...
কাহাকে বলে?

রংপুরে বামনডাঙ্গা স্টেশনের নিকটবর্তী যে দুই-একটি পল্লিতে এন্ডি শিল্পে...
নাভিশ্বাস বহিতেছে, তথাকার অধিবাসীগণ সামান্য চেষ্টা করিলে এই ব্যবসায় দ্ব...
বেশ দু-পয়সা অর্জন করিতে পারেন। এককানা ৬ হাত লম্বা ও ৩ হাত চওড়া চাদরে...
জন্য মূলধন ও লাভের একটা মোট হিসাব দেখুন :—

মূলধন—

১. তিনকাহন শুটি—	
২. সূতা কাটার মজুরি (৩ কাহন শুটিতে বোধহয় ১ সের সূতা হয়) একসের সূতার জন্য—	.৫০
৩. বেলকা বয়ন বিদ্যালয়ে বয়ন করাইলে, মজুরি	৩.০০
	৪.২৫
কিম্বা—	
১. হাট হইতে ১ সের সরু সূতা কিনিলে—	৫.০০
২. বয়ন ব্যয়—	৩.০০
	৮.০০
লাভ—	
ঐরূপ চাদরের মূল্য ন্যূনাধিক—	১২.০০

এত অল্প মূলধনে যে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়, তাহার প্রতিও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হইতে পারে? আর একটি উপায়ে বিনাপয়সা ও বিনাপরিশ্রমে এন্ডিগুটি লাভ করা যায়। তাহা এই : যদি কেহ কেবল এরন্ড পত্র কৃষকবধূদের পোকার খাদ্যের জন্য দান করেন, তবে তিনি সে পত্রের অর্ধেক গুটি পাতার বিনিময়ে পাইবেন! দুঃখের বিষয়, কৃষকরমনীদের পোকাপোষণ করিতে উৎসাহ দিবার লোক পর্যন্ত নাই।

খোদার ফজলে এখন দেশে যে স্বদেশীয় সঞ্জীবনী বাতাস বহিয়াছে, এ শুভক্ষণে দেশের নানাবিধ সুপ্তশিল্পের জাগরণ অনিবার্য! ৫০/৬০ বৎসরের পরিত্যক্ত—মৃত কত পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে; মৃতপ্রায় এন্ডিশিল্পও নবজীবন লাভ করিবে। এখন দেশের পরিধেয় খদ্দর, এন্ডি ও অন্যান্য রেশমী বস্ত্র না হইয়া উপায় নাই। এই শুভদিনীয় মাহেন্দ্রক্ষণে খোদার ফজলে রংপুর ও আসামের এন্ডি জাগিবে; ভাগলপুর ও মুর্শিদাবাদের রেশমী শিল্প জাগিবে, জাগিবে নিশ্চয়!

এখন কথা এই যে, রংপুরে এন্ডির পুনরুদ্ধার সাধন কে করিবে?

(১) স্থানীয় জমিদারগণ? তাহা হইলে তো আর কথা-ই নাই। তাঁহারা উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া সহানুভূতিসূচক ঈষৎ হাস্য করিলে—একটু স্নেহ আজ্ঞা প্রকাশ করিলে এন্ডিশিল্পে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে—মৃত এন্ডি পুনর্লাভ করিবে। গ্রামে গ্রামে কৃষকবধূ পরস্পরে বলাবলি করিবে—'আমাদের জমিদার সাহেব, রাজা মহাশয়, মহারাজা এন্ডি কাপড় চাহিয়াছেন; ওরে, আমি এখনই পোকা পোষা আরম্ভ করিব।' এ বলিবে, 'আমি আগে', ও বলিবে, 'আমি আগে।' কিন্তু না, জমিদার মহোদয়গণ সুখনিদ্রা, মোহনিদ্রা, আলস্যনিদ্রা, আফিম-খোরা নিদ্রা, সর্পদৃষ্ট প্রাণঘাতিনী নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহা করিবেন না।

(২) স্থানীয় সম্ভ্রান্ত বড়লোকেরা? তাহা হইলেও অধিক কাঁদিতে হইত না। তাঁহারা কমকেদারা হইতে নবনীত দেহখানিকে ঈষৎ দোলাইয়া, চক্ষু হইতে রঙিন চশমজোড়া একটু সরাইয়া, গ্রামের দুই-চারিজন মাতব্বরশ্রেণীর লোককে ডাকিয়া দু-চারিটা মিষ্টবাক্য ব্যয় করিলে এন্ডির শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে জীবনীপ্রবাহ বহিয়া যাইবে। কিন্তু না, তাঁহারা 'ঝোঁপড়ি মেঁ রহনা ও মহল কা খাব দেখ্‌না' গৌরব মানমর্যাদা গৌরব ইত্যাদির অনুরোধে প্রতিবেশী রাজা, মহারাজা, খাঁ বাহাদুরদের সহিত টেক্কা দিবার খেয়ালে ভুলিয়া তাহা করিবেন না।

(৩) মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা? তাহা হইলেও বেশ হইত। তাঁহারা গ্রামের লোকদের সহিত কথাবার্তা কহিয়া, হাতেকলমে উৎসাহ দিয়া, নিজেরা সখের জন্য এক প্রতিপালন করিলে একাধারে কিছু উপার্জন এবং দেশের বস্ত্রক্লেশ মোচন—দুই করিতে পারিবেন। কিন্তু না, তাঁহারা—

'চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি!
চাকুরি মাথার মাণিক!
চাকুরি বিনে বঙ্গবাসীর
জীবনধারণে ধিক্!
মশক করে হাত পাকিয়ে
লিখে, 'এ. বি.সি. ডি.';

চাকুরি হল—ডাকপিয়াদা,
গ্রামে পলো টী টী!'

অথবা-- *'চাকুরি মা! তোর চরণদুটি*
নিত্য পূজা করি,
এই অফিসে চাকুরি যেন
বজায় রেখে মরি!'

এহেন চাকুরির মায়া ত্যাগ করিয়া এন্ডিশিল্প উদ্ধার করিবেন না।

(৪) তবে অপর কোনো জেলার দেশহিতৈষী লোক? তাহাও বাঞ্ছনীয়। কি তাঁহারা এ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা মনে করিবে বাবা! নিজের ঘরদ্বার ছাড়িয়া কেউ জঙ্গলা দেশে যাইবে? রংপুরের জলবায়ু ভালো না -প্লীহা ও ম্যালেরিয়ার লীলাভূমি।

তবে?—নীলকর, চা-কর প্রভৃতির ন্যায় কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষক (Planter) রংপু গিয়া এন্ডিগুটি আবাদ করিবেন। তখন সেই এন্ডিকর সাহেবের এন্ডি বাগানে রংপুরের দরিদ্র নরনারী কুলীরূপে খাটিবে। আর ভদ্রলোকেরা গুটি মাচার পরিদর্শ বাজার সরকার কিম্বা অন্তত কুলীর সরদার পদলাভ করিয়া ধন্য হইবেন। হইতে প শ্বেতাঙ্গ এন্ডিকরেরা সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য কোনো সহজসাধ্য যন্ত্র নির্মাণ করিবে অতঃপর রংপুরের অধিবাসিগণ ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে 'রংপুর রিফাইন্ড সিল্ক' কলিক হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিবেন।

প্রথম 'আসাম সিল্ক' নাম শুনিয়া আমাদের চমক লাগিয়াছিল; পরে যখন দেখিল তো দেখিলাম, সেই নগণ্য এন্ডি!!

ফল কথা, অপর জেলার লোকে গুটি আবাদ করিতে গেলে, তাঁহাকে মূলধন স্বরূ অন্তত ২০০ (দুইশত) টাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। আর স্থানীয় লোকে ঐ কা হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে মাত্র ১০ (দশ) টি টাকা মূলধন স্বরূপ ব্যয় করিতে হই

কলীয় মুসলমান সাহিত্যপত্রিকা
বৈশাখ, ১৩২৮

রাঙ ও সোনা

১ মাসের 'সওগাত' পত্রিকায় মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী সাহেবের লিখিত 'সাহিত্য মুসলমান মহিলা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে মোহিত ও বিস্মিত হইলাম। তিনি কতিপয় বঙ্গলেখিকাকে উদার সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন, সেজন্য আমি ক্তমনে খাওয়াতীনে ইসলাম কলিকাতার সেক্রেটারিরূপে নারীদিগের পক্ষ হইতে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু বিক্রমপুরী সাহেবের অত্যধিক উদারতায় আমার ভারী আপত্তি আছে। তাহা এই যে, তিনি মাদৃশ নগণ্যাকে কয়েকজন উপাধিধারিণী বঙ্গবিখ্যাত লেখিকার শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আমি নিজেকে অবমানিতা বোধ করিতেছি।

'নিখিল ভারত সাহিত্যসঙ্ঘ' আমার নিকট 'বিদ্যাবিনোদিনী' ও 'সাহিত্যসরস্বতী' উপাধি চৌদ্দটাকায় বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাহা গ্রহণ করি নাই। কামলার নিকট জিনিস কিনিলে সস্তায় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমার প্রয়োজন নাই।

আজি-কালি যখন বা জোরে সামান্য নিকেলের 'আনি' পর্যন্ত মেকী হইতেছে, সে ক্ষেত্রে বিক্রমপুরী সাহেব সার্টিফিকেট দানের পূর্বে মেকী 'লেখিকা' ও আসল লেখিকাদের বিষয়, এমনকি, কোনো লেখিকা মৃতা কী জীবিতা—তাহা একটু সন্ধান করিয়া লইলে ভালো হইত না কি? তিনি একই নিক্তিতে রাঙ ও সোনা ওজন করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিক্রমপুরী সাহেবের মতে 'পরলোকগতা' আফজালুন্নেছা সাহেবকে আমি অদ্য (৭ ভাদ্র, ১৩৩৩ সনে) এই মাত্র (১২ টার সময়) দেখিয়া আসিলাম। অবশ্য তাঁহার সৎসঙ্গলাভের জন্য আমাকে 'পরলোকের' দ্বার পর্যন্ত যাইতে হয় নাই। আফজালুন্নেছা সাহেবের সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে; তাই তাঁহার 'মৃত্যু' সংবাদে তাঁহার পূর্বে তাঁহার সংবাদ লওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলাম। তিনি তখন সুস্থ শরীরে মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন–বেহেশতের ফলমূল নয়–আমাদের এই মৃন্ময় পৃথিবীর ভাত খাইতেছিলেন।

আশা করি, অতঃপর বিক্রমপুরী সাহেব অতিমাত্রায় সার্টিফিকেট বিতরণের নেশায় বাঙ্গালী বঙ্গ 'লেখিকাদিগকে আগেভাগে সশরীরে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবেন না। পরন্তু তাঁহাদের জন্য বেহেশতে সিট রিজার্ভ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।

সওগাত

ভাদ্র, ১৩৩৩

বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি

সভানেত্রীর অভিভাষণ

মাননীয় উপস্থিত ভগিনীবৃন্দ! আপনারা আমার ন্যায় তুচ্ছ নগণ্য ব্যক্তিকে এ[illegible] জন্য সভানেত্রীপদে বরণ করিয়া আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য [illegible] আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু আমি অবশ্যই বলিব যে, আপনা[illegible] নির্বাচন ঠিক হয় নাই। কারণ আমি আজীবন কঠোর সামাজিক 'পরদার' অত্যাচা[illegible] লোহার সিন্দুকে বন্ধ আছি। ভালোরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই—এম[illegible] সভানেত্রীকে হাসিতে হয়, না কাঁদিতে হয়, তাহাও আমি জানি না। সুতরাং আম[illegible] ভাষায়-কথায় অনেক ভুলভ্রান্তি থাকিবে তজ্জন্য আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

শ্রদ্ধাস্পদা ভগিনী মিসিস্ লিড্‌সে আমাকে মুসলমান বালিকাদের শিক্ষাসম্বন্ধে অভাব অভিযোগের কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সমবেত সুশিক্ষিতা গ্রাজুয়েট মহিলাদের সম্মুখে এ-সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তবে ২০/২১ বৎসর হইতে সাহিত্য ও সমাজ সেবা করিয়া—বিশেষত ১৬ বৎসর যাবৎ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল পরিচালনা করিয়া যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি, তাহাই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, 'বলিতে আপন দুঃখে পরনিন্দা হয়।'

এখন প্রশ্ন এই যে, মুসলমান বালিকাদের সুশিক্ষার উপায় কী? উপায় তো আল্লার কৃপায় অনেকেই আছে, কিন্তু অভাগিনীগণ তাহার ফলভোগ করিতে পায় কই? আপনারা হয়তো শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা, জানেন? সে জীব ভারতনারী। এই জীবগুলির জন্য কখনো কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছে; স্বয়ং থার্ডক্লাস গাড়িতে ভ্রমণ করিয়া দরিদ্র রেল-পথিকদের কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি' দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটরচাপা পড়িলে, তাহার জন্য এংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও ভূ-ভারতে নাই।

নারী ও পুরুষ বিরাট সমাজ-দেহের দুইটি বিভিন্ন অংশ। বহুকাল হইতে পুরুষ নারীকে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে, আর নারী কেবল নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। পুরুষের পক্ষে নারায়ণী সেনা আছেন বলিয়া তাঁহারা এ যাবৎ নারীর ওপর জয়লাভ করিয়া আসিতেছেন। সুখের বিষয়, এতকাল পরে 'শ্রীকৃষ্ণ' বর্তমান আমার হিন্দু ভগিনীদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করিয়াছে! তাই চারিদিকে হিন্দু সমাজে

[illegible] সম্প্রদায়ের অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে [illegible] তাঁহারা, বিশেষত মাদ্রাজের মহিলাবৃন্দ সর্ববিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এবার মাদ্রাজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদে একজন মহিলা নির্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি রেঙ্গুনে একজন ব্যারিস্টার হইয়াছেন লেডি ব্যারিস্টার মিস ঘোরাবজীর নামও সুপরিচিত; কিন্তু মুসলিম নারীর কথা আর কি বলিব—তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরে আছে।

'মাতা যদি বিষ দেন আপন সন্তানে
বিক্রয়েন পিতা যদি অর্থ প্রতিদানে'—

তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ সাহেব এক সময় তাঁহার কোনো বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 'এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দূরপনেয় কলঙ্ক।' ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ ২০ বৎসর পূর্বে আমি হেন নগণ্য যাহা ১ম খণ্ড 'মতিচূরে' বলিয়াছি, সেই কথা এখন শেখ সাহেবের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ লোকের মুখেও শুনিতেছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মূর্খতার অন্ধকার যুগে অরবগণ কন্যা বধ করিত। যদিও ইসলাম ধর্ম কন্যাদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলিমগণ অম্লানবদনে কন্যাদের মন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অবাধে বধ করিতেছেন। কন্যাকে মূর্খ রাখা এবং চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিয়া জ্ঞান ও বিবেক হইতে বঞ্চিত রাখা অনেকে কৌলিন্যের লক্ষণ মনে করেন। কিছুকাল পর্যন্ত মিসর এবং তুরস্ক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠকিয়া ঠকিয়া নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এখন সুপথে আসিয়াছেন।

সম্প্রতি তুরস্ক এবং মিসর, ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষা দিবার জন্য বাধ্যতামূলক আইন করিয়াছেন। কিন্তু তুরস্ক আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণে সোজা পথ অবলম্বন করেন নাই; বরং আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রের একটি অলঙ্ঘনীয় আদেশ পালন করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম পুরুষ লোককে সমভাবে সুশিক্ষা দান করা কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের রসুল মকবুল (অর্থাৎ পয়গাম্বর সাহেব)। তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, শিক্ষালাভ করা সমস্ত নরনারীর অবশ্য কর্তব্য। তের শত বৎসর পূর্বেই আমাদের জন্য ঐ শিক্ষা দানের বাধ্যতামূলক আইন পাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের সমাজ ইহা পালন করে নাই, পরন্তু ঐ আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তদ্রূপ বিরুদ্ধাচরণকেই বংশগৌরব মনে করিতেছে। এখনো আমার সম্মুখে আমাদের স্কুলের একটি ছাত্রীর অভিভাবকের পত্র মজুত আছে—যাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মেয়েদের যেন সামান্য উর্দু ও কোরানশরিফ পাঠ ছাড়া আর কিছু—বিশেষত ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া না হয়। এই তো আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে যখন স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন পাস হইবে, তখন দেখা যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান—যাঁহারা স্বীয় পয়গাম্বরের নামে (কিম্বা ভগ্ন মসজিদের ভগ্ন ইষ্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গাম্বরের সত্য আদেশ

পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহার ... করিয়াছেন, তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে সম্প্রতি ... স্ত্রীশিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে ... দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী "ফরয" (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কে... তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?

এখন শিক্ষার অবস্থা এই যে, আমাদের দেশের গড়পড়তা প্রতি ২০০ (দুইশত) বালিকার একজনও অক্ষর চিনে না; প্রকৃত শিক্ষিতা মহিলারা বোধহয় দশহাজারের মধ্যেও একজন পাওয়া যাইবে না। কেবল এই বঙ্গদেশে প্রায় তিনকোটি মুসলমানের বাস। গত জানুয়ারি মাসে শিক্ষাবিভাগ হইতে আমাকে একখানি পত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশে যতগুলি মুসলিম মহিলা গ্রাজুয়েট আছেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া যেন আমি অবিলম্বে পাঠাই। কিন্তু আমি বঙ্গের মাত্র একটি গ্রাজুয়েট এবং আগা মইদুল ইসলাম সাহেবের কন্যাত্রয় ব্যতীত আর কাহারো নাম দিতে পারি নাই। আগা সাহেব বঙ্গদেশের অধিবাসী নহেন, সুতরাং তিনকোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র একটি মহিলা গ্রাজুয়েট পাওয়া গেল, বলিতে হয়!! সম্ভবত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধানের পর প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগের স্কুলের ইনসপেকট্রেস মহোদয়া আমাকে মুসলিম মেয়ে গ্রাজুয়েট খুঁজিয়া বাহির করিতে বলিয়াছিলেন। আবার আমি শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের একটি বচন উদ্ধৃতি করিতেছি।

'স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলে যে, শিক্ষা পাইলে স্ত্রীলোকেরা অশিষ্ট ও অনম্য হয়। ধিক! ইহারা নিজেকে মুসলমান বলেন, অথচ ইসলামের মূল সূত্রের এমন বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি শিক্ষা পাইয়া পুরুষগণ বিপথগামী না হয়, তবে স্ত্রীলোকেরা কেন বিপথগামিনী হইবে? এমন জাতি, যাহারা নিজেদের অর্ধেক লোককে মূর্খতা ও 'পরদা' রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখে, তাহারা অন্যান্য জাতির—যাহারা সমানে সমানে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করিয়াছে, তাহাদের সহিত জীবনসংগ্রামে কিরূপে প্রতিযোগিতা করিবে?'

ভারতবর্ষে এককোটি লোক ভিক্ষাজীবী, তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। সুতরাং তাহারা কোন্ মুখে অন্যজাতির সহিত সমকক্ষতা করিবে? আমরা আবার কৌলিন্যের বড়াই করি! ভিক্ষাবৃত্তি সর্বাপেক্ষা নীচ কার্য, আর মুসলমানের সংখ্যাই ইহাতে অগ্রণী। ইহার কারণ এই যে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে বঞ্চিত রাখিয়া সর্ববিষয়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। ফলে তাহাদের গর্ভজাত সন্তান অলস ও শ্রমকাতর হয়: সুতরাং 'বাপদাদার নাম' লইয়া ভিক্ষা ছাড়া তাহারা আর কী কাজ করিবে?

এখন স্ত্রীলোকেরা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুসলিম মহিলাগণ এ অধিকারের সদ্ব্যবহারে স্বেচ্ছায় বঞ্চিতা রহিয়াছেন। গত ইলেকশনের সময় দেখা গেল কলিকাতায় মাত্র ৪ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছে। ইহা কি মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয়? তাঁহারা কোন্ সুযোগের আশায় বা অপেক্ষায় বসিয়া আছেন?

যে পর্যন্ত পুরুষগণ শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার দিতে স্বীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিবে না। যাহারা নিজের সমাজকে উদ্ধার করিতে পরিতেছে না, তাহারা আর দেশোদ্ধার কিরূপে করিবে? অর্ধাঙ্গীকে বন্দিনী রাখিয়া নিজে স্বাধীনতা চাহে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা পাগলেরই শোভা

সায়! সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে পারেন না, আমার মনে পড়ে প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে মিস্টার মর্লি বলিয়াছিলেন, 'যদি তাহারা চাঁদের জন্য আবদার করে (If they cry for the Moon), তাহা আমরা দিতে পারি না' ইত্যাদি এবং আমাদের অমুসলমান প্রতিবেশীগণ এখন সাধারণত যেরূপ মুসলমানদের দাবিদাওয়া সহ্য করিতে পারেন না, সেইরূপ মুসলমান পুরুষগণও নারীজাতির কোনোপ্রকার উন্নতির অভিলাষ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু আল্লাহর কুদরত বা প্রকৃতির নিয়ম অতি চমৎকার। তিনি এ বিশ্বজগৎকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন—আমরা পরস্পরের সহিত এরূপভাবে জড়িত আছি যে, একে-অপরকে অতিক্রম করিয়া চলিতে পারি না! মুসলিম ভ্রাতৃগণ যতদিন আমাদের দুঃখসুখের প্রতি মনোযোগ না করিবেন, ততদিন তাঁহাদের কথাও ভারতের অপর ২২ কোটি লোকে শুনিবে না, আর যতদিন ঐ ২২ কোটি লোকে ৮ কোটি মুসলমানকে উপেক্ষা করিবে ততদিন পর্যন্ত তাঁহারে রোদনও বৃটিশ গভর্নমেন্টের কর্ণকূহরে প্রবেশ করিবে না!! বহুদিন হইল একটি বটতলার পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম :—

'আপনি যেমন মার খাইতে পারিবে,
বুঝিয়া তেয়ছাই মার আমাকে মারিবে।'

হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, "তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিও।" এস্থলে আমি শেখ সাহেবের আর একটি উক্তি উদ্ধৃতি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই :—

'ভারতবর্ষের অবরোধ-প্রথা স্ত্রীলোকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। অবরোধ-প্রথা আমাদের সমাজের সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত। ভ্রাতৃগণ! পর্দার নাম শুনিবা মাত্র আপনারা হয়ত এক যোগে বলিয়া উঠিবেন, 'তবে কি আমরা ইংরাজদের অনুকরণে বিবিদের রাজপথে বেড়াইতে দিব?' তদুত্তরে বলি, আমি মুসলমান শাস্ত্রের সীমার মধ্যে থাকিয়া আপনাদের সহিত কথা বলিতে চাই। ভারতীয় পর্দার সহিত শাস্ত্রীয় পর্দার কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি—কেবল এইটুকু বলি যে, শেখ সাহেব পর্দাকে 'সর্বাপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত' বলিয়াছেন, আমি তাহা মনে করি না। 'যন্ত্রণাদায়ক' হইলে অবলাগণ 'বাবারে! মা'রে! মলুম রে! গেলুম রে!' বলিয়া আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতেন! অবরোধ প্রথাকে প্রাণঘাতক কার্বনিক এসিড গ্যাসের সহিত তুলনা করা যায়। যেহেতু তাহাকে বিনা যন্ত্রণায় মৃত্যু হয় বলিয়া লোকে কার্বনিক গ্যাসের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিবার অবসর পায় না! অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।

মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরান শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন! কোরান শিক্ষা অর্থে শুধু টীয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরানের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবতঃ এজন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাশ না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরান শিক্ষাও দিবে না! যদি কেহ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থা-পত্র (pre-

scription) লয়, কিন্তু তাহাতে লিখিত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে [illegible] পত্রখানাকে মাদুলীরূপে গলায় পরিয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করিয়া পাঠ [illegible] তাহাতে কি সে উপকার পাইবে? আমরা পবিত্র কোরান শরীফের লিখিত [illegible] অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তাহা পাখীর মত পাঠ করি আর কাপড়ের [illegible] (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চ স্থানে রাখি। কিছুদিন হইল, মিসর হইতে আগত বিদুষী মহিলা মিস্ যাকিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতা দানকালে বলিয়াছিলেন, 'উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরানের অর্থ বুঝেন, তাঁহারা হাত তুলুন।' তাহাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরান-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এইরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কত ভীষণ, তাহা না বলাই ভাল। সুতরাং কোরানের বিধিব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নহি। স্থানীয় ভাষা বলিতে অন্য স্থানের ভাষা যাহাই হউক, কলিকাতার ভাষা কী হইবে? ষোল বৎসর যাবৎ এই সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার ফলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, এখানকার মুসলমানেরা মাতৃহীন —অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা নাই। তাহারা উর্দুকে মাতৃভাষা বলিয়া দাবী করে বটে, কিন্তু এমন বিকৃত উর্দু বলে যে, তাহা শুনিলে শ্রবণবিবর ক্ষত-বিক্ষত হয়! যাহা হউক, তথাপি উর্দু, এবং বাঙ্গালা উভয় অনুবাদই শিক্ষা দিতে হইবে। আমার অমুসলমান ভগিনীগণ! আপনারা কেহ মনে করিবেন না যে, প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কোরান শিক্ষা দিতে বলিয়া আমি গোঁড়ামীর পরিচয় দিলাম। তাহা নহে, আমি গোঁড়ামী হইতে বহুদূরে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম ও সমাজ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোরান শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্য। ভ্রাতৃগণ মনে করেন, তাঁহারা গোটাকতক আলীগড় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজে ভর করিয়া পুলসিরাত (পারলৌকিক সেতু বিশেষ) পার হইবেন--আর পার হইবার সময় স্ত্রী ও কন্যাকে হ্যাণ্ড ব্যাগে পুরিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার বিধান যে অন্য রূপ—যে বিধি-অনুসারে প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কর্মফল ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং স্ত্রীলোকদের উচিত যে, তাঁহারা বাক্স-বন্দী হইয়া মালগাড়িতে বসিয়া সশরীরে স্বর্গলাভের আশায় না থাকিয়া স্বীয় কন্যাদের সুশিক্ষায় মানোযোগী হন। কন্যার বিবাহের সময় যে টাকা অলঙ্কার ও যৌতুক ক্রয়ে ব্যয় করেন, তাহারই কিয়দংশ তাহারে সুশিক্ষায় ও স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় করুন। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম চর্চা করা প্রয়োজন; আর প্রয়োজন বিশুদ্ধ বাতাসের। অল্লাহর দান বিশুদ্ধ বাতাস বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে মহিলাগণ কেন অনিচ্ছুক, আমি তাহা বুঝিতে পরি না। শীতকালে তাঁহারা এরূপ ভাবে জানালা-দ্বার, বিশেষতঃ সার্সী বন্ধ করিয়া রাখেন যে, আমার মনে হয়, গভর্নমেন্ট কেন আইন করিয়া দ্বার-জানালার সার্সী ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করেন না! পাঁচ ছয় বৎসর হইল, ডাক্তার

• সেই জন্য তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার-কল্পে টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা চাহিলে বলি, মুসলমানগণ বড় দরিদ্র—তাহাদের টাকা নাই! কিন্তু এ কথা কী বিশ্বাসযোগ্য? যাঁহারা ইস্‌লামিয়া কলেজে হাজার টাকা অকাতরে দান করিয়াছেন, তাঁহারা কী দরিদ্র? তাঁহারা যদি শরিয়ত অর্থাৎ শাস্ত্র মানিতেন, তাহা হইলে যিনি যত টাকা বালকদের শিক্ষার জন্য দান করিয়াছেন, তাহার অর্ধেক অবশ্যই বালিকা-বিদ্যালয়ে দান করিতেন।

মিস কোহেন বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমাদের স্কুলের কতিপয় বালিকার স্বাস্থ্যের রিপোর্ট যখন তাহাদের মাতার নিকট এই অনুরোধ-সহ গেল যে, 'আপনারা অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করুন', তাহাতে তাঁহারা চটিয়া এই উত্তর দিলেন,—'স্কুলমেঁ লাড়কী পড়নে কো দিয়া হায়, না বিচার করনে কো, কে, আঁখ্ কমজোর, দাঁত কম-জোর, হলক মে ঘাও হায়, ফেঁফ্‌ড়া খারাব হ্যায়! ইয়ে সব বোলনে সে হামারী লাড়কী কা শাদী ক্যায়সে হোগা? ইয়ে সব বাৎ রহনে দেঁ, হামারী লাড়কী কো ডাক্তারনীসে না দেখায়েঁ!' ইয়া আল্লাহ্! মেয়ের প্রাণ লইয়া টানাটানি, অথচ শাদীর চিন্তায় মায়ের চোখে ঘুম ধরে নাই! ফল কথা, অশিক্ষিতা মাতার নিকট ইহাপেক্ষা আর কি আশা করা যাইতে পারে?

আমাদের স্কুলের ছাত্রীগণ পরীক্ষার সময় প্রায়শঃ ভূগোল, ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে অকৃতকার্য (ফেল) হয়; ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিজেদের বাসভবন এবং স্কুল-গৃহ ব্যতীত দুনিয়ার আর কিছুই দেখিতে পায় না, এই দুনিয়ায় তাহাদের পিতা ও ভ্রাতা ছাড়া আরও কেহ আছে কিনা, তাহা তাহারা জানে না; রুদ্ধ বায়ুপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়া মা-মাসীকে অনবরত রোগ-ভোগ ও স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে দেখে। তাহারা কেবল জানে, অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। এই সকল কু-রোগের এক মাত্র ঔষধ সুশিক্ষা।

উপসংহারে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল এবং আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইস্‌লামের উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কলিকাতার মুস্‌লিম সমাজের উন্নতির নিমিত্ত এই উভয় প্রতিষ্ঠানই প্রানপণে যত্ন করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা এখনও পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করে নাই। স্কুলটিকে হাই স্কুলে উন্নীত করা এবং ইহার জন্য একটা নিজের বাড়ি হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন এবং আঞ্জুমানটি মহিলা-সমাজে সর্বজনপ্রিয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আজ আপনাদের অনেকখানি সময় নষ্ট করিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এখন আমি ইতি করি!*

সওগাত
চৈত্র, ১৩৩৩

* Bengal Women's Educational Conference-এ (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশনে) পঠিত।

লুকানো রতন

সাগরের সুগভীর আঁধার গহ্বরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকা'য়ে;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশা'য়ে।

অভাগিনী বঙ্গদেশের নিভৃত অন্তঃপুর-উদ্যানে কত ফুল নীরবে ফুটিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে ঝড়িয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে? অন্তঃপুরের সুরক্ষিত লৌহসিন্দুকে ও না-জানি কত উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত আছে, তাহার সন্ধানও অনেকেই জানে না। অদ্য আমরা মাত্র একটি রত্নের উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের মুস্‌লিম সমাজ নিতান্ত দীন নহে—তাহাতে এমন অমূল্য রত্নরাজিও আছে।

করিমুন্নেসা খানম সাহেবা

গত ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রঙ্গপুরের অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের কোনো উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত অন্তঃপুরে অর্থাৎ তত্রত্য প্রসিদ্ধ জমিদার মরহুম মৌলবি জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের সাহেবের গৃহে ঐরূপ একটি রত্ন (করিমুন্নেসা খানম) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁহাকে টিয়া পাখির মাতা কোরানশরীফ ব্যতীত আর কিছু পড়িতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তাঁহার আত্মার তৃপ্তি হইত না! তাঁহার ছোট ভাইয়েরা বাহিরে মুন্সি সাহেবের নিকট ফার্সি পড়িয়া আসিতেন—ভগিনীকে শুনাইয়া আবৃত্তি করিতেন—

'কে বে-ইল্‌মে না-তওয়াঁ খোদারা শেনাখ্‌ত'

তখন বালিকা করিমুন্নেসাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বয়েতগুলি মুখস্থ করিতেন। ভাইদের বাঙ্গলা পড়া শুনিয়াও তিনি মুখে মুখে আবৃত্তি করিতেন—'ক'য়ে আকার দিলে 'কা', ইকার দিলে কি', দীর্ঘ ঈকার দিকে 'কী', কৃ খৃ, গৃ ঘৃ নৃ—ইত্যাদি। আর তিনি প্রাঙ্গণে মাটিতে আঁক কাটিয়া বাঙ্গলা লিখিতে শিখিয়াছিলেন।

একদিন করিমুন্নেসা গোপনে একটা বটতলার পুঁথি লইয়া অস্ফুটস্বরে পড়িতেছিলেন—

কোরানেতে আল্লাতালা কয়েছে এমতি,
ফাদ খুলি ফি ইবাদি ওয়াদ খুলি জান্নাতি'

সেই সময় হঠাৎ তাঁহার পিতা আসিয়া পড়েন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়া ভাবিলেন যে, 'আজ আমার সর্বনাশ,—বুঝি এখনই আমাকে যমালয়ে যাইতে হইবে! কিন্তু না, শোকর আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ্‌! পিতা কন্যার হাতে পুঁথি দেখিয়া রাগ করিলেন না,—বরং ভয়ে মূর্চ্ছিতা-প্রায় বালিকাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন এবং সেইদিন

হইতেই একটু একটু 'সাধুভাষা'র বাঙ্গলা পড়াইতে লাগিলেন। বাসা আর যত মোল্লা মরুব্বির দল একযোগে চটিয়া উঠিলেন—'হেঁ-মেয়েকে বাঙ্গলা পড়ান হইতেছে!' তাঁহাদের নিন্দা ও বাক্য-জ্বালায় অধীর হইয়া পিতা তাঁহার পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

শুধু পড়াই বন্ধ হইল না,—এখন করিমুন্নেসাকে অন্ধকার কারাগৃহে (অর্থাৎ বলিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে) পাঠাইয়া দিয়া বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে বিবাহ হইয়া গেল। শাপেই বর—শ্বশুরালয় দেলদুয়ারে আসিয়া তিনি কয়েকজন দেবরসম্পর্কীয় ছাত্রের সাহায্যে যথাবিধি বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। সেজন্য তিনি সমাজের অনেক লাঞ্ছনা সহিয়াছেন। কেবল নিজের লেখাপড়া শিক্ষার জন্যই লাঞ্ছনার শেষ হয় নাই। বিবাহের ৯ বৎসর পরেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। বৈধব্যের পর তাঁহার শিশু পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার জন্যও তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বনা ও উপদ্রব সহিতে হইয়াছে।

দেলদুয়ারে ছেলেদের উচ্চশিক্ষা লাভ অসম্ভব দেখিয়া করিমুন্নেসা খানম কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বড় ছেলেকে (হাজী এ. কে. গজনভী সাহেবকে) ইংলন্ডে পাঠাইলেন এবং ছোটটিকে (মিঃ আবদুল হালিম গজনভী সাহেবকে) সেন্টজেভিয়ার কলেজে ভর্তি করিলেন! এত বড় পাপ কার্যের জন্য সমাজ তাঁহার প্রতি কী কী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিল, কত অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছিল, কত নিন্দা-কুৎসা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত—পাঠিকা ভগিনী তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।

করিমুন্নেসা খানম স্বভাব-কবি ছিলেন। পারিবারিক ঘটনা এবং সামাজিক বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে কবিতাগুলি দিনের আলোক দেখিতে পায় নাই। আজিকালি দেখি, লোকে ভলোমতে বর্ণজ্ঞানের সহিত ভালোমতে পরিচিত না হইয়াও ভাড়াকরা লেখকের দ্বারা প্রবন্ধ ও পুস্তক লেখাইয়া নিজের নামে প্রকাশ করে। কিন্তু করিমুন্নেসা সাহেবা নিজের রচনা কখনও স্বনামে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন নাই। কালে-ভদ্রে কেনো রচনা বা পুস্তক বে-নামীতে ছাপা হইত। অধিকাংশ রচনাই বিশেষতঃ কবিতার বাঁধানো খাতাগুলি তাঁহার বাক্সের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকিত। দুই তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার কয়েকটি কবিতা আমি জোর করিয়া কোনো হিন্দু সংবাদপত্রে দিয়াছিলাম—তাহাতে নাম প্রকাশ হয় নাই। আমি অনেক পীড়াপীড়ি করায় কবিতার নিম্নে 'সাবের বংশের জনৈকা কন্যা' নাম দেওয়া হইয়াছিল। সে পত্রিকায় সম্পাদক আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'সাবের বংশের কন্যার কবিতাগুলি বড় চমৎকার; আমাদের বেশ লাগিয়াছে। দয়া করিয়া আরো পাঠাইবেন।'

তিনি ইংরাজি ভাষা শিখিবার জন্য সাধনাও কম করেন নাই। তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক কোনো কোনো ম্যট্রিক পাস করা লোকের তুলনায় উৎকৃষ্ট বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থলে ১৬ বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা মনে পড়িল। একদিন তিনি ও আমি প্ল্যানচেটে হাত রাখিয়া নানা লোকের আত্মার দ্বার লিখাইতেছিলাম।* আমার খেলাইয়ের আত্মা ইংরেজিতে নাম লিখিল দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে ইংরাজি শিখিতে পারিব।'

* প্ল্যানচেট কি জিনিস—তাহা সত্য কি মিথ্যা, এ স্থলে সে-বিষয় আলোচ্য নহে।

তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে রীতিমতো আরবি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'মন্ত্রপাঠের মতো কোরানের বুলি আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তি না, তাই আমি যথাবিধি আরবি পড়িতেছি।' তিনি পারস্য ভাষাও জানিতেন।

সমাজ তাঁহাকে গলা-টেপা করিয়া না রাখিলে করিমুন্নেসা সাহেবা দেশের উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন। ইলেকট্রিক বাতিকে স্তরের-পর-স্তর—অনেক কাপড়ের আবরণে ঢাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখায়, আমার বর্ণিতা মহিলাটিও সেইরূপ কাপড়ের চাপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্বলিত শিক্ষা অন্তরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজের শিক্ষালাভের জন্য কষ্ট সহিয়াছেন; পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্যে লাঞ্ছনা সহিয়াছেন—শেষে আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ! তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। আমাকে সাহিত্য-চর্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না। করিমুন্নেসা সাহেবা লক্ষাধিক সংখ্যক বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। অনেক পারস্য গজল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

গত ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ৬ সেপ্টেম্বর এই রত্নটি ৭১ বৎসর ৫ মাস বয়সে হৃদ্‌যন্ত্র অচল হওয়ায় (হার্ট ফেল করিয়া) চির-লুক্কায়িত হইয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগকে 'অকাল-মৃত্যু বলা যায় না বটে; তবু কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি আরও দশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহ দিলে ভালো হইত। এখন আর আমার কিছুই ভলো লাগে না; মনে হয়—আর কে পড়িবে?

সওগাত
আষাঢ়, ১৩৩৪

রানি ভিখারিনী

আমেরিকাবাসিনী মিস্ মেয়ো 'ভারত মাতা' নামক পুস্তকে হিন্দু নারীদের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে অতি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নির্মম সত্যকথা বলার জন্য হিন্দুগণ মিস্ মেয়োকে যত ইচ্ছা গালাগালি করুন, কিন্তু গালির চোটে কাকের কালো রঙ বকের মতো সাদা হইবে না, পরিত্যক্ত জারজ শিশু পুনর্জীবন লাভ করিবে না, দ্বাদশ বর্ষীয়া প্রসূতিদের বিবিধ রোগ নিরাময় হইবে না; হাসপাতালে রোগিণীদের সংখ্যাও হ্রাস হইবে না। এ দেশীয় কর্তারা বলেন, 'ভারত মাতা' পুস্তকে ভারতের কেবল নিকৃষ্ট অংশ দেখানো হইয়াছে, উৎকৃষ্ট অংশের উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু কথা এই যে, যাহা ভলো, তাহা তো ভালোই; তাহার পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। যাহা মন্দ তাহাই সংশোধন করা আবশ্যক।

ডাক্তারের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইলে, তিনি রোগীর রোগসমূহেরই উল্লেখ করেন এবং রোগ দূর করিবারই ব্যবস্থা দেন। আপনার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা দিবার সময় ডাক্তার আপনার পরিপাক শক্তির প্রশংসা-পত্র লিখিতে বসেন না। তারপর ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট অংশের প্রশংসাগীতি গাহিবার জন্য ভারতের গড়পড়তা

১১ কোটি পুরুষ তো আছেই। সে জায়গাকে কোটি ঠাকুরবার জন্য [illegible]
কার মিস্ মেয়োর প্রয়োজন সেই কথা কহিতে যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলে [illegible]
যাহা এযাবৎ আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই। সেই কথা আমিও আজ [illegible]
হইতে বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারো শ্রবণ [illegible]
করে নাই—আজ মিস্ মেয়োর গর্জনে সকলের টনক নড়িয়াছে!

'ভারত মাতা'—লেখিকার সহিত ভারত-পিতাগণ 'চুলোচুলি' করিতেছেন, এই সুযোগে, মুসলিম-সমাজ! আপনারা ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া লউন। দেখুন তো আপনারা নিজ সমাজের রানিকে কিরূপ ভিখারিনী সাজাইয়াছেন। এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম নারীকে কিছুমাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম নারীর দুর্দশার একশেষ হইয়াছে!

কোনো জাতি কন্যাকে সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই, ইসলাম কন্যাকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভ্রাতার অর্ধেক অংশ ভাগিনী করিয়াছে। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। স্ত্রী যদি কিছু টাকা-কড়ি পিত্রালয় হইতে আনে, তাহা স্বামীর কবলে পড়ে —স্ত্রী ভোগ করিতে পায় না। মুসলিম স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, সে বিবাহের সময় স্বামীর অবস্থা-অনুসারে 'দেন-মোহর' বাবদ নগদ টাকা বা বিষয়ের অধিকারিণী হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র-কন্যা প্রভৃতি অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশ-বিভাগের পূর্বে স্ত্রীর 'মোহর' (স্ত্রীধন) এবং তাহার প্রাপ্য অষ্টমাংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অপর সকলে পায়।

হিন্দু স্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাগণ এখন সহমৃতা না হইলেও জীবন মৃতা হইয়া থাকে। তাহাদের গাড়ি-বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, 'বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল-মূল খাইয়া বিধবার প্রতি কোনো অত্যাচার নাই; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোনো বাঁধা নিয়ম নাই।

হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু কিম্বা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য। অষ্টম বর্ষে কন্যা বিবাহ দিলে তাঁহারা গৌরীদানের ফল প্রাপ্ত হন। ইসলাম ধর্মে স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা গিয়াছে। 'মাতার পদতলে স্বর্গ' বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ব্যতীত কোনো নারীর বিবাহ হইতে পারে না, ইহাতে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত করা হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্র বলে, 'স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।' আর আমাদের রসুলুল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'তালাবুল ইলমি ফরিজাতুন, 'আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন' (অর্থাৎ সমভাবে শিক্ষালাভ করা সমস্ত মুসলিম নর ও নারীর অবশ্য কর্তব্য)।

কিন্তু কার্যত ঃ আমরা কি দেখিতে পাই? হিন্দুগণ কন্যাকে অংশ দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা 'উইল' করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। উইল দ্বারা স্ত্রী কিম্বা কন্যাকে যথাসর্বস্ব দান করিতে পারেন। আর মুসলমানেরা কন্যার দ্বারা সম্পত্তিতে লা-দাবী লিখাইয়া লইয়া কন্যাকে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। নানাবিধ জঘন্য উপায়ে নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। আর [illegible] তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব [illegible] করেন।

হিন্দুগণ বাল্যবিবাহ রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন। [illegible] বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া ধার্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন (যদিও [illegible] পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে 'অ-হিন্দু' বলিতেছেন)। আর আমাদের সমাজে দেখিতে পাই, টেলিগ্রাফ-যোগে কোনো দূর দেশে অবস্থিত বরের সহিত অপ্রাপ্ত বয়স্ক -৯ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতেছে। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত অথবা দুশ্চরিত্রপানা সক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া বুক-ভাঙ্গা রোদনে বক্ষ ভিজাইতে থাকে—সেই হৃদয়-বিদারী অশ্রু-প্রবাহের মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পাত্রী কিছুতেই 'হুঁ' বলিবে না,—কিন্তু অভিভাবকও নাছোড়বান্দা—তাঁহারা বলপূর্বক 'হুঁ' বলাইয়া বিবাহের শ্রাদ্ধ করেন।

এখন হিন্দুগণ অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিয়াছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।

৬০/৭০ বৎসর পূর্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজি শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজি পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্তারা তাহার ফলভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানের জন্য 'অযোগ্যতার' অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টি চাকুরী লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়া মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed Class-এর) তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। আমি বলি, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'অযোগ্য'। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা-সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা তো অতি স্বাভাবিক। 'অযোগ্য' বলার জন্য রাগ না করিয়া 'যোগ্য' হইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

মাসিক মোহাম্মাদী,
পৌস, ১৩৩৪।

বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ

বোম্বাইয়ের কোনো বালিকা বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট— ফাতেমা বেগম সাহেবা, মহামান্যা সুরাইয়া বেগমের সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য 'তাজমহল' হোটেলে গিয়াছিলেন কিন্তু মহামান্যার অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরন্তু তাঁহার মাতা 'বেগম তরজী'র সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ফাতেমা বেগম সাহেবা উক্ত সাক্ষাতের বিবরণ কোনো উর্দু কাগজে লিখিয়াছিলেন। সেই উক্ত কাগজ হইতে 'সওগাতে'র জন্য তাহা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়া দিলাম।]

আফগানিস্তানের মুকুটবিহীন রাজা, মুসলমানদের হৃদয়ের বাদশাহ্ আমানুল্লাহ্ খাঁ এবং তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী সুরাইয়া বেগম সাহেবা বোম্বাইতে আছেন অবধি তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা-রকমের গুজব শহরময় ও দেশময় ছড়াইতেছে; এসময় আমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইল যে, এই পূণ্যবতী সর্বজনপ্রিয় মহারানির সহিত অন্তত কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করিয়া আসি। এই উদ্দেশ্যে অন্য একটি মুসলমান মহিলাকে সঙ্গে লইয়া তাজমহল হোটেলে সন্ধ্যাবেলায় উপনীত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, রাজদম্পতি মোটরযোগে বায়ু-সেবনের নিমিত্ত বাহিরে গিয়াছেন। সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, আগামীকল্য দশটার সময় আসিলে মহারানির সহিত দেখা হইবে; এ-সময় রাজদম্পতি হোটেলে নাই। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় দিন আবার নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে গেলাম, এবং পারসি ভাষায় একখানা চিঠি সেক্রেটারিকে পাঠাইলাম। তাহার উত্তরে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইল। কামরায় প্রবেশ করিবা মাত্র এক অতিশয় সুদর্শনা এবং বয়স্কা মহিলার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। জানিতে পারিলাম, তিনি রানি সুরাইয়ার জননী—সর্দার মাহমুদ তরজীর বেগম সাহেবা।

বেগম সাহেবা বলিলেন, আমার স্বামী ২০ বৎসর পর্যন্ত প্রাণপণে যত্নে আফগানিস্তানের সেবা করিয়াছিলেন; সমগ্র ইউরোপিয় জাতিসমূহের দ্বারা আফগানিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র-রূপে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিলেন, আর কাবুলকে কোটি সুন্দর প্রমোদ-কাননে পরিণত করিবার জন্য বাদশাহকে সকল রকম পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ প্রজাগণ তাহার এমনি প্রতিদান দিল যে, তিনি উহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আজ তেহরানে গিয়া বসিয়াছেন। আমাদের এক পুত্র মস্কো গিয়াছে, আর এক পুত্র এবং কন্যা ফ্রান্সে আছে। আর আমি নিজে এই কন্যাদের সঙ্গে এইরূপ পেরেশান হইয়া বেড়াইতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'মহামান্যা সুরাইয়া বেগমের শরীর বড়ই অসুস্থ, তিনি শয্যাগত আছেন। এমন কি, লেডি ডাক্তার পর্যন্ত তাঁহার নিকট আছে। এই কারণে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারিলেন না। যদি ২/৩ সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকা হয় এবং তাঁহার শরীর কিছু ভালো হয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিলে তাঁহার সহিত দেখা হইবে।'

এই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহার এক দৌহিত্র ও চার দৌহিত্রী, অর্থাৎ রানি সুরাইয়ার চার কন্যা—আমিনা, আবেদা, আরেফা আর আদেলা প্রভৃতিকে দেখিলাম।

রাজকুমারীরা অতিশয় সুন্দরী; তাহাদের পোশাক একেবারে আধুনিক ধরনের, এবং সকলেরই আধুনিক ধরনের চুল কাটা, এমন কি, বেগম সাহেবারও চুল কাটা এবং পোশাক একেবারে ইউরোপিয় ধরনের। এঁদের পূর্বপুরুষগণ আরব এবং শ্যাম দেশবাসী, এবং আরব জাতির বিশেষ সৌন্দর্য চেহারায় বিদ্যমান আছে।

কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 'আমরা কান্দাহার হইতে এমনি অবস্থায় আসিয়াছি যে, আমাদের পরনের কাপড় ছাড়া কোনো জিনিসপত্র, এমন কি, আর এক প্রস্থ কাপড় পর্যন্তও আমাদের সঙ্গে আনা সম্ভব হয় নাই। এখানে আসিয়া আমরা হোটেলে লোক ডাকিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতেছি।'

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'ভারতবর্ষের মুসলমানেরা শাহ আমানুল্লাহ খানের প্রতি বিশেষ প্রীতি এবং শ্রদ্ধা তাহাদের হৃদয়ে পোষণ করে। আর ভারতবর্ষের শুধু মুসলমান নহে, অন্যান্য জাতির মহিলাগনও মহামান্যা সুরাইয়া বেগমকে প্রানপনে ভালোবাসে। আমাদের ছেলেমেয়েরা শাহ আমানুল্লাহর জন্য সর্বদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে।'

তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বাস্তবিকই আমরা ভারতবর্ষের মুসলমানদের নিকট কৃতজ্ঞ আছি যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি এতখানি সহানুভূতি রাখেন। কিন্তু আক্ষেপ যে, আমাদের নিজেদের দেশের লোকেরা আমাদের কাফেরের ফতোয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। বিশেষতঃ এমন বাদশাহকে তাহারা কাফের বলিল, যে সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্র সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দিয়াছেন—যাহাদের সংখ্যা দেশে কেবল শতাবধি নহে, হাজারের চেয়েও বেশি ছিল ;—এমন কি, তাঁহার মাতৃ অন্তঃপুরে যে সমস্ত দাসী ছিল, তাহাদিগকেও তিনি মুক্তি দিয়াছেন। আফগানিস্তানে আমানুল্লাহ খানের এই ক্ষণিক রাজত্বের সময়ে একটিও বাঁদী দেখা যায় নাই; কেহ না, বাঁদী অথবা 'গোলাম' কেহ রাখিলে তাঁহাকে দুই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হইত।—বাঁদী গোলামের স্থানে চাকর ও চাকরানি অন্দর ও বাহিরে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই চাকরদের সহিত অধিক কঠোর ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না।

তারপর তিনি বলিলেন—'সমস্ত আফগানিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা যে বাদশাহের মাত্র এক বিবি থাকে, তাঁহার দ্বিতীয় বিবি কিম্বা কোনো রক্ষিতা থাকে না। আহা! এমন বাদশাহের বিরুদ্ধে তাহারা কাফেরি ফতোয়া দিল! বাদশাহ স্বদেশের উন্নতির জন্য এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন যে, তিনি দশ বৎসরের মধ্যে কাবুলকে গুলজার করিয়া তুলিলেন। তিনি রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন, ইমারত নির্মাণ করাইলেন, মোটর চালাইলেন, বৈদ্যুতিক তার লাগাইলেন, উদ্যান প্রস্তুত করাইলেন, হাসপাতাল স্থাপন করিলেন। আধুনিক জগতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমৃদ্ধি দ্বারা কাবুলকে গৌরবময় করিয়া তোলাই তাঁহার প্রাণের একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি তদুদ্দেশ্যে নিজের দেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া তরুণদিগকে শিক্ষালাভের নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইলেন—যাহাতে তাহার ইঞ্জিনিয়ারিং, খনির কাজ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে এবং যাহাতে নিজের দেশে নিজের লোকেরাই কাজ করিতে পারে!'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কাবুল শহরে বালিকাদের জন্য কয়টি স্কুল স্থাপন করিয়াছে। —তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া এবং গণনা করিয়া বলিলেন—'কাবুলে ৬টি বালিকা বিদ্যালয় স্বয়ং মহারানি সুরাইয়া স্থাপন করিয়াছেন। আমি উক্ত স্কুলসমূহ

...ক করিতাম। স্বয়ং মহারানি মেয়েদের পরিক্ষা নিতেন এবং যখন তখন স্কুল
...দর্শন করিতে যাইতেন। এই স্কুলে যাহারা ভর্তি হইত তাহাদের মধ্যে গরিব
...বদের জোড়া-জোড়া কাপড় এমন কি জুতা মোজা পর্যন্ত মহারানি দিতেন।
...শাহ স্বয়ং প্রত্যেক মেয়েকে রাজকোষ হইতে বৃত্তি দিতেন—যাহাতে লোকে কাপড়
...ত্তির লোভে মেয়েদিগকে পড়ায়।'

...তঃপর তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আমি ইউরোপ, মিসর এবং সিরিয়ার
...লয়সমূহ দেখিয়াছি। আমি বলিতে পারি যে, কাবুলের বিদ্যালয় ঐ সকল
...লয় অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং কোনো কোনো বিষয়ে উৎকৃষ্টতর।
...শাহ স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপে ও তুরস্কে এই কারণে পাঠাইলেন যে, সেখানে গিয়া
...রা প্রত্যেক রকমের আধুনিক শিক্ষা লাভ করিয়া আসে—যাহাতে এই অশিক্ষিত
...শের বালিকাদের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বাহির হইতে শিক্ষয়িত্রী আনিবার
...য়োজন না হয়। শিক্ষার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে প্রেরিত ঐসকল বালক-বালিকাদের
...চের জন্য রাজকোষের দ্বার বাদশাহ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগকে হাজার
...ার পাউন্ড মাসিক খরচ পাঠান হইত।'

...হারানি সুরাইয়ার কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, 'আমার কন্যা অতিশয় সুশীল,
...দয়া ও আপন-ভোলা মেয়ে। তিনি নিজের স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা, সর্ব সময়ে
...কে-দুঃখে তাহার ছায়াতুল্য সহচারী। আর তাহাদের দাম্পত্য-প্রেম অত্যন্ত গাঢ়।'

আমি বলিলাম, 'মহারানি সুরাইয়া অতিশয় ভাগ্যবতী। চিন্তা করিবার কিছুই নাই-
...দিও তিনি এখন আর আফগানিস্তানের 'বদ্‌বখত্' ও 'ছেয়াহ্ বখত্' লোকদের উপর
...ত্ব করিতেছেন না, কিন্তু তিনি বাদশাহ আমানুল্লাহর উপর রাজত্ব করিতেছেন।
...ন সুরাইয়া বাঁচিয়া থাকুন, বাদশাহ আমানুল্লাহ দীর্ঘজীবী হউন।'

মহারানির মাতা বলিলেন, 'যিনি নিজের দেশবাসী এবং আপন প্রজাদের রক্তপাত
...রিতে অনিচ্ছুক এবং যিনি শুধু রক্তপাতকে এড়াইবার জন্য নিজের দেশ ছাড়িয়াছেন,
...ন পুণ্যশ্লোক বাদশাহকে 'কাফের' ফতোয়া দেওয়া হইল! প্রকৃতপক্ষে, ঐ বদ্‌বখত্
...লিশুদ্ধ জাতি বাচ্চাই-সাক্কার মতো ডাকাতের রাজত্বেরই উপযুক্ত। বাচ্চাই-সাক্কা, সে
...সে কেবল 'হ্যাট' পরার অপরাধে লোকেদের শিরচ্ছেদ করিয়াছে। সে সকল
...ম দোষ এবং পাপের বাজার গরম রাখিয়াছে; তাহার লোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে
...স্ত অপমানিত করিয়াছে। আমানুল্লাহ্ খাঁকে এই জন্য 'কাফের' বলা হয় যে, তিনি
...ন্যায় কার্য করিবার অনুমতি দেন নাই। তিনি অন্যায়কারীদের পরম শত্রু। তিনি
...স্তপ্রিয়, দয়ালু-হৃদয় এবং ধার্মিক। তিনি প্রাচীন কালের দাসত্ব মোচন করিয়াছেন।
...ন বদ্‌বখত্ আফগানিস্তানকে চিরদিনের জন্য স্বাধীন এবং সভ্য করিয়া গড়িতে
...য়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ মহাত্মাকে 'কাফের' বলাই চাই।'

মহারানির মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, রাজকুমারীদিগকে দেখিয়া এবং মহারানির
...ত আর একদিন আসিয়া দেখা করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া, যাহা হউক, গৃহে
...রিয়া আসিলাম। আজকে এমন পাষাণ হইতে পাষাণতর কে আছে যে, প্রকৃত
...লমান পুণ্যাত্মা বাদশাহ্ আমানুল্লাহ এবং মালেকা সুরাইয়ার জন্য চক্ষু সজল এবং
...ক দীর্ঘশ্বাস না রাখে!

সমাপ্ত,
ভদ্র, ১৩৩৬।

সুবেহ্ সাদেক

জাগো মাতা, ভগিনী, কন্যা—উঠ, শয্যা ত্যাগ করিয়া; অগ্রসর হও। ঐ শুন, মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। তোমরা কি ঐ আজান-ধ্বনি, আল্লাহর ধ্বনি শুনিতে পাও না? ঘুমাইও না; উঠ, এখন আর রাত্রি নাই, এখন সুবেহ সাদেক—মোয়াজ্জিন আজান দিতেছেন। যৎকালে সমগ্র জগতের নারীজাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহারা নানা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা করিয়াছে—তাহারা শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছে, ডাক্তার, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, যুদ্ধমন্ত্রী, প্রধানা সেনাধ্যক্ষা, লেখিকা কবি ইত্যাদি হইতেছে—আমরা বঙ্গনারী গৃহ-কারাগারে অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে মেজেতে পড়িয়া অকাতরে ঘুমাইতেছি, আর যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া হাজারে হাজারে মরিতেছি।

আমরা নিজেদের জন্য যাবতীয় অভিসম্পাত 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিয়াছি অন্য সময়ের গতির সহিত সমপদক্ষেপে নড়িব না। আমরা শপথ করিয়া বসিয়া আছি আজানের শব্দ শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করিব না। কিন্তু তাহা যে আর হইবে না ভগিনীগণ! আপনারা স্বীয় কারাগারের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়া উকি মারিয়া একবার বাহিরের জগৎ দেখুন দেখি!

আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুনিয়াছি যে, আমরা জন্মিয়াছি দাসী, চিরকাল দাসী, খাঁটি দাসী।

আহ! কবি বড় দুঃখে গাহিয়াছেন—

'মনের মরম ব্যথা প্রকাশিতে নারি,
কত পাল ছিল তাই হয়েছিনু নারী।'

আমাদিগকে 'নাকে সুল আকেল' বলিয়া দুনিয়ার সমস্ত দোষ আমাদের স্কন্ধে চাপানো হয়। আমরা মুক বলিয়া কোনো কালে এইসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করি নাই, আমাদের প্রতি পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হয়—আমরা তাহাতেই গৌরব বোধ করি।

কিছুকাল হইতে আমাদের প্রভুগণ আমাদিগকে মূল্যবান অলঙ্কারের শামিল গণনা করিতেছেন। তাই দেখুন কত প্রকারের 'নারী রক্ষা সমিতি' গঠিত হইতেছে! বাস্তবিক, আমরা যখন জ্যান্ত লগেজ,তখন যাহাতে আমরা চুরি না হইতে পারি, সেজন্য জগদ্দল প্রহরীর প্রয়োজন। আমার অভাগিনী ভগিনীগণ! আপনারা কী ইহাতে অপমান বোধ করেন না? যদি করেন তবে এই নির্মম অবমাননা নীরবে হজম করেন কেন?

একবার নিজের দিকে চাহিয়া দেখুন দেখি—আমাদিগকে পশুর সহিত তুলনা করা হয়। তাই দেখুন, 'পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির' পার্শ্বে 'নারীরক্ষা সমিতি।' ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অপমান আর কী হইতে পারে? যাহা হইক, এখন এ অপমানের ইতি হওয়া চাই।

ভগিনীগণ ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন—অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী। আমরা আসবাব নই ; বলো কন্যে। আমরা জড়োয়া অলঙ্কার-রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো—

...ঘুম! আর কার্যতঃ দেখাও যে আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ ... পক্ষে আমরাই সৃষ্টি জগতের মাতা। তোমরা নিজের দ্বারা ... রক্ষার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।

শিক্ষা বিস্তারই এইসব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। ... দিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত ... সেই বলি; গোটা কত পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে ... আমি চাই সেই শিক্ষা— যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে ... করিবে, তাহাদিগকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিণী এবং আদর্শ মাতা-রূপে গঠিত করিবে! শিক্ষা— মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। ছাত্রীদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ী, ক্লিপ ও বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য পালনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে! তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও অনুগ্রহ না হয়।

শারীরিক শিক্ষার জন্য আমার মতে লাঠি ও ছোরা খেলা, ঢেঁকির সাহায্যে ধান ভানা, যাঁতায় আটা প্রস্তুত করা এবং যাবতীয় গৃহকর্ম শিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত। এক. ধান ভানা ও যাঁতা চালনায় দেশের সর্ববৃহৎ খাদ্য সমস্যা পূরণ হইবে। অধুনা ঢেঁকিছাটা তণ্ডুল ও যাঁতায় পেষা আটার অভাবে দেশের লোক মৃত্যুস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ব্যায়াম, লম্ফ-ঝম্ফ, নৃত্য ইত্যাদি অপেক্ষা উপরোক্তরূপ শরীরচর্চা শতগুণ শ্রেয়। খোলা মাঠে প্রাতভ্রমণও অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। গবর্নমেন্ট এখন শিশুরক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়াছেন, ভালো কথা, কিন্তু প্রথমে শিশুর মাতাকে রক্ষা করা চাই।

যাহা হউক, মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না,— উঠ, কর্তব্য-পথে আগ্রসর হও।

মোয়াজ্জিন,
আষাঢ়-শ্রবণ, ১৩৩৭।

ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম

মাননীয় সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণ!

আমি সর্বদা আপনাদের এই স্কুলের বিষয় নিয়ে বিরক্ত করে থাকি। এমনকি, অনেকে আমাকে এজন্য একটা nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, তবে আমার কোনো দেবতা থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে বলতেন—'প্রার্থনা সময়ে 'ধনং দেহি, মানং দেহি' এসব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল একঘেঁয়ে—'স্কুলের জন্য গৃহং দেহি, স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি' বলে। দাও বেটীকে লাথি মেরে তাড়িয়ে!'

আজ আমি আপনাদের নিকট খানিকটা সময় ভিক্ষা চাই যে, আপনারা দয়া করে ধৈর্যের সহিত আমার দুটি কথা শুনুন।

আপনারা সকলেই জানেন যে, এই 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল [illegible] থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয় হবে না যে—

ঘুঘু চরবে আমার বাড়ি,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ি,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ি—
অন্তিম দশায় খাবি খাব!

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ-স্কুলের উন্নতি কেন চাই, চাই, নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নয়; চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দদুটির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয় তবে সাইনবোর্ড থেকেও শব্দদুটি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোনো বংশধর নাই যে, তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব, কিম্বা তাদের দুষ্কিয়া দেখে আমি লজ্জিত হব। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথাব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।

একবার ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখুন—এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙালি হিন্দুর আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলোক এসে উঁকি মারলে, তখন তাঁরা চোখ খুললেন, পরে পাখির কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, 'আর রাত্রি নাই ভোর হইয়াছে', তখন তাঁরা অলসশয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায়?—এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায়; সুতরাং তখন তাঁরা দলে দলে খ্রিস্টান হতে আরম্ভ করলেন—ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বদলে 'ব্যানার্জ্জি হলেন, আর সরকার হলেন 'সিরকার'! সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজহিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তন করে হিন্দুকে সবংশে খ্রিস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হল—তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর খ্রিস্টানের স্কুল পড়তে যায় না। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।

অপরদিকে মোসলেম সমাজ যখন 'ঝোঁপড়ী মে শুয়ে মহলের খাব' দেখছিলেন, সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোঁপড়ীর ভাঙা চালের ভিতরও উঁকি মারলে তখন তাঁরা আর কেবল 'পন্দেনামা' আর 'শাহনামা' পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খ্রিস্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের জন্য স্কুল-কলেজ কিছুই করলেন না। তাঁরা খ্রিস্টানের কলেজে লেখাপড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন—বলেন বিলাতি বুলি; চাকরকে বলেন বেহারা, আর মুটেকে বলেন কুলি!'

তখন পর্যন্ত মোসলেম সমাজের ততবেশি অপকার হয় নাই; কারণ বাপ ক্লাবে গিয়ে চা খান, না চুরুট খান, ছেলেমেয়েরা তো দেখতে পেত না—তারা বাড়িতে নামাজী মুসল্লী মাকে সর্বক্ষণ দেখত—সেই আদর্শে তারা খেলা করত, নামাজ নামাজ খেলা; আর পুব, দক্ষিণ যে-কোনোদিকে মুখ করে আজানের অনুকরণে 'আল্লাহু আকবর' বলে আজান দিত।

ক্রমে শিক্ষিত বাপ মেয়েকে আর শুধু 'রাহেনাজাত' এবং 'সোনাভান' পুঁথি পড়িয়ে

[illegible] পারলেন না তাই তাঁরা মেয়েদের দিলেন [illegible]
Convent-এ পড়তে গিয়ে লয়লার নাম বদলে হল [illegible]
[illegible]। হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়শার নাম হল 'আশা', আর কুলসুম হয়ে গেল [illegible]
[illegible] হয়ে থামলেও ক্ষতি ছিল না, আমাদের অধঃপতনের ঐখানেই শেষ নয়।
পরবর্তী যুগে জেনির ছেলেমেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হল খ্রিস্টান আয়ার, যাতে
ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই ইংরাজি কথা বলতে শিখে। আর তার মেয়ের নাম হল
'রেবেকা আরীফ'। এখন বারবারা ঘরে তো আর মাকে নামাজ পড়তে দেখে না; সুতরাং
মেয়েখেলার আদর্শ হল গির্জা। আর Convent থেকে গান শিখে বাড়িতে এসে গায় :

'Jesus saves me this I know,
For the Bible tells me so--'!

কিম্বা :

'মুসলমান বেইমান,
মারো জুতা, পাকড়ো কান!'

অপরদিকে আমাদের কুসুমের মেয়ের নাম হয়েছে 'সৌদামিনী বেগম'! সৌদমিনীর খেলার আদর্শ হয়েছে পূজা, আর মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়া। আর সে গান করে :

'যমুনার মাটি অঙ্গেতে লেপিয়া
হরি নাম লিখ তায়;
সব সখী মিলে বল হরি হরি,
যখন পরান যায়।'

অথবা :

'নড়ে মুসলমান,—
তার না আছে ধন, না আছে মান!'

[illegible] দিন Bengal Women's Education Conference উপলক্ষে জনৈক উচ্চশিক্ষা
[illegible]সলমান ব্রাহ্ম' মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন যে,
[illegible]হেতু তাঁর বাল্যকালে মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, তাই তাঁর
[illegible]বা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে গিয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যেভাবে
[illegible]য়েছে তাতে তিনি কোরআন, হাদীস আলোচনা করবার সুযোগ পান নাই। সুতরাং
[illegible]নি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেন নাই।

ঐরূপ একটি সুশিক্ষিতা মহিলাকে তাঁর পিতামাতা এবং ভ্রাতাসহ মোসলেম সমাজ
[illegible]রচের খাতায় লিখতে বাধ্য হল। স্ত্রীশিক্ষা অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানা
[illegible]কারের খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশ ভারী হয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের খরচের
[illegible]তা কিরূপে বেড়ে যাচ্ছে, তার একটু আভাস দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি

গত ৮ মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় 'সাখাওয়াত মিমোরিয়াল গার্লস স্কুলের' ম্যানেজিং কমিটির অধিবেশনে উপরোক্ত লেখাটি সেক্রেটারি সাহেব কর্তৃক পঠিত হয়। সভায় প্রেসিডেন্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

যে, কোনো কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, [illegible] পাত্রী না পেলে তাঁরা বিয়ে করবেন না; মোসলেম সমাজে যদি একান্তই [illegible] না পাওয়া যায়, তবে তাঁরা খ্রিস্টান হয়ে যাবেন।

কেউ আবদার করে কাঁদেন যে, 'মা আমাকে একটা নিরক্ষর মেয়ের সঙ্গে [illegible] দিয়েছেন; এখন তিনিই বউ নিয়ে থাকুন—ও কাঠের পুতুল নিয়ে আমি ঘর করতে পারব না।' কোনো ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আই.এ. পাস পাত্রী চাই। কেউ চান অন্তত ম্যাট্রিক পাস; তা না হলে তাঁরা খ্রিস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এসব বিকৃতরুচির প্রধান কারণ—বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা। এলাহাবাদের কবি আকবর সাহেব [illegible] বলেছেন—

'তিফিল মেঁবু আয়ে কেয়া মাঁ বাপ কে আতওয়ারি কী?—
দুধ তো ডিব্বে কা হায়, তালীম হায় সরকার কী।'

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরে এখন 'এম.এ.পাস' বউ না হলে আলো হয় না। কিন্তু এজন্য সে বেচারাদের গালাগালি না দিয়ে বরং যাতে তাঁরা আমাদের হাতছাড়া না হন, তারই ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার আরও জানা আছে যে, অনেক বিকৃতমস্তিষ্ক ধর্মহীন লোক উপযুক্তা বিদুষী ভার্যার হাতে পড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাকা মুসুল্লী হয়েছেন।

এই বিংশ-শতাব্দীতে যৎকালে অন্যান্য জাতি নিজেদের প্রাচীন প্রথাকে নানারকমে সংস্কৃত, সংশোধিত ও সুমার্জিত করে আঁকড়ে ধরে আছেন; আমাদেরই উত্তরাধিকার 'তালাক' 'খোলা' প্রভৃতি সামাজিক প্রথা নিজেদের মধ্যে সংযোগ করে, 'পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার বিল' পত্নীত্যাগ বিল', 'পতিত্যাগ বিল' ইত্যাদি নানারকমের বিল পাস করিয়ে নিবার চেষ্টা করছেন, তৎকালে আমরা নিজেদের অতি সুন্দর ধর্ম, অতি সুন্দর সামাজিক আচারপ্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত জানোয়ার সাজতে বসেছি 'সুরেন্দ্র সলিমুল্লা, স্যামুয়েল খাঁ' গোছের নাম শুনতে কেমন লাগবে?

ফল কথা, উপরোক্ত দুরবস্থার একমাত্র ঔষধ—একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়—যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলার এবং গোলটেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছেন, আমাদের মেয়েরা কোন্ পাপে ঐসব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে? আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিতা হবে—যাদের সন্তানসন্ততি হবে হজরত ওমর ফারুক, হজরত ফাতেমা জোহরার মতো। এরজন্য কোরআনশরিফ শিক্ষার বহুলবিস্তার দরকার। কোরআনশরিফ,অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুলপ্রচার একান্ত আবশ্যক।

ছেলেবেলায় আমি মার মুখে 'শুনতুম,—'কোরআনশরিফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।' সে-কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, খুব বড় আকারের বুকের জেলদ বাঁধা কোরআনখানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কোরআনশরিফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানাপ্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআনশরিফের বিধান অনুযায়ী ধর্মকর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।*

মাসিক মোহাম্মদী,
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

---

* পরম ভক্তিভাজন বেগম ছাখাওয়াত হোছেন সাহেবের এই প্রবন্ধটি আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পুনঃ মুদ্রিত করিলাম। প্রকৃত কাজের কদর যে-সমাজে নাই, তাহাতে কাজের লোকের সৃষ্টি খুব কমই হইয়া থাকে এবং কৃচিৎ কদাচিৎ হইলেও সমাজের উপেক্ষা ও অবহেলার আঘাতে অনেক সময়ে মানুষের প্রাণ অবসাদে-অভিমানে মুসড়িয়া পড়ে। লেখিকার ন্যায় আদর্শমহিলা সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা করার যে বিশেষ কোনো কারণ নাই, তাহা অবগত আছি। কিন্তু তত্রাচ বলিতে হইতেছে, তাঁহার এই লেখার ছত্রেছত্রে, বাহিরের হাসিকৌতুকের অন্তরালে ক্ষোভের একটা মর্মান্তিক জ্বালা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। সমাজের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে, আমাদিগকে আজ এ অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না।
এই প্রবন্ধে লেখিকা একস্থানে বলিয়াছেন—'আমার কোনো বংশধর নাই।' আমরা তাঁহার এই ধারণার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। আল্লাহতায়ালার মঙ্গলময়ত্বের কোমল-কঠোর আঘাতে যে মাতৃহৃদয়ের বিগলিত করুণাধারা 'পিপাসার' নামে কারবালার মরুপ্রান্তরেও স্বর্গের ছল-ছবিল প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, একের বাঁধ ভাঙিয়াই তো সে আজ সহস্রমুখী হইতে পারিয়াছে। তাই তো আজ তিনি একটিকে বিসর্জন দিয়া শতসহস্র কন্যার মাতৃকর্তব্যের গৌরবময় জ্বালা বুক পাতিয়া লওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন।

সম্পাদক : মাসিক মোহাম্মদী।

হজের ময়দানে

[৯ জিলহজ্জ]

অদ্য পবিত্র হজের দিন। এই তীর্থযাত্রা মুসলমানদের ধর্মের চারি অঙ্গের একটি অঙ্গ। প্রথম অঙ্গ নামাজ, দ্বিতীয় রোজা, তৃতীয় জাকাত এবং চতুর্থ হজ।

প্রত্যেক বয়োঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য অন্তত জীবনে একবার হজব্রত পালন করা অবশ্যকর্তব্য । পরিষ্কার বস্ত্র, সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শরীর, সর্বোপরি ভক্তিপূর্ণ বিশুদ্ধ মন, পবিত্র প্রাণ লইয়া হজ করিতে হয়। যাত্রার পূর্বে সমস্ত দেনাপাওনা চুকাইয়া, স্ত্রীপরিজন বা অপর পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতে হয়। পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে থাকা চাই। উপরন্তু অশ্রুতপূর্ব ঘটনা কিম্বা বিপদআপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত হাতে কিছু অতিরিক্তি টাকাও থাকা চাই। মক্কাশরিফে গিয়া যেন পরের দ্বারস্থ বা গলগ্রহ হইতে না হয়। এক-কথায়, পার্থিব সমস্ত বিষয় হইতে অবসর লইয়া আল্লাহর দরবারে ধন, মন, তন, প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়।

'ওমর'হকে সাধারণত ছোট হজ বলা হয়। হজ ও 'ওমরাহ'তে অতি সামান্য পার্থক্য আছে। 'ওমরাহ' সকল সময়ই পালন করা যায়, কিন্তু হজ বৎসরে একবারমাত্র জিলহজ চন্দ্রের ৯ তারিখে সম্পন্ন করিতে হয়।

৯ জিলহজের দিন এই হজব্রত পালন করা হয় এবং যাত্রিগণের ৭তারিখের পূর্বেই মক্কাশরিফ পৌছা কর্তব্য। হজের সময় কী কী বিধান পালন করা কর্তব্য, তাহা সেখানে গেলে তথাকার 'মু'-অল্লিম'দের নিকট সহজেই শিক্ষা করা যায়।

প্রধান ক্রিয়া 'আরকান'সমূহ মোটামুটি এই :

১. ইহরাম বাঁধা। এসময় সমস্ত পোশাক খুলিয়া বিনা সেলাইয়ের দুইখণ্ড শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে হয় ও সমস্ত মস্তক অনাবৃত রাখিতে হয়।

২. তওয়াফ, অর্থাৎ কাবা ঘরের চতুর্দিকে সাতবার প্রদাক্ষণ করা।

৩. সাঈ, অর্থাৎ 'সাফা' এবং 'মারওয়া' নামক দুইটি ছোট পাহাড়ের উপত্যকায় সাত বার দৌড়ানো।

৪. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।

ইহাতে দেখা যায় যে, ইহরাম সমস্ত নরনারীকে তুল্য অবস্থায় রাখে—পুরুষ ও নারীর স্থান সমান। সকলেই সেলাইবিহীন শাদাসিদে কাপড় পরে এবং সকলেই আড়ম্বরশূন্য সাধারণভাবে সাধু জীবনযাপন করে। ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ, স্বদেশী, বিদেশী সকলে এক সাম্যমন্দিরে অবস্থান করে। এইদিন এই স্থানে রাজা, বাদশাহ আর নগণ্য কৃষকে কোনো প্রভেদ থাকে না। ইহরামে পুরুষ ও নারীর স্থান সমান।*

* 'ইহরাম' নরনারী নির্বিশেষে সকলকে বাঁধিতে হয়। তবে স্ত্রী ও পুরুষের জন্য ইহার প্রকারভেদের ব্যবস্থা আছে। মুখ আবৃত করিয়া রাখাই নারীদের ইহরামের প্রধান অঙ্গ।

সম্পাদক : মাসিক মোহাম্মদী।

সেখানে পদ ও বর্ণ, সম্পদ ও জাতি, রাজা ও প্রজায় কোনোই প্রভেদ নাই। সৃষ্টার সম্মুখে সকল মানবজাতি সেখানে একই আকার ধারণ করিয়া আছে। সেই কারণে 'আরাফাত' নামক আশ্চর্য মরুভূমিতে সমগ্র মানবজাতির সাম্যই সুন্দর ও মহৎ দৃশ্য। আরাফাতেই মানুষ সৃষ্টিকর্তার প্রকৃত পরিচয় পাইতে সক্ষম হয়।

সমগ্র পৃথিবীর আর কোনো স্থানে এরূপ সাম্য ও ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হয় না। তীর্থযাত্রীর অবস্থা, তীর্থযাত্রার আনুসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ, পরিভ্রমণ ইত্যাদিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভক্তবৃন্দ আল্লাহতায়ালার প্রেমে অনুপ্রাণিত।

নির্বিকার ও সত্যকার 'ঈশ্বরপ্রেম' এই স্থানেই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। উপাসকের হৃদয়ে প্রেমবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, নিজের শরীর তাহার নিকট অবহেলার বস্তু। নিজের মনপ্রাণ আল্লাহর দরবারে বিসর্জন দেওয়াতেই তাহার পরম আনন্দ। প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় সে বাঞ্ছিতজনের গৃহের চারিপাশ দ্রুতপদে প্রদক্ষিণ করে এবং দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। বস্তুত সে নিজের সত্তা পারমার্থিক সত্তার মধ্যে বিলাইয়া দিয়া নিজের সকল স্বার্থ ভুলিয়া নিজকে সম্পূর্ণরূপে পরমাত্মার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়াছে।

তীর্থযাত্রী পার্থিব সকল যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছে, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তাহার আর কোনো আকর্ষণ নাই। তীর্থ ভ্রমণই (অর্থাৎ হজ) আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম উৎকর্ষ। তীর্থযাত্রী (হাজী) তাহার বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা পৃথিবীর নিকট প্রচার করিয়াছে যে, 'মানবতার চরম সার্থকতা লাভ করিতে হইলে পার্থিব যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার সহিত প্রকৃত সংযোগ রাখিতে হইবে।'

'আরাফাত' প্রান্তরে এই দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে। সেখানকার জলবায়ু এমনই আল্লাহপ্রেমের মদিরায় পরিপূর্ণ যে, সেখানে অবস্থানকালে মানুষের বাহ্যিক জ্ঞান থাকে না; তাহার একমাত্র কাম্য হয়, আল্লাহর সান্নিধ্যলাভ। তাহার শিরায়-শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে প্রেমের বিদ্যুৎ চলাচল করে। তাহার মনোগত ভাব এই হয়—

'কী যেন স্বপনে হারাই আপনে,
মনেই থাকে না এ যে ধরাতল।'

এই অবস্থায় হাজীর মনের ভাব অতি নির্মল ও পবিত্র হয়। কোনো একটা বটতলার পুঁথিতে দেখিয়াছি, বেহেশতবাসীদের মধ্যে কোনো কোনো পুণ্যাত্মা একবার আল্লাহর দর্শন পাইবেন, সে-সময় আর তাঁহারা বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না, মিনতি করিয়া বলিবেন—

বেহেশতে না যাব মোরা, মেওয়া না খাইব,
দেখিয়া তোমার রূপ এইখানে রব।

আরাফাতের প্রান্তরে দাঁড়াইয়াও হয়তো লোকের মনের ভাব এইপ্রকার হয়। অন্তরের অন্তর হইতে সুর বাজে—

'নাহি চাহি ধন-জন-মান—
নাহি, প্রভু! অন্য কাম!

আহা! এ ময়দান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না!'

হজ সমাপনান্তে কোরবানীর পালা। কোরবানী বলিতে হাজীগণ পশু হত্যা করেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মনের সমস্ত কলুষ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, দুষ্ক্রিয়ার কুপ্রবৃত্তি অন্তরের যাবতীয় কালিমা হত্যা করিয়া নির্বাণ মুক্তিলাভ করেন।

হজের সময় নরনারীর তুল্য অধিকার। উভয়ের পরিধেয় একই প্রকার সেলাইবিহীন দুই খণ্ড বস্ত্রমাত্র। এখানে জরীর লেস, ঢাকা নতুন ফ্যাসানের বোরকা নাই, ঘেরা-টোপ ঢাকা পালকিও নাই। শরীফজাদী বিবিদিগকে পদব্রজেই সাফা এবং মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপত্যকায় দৌড়াইতে হইবে; কাবাশরিফ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। এসময় পুরুষদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি ও ঠেলাঠেলি অনিবার্য।*

ভারতীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা হজের জন্য আলাদা 'পরদাশীন' দিবস প্রচলন করেন না কেন? কলিকাতায় যেমন প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অবরোধবন্দিনীদের জন্য একটি বিশেষ দিন ধার্য করা হয়, ভারতীয় শরীফগণ সেইরূপ নারীর জন্য হজের স্বতন্ত্র দিন ধার্য করিতে পারিলে বুঝিব, তাঁহারা মরদ বটে।

পরিশেষে ভক্তির সহিত এই প্রার্থনা করি, যেন সকল মুসলিম নরনারী জীবনে একবার হজের প্রান্তর দেখিতে পায়।-আমীন।

মাসিক মোহাম্মদী
বৈশাখ, ১৩৩৯

---

* কোনো এক সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'তে শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন—'যাহারা নারীর জন্য অবরোধ প্রথাকে ইসলাম ধর্মের অঙ্গ বলে, তাহাদিগকে ফতওয়া দেখাইতে হইবে যে, স্ত্রীলোকের জন্য হজ নিষিদ্ধ। কারণ, হজ করিতে গেলে নারীকে সর্বপ্রকার ইহরামের সময় মুখাবরণ খুলিতে হইবে।' ইত্যাদি—লেখিকা।

বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল

[সফল স্বপ্ন]

সে বহুদিনের কথা (১১০৫ খ্রি.)। তখন আমরা ভাগলপুরের বাঁকা নামক সাবডিভিশনে ছিলাম। মরুহুম ডেপুটি সাহেব (আমার পূজনীয় স্বামী) 'টুর'-এ গিয়াছিলেন; আমি বাসায় সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম। সময় যাপনের নিমিত্ত কিছু একটা লিখিলাম। তিনি দুইদিন পরে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুইদিন আমি কী করিতেছিলাম! তদুত্তরে আমি তাঁহাকে খসড়া লেখা, 'Sultana's Dream' দেখাইলাম। তিনি দাঁড়াইয়াই সমস্ত পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন-'A Terrible Revenge.' (ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ!) অতঃপর তিনি সেই রচনাটা ভাগলপুরের তদানীন্তন কমিশনার মি. ম্যাকফারসনের নিকট সংশোধনের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন!

যথাসময়ে লেখাটা মি. ম্যাকফারসনের নিকট হইতে ফেরত আসিলে দেখা গেল, তিনি কোথাও কলমের আঁচড় দেন নাই। তিনি সেইসঙ্গে ডেপুটি সাহেবকে যে-পত্র দিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন, 'The ideas expressed in it are quite delightful and full of originality and they are written in perfect English. ** I wonder if she has foretold here the manner in which we may be able to move about in the air at some future time. Her suggestions on this point are most ingenious.

ভাবার্থ—

'ইহাতে যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আনন্দপ্রদ এবং অপূর্ব। রচনার ইংরাজিও নিখুঁত। ০০০আমি সবিস্ময়ে মনে করি, সুদূর ভবিষ্যতে আমরা বায়ুপথে কিরূপে ভ্রমণ করিব এখানে লেখিকা তাহারই আভাষ দিয়াছেন। এ-বিষয়ে কল্পনা অতি মনোরম।'

যে-সময় আমি 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখিয়াছিলাম, তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি সে-সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আইসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্তত আমি তখন সে-সব কিছুই দেখি নাই।

প্রায় ছয় বৎসর পরে (১৯১১ খ্রি.) কলিকাতায় আসিয়া প্রথম হাওয়াই জাহাজ অতি দূর হইতে শুন্যে উড়িতে দেখিলাম। আমি নিজে কখনো উড়োজাহাজে উঠিতে পাইব, এরূপ আশা কখনোই করি নাই। শুধু নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতাম।

গত ৩১ নভেম্বর (১৯৩০ খ্রি.) রবিবার সন্ধ্যার পর যখন শ্রীমান মোরাদ আসিয়া বলিলেন, 'খালাআম্মা, চলুন, আগামী পরশু আমার প্লেনে আপনাকে উড়াইয়া আনি; কলিকাতার চারিদিকে উড়িতে প্রায় ৩৫ মিনিট লাগিবে!' তখন আমার প্রাণ অভূতপূর্ব আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

এ-শুভ সংবাদে বেশি লোককে জানাইলাম না দুই কারণে :—প্রথম কারণ এই যে,

মাত্র দুইমাস পূর্বে, 'আর ১০১' নামক সুবৃহৎ এরোপ্লেন ধ্বংস হওয়ায় হতভাগ্য আরোহী সশরীরে নরকানলে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার বিভীষণমূর্তি মনে তখনো জাজ্বল্যমান থাকায় সকলের মনে এরোপ্লেন সম্বন্ধে ভয়ানক আছে বলিয়া আমাকে লোকে উড়িতে বাধা দিবে। দ্বিতীয় কারণ, অনেকে লইয়া উপস্থিত থাকিবে আমার ফটো লইতে।

যথাকালে ২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা শুভযাত্রা করিলাম এক মোটরে মিসেস রাসাদ (শ্রীমান মোরাদের মাতা), তাঁহার তৃতীয় পুত্র কোয়াসেম মিসেস দে এবং আমি; অপর মোটরে আমার ভগিনী ও তাঁহার পুত্রকন্যা প্রমুখ ছিলেন। যাত্রার সময়ে দেখি, আমার এক স্নেহময়ী ভগিনী মিসেস দাউদর রহমান আসিয়া উপস্থিত। তিনিও আমাদের সঙ্গে দমদম চলিলেন।

এরোড্রামে গিয়া দেখি, একেবারে মুক্ত ময়দান! কেবল আমাদের মোটর তিনটি এবং আমরাই। আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়া বঙ্গের গৌরব প্রথম মুসলিম পাইলট শ্রীমান 'মোরাদের' প্লেনে গিয়া বসিলাম। আকাশে উড়িয়া দেখি—ধরাখানা সত্যই সরা তুল্য। আমি ক্রমে ৩০০০ (তিন হাজার) ফিট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি। তখনকার দৃশ্য বড় চমৎকার। আমার দক্ষিণদিকে অস্তগামী সূর্য, বামদিকে ১১ রজবের (দ্বাদশীর) পূর্ণপ্রায় চন্দ্র—উভয়ে যেন আমার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতেছিল। নিচে চাহিয়া দেখি—কলিকাতার পাকা বাড়িগুলি, কোঠাবালাখানা, এমারত সব ইস্টকস্তূপের মতো দেখাইতেছে—হাবড়ার পুল কতটুকু খেলনা বিশেষ, আর হুগলী নদী—সে তো জলাশয়ের সামান্য একটি রেখার মতো দেখাইতেছিল। আমরা পঞ্চাশমাইল চক্কর দিয়া নিচে আসিলাম। আমি নামিলে পরে মিসেস রাসাদ মাত্র ৫ মিনিটের জন্য উড়িলেন। শোকর আলহামদালিল্লাহ।

২৫ বৎসর পূর্বে লিখিত 'সুলতানার স্বপ্নে' বর্ণিত বায়ুযানে আমি সত্যই বেড়াইলাম। বঙ্গের প্রথম মুসলিম পাইলটের সহিত যে প্রথম অবরোধবন্দিনী নারী উড়িল সে আমিই। আমার পূর্বে যে কয়জন বঙ্গীয় মুসলিম মহিলা এরোপ্লেনে উঠিয়াছেন, তাঁহারা উড়িয়াছেন সুদক্ষ ইউরোপিয়ান পাইলটের সহিত। আর তাঁহাদের মাথায় হেলমেট, কানে টেলিফোন এবং চক্ষে গগল্‌স্ ছিল। আমার এসব কিছুই ছিল না। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও নিরুপায় অবস্থায় একটি বালকের সহিত গিয়াছিলাম। মধ্যপথে প্রয়োজন বোধ করিলে মোরাদের সহিত কথা বলিবার আমার কোনোই উপায় ছিল না। শীতকষ্ট হইবে না শুনিয়া গায়ের শালখানাও 'মিসেসদের হাতে ফিরাইয়া দিলাম। প্লেনে বসিলে মোরাদ বলিলেন, 'খালাআম্মা! ভালোমতো কান ঢাকিবেন।' যাহ্! কান আবার কী দিয়া ঢাকিব?—শালটাও তো ফেলিয়া আসিলাম। সে-সময় মাথার আঁচলখানাই ছিল একমাত্র সম্বল। ইঞ্জিনের ভয়ঙ্করগর্জনে যখন কানে তালা লাগিতেছিল, তখন বুঝিলাম, মোরাদ কেন কান ঢাকিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অভ্যন্তরীণ আনন্দের আতিশয্যের তুলনায় সে কষ্ট অসহ্য হইলেও, নগণ্য বোধ হইল।

বিমানবীর মোরাদের সৎসাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

কিন্তু আমি বলি, মিসেস রাশাদের ধৈর্য এবং সাহসও কম নয়। বেচারী অসহায়া বিধবা যে কতবড় পাষাণে বুক বাঁধিয়া প্রথম সন্তানটিকে সম্পূর্ণ একাকী কেপটাউন

আত্মমুখে রওনা হইতে দিয়াছিলেন এবং এখনো মোরাদকে একাকী বিদ্যালয়ে যাওয়া প্লেনে কাজ শিখিতে দিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। আল্লাহ তাঁহার সহায় হউন। আমীন!

মোয়াজ্জিন,
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

নারীর অধিকার

আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্রপাত্রীর দ্বারা। তাই খোদা না করুক, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক-তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্তত এইটে তো প্রায় প্রতিক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থশ্রেনীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোনো ত্রুটি হলেই স্বামী দম্ভ ভরে প্রচার করে, 'আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব।' তারপর ঘরের ভিতর বসে কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে নিয়ে; সামনে বারান্দায় কিম্বা উঠানে বসে স্বামী নামক জীবটাকে নিয়ে কতকগুলি পুরুষ; এইসব লোকগুলির সামনে স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে :

'আয়েন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক
আজ জরুরে দিলাম তালাক।

এই সময় পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধহয়, নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে। এরপর কোনো বয়স্কা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ধরে তার কানের, নাকের, হাতের অলঙ্কারগুলি খুলে শাড়ির আঁচলে বেঁধে দেয়। হাতের কাঁচের চুড়িগুলি এক-টুকরা ইট বা কাঠের সাহায্যে ভেঙে দেয়, আর বলে, 'দেনমোহর মাফ করে দিয়ে যা!' মেয়েটি এই সময় ভয়ানক কাঁদে। বেচারী স্বামী হারিয়ে, সাজসজ্জা হারিয়ে, হাতেগড়া সাধের পাতানো সংসার হারিয়ে রিক্ততার দুঃখ নিয়েই কাঁদে।

এর পরের দৃশ্য—পুরুষটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কোথাও বেড়াতে যায়। আর মেয়েটির বাপ, ভাই, চাচা বা মামু যে অভিভাবকরূপে উপস্থিত থাকে (কারণ এইরূপ দু-একজনকে পূর্বেই ডেকে আনা হয়) সেই অভিভাবকস্থানীয় লোকটি তখন ঐ ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে পালকি কিম্বা গরুরগাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ পুরুষদের বালিকাবিবাহের কত আগ্রহ ও সাধ, সেই সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে একটি ছড়াও প্রচলিত রয়েছে :

'হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে।
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে।'

মাহে-নও;
মাঘ, ১৩৬৪

• ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর, বাংলার মুসলিম মেয়েদের জাগরণের অগ্রদূতী বেগম রোকেয়া বিদায় নিয়েছেন এই মাটির পৃথিবী থেকে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি চিন্তা করেছেন এদেশের অভাগিনী মুসলিম নারী জাতির কথা। ৯ ডিসেম্বর ভোররাত্রে তিনি ইন্তেকাল করেন। সে-রাতেও তিনি ১১টা পর্যন্ত তাঁর টেবিলে বসে কাজ করেছিলেন। যে টেবিলে শেষ লেখাপড়ার কাজ করে তিনি গিয়েছিলেন, সেখানে পরদিন এই অসমাপ্ত লেখাটি পেপার ওয়েটের নিচে দেখা গিয়েছিল। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয়স্বজন, তাঁর পরিবারের সকলের গৌরবের পাত্রী। তাই, তাঁর মৃত্যুর পরে আমার জন্ম হলেও আমার অক্ষর পরিচয়ের আগেই হয়েছিল বেগম রোকেয়ার অপূর্ব জীবন ইতিহাসের সাথে পরিচয়। তাঁর জীবনের শেষমুহূর্তের সাথীর একজনের কাছ থেকে কিছুদিন আগে পেয়েছি তাঁর শেষ চিন্তাধারার দিশা—যে লেখা আরম্ভ করে শেষ করবার অবকাশ আর তিনি পেলেন না মহাকালের ডাকে।

বেগম রোকেয়ার মৃত্যুকালে তাঁর চাচাতো বোন বেগম মরিয়ম রশীদ সাহেবা সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে তাঁর কাছেই ছিলেন। তিনি এই লেখাটি বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তাঁর টেবিল থেকে নিয়ে পরম যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। বছর দুই আগে বেগম মরিয়ম রশীদ পরলোক গমন করেছেন। তার কিছুদিন আগে তিনি লেখাটি বেগম রোকেয়ার প্রিয় শিষ্যা ও সহকর্মিনী বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের হাতে দেন।

বর্তমানে পুরুষের একাধিক বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। বিবাহ ও পারিবারিক আইন, এসবের আলোচনা চলছে। কিন্তু সে-যুগেও বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে বিবাহবিচ্ছেদ ও নারীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলেছিল। এতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেগম সখিনা ফারুখ, সুলতানা মুয়ায়িদজাদা, বেগম সামসুন নাহার মাহমুদ ও আরও বহু মহিলা।

পুরুষদের তালাক দেবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাহ করা সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গের কিছু আভাস এই লেখাটিতে বেগম রোকেয়া দিয়ে গিয়েছেন। বেগম রোকেয়া আজ সশরীরে আমাদের মাঝে নেই; কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার আমাদের তুলে নিতে হবে। তাঁর আরব্ধ মহৎকাজ সম্পন্ন করেই তাঁর স্মৃতির প্রতি প্রকৃত সম্মান আমরা প্রদর্শন করতে পারি। জীবনের শেষমুহূর্তেও তাঁর লেখনী দিয়ে গেছে আমাদের কাজের দিশা। তিনি যে দিশারী।—মোশাফেকা মাহমুদ (নারীর অধিকার' প্রবন্ধটির সংগ্রাহিকা।)

কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন

এখন আমরা হিমালয়ে আছি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল, আমি পর্বত দেখিলাম। পাঠ্যাদিগের নিকট হিমালয় নূতন বোধ না হইতে পারে, কিন্তু আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পুস্তকে সাগর, ভূধর, নির্ঝর ইত্যাদির বিষয় পাঠে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত-নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম, এসব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশি দুঃখ হইত, এই ভাবিয়া যে, সুদূর ইউরোপের লোকেরা আমাদের হিমালয় দেখিয়া যায়, আর আমরাই তাহা দেখিতে পাই না। এতদিনে ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও হিমালয় দেখিলাম।

যথা সময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি স্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিঙ হিমালয় রেল রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ির অপেক্ষা ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলগাড়ি ছোট। হিমালয়ান রেলগাড়ি আবার তাহার অপেক্ষাও ছোট, ক্ষুদ্র গাড়িগুলি খেলেনা গাড়ির মতো বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়িগুলি খুব নিচু।—যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেন অনেক আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল—গাড়িগুলি "কটাটটা"—শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল। পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও অতিউচ্চ (Steep) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

মাঝে মাঝে কয়েকটি Refreshment Room এবং স্টেশন দেখিলাম। প্রায় সব স্টেশনেই Ladie's waiting room আছে। ঘরগুলি বেশ furnished, আমাদের সহযাত্রী ইউরোপিয় ভগ্নিগণ প্রায় প্রত্যেক স্টেশনেই এক একবার নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। Waiting room-এ মুখ ধুইবার পেয়ালাও অনেক—একসঙ্গে চারিজন হাত মুখ ধুইতে পারে। ভগ্নিরা আর কিছু সঙ্গে রাখুন বা না রাখুন, চিরুণী, ব্রাশ পাউডার তো রাখেন। বাঙ্গালি মেয়েরা এত ঘন ঘন চুল বিন্যাস করিতে পারে না। যাহা হউক ইউরোপিয় ভগ্নীদের স্ফূর্তি খুব প্রশংসনীয়। ওয়েটিং রুমে 'ভুটিয়ানী' আয়া উপস্থিত থাকে।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (Sea level) হইতে তিন হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছি, এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভেতর দিয়া চলিয়াছি। নিম্ন উপত্যকায় নির্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড় বড় ঘাস আমি পূর্বে দেখি নাই। হরিদ্বর্ণ চায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। দূর হইতে সারি সারি চারাগুলি বড় সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সঙ্কীর্ণ পথগুলি ধরণীর সীমান্তের ন্যায় দেখায়। নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকাবাঁকা সিঁথি!!

রেলপথে অনেকগুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীমবেগে হিমাদ্রির পাষাণ বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে। ইহাদেরই কোন একটি বিশালকায় জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড় ঝর্ণার নিকট ট্রেন থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধহয় গাড়ি থামিয়াছে।

(বাস্তবিক সেজন্য কিন্তু ট্রেন থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেইখানে জল [illegible] হইতেছিল) যে কারণেই ট্রেন থামুক—আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফিট ঊর্ধ্বে উঠিয়াছি, তবু শীত অনুভব করি। গরমের জ্বালায় যে এতক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইয়া অল্প বাতাস মৃদু গতিতে বহিতেছে। এইখানে ৪১২০ ফিট উচ্চে 'মহানদী' স্টেশনের নামটা খুব ভালোমতো পড়িতে পারি নাই, যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে 'মহানদী'ই নাম। যাহা হউক, যদি স্টেশনের নাম ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমার নহে—স্টেশন হইতে আমার গাড়ির দূরত্বের সে দোষ।

অবশেষে কারসিয়ং স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফিট। স্টেশনে অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া আমি Ladie's waiting room-এ একটু বসিলাম। ইউরোপীয় ভগ্নীদের মুখ ধোয়া এবং কেশ বিন্যাস দেখিলাম। একজনের সঙ্গে কচি ছেলে ছিল, তিনি আমাকে ছেলের মুখ ধোয়াইতে হুকুম দিয়া গাড়িতে উঠিতে গেলেন। আমার কী গরজ, ছেলের মুখ ধোয়াইব? সে তাহার পরিত্যক্ত তোয়ালে দ্বারা ছেলের মুখ মুছাইয়া অনুমান ৯০ সেকেন্ড দেরি করিয়া গাড়ি অভিমুখে ছুটিল। চাকরের উপর নির্ভর করিলে ঐ রূপ হয়। ট্রেন ছুটিলে ভীড় কম হইল, তখন আমরা ওয়েটিং রুম ছাড়িয়া উঠিলাম।

স্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূরে নহে, শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জিলীঙ্গের ঠিকানায় Book করা হইয়াছিল। জিনিসপত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্বে) গৃহসুখ (at home) অনুভব করিতে পারি নাই। সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের ট্রাঙ্কগুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জিলীং যাবার পূর্বে আমাদের জিনিষপত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল। পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যক আসবাব-সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্বত্য বসন্তকাল বলিলে কেমন হয়? সূর্য্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর একদিন মাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ু তো খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভালো নহে। আমরা পানীয় জল ফিল্টারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরণার সুবিমল, শীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, দর্শনে হস্ত জুড়ায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত শীতল বাতাসে, না ঘন কুয়াশায় প্রাণ জুড়ায়।

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হাল্কা। বায়ু এবং মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখিয়া চমৎকার। এই মেঘ এদিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল, মেঘখণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন অস্তমান রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া মনোহর সৌন্দর্য্যের রঙ্গ রচনা করে। পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায় তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড সুকুমার মেঘগুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। ইহাদের এই তামাসা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোন কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার "মহিলা"য় ঢেঁকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেঁকি শাক আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূ-তত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবনিফেয়াস যুগে বড় বড় ঢেঁকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেঁকিতরু স্বচক্ষে

...ভারী আনন্দ হইল। একটা ডাল ভাঙিয়া মাপিলাম ... ফিট, ...
...২০/২৫ ফিট উচ্চ হইবে।

...কোন কোন স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই, তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি, আমরা নির্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভালোবাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক ব্যতীত পর্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিনবার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এদেশে স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটিয়া চাকরানী "ভালু" বলে, জোঁকে কী ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়। ভুটিয়ারীরা দশ গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মতো করিয়া পরে, কোমরে একখণ্ড কাপড় জড়ান থাকে, ফুল জ্যাকেট এবং বিলাতী শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই-এক মণ বোঝা লইয়া অনায়াসে প্রস্তরসঙ্কুল আবুড়াখাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে। ঐ রূপ নিচেও যায়। যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস 'গায়েব' হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে চলে।

মহিলার সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, 'রমণীজাতি দুর্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা।' জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানীরাও ঐ অবলা জাতির অন্তর্গত না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী নহে, সমভাবে উপার্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোকদিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশি বোঝা বহন করে না। অবলারা প্রস্তর বলিয়া লাইয়া যায়। 'সবলেরা' পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে। এখানে সবলেরা বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধহয়।

ভুটিয়ানীরা 'পাহাড়নী' বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে 'নীচেকা আদমী' বলে। যেন ইহাদের মতে 'নীচেকা আদমী'ই অসভ্য। স্বভাবতঃ ইহারা শ্রমশীলা, কার্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু 'নীচেকা আদমীর' সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশঃ সদ্গুণরাজী হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্পস্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশানো ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার 'নীচেকা আদমীর' সঙ্গে বিবাহও হয়। ঐরূপে ইহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

মুসলমান ধর্মে শাস্ত্রানুমোদিত পরদা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, একথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহাবিপদ ভাবে। শাস্ত্রে পরদা সম্বন্ধে যতটুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পরদা প্রথা তদপেক্ষাও কঠোর। যাহা হউক কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত পরদা সে-ই রক্ষা করে, যে সমস্ত মানব জাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড় একটা ঝরণা বহিতেছে, এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কি বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি, বাকী ছিল পর্বতের একটি নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধ তো মিটে নাই যতো দেখি, ততই দর্শন পিপাসা শতগুণে বা... কেবল দুটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব ? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন... ? যতো দেখি যতো ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই। প্রত্যেকটি... প্রত্যেকটি ঝরণা প্রথমে যেন বলে, আমায় দেখ। আমায় দেখ। যখন তাহাদে... বিস্ফারিত নয়নে দেখি তখন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে, আমাকে... আমার স্রষ্টাকে স্মরণ কর। ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়... নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত... কত বিস্তৃত, কি মহান! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র। বালুকাকণা... বলিলেও বড় বলা হয়।

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণকীর্তন না করি... তবে কী কৃতঘ্নতা হয় না ? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে তবে তৃপ্তি হয়... কেবল টীয়া পাখির মতো কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্ততঃ আমার মনে)... উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন... কালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে, 'ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য। তিনিই ধন্য'... তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

কূপমণ্ডুকের হিমালয় বর্ণনা আজি এইখানে সমাপ্ত।

নারী-পূজা

'হিন্দুর নারীমর্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়', একখানি পুরাতন 'ভারতী' পত্রিকার পাতা... উল্টাইতে উল্টাইতে আমি বলিলাম, 'হিন্দুর নারীমর্যাদা অবশ্য প্রশংসনীয়। অন্য কোন... দেশে রমণীর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শন হয় না। হিন্দুর আরাধ্য দেবতা নারী।'

আমার কথা শুনিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দ হাসিয়া উঠিলেন। আমি একটু অপ্রতিভ... হইলাম। জমিলা বেগম প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—'মাফ করুন মিসেস চাটার্জি! এ... দেশে ললনারা পদ দাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে!'

জমিলা একজন বিখ্যাত উকিলের পত্নী ; কুসুমকুমারী রায়ের সহিত ইহার খুব... বন্ধুত্ব। অপর কামিনী আমেনা বেগম বিধবা ; ইনি দশ বৎসর পশ্চিমে ছিলেন ; খুব ভাল... উর্দু জানেন। ইনিও কুসুমের প্রিয় বন্ধু। মিসেস রায়ের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠতা এত... অধিক যে, ইহারা পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন। উক্ত মোসলেম রমণীদের সহিত... আমার পরিচয় মাত্র দুই-তিন মাস হইল হইয়াছে ; কিন্তু কুসুম আমার সমবয়স্কা বাল্য-... সখী।

কুসুমের বসিবার কক্ষে বসিয়াই আমি 'ভারতী' দেখিতেছিলাম। আমি তর্কের জন্য... পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না ; তথাপি আমার ঐ উক্তি লইয়া যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিল। আমেনা বেগম ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—'এ দেশে রমণী জাতি পুরুষের নিজস্ব... সম্পত্তিবিশেষ!'

আমি : ইহা আপনাদের ভ্রম। হিন্দু নারীকে শ্রদ্ধা না করিলে, তাহাকে দেবী রূপে... কল্পনা করিত না। অধিকাংশ দেবতাই নারী।

আমেনা : আমরা কিন্তু ফল দেখিয়া বিচার করিতে চাই! দেবী কল্পনার কথা ছাড়িয়া...

ঘটনা দেখান।

আমি : ও ভাই কুসুম! তুমি আমায় সাহায্য কর। আনো তো তোমার মহাভারতখানা, দিদিগকে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখাই।

কুসুম : তোমরা তিনজনেই আমার সমান শ্রদ্ধার পাত্রী, আমি কাহারও পক্ষপাতিতা করিতে পারি না। মহাভারত বা ইতিহাসে কাজ কি ? বর্তমান সামাজিক ঘটনার আলোচনা করিতে পার।

আমি : (মোসলেম কামিনীদ্বয়ের প্রতি) আপনারা কী দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী প্রমুখ সতী-ললনাকে দাসী বলিতে চান ?

জমিলা : না। সতী সাবিত্রী প্রভৃতি নিজগুণে ধন্য হইয়াছেন। সীতা নিজে ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় সমাজ তাঁহাকে কী রূপে পূজা করিয়াছিল ?

আমি : (ও কথার উত্তর না দিয়া) পুরাকালে অনেক দেবী ছিলেন। লীলাবতী, খনা প্রভৃতি বিদুষী ললনা ভূতলে অতুল।

আমেনা : তাঁহারা বিদুষী ছিলেন, সে গুণ তাঁহাদের নিজের। এখানে কথা হইতেছে, নারীর প্রতি সমাজের ব্যবহারের। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্না ছিলেন। আজিও পল্লীগ্রামে এমন কৃষক নাই যে, দুই-চারিটি খনার বচন না জানে। কিন্তু—

আমি : কিন্তু আর কী ? গ্রামে গ্রামে খনার বচন আবৃত্তি করা হয়, ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি সর্বসাধারণ কর্তৃক পূজিতা হইতেছেন!—

আমেনা : ক্ষমা করুন, মিসেস চাটার্জি। আমার কথাটুকু শেষ হইতে দিন। খনা যেমন পূজিতা হইতেছেন, কিন্তু তিনি মরিয়াছেন কি প্রকারে তাহা কী আপনি বিদিত নহেন? তাঁহার যে রসনা ঐ বচনগুলির জনয়িত্রী, সেই রসনা ছেদন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে!

আমি : হত্যা তো করা হয় নাই ;—তবে হ্যাঁ,—খনার রসনা কর্তিত হইয়াছিল।

জমিলা : 'হত্যা' কী গাছে ধরে ? খনার স্বামী তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিলে পর খনা নীরবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

কুসুম : আপনারা পুরাতন কথা ছাড় ন। বর্তমান শতাব্দীর ঘটনা দ্বারা জয় পরাজয় দেখা যাউক।

আমি : বেগম সাহেবেরা দুইজন, আর আমি একা। জোর যার, মুলুক তার, সুতরাং আমি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করি।

কুসুম : সে কী! তুমি এত শীঘ্র তর্ক ছাড়িবে কেন ? যতো দূর পার অগ্রসর হও।

আমেনা : আমরা দুইজন হইলেও মোটের উপর আপনার তুলনায় দুর্বল। কারণ আপনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা ;—(ঈষৎ হাস্যে) যদিও এফ এ. ফেল! আপনি অনেক দেখিয়া শিখা এবং নানা পুস্তক পাঠে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। আর আমরা কঠোর অবরোধে থাকি,—আমরা কেবল কুসুমদিদিকে জানি, আর চিনি আপনাকে।

আমি : বেশ, বেশ, চলুন; আপনারা নাছোড়বান্দা! কুসুমদিদি! 'বর্তমান শতাব্দী' মানে বাঙ্গালার ১৩১২ সন, না ? খ্রিস্টাব্দের ২০শ শতাব্দী?

কুসুম : ত্রয়োদশও নয়, বিংশও নয়;—এই শেষ একশত বৎসরের ভিতরের ঘটনা ধর না।

আমি : বেশ! ইদানিং ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হওয়ায় রমণী জাতি কল্পিত দেবত্বের পদ হইতে ক্রমে সত্যকার দেবী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জমিলা : তাহা কতক পরিমাণে সত্য। আপনি আর একটি কথা শুনুন, আপনারা যখন হিন্দু সমাজের দেবী লইয়া গৌরব ও গর্ব করেন, তখন তার দোষকেও আপনাদের নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকুন।

আমি : এ বড় শক্ত condition!

কুসুম : শক্ত হইলেও পণটা ন্যায়সঙ্গত বটে। উঁহারা পূর্বেই তোমার ফাঁকি করিলেন! বুঝিলে, প্রভা দিদি ?

আমি : কী রকম ফাঁকি ?

কুসুম : উঁহারা কোন হিন্দু পরিবারের অবলার দুর্দশার কথা বলিলে তুমি বলিতে পারিতে, 'আমাদের ব্রহ্মসমাজে কিন্তু ওরূপ হয় না।'

আমি : তাহা তো ঠিক। ব্রাহ্মসমাজে অবলাপীড়ন হয়, ইহা কেহ বলিতে পারে না।

আমেনা : যদি কেবল নববিধান সমাজ লইয়া থাকেন, তবে আপনারা হিন্দুসমাজের দেবী লইয়া টানাটানি করেন কেন ? কেবল গুণের প্রশংসার ভাগ লইতে অগ্রসর হইবেন আর দোষের নিন্দা গ্রহণ করিবেন না, ইহা তো বড় অবিচার!

জমিলা : এই জন্য আপনি বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতেছিলেন, এখন বুঝিলাম। তবে থাক, নারী পূজার আলোচনায় কাজ নাই, অন্য কথা পাড়ুন।

আমি প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলাম, একটু পরে ভাবিলাম, 'আমি এতই ভীরু বিনা তর্কে হারিব ?' প্রকাশ্যে বলিলাম :

'না বেগম সাহেব! আপনাদের ভয় নাই' আমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কবির না—চলুন।'

সকলে হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগকে হাসানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা কিন্তু শিষ্টাচারের অনুরোধে আর সামাজিক কথা বলিতেছিলেন না। তাহা আমার অসহ্য হইয়াছে আমি জেদ ধরিয়া বলিলাম—

'কই বেগম সাহেবা, আপনি তো একটিও প্রপীড়িতা ললনার কাহিনী বলিতে পারিলেন না!'

জমিলা : বলিল, 'একটি কেন, অনেক বলা যায়',—'সে বিহ্বর শত শিখা কে করিবে গণন।'

আমি : আপাতত: একটি শিখাও দেখান দেখি!

জমিলা : বেশ। যে সকল হিন্দু রমণী পূজিতা হন, সেই হিন্দু কুলকামিনীর কথা তো আমরা শুনিতে পাই।

'সাবাসি সাবাসি বটে হিন্দুর সন্তানে,
গড় কি তোদের বুক নিরেট পাষাণে?

* * *

বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি

* * *

নাই দয়া নাই ধর্ম, বোঝে না'ক কর্মকর্ম
শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়;'

কী বলেন ভাই! ঐ কয় ছত্র পদ্যকে ব্যথিত হৃদয়ের 'আর্তনাদ' না পূজা প্রাপ্তিতে 'আশীর্বাদ' বলিব ?

আমি : উহা তো কবির রচনা—কল্পিত বেদনা।

জামিলা :—আপনি বাল্যবিধবার যন্ত্রণাকে কল্পিত বেদনা বলিলেন ?
আমিনা : একেবারে কল্পিত নহে, অনেক পরিমাণে সত্য,—
কুসুম : ধ্রুব সত্য।
আমিনা : কিন্তু ইহা তো সামাজিক নিয়ম, কাজেই সহিতে বাধ্য হওয়া যায়।
আমেনা : কবিকল্পনার কথা ছাড়িয়া আমি সদ্য দেখাই, ভারতবর্ষ কি কি উপাদানে দেবী পূজা করে, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত 'Heart Beats' গ্রন্থখানি দেখিয়াছেন ?
আমি প্রথমে ভাবিয়া দেখিলাম, উক্ত গ্রন্থে কেবল পারমার্থিক কথা আছে। একটু চিন্তা করিয়া শেষে সাহসের সহিত বলিলাম, 'হাঁ দেখিয়াছি। তাহাতে কোন ললনাদললনতত্ত্ব নাই।'
আমেনা : মূল গ্রন্থে নাই বটে, কিন্তু মোঃ এস. জে. ব্যারোস কর্তৃক লিখিত মজুমদার মহাশয়ের জবানীতে একটি নমুনা পাওয়া যায়।
আমি : অবলাপীড়নের নমুনা?—আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ?
আমেনা স্থির স্বরে বলিলেন, 'হাঁ, তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটনা। যৎকালে মজুমদার মহোদয়ের জননী ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতেছিলেন।[১] বাড়ির গাভীটার কোন রূপ পীড়া হইলেও বোধ হয় কর্তা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। বিধবার প্রতি সমাজের ব্যবহার কিরূপ হয়, তাহা মজুমদার মহোদয়ের ভাষায় চমৎকার শুনায়! আপনারা তাঁহার জীবনীর ১৪শ হইতে ১৬শ পৃষ্ঠা পুনরায় পাঠ করিয়া দেখুন। তাহা পাঠ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রতিপালিত কুকুর বিড়ালও বোধ হয় বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না ; আর ইশ্বরের সৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠতমা জীব, পরিবারের এক জন বধূ রোগের যন্ত্রণায় অধীরা, কেহ তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই! বিধবার জন্য চিকিৎসক ডাকিতে হইবে, একথাও কেহ ভাবে নাই! মজুমদার স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্যদের সুখনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কক্ষে তিনি প্রবেশ করিতে পারে নাই![২] চাকরটা পর্যন্ত চিকিৎসক ডাকিতে যাইবে না—না যাউক। কিন্তু পুত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না! যাঁহার জননী জন্মের মতো বিদায় লইতেছে, তিনি কি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন ? না! তিনি পাগলের ন্যায় পথে ছুটলেন,—(স্বর্গীয়) কেশবচন্দ্র সেন এবং অপর কয়েকজন বন্ধুকে ডাকিতে চেষ্টা

'Everybody in the house was up expect my uncle, who was the Karta (Head). Nobody seemed to care to call in a doctor ..... My perplexity may be imagined.' Rushing to speak to my uncles, I was not admitted to their rooms ; and no one, not even a servant, would go for a medical man. Maddened and despairing, I rushed into the streets, tried to call up Keshub and other friends ; but every gate was shut for the night. I ran to a doctor's house in the neighbourhood, but his servant turned me out. I don't know into how many places I went, and pleaded my poor, dying mother's case, but could not get medical help.

... What need to bewail the world's hard heartedness? What need to curse the selfish cruelty of men and women to the wretched, forsaken Hindu widow? ... But if men were more compassionate, and society recognised their (women's) rights to the commonest neccssaries of life, perhaps they would be less hard on themselves, and many a heart-stricken son would be spared, the misery I felt when I found my mother's beloved life sink under the load of the world's neglect and indifference.'

করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সকলের গৃহদ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক ডাক্তারের ... গেলেন; ডাক্তারের চাকর হতভাগ্যকে তাড়াইয়া দিল! সে ভৃত্যটি তো ভাব... পুরুষ, সে অবশ্যই জানিত, কিরূপে নারী-পূজা করিতে হয়। তাই বিধবার জন্য ... কষ্ট দেওয়া উচিত নহে, ভাবিয়া সে মাতৃশোকাতুর পুত্রকে তাড়াইয়া দিল!!

'আমরা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই, সেই ঊনবিংশ বর্ষীয় বালক মাতৃশোকে পাগল প্রায় হইয়া পথে ছুটাছুটি করিতেছেন। আর তাঁহার হৃদয়ে কী আকুলতা, কী মর্মান্তিক যাতনা ছিল, তাহা আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। আমরা ইশ্বরের যতো প্রকার আশীর্বাদ ভোগ করি, তন্মধ্যে মাতৃচরণ শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ। সব সুখসমূহ তুলাদণ্ডের এক দিকে, আর মা এক দিকে!!'

'ইহাকে—বিধবার প্রতি এইরূপ নির্মম নির্দয় ব্যবহারকে যদি আপনারা 'নারী-পূজা' বলেন, তবে আর আমার বলিবার কিছু নাই।'

আমি : ইদৃশী ঘটনা বিরল। কেবল একটি বিধবার প্রতি যত্ন হয় নাই বলিয়া সকলে দোষী হইতে পারে না।

কুসুম : না প্রভা দিদি! ওরূপ ঘটনা বিরল নহে—তবে কথা এই যে, আর কেহ মজুমদার মহাশয়ের মতো ঐ প্রকার কলঙ্ককাহিনী লিখিয়া রাখে না, তাই আমরা সে সব ঘটনা জানিতে পারি না। আমিও দুই চারিটি পরিবারের ঐ রূপ অবস্থা জানি।

আমি : (জমিলা বেগমের প্রতি) আর আপনি? আপনি কোন লোমহর্ষণ ব্যাপার অবগত আছেন?

জমিলা : একটি ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; সে অনেক কথা!

আমি : বলুন, শুনি।

জমিলা বলিলেন,—'একজন বড় লোকের শিশুকন্যা পীড়িত ছিল। বাড়িতে দাস দাসী, ঘোড়া গাড়ি, যত প্রকার বিলাসদ্রব্য হইতে পারে, সবই প্রচুর ছিল। কেবল কন্যা জাতিকে অভিশাপ মনে করা হয় বলিয়া খুকির চিকিৎসা হইতেছিল না।'

'কোন অভাব নাই—অপর শিশুরা টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা করে, অথচ দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বিনা চিকিৎসায় মরিতেছে, এ চিন্তা গৃহিণীর সহ্য হইল না! তিনি বারম্বার সবিনয়ে সজল নয়নে কর্তাকে চিকিৎসক ডাকিতে অনুরোধ করিলেন,—কর্তা শুনিলেন না! এমন-কি কর্তা একদিন নিজের প্রয়োজনবশত ডাক্তারের নিকট যাইতেছিলেন, সেই সময় কর্ত্রী সকাতরে বলিলেন, 'খুকির অবস্থাও ডাক্তারকে জানাইও।' 'মেয়ে কী কখনও মরে!' এই বলিয়া কর্তা প্রস্থান করিলেন।

'অতঃপর অসহায়া গৃহিণী উপান্তর না দেখিয়া মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন! পুংশাবককে যখন পিতা হনুমান বধ করিতে চেষ্টা করে, তখন শাবকটিকে বক্ষে লইয়া হনুমানমাতা বনে জঙ্গলে পালায়ন করিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করে! কিন্তু পর্দানশীল মহিলা পিতৃ-অত্যাচার হইতে শিশুকন্যাকে রক্ষা করিবার জন্য কোথায় যাইবেন? নগরে অসংখ্য ডাক্তার আছেন—থাকুন ; তাহাতে অন্তঃপুরিকার লাভ কী?'

আমি : "ঈস্! মানুষ এমন পাষণ্ড হয়! শেষে কী হইল ভাই? শিশুটি বাঁচিল, না অযত্নে মারা গেল?'

জমিলা : 'শিশুটি শেষে বাঁচিল। যৎকালে কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মাতা রোদন করিতেছিলেন, সেই সময় দৈবাৎ উক্ত পরিবারের ভাগ্যবান জ্যেষ্ঠ পুত্র তথায় গিয়াছিল। সে

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, তাই মাতার ক্রন্দনে তাহার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল, সে [illegible] নিকট গিয়া কয়েক মাত্রা ঔষধ আনিয়া দিল। সে ঔষধ আনিয়াছিল কেবল [illegible] দিবার জন্য! ঈশ্বরকৃপায় সেই সামান্য ঔষধে খুকি বাঁচিল। সেই ধনী পরিবার অদ্যাপি বর্তমান আছে! সেই শিশু, সেই পিতা, মাতা, ভ্রাতা—সকলেই জীবিত আছেন!!'

আমি : 'পরিবারটি হিন্দু, না মুসলমান ?'

জমিলা : 'তাহা আমি বলিব না,—তাঁহাদের মুখে মসীলেপন করিয়া কাজ কি ? এই পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট—তাঁহারা বঙ্গবাসী!'

আমি : 'দেখুন, এদেশে যে জঘন্য অবরোধ প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাই সব অনিষ্টের মূল। মুসলমান সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী। তাঁহারা চাকরের সম্মুখেও বাহির হন না, এই জন্য মোসলেম রমণী একেবারে নিরুপায়। ঐ পর্দা তাঁহাদিগকে পশু—হনুমানমাতা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, অসহায় করিয়াছে।'

আমেনা : অবরোধ প্রথা জঘন্য হইলেও উহা আমাদের হাড়ে-মাংসে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষেরা যতদিন ভদ্র শিষ্ট হইতে না শিখেন, ততদিন এ পরর্দা ছাড়া সহজ নহে। পুরুষসমাজ যদি ললনাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কি ?

কুসুম : আমি শুনিয়াছি যে, অন্যান্য মুসলমানপ্রধান দেশে নাকি ঈদৃশ অন্তঃপুরপ্রথা নাই! তবে ভারতবর্ষে মুসলমানেরা কেন এরূপ পরদার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের স্ত্রীকন্যার সহিত আমাদিগকেও বন্দিনী করিলেন ?

জমিলা : পরদার আদিস্রষ্টা কে? তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। কোন মোসলেম ভ্রাতা যখন অবরোধের অনুকূলে কিছু লিখেন, তখন তিনি বলেন, 'আমরাই পর্দার স্রষ্টা, হিন্দুভ্রাতৃগণ যে পরদার আবিষ্কারক বলিয়া দাবি করেন, তাহা ঠিক নহে।' আবার যে মুসলমান ভাইটি পরদার প্রতিকূলে কিছু লিখেন, তিনি নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, 'পরদার প্রথাম মুসলমানেরা বিধর্মীদের নিকট শিখিয়াছে।' যাহা হউক এই প্রথার স্রষ্টা যিনিই হউন, ভোগটা আমাদিগকে ভুগিতে হইতেছে!

আমি : আপনারা ধীরে ধীরে পর্দা ছাড়েন না কেন ? আমরা তো ছাড়িয়াছি।

জমিলা : আপনারা পরদাত্যাগে খুব ভালো আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছেন কই? যে ভাবে পরদা ছাড়িয়াছেন, তাহাতে আপনাদিগকে অনেক নিন্দা সহিতে হইতেছে।

আমি : নিন্দাকে ভয় করিবার প্রয়োজন ?

আমেনা : ভয় না করুন, কিন্তু অনেকে প্রকৃত পরদার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে পবিত্রতা নষ্ট—

আমি : থামিলেন কেন ? বলুন,—

আমেনা : আমি একটা অপ্রিয় কথা বলিতে যাইতেছিলাম, যাহা হউক, সমাজের প্রতিও আমাদের কতকগুলি কর্তব্য আছে, কেবল ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য আমরা সে কর্তব্য অবহেলা করিতে পারি না।

আমি : হিন্দুরা ব্রাহ্মসমাজের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাতে কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

কুসুম : কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে পরদাত্যাগে নিন্দা করেন, তাহা শুনিয়া সাবধান হওয়া উচিত। আমেনাদিদি হয়তো ব্রাহ্মসমাজে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতে যাইতেছিলেন।

আমেনা : আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন।

আমি : কিন্তু মোটের উপর মোসলেম সমাজে যেরূপ রমণী-পীড়ন হয়, সেরূপ কোথাও হয় না। আপনারা খনার মৃত্যুর কথা বলিলেন, কিন্তু লাহোরের 'আনারকলি' সমাধি মন্দিরের ইতিহাস জানেন ? সম্রাট আকবরের আদেশে আনারকলিকে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল!! পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর আনারকলির শবের উপর সেই সমাধিভবন নির্মাণ করিয়াছেন! পরন্ত তাজমহলের অভ্যন্তরেও কোন বিষাদের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে কি না কে জানে ?

জমিলা : মুসলমানেরা রমণীদলন করে সত্য, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে 'নারীপূজা করি' বলিয়া ছলনা করে না। বরং এ-দেশের কাট-মোল্লারা মনে করে যে, অবলাপীড়ন করাই তাহাদের ধর্মত কর্তব্য!

আমেনা : আমার মনে হয়, হিন্দুরা আমাদের নিকট অবরোধপ্রথা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কাট-মোল্লারা হিন্দুর নিকট নারীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। নতুবা কোরান শরীফের বিধান মানিলে অবলা-পীড়নও চলে না ; অন্যায় অন্তঃপুরপ্রথাও চলে না।

আমি : আপনারা কী মনে করেন, কাট-মোল্লারা অন্যায় পরদার পক্ষপাতী?

জমিলা : দেখ ভাই আমেনা! এখন আবার মোল্লাদের মৌচাকে ঢিল ছুড়িও না!

আমেনা : হ্যাঁ, ঠিক বলিলেন। এখন আমি মোল্লাদের মৌচাকে লোষ্ট্রনিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নহি। মোল্লাদের কথা ছাড় ন, মিসেস চাটার্জি!

আমি : মৌমাছিকে ভয় করিলে আপনারা মধু আহরণ করিবেন কিরূপে ?

জমিলা : মধুল্লুণ্ঠন করিবার সময় তো পূর্বেই সাবধানে যথেষ্ট ধুম অগ্নি লইয়া যাওয়া হয় এবং সে সময় দুই একটা মৌমাছির দংশন বরং সহ্য হয়! কিন্তু মধু লইতে প্রস্তুত না থাকিয়া অনর্থক মৌচাকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করা বালকোচিত মুর্খতা হইবে। এখানে কথা হইতেছে—অবলাপীড়নের, তাহাই বলুন।

আমি : তাহা তো আপনারা বলিবেন, আমি শুনিব।

আমেনা : বলিবার তো অনেক ছিল ; সে সব মর্মভেদী কাহিনী কী বলিয়া শেষ করা যায়? তবে, আজি আর সময় নাই ; এখন উঠি কুসুম দিদি!

অতঃপর আমরা স্ব স্ব ভবনে ফিরিলাম।

আশা-জ্যোতি :

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। পূর্বাকাশে তবে ও কিসের আলোক দেখা যায় ? মাত্র অমানিশা অবসানে আকাশের কোলে শুকতারা দেখা দিয়েছে ; উষা ও বালার্ক এখনও বহুদূরে।

অনেক সময় মনে করি, আমাদের উন্নতির কোনো আশা ভরসা নাই। যে দেশে পুরুষজাতি অবলার প্রতি শত্রুতাচরণই গৌরবের বিষয় মনে করে, সে দেশে আর আশা কি ? কিন্তু কালের বিচিত্রগতি সবদিন সমান যায় না। এখন দেখি, দয়াময় আমাদের প্রতি সদয় কটাক্ষে চাহিয়াছেন।

বাঙ্গালী হিন্দু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু অপেক্ষা অধিক উন্নত ও সুশিক্ষিত : পক্ষান্তরে বাঙ্গালী মুসলমান পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের তুলনায় অনেক হীন ও

অধঃপতিত। অতএব কেবল বঙ্গের কতিপয় নারীবিদ্বেষীর ক্ষুদ্রাশয়তা দর্শনে আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নহে।

সমাজের অর্দ্ধঅঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব ; এ রহস্য বোম্বাই, লাহোর ও আলীগড়ের মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ বেশ বুঝিয়াছেন। তাই এখন আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার যথাসাধ্য আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয় পাঠিকা বলিতে পারেন, 'আলীগড়ে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হইলে আমাদের লাভ কি ? আমরা আছি বঙ্গদেশে—আলীগড় তো বহুদূরে। আমাদের মুক্তির উপায় কী ?'

মুক্তির উপায় ঐ শিক্ষাবিস্তার। আমরা যদি শিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আলীগড়ের দূরত্ব আমাদিগকে আলীগড়ে পৌঁছিতে বাধা দিতে পারিবে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধির আশা করা যায় কি ? যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সুশিক্ষালাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়, তবে শিক্ষার পথে যতই কন্টক থাকুক না কেন, বিশ্বাসী (বিশ্বাসিনী) তাহা উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইবেই। এবার এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল—তাহারা কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিয়াছে, কত ব্যক্তি জনতার পদচাপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। তবু কি তীর্থযাত্রী পুনরায় তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হইবে। কখনই না। তিথি বিশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে অসূর্যম্পশ্যা হিন্দু কুলবালারা শিবিকাসহ ডুবিয়া স্নান করেন। সুতরাং দেখিতেছেন, বিশ্বাসিনীর শুভকার্যে দুর্ভেদ্য পরদাও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

জ্ঞান ধর্মেরই প্রধান অঙ্গ। এককালে মোসলেম সমাজ অতিশয় উন্নত ছিল ; কিসের বলে ? জ্ঞান-বলে। আজি ইউরোপ ও আমেরিকা সুসভ্য, ধনাঢ্য এবং সর্ববিষয়ে উন্নত ; কেন ? জ্ঞানবিজ্ঞানের কৃপায়। যে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে চাহিয়া অভাগিনী বঙ্গভূমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারও উন্নতির একমাত্র কারণ—জ্ঞান।

কোন বস্তুই ইচ্ছামাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে হয়। আমরা জ্ঞানপিপাসা অনুভব করা মাত্রই কেহ সুধাভাণ্ড হস্তে আমাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হইবে না। তৃষ্ণার্তের নিকট কূপ আইসে না—পিপাসীকে কূপের নিকট যাইতে হয়। সমাজের একটি সুনীতি একতা—এই একতা স্থাপনের জন্য আলীগড় ও বাঙ্গালাকে একাকার করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি ; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারীবিদ্বেষী, ইহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি। তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলণ্ডের পুরুষসমাজ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্তা রমণীদের 'ব্লুষ্টকিং' বলিয়া বিদ্রূপ করেন ; শিক্ষিতা বঙ্গবালাও 'নভেলপাণি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর এক চমৎকার কথা—আমরা পুরুষের রচনায় ইংলণ্ডের সমাজের যতো চিত্র না দেখিতে পাই, তাহা মহিলাদের রচনায় দেখিয়া থাকি। মিসেস হেনরি উড এবং মেরি করেলির উপন্যাসে অনেক সামাজিক ক্ষত দৃষ্টিগোচর হয়। এমনকি মাননীয়া মেরি করেলি তাঁহার কোন উপাখ্যানের নায়িকা (ডেলিশিয়া)র প্রিয় কুকুরটিকে পুরুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন!![১] যাহা হউক, এত হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরাজললনা মাথা তুলিয়াছেন ; এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন; এবার মোসলেম ললনার পালা।

---

১ মেরী করেলি রচিত Murder of Delicia দ্রষ্টব্য

দুই বৎসর পূর্বে আমরা বলিয়াছিলাম, 'আমাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ... এবং পরীক্ষক স্ত্রীলোক হওয়া কী অসম্ভব?'[২] এখন দেখি সত্যই আলীগড়ে আমাদের ... স্বতন্ত্র শিক্ষাগারের সূত্রপাত হইতেছে। ইহা কী কম সৌভাগ্যের বিষয়? অবশ্য ... কলেজ এখনও সুদূর ভবিষ্যতের পরপারে। সম্প্রতি কেবল নর্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার ... হইতেছে ; এই স্কুলটিকে সেই ভাবী জেনানা কলেজের মাতামহী বা প্রমাতামহী ... অত্যুক্তি হইবে না। কেহ বলিতে পারেন, তবে এখনই এত আশায় উৎফুল্ল হওয়া ... আশার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমে বীজ, তৎপরে অঙ্কুর, তারপর বৃক্ষ—সর্বশেষে ফল আজি যে দীর্ঘ তাল-তরুটি উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া গগন চুম্বন করিতেছে, তাহার বীজ কবে নিহিত হইয়াছে? অন্তত চল্লিশ বৎসর পূর্বে। অতএব আলীগড়ের 'স্কুলবীজ' দেখিয়া আমাদের আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য আমরা ইহার ফল ভোগ করিতে পাইব না—ফল ভোগ করিবে আমাদের তৃতীয় পুরুষ। যে তালের গাছ বপন করে, সে নিজে কদাচিত ফল খাইতে পায়!

আমরা কেবল আশায় আশ্বস্ত হইলেই কি আমাদের কাজ শেষ হইবে? অবশ্য না। ঐ স্কুলবীজটির প্রতি আমাদের অনেক কর্তব্য আছে। উপযুক্ত অর্থাভাবে এখনও স্কুলের কার্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না—আমাদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। ভদ্রলোকেরা চাঁদা দেন, ভাল কথা—যদি না দেন, তবে মহিলাদের চাঁদা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক কর্তব্য আছে, যিনি তাহা পালন করিতে ইচ্ছুক তিনি সেক্রেটারি সাহেবকে পত্র লিখিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারেন। সম্প্রতি চাঁদা সংগ্রহই প্রধান কার্য। আলীগড়ের মহানুভব লোকেরা যে মহৎ কার্যের আয়োজন করিতেছেন, তাহা দুই চারিজনের দ্বারা সাধিত হওয়া অসম্ভব।

এ সময় যদি সকলে উহাতে যোগদান না করেন, তবে ও স্কুলবীজ অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না—যদি আশাতরু এবার অর্থাভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, তবে আবার বীজ সংগৃহীত হওয়া সুদূরপরাহত। যে মাতৃজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এই প্রয়োজন, তাঁহারা নিশ্চিতভাবে নিদ্রিত থাকিলে চলিবে কেন? আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই।

লাহোর, বোম্বাই ও আলীগড় নিবাসী লোকের সহিত ঐক্য রক্ষা করিতে হইলে সকলকে একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। সেই ভাষা ইংরাজি হইলে ভাল হয়; নতুবা কোনো বিখ্যাত প্রাদেশিক (যেমন হিন্দী) ভাষার চর্চা রাখিলে চলে। লাহোরের লোকে আমাদের ভঙ্গভাষা শিখিবে, এরূপ আশা দুরাশা, সুতরাং বাঙ্গালীকেই উর্দু শিখিতে হইবে।

দেশের, বিশেষত নিজের সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য স্বার্থত্যাগে নারী কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। যে শিক্ষা মানবের পক্ষে অশেষ উপকারী, সেই শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত রমণী সামান্য অর্থরূপ স্বার্থত্যাগ করিবে না কি? জ্ঞান বিনিময় হজরত 'হাভা' স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন—তাহারই দুহিতা হইয়া আমরা কি সামান্য অর্থত্যাগে বিমুখ হইব?

কেহ হয়ত বলিবেন, 'একবার আদি জননী জ্ঞানফল চয়ন করায় পিতা আদমকে স্বর্গচ্যুত হইতে হইয়াছে, আবার বঙ্গজননীরা জ্ঞানলাভে অগ্রসর হইলে আমাদিগকে গৃহচ্যুত হইতে হইবে না তো?' উত্তরে বলা যাইতে পারে, গৃহচ্যুত হওয়ার তো আশঙ্কা নাই—আশঙ্কা আছে কর্মহীন, আকাঙ্খা উদ্যমহীন জড়তারূপ স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ার।

২. মতীচূরের "বোরকা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

যদি মাতা নিষ্কর্মা অলস জীবনের স্বর্গভোগ পরিত্যাগ না করিলে [illegible]
ধর্মবিশ্বাসরূপ অমূল্যরত্ন পাইত কোথায়? আমাদের মনে হয়, স্বর্গবাসে আদম অপেক্ষা মরুবাসী দরবেশ মনসুর অধিক সুখী ছিলেন। মহর্ষি মনসুর ঈশ্বরপ্রেমের যে মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন, স্বর্গে থাকাকালীন হজরত আদম কি সে সুধার আস্বাদ জানিতেন?

স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষেরা সর্বদা হীনবুদ্ধি বলিয়া থাকেন, তাই অবলারা নিজেকে নিতান্ত মেধাহীন ভাবিয়া ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে—তাহারা আর জ্ঞানচর্চার দিকে সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না। কোন ভাল লোককে ক্রমাগত পাগল বলিলে সত্যই সে পাগল হইয়া যায়। নারীজাতি কি বাস্তবিক হীনবুদ্ধি? না, বরং রমণী প্রতিভার মূর্তি মধীশ্বরী। ইহা সর্ববাদীসম্মত যে নারীই প্রথমে জ্ঞানফল চয়ন ও ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে পুরুষ তাঁহার (উচ্ছিষ্ট!) প্রদত্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতবালাকে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সুযোগ দেওয়া হয় না, সে স্বতন্ত্র কথা। নতুবা এ 'ডানাকাটা' অবস্থায়ও তাহা সুবিধা পাইলে পুরুষের তুলনায় তাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, যে ক্ষেত্রে মুসলমান বালক শতকরা ২০/২৫ জন কৃতকার্য্য হয়, সে স্থলে বালিকা (বোম্বাইয়ে) শতকরা ৭৫ জন কৃতকার্য হইয়াছে। যে স্বদেশী ব্রত পালনে বাঙ্গালী পুরুষেরা প্রকৃত কার্যের তুলনায় ফাঁকা হৈচৈ বেশি করেন, সেই ব্রত 'নভেলপাণি'রা দৃঢ়তার সহিত নীরবে প্রতিপালন করিতেছেন। সুতরাং অবলাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই।

সুদীর্ঘ নৈরাশ্য-যামিনীর শেষে আশা-শুকতারা উদয় হইল। এমন সুপ্রভাতে যে নিদ্রিত থাকে, তাহার দুর্ভাগ্য। তাই বলি, ভগিনী! ঐ চাহিয়া দেখুন—ঐ দূরে-আশা-জ্যোতিঃ।

মোসলমান কন্যার পুস্তক-সমালোচনা

(নূতন পুস্তক ধর্মসাধননীতি)

অদ্য আমার সমালোচনা পাঠাইলাম। আপনার লেখার সমালোচনা আমি কী করিব? 'সমালোচনা' বলিতে যেন একটা মুরুব্বিয়ানা ভাব থাকে; যেন সমালোচক নিজে একজন মান্য গণ্য লোক। তাই আমি আপনাকেই সম্বোধন করিয়া নিজ মন্তব্য ব্যক্ত করিলাম। আশা করি, ইহা মহিলায় প্রকাশিত করিবেন।

'ধর্মসাধননীতি'তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে,—'ধর্মসাধনা, 'অন্ধাত্মানুরাগ', 'অনুতাপ', 'চিত্তসংযমের উপায়', 'বাহ্যিক উপাসনা', 'আন্তরিক উপাসনা', 'জীবন্ত উপাসনা', 'নামসাধনা, 'ধর্মসঙ্গীত', 'যোগ ও প্রেমাবেশ', 'রোজা' (সংযমব্রত), 'নির্ভয়স্থাপন', 'সাংসারিক সুখের অসারতা', 'কৃতজ্ঞতাতত্ত্ব', 'কামনা ও ক্রিয়া', 'সাধুচরিত্র', এবং 'পরিশিষ্ট'—অনুতাপতত্ত্ব', ইহার প্রত্যেকটি বিষয় কিরূপ মূল্যবান, তাহা সূচীপত্র দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা এই উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি।

পুস্তকের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, 'সেই মহাগ্রন্থে(অর্থাৎ কিমিয়ায় সাদতে) রাশি রাশি সমুজ্জ্বল সত্যরত্ন শোভা পাইতেছে।' আমি বলি, আমাদের ধর্মসংক্রান্ত সত্যসমূহ 'রত্ন'-ই বটে—তাই তাহা অতি যত্নে আরব্য ও পারস্য ভাষারূপ লৌহসিন্দুকে আবদ্ধ,

আর সমাজের কাটমোল্লাগণ উন্মুক্ত করবালহস্তে ঐ সিন্দুক রক্ষা করিতেছে, একটি রত্নও ভাণ্ডারিত হইতে না পারে! যেন আরব্য ও পারস্য ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গের জ্ঞানরত্ন লাভ করিতে না পারে!

যখন কোন উদারচেতা মোসলেম ভ্রাতা ঐ গ্রন্থের কোন এক অংশ উর্দু বা বঙ্গ অনুবাদ করিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরেন, তখন আমাদের মনে হয়, যেন রত্নভাণ্ডারের একটি গবাক্ষ খুলিয়া গিয়াছে, দর্শকেরা বাহির হইতে তৃষিত নয়নে শোভা কিছু কিছু দেখিতে পাইতেছে।

কিন্তু আপনি এ কি করিয়াছেন। রত্নভাণ্ডারের অনেকগুলি বাতায়ন মুক্ত করিয়াছে, –মোল্লাদের অতি যত্নে রক্ষিত লৌহসিন্দুকও খুলিয়া ফেলিয়াছেন! সহজ সরল ভাষারূপ ডালায় রত্ন বিতরণ করিতেছেন! 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে', এই নীতিবাক্যের মর্ম আপনি বুঝিয়াছেন, আপনি বেশ জানেন, বঙ্গের দীনতম ব্যক্তিকে থালাভরা মাণিক দান করিলেও মহামূল্য 'কিমিয়ায় সাদতের' ভাণ্ডার শূন্য হইবে না! তাই অন্নছত্র খুলিয়াছেন, দেখি।

'মহাপুরুষ মোহম্মদ এবং তৎপ্রবর্ত্তিত এসলামধর্ম' গ্রন্থে 'আত্মমন্তব্যে' লিখিত হইয়াছে, একজন (মোসলমান) বন্ধু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, 'আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ একজন কাফের করিয়াছে, তাহাকে পাইলে তাহার শিরচ্ছেদন করিব।' তাই তো আপনার হাতে লৌহসিন্দুকের চাবি আছে দেখিয়া যে, মোল্লাগণ ক্রুদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র নয়। আপনার কথা দূরে থাকুক, একজন মোসলমানও (বিখ্যাত 'বানাতন নাশ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা) উরদুভাষায় কোরাণ শরীফের অনুবাদ করায় মোল্লাদের কোপে পতিত হইয়াছিলেন।

'মোসলমান জাতীয় ব্রাহ্মবন্ধু' কথাটা ভালমতে বুঝিতে পারিলাম না। জাতিতে মোসলমান, অথচ ধর্ম বিশ্বাসে 'ব্রাহ্ম' এরূপ লোকও আছে না কি?

'ধর্মসাধননীতি'র 'জীবন্ত উপাসনা' পাঠকালে আমাদের মনে পড়ে হজরত আলীর কথা। তাঁহার ন্যায় একাগ্রচিত্তে উপাসনা আর কে করিতে পারে? অহোদের যুদ্ধের সময় তাঁহার পায়ে শরবিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শরটা বাহির করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হইত; এমন-কি তিনি কাহাকেও সেই আহত পদ স্পর্শ করিতে দিতেন না। তাঁহার বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া এই স্থির করিলেন যে আলী মোর্ত্তজা যখন উপাসনা করিবেন, সেই সময় শরমোচন করা হইবে। কার্য্যত তাহাই করা হইয়াছিল। হজরত আলী উপাসনায় এমনই গভীর মগ্ন ছিলেন যে, শরমোচনের বিষয় জানিতেই পান নাই। ধন্য সেই উপাসনা। আর ধন্য সেই ভক্ত উপাসক।

গ্রন্থখানি এমন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর যে ইহার কোন অংশের উল্লেখ করিব, কোন অংশ ছাড়িব—ঠিক করা দুঃসাধ্য। আমরা আপনার বিষয়ে ততোধিক চমৎকৃত হই অর্থাৎ আপনি মোসলমান ধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি যে ভাষায় লিখেন, তাহা ভক্তের ভাষা—কূট সমালোচকের ভাষা নহে। সহজেই বুঝা যায় যে, আপনি পাদ্রীদের ন্যায় আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় বিধি বিধানের ছিদ্রান্বেষণে বদ্ধপরিকর নহেন। এজন্য আমরা আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সে দিন আমার জনৈকা বন্ধুকে আমি এই গ্রন্থসম্বন্ধে লিখিয়াছি—'মাননীয় বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুবাদিত অনেকগুলি পুস্তক আমার নিকট আছে। তাঁহার প্রেরিত 'ধর্মসাধননীতি' পাঠকালে আমার মনে হয়, তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, না ইসলামধর্ম প্রচারক?'

'মোসঙ্গীত' সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। 'যে সকল সঙ্গীতে লোকের চরিত্র কলুষিত হইতে পারে, তাহা গান বা শ্রবণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কিন্তু সাধকদিগের সাধনার প্রধান অনুকূল বলিয়া ধর্মসঙ্গীত মোহম্মদীয় শাস্ত্রে সাধনার জন্য সমাদৃত হইয়াছে।' এই রূপ লিখিয়া আপনি আমাদিগকে 'সঙ্গীত বিরোধী' দুর্নাম হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস যে 'মোসলমান ধর্মটা বড় 'খট খটে'—কারণ সঙ্গীত হেন মধুর বস্তুটি উহাতে নিষিদ্ধ।' এখন আর বোধ হয় কেহ আমাদিগকে সঙ্গীতবিরোধী মনে করিবেন না।

মোসলমান-শাস্ত্র সঙ্গীতকে সুনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া উহাকে অশ্লীলতা দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছে।

সঙ্গীতশ্রবণে লোকের মন কী বিচলিত (ঢ়র্ধ্রলরঠণঢ) হয়? না, বরং উহাতে এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, শ্রোতা একাগ্রচিত্ত হইয়া পড়ে। প্রায় সকল দেশেই শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য শিশুরঞ্জক সুমধুর ছড়া গীত হইয়া থাকে। ইউরোপে রোগীর নিদ্রাকর্ষণের নিমিত্ত সেবিকাগণ গান করিয়া থাকেন। দুই জন মান্য মোসলমান স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সঙ্গীতশ্রবণকালে অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উপসনা করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের একজন অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা তিনি প্রাতকালীন নমাজের সময় গায়কদের ভৈরবী আলাপ শুনিতে শুনিতে যেমন একাগ্রমনে নামাজ পড়িতে পারিয়াছিলেন, সেরূপ আত্মহারা নমাজ জীবনে আর কখনও পড়েন নাই! তবে ঢাকের চড়চড়ি বা আনাড়ি গায়কের গর্দভ-গর্জনের কথা ভিন্ন। তাহাতে তো জলস্থল কম্পিত হয়—আর মানুষের মন চঞ্চল না হইবে কেন?

'কৃতজ্ঞতাতত্ত্বে' শিখিবার বিষয় অনেক আছে। যাহারা আপন অবস্থায় সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহাদের পক্ষে এ অধ্যায়টি ঔষধস্বরূপ।

'ধর্মসাধননীতি' হিন্দু মোসলমান সকলেরই পাঠ্য হইয়াছে। যিনি একবার ইহা পাঠ করিবেন, তিনি মোহিত হইবেন।

দজ্জাল

যখন মহিলার শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহোদয় মোসলমান শাস্ত্রসংক্রান্ত অনেক পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন ও করিতেছেন তখন 'কেরামত' 'দজ্জাল' বা 'পোলসেরাত' সম্বন্ধে মহিলায় কিছু লেখা অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক বোধ হইবে না। আমার তো মনে হয়, 'মহিলা' যেন আমাদেরই কাগজ।

এস্থলে বলা আবশ্যক, মোসলমানের ন্যায় খ্রীস্টানগণও মহাপ্রলয় (কেয়ামত) এবং মহাবিচারের দিনে বিশ্বাস করে। কথিত আছে যে, মহাপ্রলয়ের কিছুকাল (ধরাতলে হজরত ঈসার পুনরাগমনের) পূর্বে এক বিধর্মী পৃথিবীতে আসিয়া অনেক লোকের ধর্মবিশ্বাস নষ্ট করিবে; তাহার নাম 'দজ্জাল' দজ্জাল মাত্র চল্লিশ দিন রাজত্ব করিবে; এই চল্লিশ দিনের মধ্যেই সে অসংখ্য লোকের উপর প্রভুত্ব করিবে, নিজেকে ঈসা পয়গম্বর (যীশুখ্রিস্ট) বলিয়া পরিচয় দিবে, সময় সময় ঈশ্বরত্বের দাবী করিবে![১] দজ্জালের সঙ্গে

১. 'ঈসা পয়গম্বর আমি খোদার রছুল
আমার কলেমা সবে করহ কবুল।'
অন্যত্র : 'হর ঠাঁই যাবে সেই চড়ে এক গাধা।
যারে তারে কবে আমি তোমাদের খোদা।
কেয়ামত নামা

একটা অগ্নিকুণ্ড (নরক) একটা মনোরম উদ্যান (স্বর্গ) এবং বাহনস্বরূপ একটা [illegible] থাকিবে।[২] এই কয়টা জিনিস লইয়াই দজ্জাল দিগ্বিজয়ে বাহির হইবে! এবং [illegible] সে অনেকটা কৃতকার্য হইবে। কারণ সে অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী ও অতুল ঐশ্বর্য [illegible] অধিকারী হইবে; এবং তাহার সহিত অর্দ্ধখানি রুটি (অর্থাৎ অন্ন) থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় তাহার অধীন হইবে। যে ব্যক্তি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবে, যাহার হাতে সমুদয় অন্ন জল থাকিবে, স্বর্গ ও নরক যাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান, সে যীশুখ্রীস্টত্বের দাবী না'ই করিবে কেন? তাহার কথায় মূর্খ ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাকাতর লোকেরা আপন পৈতৃক ধর্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি না'ই দিবে কেন? পেটের দায় বড় দায়!

যে ব্যক্তি দজ্জালের কথামতে কুপথে যাইবে, তাহাকে সে স্বীয় স্বর্গে স্থান দিবে, আর যে তাহার কথা অমান্য করিবে, তাহাকে ধরিয়া সে নরকে ফেলিবে! স্বর্গের লোভে নরকের ভয়ে অনেক লোক দজ্জালের দলভুক্ত হইবে। হায় ক্ষুদ্র স্বার্থ!

কিন্তু দজ্জাল যাহাকে স্বর্গে রাখিবে, সে প্রকৃত পক্ষে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং যে তাহার নরকে যাইবে সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে!

পাঠিকা ভগিনি! ঐ দজ্জালের বর্ণনা হইতে আপনি আর কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করিতে পারেন না কি? প্রকৃত দজ্জাল তো পরে আসিবে, কিন্তু এখনই আমরা কি এ জীবনে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে দজ্জালের কুহকে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই না?

ক্ষণিক সুখের (দজ্জালের স্বর্গের) লোভে লোকে কি প্রেয় পথে অগ্রসর হইয়া শেষে নিজেকে অভিশপ্ত দেখে না? আর যে প্রেয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হইয়া শ্রেয় পথ অবলম্বন করে সে ক্ষণিক কষ্ট (দজ্জালের নরক) ভোগ করে বটে, কিন্তু সে পরিণামে অনন্ত শান্তিলাভ করে।

মানুষের মনে প্রধানত দুইটি ভাব দেখা যায়, একটি ইঙ্গিতে সুপথ, অপরটি কুপথ প্রদর্শন করে। আমরা প্রথমোক্ত ভাবকে দেবভাব এবং শেষোক্তকে অসুর ভাব বলিব। দেবভাবের কার্য সাত্ত্বিক, আর অসুর ভাবের কার্য তামসিক। শাস্ত্রকারদের মতে মানব ফেরেশতা (ইঞ্জিল বা দেবদূত) ও পশুর মধ্যবর্ত্তী জীববিশেষ! যে ব্যক্তি পশুভাব জয় করিয়া আপন আত্মাকে উন্নত করিতে পারেন, তিনি নরদেবতা। এমনকি তাঁহাকে ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যায়। আর যে পশুভাবের বশবর্তী হইয়া ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হয়, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য নরপশু।

দজ্জাল অতুল ঐশ্বর্যশালী ইত্যাদি, অর্থাৎ পতনের পাপপথ কুসুম আস্তৃত এবং সুগম। সুতরাং অবোধ লোকেরা পাপানলে পতঙ্গপ্রায় প্রাণ উৎসর্গ করে। আর ধর্মের বা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ, অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে হয়, পদে পদে মানবের পদস্খলন হয়। উন্নতির পথে কত বিঘ্ন, কত বাধা! ও পথে পদবিক্ষেপ করিবামাত্র ভুজঙ্গের শত ফণা গর্জন করিয়া উঠে। অবনতি স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিলে আর কিছু করিতে হয় না, অনায়াসে গড়াইয়া গড়াইয়া নরককূপে পড়া যায়!

একটি অতি দীর্ঘ সেতুর নাম 'পোলসেরাত'। 'পোলসেরাত' সেতুটি চুলের চেয়েও

---

২. 'বড় এক আতশখানা, সঙ্গে হবে তার।
দোজখ বলিয়া নাম রাখিবে তাহার॥
আর এক বাগান তার সঙ্গে সঙ্গে চলে।
রাখিবে তাহার নাম বেহেস্তখানা বলে॥'

সূক্ষ্ম (সঙ্কীর্ণ) এবং অসির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ[৩], তাও আবার সোজা নহে- তিন স্থলে বাঁকা- সে পোলসেরাত নরকের উপর স্থাপিত হইবে।

মহাবিচারের শেষে সকলে ঐ সেতু অতিক্রম করিয়া স্বর্গাভিমুখে যাইবে। স্বর্গের পথ এমনই কঠিন!—

অমাবস্যার রজনীর ন্যায় ঘোর অন্ধকারে মানবকে ঐ সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ সেতু অতিক্রম করিতে হইবে! পুণ্যবান লোকেরা তো অনায়াসে পার হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু পাপীদের পাপের পরিমাণ অনুসারে বারবার পদস্খলন হওয়ায় তাহারা নরকে পতিত হইবে।

আমরা ঐ দুরূহ সেতুর আর একটি অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিলে দোষ কি? মনে করুন, ঐ পোলসেরাত একটি পরীক্ষা বিশেষ। ঐ পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, সে সিদ্ধি লাভ করে; যে ফেল (fail) হয়, তাহার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই সংসার কি? একটা বিরাট পরীক্ষাক্ষেত্র নহে কি? মানব-জীবন পোলসেরাতের পথেই চলিতেছে না কি? কেহ

আরম্ভে, কেহ এক-তৃতীয়াংশ পথে(পোলসেরাতের প্রথম মোড়ে), কেহ অর্দ্ধপথে (অথবা সেতুর দ্বিতীয় মোড়ে), কেহ আর কিছু দূরে (সেতুর তৃতীয় মোড় পর্যন্ত) অগ্রসর হইয়া ফেল হয়,—অধিকাংশ লোকেই ফেল হয়। ক্বচিৎ দুই দশ জন ভাগ্যবান লোক সফলকাম হয়। কবি বড় নৈরাশ্যে গাহিয়াছেন, :

'মিছে কেন কর বিষয় ভাবনা—
কতই দেখিছ, এ ছার সংসারে
কারুই পুরে না মনোবাসনা।'

এই ভারতের ত্রিশ কোটি নরনারীর মধ্যে কয়জন লোক প্রতিদিন দুই বেলা পূর্ণোদর আহার প্রাপ্ত হয়? কয়জন লোকের জন্য জীবিকার পথ সুগম? কয়জনে পোলসেরাতের উপর বসিয়া অশ্রুপাত না করে? কয়জন জীবনের এক-একটি দিনকে এক বৎসর তুল্য দীর্ঘ মনে না করে? কয়জনে জীবনের পথটা কণ্টকময় মনে না করে? তাই কবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন—

'জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!'

তাই তো, একবার এ ভ্রমে পতিত হইলে আর সহজে নিষ্কৃতি নাই।

তাই বলিয়া পোলসেরাত যে একেবারে দুর্গম, তাহাও নহে। অনেকে ধর্মজীবনে সিদ্ধিলাভ করেন; অনেকে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করেন, যিনিই কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহাকেই কঠোর পরীক্ষা পোলসেরাত অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

---

৩ 'চুল হইতে সরু যে তলওয়ার হৈতে ধার,
অন্ধকার রাত্রি হৈতে সেথা অন্ধকার॥
পোনের হাজার সাল জান সেই রাহা।
তিন বেঁক হবে তাহে এলাহির চাহা॥'
'পোনের হাজার সাল সেই রাহা,'
অর্থাৎ সেতুটি এত দীর্ঘ যে পদব্রজে চলিয়া উহা অতিক্রম করিতে ১৫০০০ বৎসর সময় লাগিবে।

আর এক কথা বলিয়া এখন উপসংহার করি। দজ্জাল ১. খ্রীষ্টান (অর্থাৎ দজ্জাল খ্রীষ্টান?) তাহার সঙ্গে ২. অর্দ্ধেক রুটি থাকিবে[৪], যে রুটি [illegible] দেশে সে যাইবে, সেই দেশের ৩. জলের কর্ত্তা হইবে[৫]; (অর্থাৎ তাহার [illegible] অন্ন জল থাকিবে!) ৪. পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য তাহার করায়ত্ত হইবে; ৫. [illegible] ইচ্ছায় শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হইবে, ইত্যাদি কথার অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে। [illegible] তো এই দেখা যায়;—১. খ্রীস্টান দজ্জাল ২. অন্ন ৩. জল ও ৪. অতুল ঐশ্বর্যে [illegible] এবং সে ৫. বিজ্ঞান বলে অঘটন ঘটাইতে (অর্থাৎ শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলাইতে) সমর্থ।

ঐ দজ্জাল ও পোলসেরাতে প্রচুর নৈতিক ও দার্শনিক শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত [illegible] সেই ধর্মগুরু (হজরত মুহম্মদ), যিনি এক কথা জানিতেন! যিনি এমন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী ছিলেন। ধন্য তিনি! অমর তিনি !!

অবশ্য আমার সাধ্য কি যে আমি দজ্জাল বা পোলসেরাতের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করিতে বা তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারি। আমি কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট! তবে বাল্যকালে 'কেয়ামত-নামা' পাঠকালে যাহা মনে উদয় হইল, এস্থলে তাই বলিলাম, আবশ্যক বোধে উক্ত পুস্তকের কোন কোন অংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করা গেল।

যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক; আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি দজ্জালকে একরূপ বুঝিলাম, আর কেহ হয়ত অন্যরূপ বুঝিবেন, কেহ হয়ত হাসিবেন। যিনি হাসিতে চাহেন, তাঁহার প্রতি আমার এই বিনীত অনুরোধ যে, হাসিবার পূর্বে তিনি যেন একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন অদ্য এই পর্যন্ত।

'কাটা মুণ্ড কথা কয়'

'বঙ্গলক্ষ্মী'র পাঠিকা ভগিনীগণ জানেন, ভারতের বিবিধ সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে মুসলিম-ললনা কিরূপ পশ্চাৎপদ এবং মৃতপ্রায় নির্জীব। এখন তাঁহারা এ-কথা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মুসলিম-নারীও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় এখন সেই কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত সত্য ঘটনা পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিতেছি।

প্রায় দুই মাস হইতে সংবাদপত্রে প্রচার করা হইতেছিল যে, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে সভা-সমিতির বিরাট আয়োজন হইতেছে। মুসলিম পরদানশীন মহিলাদের জন্য মণ্ডপে বিশেষ পরদার ব্যবস্থা থাকিবে। ২৬ ডিসেম্বর 'অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের' অধিবেশন হইবে, এবং ২৮ তারিখে জুবিলী অধিবেশন হইবে। তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম মহিলাগণ আলিগড়ে সমাবেত হইয়াছিলেন।

---

৪. 'সঙ্গে তার হবে আর এক আধা রুটি।
যাহাকে চাহিবে সেই রুটি দিবে বাঁটি॥'

৫. 'আর তার তাবে হবে দেশে যত পানি।
চাহিলে না দিবে পানি বিনে পেরেশানি॥'
অর্থাৎ বিশ্বাসীদিগকে জ্বালাতন না করিয়া দজ্জাল জলদান করিবে না

২৬ ডিসেম্বর বেলা ৯টার সময় যখন সমাগত মহিলাবৃন্দ তত্রত্য বালিকা কলেজের সেক্রেটারি শেখ আবদুল্লাহ সাহেবের পত্নীকে সভামণ্ডপে যাওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বিষণ্নমুখে বলিলেন, 'হাঁ সব প্রস্তুত; কিন্তু দেখুন না, মহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সেক্রেটারি প্রফেসার শিরওয়ানী কি গোলযোগ করিতেছেন। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সভামণ্ডপে যাইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে দিবেন না।' অতঃপর মিসেস্ আবদুল্লাহ সকলকে শিরওয়ানীর স্বহস্তলিখিত আদেশ-লিপি দেখাইলেন। যাহাতে লেখা ছিল, 'এডুকেশন্যাল কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারিরূপে আমার হুকুম এই যে, মেয়েরা মণ্ডপে আসিতে পাইবেন না। তাঁহারা হুকুম অমান্য করিয়া যদি আসেন, তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য আমি দায়ী হইব না।'

মহিলাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহারা স্ব স্ব দায়িত্বে বোরকায় (বিশেষ প্রকার অবগুণ্ঠনে) আবৃত হইয়া যাইবেন। পরে মিসেস আবদুল্লার সহায়তায় বালিকা কলেজের মোটরবাসে আমরা প্রায় ২৫ জন স্ত্রীলোক রওনা হইলাম। আমরা পুলিশ প্রহরীর রেগুলেশন লাঠির জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বিনা দ্বিধায় সকলে মণ্ডপে গিয়া উঠিলাম। দ্বিধায় বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা আতিয়া বেগম সাহেবা উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকলকে যথাস্থানে বসাইলেন। আমরা দেখিলাম, চিক এবং কাপড় ঘিরিয়া যে পরদার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা সব খুলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। চিক ও কাপড়ের পরদাগুলি পদদলিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রোফেসার শিরওয়ানীর দোর্দণ্ড প্রতাপের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিল।

মহিলাগণ আসন গ্রহণ করিলে আতিয়া বেগম সাহেবা ভলান্টিয়ারদের দ্বারা চিকগুলি বাঁধাইয়া দিলেন। কর্ত্তৃগণ আতিয়া বেগমকে প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। আর আতিয়া বেগম রাগে কাঁপিতেছিলেন।

যথাসময়ে আতিয়া বেগম একটা চেয়ারে দাঁড়াইয়া দুই চিকের ফাঁক হইতে মুখ বাড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; তখন সমস্ত শ্রোতমণ্ডলী ফিরিয়া বসিলেন। অনেকে চেয়ার বেঞ্চ ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া চিকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন প্রোফেসার শিরওয়ানী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ণ করিলেন। পরে আতিয়া বেগম প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া প্রায় ১০ মিনিট বক্তৃতা করিলেন।

২৮ ডিসেম্বর জুবিলী অধিবেশন ছিল; সে-দিন মহিলাগণ বিনা বাধায় মণ্ডপে গিয়াছিলেন। যথাবিধি চিক পরদার ব্যবস্থা ছিল। সে দিন আতিয়া বেগম আমাদের নিকট না বসিয়া প্লাটফরমের পার্শ্বে বসিয়া মাঝে মাঝে ভদ্রলোকদের বক্তৃতায় টিটকারি দিতেছিলেন। একবার তিনি বলিলেন, 'যে ভদ্রলোক মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন, তিনি চুড়ি পরিয়া অন্তঃপুরে বসুন।' চিকের অন্তরাল হইতে কোন মহিলা দুইগাছি চুড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

উপরোক্ত প্রকারে পরদানশীল নির্জীব মুসলিম মহিলাগণ রণাঙ্গন হইতে প্রোফেসার শিরওয়ানীকে বিতাড়িত করিয়া নিজেরা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং লিখিলেন, ভগিনি! এখন কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অতএব 'বঙ্গলক্ষ্মী'র জয়।

উন্নতির পথে

আজকাল সবাই উন্নতি করেছে—যেদিকে তাকাই কেবল দেখি উন্নতি আর উন্নতি; কেবল আমি অথর্ব বুড়ো অচল হয়ে বসে আছি। তাই ভাবি আর বেশি করে ভাত খাই আর ভাবি যে কি করে আমার উন্নতি হবে।

চশমাটা ভাল করে মুছে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনে নজর পড়ল—'ক্রুশেন সল্ট্' খেলে সত্তর বছরের বুড়ো কুড়ি বছরের তরুণ হয়ে যায়। বাস্—এক শিশি কিনে খাওয়া আরম্ভ করলুম।

ভাই! কী বলব—এক হপ্তা 'ক্রুশেন সল্ট্' খেতে না খেতে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণের মতো গায়ে স্ফূর্তি হলো! তখন ভাবলুম, আর এ বুড়োদের সঙ্গে অথর্ব হয়ে থাকা নয়—যাই তরুণদের সাথে মিশতে।

লাঠি ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি : মেলা তরুণ এক জায়গায় জড় হয়ে গান করছে—

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—'

বাঃ! আমার বড় ভালো লাগল—বিশেষত আমি বাষট্টি বছর এগিয়ে এসেছি কি না—অর্থাৎ আমার বয়স আশি বছর; কিন্তু এক হপ্তা ওষুধ খেয়ে যে এক্কেবারে আঠারো বছরের তরুণ হয়ে গিছি—তাই প্রাণে আর স্ফূর্তি ধরে না!

তরুণকে বললুম, 'ভাই, আমি দাড়ি গোঁফ চেঁচে ফেলে (শিং কাটিয়ে) তোমাদের সঙ্গে মিশতে এসেছি। আমায় তোমার সঙ্গে উন্নতির পথে নিয়ে চল।'

সে বলল, 'বেশ এস।'

পরদিন আমি একটা মোটর নিয়ে তরুণের কাছে গেলুম। সে হেসে বললে, 'এরা আর মোটর নয়। আমার এরোপ্লেনে চল। এরোপ্লেনটা ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল চলে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'ভায়া। পৃথিবীর গতি ঘণ্টায় ৭২০ মাইল, আর তোমার এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৬০,০০০ মাইল?'

তরুণ বলল, 'কি জান দাদা। পৃথিবী বুড়ো হয়ে গেছে—সে আর আমাদের উন্নতির গতির সঙ্গে পেরে উঠছে না।'

যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ করে রওয়ানা হলো। তাতে আরও অনেক যাত্রী ছিল—ইরানী, তুরানী, তুর্কী, আল্‌বানিয়ান, ইরাকী কাবুলী ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিল। সবাই নওজোয়ান,—বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না। আমার মাথার ভিতর কেবলই গুঞ্জন করছিল—

'নগ্ন শির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে—'

কখনও ঐ গানটাই উলট-পালট হয়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিল

'পাগড়ি নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—' ইত্যাদি।

ও বাবা! কতক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা-কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে—আর—

'রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়।'

শেষে দেখি, সোবহান আল্লাহ! তরুণীরাও অর্ধ-দিগম্বরী॥

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি না-ও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচাবে। কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নাই। আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম—'ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছ তা উলঙ্গ হয়ে কেন?'

সে বললে, 'আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি—আমাদের কি কাছা-কোঁচা জ্ঞান আছে? তুচ্ছ বেশ-ভূষা, তুচ্ছ বাস--সব বিসর্জ্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নতি।'

চুপ করে থাকা আমার ধাতে নেই—আমি মরণকালে যমের সঙ্গেও গল্প করব। তুরানী তরুণকে বললুম,'তোমরা তো ভাই নিজের দেশেই আছ, তোমরা স্বাধীন, তবে কাপড় পড়লে কেন?'

সে বললে 'এ কোথাকার ওল্ড ফুল! পৃথিবী যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে—অর্থাৎ যেখান থেকে যাত্রা করেছে, ঘুরে আবার সেইখানে পৌঁছবে—এ তাও জানে না!'

পরে আমি কাবুলী তরুণকে বললুম, 'ভাই! তোমরা তো চিরস্বাধীন, তবে কাপড় পড়লে কেন?'

সে আমাকে বুঝিয়ে বলল যে, তাদের দেশ আবর্জনায় ভরে গেছে, এখন তারা দেশের পস্কোদ্ধার করছে। পাগড়ি ও প্রকাণ্ড কাবুলী পায়জামা, আর চুল, দাড়ি—এসব নিয়ে কাজ করতে গেলে, কাদার ছিটায় (চুল, দাড়ি, পাগড়ি, পায়জামা) সব বিদিকিচ্ছি হয়ে যাবে যে! তাই কেবল হ্যাট ছাড়া দেশে আর কোনো আবরণই থাকবে না।

বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটেছে। এখন দেখি কি, সেই তরুণী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে—যখন মুনি-ঋষিরা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সব সময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হত না বলে টেনে টুনে পরতে হত—সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আমি মিনতি করে বললুম—'ভায়া তরুণ! দয়া করে তোমার প্লেনটা থামাও, আমি এইখানে নেমে পড়ি।'

ইরানী তরুণ হাসতে হাসতে বললেন, 'দাদা! এখনই কি হয়েছে—কোল ভীলের যুগ সেই ভয় পাচ্ছ? এখনও গায়ে রং মাখার যুগে এসে পৌঁছায়নি।'

আমি কাকুতি করে বললুম, 'দোহাই ভায়া তরুণ! আর না। আমি বুঝতে পেরেছি : তোমরা এখন আদি-মাতা হজরত হাবার যুগে এসে পড়বে। আদি-পিতা অভিশপ্ত হয়ে বেহেশ্‌ত থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে—একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপী করেছিলেন। আর আদি-মাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় তো চুলও নেই—এরা কী দিয়ে গা ঢাকবে?'

৭০০ স্কুলের দেশে

এই বঙ্গদেশে এমন একটি জেলা আছে, যেখানে একটি নয়, দুইটি নয়, সাতশত বিদ্যালয় আছে। সেই জেলার এক গ্রামের জমীদারের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার নিজ গ্রামে একটি মধ্য ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। বিদ্যালয় স্থাপন করা বরং সহজ, কিন্তু তাহা পরিচালনা করা সহজ নহে; বিশেষতঃ পরদানশীন মেয়েদের স্কুল।

জমিদার সাহেব শেষে স্থির করিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিবেন একটি সুশিক্ষিতা পাত্রীর সহিত। সেই বধূ তাঁহার বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিবে। তদনুসারে যথাসময়ে অতি সমারোহের সহিত জমিদার পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। বধূর নাম,—ধরুন, সালেহা খাতুন। সালেহা শ্বশুরবাড়ি গিয়া দেখে, তাহার সহিত কেহ কথা বলে না; শাশুড়ি, ননদ সবাই যেন তটস্থ! পাড়ার স্ত্রীলোকেরা বেড়াইতে আসিয়া ফিসফিস করিয়া পরস্পরে কথা বলে। সকলেই বউ দেখিতে আসে—বউ যেন যাদুঘরের কোন আজব চিজ—তাই সমস্ত দিন ছেলে মেয়েসহ স্ত্রীলোকেরা আসে বউ দেখিতে। কিন্তু কেহই বধূর সহিত কথা বলে না। কারণ সালেহার দোষ ত্রিবিধ। ১ম, সে কলিকাতার মেয়ে; ২য়, সে জজ ম্যাজিস্ট্রেরের ম্যায়া; ৩য়, সে সাখাওয়াত স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের মিডল পরীক্ষায় পাশ করা মাইয়া! তাহা ছাড়া সে উক্ত স্কুলে থাকাকালিন কলিকাতা গার্লস স্কলারশিপ পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হইয়া গভর্ণমেন্ট হইতে ২৮.০০ জলপানি পাইয়াছে; ফার্স্ট এড্ এবং হোম নার্সিং (অর্থাৎ প্রাথমিক প্রতিকার ও গৃহ চিকিৎসা) পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ডিপ্লোমা পাইয়াছে, সুচারু সূচিকর্মের জন্য ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হইতে পদক প্রাপ্ত হইয়াছে।

এসব কথা গ্রামময় রাষ্ট্র ছিল। তাই সে শ্বশুরবাড়িতে উপাধি পাইল, 'পড়া বউ'। স্বয়ং কর্ত্তাও গৃহিণীকে চুপি চুপি বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি যেন হঠাৎ যেমন তেমন কোন কথা বলিয়া 'পড়া বউ'-এর নিকট হাস্যাস্পদ না হন। তাই তিনিও পুত্রবধুর সহিত ওজন করিয়া কথা কহেন। সুতরাং বেচারী সালেহা সমস্ত দিন জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে নিতান্ত একাকিনী বোধ করিত।

ক্রমে অবস্থাটা সালেহার বর বুঝিতে পারিলেন। একদিন তিনি নিজে ছোট ভগিনীকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেন তাহার ভাবিজানের সহিত কথাবার্তা বলে না, তাহার কাছে কেন দুদণ্ড বসে না। তাহার উত্তরে সে কাঁদকাঁদভাবে বলিল যে, ভাবিজানের নিকট সমস্ত দিন হাটের মতো লোক থাকে, সে কেমন করিয়া তাহাদের সম্মুখে যাইবে, (কারণ সে যে কুমারী বালিকা) আর তাহাকে মুরুব্বীরা বারণ করিয়াছেন 'পড়া ভাবি'র সহিত কথা বলিতে; কারণ সে তো লেখাপড়া জানে না।

একবার এক মুন্সেফের বউ দুইচারি কথা বলিয়াই হঠাৎ চুপ করিলেন এবং সভয়ে সকাতরে চুপি চুপি বলিলেন, 'মাফ করিবেন, আমি মুক্ষু সুক্ষু মানুষ, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম। আমার স্বামী আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। কারণ আপনি পড়া মানুষ,—আর আমরা কথা কইতে জানি না!'

এদিকে ছয় সাত মাস পরে সালেহাকে তাহার শ্বশুর তাড়া দিতে লাগিলেন যে, পাড়ার ভাল মানুষের মেয়েদের লইয়া স্কুল আরম্ভ করা হউক। কিন্তু তাহারা পড়ালেখার নাম শুনিয়া আঁতকাইয়া উঠিল,—বাপরে! 'পড়া বউ' বলে কী! কোরান কিতাব হইল পাক

আমরা মাগী না ছাগী, কী কাজে লাগি? মাগীর জাত নাপাক, তাহার [illegible] ছুইবে? সালেহা শ্বশুরকে এ সমস্ত বলায় তিনি বলিলেন, 'তবে আপনারা [illegible] ছাড়িয়া নিম্ন শ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা—সকলকে নামাজ শিক্ষা দাও, [illegible] কেহ আপত্তি করিবে না।'

নামাজ শিক্ষা আরম্ভ হইল। ইহাতে সালেহার শশুড়িও সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি বৃদ্ধাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিন কাল গিয়াছে, এখন আল্লাহতালার এবাদত করা দরকার। নতুবা—

'বেনামাজী, বে-দ্বীন ও বে-ঈমানে
বে-তাইন সাজা হবে হাশর-ময়দানে'

তাহারা নামাজ শিখিতে সম্মত হইল। সালেহা সকলকে একত্রে দাঁড় করাইয়া মুখে মুখে বলিয়া নামাজ পড়াইত। পরে প্রত্যেককে নামাজের জন্য ব্যবহৃত সুরাসমূহ মুখস্ত করিতে দিত।

একদিন মগরিবের সময় সকলকে নামাজের নিয়ত ও সুরা বলিয়া দিয়া সালেহা নিজে নামাজ পড়িতে গেল। তাহার নামাজ শেষ হওয়ামাত্র তাহার ছোট ননদ দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, 'ও ভাবিজান! দেখুন আসিয়া,—কালার মা তক্তপোষে শুইয়া ঘরের থামে দুই পা তুলিয়া দিয়া পড়িতেছে,—আলহামদো আলে, দুই ঠ্যাং উঠল চালে।' সালেহা সহর সহিত গিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া সকলের পড়া শুনিতে লাগিল। সকলে আলাদা আলাদা সুর করিয়া পড়িতেছে—

কেহ বলিতেছে—'ইন্নিয়া জাহাদো—'

অপর একজন—'ইসুফ! ইসুফ! ফিছা ধরে নাচ—'

অপর একজন—'খইচালা দিয়া নারাণ জাতা—'

অপর একজন—'আলামতারার কয়টা ফালা—'

অপর একজন—'বেজার হইতেন মুন্সিজী—'

সালেহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল,—রাগে তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে কাঁদিয়া গিয়া শশুড়িকে সমস্ত বলিল।

তিনি আসিয়া স্বকর্ণে পড়া শুনিয়া সকলকে ধমকাইয়া বলিলেন, 'ওরে সর্বনাশী, কালীচুন্নি—ও! তোদের গালে কালী! দূর হ! তোরা কিসের নামাজ শিখবি?'

জনৈকা বৃদ্ধা (সেই কালার মা) সাহস করিয়া বলিল, 'বিবী সাব, দূর দূর করিয়া শেয়াল কুকুরের মতো তাড়ান কেন? নামাজ না পড়লে তো আমাদের বয়েই যাবে। কালার বাপ হজ্ব করে আইলছে; আমরা এত বড় পীরের মুরিদ; আমরা মনজিলের দিন (মহররমের ১০ তারিখে) বিবীর নামে রোজা রাখি; খোদার নাতিদের নামে শরবত খাওয়াই—আমাদের মতো ছওয়াবের কাজ আর কেউ করুক দেখি!' সালেহার শাশুড়ি 'নাউজবিল্লাহ! তোবা তোবা!' বলিয়া কানে হাত দিলেন। নামাজ শিক্ষার্থিনীরা রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেল।

উপরোক্ত ঘটনার সপ্তাহকাল পরে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সালেহার নিকট চাঁদা চাহিতে আসিল। কিসের জন্য চাঁদা দিতে হইবে, এ-কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, গ্রামে বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে, তাই শীতলা দেবীর পূজা করিতে হইবে। সালেহা মিষ্ট ভাষায় তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এ-সব শেরেক বেদাত করা ভাল নয়।

তোমরা ছেলে বুড়া সকলে বসন্তের টিকা লও। তাহারা বলিল, 'তুমি কলিকাতার ম্যায়া, দুই চারিখানা ক্যাতাব পড়িয়াছ, তাই মনে কর তুমি খুব জ্ঞানী মা। তুমি ছাই কিছুই জান না! শীতলামাতাকে স্বয়ং খোদাও ভয় করেন। শীতলাদেবী খোদার গায়েও পাঁচ গোটা বসন্ত দিয়াছেন।' সালেহা কানে আঙুল দিয়া বলিল, 'রক্ষা কর—আর শুনিতে চাই না।'

অপর এক বর্ষীয়সী ধীরভাবে সালেহাকে বলিল, 'পড়া-বউ' যদি রাগ না কর, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। লোকে যে বলে, খোদা ও রসুল। হ্যাঁ মা! খোদা ও রসুল একই লোক না? সালেহা তাহার কথার যথার্থ উত্তর দিয়া তাহাকে কলেমা পড়াইল এবং ভালরূপে কলেমার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বলিল, 'এখন হইতে তওবা কর আর কখনও বিবীর নামে রোজা রাখিও না। হজরত ইমাম হাসান ও হোসেনকে খোদার নাতি বলিও না—' ইত্যাদি। তদুত্তরে আর একজন বলিল, 'আমাদের পয়গম্বর সাব খোদার দোস্তুত, দোস্তের নাতি কী খোদার নাতি হয় না?'

কালার মা বুড়ি বলিল, 'দেখ পড়া-বউ, এই জন্যই এতদিন তোমার লগে আমরা কথা কই নাই। কালার বাপ আগেই আমাকে বলেছিল, পড়া বউ ইংরাজি পড়েছে, তার লগে কথা কইলে ঈমান নষ্ট হবে। বিবী ফাতেমা তানার বাপের দোস্তের কাছ থেকে মহররমের দশটা দিন চাহিয়া লইয়াছেন যে 'তাউই সাব। বছরের সবদিন আপনার থাকুক, কেবল মহররম মাসের দশটা দিন আমাকে দেন।' আমাদের পীর সাব বলিয়াছেন যে, কোরান শরীফের মানে পড়িলে বা মানে বুঝিতে চাইলে বে-আদবী হয়, আর ঈমান যায়। আর তুমি পড়া বউ, এসময় কলেমার মানে বলিয়া দিয়া আমাদের সকলের ঈমানের মাথা খাইলে। তুমি দুই পাতা ইংরাজি পড়িয়াছ, কিন্তু দীন-এসলামের কথা কাঁচকলা কিছুই শিখ নাই। আমি তোমাকে বলি, আজ থেকে তওবা কর, পীর সা'বের কাছে মুরিদ হও,—আর কখনও ইংরাজি পড়িও না,—কোরান শরীফের তরজমা পড়িও না।'

সালেহা দেখিল, তাহার শ্বশুরের মধ্য-ইংরাজি বালিকা-স্কুলের আশা একেবারে আকাশ-কুসুম। সেলাই প্রভৃতি হাতের কাজে পাড়ায় 'ধর্মপরায়ণা' স্ত্রীলোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় কি না, এখন সেইরূপ চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। সে পাড়ার অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক ও বালিকাদের দেখাইয়া দেখাইয়া নিজে সেলাই করিতে বসিত। স্বহস্তে ব্লাউস, পেটিকোট ইত্যাদি কাটিয়া সেলাই করিত। তাহারা স্থিরভাবে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিত, আর পরস্পরে ফিসফিস করিয়া কি সব বলাবলি করিত। একবার একজন সাহস করিয়া বলিল,—

'আচ্ছা পড়া বউ, তুমি থান কা থান আনাম কাপড় কাটিয়া টুকরা টুকরা কর, আবার সেই টুকরাগুলি জোড়া দাও,—ইহাতে লাভটা কি? আনাম কাপড় কাটই-বা কেন, আবার জোড়াই বা দাও কেন?'

সালেহা তাহাদের বলিল, 'তোমরা আগলা গায়ে থাক, ইহা লজ্জার কথা; শাড়ির সঙ্গে অন্তত শেমিজ পরা দরকার। তোমরা কাপড় আনিলে আমি ছাঁটকাট ও সেলাই করা শিখাইয়া দিব।'

দুই চারি দিন পরে কয়েকজন ভালো মানুষের বউ-ঝি কয়েকটা ব্লাউস, পেটিকোট, ফ্রক ইত্যাদি আনিয়া সালেহাকে দেখাইয়া বলিল—'বাপজি বলে, এসব তৈয়ারি জামা পোষাক তো হাটেই কিনতে পাওয়া যায়, তবে এত মেহনত করিয়া সেলাই করার

দরকার কি? পড়া বউয়ে জানে না যে এসব পোষাক হাটে পাওয়া যায়।' সালেহা নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল, ইহাদিগকে পথে আনিবার কোনই উপায় নাই। আর মধ্য ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়,—তাহা আপাতত স্বপ্নই রহিয়া গেল।

একদিন সালেহার শাশুড়ি একটা সুজনী সেলাই করিতেছিলেন। তিনি কার্যান্তরে উঠিয়া গেলে সালেহা সেই কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, নিজের সময় যাপন করা এবং শাশুড়ির কাজে সাহায্য করা,—বুড়ো মানুষ কষ্ট করিয়া সূচে সূতা পরান, তাই সে সুজনী সেলাই করিতে বসিল। কিয়ৎকাল পরে সে মাথা তুলিয়া দেখে, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আসিয়া তাহার কাঁথা সেলাই দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতেছে। একে অপরকে বলিতেছে,—'দ্যাখ্ বু! পড়া বউ-এর গুণ আছে—কাঁথা সেলাই করিতে জানে!'

অপরে বলে, 'তাইতো এ গুণের কথা আমরা জানতাম না; আমরা বলি, কলিকাতার জজ ম্যাজিস্টারের ম্যায়া—সে আবার কি জানব—আরে আয়, আয়! দ্যাখ আইস্যা! পড়া বউ কাঁথা সেলাই করতে জানে!' সকলের দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া এবং গোলমাল শুনিয়া সালেহার শাশুড়ি কোন বিপদের আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তথায় আসিলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি আনন্দে ও গর্বে স্ফীত হইয়া বলিলেন,—'জানব না? সেলাই করে মেডাল পাইছে? তোমরা সবাই বলতে, আমার বউ কাঁচকলা কিছুই জানে না,—এখন দেখলে তো? কি সুন্দর চিকন সেলাই! আমার চাইতেও ভাল!'

গুলিস্তাঁ

কোরান-শরিফে আল্লাহতা'লা বলেছেন :
'ফাঁদ খলিফি ইবাদি ওয়দ খুলিফি জান্নাতি'
অর্থাৎ—'অতএব আমার বাগানের মধ্যে আইস এবং আমার বাগানে প্রবেশ কর।'
মানবের চরম লক্ষ্য সেই গুলিস্তাঁ—যাহা আল্লাহ পুণ্যাত্মাদিগকে দান করিবেন—যেই গুলিস্তাঁয় প্রবেশ করিতে আল্লাহ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

আমরা তুচ্ছ মানব সামান্য লতা-পাতা লইয়া গুলিস্তাঁ রচনা করিয়া থাকি; কারণ ফুলের মতো সুন্দর, ফুলের মতো নির্মল এবং ফুলের মতো পবিত্র জিনিষ জগতে আর কিছু নাই। কত কবি কত ছন্দে যে ফুলের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাস্তবিকই ফুলের সুষমা, ফুলের সৌরভ এবং সৌন্দর্য মানুষকে যতো আনন্দ দেয়, আত্মহারা করে, তেমন আর কিছুতে পারে না। এ জ্বালা-যন্ত্রণাময় জগতে যদি কিছু জুড়াইবার জিনিষ থাকে, তবে সে একমাত্র ফুলকেই বলা যায়।

সৃষ্টিকর্তার কী অপার মহিমা! তিনি মাটি ও ধূলা হইতেই ফুল উৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাই যে, আমরা যতই পাপিষ্ঠ হই না কেন, অনুতপ্ত চিত্তে তওবা করিলে আমাদের সমস্ত কলুষ ধুইয়া-মুছিয়া যাইবে, আমাদের মন পবিত্র ফুলের মতো হইবে। পাপ, পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই আমরা ফুল হইতে পারিব। ফুল হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন বস্তু পৃথিবীতে আছে কি? ফুল অমূল্য ধন। আমেরিকার একটি গোলাপ ফুলের মূল্য সময় সময় ২৫০টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকার লোক জানে ফুল কি জিনিস। আমাদের দেশে প্রকৃতির দয়ায় ফুলের অভাব নাই; তবু গোলাপের মতো সুন্দর ফুল বনে-জঙ্গলে হয় না।

ফুল না হলে আমাদের চলে না; জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত [illegible] ব্যবহৃত হয়। নববধূকে ফুলের অলঙ্কার পরাই; ফুলদ্বারা বিবাহের মজলিস সাজাই প্রিয়জনকে উপহার দেই। ফুল দ্বারা আরো আরো কত কি হয় তাহা বর্ণনা জীবনের শেষ ক্রিয়া শবাধার ফুল দ্বারাই সজ্জিত হয়। অতএব আমরা গুলের সৃষ্টিক অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'গুলিস্তা' পত্রিকাকে এস্তেকবাল করিতেছি।

কৌতুক-কণা

এক

প্রধান শিক্ষক ছাত্রদিগকে হেপোপটেমাস জন্তুর বুঝাইবার সময় বলিলেন,—'হিপোপটেমাস কেমন কুৎসিত জন্তু তাহা যদি ভাল মতে বুঝিতে চাও, তবে আমার মুখের দিকে তাকাও।'

দুই

এক আফিংচি ছেলে কোলে লইয়া মেলায় গিয়াছিল; অনেকক্ষণ নানা দৃশ্য দেখার পর তাহার মনে হইল ছেলে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। বেচারা ছেলে খুঁজিয়া হয়রান শেষে থানায় সংবাদ দিয়া বাড়ি ফিরিল। ঘরে প্রবেশের সময় কপাটের আঘাত লাগায় তাহার কোলের ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। তখন সে ছেলের গালে চড় মারিয়া বলিল—'কমবখৎ! আগে কাঁদিসনি কেন? তা হলে আমার এত হয়রাণ হয়ে থানায় খবর দিতে হত না।'

তিন

হরিশবাবু চাকরের হাতে একটা চিঠি আর পাঁচটা পয়সা দিয়া বলিলেন যে; সে যেন টিকিট কিনিয়া চিঠিতে আঁটিয়া চিঠিখানা ডাকে দেয়। চাকর কিছুক্ষণ পরে আসিয়া হাসিমুখে পয়সা ফেরত দিয়া বলিল,—'নিন আপনার পয়সা। যেই দেখলুম ডাকবাবু মাথা নীচু করে লেখাপড়া করছেন, আমি অমনি চুপি চুপি চিঠিখানা ডাক-বাক্সে ফেলেই, দিয়েছি দৌড়! দেখুন তো কি বুদ্ধি করে বিনি পয়সায় আপনার চিঠি ডাকে দিয়ে এলুম,তবু আপনি আমায় বোকা বলেন!'

চার

পাদ্রী সাহেব মিশন স্কুলের ছাত্রদিগকে পাঠ শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভবিষ্যতে তোমরা কে কী হতে চাও?' জনৈক ছাত্র বলিল,—'আমি কৃষক হব।' পাদ্রী সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—, 'বেশ ভাল কথা। তুমি মানবের ক্ষুধা নিবারণের উপায় করবে। লোকের পরম উপকার করবে।'

অপর একজন বলিল, 'আমি শিক্ষক হব।' পাদ্রী সাহেব পূর্বাপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন--'এ তো আরও ভাল; তুমি মানবের মানসিক ক্ষুধা নিবারণ করবে শারীরিক খাদ্যের চেয়ে মানসিক খাদ্যের মূল্য বেশি।'

তৃতীয় ছাত্র বলিল,—আমি পাদ্রী হব।' এবার পাদ্রী সাহেব আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ, তুমি মানবের পরিত্রাণের কারণ হবে শারীরিক ও মানসিক খাদ্যের চেয়ে আধ্যাত্মিক খাদ্য আরও শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা বাপু! বল তো তুমি কেন পাদ্রী হতে চাও?"

ছাত্র বলিল, 'আমরা গরীব বলে মাংস খেতে পাই না। কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি যেদিন যান, সে-দিনই আমার মা মুরগী রেঁধে আপনাকে খাওয়ান।'

পাঁচ

এক বাড়িতে বিবাহ হইতেছিল। যে মোল্লা বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তোতলা; আর বর ছিল বধির। মোল্লা সাহেব বহু কষ্টে বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'ব-ব-বল, বি-বি-বি-ই-ইঃ-ঈ সমিল্লাহ—' বর জিজ্ঞাসা করিল, 'অ্যাঁ?' মোল্লা ভারী বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলেন, আমি এত কষ্ট করিয়া বিসমিল্লাহ বলিলাম ও হতভাগা তাহা শুনিতেই পাইল না।

ছয়

একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে ভুগোল পড়াইবার সময় দিক-নির্ণয় বুঝাইতেছিলেন। তিনি একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--'দেখ, তোমার বাম হাত দক্ষিণ দিকে, ডান হাত উত্তরে, মুখ পশ্চিম দিকে, এখন বল তো তোমার পশ্চাতে কী আছে?' সে উত্তর দিল, 'স্কুলে আসবার সময় মা আমার ছেঁড়া প্যাৎলুনে একটা তালি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাই আছে।'

সাত

দুইটি ছোট বালিকা পুতুলের বিবাহ দিতেছিল। তাহাদের একজন বরের মা এবং একজন কনের মা সাজিয়াছিল। বিবাহের মন্ত্র পড়াইবার সময় মোল্লাজি বরের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। বরের মা উত্তরে বলিয়া পাঠাইল যে, বল উহার মায়ের এখনও বিবাহ হয় নাই।

নারীর অধিকার

আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন, বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এটা কেন হয় এক-তরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা? অন্তত এইটে তো প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমাদের উত্তর-বঙ্গে দেখেছি, গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোন ত্রুটি হলেই স্বামী দম্ভভরে প্রচার করে, 'আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব।' তারপর ঘরের ভিতর বসে কতকগুলি স্ত্রীলোক ঐ

ভাগ্যহীনা মেয়েটিকে নিয়ে; সামনে বারান্দায় কিম্বা উঠানে বসে স্বামী নামক জীব নিয়ে কতকগুলি পুরুষ; এইসব লোকগুলির সামনে স্বামী লোকটি তিনবার উচ্চারণ করে উচ্চস্বরে :

'আয়েন তালাক, বায়েন তালাক,
তালাক তালাক, তিন তালাক,
আজ জরুরে দিলাম তালাক।'

এই সময় পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয়, নূতন পত্নী লাভ হবে এই আনন্দে। কিন্তু মেয়েটি ভয়ানক কাঁদে। এর পর কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক মেয়েটিকে ধরে তার কানের, নাকের, হাতের অলঙ্কারগুলি খুলে শাড়ির আঁচলে বেঁধে দেয়। হাতের কাঁচের চুড়িগুলি এক টুকরা ইট বা কাঠের সাহায্যে ভেঙ্গে দেয়, আর বলে, 'দেন-মোহর মাফ করে দিয়ে যা।' মেয়েটি এই সময় ভয়ানক কাঁদে। বেচারী স্বামী হারিয়ে, সাজ-সজ্জা হারিয়ে, হাতে-গড়া সাধের পাতানো সংসার হারিয়ে রিক্ততার দুঃখ নিয়েই কাঁদে।

এর পরের দৃশ্য—পুরুষটি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হৃষ্টচিত্তে কোথাও বেড়াতে যায়। আর মেয়েটির বাপ, ভাই, চাচা বা মামু যে অভিভাবক-রূপে উপস্থিত থাকে (কারণ এইরূপ দু'একজনকে পূর্বেই ডেকে আনা হয়) সেই অভিভাবক স্থানীয় লোকটি তখন ঐ ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে টেনে-হিঁচড়ে পাল্কী কিংবা গরুর গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।

বৃদ্ধ পুরুষদের বালিকা-বিবাহে কত আগ্রহ ও সাধ, সেই সম্বন্ধে উত্তর-বঙ্গে এই একটি ছড়া-ও প্রচলিত রয়েছে :

'হুকুর হুকুর কাশে বুড়া
হুকুর হুকুর কাশে।
নিকার নামে হাসে বুড়া
ফুকুর ফুকুর হাসে॥'

পদ্মরাগ

[উপন্যাস]

উৎসর্গপত্র

এই গ্রন্থখানি
পরম স্নেহের দাদা আবোল আসাদ ইব্রাহিম
সাবের সাহেবের করকমলে সমর্পিত হইল।

দাদা!

আমি আশৈশব তোমার স্নেহসাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না—পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়—আমি কেবল তোমাকেই জানি।

জননী সময়ে সময়ে শাসন করিয়াছেন—তুমি কখনো শাসন কর নাই। তাই মাতৃস্নেহের কোমলতাও তোমাতেই অনুভব করিয়াছি।

'পুরস্কার তিরস্কার হিতইচ্ছা থেকে'—

সেরূপ হিতাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকও তুমিই আমার। দাদা, তুমি পুরস্কারই দিয়াছ, তিরস্কার কদাচ কর নাই। মধুতেও ঈষৎ তিক্ত স্বাদ আছে, তোমার স্নেহ কেবলই মিষ্ট-ঐ তিক্তভাবরহিত মধু—স্বর্গীয় 'কওসর'তুল্য!

দাদা! অলস সময় কাটাইবার জন্য যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি-সে প্রথম চেষ্টার প্রথম কাব্য তোমারই চরণকমলে সমর্পণ করিলাম। আমার এ-কাব্যে সামাজিক নিয়মরক্ষা হয় নাই—আমি কেবল বিশ্বপ্রেমিকের চিত্র আঁকিয়াছি।

তোমার আদরের ক্ষুদ্র ভগিনী,
রকু

নিবেদন

প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছিল। ইহার পাণ্ডুলিপি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পরলোকগত বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম. এ. বি. এল. মহোদয়কে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অনেকস্থলে 'Beautiful' এবং Most beautiful' বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাহা পরিষ্কার করিয়া পুনরায় লিখিতে উপদেশ নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নানাকারণে আমি এতদিন তাহা লিখিতে (revise করিতে) পারি নাই। এখন পুনর্লিপি করিতে অনেকস্থল পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিবর্জিত হইয়াছে। কেবল উৎসর্গপত্রখানি পূর্ববৎ অবিকৃত রহিয়াছে।

আজি মনে পড়ে, আমার ভক্তিভাজন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন; সমস্ত গল্পটি মনে নাই, এইটুকু কেবল স্মরণ হয় :

একজন ধর্মপিপাসু ব্যক্তি জনৈক দরবেশের নিকট যোগশিক্ষা করিতে চাহিল। তাহাতে দরবেশ বলিলেন, 'চল আমার গুরুর নিকট।' সে গুরু একজন হিন্দু। হিন্দু সাধু বলিলেন, 'আমি কী শিখাইব, আমার গুরুর নিকট চল'। তাঁহার গুরু আবার একজন মুসলমান দরবেশ!! শিক্ষার্থী দরবেশকে এই হিন্দু-মুসলমানে মিশামিশির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন :

ধর্ম একটি ত্রিতল অট্টালিকার ন্যায়। নিচের তলে অনেক কামরা, হিন্দু—ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন শাখা; মুসলমান—শিয়া, সুন্নী, হানাফী, সাফী প্রভৃতি নানাসম্প্রদায়; ঐরূপ খৃস্টান, রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ইত্যাদি। তাহার ওপর দ্বিতলে দেখ, কেবল মুসলমান-সবই মুসলমান; হিন্দু সবই হিন্দু, ইত্যাদি। তাহার ওপর ত্রিতলে উঠিয়া দেখ-একটি কক্ষ মাত্র, কামরা বিভাগ নাই, অর্থাৎ মুসলমান, হিন্দু, কিছুই নাই—সকলে একপ্রকার মানুষ এবং উপাস্য কেবল এক আল্লাহ। সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে কিছুই থাকে না—সব 'নাই' হইয়া কেবল আল্লাহ থাকেন।

ইতিপূর্বে 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কোনো অংশ কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং এবার পাঠকগণ বলিতে পারিবেন না যে, ইহা পুরাতন জিনিস; অমুক কাগজে দেখিয়াছিলাম।'

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়ভূষণ সরকার, বি. এ. বি. টি. মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক 'পদ্মরাগে'র প্রুফ আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন, সেজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি।

'পদ্মরাগে' আর যাহা কিছু ত্রুটি রহিল, তাহার কারণ লেখিকার বিদ্যাবুদ্ধির দৈন্য। আশা করি, গুণগ্রাহী পাঠক ও পাঠিকাগণ তাহা মার্জনা করিবেন।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী।

পদ্মরাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরুদ্দেশ যাত্রা

নৈহাটী স্টেশনে রাত্রি ১১টার সময় যখন ট্রেন থামিল, তখন ইংরাজি পোষাকে সজ্জিত একজন আরোহী সেকেন্ড ক্লাস হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি জনতায় না মিশিয়া পাশ কাটিয়া বিশ্রামাগারে (ওয়েটিং রুমের) নিকট গেলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া স্টেশনের শোভাসৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তিনি এরূপ স্থান বা স্টেশন-ঘর ও এমন জনতা পূর্বে কখনো দেখেন নাই। তাই বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

হুগলী হইয়া কলিকাতায় যাইতে হইলে এইখানে ট্রেন বদল করিতে হয়। ঘাটগাড়ি আসিতে কিছু বিলম্ব ছিল। ইত্যবসরে উক্ত আরোহী স্টেশনের অপরপার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। কতকগুলি নিষ্কর্মা গাড়ি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই গাড়ির ছায়ায় ঈষৎ অন্ধকারে আসিয়া তিনি পদচারণা করিতে লাগিলেন। অদূরে পাদপশ্রেণী, পরিষ্কার দুর্বাক্ষেত্র—সকলেই যেন শারদীয় চন্দ্রকরে স্নান করিতেছিল। কিন্তু আমাদের পথিক এ সব দেখিতেছিলেন না। তাঁহার বয়স অনুমান ১৮/১৯ বৎসর হইবে; মুখখানী পাণ্ডুবর্ণ, গভীর বিষাদপূর্ণ অথচ কোমলতাময়। মনে হয়, তাঁহার হৃদয়খানি যেন ভাঙিয়া পড়িতে চাহে; পদচারণা করিতেছেন বটে, কিন্তু চরণ যেন অচল।

তিনি তো গভীর চিন্তাসাগরে মগ্ন ছিলেন। এদিকে ট্রেন আসিল ও ছাড়িল। ক্রমে ল্যাম্পগুলি একটি-দুইটি করিয়া নির্বাপিত হইল— তিনি এসব কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সহসা জাগিয়া উঠিয়া স্টেশনের জনৈক কর্মচারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'ট্রেন' ছাড়িতে কত দেরী?' উত্তর পাইলেন, অনেকক্ষণ হইল ট্রেন ছাড়িয়া গিয়াছে; ঘাটগাড়ি রাত্রে আর ছাড়িবে না। তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন—দশ দিক অন্ধকার দেখিলেন এবং নীরবে তথা হইতে সরিয়া গেলেন।

কলিকাতায় যাইতে ছিলেন, যাওয়া হইল না। এইখানে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। ভাবিতেছিলেন, 'তবে' কী করি? কোথায় যাই? কলিকাতায় যাইয়াই বা কী করিব? সেখানেই বা কাহাকে চিনি? কাহার নিকটই বা কী বলিয়া দাঁড়াইব?

এ-কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, হুগলী হইয়া কলিকাতায় যাওয়া কেন? নৈহাটী হইতে তো সোজাসুজি কলিকাতায় যাওয়া যায়। অবশ্য ইহার কিছু কারণ আছে। এ যুবক কোনো বিপদে পড়িয়া ছদ্মবেশী হইয়াছেন। বিপদগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতেছেন, সুতরাং সোজা পথে যাইবেন কেন? শত্রু যে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। হইতে পারে, শত্রুও তাঁহার সহিত কলিকাতা যাইতেছে। তাই তিনি হুগলী যাইবার আশায় এখানে অপেক্ষা করিতেছেন।

আমাদের কথিত যাত্রী নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়ে দীননয়নে চারিদিকে শরতের সুশোভন আকাশ, দীপ্তিমান নক্ষত্রমালা, সুস্নিগ্ধ তরুলতা প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করিল না! বরং সুধাকর যেন তাহার হওয়ায় উপহাস করিতেছি। তিনি উদাসীনভাবে চন্দ্রমার দিকে চাহিয়া লাগিলেন :

নিষ্ঠুর নিদয় শশী! সুদূর গগনে বসি
কী দেখিছ?—জগতের হিংসা পাপরাশি?
—মোরে দেখে পায় তব হাসি?
তোমার হৃদয় তবে বড়ই কঠিন হবে
দুঃখ দেখি তব চোখে আসিল না জল,
একমনে হাসিছ কেবল!
যখন তাপিত প্রাণে চাহি তব মুখপানে,
তোমার এ হাসি, দেখে হিংসা হয় চিতে।
আমি কেন পারি না হাসিতে?
তোমারে গড়িল যেই আমারও নির্মাতা সেই,
তুমি সদা ফুল্লমনে হাস সুধাহাসি,—
আমি কেন আঁখিজলে ভাসি?
জগতের দুঃখ ভয় তোমাদের সঙ্গী নয়
পাপ তাপ তোমাদের কাছে নাহি যায়;
তারা কেন আমারে কাঁদায়?
তোমরা সর্বত্র যাও; বাধা কি কখনো পাও?
কেহ কভু বলে কি 'এ আমাদের ঘর,
এখানে এস না তুমি পর?'
তুমি নীলিমার দেশে যথা ইচ্ছা যাও ভেসে,
অনন্ত আকাশ যেন তোমারি আলয়!—
আমি কেন পাই না আশ্রয়?

অথবা আর কিছু ভাবিতেছেন। তাঁহার মনোভাব আমরা কিরূপে ব্যক্ত করিব? হইতে পারে তিনি সৃষ্টিকর্তাসমীপে মনোদুঃখ, হতাশ বেদনা জানাইতেছিলেন। দুঃখের সময় সে মধুর নাম স্মরণে, যে সুখ—তাহা যে কখনো ব্যথিত হৃদয়ে আল্লাহকে ডাকিয়াছে—সেই জানে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিরাশ্রয়

যুবক এইরূপে অন্যমনে পদচারণা করিতে করিতে স্টেশন ছাড়িয়া কিছু দূরে গিয়া পড়িলেন। এ-নিশীথ সময়েও তিনি নিদ্রায় কিছুমাত্র কাতর হন নাই। সন্তাপহারিণী, বিরাম দায়িনী নিদ্রাদেবীও সুখীর সহচরী—তিনি দুঃখীর সঙ্গিনী নহেন! পথিক যথাধিক উদ্বিগ্নতায় কাতর হইয়াছেন। তাঁহার প্রধান চিন্তা আশ্রয় অন্বেষণ।

এখন শেষ-রজনীতে সুধাংশ পাণ্ডুবর্ণ হইল। ধরণী ঈষৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। নক্ষত্রমণ্ডলীর রূপের ছটায় গগনমণ্ডল ঈষৎ দীপ্ত ছিল। আরও কতক্ষণ এইভাবে গত হইল। যুবক যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এ-ভূমিটি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

অদূরে একটি মসজিদ হইতে সুমধুর 'আজান'-এর শব্দ নিস্তব্ধ ধরণীকে ভুলাইতেছিল, মোহিত করিতেছিল, জগতের প্রাণ ভক্তিরসে গলাইতেছিল। সে মোহন রবে প্রকৃতি জাগিল, পাখি সব জাগিল। সমীরণ সেই স্বর দূর হইতে দূরান্তরে বহিয়া লইতেছিল। স্থির, শান্ত প্রকৃতি সেই সঙ্গীতস্রোতে ভাসিল। ঐ সুধাময় সঙ্গীতশ্রবণে পথিক রাত্রিজাগরণজনিত বেদনা ভুলিলেন। কেমন আনন্দানুভব করিলেন, তাহা বলিতে পারি না, তাহা কেবল অনুভবেরই জিনিস; যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝে।

আমাদের পথিক ভাবিলেন, ঐ মসজিদে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে কেমন হয়? তাঁহার সঙ্গে মাত্র একটি হ্যান্ডব্যাগ ছিল, সুতরাং মসজিদে দুই-একদিন বাস করিতে কোনো অসুবিধা ছিল না। তিনি মসজিদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রবেশ করিতে সাহস পাইলেন না। একি! তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন যে! না তিনি মসজিদে যাইবেন না। তিনি অসহায়ভাবে পথিপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

এই সময় তিনজন ব্রাহ্মমহিলা ঐ পথে যাইতে কী ভাবিয়া ঐ পথিকের নিকট দাঁড়াইলেন। এবার এ নিরাশ্রয় পথিক হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহিলাত্রয়কে নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন—

'আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমার একটু উপকার করিবেন কি?

প্রথম মহিলা। 'উপকার? কী করিতে হইবে বলুন, চেষ্টা করিয়া দেখি'।

'আমার ভগিনীকে আপনারা দুই-এক সপ্তাহের জন্য স্থান দিবেন কি? আমার অন্যত্র প্রয়োজন আছে। বাড়িতে কেহই নাই। আপনার তাহাকে দুই-সপ্তাহ রাখুন, পরে আমি যাহা হয়, করিব।'

প্রথমা। আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আপনার বাড়ি কোথা? আপনি কে? আমরা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা, তবু আমাদের নিকট আপনার ভগ্নীকে রাখিতে চাহেন, ইহার অর্থ কী?

দ্বিতীয়া। আমরাও তো এখানে প্রবাসী—আমরা আজই কলিকাতায় চলিয়া যাইতেছি। আপনি স্থানীয় কোনো লোকের বাড়ি—চেষ্টা দেখুন।

পথিক অতি কাতরভাবে দীননয়নে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—
কেবল দয়াধর্মের অনুরোধে আমাকে—না, আমার কুমারী ভগ্নীকে আশ্রয়
মহিলাত্রয় পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বলিলেন, 'আপনার ভগ্নীকে
রাখিতাম, কিন্তু আমরা বাস্তবিকই অদ্য কলিকাতা যাইতেছি।'
'সেও কলিকাতায় যাইবে। আপনাদের বাসায় তাহাকে পৌঁছাইয়া দিই
সে নিজেই দিবে।'
প্রথম মহিলা। (সঙ্গিনীদের প্রতি) তোমাদের কী মত?
দ্বিতীয়া। তোমার যাহা ইচ্ছা। আমার আপত্তি নাই। তবে পরের বাড়ি কি
মিসিস সেনকে পূর্বে কিছু না বলিয়া একজন অপরিচিতাকে লইয়া হঠাৎ যাই কি
কী বল বিভা?
বিভা। আমার পরামর্শ এই—আজ আমরা যাই; মিসিস সেনকে সব বলিয়া
(পথিকের প্রতি) আগামীকল্য আপনি সেখানে যাইবেন। এই নিন, এই কা
আমাদের ঠিকানা লেখা আছে। আমাদের নিজের বাড়ি নয়—আমরা তারিণী বিদ্যা
কাজ করি। আপনার ভগিনীসহ আপনি সেইখানে যাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দীনতারিণী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার তারিণীচরণ সেন অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পু
কন্যা কেহই ছিল না; ছিলেন কেবল তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সপ্তদশবর্ষীয়া তরুণী বিধ
দীন-তারিণী। তিনি চারি বৎসর পর্যন্ত বৈধব্যযন্ত্রণার সহিত নানাবিধ রোগ ভো
করিলেন। অতঃপর কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তারগণ তাঁহাকে জবাব দিলেন। কি
দীনতারিণী মরিলেন না।

দেবর-ভাশুর প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীনতারিণী একটি বিধ
আশ্রম স্থাপন করিলেন। আশ্রমের নাম রাখিলেন—'তারিণীভবন'। তারিণীভবনে
শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিতা হইয়া তিনি একটা বিদ্যালয় খুলিলেন এবং 'নারী ক্লেশ নিবারণ
সমিতি' নামে একটি সভা গঠন করিলেন। তারিণীভবনের বিরাট অট্টালিকার একপ্রান্তে
বালিকা বিদ্যালয়, অপরপ্রান্তে বিধবাআশ্রম। কিন্তু ক্রমে তাঁহাকে তৎসংলগ্ন এক
আতুর আশ্রমও স্থাপন করিতে হইল।

এইরূপে দীনতারিণী শমনভবনের দ্বারদেশ হইতে প্রত্যাগতা হইয়া বিধ
কার্যক্ষেত্রে নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহার এই কর্মজীবনে
সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা বিরক্তই রহিলেন, এবং তারিণী লক্ষাধিক টাকার অপব্যয়
শ্রাদ্ধ করিতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিতেন আর তারিণীর কার্যকলাপকে নিন্দ
করিতেন।

যে বিধবার তিনকুলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে? তারিণীভবনে। যে
বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে? তারিণী-বিদ্যালয়ে। যে সর্ব

মার পাশবিক অত্যাচারে চূর্ণবিচূর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে
থায় গমন করিবে?—ঐ তারিণীকর্মালয়ে।
দীনতারিণী স্বীয় আত্মীয়স্বজন কর্তৃক একরূপ 'সমাজচ্যুতা' হইয়া নির্জনে বাস
রতেন। কিন্তু 'নির্জন' বলিলে মিথ্যা বলা হয়, কারণ তারিণী বিদ্যালয়ের সাধারণ
ী (ডে-স্কলার) ব্যতীত কেবল বোর্ডিং হাউসেই শতাধিক বালিকা বাস করে;
তীত তাহাদের শিক্ষয়িত্রী; 'মেট্রন', পরিচারিকা ইত্যাদি তো আছেই।
রিণীভবনেও লোকসংখ্যা অল্প নহে। ইহাতে তাহার আত্মীয়গণ বলিতেন, 'তারিণী
ব লোক পাইবে কোথায়? কোন্ ভদ্র ঘরের বউ-ঝি তাঁহার নিকট যাইবে? দেশের
ঁ পতিতা স্ত্রীলোক, যত কুষ্ঠরোগী, যত সব নগণ্য অনাথ শিশু—তাদের লইয়াই তো
রিণীর সংসার!!' এবম্বিধ মন্তব্য শ্রবণে তারিণী দুঃখিত না হইয়া বরং হাসিতেন।
নি বলিতেন, 'পর-সেবা করিবার মতো সৌভাগ্য কি সকলের হয়?'
দীনতারিণী সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ব্যস্ত ছিলেন। বিদ্যালয়সংক্রান্ত অনেক
জের ভীড়। একজন কোচম্যানকে কী কারণে সরকার বাবু প্রহার করিয়াছেন, সে
শের বিচার! সেইদিন অপরাহ্নে ৫ নং 'বাসের' ঝি বলিয়াছিল, 'ওমা! আমি আর
নের মেয়ে পৌঁছাতে যাব না। নেসপেটটর বাবু বলেছেন, 'তোমাদের গাড়ি আটক
ব, আর কোচম্যানকে ফটক দিব।' তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?—ঘোড়ার পা
ড়া।' তবে তুমি বলিও 'ঘোড়াকে আটক দিন, আর সইসকে ফাটক দিন।' কিন্তু
ত্রায় 'কলিকাতা, পশু-ক্লেশ নিবারণী সভার পত্র আসিয়াছে যে, ৩ নম্বর এবং ৫
ম্বর, 'বাস'-এর ঘোড়া খোঁড়াইয়া চলে সেজন্য তাঁহারা স্কুলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা
রিবেন। দুইজন সইসের বিরুদ্ধে ঘোড়ার দানা চুরির অভিযোগ। ৭ নং 'বাস'
ত্রিখানা অপরাহ্নে ট্রামের ধাক্কায় চাকা ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছিল—ইত্যাদি নানাবিধ
ালমালে তারিণী ভারি ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় মিস বিভা চক্রবর্তী সংবাদ দিলেন
য, নৈহাটী হইতে সেই অজানা মেয়ে মানুষটি আসিয়াছেন।
তারিণী। তুমি আজ রাত্রে তাহাকে তারিণীভবনে রাখ, আমি এখন তাঁহার সংবাদ
ইতে পারিব না। আগামীকল্য প্রভাতে সর্বপ্রথমে তোমাদেরই দরবার করা যাইবে।
খন যাও—আমি বড় ব্যস্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তারিণীভবন

ভা সিদ্ধিকাকে (সেই অপরিচিতা মহিলাকে) তারিণীভবনে লইয়া গেলেন।
সাধারণত 'তারিণীভবন' বলিতে তৎসলগ্ন বিদ্যালয়, কর্মালয় এবং আতুরাশ্রমও
ঝায়!
বিদ্যালয়বিভাগে ব্রাহ্ম, হিন্দু, খ্রিস্টান, শিক্ষয়িত্রী তো ছিলেনই। ক্রমশ মুসলমান
ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের ধর্মশিক্ষার জন্য দুই-তিনজন মুসলমান
ক্ষয়িত্রীও নিযুক্ত করা হয়। কী সুন্দর সাম্য!—মুসলমান, হিন্দু ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান, সকলে
মন এক মাতৃগর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলিয়ামিশিয়া কার্য করিতেছেন।

বিদ্যালয়ে গভর্নমেন্ট হইতে আর্থিকসাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং [illegible] 'সরকারি' পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত কোনো পুস্তক অধ্যয়ন করানো হয় না। সুশিক্ষিতা মহিলাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দীনতারিণী নিজেই পাঠ্যপুস্তক [illegible] করেন।

ছাত্রীদিগকে দুইপাতা পড়িতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র –সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন প্রভৃতি বিষয়ে অধিক মনোযোগ দান করা হয়। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালোবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষত তাঁহারা আত্মনির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যত-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীপুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই এ বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য করেন। বিশেষত দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজন্যবর্গের ভিক্ষা গ্রহণ করা হয় না।

আতুরাশ্রমে 'পথে পড়িয়া পাওয়া' নিঃসহায়, নিঃস্ব রোগী আশ্রয় পায়, আরোগ্যলাভ করিবার পর তাঁহারা চলিয়া যায়। কেবল কুষ্ঠ ও অক্ষম রোগী রহিয়া যায়।

আতুরাশ্রম বিভাগে অনেকেই অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন, অনেক মুসলমান মহিলা গোপণে অর্থদান করেন। নামপ্রকাশে পুণ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এ-দানক্রিয়া অতিগোপনে সম্পন্ন হয়।

'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতির সাহায্যে তারিণীভবনের অধিকাংশ ব্যয়নির্বাহ হয়। অনেক মুসলমান মহিলা গোপনে এই সমিতির সভ্যা হইয়াছেন। বৃদ্ধা ও রোগ-হেতু কার্য করিতে অক্ষম দরিদ্র বিধবা ও সধবাগণ তারিণীভবনে বাস করেন।

কর্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা—সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। তাঁহারা বিবিধ সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, হাতের তাঁতে কাপড় বোনেন, পুস্তক বাঁধাই করেন, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। কেহ শিক্ষয়িত্রী-পদলাভের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন; কেহ টাইপিং শিক্ষা করেন; কেহ রোগীসেবা শিখেন। ফল কথা, এ বিভাগে রমণীগণ আপন আপন জীবিকা স্বয়ং উপার্জন করিয়া থাকেন। এই বিভাগে তারিণী-বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষয়িত্রী এবং আতুরাশ্রমের জন্য নার্স প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য হিতকর কার্য, যথা দুর্ভিক্ষ, বন্যা এবং মহামারীপীড়িত লোকদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বিভাগ হইতে মহিলাগণ তণ্ডুল, বস্ত্র ও ঔষধবিতরণ এবং রোগী-সেবা করিতে গিয়া থাকেন।

সিদ্দিকা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া গৃহশোভা দেখিতে লাগিলেন। পরিষ্কার ঝরঝরে পাথরের মেজে; বিলাসিতার কোনো সরঞ্জাম, যথা টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি নাই; প্রত্যেক ভগিনীর জন্য এক-একখানা শয্যা মাত্র। দেওয়ালে বড় একটা ঘড়ি নিয়মমতো নিজের কার্য করিয়া যাইতেছে।

'ভগিনীদের পোষাক সকলের প্রায় একইপ্রকার : শ্বেতবস্ত্র শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া এখানে তাহা ব্যবহার করা হয় না। সকলের পরিধানে নীলবর্ণ বা গৈরিক শাড়ি আর

ভূষণ। সভ্যতার পরিচায়ক জুতা, মোজা নাই। অলঙ্কারের আড়ম্বর কাহারও নাই। কাহারো কাহারো হাতে বালা কিংবা শাঁখা আছে মাত্র। অহঙ্কার নাই, বিলাসিতা নাই। কেবলই যেন সরলতা ও উদারতায় ভূষিতা। যেন মুনিকন্যাগণ তপোবন ছাড়িয়া সংসারক্ষেত্রে আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই নিরাভরণবেশেই কত না রূপ! 'ভগিনীগণ' সকলেই যেন সাক্ষাৎ করুণা!

এখানে সকলেই বয়স বিচার না করিয়া পরস্পরে 'তুমি' সম্বোধনে কথা বলেন। একে-অপরকে 'দি' (দিদি) এবং মুসলমানদের 'বু' (বুবু অর্থাৎ ভগিনী) বলেন। কোবেশা পাটনার অধিবাসিনী, বাঙলার, 'বু'র মর্ম বুঝেন না বলিয়া তাঁহাকে 'বি' বলা হয়। দীন-তারিণী সাধারণত 'মিসিস সেন' নামে পরিচিতা। তাঁহাকে সকলে 'আপনি' সম্বোধন করেন; তিনিও কয়েকজন মহিলা ব্যতীত অপর সকলকে 'আপনি' বলিতেন।

বিভা নিম্নলিখিত মহিলাত্রয়ের সঙ্গে সিদ্দিকার আলাপ করাইয়া দিলেন :

১. চারুবালা দত্ত—চিরকুমারী, বয়স ৩৮ বৎসর।
২. সৌদামিনী—সধনা, বয়স ৪৩ বৎসর, গৌরবর্ণা এবং সর্বাঙ্গসুন্দরী। বয়স অধিক হওয়াতেও লাবণ্য নষ্ট হয় নাই।
৩. মিসিস হেলেন হরেস—ইংরাজ মহিলা, বয়স ৪১ বৎসর, বিধবা বলিয়া পরিচিতা।

সিদ্দিকা ইঁহাদের আদরযত্নে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন : ভাবিলেন, এমন স্থান পাইলে স্বর্গেরও প্রয়োজন নাই। অত্যন্ত ক্লান্তিবশত সিদ্দিকা নৈশভোজের পর অচিরে নিদ্রাভিভূত হইলেন, সুতরাং 'ভগিনীগণ' ভালোরূপে তাঁহার পরিচয় লইতে পারিলেন না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী এবং কর্মালয়ের ভগিনীদের বাসস্থান সম্বন্ধে পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তগণ প্রত্যেকে এক-একটি স্বতন্ত্র কামরা পাইয়া থাকেন, আর তাঁহারা গৃহিকবাসা সন্ন্যাসিনীও নহেন। 'ভগিনী'দের কাহারো স্বতন্ত্র কামরা নাই—বৃহৎ দালানে পাথরের মেজের উপর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র শয্যা, একটা আলনা এবং একটি ট্রাঙ্ক আছে। সিদ্দিকা এই কর্মালয়ে সৌদামিনীর শয্যায় রাত্রিযাপন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্মরাগ

নির্বিঘ্নে রজনীযাপন করিবার পর সিদ্দিকা বেশ প্রফুল্ল হইলেন এবং আপন স্বাভাবিক কান্তি ফিরিয়া পাইলেন। প্রাতঃরাশের পর বিভা ও ঊষারাণী সিদ্দিকাকে তারিণীর কক্ষে লইয়া গেলেন।

দীনতারিণীর সম্মুখে আনীতা হইয়া সিদ্দিকা সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কী?'

—'সিদ্দিকা।'

—'সিদ্দিকা, না পদ্মরাগ? তুমি দেখিতে ঠিক পদ্মফুলের মতো টুকটুকে। এখানে রাত্রে তোমার কোনো কষ্ট হয় নাই তো?'

—'আজ্ঞে না, আমি বেশ আরামে ঘুমাইয়াছি। আপনার কাছে আবার কষ্ট কী?'

—'আহা! তুমি এমন কথা বলিও না। এ তোমার নিজের ঘর। এখানে মুসলমান শিক্ষয়িত্রী আছেন, তুমি তাঁহাদের নিকট থাকিবে। কোনো অসুবিধা আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিও না। তোমাকে এখানে রাখিয়া তোমার ভাই কোথা গেলেন?'

—'বিদেশে।'

—'তা বিদেশে গেলেই ভগ্নীকে এখানে রাখিতে হইবে, ইহার কারণ কী?'

—'আমাদের বাড়িতে আর কেহ নাই যে।'

—'বিভা! তোমাকে ইহার ভাই কী বলিয়া গেলেন?'

বিভা। আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমি নিচে যাইবার পূর্বেই নাকি তিনি ইঁহাকে গাড়িতে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

—'তা বেশ লোক তো! কুমারী ভগ্নীকে একটা অপরিচিত স্থানে রাখিয়া গেলেন অথচ সেখানকার লোককে দুটি কথাও বলিয়া গেলেন না।'

বিভা—'ইহাতে বুঝা যায়, আপনার প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভরসা যথেষ্ট আছে।'

তা।—'কিন্তু তুমি কিরূপে বিশ্বাস করিলে যে, এই মেয়ে নৈহাটীর সেই ভদ্রলোকের ভগ্নী?'

সিদ্দিকার মুখেরদিকে চাহিয়া বিভা বলিলেন, 'ইনি দেখিতে ঠিক তাঁহারই মতো মনে হয়, যেন জমজ-ভ্রাতাভগ্নী। আর আমি যে কাগজখণ্ডে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহাও ইঁহার নিকটই পাইলাম, আর যে হ্যান্ডব্যাগটা—'

উচ্চহাস্য করিয়া তারিণী বলিলেন, 'বেশ! বেশ! আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই তুমি ইঁহাকে তারিণীভবনে না দিয়া আপাতত কোনো শিক্ষয়িত্রীর কামরায় রাখ। তাহা হইলে, ইঁহাকে জাফরী খানমের জিম্মায় দিবে, না, কোরেশা বি-র সঙ্গে রাখিবে?'

—'কোরেশা বি-ই অধিক সভ্যভব্য; আর তিনি নিজেই সিদ্দিকাকে রাখিতে চাহিয়াছেন।'

—'তা, এই যে কোরেশা বি'ও আসিয়াছেন। বেশ, এই নিন, এ মেয়েটিকে পরম যত্নে রাখিবেন।'

কোরেশা বিবি বলিলেন—'তাহা আর বলিতে? আমি তো সেইজন্য আসিয়াছি। (সিদ্দিকার প্রতি) আসুন, আপনার নাম কী?'

বিভা। 'মিসিস সেন উহার নাম রাখিয়াছেন—পদ্মরাগ!'

কোরেশা।—'পদমৃরাজ'? এ আবার কী নাম?

তারিণী।—'আপনি বিভার দুষ্টামী শুনিবেন না; এ বিবির নাম সিদ্দিকা খাতুন।'

বিভা।—'কোরেশা বি! আপনি আমাদের বাংলা নামগুলির বড় লাঞ্ছনা করেন; আপনি পদ্মরাগকে বলিলেন, পদমৃরাজ'; আপনার এ ভারি অন্যায়।'

মিসিস উষারাণী চ্যাটার্জি বলিলেন, 'এজন্য আর দুঃখ কেন? তুমি প্রথম প্রথম মুসলমান মেয়েদের নামগুলি কেমন বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিতে—রাসেখাকে 'রসিকা', আর শওকত আরাকে 'শুকতারা' বলিতে, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ?'

বিভা।—'একদিন জাফরী খানমের সঙ্গে ঐ বিষয় লইয়া লাঠালাঠি হওয়ার উপক্রম

[illegible]য়াছিল, তাহাও মনে আছে; তা আমাদের কোরেশা বি [illegible]
[illegible]রেন।'

ঊষা। 'নয় তো কী! এখনই তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন যে আপনাকে চায় খাবেন!'

কোরেশা—(তারিণীর প্রতি মুদৃস্বরে) 'কথাটি কি ঠিক বাঙলা হয় নাই?'

তারিণী—'তা সব ঠিক আছে; আপনি ও বাঙালিদের কথায় কোনো কান দিবেন না।'

সান্ধ্য উপাসনার পর ঊষারাণীর কামরায় কোরেশা ব্যতীত অপর শিক্ষয়িত্রীদের এবং কর্মালয়ের 'ভগিনী'দের একটা সভা বসিল। আলোচ্য বিষয় ছিলেন—সিদ্দিকা।

জাফরী খানম বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার সুরে বলিলেন, কোনো ভদ্রলোকের কন্যা এভাবে কোথাও আইসে না।'

চারুবালা।—'যদি সহোদর ভ্রাতা সঙ্গে আনিয়া রাখিয়া যায়?'

জাফরী।—'ঐ কথাই তো বলিতেছি, কোনো ভদ্রলোক এমন করে না।'

ঊষা।—'কোনো একটা ব্যবস্থাপুস্তকে এরূপ আছে কি, যাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে—'ভদ্রলোক কেবল এই কাজ করে' আর 'এই কাজ করে না?'

বিভা—'জ্বালাতন করিলেন দেখি; ভদ্রলোকে প্রবঞ্চনা করা, মিথ্যা বলা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা ইত্যাদি সব দোষ করিতে পারে; আর পারে না কেবল কোনো সম্ভ্রান্ত জায়গায় ভগ্নীকে রাখিতে?'

চারু।—'ভদ্রলোকে না করেন কী? ডাকাতী, জুয়াচুরি, পরস্বাপহরণ, পঞ্চ 'মকার' আদি কোন্ পাপের লাইসেন্স, তাঁহাদের নাই?'

ঊষা।—'যদি বিধবা মাসী-পিসির সর্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার হাতে কমণ্ডলু দিয়া পথে না বসাইলেন, তবে আর তিনি কিসের বনিয়াদী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক? তাঁহার হজ, তীর্থ, পুণ্য সবই বৃথা! যাক সে-কথা। বলুন দেখি খানম সাহেবা, সিদ্দিকাকে দেখিয়া কী ধারণা হয়? কোনো কুলিমজুরের মেয়ে, সাঁওতাল না কোল?'

জাফরী।—"আমি 'এলমে কেয়াফা' (মুখদর্শনে মানুষচেনা বিদ্যা) জানি না। তবে ভদ্রঘরের মেয়ের মতো ইঁহার মুখশ্রীতে কোমলতা আছে।"

নলিনী।—'বলি, খানম সাহেবা, আপনার লক্ষ্ণৌয়ী ভদ্রলোকেরা কী কাজ করেন?'

বিভা।—'তাঁহারা গোঁফে আতর আর কাপড়ে ঘি মাখেন!'

জাফরী।—'যাও বিওয়া (বিভা) দি! আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না।'

সৌদামিনী।—'অভাগিনী পদ্মরাগ নিশ্চয় সংসারের নির্মম পেষণে বাধ্য হইয়াই বৃন্তচ্যুত কলিকার ন্যায় এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সে যদি ভদ্র গৃহস্থের কন্যা নাও হয়, তবু আমরা তাহাকে 'ভদ্র' করিয়া লইব।'

নলিনী।—'তারিণী-কর্মালয়—রূপ পরশপাথরের স্পর্শে সে সোনা হইয়া যাইবে।'

ঊষা।—"সোনা না হইয়া 'পদ্মরাগ' হইলেও আপত্তি নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিতান্ত একাকিনী

সিদ্দিকা ৯/১০ মাস হইতে তারিণীকর্মালয়ে আছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পর্যন্ত কেহই জানিতে পারে নাই। তাঁহাকে 'ভগিনী'গণ (তারিণীকর্মালয়ের মহিলা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণ সাধারণত 'দরিদ্রের ভগ্নি' নামে পরিচিতা, সংক্ষেপে তাই কেবল 'ভগিনী' বলা হয়) অনেক আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় উঠিয়া পলাইতেন; নয়, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতেন, 'ক্ষমা করিবেন, আমি কিছুই বলিতে পারিব না--আমি নিতান্ত একাকিনী। জগতে আমার কেহ নাই'।

আবার যদি প্রশ্ন হয়--'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'আমার বাড়ি সর্বত্র--বিশেষত তারিণীভবন'।

এ-দীর্ঘকালে সিদ্দিকা কাহাকেও একখানি পত্র লিখেন নাই, তাঁহার নামেও কাহারো চিঠিপত্র আইসে নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচয় জানিবার কোনো উপায় নাই। তাঁহার ভ্রাতা যে তাঁহাকে মাত্র দুই-সপ্তাহের জন্য রাখিয়া গেলেন, তিনিও এ-যাবৎ একখানা পোস্টকার্ড দ্বারা ভগ্নীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। আর সে ভ্রাতাকে তারিণীভবনের কোনো লোকই দেখে নাই। সিদ্দিকা হ্যান্ডব্যাগটিসহ গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া নিজেই গাড়ির ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছেন। পরে বিভা আসিলে, তাহার সহিত উপরে গিয়াছেন; যাহা হউক, কোনোপ্রকারেই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইত না। তিনি সর্বদা ম্রিয়মান থাকিতেন। 'ভগিনী'গণ তাঁহাকে হাসাইবার জন্য অনেক প্রকার হাস্যকৌতুক করিতেন কিন্তু তিনি অটল পর্বতের মতো স্থির, গম্ভীর। সময় সময় বৃদ্ধ কম্পাউন্ডার ঈশান বাবু বলিতেন, 'বাবা! অনেক দেখেছি--এমন মেয়ে দেখি নাই! এ যে সাক্ষাৎ পাষাণীর মেয়ে পাষাণী!!'

শিক্ষয়িত্রী এবং রোগী-সেবিকাগণ পরস্পরে সিদ্দিকার সমালোচনা করিয়া বলিতেন--'পদ্মরাগ কী সত্যই মনুষ্য নহেন--মানবের ভাষা বুঝেন না? কোনো অজ্ঞাত স্বর্গ হইতে শাপভ্রষ্টা দেবী এখানে আসিয়াছেন কি? আহা! এমন শাপ কে দিয়াছে?'

'অথবা স্বর্গের দেবী পথ ভুলিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। যেন সংসারের গতি মতি কিছু জানেন না।'

'তাই বটে; প্রভাতের ম্লানমুখী পূর্ণশশীটির মতো; কিম্বা শুষ্কপ্রায় গোলাপ-মুকুলটির মতো। আহা! কেন ওর গায় এত শীঘ্র সংসারের উত্তাপ লাগিল!'

'এ আশ্রমটি বেশ তাপদগ্ধ জীবনের দাঁড়াইবার স্থান হইয়াছে। দিদি, আমরা তো সংসারে নিষ্ঠুর নির্মমতার চূর্ণ হইয়া সংসার ছাড়িয়া জুড়াইবার জন্য তারিণীভবন আসিয়াছি। কিন্তু এ কিশোরী বালিকা সংসারের কী জানে যে, এই বয়সে সন্ন্যাসিনী হইতে আসিয়াছে?'

সৌদামিনী। কী জানি ভগিনী, কাহার মনের ব্যথা কে বুঝিতে পারে? জানো, অনেক জিনিস অকালেই পরিপক্ব হয়। ভেবে দেখ, আবার অনেক কলি অকালে শুকায়। এ বিশাল সংসার-আকাশে ছোটবড় কত তারা—

নীরবে উদয় হয়, নীরবেও যায় অস্তাচলে,
কে তার হিসাব রাখে, কে রাখে সংবাদ?

নলিনী। হাঁ, সেই কবির বচন মনে পড়ে—

সাগরের সুগভীর আঁধার গহ্বরে
উজ্জ্বল রতন কত রয়েছে লুকায়ে;
ফুটিয়া কুসুম কত বিজন প্রান্তরে
শুকায় সৌরভ তার বায়ুতে মিশায়ে!

সৌদামিনী। তোমার রোগীর অবস্থা কিরূপ? আজ তুমি বোধহয় একবারও তাহার নিকট যাও নাই।

নলিনী। না দিদি, তাহাও কি হয়? এই এখনই দেখিয়া আসিলাম। বেশ সুখে নিদ্রায় আছে।

চারুবালা। নার্স নলিনী কর্তব্য ভুলিবার পাত্রী নহেন! তোমরা হীরা মাণিকের আলোচনা কর, আমি ভাবি নলিনীর কথা; সে যে—

'ভ্রমর-গুঞ্জনে কতই শুনিত
আমার মোহিনী বাণী;
রচি কল্পনায় প্রসূন রাজত্ব
তাহাতে ছিল সে রানি!—'

বাল-বিধবা নলিনী সত্যই পদ্মফুলের মতো প্রফুল্ল; বয়স ৩৮ বৎসর হইবে। তিনি কপট বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'ছি! চারু-দি'! একটু গম্ভীর হইতে শিখ।'

চা। বেশ তবে—

'জীবন-সরসে কমল-কলিকা
আশার অরুণ পানে চাহিল—
নলিনীর পূর্ণ-বিকাশ দিবসে
মধ্যাহ্ন না এসে, সন্ধ্যা আইল!'

কিছুদিন পরে সিদ্দিকা বলিলেন, 'আমাকেও কোনো একটি কাজ দিন।'

সৌদামিনী। তুমি কী কাজ জানো?

সিদ্দিকা। বিশেষ কোনো কাজই জানি না; যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিব।

সৌদা। যদি কাঠ কাটিতে বলি?

সিদ্দি। কাঠ কাটিতে পারিব না—এমন কাজ দিন যাহাতে শারীরিক বলের দরকার না হয়। সেলাই করিতে দিন না?

সৌদা। সেলাই—কী কী রকম জানো? আমাদের জামা প্রস্তুত করিয়া দিবে? পেটিকোট, ব্লাউস, শার্ট ইত্যাদি ভালো মতো ছাঁটিতে-কাটিতে পার?

সিদ্দিকা কারচুবি ইত্যাদি উচ্চদরের সেলাই জানিতেন বটে, কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় কাপড় সেলাই করিতে শিখেন নাই! লেখাপড়া যাহা শিখিয়াছেন তাহাও এক্ষেত্রে অর্থকরী নহে। ফল কথা, জমিদার-পরিবারের কন্যাগণ যেমন লেখাপড়া— শুধু

ভাষাশিক্ষা এবং নানারূপ সূক্ষ্ম সূচিকার্য উল বুনানো ইত্যাদি শিক্ষা করি... সিদ্দিকাও তাহাই জানিতেন। সুতরাং সিদ্দিকা দেখিলেন, তাঁহার কোনো... পয়সা উপার্জন করিবার উপযোগী যোগ্যতা লাভ করে নাই। অঙ্ক না-জানায় ... লেখাপড়া কাজে আসিল না। শেষে সেলাই করিতে চাহিলেন, তাহাতেও কষ্টা... হেঙ্গাম! অবশেষে স্থির হইল, তিনি দরিদ্র রোগীদের জামা, পরদা, চাদরের ... বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি সেলাই করিবেন।

সেইদিন হইতে সিদ্দিকা সর্বদা সুচ-সূতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। অন্যান্য কার্যে যথাসাধ্য যোগদান করিতেন। ঔষধের মিকচার (mixture) প্রস্তুত করিতেন, পথ্য রাঁধিতেন। ছোট ছোট কার্য যাহা করিতে অন্য সেবিকাদের অবসর হইত না, তাহা সিদ্দিকা করিতেন। কোনো কার্যেই তাঁহার ঔদাস্য দেখা যায় না—কার্যে তিনি বড় মনোযোগী। রীতিমতো অভ্যাস (Practice) না-থাকায় প্রথম প্রথম কোনো কার্যই সুচারুভাবে করিতে পারিতেন না।

একদিন তারিণীর 'অফিস'-কামরায় গিয়া কতিপয় মহিলাকে টাইপ (type) করিতে দেখিয়া সিদ্দিকা ভাবিলেন, এ কাজটি বেশ সহজ। তিনি রাফিয়া বেগমের নিকটে গিয়া টাইপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি প্রশ্ন করিলেন—'তুমি টাইপ করিতে পার?'

সি। কখনো করি নাই বটে, কিন্তু পারিব; দেখুন না—

কিন্তু তাঁহার টাইপ করা দেখিয়া সকলে হাসিয়া ফেলিলেন!

সিদ্দিকা লজ্জা পাইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—ইংরাজি জানি; টাইপরাইটারের চাবিতে লিখিত অক্ষরও পড়িতে পারি, তবু আমার হাতে আঙুলগুলি ঠিক চলিল না কেন।' পরে তিনি যথাবিধি টাইপ শিক্ষা করিতে গিয়া দেখিলেন, (blind system অনুসারে) সামান্য দুই অক্ষরের একটি শব্দ, যথা 'is ' লিখিতে গেলেও একবার দক্ষিণহস্তের আঙুলি এবং পরে বামহস্তের অঙুলি ব্যবহার করিতে হয়।

যদিও দৈনন্দিন কার্যের অনুরোধে তারিণীভবনের সকল পুরুষ কর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদা দেখা হইত, তবু সিদ্দিকা তাঁহাদের নিকট সুপরিচিতা ছিলেন না। সিদ্দিকাকে মিতভাষিণী জানিয়া তাঁহারা ইহার সঙ্গে অনাবশ্যক কথা বলিতে প্রয়াস পাইতেন না।

সন্ধ্যার সময় কার্য শেষ হইলে, রমণীগণ নদীতীরে বা মাঠে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। প্রথম প্রথম সিদ্দিকা তাঁহাদের সঙ্গে বাহির হইতেন না। পরে সকিনা ও নলিনী তাঁহারে বলিয়া-কহিয়া সঙ্গে লইতে লাগিলেন।

শরৎ নামক একটি বালক এখানে আতুরাশ্রমে আসিয়াছে। তাহাকে সিদ্দিকা খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে সিদ্দিকা রোগী-সেবা শিক্ষা করেন। পূর্বে তিনি রোগী দেখিলে ভয় পাইতেন; শরৎ তাঁহাকে সেবাধর্ম শিক্ষা দিলেন। শরতের সেবা-শুশ্রূষার সময় সৌদামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বেশি হইল, কারণ সৌদামিনী শরৎকে প্রাণের সহিত ভালোবাসিতেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রোগী

গ্রীষ্মাবকাশের সময় তারিণী-বিদ্যালয় বন্ধ হইলে কতিপয় শিক্ষয়িত্রী সমভিব্যাহারে তারিণী কারসিয়ঙ্গে আসিয়াছেন। কোরেশা এবং সিদ্দিকাও আসিয়াছেন।

একদা অপরাহ্ণে উষারাণী, কোরেশা এবং সিদ্দিকা একটা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেছিলেন। বোর্ডিলন রোড ধরিয়া ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি হইল। বিভার মাতা পীড়িতা ছিলেন। তাঁর জন্য ঔষধ লইয়া একটি 'শর্টকাট্' পথ দেখিয়া উষা বলিলেন—'এই পথে চল, শিগ্‌গির যাওয়া যাইবে।'

'শর্টকাট্' পথে আসিতে আসিতে একটা ঝোপের নিকট মানুষের মতো কী একটা জিনিসের ওপর তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—এ কী! সত্যই একজন মানুষ রুধিরাক্ত কলেবরে পড়িয়া আছে! ঝোপের ভিতর জোছনালোক স্পষ্ট পৌঁছিতে পারে নাই, তাই কিছু অন্ধকার ছিল। তাঁহাদের শরীর কণ্টকিত হইল! তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, কী করা উচিত? উষা নাড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, মানুষটি এখনো জীবিত আছে—যত্ন করিলে বাঁচিতে পারে। কিন্তু যত্ন অতি শীঘ্র হওয়া আবশ্যক।

হাসপাতাল এখান হইতে অনেকটা দূর, আর তাঁহাদের বাসা অতি নিকটে। বিভা বলিলেন, 'আপাতত আমরা ইহাকে বাসায় লইয়া গিয়া প্রাথমিক প্রতিবিধান (first-aid) করি, পরে যাহা হয়, করা যাইবে। কিন্তু মিসিস্ সেন যদি বিরক্ত হন!'

কোরেশা। তিনি নিশ্চয় বিরক্ত হইবেন না; যদি হন তো আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব।

উষা। মরণাপন্ন লোকের সাহায্যে মিসিস্ সেন আপত্তি করিবেন না। এখন তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি একটা 'ডান্ডি' লইয়া আসি!

'ডান্ডি' শিবিকার ন্যায় বাহন বিশেষ। দুই বা তিনজন কুলি স্কন্ধে বহন করে। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময় দার্জিলিঙে 'রিকশ', অশ্ব এবং 'ডান্ডি' ব্যতীত অপর কোনোপ্রকার বাহন ছিল না।

সৌভাগ্যবশত 'ডান্ডি' শীঘ্রই পাওয়া গেল; তাঁহারা মৃতপ্রায় লোকটিকে লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

• • •

তারিণী। স্ত্রীলোক হইলে আমার চিন্তা ছিল না। কিন্তু এ পুরুষমানুষের যত্ন কে করিবে? তোমরা জানোই তো, আমার এখানে পুরুষ চাকর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; বয়টা ছেলেমানুষ; বেহারা ও পানিঅলা এ বাড়িতে রাত্রিবাস করে না। একমাত্র বাবুর্চি—সে তো রান্নাঘর ছাড়িয়া নড়িবার পাত্র নয়!

কোরেশা। তা কী করা যাইবে? এখন তো ইহাকে আনিয়া ফেলিয়াছি।

তারিণী। তা বেশ, আপনারাই শুশ্রূষা করিবেন। আমি এ দায়িত্বের মধ্যে ... বিভা তো খাটিবেই। কোরেশা-বি! আপনারও পরদা করা চলিবে না। আপনি ... যথাবিধি দেখিবেন। আর পদ্মরাগ! তুমিও—

সিদ্দিকা। আমি যে 'প্রাথমিক প্রতিবিধান' (first-aid) বা রোগীসেবার কিছুই ... না।—

তারিণী। জানো না—শিক্ষা কর! বিভা, যাও শিগগির। তোমার মাতাকে ... ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া এ বেচারাকে দেখাও।

বিভা দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারবাবু আসিলেন। কোরেশা গরম জল আনিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। উষা ডাক্তারবাবুকে রোগীর ক্ষত পরীক্ষায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন, সিদ্দিকা হারিকেন লণ্ঠন তুলিয়া আলো দেখাইতে লাগিলেন, পরিচারিকাদ্বয় ঔষধ জল ইত্যাদি সম্মুখে বাড়াইয়া দিতেছিল। আর তারিণী?—তিনি কিছু করিবেন না বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন পুরাতন বস্ত্রের ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত করিয়া দিতেছিলেন।

* * *

একটি কক্ষে একজন রোগী ঘুমাইতেছিলেন; তাঁহার শয্যার নিকট একটা চেয়ারে বসিয়া সিদ্দিকা একখানি বই দেখিতেছিলেন। বই দেখা হইতেছিল বটে, কিন্তু পড়া কতদূর হইল, বলা যায় না। তিনি জাগিয়া থাকিবার জন্য কখনো বই দেখিতেছিলেন, কখনো উন্মনা হইয়া উল্ বুনিতেছিলেন। কিন্তু কোনো কাজই যে ঠিকমতো হইতেছিল না, এ-কথা বলাই বাহুল্য; কারণ তাঁহার চক্ষুদুটি নিদ্রাভারাক্রান্ত ছিল।

একবার রোগী পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। রোগীর জ্ঞান হওয়াতে সিদ্দিকা একটু আহ্লাদিত হইলেন।

রোগী ডাকিল,—'করিম বখ্‌শ—ও করিম বখ্‌শ–'

সিদ্দিকা রোগীর কথায় বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'করিম বখ্‌শ ঘুমাইয়াছে।'

রোগী। তবে কি রাত হইয়াছে? কত রাত্রি হইবে?

সি। প্রায় তিনটা।

রো। তবে তুমি জাগিয়া আছ কেন? তুমি কে?

সি। আমি 'দরিদ্র ভগিনী', আপনি কিছু খাইবেন কি না তাহাই জানিতে আসিলাম।

রো। রফিকা! তুমি কখন আসিলে?

সি। আপনার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনদিন হইল, আসিয়াছি।

রো। আমি পীড়িত নাকি? ও! তাইতে আমি উঠিতে পারি না, আমার সর্বাঙ্গে ভারি ব্যথা হইয়াছে।

'সেজন্য চিন্তা নাই, আল্লাহ চাহে আপনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিবেন।' এই বলিয়া সিদ্দিকা এক বাটি দুধ আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন।

রোগী উঠিয়া বসিয়া চারিদিক নিরীক্ষন করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—'এ কাহার বাড়ি? এ তো সে সেনিটেরিয়ম নয়।' সিদ্দিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আর কই, আপনিও ত রফিকা নহেন। অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি, আমি এখানে কিরূপে আসিলাম?'

সি। সে-কথা পরে বলিতেছি; এখন আপনি বড় ক্লান্ত আছেন, এই দুধটুকু খান দেখি। আপনার কোনো চিন্তা নাই।

রোগী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। ইতিমধ্যে বেয়ারা নলিনী আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্দিকা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

নলিনী পাস-করা নার্স; তিনি সময়োপযোগী দুই-চারিটি মিষ্ট কথায় রোগীকে খুশি করিলেন। অতঃপর সিদ্দিকার সাহায্যে তাঁহার ক্ষতস্থলে ঔষধ লাগাইয়া দিলেন।

রোগীকে যথাবিধি শয্যায় রাখিয়া নলিনী যাইতে চাহিলেন। সিদ্দিকা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন—'একটু বস না, রাত তো আর বেশি নাই।'

নলিনী। তাই তো যাইতেছি, একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিব।

সিদ্দিকা। সে কী! তুমি জাগিয়াছিলে নাকি? আজ তো—

নলিনী। হাঁ, আজ রাত্রে তো আমার কোনো কাজ ছিল না; কিন্তু পোড়া চক্ষে ঘুম নাই, তাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তোমাদেরও দেখিতে আসিলাম।

সি। আর আমার চক্ষে তোমাদের সকলের নিদ্রা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে—আমি যেন চক্ষু খুলিতেই পারি না। আমি তোমার মতো জাগিতে পারি না কেন?

নলিনী। অভ্যাস হইলেই পারিবে। এখন ছাড়—যাই।

তখন রজনী প্রভাত হইয়াছিল। সিদ্দিকা একটি জানালা খুলিয়া দেখিলেন, উষার রক্তিমচ্ছটায় আকাশমণ্ডল আরক্ত হইয়াছে। প্রভাত হইয়াছে শুনিয়া রোগী একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন, কিন্তু কিছু কহিলেন না। আবার পূর্ববৎ চক্ষু বুজিয়া রহিলেন।

আরও কতদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। এ পর্যন্ত কেহ রোগীকে নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে নাই। অভাগা রোগী নীরবে সবই দেখিতেন, শুনিতেন, স্বয়ং কিছু বলিতেন না। যেন কী গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। প্রতিদিন দেখেন—সেবিকা বদল হয়। আজ রাত্রে নলিনী জাগেন তো কাল রাত্রে সিদ্দিকা কিংবা উষা জাগেন। রাত্রে যখনই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখনই দেখিতে পান, এক দেবীমূর্তি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তখন মনে করেন, ইহারা যথার্থই 'ভগিনী'। রফিকা কি এত যত্ন করিতে পারিত?

একদিন অপরাহ্ণে সিদ্দিকা তাঁহার নিকটে বসিয়া ক্রুশে কী বুনিতেছিলেন, সেই সময় রোগী জিজ্ঞাসা করিলেন—'সত্য বলুন দেখি, আমি কোথায়? এ কাহার বাড়ি? আমি কী প্রকারে এখানে আসিয়াছি।

সি। আপনি কারসিয়ঙ্গে মিসিস্ সেন নাম্নী এক ব্রাহ্ম-মহিলার বাসায় আছেন। আমরা সকলে তাঁহারই বাসার লোক। আপনি বোর্ডিলন রোডের পার্শ্বে ইট শর্টকাট রাস্তার ধারে আহত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছি।

এমন সময় কে বাহির হইতে ডাকিল—'সিদ্দিকা, শুনে যাও!'

সিদ্দিকা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। রোগীর সহিত আর কোনো কথা হইল না! রোগী ভাবিলেন, এ মেয়েটি তবে মুসলমান। ব্রাহ্ম-বাড়িতে মুসলমান—এ কী প্রহেলিকা! যাক্—আমার কী।'

তারিণী আসিয়া দেখিলেন, রোগী অনেকটা সবল ও সুস্থ হইয়াছেন এবং উঠিয়া বসিয়াছেন। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

রোগী। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। আপনাদের যত্নে আমি জীবন ফিরিয়া পাইলাম। এখন আমার মনে পড়ে, আমি কিরূপে আহত হইয়াছিলাম। আমি দার্জিলিং হইতে সেদিন কারসিয়ঙ্গে আসিয়াছিলাম; হোটেলে রাত্রিযাপন করিবার মানসে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। পথে তিনজন লোক আমাকে ধরিল। তাহারা আমার ঘড়ি, চেন, চশমা ইত্যাদি কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। আমি 'পুলিশ! পুলিশ!' বলিয়া চিৎকার করায় তাহারা

ছোরা ও লাঠির দ্বারা আমাকে আক্রমণ করিল, আমি অজ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হইলাম। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারাই জানেন।

তারিণী। অত্যধিক রক্তস্রাব হওয়ায় আপনি মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। এখানে আনিবার পর আপনার অবস্থা এমন ভীষণ ছিল যে, আমরা আর আপনাকে কষ্ট দিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে সাহস করি নাই। আমাদের প্রধান চিন্তা ছিল, আপনার প্রাণরক্ষা করা। যাহা হউক, আপনি কোনো চিন্তা করিবেন না। আমরা আপনার 'দরিদ্র ভগিনী', আমাদের সাধ্যমতো আপনার সেবাযত্ন করিব। আপনার নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

রোগী। 'লতীফ আল্‌মাস'। আপনাদিগকে কী বলিয়া ধন্যবাদ দিব, জানি না। মাতা, ভগিনীও এতটা যত্ন করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

মি. লতীফ আলমাসের যখন রোগের কিছু উপশম হইল, তখন আর 'ভগিনী'গণ তাঁহার নিকট বড় একটা আসিতেন না। কেবল কম্পাউন্ডার ঈশানবাবু দুইবেলা তাঁহার ক্ষত অঙ্গে প্রলেপ দিয়া যাইতেন। এইরূপে ঈশানবাবুর সঙ্গে লতীফের বেশ আলাপ হইল; তিনি ইহার নিকট 'ভগিনী'দের সংক্ষিপ্ত এবং দীনতারিণীর বিস্তৃত পরিচয় পাইলেন। তিনি কেবল সিদ্দিকার পরিচয় দিতে পারিলেন না।

ল। আপনারা এরূপ অজ্ঞাতকুলশীলা স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হন না? হইতে পারে, তিনি খুন করিয়া আসিয়াছেন; হইতে পারে, তিনি নিতান্ত জঘন্য স্থান হইতে আসিয়াছেন।

ঈ। যিনিই যাহা করিয়া আসুন-না কেন, আমাদের 'তারিণীভবন' গঙ্গা—ইহাতে এক ডুব দিলেই সকলে পবিত্র হইয়া যায়।

ঈশানবাবুকে সকলে 'ঈশান-দা' বলিয়া ডাকেন। লতীফও তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শরৎকুমার

শরৎকুমার নামক একটি ৯ বৎসরের বালক তারিণীভবনে আসিয়াছে। ধীরেন্দ্রবাবু অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্ম। পূর্বে তিনি ধনী লোক ছিলেন। কালের কুটিল আবর্তে এখন দরিদ্র হইয়াছেন। শরৎ এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন হয়, সুতরাং পিতার বড় আদরের ধন। ধীরেনবাবুর নিকট সমস্ত জগৎ—ঐশ্বর্য-বিভব একদিকে, আর শরৎ একা একদিকে।

শরৎকে পাইয়া ধীরেন্দ্র ভাবিতে পারিতেন না যে, জগতে ইহার অপেক্ষা আরও কিছু মূল্যবান জিনিস আছে।

দুই বৎসর যাবৎ শরৎ ম্যালেরিয়া, প্লীহা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছে। ডাক্তারি, কবিরাজি, হাকিমি—সকল প্রকার চিকিৎসাই শরৎ অতিক্রম করিয়াছে। ধীরেন্দ্র আর ডাক্তার হাকিম বিশ্বাস করেন না।

হতভাগ্য ধীরেন্দ্রের বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নাই—তাঁহার মাতা ভগ্নী ইত্যাদি কেহই নাই। দূর-সম্পর্কের আত্মীয়গণ দরিদ্রের বাড়ি আসিবেন কেন? যাহার কপাল

পাড়ে তাহার বিপদও শতাধিক। ধীরেন্দ্র স্বয়ং দিবারাত্রি শরতের শুশ্রূষা করিয়া ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে অধিকতর ও যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার আশায় শরৎকে তারিণী-আতুরাশ্রমে আনিয়া রাখিলেন। আশ্রমবাসিনীগণ যথাসাধ্য তাহার যত্ন করিতে লাগিলেন। শেষে বায়ু-পরিবর্তনের নিমিত্ত তাহাকে লইয়া কাবসিয়ঙ্গে আসিলেন।

শরৎকে লইয়া তারিণীর আসিবার ৮ দিন পরে লতীফ আসিয়াছেন। তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন।

লতীফ অনেকটা সুস্থ হইলেন; ধীরে ধীরে হাঁটিতে পারেন। তিনি সময় সময় শরতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। শরৎ এখন নিতান্ত শীর্ণ অবস্থায়। একদিন বাল-স্বভাবসুলভ হাস্যমুখে সে সৌদিমিনীকে বলিল—'পিসিমা! বাবা কখন আসিবেন?'

সৌদিমিনী। তোমার বাবা তো এখনই গেলেন। আবার বাবাকে দেখিতে চাও কেন? আমাদের ওপর বুঝি তোমার মায়া নেই? বাবাই সব? বাবা আসিলে কী হয়?

শরৎ। বাবা তো কিছু করেন না, তবু বাবা আসিলে অসুখ সারে—জ্বর কমিয়া যায়। আরও কত কী হয়। বাবাকে দেখিলে কত সুখ হয়।

সিদ্দিকা। তবে তোমার বাবাকে ডাকিতে পাঠাই?

শ। না। এখন আর বাবাকে কষ্ট দিয়া কাজ নাই। বাবাকে বেশি কষ্ট দিলে ঈশ্বর বিরক্ত হইবেন।

ল। (ঈষৎ হাস্যে) তাও তুমি জানো? আর কী জানো?

শ। গান জানি। আপনারা গান শুনিবেন?

সৌ। না, তুমি এখন চুপ কর। বেশি কথা কহিলে তোমার কাশি বৃদ্ধি হয়, তাহাতে ঈশ্বর দুঃখিত হইবেন।

শ। আমি তবে কবিতা পাঠ করি?

সৌ। এখন না।

শ। আমার গান আপনাদের ভালো লাগে না?

নলিনী। ভালো তো লাগে, কিন্তু তোমার কষ্ট হয় যে। তুমি এখন একটু ঘুমাও দেখি।

শ। আমি একটু কষ্ট স্বীকার করিলে—কষ্ট করিয়া গান গাহিলে আপনাদের সুখী করিতে পারি, তবে সে-কাজ করিব না কেন? মানুষ কয়দিনের জন্য? পরের জন্য কষ্টভোগ করিব না, তবে কী করিব?

লতীফ ভাবিলেন, এ বালক কে।—এ যে মূর্তিমান প্রেম! ধীরেন্দ্রবাবু এমন রত্ন কোন্ তপস্যার ফলে পাইয়াছেন? তিনি বালকের তেজঃপূর্ণ উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া মোহিত হইলেন।

শরৎ এবার গান আরম্ভ করিল; কিন্তু এক পদ গাহিতে না-গাহিতেই কাশিতে কাশিতে অস্থির হইল। সৌদামিনী বলিলেন, 'তুমি কথা শুন না, তুমি ভারি দুষ্ট ছেলে! তোমার সব গুণ আছে, কেবল বাধ্যতা নাই।'

শ। পিসিমা! অবাধ্যতার শাস্তি যথেষ্ট হইল, আর কেন—(কাশি)।

অত্যধিক দুর্বলতাবশত শরৎ আর তাহার অতি সাধের গান 'এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে—গাহিতে পারে না। তবু সময় সময় ভৈরবী বা বেহাগের গৎ আবৃত্তি করিত। নিস্তব্ধ গভীর রাজনীতে ঐ কণ্ঠে—ঐ শরৎকুমারের সুমধুর কণ্ঠস্বরে সেই সাধারণ 'সা-রে-গা-মা'

যে কত মধুর শুনাইত, তাহা যে শুনিয়াছে, সেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। স্বর্গীয় সঙ্গ [illegible] হইতে অধিক সুন্দর?

ক্রমে শরৎ বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িল; আর তাহার সঙ্গীতে রুচি নাই। যে তাহাকে গাহিতে নিষেধ করিতেন, তিনিই এখন এক-একবার মিনতি করিয়া বলেন, একটি গান গাও তো।' বাবা উত্তর করে, 'না—ভালো লাগে না!' সৌদামিনী মুখ ফিরাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করেন।

১ আষাঢ় তারিণী-বিদ্যালয়ের ছুটি শেষ হইবে বলিয়া কেবল সৌদামিনী, নরেন, সকিনাকে লতীফ ও শরতের শুশ্রূষার জন্য রাখিয়া, অপর সকলকে লইয়া তুর্কি কলিকাতায় গিয়াছেন। সিদ্দিকা স্বয়ং সুস্থসবল নহেন বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেন ঈশানবাবুও রহিলেন। এই কথা স্থির হইল যে, শরতের অবস্থা কিরূপ হয়, দেখিয়া এক মাসের মাঝামাঝি অবশিষ্ট সকলে কলিকাতায় যাইবেন।

সন্ধ্যার পর লতীফ আবার শরৎকে দেখিতে আসিলেন। তাহার আকর্ষণীশক্তি এমন প্রবল যে, কেহ তাহাকে ছাড়িয়া দূরে থাকিতে পারে না। এসময় ধীরেন্দ্রও আসিয়াছিলেন। শরৎ ক্ষীণ ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, 'কেমন আছ বাবা? আজ তুমি হয়তো কিছু খাও নাই, তোমার মুখ শুকনো!' ধী। (পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া) আমি ভালো আছি। আমার জন্য চিন্তা নাই। তুমি ভালো হইলে জীবন ফিরিয়া পাই।

শ। বাবা। মরণ তো একদিন আছেই, তবে সে নাম শুনিলে তোমরা ভয় পাও কেন? জীবন অল্পদিনের জন্য, মরণ তো চিরদিনের জন্য! তুমি আমাকে যত ভালোবাস, তত ভালোবাসা ঈশ্বরকে—

ধী। বাবা, চুপ কর। তোমার বক্তৃতা বন্ধ কর শরৎ! বারবার ঐ কথা! আর কোনো কথা নাই?

শ। অন্য কথা থাকিতে পারে, আমি জানি না। (ঈষৎ হাস্যে) তুমিই না বলিতে ঈশ্বরকে সকলের অপেক্ষা অধিক ভালোবাসিতে হয়? তবে তুমি শরৎ—ক্ষুদ্র শরৎকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি ভালোবাস কেন?

ধী। তুমি চুপ করিবে না? এখন একটু ঘুমাইবে না? তবে আমি চলিলাম।

ধীরেন্দ্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া শরৎ ডাকিয়া বলিল—'বাবা! বাবা! ফের! তুমি রাগ কর কেন? আর একদিনের জন্য এত মান-অভিমান কেন।'

'আর একদিনের জন্য'—কথাটা ধীরেন্দ্র তখন বুঝিতে পারেন নাই—পরদিন বুঝিলেন।

অদ্য শরৎ বড়ই কাতর। কাশিতে কাশিতে মূর্চ্ছিতপ্রায়। সকলেই তাহার জন্য দুঃখিত। সৌদামিনী অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন সে মৃত্যুর ছায়ায় আচ্ছন্ন মুখ আর দেখিতে পারেন না। সে দৃশ্য নিতান্তই অসহ্য! শরৎ উদ্গ্রীব ছিল—পিতার জন্য; যেন পিতা আসিলেই বিদায় লইয়া যাইতে পারে। হতভাগ্য পিতা আসিলেন। শরৎ অধীরভাবে বলিল, 'বাবা! আর বাঁচি না!'

ধী। বাবা! তুমি অমন কথা বলিলে আমি বিবাগী হইয়া বনে যাইব। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? আমার জগৎ আঁধার হইবে যে বাবা! তাহা কি তুই বুঝিস্ না?

আর শরৎ 'আহাটি' বলে নাই। সে জানে, তাহার জন্য তাহার পিতার কত কষ্ট হয়; তাই আর নিজের যন্ত্রণা পিতাকে জানিতে দেয় নাই। নীরবে ছটফট করিয়া মরণযন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল। নিতান্ত অসহ্য হইলে শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ গড়াগড়ি করিত—কিন্তু 'উহু' পর্যন্ত বলে নাই। কী মহতী সহিষ্ণুতা! এ কি মানবে সম্ভবে? মানব এমন ধৈর্য পাইবে

কোথায়?

তারপর? তারপর আর কী—শরৎ পিতাকে কোলে লইতে ইঙ্গিত করিল, পার্থিব পিতার ক্রোড় হইতে বিশ্বপিতার ক্রোড়ে গিয়া অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিল! শ্রাবণের মেঘ গভীর গর্জনে বৃষ্টির ছলে কাঁদিয়া ফেলিল!—সমীরণ চিৎকারস্বরে 'হায় হায়" বলিয়া উঠিল। গগনে শশী তারা কিছুই নাই—জগৎ ঘোর অন্ধকার ! ! !

সৌদামিনী ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন যে, শরৎ যেন মরিতেছে। মৃত্যুকালে যেন সে তাহাকে বলিল—'পিসিমা! আমি এখনো মরি নাই—তোমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি!' সৌদামিনী জাগিবামাত্রই পাগলিনী-প্রায় মুক্তকেশে দৌড়িলেন। শরৎকে ডাকিলেন— শরৎ একটু চক্ষু খুলিল; কিছু বলিল না—তখন তাহার বাকশক্তি ছিল না। আবার চক্ষুদুইটি মুদ্রিত হইল। যাও সৌদামিনী। আর কী দেখ? এ তোমার শরৎ নহে, এ কেবল মৃন্ময় পুতুল মাত্র—তোমার শরৎ এখানে নাই—নাই!!

* * *

ধীরেন্দ্র সৌদামিনীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সৌদামিনী চিনিয়াছিলেন, ধীরেন্দ্র চিনেন নাই। তিনি ১৭ বৎসর হইতে ভগিনীকে দেখেন নাই, সুতরাং চেনা অসাধ্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী সৌদামিনী কথাবার্তায় ভ্রাতাকে চিনিয়াছেন, কিন্তু নিজের পরিচয় দেন নাই। শরৎকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, 'আপন' বলিতে একটি লোক পাইয়া দগ্ধপ্রাণ জুড়াইবেন। কিন্তু পোড়াকপালে তাহাও হইল না। সেইজন্য ভ্রাতাকে আর পরিচয় দিলেন না। কী জানি, ভাইটিকে 'ভাই' বলিয়া ডাকিলে যে-আনন্দ হয়, তাহাতেও যদি বিধাতার হিংসা হয়, তাহার ফলে ভাইটিও যদি না থাকে? তবে কাজ কী? দগ্ধ-হৃদয়ের আগুন কণামাত্র নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করাও বৃথা—জ্বলুক হৃদয় তবে জ্বলুক! জ্বলুক!!

শরৎকুমারের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্র আর দেখা দেন নাই। কোথায় গিয়াছেন, আল্লাহ জানেন। যাও ধীরেন। যোগী হইয়া গহন কাননে, হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে শরতের অনুসন্ধান—না, শরতের নির্মাতার অনুসন্ধান কর গিয়া। নিষ্ঠুর জগৎ তোমাকে অনায়াসে ভুলিয়া থাকিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

পরার্থপরতা

মানুষ সময় সময় কোনো একটি জিনিসের প্রতি কেন যে আকৃষ্ট হয়, তাহা তাহারা নিজেই বুঝিতে পারে না। সেই অজ্ঞাত কারণটা কী? লতীফের পীড়ার সময় তিনি সর্বদা সিদ্দিকাকে আপন শিয়রে উপবিষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। অন্যান্য ভগিনীগণ নানাপ্রকার গল্প-পরিহাস দ্বারা তাঁহার রোগযন্ত্রণা লাঘব করিতে চেষ্টা করিতেন, আর সিদ্দিকা কেবলই নীরবে বসিয়া থাকিতেন্। লতীফ ঐ মৌনভাবই ভালোবাসিতেন। এখন লতীফ অনেক পরিমাণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, সুতরাং সিদ্দিকা আর নিকটে আসিয়া বসেন না।

এমন স্বর্গতুল্য স্থান ছাড়িয়া যাইতে লতীফের মনে একটু কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু যাইতে চাইবেই। শরতের জন্য 'ভগিনী'গণ শ্রাবণ মাসের ১৫ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে ইচ্ছুক

ছিলেন; কিন্তু শরৎকামিনী শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহেই শেষ হইয়াছে। [illegible] কলিকাতা যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন; তাঁহারা কেবল লতীফের গৃহগমনের [illegible] করিতেছেন। লতীফ হিসাব করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাথেয় ইত্যাদিতে ২৫০ টাকা লাগিবে না। কাপড় দুই-একজোড়া প্রস্তুত করিতে হইবে। আশ্রমে তাঁহার জন্য [illegible] হইয়াছে, তাহাও শোধ করা উচিত, কারণ তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট লোকে আতুরাশ্রমের [illegible] গ্রহণ করিলে দান দিবে কে? তিনি ৩০০ টাকা পাঠাইবার জন্য বাড়িতে চিঠি লিখিলেন।

যথাসময়ে লতীফের পত্রের উত্তর আসিল। পত্রখানি রমণীর কোমল হস্তলিখিত [illegible] বটে, কিন্তু ভাষার কোমলতায় লতীফ সন্তুষ্টি অনুভব করিতে পারিলেন না।

পত্রের মর্ম এই :

'তোমার পত্রে জানা যায় যে, একদল দস্যু তোমার সর্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; এবং দুইমাস তুমি পীড়িত থাকায় আমাদের পত্র লিখিতে পার নাই। কিন্তু তোমার সঙ্গী এখানে আসিয়া আমাদের জানাইয়াছে যে, দস্যুগণ তোমাকে হত্যা করিয়াছে। তিনি তোমার জিনিসপত্র ফেরত আনিয়াছেন। সুতরাং তোমার চিঠি দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, আর কেহ তোমার হস্তাক্ষর জাল করিয়া টাকার জন্য লিখিয়াছে। আমরা তোমাকে স্বচক্ষে না দেখিলে, তুমি বাঁচিয়া আছ বলিয়া বিশ্বাস করিব না। আমি ভাইকে এ-বিষয় লিখিয়াছি। তিনি তোমাকে দেখিতে যাইবেন, তাঁহার সঙ্গেই তুমি আসিও।'

লতীফ পত্রখানি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন। কী পাগল, এমন কথা শুনিলে কাহার না রাগ হয়! সালেহার কোনো কাজ করিবারই যোগ্যতা নাই; সন্দেহ যে করিবেন, সে সন্দেহ করিবার যোগ্যতাও তাঁহার নাই। লতীফ ভাবিতে লাগিলেন, এখন কী করি? টাকা না পাইলে গৃহে গমন করি কী করিয়া? এমন সময় মৃদু পদবিক্ষেপে সৌদামিনী তথায় উপস্থিত হইলেন।

সৌদামিনীকে দেখিয়া লতীফের মনে কেমন যেন একটু আনন্দ-সঞ্চার হইল। মনে নিরাশার মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, হঠাৎ আশা-সৌদামিনী দেখা দিলেন। লতীফের হস্তে ছিন্ন পত্রখণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞেসা করিলেন, 'বাড়ির চিঠি পাইয়াছেন, মি. আলমাস? কী খবর? সকলে ভালো আছেন তো?'

ল। ভালো তো আছেন।

সৌ। তবে কিসের ভাবনা?

ল। কই, ভাবনা তো নাই।

সৌ। কিন্তু আপনি-যে ভালো সংবাদ পান নাই, এ-কথা নিশ্চিত। অন্তত আশানুরূপ সন্তোষজনক উত্তর পান নাই।

ল। আপনার কথাই ঠিক। আমি কিন্তু চিন্তান্বিত নহি।

সৌ। আপনি চিন্তান্বিত না হইতে পারেন, কিন্তু রাগান্বিত হইয়াছেন।

ল। (লজ্জিতভাবে) আপনি দেবী, আপনার নিকট কিছু গোপন করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সত্যই আমার রাগ হইয়াছে। আমি টাকা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাঠাইবেন না। আমার টাকা আমিই পাইব না।

সৌ। সেজন্য দুঃখ কেন? আপনার যত টাকা প্রয়োজন, ধার লইতে পারেন, সুবিধামতো শোধ করিবেন।

ল। আমাকে এখানে কে চিনে যে টাকা ধার দিবে?

সৌ। আমরা দিব। উপস্থিত আমাদের কয় ভগিনীর হাতে যত টাকা আছে, তাহাতে না কুলাইলে, মিসিস্ সেনকে লিখিয়া তারিণীভবন হইতে টাকা আনাইব। আপনার কত টাকার দরকার?

লতীফ বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। টাকা এমন জিনিস—সেই টাকা এ অজ্ঞাতা রমণীগণ

...কে বিশ্বাস করিয়া দিতে প্রস্তুত। আর তাঁহার স্ত্রী ৩০০ টাকা না হউক, অন্তত ৫০০ টাকাও পাঠাইতে সাহস করেন নাই। লতীফ সকৃতজ্ঞ স্বরে বলিলেন, 'ভগিনী! আপনাদের দয়ায় ডুবিয়া আছি। বাস্তবিক আপনাদের অতি-অনুগ্রহে আমি লজ্জিত হই আমি আপনাদের এত দয়া-স্নেহের যোগ্য নহি। আমি পাথেয় অভাবে বাড়ি যাইতে পারিতেছি না। আপাতত ১০০ টাকা হইলেই হইবে।'

সন্ধ্যার সময় ভগিনীগণ বাগানে বসিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের বৃষ্টির পর আকাশ এখন কিঞ্চিৎ মেঘমুক্ত ছিল। দশমীর শশী প্রাণ খুলিয়া তারা-কুমারীদের সঙ্গে হাস্যামোদ করিতেছিল। তাহার রূপের ছটায় ধরণী রজতস্রোতে ভাসিতেছিল। এক-একবার একখণ্ড মেঘ আসিয়া সুধাকরকে ঢাকিয়া কৌতুক দেখিতেছিল। সিদ্দিকা এককোণে বসিয়া ঐ খানে অলকমালার লুকোচুরি, চারুচন্দ্রমা ও নক্ষত্রের সমাবেশ সমালোচনা করিতেছিলেন। এমন সময় লতীফ ও সৌদামিনী তথায় উপস্থিত হইলেন। সৌদামিনী সকৌতুকে বলিলেন, 'কী সিদ্দিকা! তারা গণিতেছ নাকি?'

সি। (সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কী দিদি! তুমি কিছু বলিতে চাও?

সৌ। হাঁ। মি. আলমাস বাড়ি যাইবেন, কিন্তু অন্যত্র টাকার জোগাড় হয় নাই; সুতরাং আমাদিগকে চাঁদা তুলিয়া তাঁহার পাথেয় ধার দিতে হইবে। অন্তত ১০০ টাকার প্রয়োজন। তুমি কত টাকা দিতে পার?

সি। আমি মাত্র ৫০ টাকা কী ৬০ টাকা দিতে পারি।

সৌ। দেখুন মি. আলমাস। আপনার ৬০ টাকা হইল।

লতীফের অপরিমিত কৃতজ্ঞতা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। সে নীরব কৃতজ্ঞতার ভাষা সিদ্দিকা এবং সৌদামিনী বুঝিলেন।

পরদিন প্রাতরাশের পর সৌদামিনী সিদ্দিকাকে টাকা দিতে বলিলেন। সিদ্দিকা টাকা আনিবার জন্য উঠিয়া গেলে লতীফ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

সিদ্দিকা একটি একটি করিয়া ৬০টি টাকা লতীফের হস্তে গুনিয়া দিলেন। লতীফ ভাবিতেছিলেন—যদি স্বর্গ নামে কোনো স্থান থাকে তবে এই স্বর্গ! ইহারা কেমন সরল লোক; টাকা কাহাকে দিতেছেন— এ টাকা ফিরিয়া পাইবেন কি না সে-বিষয় একটু চিন্তাও করেন না। তিনি মুগ্ধনেত্রে অর্থদাত্রীর হাত দুইটি দেখিতেছিলেন—সে হাত কেমন স্বাধীন!

সিদ্দিকা সস্নেহ কোমল স্বরে বলিলেন, 'আর আপনার কত টাকার প্রয়োজন?'

ল। যদি পারেন তো ১০০ টাকা পূরণ করিয়া দিলে বাধিত হইব।

সি। আমার যাহা ছিল, সব দিয়াছি; বাকি টাকা অপর ভগিনীরা দিবেন।

'আমার যাহা ছিল সব দিয়াছি' কথাটা লতীফের হৃদয়ে গিয়া বাজিল। যেভাবে, যে অপরূপভাবে কথাটা বাজিল, সেরূপ বাজা উচিত ছিল না। কারণ তাঁহার যে সালেহা আছেন। তিনি বক্তার মুখপানে চাহিলেন—সে মুখ দেখিয়া কিছু অর্থ বুঝা গেল না— সে মুখ কেবলই দেবতুল্য সুন্দর, সদয়, সরল। লতীফ নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, 'আপনার সুবিধার জন্য কিছু টাকা রাখিলেন না?'

সি। আমার কোনো অসুবিধা হইবে না, আপনি সেজন্য ভাবিবেন না।

(নলিনীর প্রবেশ)

নলিনী-দি! তোমার ভাগের চাঁদার টাকা দিলে না?

চঞ্চলস্বভাবা বাচাল নলিনী বলিলেন, 'দিব বই কী, তবে আমাদের 'পথে কুড়ানো চাঁদটি' এখন দেশে চলিলেন, জানি না, আবার কবে দেখা হইবে।'

লতীফ। আপনারা দয়া করিয়া স্মরণ রাখিলেই দেখা হইতে পারে। দুঃখের বিষয় কলিকাতায় প্র্যাকটিস করি না। (লতীফ একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার এবং প্রকৃত জমিদার)

নলিনী সকিনা খানমকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির দাও তো দিদি! এই যে চাবি—'

সকিনা ২০ টাকা আনিয়া নলিনীর হস্তে দিলেন। নলিনী টাকা গণিয়া বলিলেন, 'এ বেশি কেন?'

স। চাঁদার টাকা দিবার অধিকার কি আর কাহারো নাই? আমি গরিব মানুষ, বেশি দিতে পারিলাম না।

ল। (সকৃতজ্ঞস্বরে) আপনাদের সৌজন্য দেখিয়া আমার হিংসা হয়—আমিও যে আপনাদের মতো তারিণীভবনের একজন 'ভগিনী' হই নাই!

স। খোদাতালার সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব পুরুষ হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি বাঞ্ছনীয়? লেডি ডাক্তার নলিনীর ব্যবস্থা অনুসারে এ শাড়ি ও চুড়িজোড়াই কি বড়?

(ঈশান বাবুর প্রবেশ)

ঈশান। সৃষ্টি সম্বন্ধে কী কথা হইতেছে?

ন। মি. আলমাস মেয়েমানুষ হন নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন।

ল। যে-সে মেয়ে তো নহে, আপনাদের ন্যায় দেববালা হওয়া অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

ঈ। অবশ্য। (ভগিনীত্রয়ের প্রতি আঙুলি নির্দেশ করিয়া লতীফের প্রতি) কিন্তু ইহারা কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন কি?

ল। না।

ঈ। তবে শুনুন :

'দুঃখীদের রোদনের ধ্বনি
একদা পশিল গিয়া স্বরগ-দুয়ারে।
জগদীশ সদয় হইয়া
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন তাহাদের পরে।
স্বরগের বিচিত্র সুন্দর
ফুলদল ধরাতলে পতিত হইল;
ইতস্তত যে যেখানে পায়—
মানুষের উপবনে ফুটিয়া উঠিল।
মানুষেরা নিতান্ত পামর
আদর করিতে ফুলে নাহি ভালোবাসে
ফুলগণ কহিল বিধিরে,
'মোদের পাঠালে কেন মানব-আবাসে?'
তাই প্রভু দয়ার সাগর
স্বর্গচ্যুত ফুল লয়ে গাঁথিলেন মালা।
তদবধি তারিণীভবনে
'দরিদ্র-ভগিনী' নামে রহে সুরবালা।'

ঈশান-দা, আপনি চমৎকার কবি! আমি মনে করিতাম, 'বেরিয়াম সালফেট' ও বেরিয়াম সালফাইড'-এর পার্থক্য-চিন্তায় যে মস্তিষ্ক অহরহ ব্যস্ত থাকে, সে আর অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পায় না; এখন দেখি, বিবিধ ঔষধের শিশির সঙ্গে এক শিশি সালফেট অব কবিত্বও থাকে!

ঈ। তা থাকিবে বই কী! কম্পাউন্ডারকে সকলপ্রকার ঔষধই নাড়াচাড়া করিতে হয়। বিশেষত আমাদের মিসিস্ সেন যেখানেই যান, হাসপাতালে তাঁহার সঙ্গে যায়। নার্স নলিনী এবং আমি আপনার শুশ্রূষার জন্য আহূত হইয়াছি। আমাদের সঙ্গে একটা ডিসপেনসরি বক্সও আসিয়াছে।

এমন সময় সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, 'কিসের আলোচনা হইতেছে?'

ঈ। কিছু না, দিদি! অদ্য ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে মি. আলমাসকে একমাত্রা 'রাই কারবনেট অব কবিতা' দিলাম!

সৌ। তা বেশ করিয়াছেন। টাকা পাইলেন মি. আলমাস?

ল। হাঁ, ৮০ টাকা পাইলাম।

সৌ। বেশ, বাকি ২০ টাকাও পাইবেন।

বিদায়ের দিন লতীফ অতি-প্রত্যূষে জাগিলেন, জাগিবামাত্র তাঁহার কর্ণে দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, সুতরাং সঙ্গীতের রাগ লয় চিনিলেন—মধুর ভৈরবী রাগিণী। আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না—সেই হরমোনিয়ামের সুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। অদ্য তাঁহার বিদায়ের দিন—

তাই কী দেবতাগণ (স্বরগপুরে)
গাহিছে বিদায়-গীতি করুণ সুরে?

তিনি বাহির হইয়া জনৈক চাকরানিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—সিদ্দিকা হরমোনিয়াম বাজাইতেছেন। তিনি কান পাতিয়া আশা করিলেন যে, গায়িকার কণ্ঠস্বরও শুনিবেন, কিন্তু তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। ক্রমে সঙ্গীত থামিল। গায়িকা কি হৃদয়ের গভীর বেদনা এই সঙ্গীতরূপে বাতাসে মিশাইয়া অনন্ত আকাশে ঢালিতেছেন? তাঁহার প্রাণটা গলিয়া তরল হইয়া ঐ সঙ্গীতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল কি? না, এ কেবল তাঁহাদের প্রাত্যহিক প্রাতঃসঙ্গীত?

লতীফ মধ্যাহ্নে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। সকলেই নানাপ্রকার স্নেহসূচক কথায় তাঁহাকে পত্র লিখিতে অনুরোধ করিলেন। কেবল সিদ্দিকা একটিও কথা বলেন নাই। লতীফ ভাবিলেন, 'তিনি পাষাণপ্রতিমা!'

দশম পরিচ্ছেদ

গৃহ-জীবন

লতীফ বাড়ি যাইবার চিন্তায় সুখী হন নাই। লোকে বিদেশ হইতে গৃহে যাইতে যেরূপ আনন্দিত হয়, লতীফ তদ্রূপ আহ্লাদে আত্মহারা হন নাই—বরং বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে যাইতে বিষাদ কেন? গৃহে কি শান্তি নাই? শান্তি নাই বলিয়াই তো গৃহযাত্রা—শুভযাত্রায় আনন্দ নাই।

লতীফ শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছেন। পিতামহ বর্তমানে পিতার মৃত্যু হওয়া ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় রশীদা ও রফিকা সম্পত্তির অংশে বঞ্চিত হইলেন। পি[illegible] মৃত্যু হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত হাজী হাবীব আলম জমিদারির উত্তরাধিকা[illegible] হইলেন। তিনি বিধবা ভাদ্রবধূ ও তাঁহার শিশু দুইটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলে[illegible] লতীফের মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন, তিনি দেখিলেন, মুষ্টিঅন্ন [illegible] যথাবিধি লাভ হইতেছে, কিন্তু লতীফের সুশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা হইতেছে না। [illegible] দাসীর অধম হইয়া ভাশুর-পত্নীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন; তাহার ফলে [illegible] (ভাশুর-পত্নী) স্বামীকে বলিয়া কহিয়া লতীফকে স্কুলে ভর্তি করিয়া দিলেন।

লতীফ ক্লাসের পর ক্লাস উল্লঙ্ঘন করিয়া ২২ বৎসর বয়সে এম. এ. পাস করি[illegible] ফেলিলেন। এই সময় তাঁহার মাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা রশীদার ননদের সহিত লতীফে[illegible] এবং অন্যত্র রফিকার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিলেন। রফিকার বিবাহ হইয়া গেল, কি[illegible] লতীফের তিন বৎসর পরে বিবাহ হওয়ার শর্তে কেবল 'আকদবস্ত' হইয়া রহিল।*

অতঃপর লতীফ পিতৃব্যের অনুগ্রহে ইংল্যন্ড গেলেন। তথা হইতে তিন বৎসর প[illegible] ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিলেন।

হাজী হাবীব আলম অত্যন্ত জমিদারি-পিপাসু ছিলেন। তিনি দেখিলেন, 'লইে[illegible] ব্যারিস্টার' কন্যাদায়গ্রস্ত লোকদের জন্য বেশ একটি মনোরম 'প্রলোভন'। তাঁহ[illegible] জনৈকা আত্মীয় একমাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছেন, এই কন্যাটিকে হস্তগত করি[illegible] বিধবার সম্পত্তিও করায়ত্ত হয়। কিন্তু বোকা লতীফ সহজে দ্বিতীয় বিবাহে সম্মত হইবার পাত্র নহেন। এইজন্য তিনি রশীদার স্বামীর সঙ্গে এক 'চাল' চালিলেন। জমিদার হইলেও মুহাম্মদ সোলেমান ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ন্যায়, সাধু ও ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন।

'আকদবস্ত'-এর তিন বৎসর পরে হাজী সাহেব জামাতাকে লিখিলেন যে, তাঁহার বিবাহের জন্য প্রস্তুত কিন্তু বিবাহের পূর্বেই কন্যাকে যেন তাঁহার ভাগের সম্পত্তি লিখিয়া দেওয়া হয়।

সোলেমান উত্তরে লিখিলেন যে, তিন বৎসরের শর্ত-অনুসারে তাঁহারা বিবাহের জন্য প্রস্তুত আছেন। যথাবিধি বিবাহের দিন-তারিখ ধার্য হউক। দ্বিতীয়ত. কন্যা যখন বয়োপ্রাপ্তা (অর্থাৎ ১৮ বৎসরের) হইবে, তখন সে নিজের সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়া লইবে। তিনি স্বয়ং কিছু লিখিয়া দিবেন না।

তদুত্তরে হাজী সাহেব জানাইলেন যে, সম্পত্তি লিখিয়া না দিলেও মেয়েকে বিবাহ করা হইবে না। অতএব তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ অন্যত্র ঠিক করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর যেন তাঁহাকে দোষ দেওয়া না হয়।

সোলেমান তাঁহাকে লিখিলেন, তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সেইদিন [illegible] লতীফাকেও পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ-বিষয়ে তাঁহার নিজের কী বক্তব্য আছে।

পল্লিগ্রামের ডাকঘর জমিদারদের করায়ত্ত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হাজী সাহেব দৃষ্টি রাখিলেন, যাহাতে লতীফ সোলেমানের সহিত পত্রব্যবহার করিতে না পারেন। লতীফের নামে সোলেমানের যে রেজিস্ট্রি পত্র আসিয়াছিল, তাহা তিনি জাল স্বাক্ষর দিয়া চুরি করিলেন। সুতরাং লতীফ সোলেমানের পত্রই পাইলেন না আর উত্তর দিবেন কী!

* প্রচলিত ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, লতীফের ভাবীপত্নী 'বাগদত্তা' হইয়া রহিলেন।

এদিকে সোলেমান লতীফের কোনো উত্তর না পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। ইহার পক্ষকাল পরে যখন শুনিলেন লতীফ পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল।

হতভাগ্য লতীফ দ্বিতীয় বিবাহে মোটেই সম্মত হইল না। কিন্তু পিতৃব্য, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার মাতা বলিলেন, 'বাবা! তুমি দুই বিবাহ করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে না। না করিলে হাজী সাহেব রাগ করিয়া তোমাকে এক কড়ার সম্পত্তিও দিবেন না।'

ল। আমি তাঁহার এক কানাকড়ির সম্পত্তিও চাহি না। তিনি অনুগ্রহপূর্বক সুশিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট।

লতীফের মাতা। তুমি সম্পত্তি না চাহিলে কিছু আসে যায় না। হাজী সাহেবের কথার অবাধ্য হইলে সকলেই তোমাকে কৃতঘ্ন পামর মনে করিবে।

ল। তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া সব গোল চুকাইয়া দিই।

মাতা। শুধু আত্মহত্যা কেন, মাতৃহত্যা কর। আইস, মাতা-পুত্রে হাত ধরাধরি করিয়া পুকুরে ডুবি।

লতীফের জনৈকা মাসি কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা! আমার তো আর কেহ নাই, একমাত্র আশা-ভরসা তুমি! তোমরা মাতা-পুত্রে আত্মহত্যা করিলে আমার কী গতি হইবে?'

অপর কক্ষ হইতে জনৈকা পিসি আসিয়া সক্রোধে বলিলেন, 'বাবা! আজিকালিকার ছেলেদের কথা শুনিলে মরা-মানুষের পিত্তি জ্বলিয়া যায়! হাজী সাহেব সম্পত্তি লিখিয়া চাহিয়া কী এমন দোষ করিলেন? সম্পত্তি হইলে তোমার হইবে, ভোগ করিবে তুমি! বাহাত্তরে বুড়ো হাজী সাহেব কবরে লইয়া যাইবেন না। সোলেমানকে একটু শাস্তি দেওয়া দরকার, তাই আবার বিবাহ করিতে বলেন।'

ল। শাস্তি তো সোলেমান সাহেবের হইবে না; শাস্তি দেওয়া হইবে একটি নিরীহ জীবকে।

পিসি। (স্বাগত) এখনো তাহাকে চক্ষে দেখা হয় নাই, তবু এত মায়া! (প্রকাশ্যে) 'নিরীহ জীবটির এমন কী ক্ষতি হইবে? আর কেহ সপত্নী লইয়া ঘর করে না কি। লোকে শুনিলে মনে করিবে, হাজী সাহেব না-জানি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছেন যে, ইহারা মাতাপুত্রে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইল! ঐ দেখ, রফিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু মুখ ফুলাইয়াছে; কালি হইতে সে অন্নজল গ্রহণ করে নাই।

লতীফ চাহিয়া দেখিলেন, রফিকা সত্যই ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছেন। তিনি কর্কশস্বরে বলিলেন, 'তবে আমাকে কী করিতে বল?'

পিসি। বলি আমার মাথা মুণ্ডু! (যুক্তকরে) বলি, সব দিক বজায় রাখ, গুরুজনের কথা রাখ!

লতীফ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিদানের ছাগলের মতো বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অর্ধপিপাসু হাজী সাহেব কিন্তু বেশ ঠকিলেন। লতিফের শাশুড়িকে তিনি যেরূপ বৃহৎ সম্পত্তিশালিনী মনে করিয়াছিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহা নহেন। সমস্ত জমিদারি ঋণজালে আবদ্ধ! ইহারা কিছু লাভ করিবেন, দূরে থাকুক, বৃথা মোকদ্দমায় আরো ঘরের টাকা নষ্ট করিতে হইল!

সালেহা (লতীফের স্ত্রী) জানিতেন যে, তাঁহার সম্পত্তির জন্যই বিবাহ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার আর অন্য গুণের প্রয়োজন নাই। তিনি অত্যন্ত মুখরা ও কলহপ্রিয়া ছিলেন। তাঁহার দৈনিক কার্য ছিল, দাসী প্রহার করা। লতীফও তটস্থ থাকিতেন।

লতীফ বাহির হইতে আসিলে প্রথমে মাতার নিকট যাইতেন, সেখানে বসিয়া সালেহার গতিবিধি জানিয়া তবে তাঁহার ঘরে যাইতেন। আর যদি মাতার ঘরে আসিয়া শুনিতে পাইতেন যে, সালেহা রাগান্বিতা আছেন, অথবা 'জেল-দারোগা'র মতো কোনো দাসীকে প্রহার করিতেছেন তবে অমনি বাহিরে ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু যদি সালেহা ঐ ফিরিয়া যাওয়া দেখিতে পাইতেন, তবে আর নিস্তার নাই!

এবার কারসিয়ঙ্গ হইতে আসিয়াও লতীফ পূর্বে মাতার নিকট গেলেন। জননী তো হারাধন—বিশেষত যাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়াছেন,সেই পুত্রকে যমালয় হইতে ফিরিয়া পাইয়া হাসিয়া-কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। লতীফ আশা করিয়াছেন যে, সালেহাও এবার তাঁহার আগমনে ষোলআনা না হউক অন্তত বারোআনা আনন্দ প্রকাশ করিবেন। তাঁহার ওরূপ আশা করা স্পর্ধা! এক কথায় দুই কথায় তাঁহাদের ঝগড়া আরম্ভ হইল।

লতীফ। তুমি আমাকে টাকা পাঠাও নাই, সেজন্য আমার কাজ বন্ধ থাকে নাই। এ কলুষিতা পৃথিবীতে অনেক দেববালা আছেন, যাঁহারা না চাহিতে দান করেন। বাস্তবিক, তুমি যে ঠাকা পাঠাইলে না, তবে আমি আসিতাম কিরূপে? আমার তো অত্যন্ত রাগ হইয়াছিল—আমি আর এখানে আসিতাম না।

সালেহা। তবে আসিলে কেন? তোমাকে পায়ে ধরিয়া মিনতি করিয়া কে ডাকিয়াছে?

ল। মা ও হামিদ (লতীফের শিশুপুত্র) আছে বলিয়া আসিলাম।

সা। এতদিন বেশ ছিলাম—তুমি আসিলে আর দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

'এতদিন বেশ ছিলাম' কথাটা লতীফের হৃদয়ে আঘাত করিল। 'এতদিন'—লতীফের অনুপস্থিত সময়ে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া—লতীফ মরিয়াছেন জানিয়া, এতদিন বেশ ছিলেন! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া মুখে প্রফুল্লতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, তোমার যে দীর্ঘকর্ণ তাই বক্তৃতার অবয়বও দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়।

সা। কী বলিলে, আমি দীর্ঘকর্ণা? বেশ থাকো, গাধা আর এখানে থাকিবে না—এই চলিলাম। (গমনোদ্যতা)

ল। না, থামো। (দৌড়াইয়া যাইয়া অঞ্চল ধরিয়া) আমি তো এমন কিছুই বলি নাই। কেবল এতদিন দুঃখভোগ করিয়াছি, সেই অতীত দুঃখের কথা বলিতেছিলাম। তাহা তুমি শুনিতে না চাও—বলিব না।

না। দুঃখ আবার কিসের—দেববালাদের সঙ্গে স্বর্গে ছিলে! তাহারা পথ খরচের টাকা দিয়াছে। দুঃখটা কোথায় ছিল?

ল। টাকার অভাবে আমি দ্বীপান্তরে আটক ছিলাম।

সা। এখন দ্বীপান্তর ছাড়িয়া আসিয়াছি তো, আর কী চাও?

ল। পাঁচশত (৫০০) টাকা চাই। শ্রীমতী দীনতারিণীকে অদ্যই ঐ টাকা পাঠাইয়া দাও।

সা। তোমার আসিতে ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে? তবে এতো 'বাদশাহি সফর' আর কী?*

ল। আমার আসিতে ১০০ টাকা কিংবা ৫০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে কিনা সে হিসাবে তোমার প্রয়োজন কী। যেদিন তোমার টাকা ব্যয় করিব, সেদিন তোমাকে হিসাবনিকাশ দিব।

---

* সফর—ভ্রমণ। বিদেশে যাওয়া, প্রবাস ইত্যাদি।

সালেহা টাকা আনিয়া দিয়া রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময় রফিকা তাহাদের ঝগড়া থামাইতে আসিয়া টাকার বিষয় জিজ্ঞাসা করায় লতীফ বলিলেন,'আমার আসিতে ১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, দুইমাস আমার ঔষধপথ্যের জন্য অনুমান ব্যয় ২০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারিণীভবনে ২০০ টাকা দিব—যাহাতে আমার ন্যায় হতভাগ্য নিরাশ্রয়দের সাহায্য হয়।'

লতীফের আগমন-সংবাদ পাইয়া রফিকা আসিয়াছেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ি নিকটেই সুতরাং ইচ্ছামাত্রেই আসিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে পাইয়া সালেহা লতীফের অনেক নিন্দা করিলেন। ইহা আজ নূতন নহে, রফিকা চিরকালই জানেন যে, ভ্রাতৃবধূর নিকট যাইবা মাত্রই তিনি একথলি ভ্রাতা-নিন্দা উপহার পাইবেন। কেবল রফিকা কেন, সালেহা যাঁহাকে সম্মুখে পাইতেন তাঁহারই সাক্ষাতে স্বামী-নিন্দা করিতেন।

লতীফ সর্বদা ভাবিতেন, 'সুখই বুঝি মানব-জগতে নাই।' সালেহা তাঁহার প্রত্যেক কার্যে ও বাক্যে দোষ ব্যতীত গুণ দেখিতে পাইতেন না। আজ পাঁচ (৫) বৎসর হইতে লতীফ ও সালেহা এক গাড়ির দুইটি চাকার ন্যায় এক পথের পথিক হইয়াছেন, কিন্তু উভয়ের মতের ঐক্য কখনো হয় নাই। লতীফ যদি বলেন, 'শীতকালে ভালো,' সালেহা বলিবেন, 'গ্রীষ্মকাল ভালো!' লতীফ যখন শিশু হামিদকে আদর করেন, সালেহা তখন কোনোমতে পুত্রকে কাঁদাইতেন।' এসব অত্যাচার লতীফ নীরবে সহ্য করিতেন। তাহার হৃদয়খানি সর্বদাই শূন্য—আশ্রয়হীন থাকিত।

এই গৃহজ্বালা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লতীফ ব্যারিস্টারি উপলক্ষে অধিকাংশ সময়ে শহরে থাকিতেন। অন্য ব্যারিস্টারদের ন্যায় তিনি সপরিবার শহরে বাস করিতেন না। দুই বৎসর কাল এদিক-ওদিক থাকিয়া বাড়ি আসিয়াছিলেন; কিন্তু গৃহিণী তাঁহাকে ছয়মাসের অধিক তিষ্টিতে দেন নাই। বলিয়াছি তো' এবারও বাড়ি আসিবার সময় লতিফ নিরানন্দ ছিলেন।

নিরন্তর দগ্ধ হইয়া লতীফের জীবন তিক্ত বিষাক্ত হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেন, 'হয় আমি মরি, নয় সালেহা মরুক—দুইজনে আর একই সংসারে থাকিতে পারি না।' কখনো বা সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু তাঁহার কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠতা তাঁহাকে নিরস্ত করিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গভীর হৃদয়

যাহার হৃদয় গভীর হয়, তাহাকে দেখিয়া সহসা তাহার মনোভাব বুঝা যায় না। যাঁহারা মানুষের মুখ দেখিলে মন বুঝিতে পারেন, তাঁহারাও গভীর হৃদয়ের অবস্থা সহজে বুঝিতে পারেন না। সিদ্দিকার হৃদয় অতিশয় গভীর ছিল। তিনি তো আত্মপরিচয় দেন নাই। তিনি কর্তব্য-পালনে অত্যন্ত যত্নবতী ছিলেন, তিনি পরিশ্রমে কাতর হইতেন না।

লতীফের দেশে যাওয়ার পর হইতে দেখা যায়, কাজে আর সিদ্দিকার তত উৎসাহ নাই। এখন তিনি নির্জনে বসিয়া চিন্তা করিতে ভালোবাসেন। এখন তিনি জীবনের মধ্যে অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন। এই পরিবর্তনটুকু অন্যলোকে জানিবে কিরূপে? তিনি তো সর্বদাই গভীর চিন্তামগ্না—মূর্তিমতী বিষাদ। অথবা পর্বতের কত

অটল, অচল—বিষাদময়ী পাষাণপ্রতিমা। সেই অটল পর্বতসমা সিদ্দিকার হৃদয়ে ঝড়-বৃষ্টি? অসম্ভব। তবে কী পাষাণে রেখা অঙ্কিত হইয়াছে?

তাঁহার উপাধানের যদি বাকশক্তি থাকিত তবে সে বলিতে পারিত প্রতি রজনীতে তাহার উপর কত বিন্দু অশ্রুপাত হয়! আর দীর্ঘনিশ্বাসের সংখ্যাও সে বলিতে পারিত কিন্তু সিদ্দিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের দুঃখ-সুখের হিসাব রাখিবার যে কেহ নাই। বিশেষত তাঁহার বিশ্বস্ত প্রিয়বন্ধু তো কেহ ছিল না—তিনি নিতান্ত একাকিনী। সুতরাং আশার বিদ্যুৎ, নৈরাশ্যের ঝড়—সবই হৃদয়-প্রাচীরের অভ্যন্তরে আবদ্ধ।

সাধারণত লোকে প্রিয়পাত্রকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সিদ্দিকা তাঁহার প্রিয়পাত্রকে নিকটে পাইতে ইচ্ছা করিবেন তো দূরের কথা, সে নামটি পর্যন্ত অগ্নিতুল্য মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেন।

তাঁহার হৃদয়ের আর একটি কার্য বৃদ্ধি হইয়াছে। একটি একটি করিয়া লতীফের কার্যকলাপ ও কথা তাঁহার মনে পড়িত আর তাঁহার হৃদয় তাহারই ব্যাখ্যা, টীকা ও সমালোচনা করিত। তিনি হৃদয়কে যে-পথ হইতে ফিরাইতে চাহিতেন, অবাধ্য হৃদয় সেই পথে বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় শতধারে ধাবিত হইত। হৃদয়ের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া সিদ্দিকা শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।

সাকিনা সিদ্দিকার চিন্তাশীলতা দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছেন 'সুফিয়া'। ঈশান বাবুও তাঁহাকে 'তপস্বিনী' বলেন। কিন্তু তাঁহার সাধনার ধন যে কী তাহা কি কেহ জানে?

লতীফ বাড়ি গিয়া ভদ্রতার অনুরোধে তারিণী এবং অন্যান্য ভগিনীদিগকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের সহিত গৃহীত ঋণের ১০০ টাকা পরিশোধ করিয়া আরো চারিশত (৪০০) টাকা তারিণীভবনে চাঁদা পাঠাইয়াছেন। সিদ্দিকাও ঐরূপ একখানি ধন্যবাদ-লিপি পাইয়াছেন।

পত্রের ঠিকানায় 'রসুলপুর গ্রাম, জিলা... 'এবং লতীফের মনোগ্রাম দেখিয়া সিদ্দিকার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তবে ইনি সেই রসুলপুরের লতীফ? মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন, 'একই নামের অনেক লোক থাকে, একই নামের অনেক গ্রাম থাকে। এ রসুলপুর সে রসুলপুর নহে এবং এ লতীফও সে লতীফ নহেন। আর তিনি যদি বাস্তবিক সেই ব্যক্তি হন, তাহাতেই বা আসে যায় কী? বেল পাকিলে কাকের বাপের কী? তিনি তো সালেহার স্বামী, তোমার কে?' কিন্তু মন যদি সবসময় যুক্তিতর্ক মানিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক যন্ত্রণার লাঘব হইত।

• • •

একদিন সিদ্দিকা আপন ট্রাঙ্কটা ঝাড়িয়া গুছাইতেছিলেন,সেই সময় তথায় সৌদামিনী কোনো কার্য উপলক্ষে আসিলেন। ট্রাঙ্কে ছোট একটি কাগজের কৌটা দেখিয়া সৌদামিনীর কৌতূহল হইল; তিনি সেই কৌটাটি হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে সরু একটি সোনার হার—তাহার মধ্যস্থলে চুনি, মুক্তা ও হীরকখচিত একটি বহুমূল্য 'লকেট'। 'লকেট' খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লতীফের ফটো। তিনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সিদ্দিকার দিকে চাহিলেন।

প্রকৃতপক্ষে হতভাগিনী সিদ্দিকা এ লকেটের অভ্যন্তরীণ ফটো সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সৌদামিনীর নিকট যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে ধরা পড়িয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোনো কথাই খাটিবে না জানিয়া আরক্তিম বদনে দাঁড়াইয়া ঘামিতে

লাগিলেন। সৌদামিনী তাঁহাকে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

'রসুলপুর' ও তাহার অধিবাসী সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা এই লকেটের ফটো দর্শনে সম্পূর্ণ দূর হইল। সিদ্দিকা উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—

'জগৎ এখন কর্মক্ষেত্র তার,
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী আশা,
সে কেন স্মরণে রাখিবে গো বল,
বালিকার ভালোবাসা?'

'আমি কি পাগল! এক্ষেত্রে তিনি 'বালিকা'কে জানেনই না, তবে আর মনে মনে রাখিবেন কি?' বিধাতার কী নিষ্ঠুর খেলা। যে ব্যক্তি বিনাকারণে সিদ্দিকাকে অতি নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন—যাঁহার বিষয় তিনি কোনোদিন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই, সেই ব্যক্তিই এখন সিদ্দিকার ধ্যানজ্ঞানের বিষয় হইলেন। তিনি দারাপুত্র লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিবেন, আর ইনি চিরজীবন দুঃখনানলে দগ্ধ হইবেন!! ইহাই বিধাতার বিধান!!! সিদ্দিকা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বিধির বিধান অতি কঠোর হইলেও শিরোধার্য, সুতরাং—

'চিরদিন এ জীবনে তারি তরে কাঁদিব,
অন্তিমে তাহারি দুঃখে দু-নয়ন মুদিব।'

রাত্রে সৌদামিনী তাশ খেলিবার জন্য সিদ্দিকাকে ডাকিলেন। সিদ্দিকা বিনীতভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'দিদি! হাস্যামোদ বা খেলা আমার ভালো লাগে না। আমার হাসির উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। তোমাদের প্রফুল্লতা, হাস্যকৌতুক দেখিয়া আমার হিংসা হয়—সেই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়;

'Could my heart be light as thine,
I'd gladly change with thee.'

সৌদামিনী। (স্মিতমুখে) আহা! আমার সঙ্গে হৃদয় বদল করিবে? তবে তো আমার মঙ্গলই হয়। তুমি জানো না ইহা কত ভয়ঙ্কর,ভগিনী! তুমি কি সত্যই মনে কর যে, সৌদামিনীতে আগুন নাই? দেখ না মেঘের অঙ্কে বিদ্যুতের হাসি কত সুন্দর মনোহর, কিন্তু কত ভয়ানক! আমি হাসি—তোমাদিগকে হাসাইবার জন্য। ইহাও এখন অভ্যাস হইয়াছে।

সিদ্দিকা সবিস্ময়ে চাহিলেন। দেখিলেন, সৌদামিনী এখন হাস্যময়ী নহেন—গম্ভীর বিষাদময়ী। তিনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'আমাকে তোমার আগুন দেখাইবে?'

সৌদামিনী নীরব।

সিদ্দিকা ধীরে ধীরে পুনরায় বলিলেন—'দিদি! আমাকে তোমার আগুন দেখাও। আমি দুঃখের গল্প শুনিতে বড় ভালোবাসি।'

সৌ। তবে তুমি দুঃখের মর্ম বুঝিয়াছ?

সি। তোমার গল্প আরম্ভ কর।

সৌ। আরম্ভ করি, কিন্তু পদ্মরাগ, সকল জিনিসেরই বিনিময় আছে। তুমি প্রতিদান দিবে তো?

সি। দিব, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেহ যেন না শোনে।

সৌ। তাহাই হইবে। আমি তোমাকে আমার আগুন দেখাইব, তুমি আমাকে তোমার লকেটের ইতিহাস বলিবে।

তাশ খেলা আর হইল না। নলিনী ডাকিতে আসিলে সৌদামিনী তাঁহাকে ঘুমাইবার উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

নলিনী। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া আসিয়া) তোমরা গোপনে কিছু পরামর্শ করিবে বোধ হয়! আমিও থাকিতে পারি না?

সৌ। না, তুমি যাও। তাশ খেলা অপেক্ষা নিদ্রা অধিক উপকারী।

না। আর তোমাদের জন্য?

সৌ। আজি অনিদ্রা বিধান। তুমি নিদ্রা আরম্ভ কর গিয়া, আমিও যোগদান করিব।

নলিনী চলিয়া গেলে সৌদামিনী বলিলেন—'নিশ্চয় শুনিবে? শুনিলে তুমি পুরস্কার কী দিবে?'

সি। দুই-চারি বিন্দু অশ্রু।

সৌ। তাহাই তো চাই। আহা! নিষ্ঠুর জগতের নিকট—এমনকি মাতার নিকটও আমি কোনোদিন একটি বিন্দু অশ্রু পাই নাই। জগৎ আমার প্রতি এমনই কৃপণ ছিল।

সি। বল কী! মাতাও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই?

সৌ। মাতাও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি দেবী, মানুষের কলুষ বুঝিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৌদামিনীর আগুন

সৌদামিনী বলিলেন,—আমার পিত্রালয় গোরস্থান লেনে ছিল। আমি যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমরা কলিকাতায় ভাড়াটে বাড়িতে থাকিতাম। কুলীনের কন্যা ছিলাম এবং পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন না বলিয়া অধিক বয়সে—প্রায় ১৭ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। যাহাকে মাতা বলিয়া জানিতাম, তিনি যে আমার গর্ভধারিণী নহেন,তাহা বিবাহের পরে জানিয়াছি। আমি অত্যন্ত বোকা মেয়ে ছিলাম; ৭ বৎসর বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছিলাম, তবু বুঝিতাম না যে মা নাই। বিমাতাকেই মাতা বলিয়া জানিতাম।

আমার বিবাহের কিছুদিন পরে পাশের বাড়ির কয়েকটি মেয়েমানুষ আমার চুল বাঁধিতেছিল, মা নিকটে বসিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর বলিল—"এর মাথায় 'সতীন চুল' আছে।" মা তাড়াতাড়ি মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিলেন—'তা সতীন হয়তো মরে গেছে, এখন আর ভয় কী?' কিন্তু আমার ভাগ্যে যে সতীনের সতীনত্ব রহিয়া গিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না।

শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় মা আমাকে সতর্ক থাকিতে এবং আমার বরের ছেলেমেয়েকে যত্ন করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং বিমাতার ক্রোড়ে প্রতিপালিতা হইয়াছি—সুতরাং 'বিমাতা' হওয়া যে জীবনের অভিশাপ, তাহা জানিতাম না।

আমার স্বামীর ছেলে ও মেয়ের নাম নগেন্দ্র ও জাহ্নবী। আমি যখন সেখানে যাই, তখন তাহারা তাহাদের দিদিমার নিকট ছিল। তাই তাহাদের দেখিতে পাই নাই, তাহাদের সঙ্গে পাঁচ বৎসর পর দেখা হইয়াছিল।

আমি স্বামীগৃহে যাইবামাত্র চতুর্দিক হইতে আমার প্রতি বিষবাণ বর্ষণ হইতে লাগিল। যাহারা 'বউ' দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারাই মধুরবাণী বলিয়া নববধূর প্রাণে অমৃত ঢালিয়াছিল। 'ক' বলিল,—'এখন হইতে নগেন ও জাহ্নবী পর হইল।'

'খ'। আহা, তাই তো বাছারা আর কি আসিবে?

'গ'। তাঁহারাই বা কোন্ প্রাণে বাছাদের এখানে পাঠাইবেন?

'ঘ'। এখন তাহারা পিতৃহীন হইল।

'ঙ'। এ বাড়িঘর দালানকোঠা যে উহাদের ভাগ্যে ছিল না, তাহা কে জানিত?

'চ'। যার মা নাই, তার কিছুই নাই।

আমার ননদদ্বয় সেই সময় কাঁদিতে বসিয়াছিলেন। কান্নার সুর ছিল—'লক্ষ্মী তো গিয়াছে, এখন ডাকিনী আসিল—' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি খুনি আসামির মতো ভয়ে, চিন্তায় আকুল হইলাম। যেন এসব দুঃখের মূল আমিই। আমিই যেন সে স্বর্গীয়া লক্ষ্মীকে হত্যা করিয়াছি।'

ক্রমে পাঁচ বৎসর অতীত হইল, আমার সন্তানসন্ততি হইল না। নিতান্তই একলা ছিলাম। স্বামী উপার্জন উপলক্ষে প্রায়ই বিদেশে থাকিতেন। আমার ননদ দুইজন সময় সময় আসিতেন, কিন্তু তাঁহাদের উপস্থিতি আমার বাঞ্ছনীয় ছিল না।

ঈশ্বর সন্তান দেন নাই, তাহাও যেন আমারই দোষ! ললিতা (আমার ছোট ননদ) বলিত—'তা হবে কেন? ও মাতৃহীন বাছাদের তাড়াইয়া, তাহাদের ভাগ যে ভোগ করিতে চাহিবে, সে-ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে কেন। ঈশ্বর উহাদের সহায়-উহাদের ভাগ কম করিতে চেষ্টা করিলে তা হইবে কেন?'

পাঁচ বৎসর পরে বাছারা আসিল। তাহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা-ভগ্নী। তাহাদের মাসীমাও সঙ্গে আসিলেন। এখন হইতে ঐ শ্যামাদিদি আমার জন্য সুন্দর চিতা সাজাইয়া আমাকে পরতে পরতে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এখন বলিতে লজ্জা করে, আমি বাছাদের পাইয়া যত সুখী হইব মনে করিয়াছিলাম তত সুখী হইতে পারি নাই। স্বীকার করি যে, আমার মনের সেরূপ ভাব হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ করে। কিন্তু কী করিব? আমি আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই। যে-অভাব আমার হৃদয়ে ছিল—যে-অভাব নগেন ও জাহ্নবীকে কোলে পাইলে দূর হইবে ভাবিতাম, সে-অভাব যেন আরও শতগুণ বৃদ্ধি হইল!

শাশুড়ি আমাকে কখনো কটুকাটব্য বলেন নাই। এখন দিদির মুখে সর্বদা শুনিতেন, 'ছেলেদের খাওয়ার যত্ন হয় না, ছেলেদের কাপড় নাই,' ইত্যাদি। সুতরাং তিনিও এখন আমাকে বেশ দু-কথা শুনাইতে লাগিলেন।

স্বামী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি আমাকে সরল প্রকৃতির বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ভীষণ অন্ধকারে আমি কেবল তাঁহার চরণ দুইটি দেখিতে পাইতাম। আমার মরুময় জগৎ-সংসারে ছায়া কেবল তিনিই ছিলেন। শ্যামাদিদি আমার বিরুদ্ধে সকলকে বিষাক্ত করিয়া তাঁহারও হৃদয়ে বিষ ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে দিদির কথায় বিশ্বাস করেন নাই, বরং তাঁহাকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দিদি কাঁদিতে বসিলেন—নগেন জাহ্নবীকে ডাকিনীর হাতে দিয়া কিরূপে যাইবেন?

আর যাইতেনই বা কোথায়? তিনি নিরাশ্রয়া বিধবা ছিলেন।

দিদি বাছাদের কাপড় চুরি করিয়া নিজের মাতার নিকট পাঠাইতেন, আর কর্তাকে বলিতেন, 'তোমার স্ত্রী ছেলেদের কাপড় কিনিয়া দেয় না।' সেইসব কাপড় আমরা প্রকাশ্যে দিদির ছেলের জন্য ফিরিয়া আসিত। শুনিতাম, 'খশুর পিসি দিয়াছে। খশুর দিদিমা দিয়াছে,' ইত্যাদি।

খাবার জিনিস সর্বদা চুরি হইত, কী হইত, জানিতাম না, তাই বাছাদের খাইতে দিতে পারিতাম না। খাবার জিনিস বন্ধ করিয়া রাখিলে দিদি ও প্রতিবেশিনীগণ কপালে করাঘাত করিত,—'ছেলেদের খাবার সময়, তারাই খেতে পায় না!' একদিন কর্তাও বলিলেন, 'তবে বল তো—ওরা না খেলে খাবে কে?' উহাদের যে যত্ন করিয়া খাওয়াইতাম, তাহা কেহই অন্ধচোক্ষে দেখিত না। দেখা যাইত, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় মিষ্টান্ন ঘরের কানাচে পড়িয়া আছে। দিদি চুরি করিয়া ফেলিয়া দিতেন—আর সকলকে ডাকিয়া দেখাইতেন—'দেখ, ফেলে দেয়, তবু বাছাদের খেতে দেয় না।' আমার কথা কেহ বিশ্বাস করিত না। দিদির কথাই বেদবাক্য।

কত বলিব? এরূপ ঘটনা তো দৈনিক ব্যাপার ছিল। একবার শীতকালে আমার ভয়ানক সর্দি-কাশি হয়—দিবারাত্রি ঘরে আগুন থাকিত। একদিন তন্দ্রা হইতে জাগিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইলাম—রেশম পোড়ার গন্ধ! আর দেখিলাম দিদি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। কর্তাও তখনই আসিলেন। তিনি দুর্গন্ধে বিরক্ত হইয়া ঘরের আগুন বাহির করিতে বলিলেন। দিদি পুনরায় আসিয়া বলিলেন, 'দেখি এতে কী? কিসের এমন গন্ধ?' তিনি কাপড়ের দগ্ধাবশিষ্ট খণ্ড বাহির করিয়া বলিলেন—'দেখেছ! এই-যে বাছাদের জামার সেই কিংখাপ কাপড়! ওঁর একখানা শাড়ি হয় নাই, উনি বাছাদের এ কাপড় পরতে দিবেন কেন! তাই তো বলি—বাছাদের কাপড় সব হয় কী?'—এই সঙ্গে কান্না আরম্ভ হইল। কর্তা নীরবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—একটিও কথা কহিলেন না। সেই নীরব তিরস্কার যে কত বিষাক্ত, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে, পদ্মরাগ?

সিদ্দিকা গল্পের গতিরোধ করিয়া বলিলেন, 'তুমি কেন কর্তাকে বল নাই যে, দিদিই কাপড় পোড়াইয়াছিল?'

সৌ। সে-কথা বলিলে, বিশ্বাস করিত কে? সে আপন মাসী—আমি বিমাতা। আমার হিংসায় বস্ত্র দগ্ধ হয় নাই, তবে কি তাহাদের মাতার সহোদরা অমন কাজ করিবে? তাঁহার রক্তের টান, অগাধ স্নেহ—আমি কী? এ-কথা বলিলে একটা তুমুল সংগ্রাম বাধিত, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সকলে আমার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিত। দিদির অত সৈন্যসামন্তের সঙ্গে একা আমি কিরূপে যুঝিতাম? বিশেষত আমি তখন শাপগ্রস্তা ছিলাম— সুতরাং আমি যাহাই করিতাম ফল বিপরীত হইত।

একদিন নগেন দৌড়িয়া আসিয়া আমার কোলে বসিল। আমি সাদরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলাম—অমনি সে বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল—'বাবা গো—মলুম গো! আমি তো অবাক। এ কি সরল সুকুমার শিশু? কে যেন উত্তর দিল—আমার হৃদয়ে যে বাজিয়া উঠিল, 'না,—সতীনের সতীনত্ব!!'

ললিতা দৌড়াইয়া আসিয়া নগেনকে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, 'হতভাগা! ওখানে মরতে গিয়েছিলে কেন। তোর মা নাই—মায়ের মমতা কোথায় পাবি?' আমি স্বীকার করি যে, নগেনকে 'মায়ের মমতা' দিতে পারি নাই। তাই বলিয়া তাহাকে গাল

টিপিয়া মারিতেও যাই নাই তো। অনেক সত্য ঘটনায় মাতার নিষ্ঠুরতার কথাও শুনা যায়। 'সৎ' সম্বন্ধটাই বড় ভয়ানক। যে-কাজ মাতা করিলে দোষ নাই, সেই কাজ 'বিমাতা' করিলে জগৎ তাহার ওপর খড়্গহস্ত হয়।

আর একদিন আমি ভাঁড়ারঘরে একটা বড় সিন্দুক খুলিয়া জনৈক অতিথিকে সিধা দিলাম। সিন্দুকটা বন্ধ করিয়া রন্ধনশালায় তৈল আছে কি না দেখিতে গেলাম—সিন্দুকে তালা বন্ধ করা হয় নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সিন্দুক বন্ধই আছে। অমি কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে গোলাপের মা (ঝি) আসিয়া বলিল—'দেখসে মা! তোমার সিন্দুকের ভিতর কী যেন ধুপধাপ করে!' আমি বলিলাম—'দূর, আমি এখনই যে সিন্দুক বন্ধ করিয়া আসিলাম।'

কৌতূহল-পরবশ হইয়া কর্তাও আমার সঙ্গে সিন্দুক দেখিতে চলিলেন, আমি সিন্দুক খুলিয়া দেখি—নগেন্দ্র! আমার তো চক্ষু স্থির! শ্যামা তাড়াতাড়ি নগেনকে তুলিল। তখন যে ঝড়-তুফান আরম্ভ হইল, তাহা অনুমান করিয়া দেখ!

এইখানে সৌদামিনী থামিলেন। যেন সেই অতীত ঘটনা-রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। অনেক পরে সিদ্দিকা কহিলেন—'নগেন কিরূপে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে?'

সৌ। না। সেইদিন হইতে স্বামী আমার সঙ্গে কথা কহা বন্ধ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ দিতে পারি না। তিনি কী করিবেন? এতকাল সকলের বাক্যজ্বালা, বিষবাণ অকাতরে সহিতেছিলাম,—বেশি দুঃখ হয় নাই। কিন্তু এখন তাঁহার অনাদর-অবহেলা অত্যন্ত অসহ্য হইল। সপ্তাহকাল নীরবে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমার মাতার নিকট যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

আবার সেই শান্তিপ্রদ মাতৃক্রোড়ে যাইয়া জুড়াইলাম। দুঃখের বিষয়, আমার দুঃখে কেহই সহানুভূতি করিত না। জগতে আমার জন্য কেহ আহাটি বলিত না! এমনকি মা—যে মা আমার (বিমাতা হইলেও) সুধা-স্বরূপিণী ছিলেন, তিনিও আমার দুঃখ বুঝিতেন না। তিনি বলিতেন—'মা! তোর কথা আমি বুঝতে পারি না—তুই ছেলে দুটোকে—পোষ মানিয়ে নিতে পারলি না? আমি তোর চেয়ে কমবয়সে তোদের মানুষ করলেম কী করে? আমি তোর চেয়ে মোটে পাঁচবছরের বড়!' হা অদৃষ্ট! কেমন করিয়া বুঝাইব,—কেন ছেলেদের পোষ মানাইতে পারি নাই? সেইদিন বুঝিলাম—জগৎ অন্ধ! আমার দুঃখ দেখিবার চক্ষু জগতের নাই। আমার যন্ত্রণা দেখিবার—বুঝিবার কেহ নাই। যখন সেই স্নেহময়ী মা বুঝিলেন না, তখন আর কে বুঝিবে? হৃদয়ের তারে তারে যেন কেমন সুরে বাজিত—

ভাবি মনে নিশিদিন, কিরূপে কাটিবে দিন
এ ভব-রাক্ষস-পুরে—মরু সাহারায়?
হেথা স্নিগ্ধ ছায়া নাই, পর দুঃখে মায়া নাই,
কিরূপে কাটাব দিন—হায় এ কারায়?'

প্রায় এক বৎসর পরে স্বামীগৃহে আসিলাম। আবার নূতন করিয়া নগেন ও জাহ্নবীর সহিত সুখের ঘর রচনার চেষ্টা করিলাম। এখন আমার জন্য নূতন অপবাদের সৃষ্টি হইল। জাহ্নবীর তিন-চারিখানা মূল্যবান অলঙ্কার চুরি গিয়াছিল। আমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিতাম—'শ্যামা চুরি করিয়াছিল,' কিন্তু বলা হয় নাই। শ্যামা ও ললিতা

আমাকে চুরির অপবাদ দিল। আমি কেবল বলিতাম—'হরি হে, তুমি সত্য!'

সিদ্দিকা। উহ্ ! এত নিপীড়ন!!

সৌ। ইহাই শেষ নহে—আরও শুন। পাড়ায় তো রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, আমি দুষ্ট নগেনের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছি। দ্বিতীয়বারের ঘটনার পর হইতে আমার নাম 'রাক্ষসী' হইল! ক্রমে আমার বিবাহ-জীবনের দশ বৎসর অতীত হইল। আমার বাছাদের বয়স তখন ১২ বছর। এই সময় আরও একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। আমি প্রাঙ্গনস্থিত বাঁধা কূপের ধারে দাঁড়াইয়া আছি। একবার সাধ হইল, ঐ কালো জলে লীন হই। অমনি কে যেন বলিল—'অমন কাজ করিও না—আর কয়দিন অপেক্ষা কর।' বোধহয়, এ বক্তা সেই জন, যিনি বলেন—'সতীনের সতীনত্ব'।

জাহ্নবী কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া কূপের দেওয়ালের উপর উঠিল। আমি সেস্থান তথা হইতে পলায়ন করিব, মনে করিলাম; সে কিন্তু আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। আমি বলিলাম, 'করিস কী বাছা! পড়ে যাবি।' সে বলিল, 'তবে আমাকে ধরে নাবিয়ে দাও।'

যেই তাহাকে ধরিলাম, অমনি সে চিৎকার করিয়া উঠিল—'মাসিমা দেখ! মা আমায় ফেলে দিল!' আমি তখন কী যে করি ভাবিয়া পাই নাই—চক্ষে আঁধার দেখিতাম। শ্যামা আসিবার পূর্বে কর্তা আসিলেন। তিনি স্বয়ং আমাকে জাহ্নবী-বধের চেষ্টা করিতে দেখিলেন। তিনি বলিলেন—'আজ তো আমি স্বচক্ষে তোমার কাণ্ড দেখিলাম।' আমি কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না—জাহ্নবীকে লইয়া দ্রুতগতি প্রস্থান করিলেন।

দশদিক অন্ধকার দেখিলাম—একদণ্ড নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইবারও স্থান নাই। কূপের ধারে একটু দাঁড়াই। তাহাও বিধাতার অসহ্য। আমি প্রতিদিন পলে পলে অনুভব করিতে লাগিলাম আপন সন্তান স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করে, কিন্তু সপত্নী-সন্তান স্ত্রীকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূর করে! আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, স্বামীর হৃদয় হইতে অনেক দূর সরিয়াছি এবং ক্রমশই দূর হইতেছি। অথচ তাঁহাকে আবার আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া দেয়, এমন কেহ তো ছিল না! হইতে পারে—আমার এ ধারণা ভ্রান্ত

সি। আমার বিশ্বাস, তোমার ধারণা ভ্রান্ত নহে, কারণ কোরেশা-বিও তো ঐ কথা বলেন। তিনি পাটনাত্যাগিনী হইয়া তারিণী বিদ্যালয়ে কেন? ঐ দুঃখেই তো! তিনি ঝাড়া আট বৎসর স্বামীর সহিত দুর্বিসহ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার সপত্নী-পুত্র, দশমবর্ষীয় বালক কমরজজমান ওলাউঠা রোগে মারা পড়িবার পর হইতে স্বামীর ঔদাস্য এমন অসহ্য হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ট্রেনিং স্কুলে পড়িতে গেলেন। তাহার পর শিক্ষয়িত্রীরূপে গয়া, মুজফফরপুর ইত্যাদি বালিকা-স্কুলে ঘুরিয়া শেষে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সৌ। এই সে যত্রতত্র চাকুরি করা—বিশেষত এখানে চাকুরি-গ্রহণ তো তাঁহার স্বামীর অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ঔদাসীন্যবশত তিনি বাধা দেন নাই। ইহাতে কোরেশা-বির পক্ষে শাপে বরই হইয়াছিল।

সি। কোরেশা-বির ভাসুর, দেবর, জায়েরা ও কামরুর সহোদরা—সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রবাসী স্বামীকে বুঝাইলেন যে, ওলাউঠায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা অভাবেই কমরু মারা গেল। বেচারি যদিও সেই রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় পাটনার অন্যতম বিখ্যাত ডাক্তার ডাকিয়া কমরুকে দেখাইয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে চিকিৎসা না-করার অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

সৌ। কেবল ইহাই নহে—সেইদিন অপরাহ্নে অপর ছেলেদের সঙ্গে কমল সেই লুচি-পুরি কিনিয়া খাইয়াছিল, তাহা কিনিবার দু-গণ্ডা পয়সা কোরেশা-বিই দিয়াছিলেন। আর সে ডাক্তারও ছিলেন তাঁহার পিতৃ-বন্ধু। আমি কোরেশা-বির স্বামীর কোনো দোষ দেখি না, তিনি বেচারা কী করিবেন?—'দশচক্রে ভগাবান ভূত'! তবু তিনি স্ত্রীর সহিত বেশ ভদ্র ব্যবহার করেন। এখানে প্রায় সর্বদাই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। গত বৎসর ছুটির সময় কোরেশা-বিও বাড়ি গিয়াছিলেন।

সি। ইহার কারণ, আমার বোধ হয় যে, এখন তিনি স্বয়ং পুত্রবতী হইয়াছেন, তাই ১১ বৎসর পরে তাঁহার কপাল ফিরিয়াছে। যাক্, দিদি, এখন তোমার কাহিনী চলুক।

সৌ। বলিয়াছি তো, আমার জগৎ-সংসার ঘোর অন্ধকারময় মরুভূমি ছিল। যিনি এই মরুভূমিতে কেবল একবিন্দু সুধা—সেই অন্ধকারে একটিমাত্র ক্ষীণ জ্যোতির্ময় তারকা—তিনিও দূরে—বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং আমি জীবনে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম।

সি। তোমার নগেন ও জাহ্নবী ছেলেমানুষ বই তো নয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ কী?

সৌ। তাহা সত্য। এইজন্যই তো এসব কথা এতকাল কাহাকেও বলি নাই; তুমি শুনিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে বলিয়া তোমাকে বলিতেছি। নচেৎ এসব কথা কি বলিবার? এ কেবলই নীরবে সহিবার—আর হৃদয়ের পরতে পরতে দগ্ধ হইবার ব্যাপার। বাছারা তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তাহাদের কার্যের জন্য তাহারা দায়ী ছিল না, কেবল আমারই দায়িত্ব গুরুতর ছিল। উহাদের কর্মফল আমাকে ভোগ করিতে হইত! আর সেই কর্মফল কত ভীষণ, তাহা একবার কল্পনা-সহায়ে মানসচক্ষে দেখ!

সি। তোমার কি দিদিই সব সর্বনাশের মূল ছিল? তাহাকে তাড়াইতে পারিলে তুমি নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিতে।

সৌ। ও হরি! বল কী! তাই তো অসম্ভব ছিল। তাহাকে তাড়াইবে কে? সে-ই গিন্নি, সেই সর্বেসর্বা—সে যে দয়া করিয়া আমাকে তাড়ায় নাই, তাহাই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য! শ্যামা দূর হইলেই তো ছেলেমেয়ে, ঘর-দ্বার সমস্তই আমার হইত।

সি। এখন বল কিরূপে শাপমুক্ত হইলে? আর অভিশাপের কথা শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

সৌ। এখন দেখিলে তো—আগুন আছে কি না? মানুষ যখন নিতান্ত নিরুপায় হয়, জীবনে মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তখন পরম দয়াল ঈশ্বর মানবের প্রতি দয়া করেন।—

'নিদাঘের তীব্র তাপ অসহ্য যখন,
জলদ তখনি করে সলিল বর্ষণ।'

ঈশ্বর পতিতপাবন, পতিত মানবকে উদ্ধার করেন। কাহারো জন্য মৃত্যু বিধান, কাহারো জন্য অন্যকিছু—যাহা হয় একটা উপায় করিয়া দেন। আমারও উপায় হইল। আমরা তীর্থযাত্রা করিলাম। ললিতা পুত্রের কল্যাণে মথুরায় কোনো ঠাকুরের পূজা মানিয়া ছিল। সেই উপলক্ষে মথুরায় যাওয়া হয়। আমরা যেখানে ছিলাম, তথা হইতে ললিতার মানিত ঠাকুরের মন্দির কিছু দূরে ছিল, তাই সেখানে জলযানে যাইতে হইয়াছিল। ললিতা ছোট একটা বজরা ভাড়া লইল। আমাদের সঙ্গে আরো অনেক

যাত্রী ছিল। কর্তা স্বয়ং নগেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া শ্যামাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, জাহ্নবীকে যেন খুব সাবধানে রাখে। তাঁহার অতি-সতর্কতার কথা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মনে হইল, জাহ্নবী যদি ডুবিয়া যায়।

সেইদিন কর্তা আমারও প্রতি যেন একটু প্রসন্ন হইলেন; স্বয়ং হাত ধরিয়া নৌকায় তুলিলেন, বসিবার স্থানটা নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখের উপর আমার চোখ পড়িল-সেদিন সে-মুখ বড় সুন্দর লাগিয়াছিল—চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। মনে হইল, এই বুঝি শেষ দেখা—আর ও-মুখ দেখা হইবে না—যদি আর না দেখিতে পাই, ভালোমতে দেখিয়া লই! সে-সময় সুখানুভব করিতে পারি নাই—কেমন যেন পূর্ণ বিষাদে মগ্ন হইতেছিলাম।

সৌদামিনী থামিলেন। সিদ্দিকা ভাবিলেন, সৌদামিনী বুঝি রোদন করিতেছেন, কিন্তু না, সে চক্ষু শুষ্ক—অনেক অশ্রু বিসর্জনে অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির-শান্তভাবে পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন :

যমুনার শীতল বাতাস পাইয়া শ্যামা ঘুমাইয়া পড়িল। চঞ্চলা জাহ্নবীকে আমি 'এদিকে এস, ওদিকে যেও না' ইত্যাদি বলিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। সেও সে প্রতি কথায় আমার সহিত তর্ক করিতে লাগিল; ক্রমে আমাকে ছাড়িয়া সে ললিতাকে আক্রমণ করিল। তাহারা ঝগড়া করিতে লাগিল। আমি মুক্ত বাতায়ন হইয়া যমুনার কালো জল দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—

জগৎ-জননি!
জড়াতে জগৎ-জীবে স্নিগ্ধ করুণায়
শীতল যমুনা-রূপে বিরাজ ধরায়

সহসা জাহ্নবী আমার গায়ের উপর দিয়া একেবারে জানালায় আসিয়া বসিল। আমি ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—'মা! করিস কী!' সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—'কেন, তুমি এম্নি কর; নিজে বুড়ো মাগী তামাশা দেখ—আমার দেখা তোমার সহ্য হয় না! আমি একেবারে খুকি নাকি যে ভয় করছ?' এই বলিয়া উচ্চহাস্য করিল। অতঃপর কহিল—'দেখ, আমি আরও—' কথাটা শেষ হয় নাই—সে নদীর জলে পড়িয়া গেল। আমি সহসা অজ্ঞান হইলাম।

যখন প্রথম চক্ষু খুলিলাম, দেখিলাম জাহ্নবী ও আমি পাশাপাশি ধরাতলে পড়িয়া আছি, আর পাঁচ-সাতজন লোক আমাদের শুশ্রূষা করিতেছে। তাহাদের যত্নে আমি বাঁচিয়া উঠিলাম; জাহ্নবী বাঁচিল না। আমি সংজ্ঞালাভ করিয়াছি দেখিয়া তাহারা আমাকে লইয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি কেবল দীননয়নে জাহ্নবীর প্রতি চাহিয়া রহিলাম—চক্ষের জলে বুক ভাসাইলাম—যাহার মরণে সঙ্গিনী হইয়াছিলাম, তাহাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? জেলেরা মাছ ধরিতে গিয়া আমাদের ধরিয়াছিল—আমরাই উহাদের জালে উঠিয়াছিলাম।

সি। মাছ দুইটা মন্দ নহে। কিন্তু দিদি! জাহ্নবীকে ও তোমাকে উহারা একসঙ্গে পাইল কিরূপে?

সৌ। আমিও তখনই ডুবিয়াছিলাম যে, কোনোমতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম, তাহাকে দৃঢ়ভাবে বক্ষে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম, যদি ডুবি ত একসঙ্গেই ডুবিব। যদি উঠি, তবে দুইজনে একসঙ্গেই উঠিব। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা

অন্যরূপ ছিল; তাই যদিও উভয়ে একত্রে জালে উঠিলাম, তবু তাহাতে আমাদের চিরবিচ্ছেদ হইল! (এইবার সৌদামিনীর চক্ষে জল দেখা দিল—হৃদয় উদ্ভাসিত হইল। বলিলেন)—ধীবরেরা আমাকে তাহাদের সঙ্গে লইল। আমি পূর্ব-পশ্চাৎ না ভাবিয়া তাহাদের কাছে গেলাম। দুই-একদিন পরে আমি পাগল হইয়া তাহাদের দ্বারা বাতুলালয়ে প্রেরিত হইলাম। প্রায় এক বৎসর পরে প্রকৃতিস্থ হই। সে আজ ১৭/১৮ বৎসরের ঘটনা।

আমি আরোগ্য লাভ করিলে বাতুলালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা সম্ভ্রান্ত ঘরে 'গবর্নেস'-এর কাজ জোগাড় করিয়া দিলেন। সেখানে যাইবার এক বৎসর পরে আমার ছাত্রীর বিবাহ হইলে, তাঁহারা আমাকে সরযূর সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইলেন। কিছুদিন পরে সরযূ তাহার ছোট ননদকে তারিণী-বিদ্যালয়ে ভর্তি করিবার জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেল। এই উপলক্ষে মিসিস সেনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হইল; তাহার ফলে আমি তারিণী-কর্মালয়ে চলিয়া আসিলাম। আমি এখানে ১৫/১৬ বৎসর হইল আছি। এখন দেখি হৃদয়টা বৃহৎ—বিশ্বব্যাপী হইয়াছে। এখন আর ওরূপ ক্ষুদ্র ঘটনায়—সামান্য অনাদর অবহেলায় হৃদয় আলোড়িত হয় না।

সি। তাহা হইলে এখন আবার ঐ গৃহে ঐসব লোকের সহিত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার? তবে যাইতে বাধা কী?

সৌ। আহা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব, শ্যামাদিদি সে গৃহ কেমন বিষাক্ত—কালকূটময় করিয়া তুলিয়াছিল। তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না, বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

সি। আল্লাহতালার রাজত্বে কিছুই অসম্ভব নহে। ক্ষুদ্রকায় সুকুমার শিশু দ্বারা বয়ঃপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের অনিষ্ট হইতে না-পারিবে কেন? অতিকায়ের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়েরই অত্যাচার অধিক হয়। তাই দেখ না—মৌমাছির হুল অতিশয় তীক্ষ্ণ, যন্ত্রণাপ্রদ বটে—যখন তুমি তাহার মধুর ভাণ্ডার লুটিতে যাও! নতুবা সে তোমাকে বিনাকারণে আক্রমণ করে না। আর ক্ষুদ্রকায় মশক তোমাকে নিতান্ত নির্দোষ—নিদ্রিতাবস্থায় দংশন করে। মশার অত্যাচারে মশারি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে—কিন্তু মধুকরের জ্বালায় তো কোনোপ্রকার 'দুর্গ' নির্মাণ করিতে হয় নাই!

প্রায় রাত্রি শেষ হইল দেখিয়া উভয়ে বিষণ্নহৃদয়ে শয়ন করিলেন। সৌদামিনী ঘুমাইয়াছিলেন কি না, জানি না। সিদ্দিকা কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও চক্ষু মুদিত করেন নাই। তিনি সৌদামিনী-আগুনের তরঙ্গে ওতপ্রোত হইতেছিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক সৌদামিনী-আগুনে পরিপূর্ণ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আবার দেখা

লতীফ মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। ডাক্তারের উপদেশমতে তাঁহার মাতাকে লইয়া বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার সেই মাসি (যাঁহার কেহ নাই) এবং রফিকাও আছেন। রফিকা এক বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন।

রফিকা সীতাকুণ্ড দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় একদিন তাহাদিগকে লইয়া সন্ধ্যার প্রাককালে লতিফা সীতাকুণ্ডে চলিলেন। তখন দিনমণি পশ্চিমে অস্ত যাইতেছিল সুতরাং অন্ধকার তখনো গাঢ়তর হয় নাই। তাঁহারা পদব্রজে বেড়াইতে বেড়াইতে কিছুদূর লক্ষ্মণকুণ্ডের নিকট আরও কয়েকজন মহিলাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিকটবর্তী হইলে লতীফ দেখিলেন, সিদ্দিকা এবং তাঁহার 'ভগিনী'গণ। কিন্তু সিদ্দিকা লতীফকে দেখিয়াও না-দেখার ভান করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া গেলেন। তাঁহাদের পাশ্চাতে হেলেন ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন—

'কেমন আছেন মিস্টার—?'

লতীফ অগত্যা দাঁড়াইলেন। যথারীতি অভিবাদনের পর বলিলেন, 'মিসিস হরে আমার নাম পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।'

সৌদামিনী। চেহারাখানি কিন্তু মনে আছে।

হেলেন। আপনার নামের শেষভাগটা আমি ঠিক উচ্চারণ করিতে পারি না আপনার সঙ্গিনীদের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন না?

লতীফ। 'সঙ্গিনী' বলিলেই হয় না?

হে। না, তাহা কি হয়? তবে আপনার পরিচয়ের ইচ্ছা না থাকিলে আমি জোর করি না।

ল। ইনি ভগিনী, ইনি মাসী। (তাঁহাদের প্রতি) ইহারা আমার পরম হিতকারিণী—ইহারাই সেই তারিণীভবনের 'দরিদ্র ভগিনী'।

রফিকা। ভালো হইল, ইহাদের সহিত দেখা হইল।

হে। আমরাও কৃতার্থ হইলাম।

র। ভাই-এর বাচনিক আপনাদের সৌজন্যের কথা শুনিয়া অবধি আপনাদের দেখিতে আগ্রহ ছিল; এতদিনে সে সাধ মিটিল।

সৌ। সময় সময় অনেকেরই তীর্থযাত্রা সফল হয়। আমি জীবনে একবার সার্থক তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলাম। অদ্য (রফিকার প্রতি) আপনিও একটি বাঞ্ছনীয় বস্তু পাইলেন—অর্থাৎ আমাদের দেখিলেন। (লতীফকে দূরবর্তী সিদ্দিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া) মিস্টার আলমাস, আপনারও কোনো ইষ্ট লাভ হইয়াছে কি? আমরা তো আপনার ভগিনীকে পাইলাম। আপনি কিছু পাইলেন কি?

ল। আপনাদের সঙ্গে দেখা হইল, এই যথেষ্ট লাভ, আর কী চাই? (কিন্তু যাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে আনন্দ লাভ হইত, তিনি এখনো দূরে আছেন—তাঁহার সঙ্গে একটি কথাও হয় নাই।)

সৌদামিনী ঊষাকে দূরে দেখিয়া ডাকিলেন। সিদ্দিকা ও ঊষা তখন ফিরিয়া আসিলেন।

ঊ। আমরা দেখিলাম যে, মি. আলমাস্ পলাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাই আমরাও দেখিয়া না-দেখার ভান করিয়া দূরে যাইতেছিলাম!

ল। আপনারাই অতিক্রম করিয়া গেলেন, আমিও পশ্চাৎপদ হইতেছিলাম। এখন বলুন, আপনারা ভালো আছেন তো?

ঊ। আমি ভালো আছি, ধন্যবাদ! সিদ্দিকা কিন্তু প্রায়ই অসুস্থ থাকেন।

র। (সিদ্দিকার প্রতি) ভাই-এর নিকট আপনার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার কী অসুখ?

মৌনী সিদ্দিকার প্রতি প্রশ্ন হইল দেখিয়া তিনি বিপদ গণিলেন। '...না, এমন কিছু অসুখ নয়'—এই মাত্র সংক্ষেপে বলিয়া অন্যদিকে চাহিলেন।

উ। চল, আমরা ওদিকে গিয়া বসি।

সকলে একখণ্ড পাথরের উপর উপবেশন করিলেন। রফিকা প্রথম দৃষ্টিতেই সৌদামিনীকে ভক্তি করিতে শিখিলেন। সৌদামিনীর এই ভক্তি-আকর্ষণের গুণটা কেবল তাঁহার স্বামী প্রভৃতির হৃদয়েই কার্যকরী হয় নাই।

র। আরও যে কয়েকজন ভগিনীর নাম শুনিয়াছি, কোরেশা, বিভা—এখন তাঁহারা কোথায়?

সৌ। তাঁহারা সকলে এখন কলিকাতায়। এবার পূজার সময় কেবল আমরা কর্মালয়ের কয়েকজন 'গর্গিনী, আসিয়াছি। বিদ্যালয় হইতে কেবল উষা, অসুস্থতার জন্য ছুটি লইয়া আসিয়াছেন।

র। (হেলেনের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) ও মেমও কি তারিণীভবনে থাকেন?

সৌ। হাঁ, উনি কর্মালয়-বিভাগের ইংরাজি শিক্ষয়িত্রী। কলিকাতায় উহার স্বতন্ত্র বাসাবাড়ি নাই বলিয়া তারিণীভবনেই বাস করেন।

লতীফের মাতা কিছু অসুস্থ আছেন, শুনিয়া সৌদামিনী তাঁহাকে দেখিতে যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

রফিকা সিদ্দিকাকে বলিলেন, 'আপনিও আসিবেন।'

সি। আমি যাইব না, ক্ষমা করিবেন।

র। কেন, আমি আপনাদের তাঁবুতে যাইব, আপনি আসিবেন না কেন? যাওয়া-আসাই তো নিয়ম।

সি। আপনারাই তো আমার যাইবার পথ রাখেন নাই।

র। আপনার কথা আমি ভালোমতে বুঝিলাম না। পথ রাখি নাই কেমন?

সি। আমরা সামাজিক মানুষ নহি, সুতরাং ও-নিয়ম আমাদের জন্য নহে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল দেখিয়া সকলে যাইতে উদ্যত হইলেন। বিশেষত রফিকার সঙ্গে একটি চারি বৎসরের শিশু ছিল, সে নিদ্রায় কাতর হইল। রফিকা ছেলেটিকে কোলে লইতে লইতে বলিলেন, 'এ ভাই-এর ছেলে। আজ এক বৎসর হইল, ইহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই অবধি এ আমার সঙ্গে আছে।'

ঐ কথাটা শুনিয়া বিদ্যুতের মতো হঠাৎ একটু দুরাশার আলোক সিদ্দিকার হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইল। সেই আলোকে তিনি মুহূর্তের জন্য লতীফকে স্বাধীন—বন্ধনমুক্ত দেখিতে পাইলেন! তখনই আবার একখণ্ড নিরাশার মেঘ আসিয়া সে আলোটুকু ঢাকিয়া ফেলিল। সিদ্দিকার হৃদয়ের এই আশাবিদ্যুৎ ও নৈরাশ্য মেঘ কেহই জানিতে পারিল না। কেবল লতীফ ও সৌদামিনী তাঁহার মুখভাবের এই ক্ষণিক পরিবর্তনটুকু লক্ষ করিলেন।

রফিকা কিছু লক্ষ না করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন—'আমি নিজের ছেলেমেয়ে রাখিয়া আসিয়াছি—ইহাকে ছাড়িতে পারি নাই।'

ল। তুমি হামিদাকে আদুরে করিয়া তুলিতেছ, এতটা ভালো নহে। শেষে তাহার মাতার মতো একগুঁয়ে না হইলেই রক্ষা।

এইবার সকিনা বলিলেন—'ছেলেটি ঠিক মি. আলমাসের মতো। দেড় বৎসর পরে আবার আপনাকে দেখিলাম—সেইরকমই আছেন।'

ল। আমি কি শিশু ছিলাম যে, এখন আমায় বড় দেখিবেন?

সৌ। রোগাটে ছিলেন, সবল-সুস্থ হওয়া উচিত ছিল।

উ। তা হইতেন, কিন্তু একটা গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন যে!

সৌ। (সিদ্দিকার কানে কানে) তুমিও তো মোটাসোটা হও না, ঐ আঘাতের ভয় তুমিও পাইয়াছ না কি?

ইহাতে সিদ্দিকা রাগ করিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেলেন।

সিদ্দিকাকে অপর ভগিনীদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একা দেখিয়া লতীফ ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে কী বলিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু কী বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া নীরবে তাঁহার দর্শনসুধা পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখটুকুও অধিকক্ষণ রহিল হইল না, কারণ রফিকা ও সৌদামিনী তথায় আসিলেন।

রফিকা (বাসায় ফিরিয়া যাইতে যাইতে সিদ্দিকার হাত ধরিয়া) আপনি নিশ্চয় আমাদের বাসায় আসিবেন, আপনার কোনো আপত্তি আমি শুনিব না।

সি। বেশ; কিন্তু আপনাকে আমাদের 'নারী-ক্লেশ নিবারণী-সমিতি'র সভ্য হইতে হইবে। বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা মাত্র।

র। (উচ্চহাস্যে) 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী-সমিতি?' এমন নাম তো কখনো শুনি নাই 'পশু-ক্লেশ-নিবারণী-সভা' আছে জানিতাম। বেশ বেশ! আমি নিশ্চয় সভ্য হইব।

সি। এমন সমিতির প্রতি সমস্ত নারীজাতির সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। (সিদ্দিকার প্রতি) আমার মাতাকেও সভ্য করুন; এই নিন তাঁহার চাঁদার টাকা।

ল। সৌদামিনী দিদি এ সমিতির সম্পাদিকা, টাকা তাঁহাকে দিন।

সৌ। না, সকিনাবু কোষাধ্যক্ষ, টাকা তিনিই লইবেন।

ল। তাহা হইলে দেখিতেছি যথাবিধি সভার কার্য সম্পন্ন হয়।

সৌ। তাহা নহে তো কি ছেলেখেলা? এবার সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে, আপনি দয়া করিয়া নূতন সভ্যদের সহিত যোগদান করিবেন।

উ। হাঁ, মি. আলমাস, আপনি নিশ্চয় সকলকে লইয়া কলিকাতায় আসিবেন; সে সময় তারিণী-বিদ্যালয়ের কুড়ি বৎসরের জুবিলি এবং পুরস্কার বিতরণ হইবে।

ল। বহু ধন্যবাদ। আল্লাহ চাহে নিশ্চয় যাইতে চেষ্টা করিব।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আগুনের সৌন্দর্য

সিদ্দিকা আর কোথাও বাহির হয়েন না। যদি লতীফের সহিত দেখা হয়—এই ভয়ে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন না। কয়দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে ভীষণ তুফান চলিতেছে তাঁহার অবাধ্য হৃদয় আপন মনে একদিকে বহিয়া যাইতে চাহে—তিনি বারণ করেন।

সিদ্দিকা বাহির না হইলে কী হইবে? লতীফ প্রায় প্রতি সপ্তাহে মাসি ও ভগিনীরা 'ভগিনী'দের তাঁবুতে আসিতেন। এই সময় 'ভগিনী'দের সহিত তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠত

জন্মিল। রাফিয়া এবং সকিনা তাঁহার আত্মীয়া—রাফিয়া সম্পর্কে মাসতুতো ভগ্নী এবং শ্যালক-পত্নী; আর সকিনা এক সম্পর্কে ভগ্নী, অন্য সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ ঊষা এবং সৌদামিনী তাঁহার 'দিদি' হইয়া তাঁহার সহিত 'তুমি' সম্বোধনে কথাবার্তা কহিতে সম্মতা হইয়াছেন। তিনি কেবল সিদ্দিকাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু সিদ্দিকা-জয়ের চেষ্টা ত্যাগ করেন নাই।

অভাগিনী সিদ্দিকা ভাবেন, তারিণীভবনে তো সকলেই সুখে আছেন, কেবল তাঁহার মনে শান্তি নাই কেন? সৌদামিনীও জ্বলিয়া পুড়িয়া এখন শান্তি লাভ করিয়াছেন। সিদ্দিকার এ দাহক্রিয়া কতদিনে শেষ হইবে? আরও ভাবিতেন, ইংরাজ ভগিনীদের কোনো জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। তাঁহারা পরম সুখী।

সকালবেলা তাঁবুর বারান্দায় বসিয়া হেলেন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন—অন্যমনস্কভাবে সহসা বলিয়া উঠিলেন : 'Oh poor thing! (আহা! গরিব বেচারি!)'

'কেন দিদি! ও কথাটা বলিলেন, কেন?' নিকটে যে আর কেহ ছিল, হেলেন তাহা লক্ষ করেন নাই। সিদ্দিকার প্রশ্ন শ্রবণে চকিতের ন্যায় ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'ও! সিদ্দিকা, তুমি তাহা শুনিয়া কী করিবে?'

সিদ্দিকা। বলুন না, 'poor thing' কাহাকে বলিলেন?

হেলেন। মনে কর, তোমাকে বলিলাম।

সি। আমাকে বলিলেন কেন? আমি কিসে দয়ার পাত্রী?

হে। এই দেখ না, মিস স্টার এতকাল অবিবাহিতা থাকিয়া এখন বিবাহ করিয়াছেন।

সি। তাহাতে তিনি দয়ার পাত্রী হইলেন কেন?

হে। ঈশ্বর করুন, তিনি সুখী হউন। আমার ভুক্তভোগী হৃদয় কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলেন স্বতঃই আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে।

সি। কেন দিদি, কিসের আশঙ্কা? বিবাহ-সংবাদ তো আনন্দের বিষয়।

বারান্দার অপরপ্রান্তে রাফিয়া, সকিনা ও ঊষা বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; হেলেন তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, 'ঐ-দেখ উহারা সকলেই বিবাহিতা—'

তাঁহাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ হইল দেখিয়া রাফিয়া সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাদের কী নিন্দা করিতেছেন, হেলেন দিদি?'

হেলেন সিদ্দিকার হাত ধরিয়া তাঁহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন—এই দেখ, ইহাদের সকলেই বিবাহ-জীবন 'ফেল' (fail) হইয়াছে। এই-যে রাফিয়া বেগম, ইনি বড়ঘরের কন্যা, ততধিক বড়লোকের স্ত্রী; কিন্তু তোমাদের দেশীয় প্রথা অনুসারে সধবার চিহ্নস্বরূপ হাতে একগাছি চুড়ি পর্যন্ত নাই! ঐ যে সকিনা খানম, উনিও অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা, নোয়াখালীর জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল, মিস্টার কী 'খান'—নামটা এখন আমার মনে পড়ে না,—তাঁহার স্ত্রী; কিন্তু দেখ অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই। কেবল ঊষারাণী শাঁখা খুলিতে পারেন নাই—'ছাড়ব না হাতের শাঁখা, ঐ সধবার নিশানা'।

ঊষা। হেলেনদি! তুমি আজ আমাদের 'বিয়ে ফেল'-এর আলোচনা লইয়া বসিলে কেন?

সকিনা। সম্ভবত সিদ্দিকাবুকে সাবধান করিতেছেন।—আমিও বলি, ভাই পদ্মরাগ। তুমি বিবাহ করিও না, সাবধান।

রাফিয়া। কিন্তু 'আলমাস' আসিয়া জুটিলে তোমার সতর্কবাণী মনেও থাকিবে না—

উ। মি. আলমাস আসিলে দূরে হইতে নমস্কার করিও—ধরা দিও না।

সিদ্দিকা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বলিলেন—'উঁহুঁ, বুঝিয়াছ। আলমাস' শব্দের অর্থ হীরক। সকিনাবু আমায় 'পদ্মরাগ' বলিলেন তাই রাফিয়াবু পরিহাস করিয়া 'আলমাস' বলিয়াছে।'

উ। হাঁ, হাঁ, আমিও তাহাই বলি, হীরা আসিলে চুনি যেন দূর হইতে নমস্কার করিয়া সরিয়া পড়ে!

হে। সিদ্দিকা, এখন তুমি বুঝিলে তো যে বিবাহ আনন্দের বিষয় নহে। নতুবা ইহারা গৈরিকবসনা ও নীলাম্বরধারিণী সন্ন্যাসিনী হইতেন না।

সি। ইহাদের বিবাহ কিরূপে বিফল হইয়াছে, তাহা শুনিলাম না।

উ। উনি একেবারে প্রত্যেক্ষ প্রমাণ চাহেন। পদ্মরাগ সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন।

হে। তবে শুন। এই-যে রাফিয়া বেগম, ইনি জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের পত্নী। বিবাহের তিন বৎসর পরে ইহাকে মাত্র দুইটি শিশুকন্যাসহ রাখিয়া তিনি ইংলন্ড যাত্রা করেন। সাধারণত লোকের ব্যারিস্টারি শিক্ষা করিতে তিন বৎসর লাগে। কিন্তু উহার প্রিয়তম ঝাড়া দশটি বৎসর ইংল্যান্ডে রহিলেন। ইনি পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান করিয়া বিরহের সেই সুদীর্ঘ দশ বৎসরের দিন একটি একটি করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই দশ বৎসর ইনি দুধের সর ও আম্রফল খান নাই—যেহেতু তাঁহার প্রিয়তম ইংলন্ড ঐ দুইটি জিনিসে বঞ্চিত ছিলেন—

রা। যান, হেলেন দি। আপনি ও-সব কী বলেন—

হে। সত্য ঘটনা বলিতেছি—কাব্য-উপন্যাস নহে। ইহার প্রিয়তম ইংলন্ড গিয়া প্রথম বৎসর সপ্তাহে ৭ খানি পত্র পাঠাইতেন; দ্বিতীয় বৎসর সপ্তাহে ৩ খানি—পর বৎসর সপ্তাহে ১ খানি, ক্রমে মাসে-দুইমাসে ১ খানি পত্র পাঠাইতে লাগিলেন। রাফিয়া বেগম তাহাতেও দুঃখিত ছিলেন না। জ্যেষ্ঠা কন্যাটি ৫/৬ বৎসরের হইলে শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গে নিজেও পিয়ানো, সেতার প্রভৃতি বাজাইতে এবং প্রাণপণে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ইংলন্ড-প্রত্যাগত স্বামীর উপযুক্তা ভার্যা হইতে পারেন—স্বামীর সহিত ইংরাজিতে প্রেমালাপ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই সকল সাধনা।

রা। ও হেলেন দি! আপনি চুপ করিবেন না?

হে। এই চুপ করিতেছি, আর অধিক কিছু বলিবার নাই। স্বামীকে চমৎকৃত করিবার জন্য সুমার্জিত ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিলেন। স্বামী দুইমাস পরে একটা যেন-তেন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া চরিতার্থ করিলেন। ইনি তবু দুঃখিত হন নাই। ক্রমে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল। আর দুই বৎসর পরে আসিবেন, আর এক বৎসর বাকি! এখন ছয়মাসেও একখানা পত্র আইসে না—না আসুক, তিনি আসিলে একবার সুদে-আসলে শোধ লওয়া যাইবে। ইহার কী চমৎকার ধৈর্য! প্রিয়তমের আগমনের আর মাত্র ১৫ দিন বাকি! এই সময় তাঁহার দেবর তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, যেন তিনি কোনো রেজিস্ট্রিপত্র গ্রহণ না করেন। স্বামীর আগমনের ১২ দিন পূর্বে তাঁহার ইনশিওর করা পত্র আসিল। ছয়মাস পরে এতবড় একখানি ইনশিওর করা পত্র—ইহা কি ফেরত দেওয়া যায়? দেবর হয়তো অন্য লোকের পত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। স্বামীর পত্র স্ত্রী গ্রহণ করিবেন না, এ কী কথা? তবু তিনি ডাকপিয়নকে পরদিন আসিতে

বলিয়া পত্রখানি ফেরত দিলেন। অপরাহ্নে দেবরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে সে পত্রের বিষয় বলিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন—'না, ভাই-এর পত্র গ্রহণ করিবেন না। ইস্! ছয়মাস পরে পত্র লেখা হইয়াছে! আপনি পত্র ফেরত দিলে তিনি শিক্ষা পাইবেন যে, আপনিও রাগ করিতে জানেন।'

হতভাগা ডাকপিয়ন আবার পরদিন এমন সময় আসিল, যখন কোনো পুরুষমানুষ বাড়িতে ছিলেন না। রাফিয়া বেগম ভাবিলেন, এতকাল পরে পত্র আসিল, ইহা প্রত্যাখান করি কোন্ প্রাণে? আর দশদিন পরেই তো তিনি আসিবেন, তখন বুঝিয়া লইব। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পত্রে না-জানি কতই ভালোবাসার কথা আছে। দীর্ঘকাল নীরব থাকার বিস্তারিত কৈফিয়ৎ আছে। সুতরাং তিনি যথাবিধি স্বাক্ষর দিয়া পত্র গ্রহণ করিলেন। অতি আগ্রহে তৃষাতুরা চাতকীর ন্যায় পত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন—

রাফিয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হেলেনও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। সিদ্দিকা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ঊষা এবং সকিনাও বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—'থাক, আমি আর শুনিতে চাহি না।'

হেলেন অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন—'এইটুকুই তো গল্পের প্রাণ। শুন—তিনি পত্রের মোড়ক খুলিয়া দেখিলেন, তাহা সুবিস্তৃত ত্যাগপত্র (তালাকনামা)। তিনি ত্যাগপত্র দিয়াছেন, ইনি স্বাক্ষর দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল!! এইরূপে ১৩ বৎসরের বিবাহ-বন্ধন কলমের এক আঁচড়ে শেষ হইল। তিনি তো ইংলন্ড হইতে মেম লইয়া আসিলেন, রাফিয়া পাগল হইয়া গেলেন?—'

সকিনা।

আততায়ী একবার দেখিল না ফিরে,
অর্ধমৃত কী প্রকারে ছটফট করে। *

হে। সুচিকিৎসার ফলে প্রায় তিন বৎসর পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরে কী জানি কী কৌশলে তিনি ও সকিনা একত্রে তারিণীভবনে আসিয়াছেন। পাঁচ বৎসর হইতে তাঁহারা এখানে আছেন। রাফিয়া মিসিস সেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হইয়াছেন। সকিনা রোগী-সেবা (নার্সিং) শিক্ষা করিয়াছেন।

সি। আর তাঁহার কন্যাদ্বয়?

হে। যথাকালে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

স। মিসিস হরেস, আপনি তো রাফিয়া-বুর ইতিহাস বলিলেন, কিন্তু নিজের পাগলটার গল্প বলেন না কেন?

উ। হাঁ, সে গল্প তুমি বল; তুমি সে সংবাদপত্রের পাতা কাটিয়া (কাটিং) রাখিয়াছ।

হে। তাহা হইলে সকিনাবু, আমি তোমারও বিবাহ-রহস্য বলিয়া দিব।

স। বলিবেন, সে তো আর প্রেমকাহিনী নয়। তবে শুন :

হেলেন-বিবাহ কথা অনল যেমতি
ব্যথিতা সকিনা ভণে শুনে দয়াবতী।

দয়া এবং মমতার প্রতিমা হৃদয়বতী সিদ্দিকা সত্যই ঐ কথা—ঐ অনলের তরল বৃষ্টিধারা তৃষিতা চাতকীর ন্যায় পান করিতেছিলেন!

* 'না মোড় করে বে-দরদ কাতিল নে দেখা
তড়পতী রহী মীমজান কেয়সে কেয়সে'।

সকিনা। বিবাহের তিন বৎসর পূর্ব হইতে হেলেনদি মি. জোসেফ [illegible] জানিতেন। তিন বৎসরের পরিচয়ের পর তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া [illegible] করিয়াছিলেন। এক বৎসরকাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল। তখন জানিতেন না, [illegible] 'ফুলের মালা'—প্রকৃত ফুলের মালা ছিল না, কিছুদিনের জন্য রূপান্তরিত হইয়াছিল মাত্র।

বিবাহের দ্বিতীয় বৎসর হইতে তিনি সুরাসক্ত এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুক্রিয়াসক্ত হইলেন। রাত্রি ১২/১ টার পর বাড়ি আসিয়া দিদির উপর 'মাতলামি ঝাড়িতেন! রাগারাগি, গালাগালি দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। সময় সময় প্রহারও চলিত। অদ্যাপি ইহার সঙ্গে প্রহার-চিহ্ন আছে। ইনি সেসব 'শারীরিক ও মানসিক' যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সুযোগ পাইলেই পলায়ন করিতেন, ইনি খুঁজিয়া ধরিয়া আনিতেন।

সি। পলায়ন করিতেন কেন?

স। মরিতে। অপরিমিত সুরাপানে অজ্ঞান হইয়া থাকিতেন। ইনি সেই অবস্থায় ধরিয়া আনাইতেন। অবশেষে হাজারীবাগ হইতে যে পলায়ন করিলেন, তখন আর ইনি কোনো সন্ধান পাইলেন না।

বহুদিন পরে জনশ্রুতি শুনা গেল, তিনি কানপুরে নরহত্যা করিয়া পুলিশ-কর্তৃক ধৃত হইয়াছেন। দিদি সেইখানে গেলেন। যাইয়া শুনিলেন, হরেস নামক এক ব্যক্তি বদ্ধ-পাগল বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাঁহাকে ইংলন্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। হেলেনদিও পাগলিনী-প্রায় সেই পাগলের অনুসরণে 'ঘটি-বাটি' বিক্রয় করিয়া ইংলন্ড যাত্রা করিলেন।

ইংলন্ডে গিয়া জানিতে পারিলেন, মি. হরেস মিস রিভা সন্ডার্স নাম্নী কোনো যুবতীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে ধরা পড়িয়াছেন এবং আরও একজন লোককে হত্যা করিয়া ব্রোডমুরে 'ক্রিমিন্যাল লুনাটিক এসাইলামে' ('অপরাধী-বাতুলাশ্রমে') বন্দি আছেন। তখন ইহার মাতা জীবিত ছিলেন। তিনি এই সুযোগে হরেসের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া হেলেনদিকে আদালত কর্তৃক 'ডিক্রি নিশি' দেওয়াইলেন। কিন্তু রিভা উক্ত কলঙ্কের বিরুদ্ধে আপিল করিয়া নির্দোষ বলিয়া মুক্তি পাইল। এদিকে রিভার মুক্তিতে হেলেনের 'ডিক্রি নিশি' পণ্ড হইল। আহা! বলিহারি যাই ইংরেজ আইনের! হেলেনদি আবার আপিল করিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, আপিলের লর্ড চতুষ্টয় একবাক্যে বলিলেন—'মিসিস হেলেন মেরি হরেস তাঁহার স্বামী লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিসিল জোসেফ হরেস হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না।'

তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রায় তিন বৎসর হইল সংবাদপত্রে 'পাগলের সহিত চিরজীবনে বাঁধা' ('Tied for life to a lunatic') শীর্ষক এক বিলাতি বিচারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দেখ, আমি সে কাগজখণ্ড সযত্নে রাখিয়াছি। কোনো কোনো বিচারকের একটু হৃদয় আছে, তাই লর্ড বার্কেন হেড, স্বীয় রায়ে বলিয়াছেন—'আমাদের বিবাহ আইনের এই হতভাগিনী-'বলি'র প্রতি অবশ্যই আপনাদের সহানুভূতি আছে।... ইহা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এ বেচারী চিরজীবন একটা নরঘাতক, ভয়ঙ্কর অত্যাচারী নিষ্ঠুর বাতুলের সহিত আবদ্ধা থাকিবেন ... অনেকে আমাদের এই বিচার নিষ্পত্তিকে কঠোর ও অমানুষিক মনে করিবেন—কিন্তু ইহাই হইতেছে ইংলন্ডের আইন। ...ইহার প্রকৃত প্রতিকার আইন-আদালতের বাহিরে।'

ফল কথা, ইংলন্ডের আইন হেলেনদিকে বাতুলের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে পারিল না। হরেসের বাতুলতার বিষময় ফল হেলেনকে ভোগ করিতে হইবে। ইহা

অপেক্ষা অবিচার-অত্যাচার আর কী হইতে পারে? এই ইংলন্ড—এই পূতিগন্ধময় পচা ইংলন্ড আবার সভ্যতার দাবি করে!

হে। এজন্য তুমি দুঃখ কর কেন সকিনাবু'? তুমিও তো তোমাদের দেশের আইন ও আচারপদ্ধতির উৎসর্গীকৃত 'বলি'!

স। আমাদের দেশ তো অসভ্য পরাধীন দাসাধম দাস—তাহার সর্বাঙ্গে কলঙ্ক-কালিমা। কিন্তু তোমাদের যে শাদা ধবধবে দেশ! এখন আমি 'ইতি' করি—এইরূপে হেলেনদির সুখের দিন বড় শীঘ্র ফুরাইল। 'গাঁথা না হইতে মালা—ফুলদল শুকাইল।' সূর্যোদয়ের আনন্দটুকু অনুভব করিতে-না-করিতে সূর্যাস্ত হইল। আশালতা সবে মুকুলিত হইতেছিল, তখনই সমূলে উৎপাটিতা হইল।

হে। ভগিনী। আমি ভাবিয়া দেখিলাম—না পুড়িলে কিছুই পবিত্র হয় না। ধর্মের পথ কণ্টকময়, তাই প্রেমে ক্ষণিক সুখ নাই। যত সুন্দর বস্তু দেখ, সকলের মধ্যেই আগুন আছে। যদি জোসেফের সহিত বিচ্ছেদ না হইত, তবে আমি এ বিশ্বপ্রেম শিখিতাম না। এখন এ জ্বালাপোড়া সুন্দর বোধ হয়। জ্বলিতেই সুখ বোধ হয়। জগৎ-সংসার কেবলই জ্বলিতেছে।

সি। (অন্যমনস্কভাবে) তাই তো সৌদামিনীতেও আগুন আছে।

হে। শুধু সৌদামিনীতে কেন—প্রফুল্ল—নিলিনীতেও আছে।

সিদ্দিকা সবিস্ময়ে হেলেনের মুখ দেখিতে লাগিলেন—এ কি, হেলেন কী বলেন? ইহা রূপক নাকি? তিনি কি সিদ্দিকার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন?

হে। কী ভাবিতেছ?

সি। ভাবিতেছি—আপনি এমন সুন্দর মানুষ, আপনার বুকে আগুন আছে!

হে। তোমার মনে কি আগুন নাই?

সি। (ত্রস্তভাবে) না।

এই 'না' যেরূপ জোরের সহিত উচ্চারিত হইল, তাহাতেই যেন শত 'হাঁ' প্রকাশিত হইল। সকলে হাসিলেন। সিদ্দিকা অপ্রতিভ হইলেন।

এমন সময় ঝি আসিয়া বলিল—'মাঠাকরুনরা, আজ নাবেন-খাবেন না? বড় মাঠাকরুন (সৌদামিনী) রান্নাঘরে একলাটি বসে আছেন।'

উ। তাই তো, বেলা যে ১২টা! কিন্তু এদের যে 'প্রেমসুধা-পানে ক্ষুধা তিরোহিত হয়েছে।' এখন উঠা যাক।

হে। হাঁ উঠি, কিন্তু সকিনাবু ও উষাদির গল্প বাকি রহিল।

সি। তাহা আজি রাত্রে শুনিব।

নৈশভোজনের পর সিদ্দিকা হেলেনকে উষা ও সকিনার গল্পের জন্য ধরিলেন।

হে। সকিনার কথা রাফিয়া বেগম ভালো জানেন, তিনি তাঁহার আত্মীয়া। তাঁহাকে অনুরোধ কর।

রাফিয়া বেগম আরম্ভ করিলেন :

সে আজ প্রায় ১৭ বৎসরের ঘটনা। বিবাহের সময় সকিনার বয়স ১৫ বৎসর ছিল। উনি সম্পর্কে আমার ভ্রাতৃবধূ এবং ভাগিনীও বটেন। আবদুল গফুর খাঁ তখন খুলনায় একজন উদীয়মান উকিল। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার চরিত্রদোষ ঘটে; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইলেন। অবশেষে বিবাহরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। পরিচিত লোকেরা কেহ কন্যাদানে

সম্মত হইলেন না। ভ্রাতা তখন দূরদেশে শিকারের সন্ধান করিতে লাগিলেন। [illegible] আবদুল গফুর বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই বিবাহ করিবেন না। অনেক সাধ্যসাধনার পর সম্মত হইলেন যে, নিখুঁতসুন্দরী পাইলে বিবাহ করিবেন।

(শ্রোত্রীগণ একযোগে সকিনার প্রতি চাহিলেন, সত্যই তো তিনি পরমাসুন্দরী, যেন ডানাকাটা পরী!)

তখন বড়ভাই বলিলেন যে, চরিত্র-সংশোধন হওয়া উচিত। তিনি নিজে বেশ ভালো লোক ছিলেন; কনিষ্ঠের দুষ্ক্রিয়ার জন্য মর্মপীড়িত থাকিতেন। এবার গফুরের দয়া হইল; তিনি সুবোধ বালকের মতো সুরা এবং অন্যান্য কুক্রিয়া ত্যাগ করিলেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতা বর্ধমানে গিয়া সকিনার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিলেন কিন্তু একটা পরিচারিকা যে গুপ্তভাবে তাঁহার রক্ষিতা ছিল, তাহা কেহই জানিত না।

যথাসময় আমরা বরযাত্রী লইয়া গেলাম। বেলা (সেই পরিচারিকা)-ও আমাদের সঙ্গে গেল। বিবাহ অনুষ্ঠানের পর যখন বর-কন্যার শুভদৃষ্টির নিমিত্ত বর অন্তঃপুরে আহূত হইয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, সেইসময় বেলা বরের কানে কানে কী বলিল।

আমার বলিতে লজ্জা হয়—দূর-সম্পর্কের হইলেও তিনি আমার ভাই—সেই ভাইয়ের অমানুষিক কাণ্ডের কথা বলিতে আমি লজ্জায় অধোবদন হই। তোমরা বিশ্বাস করিবে? —বর তখনই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কন্যার মুখদর্শন করিবেন না। কারণ বেলা বলিয়াছে, 'বিবিসাব তো সোন্দর না।' কন্যাপক্ষীয় লোকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বরের ভাই রাগ করিয়া বলিলেন, তিনি খুন করিবেন। উপস্থিত লোকেরা বলিলেন, 'তুমি স্বচক্ষে দেখ, পাত্রী সুন্দরী কি না।'

বর-কন্যার শুভদৃষ্টি হইল। পরদিন বর নববধূর সমস্ত অলঙ্কার লইয়া পলায়ন করিলেন। বাড়ি গিয়া ভাইকে শাসাইলেন যে, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া একটা কুৎসিত পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, এজন্য তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে 'ড্যামেজ সুট' আনিবেন! সকিনার ভাগ্যে আর স্বামীগৃহে যাওয়া ঘটে নাই।

ভ্রাতা গফুরের মুখদর্শন বন্ধ করিলেন। কিছুদিন পরে সে বেলা মরিল। গফুর একজন বিধবাকে বিবাহ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর পরে সকিনার ভ্রাতৃত্রয় 'দেনমোহর' (স্ত্রীধন)-এর জন্য নালিশ করিয়া গফুরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এসব গোলমালে আরও দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। গফুর বেগতিক দেখিয়া শ্যালকের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন ; তাঁহারা ইহাতে সম্মত হইলেন।

গফুর আমাকে এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়া মহিলাকে সঙ্গে লইয়া বউ আনিতে চলিলেন। আমরা নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি অনেক উপঢৌকন লইয়া কনেকে ফুসলাইতে গেলাম—'আরশি আনছি, কাঁকই আনছি, চুল বান্ধনের ফিতা আনছি!'

কিন্তু সে-সব দেখে কে?—সকিনার তখন ভয়ানক জ্বর।

গফুর স্বয়ং বধূর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, মাথা টিপেন, বাতাস করেন ইত্যাদি। কিন্তু বদরসিক সকিনা তাঁহার প্রতিদান কী দিলেন, জানেন। তাঁহার জ্বর ছাড়িলে আমরা বউ লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। যাত্রার পূর্বদিন বউ বরকে পত্র লিখিলেন। গফুর আমাকে সে পত্র দেখাইলেন। আজি পর্যন্ত সে পত্রের প্রত্যেকটি শব্দ আমার বেশ স্মরণ আছে। তাহা এই :

'আদাব জানিবেন,—

'আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নয়। কিন্তু স্পষ্ট কথা এই : আপনার সহিত ইহজীবনে আমার মিলন অসম্ভব। আপনি একটা পরিচারিকার কথায় আমাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা কি

আপনার স্মরণ নাই? আপনার 'বেলা যারে 'সোন্দর' কইব, সেই হইবে 'সোন্দর'।' সে আমাকে সোন্দর বলিয়া সার্টিফিকেট না দেওয়াতে যে আমার বিবাহ 'পাস' হয় নাই, এ অপমান আমার মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত নারীজাতির প্রতি এই অপমান, আমি অদ্যাপি ভুলিতে পারি নাই। অধিক বলা বাহুল্য।

ইতি—

'আপনার পদ-দলিতা

সকিনা'

সকিনার ভ্রাত্রগণ পত্রের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। সকিনার হাত-পা বাঁকিয়া 'প্যাক' করিয়া আমাদের সহিত পাঠাইবেন বলিয়া শপথ করিলেন! অভাগিনী সকিনা দেখিলেন, সমস্ত জগৎ তাঁহার বিরোধী ; তখন অনন্যোপায় হইয়া সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে কূপে ঝাঁপ দিলেন। ভাগ্যহীনাদের জন্য মৃত্যু এত সহজ নহে! একটি দাসী তাহা দেখিতে পাইয়া কোলাহল করিল, ফলে সকিনা কূপ হইতে উত্তোলিতা হইলেন।

* * *

আমি বহুকষ্টে ভ্রাতৃত্রয়কে বুঝাইলাম যে, তাঁহারা আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন, সকিনার মন ভালো হইলেই আপনি পতি-গৃহে যাইবেন।

অগত্যা আমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত ঘটনার ৭ বৎসর পরে সকিনা স্বীয় ভ্রাতৃবধূদের সহিত কলিকাতায় আসিলেন। সে সময় আমিও উন্মাদ-রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলাম। সেই সময় দুইটি সম-দুঃখিনীতে—অর্থাৎ সকিনাতে ও আমাতে বেশ ভাব হইল। তিনি আমাকে একটি সংবাদপত্রে তারিণীভবনের বিবরণ দেখাইলেন। অতঃপর আমরা উভয়ে তারিণী-কর্মালয়ে আসিলাম। আত্মীয়গণ প্রাণপণে বাধা দিলেন, কিন্তু আমরা শুনিলাম না।

সকিনা-কাহিনী বিবৃত হলে পর সৌদামিনী ঊষার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'এখন ঊষাদির পালা!'

ঊ। আমার তো প্রেমকাহিনী নহে, তাহাতে বিরহ-বিকার নাই। সন্ধিও নহে, বিচ্ছেদও নহে।

সৌ। তবুও 'কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন-কাননে?'

ঊ। রাফিয়াদি'র পাষণ্ড, হেলেনদি'র উন্মাদ, সকিনাদি'র লম্পট মাতাল কিন্তু আমারটির এ তিন গুণের এক গুণও নাই—

সৌ। 'কানো গুণ নাই তার মুখেতে আগুন!'

স। আহা! অমন কথা বলিও না—বেচারি এই দীর্ঘ ২০ বৎসরের বিরহেও শাঁখা বুলেন নাই। এখন ভূমিকা ছাড়, ঊষাদি!' তোমার "তিনি'র গুণগান কর।

ঊ। আমার 'তিনি' কাপুরষ!

সৌ। বাহবা! নহিলে কি—'ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে তারিণীভবনে?'

ঊ। আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়িয়াছিল। তাহারা 'ভদ্রলোক' ডাকাত ছিল—পিস্তলহস্তে আক্রমণ করিয়াছিল। আমার কামরায় কেবল আমার স্বামী ও আমি ছিলাম। ডাকাতেরা পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে আমার পতি-দেবতা জানালা টপকাইয়া পলায়ন করিলেন!! আমি তখন ছেলেমানুষ, বয়স

মাত্র ১৭ বৎসর—সেই ডাকাতের হাতে আমি এক!! আমি তবু প্রত্যুৎপন্নমতি দেখাইলাম—অঞ্চল হইতে চাবির রিং খুলিয়া তাহাদের দিলাম ; অঙ্গে যা অলঙ্কার ছিল—শাঁখা ব্যতীত সমস্ত উন্মোচন করিয়া দিলাম। প্রথমে তাহারা সহিত মাতৃ-সম্বোধনে কথা বলিতেছিল ; একজন বলিল—মা লক্ষ্মী, আর কোথায় আছে, বল দেখি?' অন্য একজন বলিল—'তুমি বেশ লক্ষ্মী মেয়ে।' অতঃপর আমাকে সম্পূর্ণ একাকিনী পাইয়া তাহারা ইংরেজিতে কী পরামর্শ করিল। তখন ইংরাজি মোটেই জানিতাম না, সুতরাং তাহাদের কথা বুঝিতে পারি নাই।

দস্যুগণ আমার মুখে কাপড় বাঁধিয়া এবং হাত বাঁধিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল! গৃহদ্বার অতিক্রম করা পর্যন্ত বাড়ির কোনো লোককে দেখিতে পাইলাম না, অথচ আমার দেবর, ভাশুর প্রভৃতি ছিলেন চারিজন! আমি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া, একমাত্র বিপদভঞ্জন—অসহায়ের সহায় পরেমশ্বরকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলাম। আহা! তেমন করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে আর কখনো স্মরণ করি নাই।

অন্ধকার রাত্রি, বন্য পথ দিয়া কাঁটা-জঙ্গলে পদতল রুধিরাক্ত করিয়া দস্যুদের সহিত চলিলাম। সেই পথে তিনজন লোক লণ্ঠন হস্তে যাইতেছিল—তাহারা আমাদের দেখিতে পাইল। দস্যুগণ তখন আমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সে লোকেরা দ্রুতপদে আমার নিকট আসিয়া আমার বন্ধনমোচন করিয়া বলিল—'মা! কোনো ভয় নাই, আমরা কংগ্রেস কমিটির ভলান্টিয়ার। তোমার বাড়ি কোথায় বল ; চল, তোমায় রাখিয়া আসি।'

সেই লোক তিনটি আমাকে গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল ; একে তো পদব্রজে চলিবার অভ্যাস নাই, দ্বিতীয়ত কন্টকাঘাতে পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, সুতরাং বাড়ি পৌঁছিতে ভোর হইয়া গেল। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি করিলে আমাদের পুরাতন ঝি কেষ্টার মা আসিল। তাঁহারা আমাকে কেষ্টার মা'র হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রথমে শাশুড়ির সহিত সাক্ষাৎ হইল ; তিনি আমাকে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বড়-জা বলিলেন—'সেজ বউ! তুমি কোন্ আক্কেলে আবার এখানে ফিরে এলে?' মেজ-জা বলিলেন—'পীরিত জমেছিল ভালোই, চার জনে নিয়ে গেল ; তিন জনে দিয়ে গেল!' তখন আমি শ্বশ্রূমাতার ক্রন্দনের কারণ বুঝিলাম! সমস্ত দিন স্বামীর দর্শন পাইলাম না। জায়েরা বিদ্রূপ-টিটকারি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কহিলেন না। শাশুড়ি কেবল ক্রন্দন ক্রিয়াই করিতে থাকিলেন। আমি আকাশ পাতাল ভাবিয়া কর্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য কোনো পথ সম্মুখে দেখিলাম না। অনলে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রাত্রির জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

হে। যে কাপরুষ আপন স্ত্রীকে রক্ষা না করিয়া জানালায় লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল, তাহার জন্য কোনো দণ্ড তোমাদের সমাজে নাই?

সৌ। না—ইহ-জগতে নাই ; আশা করি পরলোকে নিশ্চয় সুবিচার আছে।

উ। সন্ধ্যার সময় কেষ্টার মা আমাকে বলিল 'বউদি! চল আমার সঙ্গে।' আমি বলিলাম—'তোমার সঙ্গে যাইব কেন?' কেষ্টার মা বলিল—'তুমি যে ডাকাতের সঙ্গে গেলা, ওনারা আর তোমাকে ঘরে নেবেন না।' আমি তাহাকে আমার আত্মহত্যার সংকল্প জানাইলে সে বলিল—'অভাগি! নিজে মরে পেতনি হবি কেন? ওনাদের মুখে কালী দিয়া পরের বাড়ি রাঁধুনির কাজ কর।' ঝির কথায় আমারও সাহস হইল ; সত্যই তো, নিজে মরিব কেন? যাঁহারা আমার এ লাঞ্ছনার কারণ, তাঁহাদের মুখে কালী দিব।

আমি হাতের নিকট আর কিছু না পাইয়া আমার সপ্তমবর্ষীয়া ননদ, গুমন্ত মিনির হাতের বালা দুইটি লইয়া ঝির সঙ্গে এক বসনে চলিলাম।

চারি পাঁচদিন পরে ঝি আমাকে বলিল যে, আমার জন্য রাঁধুনির কাজ ঠিক করিয়াছে, আগামী পরশ্ব তথায় লইয়া যাইবে। কিন্তু কেষ্টার বউ আমাকে চুপি চুপি বলিল যে, আমাকে তাহার শাশুড়ি কোনো পতিতা স্ত্রীলোকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে! আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। কিঞ্চিৎ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া দীননয়নে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম—'বউ! তবে আমার কী হবে?' সে কাঁদিয়া ফেলিল। পরে সে আমাকে বলিল, তাহারা কলিকাতায় যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে লাইয়া যাইবে।

পরদিন কেষ্টা চাকুরি উপলক্ষে বউ-সহ কলিকাতায় যাইবে, আমি লুকাইয়া তাহাদের সঙ্গী হইলাম। কেষ্টার শাশুড়ি একটা স্কুলে দাসীবৃত্তি করে আমি তাহার সহিত সেই বালিকা-স্কুলে রাঁধুনির কাজে গেলাম। পরে জানিলাম, সে 'স্কুলে' তারিণী-কর্যালয়। আমি তো এক বসনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম ; সে কাপড়খানি অত্যন্ত মলিন হইয়াছিল। অন্য কাপড় কিনিবার সুবিধা হয় নাই, কারণ সেই বালা দুইটির বিনিময়ে কেষ্টার বউ আমাকে কলিকাতায় আনিয়াছে, এই যথেষ্ট।

আমি কেষ্টার শাশুড়ির সহিত মিসিস সেনের সম্মুখে আনীতা হইলে, তিনি আসন ত্যাগ করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন! আমি তো অবাক! এত স্নেহ আমার জন্য! আমি অত্যধিক কৃতজ্ঞতায় আনন্দে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলাম। তিনি তখনই আমাকে স্নানাগারে পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় পক্ষকাল পরে স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন করিলাম।

• • •

মিসিস সেন আমাকে নিজ ব্যয়ে উচ্চশিক্ষা দান করিলেন। মাত্র তিনটি নম্বরের জন্য আমি বি.এ. ফেল কইয়াছি। অতঃপর ট্রেনিং পাস করিয়াছি, এখন আমি তারিণী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষায়িত্রী।

সি। সামাজে এইসব নালিঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলের সহিত চিরজীবন আবদ্ধ থাকিতে হইবে, বিনাকারণে পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অবমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহেদর ভাই হাত-পা বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ন উল্লঙ্ঘনে পলায়ন করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে—হইহার কি কোনো প্রতিকার নাই?

সৌ। আছে! সে প্রতিকার এই তারিণীভবনের 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সমিতি'। এস, যত পরিত্যক্তা কাঙ্গালিনী উপেক্ষিতা অসহায়া লাঞ্ছিতা,—সকলে এস। তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা! আর তারিণীভবন আমাদের 'কেল্লা'।

হে রাফিয়াবু'র অকারণ 'তালাকের' বিরুদ্ধে কোনো আইন নাই কি?

রা। থাকিলেও আমি তাহার শরণ লইতে ঘৃণা বোধ করি! যে নিষ্ঠিবনের মতো পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখা কেন?

স। আমিও তো ঐজন্যই তারিণীভবনে আসিয়াছি। আমি দেখাইতে চাহি যে, দেখ, তোমাদের 'ঘর-করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে! স্বামীর 'ঘর-করাই' নারী-জীবনের সার নহে। মানবজীবন খোদাতলার অতি মূল্যবান দান—তাহা শুধু 'রাঁধা-উননে ফু-পাড়া আর কাঁদার' জন্য অপব্যয় করিবার জিনিস নহে! সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিতেই হইবে।

উ। তাহা হইলে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালির ঘরে ঘরে অশান্তির চিতা জ্বালিবে যে!

রা। চাহি না, শান্তি। চাহি না, মৃত্যুর মতো নিষ্ক্রিয় ক্লীব শান্তি!! আর এই

'অবরোধ'প্রথার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে*—এইটাই যত অনিষ্টের মূল! [illegible] হজম করিয়া 'অবরোধ'-প্রথার সম্মন রক্ষা—আর নহে!

হে। আমিও একবার আকাশপাতাল আলোড়ন করিয়া দেখিব, ইংলন্ডের এই [illegible] আইন পরিবর্তিত হয় কি না।**

রাত্রি অধিক হওয়ায় সকলে শয়ন করিলেন। সিদ্দিকা আগুনের সৌন্দর্য [illegible] ভাবিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

স্বয়ং কবিতা

অপরাহ্নে উষা, রাফিয়া, সিদ্দিকা ও সৌদামিনী পীরপাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সৌদামিনী ও সিদ্দিকা একখণ্ড পাথরের উপর উপবেশন করিলেন ; রাফিয়া ও উষা অন্যদিকে গেলেন।

সৌ। আর কতক্ষণ বসিবে?

সি। আজি একটু দেখিতে চাই সূর্যটা অস্তকালে কেমন দেখায়। পাহাড়-ভ্রমণ এই শেষ।

সৌ। তবে অনেকক্ষণ বসিতে হইবে। আমার আপত্তি নাই। দেখি, উষা কোন-দিকে গেলেন।

সি। দিদি, তুমি যদি একটু জল আনিতে পারিতে—আমার বড় তৃষ্ণা—

সৌ। তবে তুমি বস, আমি দেখি, এখানে কাহারও নিকট জল পাই কি না।

সৌদামিনী চলিয়া গেলে সিদ্দিকা নিবিষ্টচিত্তে মুগ্ধনেত্রে প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া মোহিত হইতেছিলেন। আকাশে নানাবর্ণের আলকমাল, পশ্চিমে সুবর্ণ রবি, নীচে এই বিবিধ তরুলেতা-শোভিত সৌম্য মহান পীরপাহাড়—এত সব কাব্য দেখিয়া সৃষ্টিকর্তার শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া কি থাকা যায়?

---

* 'অবরোধপ্রথার মস্তক চূর্ণ' কথাটা শুনিয়া পাঠক-পাঠিকা কর্ণে আঙুলি দিবেন না, দেহাই আমাদের 'শরিয়ত' অনুযায়ী অন্তঃপুর এবং ভারতীয় 'অবরোধ' —ইহা সম্পূর্ণ দুইটি বিভিন্ন বস্তু ছয় বৎসর পূর্বে 'আল-এসলাম' পত্রিকায় কোরআনশরীফ ও হাদিসের দলিলসহ এ-সম্বন্ধে একটি অতি চমৎকার প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে যে, 'পরদার' সহিত 'অবরোধ' প্রথার কোনো সম্পর্ক নাই। 'শরীয়ত' আমাদিগকে 'পরদায়' (বস্ত্রাবৃতা) থাকিতে বলে, 'অবরোধবন্দিনী' থাকিতে কখনো বলে না। এই কথা লাহোরের জ্ঞানবৃদ্ধ মওলানা সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেবও বলেন। যাহা হউক, এ-স্থলে সে সব বিষয় আলোচ্য নহে।

** ইংরাজী সংবাদপত্রের সেই কাটিং হইতে এই অংশ অবিকল উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না যথা : —

'Referring to Lord Birkenhead's sympathy she said :—'He could hardly say less could he? But I refuse to be down-hearted... But now I feel if it is required of me I must come forward and help in securing alternation of the law. I'll do anything to secure that." ইংরাজ-ললনার উপযুক্ত উক্তি!

এখন— 'গৃহ কারা বন্দিনী লাঞ্ছিতা জাগো।
বাংলার ভগিনী, বাংলার মাগো।'

অদ্য সিদ্দিকা বড়ই ম্রিয়মানা ; কত কী ভাবিতেছেন, সে দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। কী যেন ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; চক্ষে দুই-চারি বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিতেছেন, পিপাসাও ক্রমে প্রবল হইতেছে। সৌদামিনী কখন ফিরিবেন, সেই আশায় পথ দেখিতেছেন।

কাহার মৃদু পদশব্দ শ্রুত হইল—বুঝি সৌদামিনী আসিতেছেন। সিদ্দিকা অভিমানে মাথা তুলিয়া না দেখিয়াই বলিলেন, 'তুমি এখন আসিলে! আমি তো ভাবিয়াছিলাম, তুমি আর আসিবে না। তোমার জন্য পথ দেখিতে দেখিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—বলিতে বলিতে সহসা মুখ তুলিয়া দেখেন, সে তো সৌদামিনী নহেন—সে যে লতীফ!

লতীফ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।—একি! সিদ্দিকা, যাঁহাকে তিনি পাষাণপ্রতিমা বলিয়া জানেন—সেই পাষাণপ্রতিমা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন?—কেন? অত আশা করা যাইতে পারে না। তিনি ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সিদ্দিকা! তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলে? ইহা কি সত্য না আমার শুনিবার ভুল?'

সিদ্দিকা নিস্তব্ধ হইলেন। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন যে, না দেখিয়া কেন কথা কহিলেন। এখন যদি পর্বত বিদীর্ণ হইত তবে বেশ হইত—সিদ্দিকা তন্মধ্যে লুকাইতেন! কিন্তু পর্বত দুর্ভেদ্য পাষাণ! ভালো হইত, যদি লতীফ উত্তর না পাইয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহাও তো হইল না।—লতীফ সম্মুখস্থিত শিলাখণ্ডে বসিলেন।

সিদ্দিকা। (মৃদুস্বরে) আমি আপনাকে বলি নাই।

লতীফ। তবে কাহাকে বলিলে। এখানে তো আমি ছাড়া আর কেহ নাই।

সি। আমি সৌদামিনীদি'র জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি আপনাকে তিনি ভ্রমে ও-কথাগুলি বলিয়াছি—ক্ষমা করিবেন। সে যাহা হইক, আপনি এভাবে আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন কেন? আর এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে 'তুমি' বলিতেছেন কেন?

ল। তোমাদের তারিণীভবনে তো সকলেই পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকেন এবং 'তুমি' সম্বোধনে কথা কহেন। তুমি কি সে নিয়মের বাহিরে?

সি। আমি সে নিয়মের বাহিরে নহি সত্য, কিন্তু আপনি তো তারিণীভবনের কোনো 'ভগিনী' নহেন।

ল। 'ভগিনী'গণ আমাকে 'পথে কুড়ানো ভাই' বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।

সি। আমি কখনো আপনাকে 'পথে কুড়ানো ভাই' বলি নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ল। তুমি প্রতিবাদ না করিয়া প্রতিশোধ লও—অর্থাৎ তুমিও আমাকে 'লতীফ' এবং 'তুমি' বল!

অনেকক্ষণ উভয়ে নীরব রহিলেন, কেহ কিছু বলিলেন না—যদিও বলিবার অনেক কথা ছিল। অতঃপর লতীফ মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন—'অমন করিয়া পশ্চিম আকাশে কী দেখিতেছ?'

সি। অস্তমান রবি।

ল। (ঈষৎ হাস্যে) সূর্যের তো প্রতিদিন উদয় ও অস্ত হয়, তাহাতে আর নূতনত্ব কী?

সি। নূতনত্ব নাই বটে, কিন্তু দেখুন, আজিকার এ দৃশ্য বড় মনোহর। সূর্য যাইতেছে—যেমন বড় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া গৃহে গমন করিতেছে। আর বিষাদিনী ধরণী ম্লানমুখে তাহার দিকে করুণ-নয়নে চাহিয়া আছে—যেন বলিতেছে, 'আমায় আঁধারে ফেলিয়া কোথায় যাও? একবার এদিকে দেখ!' অন্য দিকে নিবেদিত চন্দ্রমা ঈষৎ

হাসিয়া মেদিনীকে সান্ত্বনার স্বরে বলিতেছে—'চিন্তা কী? আমি আছি। আমি বিমল চন্দ্রিকা দিব!

ল। তুমি যে এমন সুন্দর কবি, তাহা জানিতাম না। আমি জানিতাম, তুমি কবিতা। তোমার নিজের সম্বন্ধে এমনই একটা কবিতাপূর্ণ গল্প বল না।

সি। আপনার জীবনের কোনো গল্প বলুন, আমি তাহাই শুনিব।

ল। আমার জীবনের এক গল্পে তো তোমরাই নায়িকা। উল্লেখযোগ্য আর কো ঘটনা নাই। তুমি স্বয়ং কবিতা—তোমার গল্প মনোরম হইবে।

সি। আপনি ব্যারিস্টারি উপলক্ষে কত জায়গায় বেড়ান, তাই একটা কিছু বলুন (সৌদামিনী আসিলেন, দেখিয়া) দিদি! তুমি বড় শীঘ্র আসিলে—আমি তো এখনো নাই!

সৌ। বালাই! মরিবে কেন? জল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে সত্য। তা তুমি তো ছিলে না যে, দেরিটা নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল!

ল। একাই তো ছিলেন, আমি সবেমাত্র আসিয়াছি।

এই সময় তথায় রাফিয়া এবং ঊষা আসিলেন।

ল। (রাফিয়াকে নমস্কার করিয়া) বেগম সাহেবাকে সেদিন প্রথম-দর্শনে চিনি পারি নাই ; পরে মা ও রফিকার মুখে সব শুনিয়াছি।

রা। তাহাতে কী হইল?

ল। কিছু না ; আপনার সঙ্গে আলাপ হইল।

রা। আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য কেহ লালায়িত ছিল কি?

ল। ইয়া আল্লাহ! আমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য কেহ লালায়িত হইবে কে আমি শাপগ্রস্ত হতভাগা!

রা। অত বৈরাগ্য দেখাইবেন না—গৃহ শূন্য হওয়া বরং সুখের বিষয় কারণ এ একটি নবীনা গৃহিণী আসিবেন!

ল। (সিদ্দিকার প্রতি) তবে শুন, একটি গল্প মনে পড়িল। একবার এক মোকদ্দমায় বালিকা আসামি ছিল।

সৌদামিনী নীচে নামিয়া তাঁহাদের গাড়ির সংবাদ আনিতে গিয়াছেন দেখিয় সিদ্দিকা বলিলেন, 'এখন আমরা তাঁবুতে ফিরিয়া যাইতেছি, আর একদিন শুনিব।

রা। গল্পটা অবশ্যই মনোহর হইবে ; আজই শুনা যাউক।

ইতিমধ্যে বালক ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, গাড়িঅলা আর অপেক্ষা করিতে চায় না।

সি। (লতীফের প্রতি) আপনার গল্প আর একদিন শুনিব।

সৌদামিনী ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন—'ও পদ্মরাগ?'

ল। 'পদ্মরাগ'!—কে?

সৌ। আমরা সিদ্দিকাকে 'পদ্মরাগ' বলিয়া ডাকি।

ল। (সিদ্দিকার সলজ্জ রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া) সৌন্দর্য হিসাবে নামটি ঠিক হইয়াছে ; কিন্তু প্রস্তরবৎ কাঠিন্যে 'পদ্মরাগ' না হইলেই রক্ষা।

সৌ। শুনিয়াছি 'আলমাস' শব্দের অর্থ হীরক। তবে হীরাও কি পাথর নহে?

উ। হাঁ দিদি! পাথরে-পাথরেই টক্কর!

তাঁহারা চলিয়া গেলে লতীফ সিদ্দিকার সেই দূরগামী মূর্তি অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন ; এবং সিদ্দিকা যে বলিয়াছেন, 'আমি কখনো আপনাকে পথে কুড়ানো ভাই' বলি নাই' সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। সত্যই তো সিদ্দিকা অন্যান্য 'ভগিনীদের ন্যায় কখনো তাঁহাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করেন নাই! কেন? আরও মনে পড়িল, সেদিন তাঁহার পত্নীবিয়োগ সংবাদে সিদ্দিকার মুখের ভাবান্তর হইয়াছিল। লতীফ ঐ গল্প উপলক্ষে সিদ্দিকাকে আরও কিছুক্ষণ আটক রাখিতে ইচ্ছুক ছিলেন :—

'পূজা উপাসনা সকলি যে ফাঁকি,
এই উপলক্ষে, দেবি! তোমাদের দেখি!'

আর সিদ্দিকা ভাবিলেন, ঐ গল্প উপলক্ষে আর একদিন লতীফের সহিত কথা কহিবার সুযোগ হইবে। আজি গল্পটা শুনিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতের জন্য আর আশা থাকিবে না!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বীরবালা

পূর্বদা লতীফ বিশেষ করিয়া রাফিয়া, সকিনা ও সৌদামিনীকে ডাকিতে আসিয়াছেন। লতীফের মাতা তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। কার্যবশতঃ তাঁহাদের যাইতে বিলম্ব হইল ; বিশেষত রাফিয়ার টাইপিং কিছুতেই যেন শেষ হইতেছিল না, তাই লতীফ প্রায় দেড়ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন। ভগিনীগণ সকলেই স্ব-স্ব কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। কেবল তিনি একবার আসিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন :—

'আমরা এখন বড় ব্যস্ত আছি। তুমি কাল আবার আসিও, ভাই! আমরা এখানে আর বেশিদিন থাকিব না। আগামী শুক্রবারে কলিকাতায় যাইব।'

পথে যাইতে যাইতে লতীফ বলিলেন—বেগম সাহেব তো চমৎকার টাইপ করিতে শিখিয়াছেন!'

রা। আপনাদেরই জুতার প্রসাদে।

ল। ওহো! কেবল টাইপিং নহে, অস্ত্র-চিকিৎসায় অর্থাৎ মিছরীর ছুরিকা প্রয়োগেও আপনি সিদ্ধহস্তা!

স। তাহাও তো আপনাদেরই কল্যাণে!

ল। তা বেশ, আমাদের কৃপায় সকিনা খানম 'সিভিং সার্জন' রাখিয়া বেগম সাহেব 'টাইপিস্ট' আর (সিদ্দিকাকে কিছু দূরে দেখিয়া) সিদ্দিকা খাতুন কী হইয়াছেন?

রা। কবি।

সৌ। সিদ্দিকা অতি চমৎকার কবিতা লিখেন ; ইংরাজি কবিতা লিখিয়া—ইংরাজ কবিদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনবার পুরস্কার পাইয়াছেন। তুমি তাঁহার কবিতা কখনো দেখ নাই?

ল। না, আমার সে সৌভাগ্য হয় নাই।

এদিকে সিদ্দিকা ভাবিলেন, আর বুঝি লতীফের সহিত দেখা হইবে না। আগামী কল্য হয়তো তাঁহারা যাইবেন। আজ তিনি লতীফের সহিত একটি কথাও কহেন নাই।

কিছু তো বলা উচিত ছিল! লতীফও তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, সেই কথা তিনি কোনো কথা বলিতেন। লতীফ হয়ত এইজন্য বিরক্ত আছেন যে, বলার অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই। কী বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন, সিদ্দি ভাবিতেছিলেন।—এদিকে লতীফ সৌদামিনী প্রমুখসহ চলিয়া গেলেন। তখন পশ্চাৎ হইতে ডাকিবেন মনে করিয়া তিনিও অনুগমন করিলেন।

লতীফ বুঝিয়াছিলেন, সিদ্দিকা কিছু বলিতে চাহেন—তাই আরও একটু ঔদাস্যভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিদ্দিকা অনুসরণ করিয়া এতদূর দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

সি। সেদিন যে-গল্প বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা যে আর শুনাইলেন না?

ল। তুমি কি সত্যই শুনিতে চাও?

সি। হাঁ, নিশ্চয় শুনিব।

ল। আগামীকল্য বলিব।

সৌ। না, আজই সন্ধ্যায়। আমাদের বিশেষ কোনো কাজ নাই, তোমার হইলে আসিও।

* *

সন্ধ্যার সময় লতীফ গল্প আরম্ভ করিলেন। শ্রোত্রী মাত্র চারিজন—সিদ্দিকা রাফিয়া ও সৌদামিনি।

ল। প্রায় আড়াই বৎসর হইল, আমি একবার চুয়াডাঙ্গায় গিয়াছিলাম। সে তখন রবিনসন সাহেব নীলের চাষ করিতেন।—

রবিনসন সাহেবের নাম শুনিয়া সিদ্দিকা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিলেন। তাঁহার ভাব-পরিবর্তন লতীফ লক্ষ্য করিলেন বটে, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিলেন :

রবিনসন জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদারের সহিত বিবাদ করেন। ঐ বিবাদ বর্ধিত হইল। সেই সময় মহম্মদ সোলেমান সাহেব (সেই জমিদার) হজ হইলেন। তাঁহার বিধবা, একটি শিশুপুত্রও জনৈকা কুমারী ভগ্নী ছাড়া আর কেহ না। তাঁহার ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্রটিও সেই রাত্রে নিহত হয়।

সৌ। ইশ! একেবারে জোড়া খুন!!

ল। তাহাই তো হইয়াছিল। প্রতিবেশিগণ বলে, সে-রাত্রে তাহাদের বাড়ি ডাকাতি সেই দস্যুরা তাহাদের হত্যা করিয়াছিল। আর তাঁহার অসহায়া বিধবা ও ভগিনী বলে সে ডাকাত আর কেহ নহে—স্বয়ং রবিনসন সাহেব ও তাঁহার দলবল। কারণ কে জিনিস চুরি হয় নাই—ভাঙিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল মাত্র ; তবে এ ডাকাত আর কে

রবিনসন কয়েকবার সোলেমান সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন, রবিনসনকে তাঁহাদের চাকরেরা চিনিত।

রবিনসন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, মিসিস সোলেমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপ দেওয়ার মোকদ্দমা আনিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত জমিদার, সম্পত্তিতে ভগিনী অংশভাগিনী হইবেন বলিয়া, নামমাত্র বিবাহ দিয়া ভগিনী চিরকাল অবিবাহিতা রাখিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার স্বামীর সহিত মিলন হইতে দেন এই কারণে ভ্রাতা-ভগ্নীতে সর্বদা মনান্তর ছিল। সেইজন্য ভ্রাতা এবং উভয়কে হত্যা করিয়া তাঁহার ভগ্নী নিজের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

রবিনসন প্রাণপণে সেই অসহায়া বালিকাকে আসামি সাজাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'সাহেব'লোক—কী না করিতে পারেন? রবিনসনের সহিত পূর্ব হইতে আমার আলাপ ছিল, তিনি আমাকে বেশ শ্রদ্ধ-সমাদরও করিতেন। তিনি আমাকে সময়ে সাহায্য করিতে ডাকিলেন। আমি তখন রবিনসনের ব্যারিস্টার হইয়া সেখানে গেলাম ; আমার দৈনিক ফি ২০০ শত টাকা।

সৌদামিনী প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—মেয়েটির বয়স কত ছিল?

ল। রবিনসন আমাকে বলিয়াছিলেন, ২৮ বৎসর ; আর স্থানীয় লোকেরা বলিয়াছিল, ১৮/১৯ বৎসর।

সৌ। 'সোনায় গোহাগা' বলিতে হয় ; নিজে হত্যা করিয়া দোষ চাপাইলেন—ভ্রাতৃহারা ভগ্নীর ওপর! (সিদ্দিকার প্রতি) কী বল পদ্মরাগ, তোমার কি বিশ্বাস হয় যে, ভগ্নী ভ্রাতৃবধ করিবেন?

সি। শুনাই যাইক না, কী হইল। বিশ্বাস না হইলেও 'সাহেবলোক' তো অপরাধী হইতে পারেন না।

উ। কিন্তু ভগ্নীর বিরুদ্ধে প্রমাণ কী ছিল?

ল। রবিনসন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সোলেমান সাহেবের পুত্র যে-ছোরায় নিহত হন, সে ছোরাখানি শ্রীমতী জয়নবের সম্পত্তি। জয়নবদের চাকরদিগকে উৎকোচ দ্বারা রবিনসন বশীভূত করিয়াছিলেন। পুলিশও তাহার করায়ত্ত ছিল। পুলিশকে তা খুনি আসামি ধরিতেই হইবে ; তাহারা সহজে একটি অসহায়া বালিকাকে 'আসামি' বানাইতে পারিলে অনর্থক অন্য আসামি ধরিবার কথা স্বীকার করিবে কেন?

এই সময় সকিনা তথায় আসিলেন দেখিয়া লতীফ তাঁহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে বলিলেন—'আপনার মনে আছে তো, 'বেলা যারে সোন্দর কইব, সেই হইব 'সোন্দর'? এ ক্ষেত্রেও 'পুলিশ যাদের আসামী কইব, সেই হইব আসামি'!!!'

স। হাঁ, আরও মনে আছে 'পুলিশ যা'রে আসামি সাজাইল, সেই ব্যক্তি খুনের দায় হইতে বে-কসুর মুক্তি পাইলেও, পুলিশ পাইল পুরস্কার দশ হাজার ট্যাকা।'

ল। রবিনসন আরও দেখিলেন, জীবন থাকিতে তিনি তাঁহাদের জমিতে সহজে নীলের চাষ করিতে পারিবেন না। কারণ জয়নব অতিময় বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। সোলেমান সাহেব ভগ্নীকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। বলিয়া তাঁহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। সুতরাং জয়নবকে ঠকানো সহজ নহে। এতএব তিনি যাহাতে কোনোমতে দেশান্তরিতা হন, রবিনসন তাহাই করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

আমি রবিনসনের ব্যারিস্টার-রূপে তাঁহার সমুদয় অভিসন্ধি ও সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ছদ্মবেশে জয়নবের বাড়ি গেলাম! বহু কষ্টে তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে উপদেশ দিলাম। শুধু উপদেশ নহে—গোপনে গোপনে তাঁহাদের পলায়নের উপায়—অর্থাৎ নৌকা ও পালকী ঠিক করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে, রবিনসন থানায় যথাবিধি সংবাদ দিবার পূর্বেই ইহারা সরিয়া পড়ুন ; পরে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে দেখিয়া লইব। রবিনসন যাহাতে আমার ওপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকেন, আমি সেজন্যও সচেষ্ট রহিলাম।

উ। তোমার মক্কেলের সহিত তুমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা কেন করিলে?

ল। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, সে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।

রা। তাহা লতীফ সাহেবের 'গুপ্তকথা'!

স। অথবা 'প্রাণের দারুণ ব্যথা" (তিনি ও রাফিয়া অপরের অলক্ষ্যে দৃষ্টি [illegible] করিলেন)।

দ্বিতীয় দিন আবার যখন মিসিস সোলেমানকে জানাইতে গেলাম যে, সমস্ত [illegible] অদ্য গভীর রজনীতে তাঁহাদের যাইতে হইবে, তখন তিনি বলিলেন যে, উনি আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তিনি পলায়ন করিবেন না। আমি বলিলাম 'কোনো ধর্মই আত্মহত্যা অনুমোদন করে না। বিশেষত মুসলমান কখনোই আত্মহত্যা করিতে পারে না। অতএব তাঁহাকে এ পাপচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করুন : এবং [illegible] প্রস্তুত থাকিবেন, আমি রাত্রি বারটার সময় পাল্কীসহ আসিব। মাত্র দুইজন দাসী লইবেন।'

যথাসময়ে সকলকে লইয়া ঘাটে পৌঁছিলে জানিতে পারিলাম, জয়নব [illegible] আইসেন নাই! আমার অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হইল, কিন্তু তখন কিছু ভাবিবার সময় নহে। মিসিস সোলেমান নৌকায় তুলিয়া দিয়া সেই পালকীসহ আবার জয়নবের সন্ধানে ছুটিলাম। তখন বর্ষাকাল, ভাদ্রমাসের শেষ, পথে জল-কাদার অন্ত নাই শারদীয় শুক্লপক্ষ হইলেও আকাশ মেঘাচ্ছান্ন—অমাবস্যা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকার। আমি কোনো বাহন সংগ্রহ করিতে পারি নাই ; সুতরাং আমাকে পদব্রজেই মিসিস সোলেমানের পালকীর অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। আপনারা আমার সেই কর্দমাক্ত মূর্তি অনুমান করিয়া দেখুন!

বাড়ি গিয়া দেখি, দালানের সমস্ত দ্বার-জানালা ভিতর হইতে বন্ধ, বাহির হইতে কোথাও কিছু দেখা যায় না। জয়নব বিবি কামরার ভিতর কী করিতেছেন তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই! আমি হাত-পা-বাঁধা লোকের মতো ছটফট করিতে লাগিলাম—আমার সকল চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যর্থ হইল!—অবশেষে রবিনসনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, অর্থাৎ জয়নব অপসারিতা হইলেন!!

জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রাঙ্গণে গেলাম! সেই মুহূর্তে শশীও মেঘমুক্ত হইল ; সেই ক্ষণিক চন্দ্রালোকে দেখি, একটি দ্বার খুলিয়া অনেকগুলি কাপড় লইয়া একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। আমি তাহার অনুগমন করিতে মনস্থ করিলাম ; কিন্তু আকাশ আবার মেঘাবৃত হওয়ায় আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সে বাড়ির পথ-ঘাট আমার পরিচিত ছিল না বলিয়া ঘোর অন্ধকারে আমি তাহার অনুসরণ করিতে না পারিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম! হইতে পারে জয়নবের কর্তব্য কঠোর—উদ্দেশ্য মহান! আর আমি কেবল ভূতের বোঝা বৃদ্ধি করিলাম!

সহসা আলোক দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। একটা খড়ের ঘরের ভিতর আগুন জ্বলিতেছি আমার তো মাথা ঘুরিয়া গেল। অতি কষ্টে বেড়া ভাঙিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম; যাহা দেখিলাম, তাহা মনে হইলে এখনো শরীর রোমাঞ্চিত হয়! সে অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দেখি কী, সেই কাপড়গুলি চতুর্দিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, তার বীরবালা জয়নব সেই অনলের মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়াইয়া!!

সৌ। উঃ! ছুঁড়ির কী সাহস! যদি আত্মহত্যাই উদ্দেশ্য ছিল, তবে বিষ খাইয়া পারিত, গলায় দড়ি দিলেও হইত। কিন্তু পুড়িয়া মরা!—কী ভয়ানক মৃত্যু!

সিদ্দিকা কোনো প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ধীরশান্তভাবে বলিলেন—'কেন দিদি, পুড়িয়া মরণটা তোমার পছন্দ হইল না?'

সৌ। না, অত নিষ্ঠুর মৃত্যু উচিত নহে। জলে ডুবিলে হইত।

ল। আমি এখন বলি যে আমার বিবেচনায়, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই করা উচিত ছিল।

সৌ। কেন উচিত ছিল, কারণ বল।

ল। তিনি হয়তো ভাবিয়াছিলেন, অন্য কোনো উপায় আত্মহত্যা করিলে দেহ নষ্ট হইতে না। পুলিশ ও ডাক্তার তাঁহার শবদেহ পরীক্ষা করিবে—এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য ছিল।

সৌ। ঠিক—ঠিক বলিয়াছ! আমার মাথায় অত কথা আইসে নাই!

ল। আমি কিরূপে তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির করিলাম, বলিতে পারি না। যখন সংজ্ঞা লাভ করিলাম, তখন দেখি, তিনি ও আমি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া—তাঁহার হাতখানি আমি ধরিয়া আছি। জয়নব তীব্রস্বরে বলিলেন—'হাত ছাড়ুন—যাইতে দিন!' যেন আমি তাঁহার নিতান্তই আজ্ঞাবহ দাস!

আমি ব্যস্তভাবে বলিলাম—'আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না, আপনি আমার—'কথাটা শেষ না হইতেই আবার হুকুম হইল—'ছাড়ুন!'

আমি পুনরায় বলিলাম, 'ছাড়িব কী,—চলুন ; আপনার জন্য পালকি আনিয়াছি—আপনার ভাবিজান আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন—আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।' কিন্তু তিনি আর এক হেঁচকাটানে হাত ছাড়াইয়া দৌড়িলেন, আমিও পিছু পিছু ছুটিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিলাম। পোড়া অঞ্চল (অঞ্চল দগ্ধ হইয়াছিল) আমার হাতে ছিঁড়িয়া আসিল! তিনি দালানের ভিতর গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

আমি কতক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনন্তর অন্যান্য লোক আলোক দেখিয়া ঘরের আগুন নিবাইতে আসিল। যৎকালে তাহার আগুন নিবাইতে ব্যস্ত ছিল, সেই সময়টা জয়নবের অনুকূলে ছিল। তিনি কী করিতেছিলেন, জানিতে পারিলাম না।

বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার আনীত সে পালকিখানা অন্তর্হিত হইয়াছে। বেহারাদেরও দেখিতে পাইলাম না। আমি আর সে পালকির সন্ধান না করিয়া আপন বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া স্নান করিলাম। তখন রাত্রি অনুমান ৪টা। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম—ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন আমি আপন মনে বনে-জঙ্গলে খুঁজিয়া নিবিড় বনে একটি কূপ দেখিতে পাইয়াছিলাম। বোধ হয়, ঐ কূপে ডুবিয়া জয়নব বিবি জীবনের জ্বালা জুড়াইয়াছেন।

আমার ব্যারিস্টারির এইটি উল্লেখযোগ্য করুণ-কাহিনী।

উ। (দুঃখিতভাবে) আজি পর্যন্তও জানো না, জয়নব বিবি মরিয়াছেন কি না?

ল। না। কিন্তু এখনো আমার মনে হয়, জয়নব সেই পালকিতে কোথাও গিয়াছিলেন—হয়ত তিনি বাঁচিয়া আছেন।

রা। কবি বলেন, 'প্রণয়ীর হৃদয় দর্পণস্বরূপ—প্রণয়িনীর অবস্থা জানিতে পারে!'

ল। বেগম সাহেবা যদি মিছরীর ছুরি সম্বরণ না করেন তবে আর আমার গল্প বলা হইবে না।

সৌ। না ভাই, তুমি বল। রাফিয়া-বু, তুমি মন দিয়া শুন। (লতীফের প্রতি) আর তাঁহার ভ্রাতৃবধূ?

ল। তিনি এখন শান্তিতে আছেন। জয়নবকে দূর করাই রবিনসনের উদ্দেশ্য ছিল। জয়নব হইতে অভিনয় শেষ হইয়াছে। এ প্রকার আত্মত্যাগ তোমাদের সেবাব্রত

অপেক্ষা কম প্রশংসনীয় নহে। খানম সাহেব সিভিল-সার্জনরূপে মানুষকে [illegible] কুটিয়া শান্তিদান—অর্থাৎ আরোগ্যদান করেন—আর জয়নব আপনাকে [illegible] চুয়াডাঙ্গাকে শান্তিদান করিয়াছেন।

স। ঐ দেখুন, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সিভিল-সার্জন যাহাকে কাটিয়া ক্ষত-বিক্ষত করেন, তাহার ক্ষত অঙ্গে আমি প্রলেপ দিয়া পটি বাঁধি। কাটাকাটি আমার কাজ নহে।

উ। রমণী শৈশব হইতেই আত্মত্যাগ শিক্ষা করে। কুমারী জীবনে পিতা ও ভ্রাতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে, বিবাহিত জীবনে স্বামীর জন্য এবং শেষে সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করে। কাহারও আত্মত্যাগ কেবল গৃহজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে—কাহারও আত্মত্যাগ সংসারময় ব্যাপ্ত হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

'জুবিলী' ও পুরস্কার বিতরণ

তারিণীভবনে ভারি ধূম পড়িয়াছে। এ বৎসর চারি-পাঁচটি বিষয়ের অনুষ্ঠান এক সঙ্গে হইবে। প্রথম দিন বিদ্যালয়ের বিংশবর্ষীয় জুবিলী, দ্বিতীয় দিন 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী সিমিতি'র অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, তৃতীয় দিন কর্মালয়ের মুসলমান ভগিনীগণ 'মিলাদ শরীফ' পাঠ ও শ্রবণ করিবেন, চতুর্থ দিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পুরস্কার-বিতরণ, পঞ্চম দিন বিদ্যালয়-পরিত্যক্তা পুরাতন 'বালিকা'দের 'চিরহরিৎ সম্মিলনী'র অধিবেশন হইবে এবং দুই দিন বিশ্রামের পর তারিণীভবনে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী হইবে। এ প্রদর্শনী এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে বিদ্যালয়ের সপ্তমবর্ষীয় বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কর্মালয়ের সকলশ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বহস্ত-নির্মিত দ্রব্যসমূহ থাকিবে।

'চিরহরিৎ সম্মিলনী' কেবল তারিণী-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীদের সমিতি; তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী ব্যতীত অপর কাহারও সম্বন্ধ নাই। তারিণী উহার নাম এইজন্য 'চিরহরিৎ' রাখিয়াছেন যে কালে উহাতে মাতা-পুত্রী উভয় শ্রেণীর মহিলাগণ সমভাবে যোগদান করিবেন। সম্মিলনীর দিন 'মাতা-কন্যা' সম্বন্ধ ভুলিয়া, উভয়ে যে এই বিদ্যালয়ের 'ছাত্রী' এই সম্বন্ধ স্মরণ রাখিতে হইবে।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া ঝি-চাকর পর্যন্ত সকলের মুখেই একটা উৎসব আনন্দের প্রফুল্লতা। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব কর্তব্যসাধনে তৎপর, প্রত্যেকেরই ইচ্ছা—তাহার ভাগের কাজ আগে সমাধা হউক। যেন 'বিয়েবাড়ির কোলাহল!'

লতীফ পুরস্কারের খেলনা ইত্যাদি ক্রয় করিবার ও ঘর সাজাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পুরস্কার বিতরণ-কারিণী মহিলাও তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। সেজন্য তিনি দেশের রানি মহারানি প্রভৃতির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতেছেন।

একবার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখা যাউক, কে কী করিতেছেন: —মিস চারুবালা দত্ত একটা আলমারী খুলিয়া পরিচারিকাদের দ্বারা তাহার অভ্যন্তরস্থ জিনিস বাহির করাইতে ব্যস্ত আছেন।

ঝি। ক্যাতাবগুলো কোথায় রাখবো মা? একটু দেখিয়ে দাও।

চারু। এস আমার সঙ্গে।

জনৈকা শিক্ষয়িত্রী।—কই, মিস দত্ত কোথা? ঐ যে! মিস দত্ত, দেখুন তো এই মেয়ে দুইটিকে 'বনদেবী' সাজাইলে কেমন হয়?

চারু। বেশ হইবে। আর তিনটি মেয়ে সংগ্রহ করুন।

অপর একজন শিক্ষয়িত্রী।—শুনুন মিস দত্ত, এ মেয়েরা বলে কী! এরা 'প্রাইজে'র দিন আসিবে না ; কে নাকি ইহাদের বলিয়াছে যে ইহারা 'প্রাইজ' পাইবে না!

চারু। সে কী! 'প্রাইজে'র দিন আসিবে বই কী!

মেয়েরা। না, আমাদে মা বারণ করিয়াছেন।

চারু। বেশ, আসিও না।

শিক্ষয়িত্রী। 'আসিও না' বলিলে চলিবে কেন, মিস দত্ত? ওরা যে 'চিহ্নে'র মেয়ে!

চারু। আপনি অন্য মেয়ে ধরুন।

উষা। অমিয়া! তোমরা বোর্ডার ছাত্রীদের লিখিত সে পদ্য—আমাকে কখন দেখিতে দিবে?

অমিয়া। আজ্ঞে, কাল পাইবেন।

উষা। বেহারা, জা'ফরী খানমকো সালাম দোও। (জা'ফরী খানম আসিলে, তাঁহার প্রতি) কেয়া খানম সাহেবা, আপকি মুসলমান লাড়কীয়োঁকা 'নজম'* কাহাঁতক হুয়া?

জা। কেয়া বাতাওঁ! কলকাত্তেকি লাড়কিয়াঁ কেয়া উর্দু বোলনে সকতী হ্যায়? হর লফজ** মেঁ বাংলা লহজা।*** ময়ঁ তো থক্ গেয়ী!

বিভা। ও ভাই মিস দত্ত! মুসলমান মেয়েদের বাঙ্গলা পদ্য বলা শুন আসিয়া! যেন কী বিপদে পড়িয়াছে!

চারু। আসি ; এই আলমারিটা বন্ধ করি আগে।

উষা। চারু-দি! তোমার কামরাটা কবে খালি করিয়া দিবে?

চারু। আর দুই দিন পরে।

উ। তুমি আজ চারি দিন হইতে আমাকে বলিতেছ—'দুই দিন পরে!'

চা। কী করি দিদি! একদণ্ড নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া জিনিসপত্তরগুলো গুছাইতে পারি না—সমস্ত দিন, 'মিস দত্ত দেখুন' আর 'মিস দত্ত শুনুন'।—আমি দশভুজা দুর্গা হইলে বেশ হইত!

উ। আমি কিন্তু দশমুণ্ড রাবণ হইতে চাই—তাহা হইলে এক একটা মাথাকে এক একটা বিষয় চিন্তা করিবার ভার দিতাম!

তারিণীর 'আফিস'-কামরাও টাইপ-রাইটারের শব্দে মুখরিত। তারিণী নিরুপমা নাম্নী শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন,—'নিরু! তোমার জুবিলী-ইতিহাস লেখা কী শেষ হইল?'

নিরু। আজ্ঞে হয়েছে। একবার ভাল করে পড়ে দেখে দিই।

তা। বড্ড দেরি করিয়া ফেলিলে, আজই ছাপাখানায় পাঠাইতে হইবে। ও রাফিয়া-বু! তোমার টাইপিং কতদূর?

রা। এখনো বহুদূরে।

(রাজমিস্ত্রী দ্বারদেশ হইতে)

'মাইজি! চূণা ঘট গিয়া।'

---

* 'নজম'—কবিতা।

** 'লফজ'—শব্দ।

*** 'লহজা'—উচ্চারণভঙ্গী

তা। আর কয় কামরা বাকি?

রাজমিস্ত্রী। আউর পাঁচ কামরা বাকি! চূণেকা রুপেয়া দিজিয়ে।

তা। সরকার বাবুসে মাঙ্গো।

(সরদার কোচম্যান দ্বারদেশ হইতে)

'হুজুর! সাত নম্বর গাড়িকা চাক্কা বদলী হোগা।'

তা। বদলো যাকে!

কোচ। পিত্তল পালিশ কা দাম দিজিয়ে।

তা। সরকার বাবুসে মাঙ্গো।

(উড়ে মালী দ্বারদেশ হইতে দন্তবিকাশ করিয়া)

'মাইজি, ম'তে আগে রঙের টঙ্কা দিউ না।'

তা। সরকার বাবুকে বলো টঙ্কা দিতে।

মালী। সরকার বাবু টঙ্কা দিউছি না—মুই কিমতি ফুলের টব রঙ্গিবুঁ? এত্তেগুলা টব

তা। আহ্ জ্বালালে! ডাক তো সরকার বাবুকে!

মালী। (সরকার বাবুকে আসিতে দেখিয়া) সরকারবাবু আসুছন্তি।

তা। সরকারবাবু! আজ এদের সবাইকে আমার পিছনে লেলিয়ে দিয়েছেন কেন?

সরকার। না মা! ওরা বড় দুষ্টু! আমি বল্লেম, সবুর কর, মার কাছ থেকে টাকা এনে দি। তা ওরা শুনলে না, উপরে চলে এল। পূর্বে যে টাকা দিয়েছেন, এই তার হিসাব নিন। আমাকে এখন আরো কিছু টাকা দিন।

তা। পদ্মরাগ, তুমি এ হিসাবের খাতাটা এখন রাখো, অন্য সময় দেখা যাইবে। আর সরকার বাবুকে ১০০ টাকা আনিয়া দাও।

বেহারা কোনো আগন্তুক ভদ্রলোকের কার্ড আনিয়া দিল।

তা। (কার্ড পড়িয়া) মি. আলমাস—আচ্ছা সাহেবকো সালাম দোও!

লতীফ অনেকগুলি কেলনা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছেন। উষা অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া বলিলেন, 'ভাই! আরো গোটা চল্লিশ পুতুল কিনিতে হইবে।'

বিভা। হাঁ, ছোট মেয়েই তো বেশি।

কোরেশা। বাঁশী, ঝুনঝুনিও আনিবেন!

ল। বেশ। একটা ফর্দ লিখিয়া দিন।

তা। মি. আলমাস, আপনি আবার এখনই চলিলেন? একটু বসুন, বিশ্রাম করুন

সৌদামিনী পরিচারিকাকে লতীফের জন্য চা আনিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তা। সৌদামিনী-দি' তোমাদের সব ঠিক হইল তো?

সৌ। আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিও না! অনেকগুলি সেলাই এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই।

তা। উষা-দি, তুমি আমায় শেষে লজ্জা দিবে নাকি? তোমাদের মেয়েদের কী কতদূর? শুনিতেছি, মুসলমান মেয়েরা নাকি ঠিকমতো বাঙ্গালা উচ্চারণ করিতে পারে না?

উ। তাহারা উর্দুও তো পারে না! যাহা হউক, চিন্তা করিও না—সময়ে সব ঠিক হইয়া যাইবে। তোমাদের পুরস্কার বিতরণকারিণীও তো এখনো ঠিক হয় নাই।

তা। (চা-পানরত লতীফের দিকে মিষ্টান্নের থালা অগ্রসর করিয়া দিয়া) হাঁ, মি. আলমাস আপনার সে মহারানির কী সংবাদ?

ল। সকালে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, দেখা হয় নাই। আবার পরশ্ব যাইব মহারানিরা বড় ভোগান, কোনো লাট মহিষীর চেষ্টা করিব?

তা। আমরা দীনা কাঙ্গালিনী-লাট-মহিষী চাহি না। অন্য কোনো রাজকর্মচারীর পত্নী হইলে চলিবে। যথা রেডী চ্যাটার্জি বা তদ্রূপ কেহ—

ল। লেডী চ্যাটার্জি এখন দিল্লীতে।

উ। ভাই বিভা, যাও তো এই মোড়ের কনেস্টবলকে বলো, তাহার স্ত্রী আসিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে পুরস্কার দিয়া যাউক।

বি। কিন্তু তাহার বেতন যে মোটে ৮ টাকা! সেও রাজ-কর্মচারী বটে, তবে বেতন অল্প।

উ। ক্ষতি কি? এই আট টাকার কনেস্টবল কালে আটশত টাকা বেতনের রায় বাহাদুর ইন্সেপেক্টর হইতে পারে! আমরা অগ্রিম সম্মান দিয়া রাখিতে চাই!

সৌ। রায়-বাহাদুর হউকই আগে!—

তা। ওহো! তখন আমাদের বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণ করিতে আসিলে তাঁহার সম্মানের ব্যাঘাত হইবে যে! আর তাঁহার স্বাস্থ্যও তখন ক্ষণভঙ্গুর হইবে।

বি। চলো ভাই পদ্মরাগ, মেয়েদের গান শুনিবে।

সি। আমি যে গানের 'গ' বুঝি না।

বি। তবে আমি একা কী করিয়া উহাদের গান ঠিক করিব?

কো। ও আর ঠিক হইবে না, উহার ভিতর 'ইন্দুর' প্রবেশ করিয়াছে!

সি। এ কী কোরেশা-বি! উহা পারমার্থিক গান—উহা লইয়া বিদ্রূপ করা উচিত নহে।

কো। এই না তুমি বলিলে—তুমি গানের 'গ' বুঝ না?

সি। গানের তান-লয় বুঝি না বটে, শব্দ তো বুঝি। 'তার মাঝে ইন্দুকে আপনি 'ইন্দুর' বলেন!'

বি। এস উষা-দি'! আর সময় নাই। যদি রাহিলা নিতান্তই স্বর মিলাইতে না পারে, তবে উহাকে ছাড়িয়া দিব।

উ। চলো—আমার ভাগের কাজে কিন্তু কেহই সাহায্য করো না। ইংরাজী কবিতা লইয়া একাই বকিয়া মরি!

কো। না, উষা-দি'! তুমি আগে আমার ড্রিল-এর অভ্যাস (rehearsal) দেখ। মিসিস সেন আমাকে যতসব কচি?? মেয়ে দিয়াছেন, তাহারা না পারে ঠিকমতো পা ফেলিতে, না পারে হাত মিলাইতে গান রাত্রে শুনিলেও চলিবে।

বি। কক্ষণও না!—গান বেশি মুস্কিল, কারণ তাহা হাত ধরিয়া দেখান যায় না!

তা। বিভা, তুমি ব্যস্ত হও কেন? উষা-দি' ড্রিল ঠিক করুণ। তোমার গানের অভ্যাস এইখানে মি. আলমাস-এর সমক্ষে করাও ; তিনি একজন ওস্তাদ।

বি। মুসলমান মেয়েরা তো উঁহার সম্মুখে আসিবে না।

ল। হাঁ, মেয়েদের এখানে আনিবার প্রয়োজন নাই। (সিদ্দিকার প্রতি)

সিদ্দিকা। তুমি স্বয়ং গাহিয়া উহাদের গান কয়টা ঠিক করিয়া দাও।

সি। বেশ বলিয়াছেন, আমি কিন্তু গানের 'গ'ও জানি না।

ল। কায়সিয়ঙ্গে থাকাকালীন আমি স্বকর্ণে তোমার হারমোনিয়াম বাদ্য শুনিয়াছি।

সি। (সলজ্জভাবে) একটু সুর-তাল জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু গলা ভালো নয় বলিয়া গাহিতে পারি না।

ল। (রাফিয়ার প্রতি) আপনি একটা গান করুন।

রা। আমি চেঁচাইতে পারি বটে, কিন্তু আমার সুর-তাল জ্ঞান নাই।

ল। বেশ।—আপনার কণ্ঠস্বর এবং সিদ্দিকার সুর-তাল—এই দুই একত্রে [illegible] আপনারা উভয়ে মিলিয়া গাহিবেন। দোহাই আপনার, আর কোনো আপত্তি শুনিব না মিস চক্রবর্তী! আপনি এই দুইজনকে ধরুন তো, আপনার গান ঠিক হইয়া যাইবে।

এ বৎসর বিদ্যালয়ের পুরস্কার ভাণ্ডারে লতীফ স্বয়ং ১০০০ (এক হাজার) টাকা দান করিয়াছেন এবং চাঁদা তুলিয়া আরও দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 'নারী-ক্লেশ নিবারণী সমিতিতেও তিনি ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মরীচিকা

যথাকালে তারিণী-বিদ্যারয়ের জুবিলী ও শিল্পি-প্রদর্শনী ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু লতীফের মাতা, ভগ্নী ও মাসিমা এখনো কলিকাতায় আছেন। মাতা অনেকটা হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন। তিনি প্রায়ই তারিণীভবনে বেড়াইতে যান ; তাঁহার আমায়িক স্নেহে তারিণীভবনের সকলেই তাঁহার ভক্ত হইয়াছে। বোধহয় তিনি যেন তারিণীভবনে কোনো হারানো বস্তুর অনুসন্ধান করিতে আইসেন অথবা মরীচিকা লক্ষ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার বিশেষ মনোযোগ সিদ্দিকার প্রতি ; পক্ষান্তরে সিদ্দিকা যথাসম্ভব তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতেন। একদিন তিনি সিদ্দিকার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'একি মা! তুমি হাতে দু-গাছি চুড়ি পর্যন্ত রাখ না, বড় বিশ্রী দেখায়।'

তারিণী তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উত্তর দিলেন, 'সুশ্রী দেখানো তো বাঞ্ছনীয় নহে। এখানে কয়েকজন হিন্দু মহিলা আছেন, তাঁহারা সুসংস্কারবশত শাঁখা ছাড়িতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, আপনাদের মুসলমান সমাজে কোনো কুসংস্কার নাই।'

লতীফের মাতা।—তুমি বেশ মুসলমান-ভক্ত মেয়ে। তোমার মতো যদি আর ২০/২৫ জন মেয়ে থাকিতেন তবে বাঙ্গালার সৌভাগ্য হইত।

লতীফের মাতা প্রায় প্রতিদিন তারিণীভবনের 'ভগিনী' ও শিক্ষয়িত্রীদের ছয়জন করিয়া এক-এক দলকে মধ্যাহ্ন কিংবা নৈশভোজনে নিমন্ত্রণ করিতেছেন—তারিণী হইতে আরম্ভ করিয়া কোরেশা, বিভা, জা'ফরী প্রভৃতি সকলের নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল শেষ ছয়জন—রাফিয়া, সকিনা, সিদ্দিকা, সৌদামিনী, ঊষা ও নলিনী—বাকি আছেন।

অদ্য রফিকা তাঁহাদিগকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমিত্ত লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সকলেই সানন্দচিত্তে যাইতে সম্মতা হইয়াছেন ; কেবল সিদ্দিকা যুক্ত করে অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রফিকা অনুনয়বিনয় আরম্ভ করায় সিদ্দিকা বলিলেন—'আপনি একবার অশ্রু-বিসর্জনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কী বারম্বার সেরূপ আশা করেন?'

রফিকা। আমি আপনার কথা বুঝিলাম না। 'অশ্রু-বিসর্জনে সিদ্ধিলাভ' কেমন? আপনার কোনো কথা আমার নিকট হেঁয়ালীবৎ বোধ হয়। সেদিন মুঙ্গেরে বলিয়াছিলেন 'আপনারাই তো আমার যাইবার পথ রাখেন নাই।' সে কথারই বা কী অর্থ?

রাফিয়া। (সহাস্য) পদ্মরাগ-প্রহেলিকা,—

'পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে,
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে!'

র। ভাবিজান, পায়ে পড়ি,—আপনি একটু বুঝাইয়া দিন!

রা। আমি নিজেই বুঝি না।

অতঃপর সিদ্দিকা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বিভাগে রন্ধন ও বাজারের তদন্ত করিতে গেলেন। মেট্রনের সুখ, তাই সিদ্দিকা তাঁহার ভাগের কাজ করিতে আসিয়াছেন। রফিকাও সঙ্গে আসিলেন।

তারিণীভবনে যেমন নানাজাতি, নানাধর্ম এবং নানাশ্রেণীর লোক আছে, সেইরূপ নানাদেশেরও পরিচারিকা—ভুটিয়া, নেপালি, বেহারি, সাঁওতাল, কোল, মান্দ্রাজি ইত্যাদি আছে। একজন গাঞ্জামি আয়া বাজার সওদা বাহির হইতে আনিয়া দিতেছিল, আর সিদ্দিকা ফর্দ দেখিয়া সেসব বুঝিয়া লইতেছিলেন। কী একটা জিনিস কম হওয়ায় তিনি আয়াকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; সে সহজে না বুঝায়, তিনি স্বর কিঞ্চিৎ উচ্চ করিয়া বলিলেন—'বাঙ্গালী দুম্বল কই?' সে তৎক্ষণাৎ বলিল—'এই এখন আনিতে যাই!'

র। (উচ্চহাস্যে) 'বাঙ্গালি দুম্বল'! এ আবার কী?

সি। আলু। উহারা আলুকে 'বাঙ্গালি দুম্বল' বলে। আপনি পানির কোনো শ্রুতিকটু নাম জানেন কি?

র। মনে হয় না। 'জল', 'সলিল' 'মা-আ', 'আব', 'বারি,'—ও-সব নামেই তো বেশ কোমল-তরল ভাব আছে ; কেবল ইংরাজি 'ওয়াটার' একটু কটমটে শুনায়।

সি। ইহা অপেক্ষা আর কোনো শ্রুতিকঠোর নাম বলিতে পারিলেন না?

র। না। আপনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন—আপনি বলুন।

সি। মাইচরেডো!

র। ও বাবা!

এমন সময় সৌদামিনী প্রভৃতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া তথায় আসিলেন। রফিকা আর একবার সিদ্দিকাকে অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হওয়ায় অপর সকলকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

• • •

আহারান্তে সকলে গল্প করিতেছিলেন। সৌদামিনী লতীফের মাতাকে বলিলেন—'না, না! আমরা সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় জানি না!'

ল-মা। রাফু মা! তুমি জানো?

রা। না, খালা আম্মা, সিদ্দিকা আমাকে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

ল-মা। বাপু! এক সঙ্গে তিন বৎসর আছ, অথচ পরিচয় জানো না!

উ। আমরা একসঙ্গে আছি বটে, কিন্তু আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকি—কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে—'তুমি কোন গগনের তারা, কিম্বা কোন বাগানের ফুল?'

ল-মা। আমি ১২/১৩ বৎসর পূর্বে একটি নবমবর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার সহিত সিদ্দিকার অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

স। মানুষের মতো কী মানুষ হয় না?

র। একেবারে অবিকল নাক-চোখ একপ্রকার হইবে কি?

স। তাহা ঠিক বলা যায় না। আমাদের বিদ্যালয়ে কয়েকজোড়া বালিকা আছে, তাহারা দুই-দুইটি একই প্রকার ; ফজীলা ও মাহমুদা—কে কোনটি তাহা আমি সহজে চিনিতে পারি না।

ল-মা। বেশ বাপু! তোমরা কেহ সিদ্দিকার পরিচয় না জানো, তাই সই। কিন্তু তাহাকে আমার পুত্রবধূ করিয়া দাও।

সৌ। সে-বিষয়ে আমাদের হাত কী?

ল-মা। মিসিস সেনকে বলিয়া এই বিবাহ ঘটাইয়া দাও।

উ। সিদ্দিকা আপনাদের জাতের মেয়ে, তাঁহার বিবাহ মিসিস সেন কী করিয়া দিবেন?

ল-মা। তিনি যে সকলের অভিভাবিকাস্বরূপা।

ন। তাই বলিয়া তিনি কাহারও বিবাহ দিতে পারেন না।

র। তিনি কাহারও বিবাহে বাধাও তো দিতে পারেন না।

ন। অবশ্যই না। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনারা তাঁহাকে কী করিতে বলেন?

র। কন্যা-কর্ত্রী সাজিয়া বিবাহ দিতে বলি।

রা। আয় রফিকা, আমি আজই তোর বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি।

র। আমার বিয়ে আর আপনাকে দিতে হয় না!

রা। তবে সিদ্দিকার বিবাহ দিতে পারে, কাহার সাধ্য? সিদ্দিকা স্বয়ংসম্মতা না হইলে কেহ তাহার বিবাহ দিতে পারে না।

স। ভালো কথা, খালাআম্মা! আপনি কি আর পাত্রী পান না? অমন সচ্চরিত্র, ধনে মানে শ্রেষ্ঠ সুপুরুষকে কে না কন্যাদান করিবে?

উ। তাই তো ; এ অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ে লাইয়া আপনারা কী করিবেন? ধনেমানে আপনাদের সমকক্ষ পরিবারে চেষ্টা দেখুন।

ল-মা। লতীফ যে আর কোথাও বিবাহ করিতে চাহে না।

স। বেশ তো। এ পোড়া ভারতবর্ষে অনেক বিধবা আছে, দুই চারিটি বিপত্নীকও থাকুন।

রা। তাই ত, বিবাহের জন্য আবার তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কেন? জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার সাধ কী আপনাদের মিটে নাই?

র। ওহ্! এতক্ষণে আমি সিদ্দিকা বিবির হেঁয়ালী বুঝিলাম! ভাইজানকে বিবাহে সম্মত করাইবার জন্য আমি-যে কাঁদিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সে-কথার খোঁটা দিয়াছেন!

ল-মা। এবার আমি পীড়াপীড়ি করিতেছি না। সে নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করুক—আমি তাহাকে সংসারী দেখিয়া নিশ্চিন্ত হই।

ন। তবে আপনি পাত্রী খোঁজেন কেন?

ল-মা। আমি তাহাকে পাত্রীর সন্ধান দিয়া বলিব, 'দেখ বাপু, এখানে এক ঘর, সেখানে এক ঘর—যে, ঘরে তোমার ইচ্ছা বিবাহ কর।'

রা। কিন্তু আপনার মনোনীত ঘরগুলির তালিকায় সিদ্দিকার নাম কেন? তাঁহার না আছে জমিদারি বিষয়সম্পদ, না আছে নগদ টাকা ও অলঙ্কার। তিনি কর্মালয়ে প্রতিমাসে ২০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন ; তাহা হইতে অতি সামান্য ৩০/৪০ টাকা

খাওয়া-পরায় ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা তিনি আবার তারিণীভবনের অর্থভাণ্ডারে চাঁদা দেন। এ হেন দীনা কাঙ্গালিনী তপস্বিনী আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল কিসে?

ল-মা। আমরা টাকার প্রার্থী নহি।

রা। আপনার বাবার এরূপ বৈরাগ্য কবে হইতে হইয়াছে?

ল-মা। চুয়াডাঙ্গার সে কন্যার বিবাহের সময় হাজিসাহেব সম্পত্তির কথা তুলিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের কোনো হাত ছিল না। সে-কথার খোঁটা আমাকে দাও কেন?

সৌ। মা, অনুমতি দিন, আমরা এখন আসি।

র। সিদ্দিকা-লাভের কোনো উপায় বলিয়া দিয়া যান।

স। আবদার মন্দ নহে!—আমরা কি সিদ্দিকাকে ধরিয়া দিব? তাহার কোনো অভিভাবক থাকিলে হয়তো তিনি সিদ্দিকাকে বাঁধিয়া তোমাদের হাতে সমর্পণ করিতেন।

সৌ। সিদ্দিকা হয়তো একজনকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। তবে?

র। তাহা হইলে আমরা তাঁহার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব।

স। ঈস! আস্পর্ধা দেখ! তুমি সিদ্দিকার পিছনে লাগিয়াছ কেন? সে বেচারি কোনো অজ্ঞাত কারণে সর্বত্যাগিনী হইয়া তারিণীভবনে একটু জুড়াইতে আসিয়াছেন।

র। জুড়াইতে থাকিলে তো' আপত্তি ছিল না—এখন যে পোড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন!

রা। যে দাহ্য, সে দগ্ধ হইবে, সেজন্য দুঃখ কী? পতঙ্গ চিরকাল পুড়িবে।

র। আর আমরা কি সিদ্দিকা বিবির ধরা পাইব না?

সৌ। বোধহয়, না। বৃথা মরীচিকার অনুসরণে ফল কী?

ল-মা। মা! তুমি কিরূপে জানিলে সে মরীচিকা? সে কি স্পষ্ট বলিয়াছে বিবাহ করিবে না?

র। বিশেষত আমার ভাইকে বিবাহ করিবেন না, এই কথা বলিয়াছেন কি?

উ। ইচ্ছা হয়, অনুসরণ করিয়া দেখুন।

লতীফ পার্শ্ববর্তী কক্ষে থাকিয়া ইঁহাদের সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, 'সত্যই এ মরিচিকা! খোদাতালা আমাকে সবই দিয়াছেন—দিলেন না কেবল 'সুখ'। আমার ভাগ্যে 'সুখ' মরীচিকা হইয়া গেল!!'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে দরবার

তারিণী 'অফিস'-কামরায় অনেকগুলি খাতাপত্র লইয়া ব্যস্ত আছেন। সিদ্দিকা তাঁহার 'পার্সনাল এসিস্টান্ট', সুতরাং তিনিও উপস্থিত আছেন। রাফিয়া এবং সিদ্দিকা তারিণীর দক্ষিণহস্তস্বরূপা। কিঞ্চিৎ দূরে আর-একটি টেবিলে রাফিয়া, সকিনা, সৌদামিনী ও উষা স্ব-স্ব কার্যে ব্যাপৃতা আছেন। এমন সময় সরকারবাবু আসিয়া বলিলেন—

'দোহাই মা! আমি আর এখানে কাজ করিব না।'

তারিণী। কেন, সরকারবাবু?

সর। মার খাইয়া যে চাকুরি করিতে পারিবে, সেই এখানে থাকিবে হট্টগোল হইয়া গেল, আপনারা তাহা শুনিতে পান নাই কি?

তা। বলুন শুনি, ব্যাপারখানা কী? কে আপনাকে মারিতে আসিয়াছে?

সর। আপনার কয়েকজন ছাত্রীর অভিভাকেরা দল বাঁধিয়া আজ আমাকে মারিতে আসিয়াছিলেন। শৈলবালার খুড়া বলিলেন—'শৈল পুরস্কার পায় নাই কেন?' বলিলাম—'হয়তো পাস হয় নাই, তাই।' তিনি তখন চীৎকারস্বরে গালি দিয়া বলিলেন 'পাজি ব্যাটা। নচ্ছার ব্যাটা! তুই বসে বসে কী করিস? মেয়েগুলোকে পাস ও করে পারিস্ না?' আমি তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—যে মেয়ে পাস হওয়া না-হওয়া আমার কোনো হাত নাই। তদুত্তরে তাঁহারা আমায় মারিতে আসিলেন। আমার নাক লক্ষ্য করিয়া হরিমতির পিতা যে ঘুষি তুলিয়াছিলেন—

বেহারা। আমি মাঝে এসে না পড়লে সরকার মশায়ের নাক ভেঙ্গে দিত আর কি।

তা। আমার এখানকার কাজ ছাড়িলেই কি আর ওরূপ ঘটনা হইবে না, না করেন? আপনি ব্যাটাছেলে, আপনাকে তো ঘুষির বদলে লাথি দিয়াই জীবনসংগ্রাম করিতে হইবে।

উ। বলিহারি যাই বাঙ্গালি বাচ্চা! নাক লক্ষ্য করিয়া ঘুষি তুলিয়াছিল বলিয়া চাকরি ছাড়িতে হইবে!!

সর। অনুযোগ করেন কেন মা? কেবল ইহাই কি একমাত্র ঘটনা? সুশীলার পিতা বলিলেন—'তোর কি বাবার গাড়ি?—আমার মেয়েদের জন্য গাড়ি পাঠাস না কেন? আমার বাছারা প্রাইজের সময় স্কুলে যেতে পেলে না!'

তা। উষা-দি'। প্রাইজের দিন কী সুশীলারা তিন ভগ্নী উপস্থিত ছিল না?

উ। (হাজিরা-বহি দেখিয়া) না, সেদিন ইহারা ছিল না। প্রায় একমাস হইতে উহারা আইসে না।

তা। সুশীলাদের জন্য গাড়ি কেন পাঠান না, সরকারবাবু?

সর। উহারা যখন ভর্তি হইয়াছিল, তখন আপনি অতদূর গলির ভিতর বাস পাঠাইতে অস্বীকৃতা হওয়ায় মেয়েরা গোরচাঁদ রোডে জহুর চামড়াঅলার বাড়ি আসিয়া অপেক্ষা করিত ; প্রতিদিন তাহারা সেইখান হইতে গাড়িতে উঠিত এবং বিকালে তাহাদের ঐখানেই নামাইয়া দেওয়া হইত। এখন সুশীলার বাবা নিজের বাসার দোরে গাড়ি লইয়া যাইতে বলেন। তাহা তো আপনি বারণ করিয়াছেন, কাজেই গাড়ি যায় না।

তা। (ছাত্রীদের ঠিকানার খাতা দেখিতে দেখিতে) আমি তো রাসেখাদের বাড়িতে 'বাস' পাঠাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু রাসেখা ও জমীলা তো আসিতেছে ; ইহার কারণ কী?

সর। রাসেখার পিতা কোচম্যান ও সইসকে বখশিশ দিতে অস্বীকার করায় তাহারা দুষ্টামি করিয়া আপনাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল যে, সে বাড়ির হাতার ভিতর গাড়ি যাইবার পথ নাই। পরে আমি আপনার আদেশে তাহাদের বাড়ি দেখিয়া আসিয়া বলিলাম, 'বেশ পথ আছে।' সেইদিন হইতে গাড়ি যায়।

তা। সরকারবাবু, আপনি এখন যাইতে পারেন। আমাদের অনেক কাজ আছে, এক রাশি চিঠি পড়িতে ও তাহাদের উত্তর লিখিতে হইবে।

উষা। সরকারবাবুর হস্তে এক দীর্ঘ তালিকা দিয়া বলিলেন—'এই মেয়েদের বাড়ি দেখিয়া পথ সম্বন্ধে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন।'

তা। ও জানকি, ও নীহার, তোমাদের টাইপিং একটু স্থগিত রাখ। পদ্মরাগ, তুমি এখন চিঠি পড়া আরম্ভ কর।

সি। এই শুনুন ১ নম্বর চিঠি :—'সবিনয় নিবেদন মাননীয়াসু—'*

তা। রক্ষা কর পদ্মরাগ! পাঠগুলা ছাড়—কেবল পত্রাংশ এবং লেখকের নামধাম পাঠ কর।

সি। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করত) 'আমার মেয়ে ঊর্মিলা এবার প্রাইজ পাইল না কেন? আপনাদের তো বাঁধিগৎ—উত্তর আসিবে, 'পাসে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হয় নাই।' কিন্তু 'প্রথম' না হওয়া কাহার দোষ? আপনারা বৎসর ভরিয়া টাকা লইতে জানেন, আর কিছু কর্তব্য আছে কি না, তা জানেন না। আপনি মেয়েমানুষ, তাই কিছু বলিলাম না।'

২ নং চিঠি : —'আমার মেয়ে জুলেখা পাঁচ বৎসর হইতে আপনার স্কুলে পড়ে ; প্রতি বৎসর সে পরীক্ষায় প্রথম হইত। এবার তাহার অসুখের জন্য ৮/৯ মাস কামাই করিয়াছে বলিয়া তাহাকে একটা প্রাইজ দিলেন না। এ কেমন আপনাদের বিবেচনা? মেয়েলি বুদ্ধি লইয়া আর কত ভালোরূপে কাজ করিবেন? স্কুলের কর্ম-নির্বাহক সভায় যদি কোনো পুরুষ থাকিত হবে দেখিতেন, স্কুল পরিচালনা কিরূপে হয়।'

৩ নং চিঠি :—'আমার মেয়ে নিরুপমার নাম কাটিয়া দিবেন। সে প্রাইজের দিন গোল করিয়াছিল বলিয়া আপনাদের বিভা নাম্নী গুরুমা তাহার প্রতি চক্ষু রাঙাইয়াছিল। হাতের কাছে পাইলে আমি বিভার চক্ষু উৎপাটন করিতাম।'

উ। কে আছে, বিভা-দিকে একবার ডাক তো!

তা। এখন না, আরও চিঠি শুনি আগে।

৪নং চিঠি :—'স্কুল করিতে জানেন না তো রাখিয়াছেন কেন?—কেবল নাম কিনিবার জন্য? আমার মেয়ে প্রভাতী তিনমাস হইতে পড়িতেছে ; না হল সে পাস, না পেলে সে একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু।'

৫ নং চিঠি:- "আমার মেয়ে আব্বাসী তিনমাস হইতে স্কুলে পড়িতেছে; এখনো হিজ্জি করিতে পারে না।"

৬ নং চিঠি :—'আমার মেয়ে আতিফা বেগম এখনো রাত্রে বিছানা ভিজায়, তাহাকে একটু শাসন করিতে পারেন না? তবে আপনারা স্কুলে কী শিক্ষা দেন?'

৭নং চিঠি :—'আক্ষেপ যে, আপনার বিদ্যালয়ে গবর্নমেন্টের হাত নাই ; নাচেৎ মজা দেখাইতাম। আমার মেয়ে মনোরমা দুইমাস হইতে স্কুলে যায়, এখনো পর্যন্ত তাহার 'আকার' 'ইকার' শিক্ষা হয় নাই।'

৮ নং চিঠি :—'আমার মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী কাহারও কথা শুনে না, মাতাকে গালি দেয়। পড়ালেখাও তথৈবচ। দেখি—এডুকেশন মিনিস্টারকে বলিয়া কোনোপ্রকারে আপনার স্কুলের অনিষ্ট করিতে পারি কি না। এমন নামের স্কুল থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।'

৯নং চিঠি :—'আমার মেয়ে সরমাসুন্দরী আপনাদের মেট্রিক ক্লাসের ছাত্রী ; সে প্রাইজের দিন অপর মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া ও মারামারি করিতেছিল, এই অপরাধে আপনাদের জনৈক জুনিয়র শিক্ষয়িত্রী সারদা তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। সারদা আপনার নিকট রিপোর্ট করিতে পারিত ; তাহা না করিয়া নিজের হাতে আইন লইল কেন? যাহা হউক, সরমাকে এরূপ গুরুতর আক্রমণ (Criminal assault) করার জন্য

* অনেকগুলি পত্র নানাছন্দের ইংরেজি ভাষায় লিখিত ছিল, তাহাদের অনুবাদ দেওয়া গেল।

আমি সারদার বিরুদ্ধে ফৌজদারি 'কেস' করিতে ও আপনাকে সাক্ষ্য
হইলাম।

'পুনশ্চ—আপনি সারদাকে যথাবিধি শাস্তি দিয়া আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী
অব্যাহতি পাইতে পারেন।'

১০ নং চিঠি :—'আমার দুধের বাছা লীলা একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু
সে কাঁদিয়া খুন হইল। আপনার স্কুল গবর্নমেন্টের অধীন নহে, নচেৎ দেখাইয়া
কেমন স্কুল! আমার পিসে মহাশয়ের খুড়তাতো ভাগিনেয়ের শ্বশুরের আপন
স্বয়ং এডুকেশন মিনিস্টারের শালা!'

উক্ত প্রকারের আরো অনেক পত্র পঠিত হইল। পরে কোরেশা, জা'ফরী ও
ডাকিয়া উষা ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকদের অভিযোগপত্র দেখাইলেন। বিভা ও
'আসি' বলিয়া আবার বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোরেশা একদল মুসলমান বালিকা লইয়া এবং বিভা ও
একদল নানা-ধর্মাবলম্বিনী ছোটবড় বালিকা লইয়া আসিলেন।

কোরেশা। (১) আব্বাসী গত নভেম্বর মাসে স্কুলে আসিয়াছে। সে-সময়
বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য পুরাতন পাঠের পুনরাবৃত্তি করাইতেছিলাম, কাহাকেও
পড়া দেওয়া হইত না। ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ পরীক্ষায় এবং শেষার্ধ প্রাইজের
প্রস্তুত হওয়ায় ব্যয়িত হইয়াছে। জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ প্রাইজ ও জুবিলির
অতিবাহিত হইয়াছে। অদ্য জানুয়ারির ২১ তারিখ—আব্বাসী এই দুই সপ্তাহে
পরিমাণ লেখাপড়া শিখিয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

তা। রাফিয়া-বু, আপনি উহার 'বোগদাদী কায়দা' পাঠের 'হজ্জে' 'মতন' ইত্য
পরীক্ষা করুন।

রাফিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'পাঁচ বৎসরের মেয়ে, দুই সপ্তাহে যে
শিখিয়াছে, তাহা আশাতীত।'

কো। (২) আতিফা ১২ বৎসরের মেয়ে—বাড়িতে রাত্রে বিছানা ভিজায়, সেজ
স্কুল দায়ী! (৩) জুলেখা এ বৎসর ৯ মাস অনুপস্থিত ছিল, তবু পাস হওয়া এবং প্রাই
পাওয়া চাই! তার পর দেখুন, (৪) মরিয়ম ডাকাতের মতো দুর্দান্ত মেয়ে, অষ্টপ্র
তাহার কোঁদল, নিবৃত্ত করিতে হয়, পড়া করিবে কখন? (৫) আলিয়া আধপাগলে
মেয়ে, স্কুলে আসিতে 'বাস'-এর জানালা ভাঙ্গিত, অপর মেয়েদের মারিত, খামচাইত
কামড়াইত—বহু কষ্টে তাহাকে ৮ মাসের পরিশ্রমে সোজা করিয়া পথে আনিয়াছিলাম
ইদানিং অঙ্ক ইত্যাদি বেশ শিখিয়াছিল; সেই সময় তাহাকে ছাড়াইয়া দেশে লইয়া
গেলেন। দুই বৎসর ঘরে রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় পাগলী সাজাইয়া আবার স্কুলে দিয়াছেন
আজি পত্র দিয়াছেন যে, তিন বৎসর হইতে তাঁহার মেয়ে স্কুলে আছে, কিন্তু কিছু
শিখে নাই! (৬) আমিনা পাঞ্জাবি মেয়ে, তাহার ভাষা কেহ বুঝিত না, সেও আমাদে
কথা বুঝিত না। বহুকষ্টে দুইমাসে সে যখন আমাদের ভাষা বুঝিতে আরম্ভ করিয়া কি
কিছু পড়িতে লাগিল, তখন 'পড়া তো কিছু হয় না' অজুহাতে তাহাকে ছাড়াইয়া
লইলেন। (৭) জাহেদা কচদেশীয় মেয়ে—তাহার সম্বন্ধেও ভাষা না-বুঝিবার বিড়ম্বন
ছিল। তিনমাস পরে যখন তাহাকে অনেকটা সুপথে আনিলাম, তখন 'পড়া হয় না
বলিয়া ছাড়াইয়া অন্য স্কুলে দিলেন।

সারদা কোরেশা-বি, আপনার কৈফিয়ত এখন রাখুনস। আমার নিবেদন এই

শুনুন :—(১) এই-যে নিরুপমা তৃতীয়—এ মিডল ক্লাসের ছাত্রী—কলহ-বিদ্যায় চূড়ামণি; ইহার মাথায় দেখুন, কত উকুন, পায়ে ঘা, কাপড় মলিন—কিছুতেই এসব শাধরাইতে পারিতেছি না। ইহার মাতাকে চিঠি দিলে, তিনি ঝির প্রতি দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলেন, 'গুরুমারা আছে কী কর্তে?' (২) এখনো দেখুন, উর্মিলার গায়ে নুমান ১০২ ডিগ্রি জ্বর, পেটে প্লীহা কত বড়, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে আইসে. আমরা বেঞ্চের উপর শোয়াইয়া রাখি, কখনো আতুরাশ্রমে রাখিয়া আস। এ মেয়ে কিরূপে পাস হইবে, বলুন তো? (৩) প্রভাবতীল বয়স সাড়ে তিন বৎসরের অধিক নহে. সে পাস করিবে? (৪) সরমা পুরস্কার বিতরণের পরক্ষণেই অপর মেয়েদের সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া ও মারামারি আরম্ভ করিল—তখনো লেডি চ্যাটার্জি বিদায় হন নাই। অন্য মেয়েরা ধমক মানিল, সরমা কিন্তু আমার সঙ্গে মুখামুখি আরম্ভ করিল—তখন অগত্যা আমি তাহার গালে এক চড় মারিলাম। সে-সময় ঊষাদি' ও আপনি ৮০০ লোকের ভিড়ের মধ্যে, তখন আমি কোথায় যাইতাম আপনাদের নিকট রিপোর্ট করিতে? আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা হইবে, হউক; আমিও দেখিয়া লইব, তিনি কতবড় 'পুলিশ-ছানা'। (৫) মনোরমার পিতা স্কুলের প্রবীন ইনসপেক্টর কি না, সেইজন্য দুইমাসে (গত ডিসেম্বর এবং বর্তমান জানুয়ারি) মেয়ের 'আকার' 'ইকার' জ্ঞান চাহেন। মেয়ের যে বই নাই, স্লেট-পেন্সিল নাই, সারা গায়ে পাঁচড়া ভরা—বেঞ্চে বসিতে পারে না, গায়ে ১০২ ডিগ্রী জ্বর, সে খোঁজ রাখেন না।

বিভা। এখন আমার নিবেদন শুনুন : (১) এই-যে আতিফা, ইহার নিশ্চয়ই কোনো রোগ আছে. সেইজন্য রাত্রে বিছানা ভিজায়। লেডী ডাক্তার মিস বোস সপ্তাহে দুইবার বোর্ডার ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে আইসেন। তিনি দুই তিনমাস হইল, আতিফাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ইহার শীঘ্র চিকিৎসা করান দরকার। সেই হইতে ক্রমাগত ৪/৫ বার আতিফার মাকে চিকিৎসার জন্য লিখিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কেবল আমাদিগকেই শাসন করিতে বলেন (৬ নং পত্র দেখুন)। (২) এই-যে একদল কচি খুকি, ইহাদের বয়স ৩½ হইতে ৪ বৎসরের অধিক নহে; ইহাদের একমাত্র কাজ—ক্লাসে কাপড় নষ্ট করা। (৩) এই-যে এক শ্রেণী, ইহাদের মাথা খারাপ—অনুক্ষণ হুটোপাটি ও মার-ধর করে, ইহারা কোনো গুরু-মা'র কথার বাধ্য নহে। (৪) এই-যে একগুচ্ছ—ইহাদের জামা খুলিয়া দেখুন, সর্বাঙ্গে পাঁচড়া, মাথায় উকুন, গায়ে ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রী জ্বর। ইহারা প্রায় সমস্ত দিন আতুরাশ্রমে থাকে, সেখানে যথানিয়মে ইহাদের ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হয়।

তা। 'উসা-দি'! তুমি এ জ্বরগ্রস্তা, পাঁচড়া-বিক্ষতা বালিকাদের বিদ্যালয়ে আনাও কেন?

উ। আমি তো ইহাদের আনিতে বারণ করি; কিন্তু ঐসকল বাড়ি হইতে অন্যান্য মেয়ে এবং উহাদের দিদি, মাসি, পিসিকে আনিতে 'বাস' যায়। সেই সময় উহাদের মাতা জোর করিয়া উহাদের পাঠান। ঝি আনিতে না চাহিলে কর্ত্রীরা তাহার সঙ্গে ঝগড়া করেন—'তোর বাবার কী? আমরা মাসে মাসে মাইনে দিই—মেয়ে নিয়ে যাবি কি? মেয়ের জ্বর হয়েছে তো তো আবার কী?'

সৌদামিনী। মিসিস সেন, তুমি দয়া করিয়া তারিণীভবনের আর দুইটি শাখা বৃদ্ধি কর—একটা 'তারিণী-নার্সারী', আর একটা 'তারিণী-বাতুলালয়।'

বিভা। তাহা হইলে 'তারিণী-সূতিকাগৃহ'ই বাকি থাকে কেন?

উ। কোনো চিন্তা করিও না—ঈশ্বরেচ্ছায় মিসিস সেন বাঁচিয়া থাকুন, কালে তাহাও হইবে।

তা। ঊষা-দি! তুমি ব্রহ্মশাপ দিও না! তুমি এখন তোমার দলবল [illegible] যাও, আমি এ পত্রগুলির উত্তর লিখাই। জানকী ও নীহার, তোমরা স্ব স্ব [illegible] কর। রাফিয়া-বু, আপনি আমার সঙ্গে পাঠাগারে আসুন; পদ্মরাগ, তুমি [illegible] আইস, মণি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

লকেট রহস্য

এখন বহুদিন হইতে সিদ্দিকা কোরেশার সঙ্গে না থাকিয়া রাফিয়া ও সকিনার [illegible] একটা স্বতন্ত্র কামরায় বাস করেন। রাত্রি অনুমান সাড়ে নয়টা; তাঁহারা কয়জন হইয়া স্ব-স্ব শয্যায় শয়ন করিয়াছেন, কেহ নিদ্রা যান নাই। সৌদামিনী আসিয়া আঘাত করায় সিদ্দিকা উঠিয়া দ্বার খুলিলেন।

সৌ। ভাই পদ্মরাগ! আমি তোমাকেই বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, কিছু মনে করিও না।

সি। স্বচ্ছন্দে বল।

সৌ। সেই যে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তোমার 'লকেট রহস্য' বলিবে, কুরু ইত্যাদি হেঙ্গামে এতদিন তাহা শুনিবার সুবিধা হয় নাই—আজি শুনিতে চাই।

সি। বেশ। তুমি বস দিদি। আমি আলোটা নিবাইয়া আসি, কারণ সকিনার ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে।

সৌ। আমি এখানে বসিব না; চল, মিসিস সেনের কামরায়, তিনিও শুনিবেন।

সি। সে কী দিদি! তুমি একা শুনিবে বলিয়া কথা ছিল! আমি মিসিস সেনের কথা বলিতে পারিব না!

সৌ। কথাটা তাঁহারও শুনা প্রয়োজন, কারণ তিনি আমাদের সকলের ওপর বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন এবং ইহা তাঁহার কর্তব্যও বটে। জানো তো, মেয়েমানুষকে নাকি হাঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়—যেহেতু মৃন্ময় পাত্র অতি সামান্য কারণেই অপবিত্র হয়।

সি। কিন্তু আমার ইতিহাস—

'এ হতে পবিত্র প্রেম জীবের সংসারে
হয় নাই, হইবে না লোক-লোকান্তরে।'

সৌ। তবে আর সঙ্কোচ কিসের? চল, সে লকেটটাও লইয়া চল, মিসিস সেনকে দেখাইবে।

সিদ্দিকা কাগজের কৌটা শুদ্ধ লকেট আনিয়া সৌদমিনীর হাতে দিলে তিনি তাহা সিদ্দিকার গলায় পরাইয়া দিলেন।

সি। (সজলনয়নে) এ কী করিলে দিদি। এটা যে অপয়া জিনিস।

সৌদামিনী সিদ্দিকার রোদনে অপ্রতিভ হইয়া সস্নেহে বলিলেন, 'ভগিনী! তোমার মনে কষ্ট দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে। কিন্তু এটা তো কণ্ঠে—বক্ষে রাখিবারই বস্তু।'

তারিণীর কামরার দ্বারদেশে আসিয়া সৌদামিনী অতি ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। তারিণী আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়া একখানি পুস্তক দেখিতেছিলেন; কড়ার শব্দ শুনিয়া ডাকিলেন—'আইস।'

সৌ। সিদ্দিকার সেই লকেটের ইতিহাস অদ্য শুনিতে হইবে, কিন্তু তোমার সম্মুখে বলিতে লজ্জা করে।

তা। (স্নেহসিক্ত স্বরে) না আমাকে লজ্জা করিতে হইবে না—এখানে তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা অকপট সহৃদয়া বন্ধু বলিয়া জানিবে। আমার হৃদয়ভরা সহানুভূতি পাইবে। সিদ্দিকার অশ্রু তখনো বিন্দুর পর বিন্দু ঝরিতেছিল।

সৌ। একি পদ্মরাগ! তোমাকে আমরা অতি গভীরহৃদয়া বলিয়া জানি—আজি তোমার এ দুর্বলতা কেন?

তা। থাক, এত কষ্ট করিয়া তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না।

সি। (অশ্রুসম্বরণ করিয়া) না, কষ্ট কিসের? শুনুন :—আমার বয়স যখন মাত্র ১২ বৎসর, সেই সময় আমার ভ্রাতার শ্যালকের সহিত আমার বিবাহ হইল। আমি অতি শৈশবে পিত্রহীন হইয়াছিলাম, একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার অভিভাবক ছিলেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমবয়স্কা ছিলাম বলিয়া তিনি আমায় অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। আমি তাঁহার কল্যাণে কখনো পিতৃ-অভাব করি নাই। ভাইজান আমার এত অল্পবয়সে বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু মাতা বলিলেন, এমন সর্বগুণালঙ্কৃত বর সহজে পাওয়া যাইবে না, অন্তত: ইহাকে আটক করিয়া রাখা যাউক, সুতরাং তিন বৎসর পরে বিবাহ হওয়ার শর্তে আমার 'আকদ' হইল। আকদ একরূপ সম্পূর্ণ বিবাহই, কেবল বর-কনের সাক্ষাৎ হয় না। আমার সম্প্রদান-ক্রিয়া ঐ তিন বৎসর পরে অনুষ্ঠিত হইত।

তা। 'হইত'—ইহার অর্থ কী?

সি। তাহা আজি পর্যন্ত হয় নাই। বিবাহের কিছুকাল পরে মাতার মৃত্যু হইল। সে সময় 'আছে' বলিতে আমার ভাইজান এবং তাঁহার পরিবার ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

যথাকালে বরপক্ষ হইতে বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য তাকিদ-পত্র আসিল। কিন্তু বরের জ্যেষ্ঠতাত আমার ভাগের সম্পত্তি পূর্বে লিখিয়া চাহিলেন। তাঁহাকে অবিশ্বাস করা হইতেছে ভাবিয়া ভ্রাত উক্ত প্রস্তাবে বিরক্ত হইলেন এবং সম্পত্তি লিখিয়া দিতে অস্বীকৃত হইলেন। প্রত্যুত্তরে বরের পিতৃব্য স্পষ্ট জানাইলেন যে, সম্পত্তি না পাইলে তাঁহারা আমাকে গ্রহণ করিবেন না এবং তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ অন্যত্র দিতে বাধ্য হইলেন।

ভাইজান এরূপ নিষ্ঠুর অবমাননার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। আমারও মনে হইল যেন আমাকে পদাঘাতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

তা। তোমাদের সামাজিক প্রথানুসারে তাঁহারা তোমার মতো অমূল্যরত্নকে বধূরূপে বরণ করিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন? তোমার বরের মতও কি তাহাই ছিল?

সি। বরের মতো কী ছিল, বলিতে পারি না। ভাইজান বরকে রেজিস্ট্রিপত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ-বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মত কী? তিনি সে-পত্রের উত্তর দিলেন না। ইহার পক্ষকাল পরে আমরা শুনিলাম, তিনি আবার বিবাহ করিয়াছেন। এ সংবাদে আমি যতটা মর্মাহত হইলাম, ভাইজান তদপেক্ষা শতগুণ ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি মাস-দুই পর্যন্ত একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাকে দেখিলেই স্নেহসিক্তহৃদয়ে রোদন করিতেন।

কিয়ৎপরিমাণে আত্মসম্বরণ করিয়া ভাইজান আমাকে বলিলেন, 'আয় জয়নু'—আমার প্রকৃত নাম জয়নব—'তুই জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হ। মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য

যাহাতে তোকে কোনো দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে [illegible] শিক্ষা-দিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিব। তোকে বাল্য-বিধবা কিংবা চিরকুমারী জীবনযাপন করিতে হইবে; তুই সেজন্য আপন পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়া!'

তা। আহা!

'পতন না হতে তনু
দাহন হইল আগে।'

সি। (অশ্রুমোচন করিয়া) ভাইজান আমাকে প্রাণপণে জমিদারি সংক্রান্ত সকল শিক্ষা দিলেন। তিনি সর্বাদা বলিতেন, জমিদারের প্রধান কর্তব্য—প্রজা-পালন; শোষণ বা প্রজা-দহেন। তাঁহার সাধ্যানুসারে আমাকে সকল প্রকার সুশিক্ষা দিয়া যে দিন আমার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হইল, সেইদিন ভাইজান আমাকে ভাগের সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া দলিলপত্র সমস্ত আমাকে দান করিলেন।

ভাইজান বলিলেন, 'তোমার সম্পত্তিলাভের বিষয় আপাতত গোপন থাকুক। একবার সে নরাধমের বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি তোমাকে 'তালাক' দেন তবে ত পরম মঙ্গল; তোমার জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিবে। আর যদি 'তালাক' না দেন তবে আর গতি কী—তোমাকে 'চিরদিন এ ভুরু তারি তরে কাঁদিতে' হইবে—অর্থাৎ তুমি নিজেকে বাল্য-বিধবা জ্ঞান করিবে।'

সে-সময় বরের পিতৃব্য পরলোকগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি তখন স্বাধীন। ভাইজান তাঁহাকে যত পত্র লিখিতেন, সব আমাকে দেখাইতেন; এবং তাঁর যত চিঠি আসিত, তাহাও আমাকে পড়িতে দিতেন। তদবধি আমি তাঁহার মনোগত হস্তাক্ষর ও সাক্ষর চিনি।

তা। কিন্তু তাঁহাকে সশরীরে কখনো দেখ নাই?

সি। (নতমস্তকে) তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি কারসিয়ঙ্গে—আপনার বাসায়। কিন্তু তখন তাঁহাকে চিনিতাম না।'

তা। আমার বাসায়—কারসিয়ঙ্গে—কে তিনি?

সৌ। সম্ভবতঃ মিস্টার আলমাস। তোমার লকেটে তাঁহারই ফটো আছে না?

সি। হাঁ। কিন্তু লকেট ও ফটো আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকটা হইতে প্রাপ্ত হই নাই।

সৌদামিনী তারিণীকে সিদ্দিকার কণ্ঠস্থিত লকেট দেখাইলেন।

তা। মি. আলমাস তোমার ভাইকে কী উত্তর দিলেন? তিনি তোমাকে 'তালাক' দিতে সম্মত হইলেন?

সি। না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। প্রায় ছয়মাস পত্র লেখালেখির পর তাঁহার মাতার এক মাতুল মৌলবী জোনাব আলী আমাদের বাড়ি আসিলেন। একদা তাঁহাকে আমার হাত ধরিয়া তাঁহার কামরার বাহির দিকের রুদ্ধ জানালার নিকট লইয়া গেলেন। আমরা তথায় নি:শব্দে দাঁড়াইয়া ভাইজান ও জোনাব আলী সাহেবের কথোপকথন শুনিতে লাগিলাম। ভাইজান ক্রুদ্ধভাবে যাহা বলেন, জোনাব আলী শান্তভাবে বিনীতভাবে তাহাতেই সায় দিয়া বলিতেছিলেন—হাঁ, আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য। আমি আপনার সব কথা মাথায় রাখি। বৃদ্ধের প্রার্থনা এই যে, আপনি লতীফকে এই বিবাহ-রজ্জুতে বাঁধিয়া স্বহস্তে ইচ্ছানুরূপ শাস্তি দিন।'

ভাইজান একটি পাঁচনলী পিস্তল তুলিয়া বলিলেন
'আমার মনোমতো শাস্তি এই—দেখুন ইহাতে মাত্র তিনটি গুলি আছে প্রথম গুলিতে লতীফ আলমাসকে শেষ করিব, দ্বিতীয়টিতে জয়নবকে এবং তৃতীয় গুলিতে আমি আত্মহত্যা করিব।—'

জোনাব আলী তাড়াতাড়ি বলিলেন—'দোহাই আল্লার! অমন সঙ্কল্প করিবেন না।'

* * *

ভাবিজান নিজের ভাইয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাইজানকে সবিনয় মিষ্টভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, লতীফের কোনো দোষ নাই, তিনি গুরুজনের পীড়নে নিতান্ত বাধ্য হইয়া আবার বিবাহ করিয়াছেন। তোমার এ কী একগুঁয়েমি—লোকে কি সপত্নী লইয়া ঘর করে না? 'পিয়া যাকে চায়, সেই সোহাগিনী'—আমাদের জয়নু যে 'সোহাগিনী' হইবে, ইহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।'

ভাইজান বলিলেন, 'উহার স্ত্রী বর্তমানে আমি কিছুতেই জয়নুকে সম্প্রদান করিব না। আমার একমাত্র ভগ্নী—আমার অতি আদরের জয়নুকে উপেক্ষা করিল!—এজন্য লতীফকে চিরজীবন কাঁদিতে হইবে।'

সৌ। বেচারা তো এখন সত্যই কাঁদিতেছেন।

সৌদামিনীর কথায় সিদ্দিকা কিঞ্চিৎ বিজয়গর্বে মৃদু হাস্য করিলেন।

তা। অভিসম্পাতটা হাড়ে হাড়ে লাগিয়াছে।

সি। একদিন ভাবিজান আমাকে ডাকিয়া পাঁচটি মূল্যবান অলঙ্কার দেখাইয়া বলিলেন, 'একজন সওদাগর এগুলি বিক্রয় করিতে আনিয়াছে, ইহার মধ্যে তুমি যেটি পছন্দ কর?' আমি কিনিয়া দিব।' ভাইজান মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'যদি জয়নু সবগুলি পছন্দ করে?' ভাবিজান উত্তর দিলেন, 'চিন্তা নাই—আমি সবই কিনিয়া দিব।' আমি এই লকেটটাকে সর্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্যের মনে করিয়া উহার দিকে ইঙ্গিত করিলাম।

সৌ। তুমি লকেটের বহিরাংশের মণি-মুক্তাখচিত কারুকার্য দেখিয়া মনোনীত করিয়াছিলে, না, তাহার অভ্যন্তরীণ ফটো দেখিয়া?

সি। তখন আমি ফটো দেখি নাই। ভাবিজান সহাস্যে তৎক্ষণাৎ উহা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। আমি লকেট খুলিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'খবরদার! এখন ওটা খুলিস না—যেদিন তোর বর আসবে, সেইদিন খুলবি।' ভাইজানও সহাস্যে বলিলেন, 'ওটা কুলিস না।' বহুদিন পরে সেইদিন ভাইজানকে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেখিয়াছিলাম।

পরে জানিলাম, বাস্তবিক সে অলঙ্কারগুলি কোনো সওদাগর বিক্রয়ার্থ আনে নাই--তাহা জোনাব আলী মিয়া আমার জন্য আনিয়াছিলেন। সে-সময় উভয় পক্ষে সম্ভবত সন্ধি হইয়া যাইত। কিন্তু সেই রাত্রে এক লোমহর্ষক দুর্ঘটনা হইল। ভাইজান ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মারা পড়িলেন—(সিদ্দিকার বাকরোধ হইল)।

কিয়ৎক্ষণ পরে তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহার পর?'

সি। তাহার পর ঘটনাচক্রের আবর্তনে আমি গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কণ্ঠস্থিত লকেটের বিষয় আর আমার মনেই ছিল না। এখানে আসিয়া প্রথম দিন স্নান করিবার সময় উহা আমার হাতে ঠেকিল। আমি উহাকে 'অপয়া' জ্ঞানে তাচ্ছিল্যভাবে একটা বাক্সে ফেলিয়া রাখিলাম।

আমরা কারসিয়ঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার একমাস পরে আমি একদিন ট্রাঙ্ক গুছাইতেছিলাম, দৈবাৎ সেই সময় সৌদামিনী দিদি সেখানে গিয়া লকেটটাকে পাইলেন। তিনি কৌতূহলবশত তাহা হাতে লইয়া খুলিয়া দেখিলেন—লকেটের ফটো আমি সেইদিন প্রথম দেখিয়াছি। ইহাই আমার 'লকেট-রহস্য'।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সমাজের প্রতিদান

'ভাই বানু। তুমি এবার পুরস্কার বিতরণের দিন আসিলে না কেন? তাহার পর আমাদের 'চিরহরিৎ-সম্মিলনী'তেও আসিলে না, এজন্য তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি না। এখন আবার নূতন করিয়া কোণের বউ হইয়াছ না কি?' এই বলিয়া শাহিদা বানুর গাল টিপিয়া দিলেন।

তারিনির বসিবার ঘরে (ড্রয়িংরুমে) বসিয়া এই তরুণীদ্বয় গল্প করিতেছিলেন। ইহারা উভয়ে তারিণী-বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। ছয় সাত বৎসর হইল ইহারা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বিবাহিতা হইয়াছেন। বানু তাঁহার প্রথম কন্যা পঞ্চমবর্ষীয়া জরিনাকে বিদ্যালয়ে দিতে আসিয়াছেন।

তারিণী জরিনাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, 'তাই তো আশ্চর্যের বিষয়! মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এই রেজিয়া বানুই আমাদের সর্বপ্রথম ছাত্রী—সেই বানু এত সাধের জুবিলীর দিন অনুপস্থিত। কেন মা?'

বানু। (সাশ্রুনয়নে) মাসিমা। এজন্য আমি দায়ী নহি—আমার শাশুড়ি আমাকে আসিতে দেন নাই।

শাহিদা। জ্বালালে দেখি। প্রতিবৎসর প্রাইজে ও 'চিরহরিৎ -সম্মিলনী'তে আসিয়া থাকো, এবার তৃতীয় ছেলের মা হইলে পর আসিতে বাধা দিলেন। অন্যান্যবার আসিতে কিরূপে?

বা। প্রতিবৎসর—প্রতিমাসেই 'নারী-ক্লেশ-নিবারণী' সমিতির অধিবেশনের দিন তারিণীভবনে আসিবার সময় ঝগড়া হইত। এবার তিনি বাড়ি ছিলেন না বলিয়া আমার শাশুড়ির জয় হইল। আম্মা আমার এখানে আসায় ঘোর আপত্তি করেন, বলেন—'তারিণী-ভবনে পরদা নাই।'

কামরার অপরপ্রান্তে সকিনা ও রাফিয়া নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিলেন। তাঁহারা বানুর শেষ কথাটি শুনিতে পাইয়া এদিকে 'মনোযোগ' দিলেন। রাফিয়া বলিলেন—

'হা মা বানু। তোমার শাশুড়ি উঠানে বসিয়া পুরুষ চাকরদের সমক্ষে স্নান করিয়া 'পরদা' রক্ষা করেন, আর আমরা সর্বদা বস্ত্রাবৃতা থাকিয়া 'বে-পরদা'!'

স। তোমরা যে বাহিরের চাকরের সম্মুখে বাহির হও—'তাহারা কেবল গৃহপালিত চাকরের সঙ্গে মিশামিশি করেন।

রা। আমরা চাকরের সম্মুখে বাহির হই—তাহাদের দ্বার পা টিপাই না তো!

শা। ওহ্ আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, পুরুষচাকরেরা নাকি বানুর ননদের পা-মাথা টিপে, পা টিপে, তাহাতে 'পরদার' ব্যাঘাত হয় না!

বা। আর তোমার ননদ ও জায়েদের পোষাকের কথা বল না! সেই নেটের আঙ্গিয়া' আর পাতলা ফিনফিনে হাওয়ার শাড়ি!—সেই বেশে তাঁহারা দেবর নন্দাই—সকলের সম্মুখে বাহির হন! শাশুড়ি লম্বা হইয়া খাটে শুইয়া আছেন, আর জামাই আসিয়া সেই খাটে বসিলেন!

স। বাপু! তোমরা যে বড় বোকা! অবরোধে (চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে) উলঙ্গ থাকিলেও কেহ 'বে-পরদা' হয় না।

উ। আচ্ছা বাপু বানু। এখানে 'পরদা নাই' বলিয়া না হয় না আসিলে; কিন্তু তোমার শাশুড়ি তো খুব বড়লোক। দুই চারিশত টাকা জুবিলি-ফাণ্ডে দিলেন না কেন?

বা। টাকা চাহিয়াছিলাম বলিয়াই তো ঝগড়াটা বেশি পাকিল। মাসিমাকে এমন সব বিশ্রী কথা বলিলেন, যাহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়!

শা। বটে? মাসিমাকে বিশ্রী কথা—কী বলিলেন শুনি?

বা। আমি বলিতে পারিব না।

শা। আমার কানে কানে বল, লক্ষ্মী বোনটি আমার।

বানুর কথা শুনিয়া শাহিদা ক্রোধে অধর দংশন করিয়া বলিলেন—'বটে। তাঁহারা এমন ছোটলোক। মাসীমাকে এমন কথা। বানু অমন নিরীহ শান্ত মেয়ে, তাই ও সব কথা সহ্য করিয়াছে! আমি হইলে খুনাখুনি হইয়া যাইত।'

সৌ। আচ্ছা বাপু। শুনিই না, কী কথাটা?

শা। আমি মুখে আনিতে পারিব না, বানু বলুক।

বা। বাজি,* তুমি লিখিয়া দাও।

শাহিদা অপরের অগোচরে লিখিয়া কাগজখণ্ড ভাঁজ করিয়া ঊষার হাতে দিলেন। ঊষা উচ্চহাস্যে একটি শব্দ বানান করিয়া পড়িলেন—'ব-এ একার তালব্য শ-এ য-ফলা আকার।'

সৌদামিনী কাগজখণ্ড হাতে লইয়া বলিলেন 'র মতো বলিয়াছে, মিসিস সেনকে তো 'পতিতা' বলে নাই, তবে এত রাগ কেন?

তা। ব্রাহ্ম-সমাজের লোকেরা তো আমাকে স্পষ্ট '—' ই বলে; মুসলমান সমাজ এখনো পর্যন্ত আমাকে তত ভালোবাসেন না।

সিদ্দিকা কয়েকখানি পত্রহস্তে আসিয়া বলিলেন, 'মাফ করিবেন, এই চিঠিগুলি নিন।'

সিদ্দিকাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া তারিণী বলিলেন,—'বস পদ্মরাগ। ইহারা আমাদের পুরাতন ছাত্রী—ইহাদের সহিত আলাপ কর।'

উ। পদ্মরাগ, আগে পত্রগুলি পড়িয়া শুনাও—পরে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিও।

বা। গুরু-মা! আপনি নিজেই পড়ুন না।

উ। ইহার অধিকাংশই আমার প্রেমলিপি হওয়া সম্ভব। সে রকম চিঠি একা পড়িতে সুখ বোধ হয় না।

তারিণী ১০/১২ খানা পত্র ঊষার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, এইগুলি তোমার প্রেমলিপি।' (অর্থাৎ ছাত্রীবৃন্দের অভিভাবকদের অভিযোগ পত্র।)

পত্রগুলি পঠিত হইলে শাহিদা বলিলেন, 'অনেকেই ধমকাইয়াছেন যে মেয়ে ছাড়াইয়া লইবেন। তাহাতে মাসিমার কী ক্ষতি হইবে?'

* পারসি ভাষায় বড় ভগ্নীকে 'বাজি' বলে। বানু মোগলকন্যা।

উ। এই সমস্ত সানাউল্লাহ, পানাউল্লাহ, ঘোষ, বোসের মেয়ে [illegible] ত্যাগ করিলে মিসিস সেনের চৌদ্দপুরুষ নরকে যাইবে।

বিভা কয়েকখণ্ড কাগজহস্তে আসিয়া বলিলেন, 'এ অমূল্য কাগজগুলি [illegible] আপনাদের দিতে আসিলাম। আমিও একখানা পাইয়াছি।'

শা। কাগজগুলি 'সমন' এর মতো দেখাচ্ছে : কিসের 'সমন' কী [illegible] অমূল্যধন বাগচী সারদা শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছেন। মিসিস [illegible] আমরা সাক্ষী। ইহা সেই সাক্ষীর 'সমন'।

শা। বটে? হাঁ, আমিও তো কিছু কিছু শুনিয়াছি। তিনি না কী দরখাস্তে লিখিয়াছেন যে, সারদা গুরু-মা সরমাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিয়া মাথায় ও পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়াছেন; তাহার ফলে সরমা মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, তিনঘন্টা অজ্ঞান বাড়ি গিয়া সমস্ত রাত্রি প্রবল জ্বরে ছটফট করিয়াছে, একটুও ঘুমায় নাই।

বা। আমিও শুনিয়াছি, তিনি নাকি ঐ মর্মে তিন জন ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করিয়াছেন।

সৌ। তাহা করিবেনই তো। 'পুলিশের অসাধ্য ক্রিয়া নাহি চরাচরে।'

বি। সরমা সেই তিন বৎসর বয়স হইতে স্কুলে আসিত, আমরা তাহার কত [illegible] দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছি; এখন সে মেট্রিক ক্লাশে আসিয়া আমাদের এই প্রতিদান [illegible]

তা। সেজন্য দুঃখ কেন, বিভা? তুমি ইহাপেক্ষা আর কী আশা করিয়াছিলে?

শা। এই তো বানুর শাশুড়ি বলিয়াছিলেন যে, বড়-মাসিমা রাজ্যের সব টাকা [illegible] করেন—'তারিণীভবন' নামে একটা বিশেষ ব্যবসায়ের দোকান খুলিয়াছেন; বাঙ্গালের ঝিকে ঘরের বাহির করিয়াছেন। তিনি অতিশয় স্বার্থপর ও অর্থ-পিশাচ। আর—অমতি-তা স্ত্রীলোকদের মতো তাঁহার অর্থ-পিপাসা! কিন্তু মাসিমা এই ব্যবসায় না করিলে বানুর মতো অমন সর্বগুণভূষিতা পুত্রবধূ পাইতেন কোথা হইতে?

বা। টাকা আত্মসাৎ করার অপবাদটা আমার মনে সব চেয়ে বেশি লাগিয়াছে। নিজের সর্বস্ব চারিলক্ষ নগদ টাকা দেশহিতকর কার্যে ব্যয় করিয়াছেন এবং [illegible] করিতেছেন—তিনি পরের টাকা আত্মসাৎ করিবেন?

শা। কেবল টাকা নহে—যিনি তাঁহার মূল্যবান জীবনের ২২টি বৎসর, স্বাস্থ্য, সামর্থ্য—সব দেশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার প্রতিদানে এই পাইলেন!

বা। 'আজীবন পূজিলাম দেব দ্বিজগণে,
তার কি এ ফল বাছা! তুমি যাও বনে?'

এই সময় পরিচারিকা সকলের জন্য চা-খবার লইয়া আসিল।

তা। (চা ঢালিতে ঢালিতে)—মা! তোমরা এত দুঃখিত হইতেছ কেন? লোকে [illegible] বলিয়াই থাকে, ও-সব কথা ধর্তব্য নহে। এখন তোমরা চা চাও। কই জরিনা, আয় [illegible]

সৌ। তাই তো, দেশ ও সমাজ কি মিসিস সেনকে কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া [illegible] আসিয়াছিল যে, 'দীন-তারিণী। আমাদের তারণ কর। আমাদের জন্য টাকা, [illegible] জীবন উৎসর্গ কর?' ইনি কেন দেশ-সেবা করিতে গেলেন? দেশ কি ইহার সেবা [illegible]

'তুমি বল মন প্রাণ দিয়াছ তাহার;
কেন দাও? কারে দাও? সে তো নাহি চায়।'

রা। সৌদামিনী-দি', তোমার কথা মানিলাম, 'মনপ্রাণ সে তো নাহি চায়, [illegible] লইতে আইসে কেন? মিসিস সেন কি দ্বারে দ্বারে 'প্রাণ নেবে গো?' বলিয়া [illegible]

সুবিধা বেড়ান? আসল কথা এই যে, আমরা লইব, খাইব গালিও দিব।

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বিভা বলিলেন—'যে যত বড় হয়, তাহার দায়িত্ব তত বেশি। সে তত অধিক গালি শুনে। মিসিস সনে এসব জ্বালা-যন্ত্রণা বহন না করিলে আর কে করিবে? (বানু ও শাহিদার প্রতি) তোমার মনে নেই, সেই যে ইংরাজি পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলে—ইংলন্ডের কোনো রাজা মনোদুঃখে জলযন্ত্র-পরিচালকের টুপির সহিত মুকুট বদল করিতে চাহিয়াছিলেন?' *

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পাষাণ-প্রতিমা

লতীফ বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। প্রায় ৯ বৎসর পূর্বে জয়নবের সহিত তাঁহার যে 'আকদ' হইয়াছিল, সে-কথা ভুলিতে পারেন না। লতীফকে এখন তাঁহার সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে, ইহাই হইতেছে তাঁহার কর্তব্য। কিন্তু হৃদয়ের গুঢ়তম প্রদেশ হইতে কে যেন বলে, একবার এক অজ্ঞাত রমনীকে বিবাহ করিয়া পাঁচ বৎসর বিষময় ফল ভোগ করিয়াছ : জয়নবও সেইরূপ অপরিচিতা। অথচ সিদ্দিকা তো সর্বগুণে বাঞ্ছনীয়া। আর এক কথা, জয়নব অনুপস্থিত আর সিদ্দিকা উপস্থিত। বিবেক বলে—'না, না, সিদ্দিকার বিষয় ভাবা উচিত নহে, জয়নবকে লইয়াই তাঁহাকে ঘর করিতে হইবে।'

লতীফ জয়নবকে আকাশপাতাল খুঁজিতে বিরত হন নাই। কিন্তু জয়নব সম্বন্ধে কোনো কল্পনা করিতে গেলে সিদ্দিকা আসিয়া পথরোধ করিতেন—সুতরাং জয়নব ও সিদ্দিকা এক হইয়া যাইত! ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণিতা 'বীরবালা', যাঁহাকে লতীফ অনল হইতে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, সেই জয়নব লতীফের 'হারানিধি'। সে রাত্রি তাঁহার সর্বাঙ্গে কাদা-মাখাই সার হইয়াছিল—মাছ ধরিতে পারেন নাই। কী দুরদৃষ্ট। এ দীর্ঘ সাড়ে সাত বৎসরেও যখন জয়নবের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়নবের আশা ত্যাগ করিলেন।

সিদ্দিকার দিক হইতে, লতীফ যদিও কখনো কোনো আশা প্রাপ্ত হন নাই, তবু আশার বিরুদ্ধে আশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি নানা ইঙ্গিতে সিদ্দিকাকে মনে কথা, প্রাণের ব্যাথা জানাইতেন : সিদ্দিকা নির্বিকার—নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় অটল থাকিয়া, নীরবে প্রত্যাখ্যান করিতেন। এমন মূক বধির ভাব দেখাইতেন যে, আর তাঁহাকে কিছু বলা চলিত না।

এবার পাঁচ ছয়মাস মুঙ্গের ও কলিকাতায় ঘুরিয়া লতীফ এখন বাড়ি আসিয়া দেখিলেন, জমীদারি সংক্রান্ত অনেক অবশ্যকর্তব্য কার্য বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। এত-দিন সালেহার অত্যাচারে গৃহে তিষ্ঠিতে পারেন নাই; এখন গৃহে মনোযোগ দিবেন, মনে করিলেন। বাড়ির সন্নিহিত উদ্যানটি নদীর ধারের দিকে আরও কিঞ্চিৎ বাড়াইলে এবং তাহাতে ছোট একটি টিনের বাংলো নির্মাণ করিলে, তাহা মনোরম উদ্যান-বাটিকা হইবে। কিন্তু এসব করিয়া কী হইবে? তাঁহার গৃহলক্ষ্মী কই? ভালো করিয়া

* 'Thy mealy cap is worth my crown.
Thy mill my Kingdom's fee.'

অতি স্পষ্টভাষায় আর একবার সিদ্দিকার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন।

তাহাই হইল। তিনি সিদ্দিকাকে এক দীর্ঘ পত্র ইনসিওর করিয়া পাঠাইলেন। ভাষা এমন সুকৌশলে রচিত হইল যে, সিদ্দিকা—উত্তর—সদুত্তর অসন্তোষজনক উত্তরই হউক—দিতে বাধ্য হইবেন। উত্তর না দিলে 'সম্মতি লক্ষণং' বলিয়া ধরা পড়িবেন। সুতরাং এবার তাঁহার মূক হওয়া খাটিবে না।

বাংলো প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। লতীফ দুইহন মালীর সহিত বাগানের যেরূপ সাজে সেইরূপ লতাগল্প দিয়া বাগান সাজাইতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, ঐ বাটিকার নাম রাখিবেন-'Ruby কুঞ্জ'। সেই সময় ডাকপিয়ন একখানি ইনসিওর পত্র আনিয়া দিল। পত্রখানি উন্মুক্ত উদ্যানে বসিয়া পাঠ করিতে সাহস হইল। পত্রহস্তে লতীফ আপন কামরায় গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। অনেকক্ষণ পরেও তিনি ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া মালীরা হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় তিনটা—এখনো সাহেবের স্নানাহার হয় নাই। চাকরেরা সভয়ে দ্বারে আঘাত করিয়া সাহেবের সাড়াশব্দ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তিনি কি ঘুমাইয়াছেন: না, এরূপ অসময়ে তিনি তো ঘুমান না। ভৃত্যবর্গ অনন্যোপায় হইয়া রফিকার সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে দ্বারদেশে আনিয়া 'মাম্মা! মাম্মা—' বলিয়া কাঁদিবার জন্য দণ্ডায়মান করিয়া দিল। এই বালকটিকে লতীফ অত্যন্ত ভালোবাসেন। কী জন্য নির্জনে একটু কাঁদিবারও সুবিধা পাওয়া যায় না। নিজের কামরায় অবরুদ্ধ থাকিবার উপায় নাই। তাঁহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের ভাষা ছিল—

'প্রাণ কাঁদে প্রিয়া লাগি ভীম যাতনায়!
ইচ্ছা হয় ছুটে যাই, যেথা জীবজন্তু নাই,
কেঁদে আসি প্রাণভরে পড়িয়া ধরায়।'

লতীফ সে 'নিষ্ঠুর' পত্রখানি একটা বাক্সে ফেলিয়া নিশব্দে দ্বার খুলিয়া রোরুদ্যমান বালককে উপেক্ষা করিয়া মাঠে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে ভাবিতেছেন, সিদ্দিকা কী হৃদয়হীনা পাষান!—প্রেম দূরে থাকুক, সাধারণ দয়ার সহানুভূতি পর্যন্ত নাই! সেই-যে কবি বলিয়াছেন—

'উত্তরিয়া 'না', পাষাণী বলিল আবার,
'ইথে যদি মর তবে কী করিব আর?'

মানুষ এমন প্রাণহীন অসার পদার্থ হতে পারে। তাহা হইক, —আর তাঁহাতে মনে স্থান দিবার প্রয়োজন নাই। তিনি তো স্পষ্টাক্ষরে তাঁর অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আর কেন? কিন্তু সে-কথা ভাবিতেও যে হৃদয় শতধা হয়। তাহাকে ভুলিতে আর থাকে কী? কবি বলেন, প্রেমিক জ্বলিয়া সুখী হয়, তবে প্রেমিক কাঁদে কেন? ঐ রোদনেই তো সুখ! সুখসাগরে যে একবার ডুবিয়া যায়, সে আর উঠিতে চাহে না।—

'হায় রে হায়! প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভালোবাসা?
দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপাসা।
প্রেমে চায় ভালোবাসি, পরাব না পরব ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা বেচা—ভালোবেসে পুরায় আসা।'

বেশ বেশ, তাহাই হইবে,—

'সিদ্দিকা। তোমায় ভালোবাসিব আবার!'

এ পাপ-জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। ইহাতে পারে, লতীফের রোদন নিষ্ফল হইবে না। হইতে পারে, 'পাষাণ-প্রতিমা' এক সময়ে দয়া-প্রতিমা হইবে। এ বিচিত্র নাট্যশালারূপ জগতে কিছুই অসম্ভব নহে। আবার দুই-চারিবিন্দু অশ্রু ঝরিল। ছি! এ কী! অদ্য তাঁহার পুরুষোচিত ধৈর্যরক্ষা অসম্ভব হইল কেন? আত্মসম্বরণ করা সম্ভব হইল কেন? আশা লইয়াই মানুষ বাঁচে—নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই! কিন্তু—

'এমন করিয়া আর বল দেখি কতবার
গড়িয়া আশার মঠ পুনরায় ভাঙিব?'

ক্রমে-যে তিনি নদীর ধারে আসিয়া পড়িয়াছেন, লতীফ তাহা বুঝিতেই পারেন নাই। নদীবক্ষে জেলে-ডিঙীর নাবিকদের কোলাহলে তিনি যেন সংজ্ঞালাভ করিলেন। এবার ভালোমতে অশ্রুমোচন করিলেন। ছি! লোকে দেখিলে কী বলিবে। তিনি নিবিষ্টচিত্তে দাঁড়াইয়া তরঙ্গিণীর তরঙ্গ গণনা করিতে লাগিলেন। কে একজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার চক্ষু ঢাকিল।

'জোনাব আলী নানা। কী সংবাদ?'

জোনাব আলীর তো মরণ নাই, তাহার সংবাদ ভালোই। কিন্তু তোমার আজ কী হইয়াছে? শুনিলাম, স্নানাহার হয় নাই, রোরুদ্যমান মা'শুককে আদর করা হয় নাই, কেন?'

ল। মানুষের মেজাজ কি সব সময় এক রকম থাকে? তাহা ছাড়া আমার কি একটু হাসিবার-কাঁদিবার স্বাধীনতা নাই?

জো। রোদন-ক্রিয়া তো আজি দেড় বৎসর হইতে—অর্থাৎ বউ-কর্ত্রীর মৃত্যুকাল হইতে চলিতেছে, কিন্তু কখনো এরূপ রক্তচক্ষু ক্রন্দন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। নিশ্চয় আমাদের ঘরে আর কেহ সিঁদ দিয়াছে বা ডাকাতি করিয়াছে। কে সে? বল তো, ডাকাত ধরিবার চেষ্টা করি। (লতীফকে পূর্ববৎ নির্বাক দেখিয়া) তুমি আশৈশব জোনাব নানাকে বড় ভালোবাস—তাহার নিকট কিছু গোপন করো না—আজ আমি 'পর' হইলাম না কি?

ল। আমরা 'চরের' মোকদ্দমাটা হারিয়াছি, তাহা তুমি শুন নাই কি?

জো। শুনিয়াছি। কিন্তু ইহাও জানি, মোকদ্দমা হারিয়া কাঁদিবে, সে ধাতুতে লতীফ গঠিত হয় নাই।

ল। এ মোকদ্দমায় অনেকগুলি টাকা নষ্ট হইয়াছে।

জো। আবার চাতুরী। আমি এত বোকা নই। তোমার প্রকৃত দুঃখের কারণ বল। যত দূর জানি, তোমার পরলোকগতা প্রণয়িনীর সঙ্গে তোমার প্রণয়ের কোনো সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ 'হিয়া দগ-দগি, পরান-পোড়ানি' কাহার জন্য?

ল। তোমার মস্তিষ্ক উর্বর—যাহা ইচ্ছা কল্পনা করিয়া যাও।

জা। দেখিব দাদা, কখনো ধরা পড় কিনা।

দুর্ভাগ্যবশত লতীফ তখনই ধরা পড়িলেন। তিনি পুনরায় চক্ষু মুছিবার জন্য রুমাল বাহির করিবামাত্র একখানি পত্র তাঁহার পকেট হইতে পড়িয়া গেল। জোনাব আলী তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইলেন। তিনি বিজয়গর্বে হাসিয়া বলিলেন—'এখন?'

ল। 'এখন' কী? কোনো গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে?

জো। আবিষ্কার করিলাম—'সিদ্দিকা'। হুঁ-মা (অর্থাৎ লতীফের মাতা) ও রফিকার মুখে ঐ নাম শুনিয়াছি বটে।

ল। কেবল স্বাক্ষর দেখিয়া বিচার করা উচিত নহে। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া বিচার করিবে।

জো। (পত্র পাঠ করিয়া) হস্তাক্ষর আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হয়। ইহা অনেকটা বিবির হস্তাক্ষরের ন্যায়। সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যখন চুয়াডাঙ্গায় ধন্না দিয়া বসিয়াছিলাম, তখন সে বিবির হাতের লেখা অনেকবার দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনিই সে বাড়িতে সর্বেসর্বা কর্ত্রী ছিলেন। চাকরেরা' 'হুজুর' অপেক্ষা 'সাহেবজাদী'কে বেশি ভয় করিত।

লতীফের ধমনিতে ধমনিতে তড়িতপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাই তো, জয়নবের কয়েকখানি পত্র তাঁহার নিকটও তো আছে। কিন্তু তিনি কেমন অন্ধ হইয়া আছেন—একবারও সে চিঠি সিদ্দিকার চিঠির সহিত মিলাইয়া দেখেন নাই। তিনি মনোভাব গোপন করিয়া জোনাব আলীকে বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় বলিতে পার—এ পত্রের লেখিকা সেই ব্যক্তি?'

জো। না ভাই, হলফ্ করিয়া বলিতে পারি না; আর সে পায় তিন বৎসর হইল—তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়াছিলাম। তবে আমার মনে হয়—উভয় হস্তলিপিতে সাদৃশ্য আছে।

ল। এখন চিঠিখানা ফেরত দাও।

জো। পথে তো কোনো কথাই নাই; আরম্ভ—'সবিনয় নিবেদন,' 'শেষ'—'বিনীতা সিদ্দিকা'; এরূপ অকর্মণ্য কাগজখণ্ড এত যত্নে রাখিয়াছ কেন?

ল। কোনোরূপে রহিয়া গিয়াছে।

জো। তাহা হইলে একটা বাক্সের মধ্যে অথবা কোনো কাগজের স্তূপে পড়িয়া থাকিত—পকেটে থাকিবার ছলে তোমার বুকের উপর থাকিত না।

ল। পকেটে পড়িয়া থাকা কি ভুল হইতে পারে না?

জো। (পুনরায় পত্রের তারিখ দেখিয়া) না, কারণ চিঠিখানি অনেক দিনের—তুমি যখন দার্জিলিং হইতে আসিয়াছ, সেই সময়ের। যদি তদবধি উহা পকেটেই থাকিত তবে এদতিন রজক-হস্তে প্রাণত্যাগ করিত। আর তুমি আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমার চুল রৌদ্রে পাকে নাই—আমিও তো যৌবন অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধ হইয়াছি। এককালে আমিও ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের যুবা ছিলাম।

ল। তোমার বার্ধক্যে কেহ সন্দেহ করিতেছে কি? বক্তৃতা তো অনেক শুনাইলে, এখন পত্রখানি দাও।

জো। এমন রাবিশ চিঠি লইয়া কী করিবে?

ল। যাহাই করি না কেন, তোমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কী?

জো। নিতান্তই ছাড়িবে না, তবে আর কী করা যায়? আচ্ছা, ঐ স্রোতে ফেলিয়া দিই—তুমি ধর।

ল। এ খেলা সহজ নহে। যদি ধরিতে না পারি,—আর তীরে উঠিব না।

জো। এত গভীর ভালোবাসা। কেবল একখানি সাধারণ পত্রের জন্য এতটা উৎসর্গ করা হইবে?

ল। দিবে কি না বল।

জোনাব আলী অগত্যা পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া বিমর্ষভাবে লতীফের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ল। কি ভাবিতেছ, নানা?

জো। আমি তোমার প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিতেছিলাম। যদি প্রণয়-লিপি
হত তবে তাহার জন্য এরূপ আগ্রহাতিশয্য শোভা পাইত!
পত্রখানির জন্য এতটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া এখন লতীফের লজ্জা
হল। কিন্তু তিনি তো আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, তখন উচিত অনুচিত বিচার করিবার
জ্ঞান ছিল না। ভয় ছিল—যদি অরসিক জোনাব আলী পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন।
তিনি নতমস্তকে ভাবিতে লাগিলেন যে নিজের ঘরে—এমনকি পথে, ঘাটে, মাঠে—
কোথাও একটু নির্জনে চিন্তা করিবার সুবিধা নাই—মানুষ এমন পরাধীন। আর সে
চিন্তাও ত কিছু সুখ-চিন্তা নহে একটা নির্মম পাষাণপ্রতিমার আলোচনা মাত্র।

জো। (সানুনয়ে) সত্যই তোমার জোনাব-নানাকে কিছু বলিবে না? সিদ্দিকা খাতুন
সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়াও চুরিবিদ্যা ছাড়েন নাই।

ল। আমাকে ছাড়িয়া এখন তাঁহাকে আক্রমণ কেন?

জো। যেহেতু—এই যে বিরস বদন, সজল নয়ন, উদান মন—'সিদ্দিকারে।
মূলীভূতা তুমিই তাহার।

লতীফ আবার ভাবিলেন—কী বিপদ! হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে যে-বেদনা লুক্কায়িত
আছে, এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িল—এখন তাহা মা জানেন,
রফিকা জানে, জোনাব নানা জানেন, তারিণীভবনেও অনেকেই জানেন। কেবল এ
বেদনা বুঝিল না—সেই পাষাণপ্রতিমা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ঋণ-শোধ

'ঐ শিলাখণ্ড পর্যন্ত উঠতো দেখি।' বরিয়াতু পাহাড়েরর একখণ্ড শিলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারিণী সিদ্দিকাকে বলিলেন—'পাহাড়ের ঐ শিলাখণ্ড পর্যন্ত উঠ তো দেখি।'

কার্তিক মাস, পূজার ছুটি। তারিণী মাত্র চারিজন সঙ্গিনীসহ রাঁচিতে পক্ষকাল যাপন করিবার জন্য আসিয়াছেন। এবার তাঁহারা পাচক সঙ্গে আনিতে পারেন নাই, নিজেরাই পালাক্রমে রন্ধন করেন। অদ্য উষা ও রাফিয়া রন্ধনের জন্য বাসায় রহিলেন; কোরেশাও শিরপীড়া বশত বাহির হইতে পারেন নাই। সহজে একটা পুষপুষ* পাওয়া গেল বলিয়া তারিণী কেবল সিদ্দিকাকে লইয়া বরিয়াতু পাহাড়ে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

অপরদিকে অশ্বপদ-ধ্বনি শ্রবনে তাঁহারা সেইদিকে চাহিলেন। একজন বৃদ্ধ ইংরাজ অশ্বারোহণে পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্দিকা স্তম্ভিত হইলেন। তখন সায়হ্ন রবির রক্তিমছটায় আকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। সিদ্দিকা ধীরে ধীর নামিয়া আসিয়া বলিলেন—'বড় দিদি! চলুন এখন বাসায় যাই।'

তা। হাঁ চল; যাইতে হয়তো রাত্রি হইবে। পুষপুষে মাত্র দুইজন কুলি।

* পুষপুষ—পাল্কানির মতো গাড়িবিশেষ। ইহা দুই কিম্বা ততধিক মানুষে টানে; একজন পশ্চাতে ও একজন সম্মুখে থাকে। সম্ভবত পশ্চাদ্দিক হইতে ঠেলা দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম 'পুষপুষ' (Push-push) হইয়াছে।

তারিণী ও সিদ্দিকা পুষপুষের জানালা দিয়া পথের দৃশ্য এবং পাহাড়ের [illegible] দেখিলেন, সে অশ্বারোহীও ফিরিয়া আসিতেছেন। ঐ যা! ঘোড়াটা কিসে [illegible] পড়িয়া গেল। ঘোড়া তো উঠিয়া দাঁড়াইল, আরোহী আর উঠিল না। তারিণীর [illegible] কিছুদূর চলিয়া গেল।

আবার তাঁহারা পুষপুষের পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, শ্বেতাঙ্গটি [illegible] পড়িয়া আছেন, আর ছিন্নরাশ ঘোড়া আরোহীর পাশে দাঁড়াইয়া যেন তাহার জন্য অনুশোচনা করিতেছে। নিকটে একটিও লোক নাই যে তাহাদের [illegible] করিবে। তখন সায়াহ্ন-গগনে মাত্র একটি তারকা দেখা দিয়াছে। তারিণী ভাবিল লোকটা এ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে শৃগাল-কুকুরে টানাটানি করিবে।

পুষপুষ্ ফিরাইয়া লইয়া তাহারা কুলিদ্বয়ের সাহায্যে আহত লোকটিকে [illegible] তুলিলেন। পুষপুষে কোনোপ্রকার বেঞ্চ বা উচ্চ আসন নাই—তাহার সমতল মেঝে স্বচ্ছন্দে শয়ন করা যায়। মৃতকল্প লোকটিকে সেইখানে শয়ন করাইয়া দিয়া তারিণী সিদ্দিকা পদব্রজে চলিলেন।

কিয়দ্দূরে একটি ছোট মসজিদে মগরেবকালীন (সান্ধ্য) উপাসনা হইতেছিল। [illegible] হইতে জল আনিয়া তারিণী আহত ব্যক্তির চক্ষু ও মুখে দিয়া তাহার জ্ঞান সঞ্চার বৃথা চেষ্টা করিলেন। সিদ্দিকা পথপার্শ্বে সায়াহ্ন-নামাজ শেষ করিয়া স্বীয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া তাহার মাথায় ও বাহুতে পটি বাঁধিয়া দিলেন। পুষপুষঅলাদের লোকটিকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিতে বলিয়া তাঁহারা পদব্রজে তাহার অনুসরণ করিয়া পুষপুষ্ মূহূর্তমধ্যে তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

প্রভুভক্ত ঘোড়াটি পুষপুষের সঙ্গে চলিল। তদ্দর্শনে সিদ্দিকা বলিলেন— 'দেখিয়াছ বড়দিদি! ঘোড়াটি আপনিই পুষপুষের সঙ্গে যাইতেছে।'

তা। তাই তো, এইসব ঘোড়া-গরু ভালোবাসার যতখানি প্রতিদান দিয়া থাকে মানুষ যদি ইহার দশমাংশও দিত—

সি। তাহা হইলে আপনার ছাত্রীদের অভিভাবকগণ আপনাকে অমন সুন্দর* উপরত্নে ভূষিত করিতেন না।

তা। (উচ্চহাস্যে) ওহো! সেদিনকার কথা তুমি এখনো ভুলিতে পার নাই? তবে যদি উচ্চ, ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে'। কাহারও কথায় কি আর গায়ে ফোস্কা পড়ে

সি। গায়ে ফোস্কা না পড় ক, মনে ফোস্কা পড়ে!

আহারান্তে রাত্রি ১০টায় সময় ঊষা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এত কষ্ট করে বারিয়াতু হইতে তিন-চারি মাইল পদব্রজে আসিলে কেন? তোমাদের সে পুষপুষ কী হইল?

তারিণী তখন সেই পথে-কুড়ানো আহত ইংরাজের কথা বলিলেন।

কোরেশা বঙ্গভাষায় কথা বলিতে ভালোবাসেন; তিনি বলিলেন— 'পুষপুষের ভাড়া লইতে আসিলে জানা যাইবে, তাহাকে হাসপাতালে দিয়াছে, না কোথায়।

সি। পুষপুষ্-কুলিদের অগ্রিম ভাড়া এবং বখশিশ চুকাইয়া দেয়া গিয়াছে। তাহারা আর আসিবে না।

কো। মিসিস্ সেন! আপলোক এমন কাচ্ছা কাম করিলেন কেন? কুলিরা লোকটাকে রাস্তা মেঁ ফেলিয়া দিয়া আপ্না ঘর গিয়াছি।

তা। পাটনা কিংবা কলিকাতার ঠিকা-গাড়িঅলা হইলে সেরূপ করিত। [illegible]

* বেশ্যা।

কোল, সাঁওতালেরা এখনো তত সভ্য হয় নাই। যাক হাসপাতাল তো এখান হইতে অনেক দূরে নহে, আমি এখনই মালীকে পাঠাইয়া সংবাদ আনিতেছি।

পরদিন প্রাতঃকালে তারিণী, উষা ও সিদ্দিকা সেই আহত ইংরাজিটির সংবাদ লইতে গেলেন। তাঁহার পকেটে কিছু টাকা, নোট-বহি ও কার্ড-কেস পাওয়া গিয়াছে। সিদ্দিকা তাঁহার একখানি কার্ড চাহিয়া লইয়া দেখিলেন। কার্ড-দর্শনে তিনি পুনরায় রোমাঞ্চিত হইলেন—কার্ডে নাম ও ঠিকানা ছিল।

মিস্টার চার্লস জেমস রবিনসন,
প্লেটার অ্যাড জমিনডার,
চুয়াডাঙ্গা।'

সিদ্দিকা তারিণীর অনুমতি লইয়া হাসপাতালে মি. রবিনসনের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি তথায় রাত্রিবাস করিতেন না, কেবল সমস্ত দিন থাকিতেন। তাঁহার সহিত পালাক্রমে তারিণী ও অপর মহিলাগণ হাসপাতালে থাকিতেন। একদিন রাফিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'মিসিস সেন, এবার সিদ্দিকাকে আতুরাশ্রমের ভার দিবেন, রোগীসেবা করিয়া উহার সাধ মিটুক!'

তা। কী করি বোন। 'নেপাল যাও—কপাল সাথেই' ! এখানকার হাসপাতালে যত্ন করিবার তেমন লোক নাই। আমি পদ্মরাগের এই মহৎ দয়াধর্মে বাধা দিতে চাহি না।

একদিন পরেই রবিনসনের জ্ঞান হইল; তাঁহার মস্তকের আঘাত তত গুরুতর ছিল না। বাহু এবং উরুদেশের আঘাতই সাংঘাতিক ছিল। তিনি আর্তনাদ করিতেছিলেন, 'হায় মৃত্যু! মৃত্যু হয় না কেন?'

রেভারেন্ড হেনরি হোয়াইট নামক একজন পাদরি, রবিনসনকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। রবিনসনের যন্ত্রণা—শারীরিক ক্ষতের জন্য তত নহে, কিন্তু তাঁহার কলুষিত আত্মা পাপ-তাপে দগ্ধ, সেই যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করেন। তিনি পাদরির হাত ধরিয়া বলিলেন, যদি আমি মরিতেছি, তবে আমাকে অবশ্য পাপ স্বীকার করিতে হইবে! আহা! আমি মরিতেছি! ও হোয়াইট! পিতা । আপনি আমার পাপস্বীকার শুনিবেন?'

হোয়াইট তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। রবিনসন উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলেন, 'পারিলেন না। তীব্রস্বরে বলিলেন, 'সত্যই আমি মরিব? আমার মরণ বড় শীঘ্র আসিল—'

সিদ্দিকা একপাত্র দুধ-ব্রান্ডি আনিয়া রোগীকে খাইতে দিলেন। রবিনসন বলিলেন, 'নার্স! তুমি জানো না, আমি কেমন হৃদয়হীন পাষণ্ড। একবার আমার পাপের বোঝা একটি নিরীহ বালিকার স্কন্ধে দিয়া—তাহাকে মারিয়া—আমি বাঁচিয়া আছি।'

ছয়দিন হইতে রবিনসন হাসপাতালে আছেন। তাঁহার অবস্থা ক্রমশ মন্দ হইতেছে; আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই। অপরাহ্নে শ্বেতশ্মশ্রু রেভারেন্ড হোয়াইট আসিলেন। রবিনসনকে অধীর দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ঘুমাইতে চেষ্টা করিতে বলিলেন।

রবিন। (উচ্চৈঃস্বরে) আমার ঘুম নাই—আমার শান্তি নাই। হোয়াইট, আপনি জানেন না, আমি কী! আমি রাগে অন্ধ হইয়া নরহত্যা করিয়াছি! হাঁ, ঐ দেখ, তাহার আত্মা আমাকে ভয় দেখাইতেছে! ও হোয়াইট! আমাকে রক্ষা করুন!

রোগী এই পর্যন্ত বলিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। উষা তাঁহাকে একটু টনিক ঔষধ পান করাইলেন। সিদ্দিকা বাতাস করিতে লাগিলেন।

জ্ঞান হইলে রবিনসন উঠিয়া বসিলেন। বিনীতভাবে পাদরিকে বলিলেন, 'পিতা,

সকলকে বিদায় দিন, কেবল আপনাকে আমার মনের কথা বলিব।' হোয়াইট প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এখন কেবল পাপী ও পাদরি রহিলেন। ইহাদের এই গুণটা বেশ যে, মৃত্যুকালে পাপ স্বীকার করে। ইহাতে পরলোকে মুক্তি হয় কিনা, আল্লাহ জানেন; কিন্তু আমাদের একটি লাভ এই যে, লোকটার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারি।

রবিন। আমি চুয়াডাঙ্গায় অনেক দিন নীলের চাষ করিতেছিলাম। কত লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দরিদ্র লোকদের অভিশাপে আমার এই দশা হইয়াছে। কত শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছি, সংখ্যা নাই। পাপের মাত্রা ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর হইয়া চলিল। শেষে স্থানীয় জমিদার মুহম্মদ সোলেমানের নিকট ৫০ বিঘা জমি চাহিলাম। তিনি দিলেন না। ভয় প্রদর্শন করিলাম, তিনি ভীত হইলেন না। তিনি অতি মহৎ লোক ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও ব্যর্থ হইল। তখন আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলাম না—আর সহ্য হইল না—

পাদরি। তুমি অত উত্তেজিত হইও না, ধীরে ধীরে কথা কও।

রোগীর মাথাটা ঢলিয়া পড়িল। হোয়াইট আর একটা বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার নিচে দিলেন।

র। আমাকে বাধা দিবেন না, বলিতে দিন, যাহা বলিবার আছে বলিব। ইচ্ছা হইল, সোলেমানকে ডাকিয়া আনিয়া কুকুরের মতো গুলি করি। তাহা তখন ঘটিল না। সোলেমানকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম, তিনিও সমান সমান উত্তর দিলেন। আমাকে 'সাহেবলোক' মনে করিয়া কিছুমাত্র ভয় করিলেন না। ইহা কি আমার সহ্য হয়? কী? –তিনি কি মোগল-রাজ্যে বাস করিতেছিলেন যে, তাঁহার এমন নির্ভীক স্বভাব?

আমি সেই রাত্রে দলবল লইয়া গিয়া প্রথমত সোলেমানের গলা কাটিলাম। তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র আজিজ আমার প্রতি একখানা ছোরা নিক্ষেপ করিল—ছোরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। সেই ছোরা লইয়া তাহাকে হত্যা করিলাম! তাহাকে বধ করা আমার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু সে কেন পিতার হইয়া যুঝিতে আসিল? কেন অ-মার প্রতি ছোরা নিক্ষেপ করিল? পিতা! ঐ দেখুন সোলেমান!—আমাকে রক্ষা করুন! রক্ষা—

হোয়াইট। ক্ষান্ত হও, আর ওসব কথা বলিও না। এখন শান্ত হও, ঘুমাইতে চেষ্টা কর।

র। না, এখন আর ভয় নাই,—আমি যাহা বলিতেছিলাম, শুনুন। আমি ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিলাম, একটি বালিকাকণ্ঠ আমাকে ইংরাজি ভাষায় শাসন করিয়া বলিল, 'আমি সব দেখিলাম মি. রবিনসন। আপনার নিস্তার নাই!' তখন আর ফিরিয়া গিয়া বালিকার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি বীরের মতো দ্রুতপদে চলিয়া আসিলাম।

হোয়াইট। (স্বগত) কী বীরত্বের প্রশংসা।

র। পরদিন হইতে তাহাদের ওখানে ডাকাতির তদন্ত আরম্ভ হইল। সোলেমানের ভগ্নী ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিল। সেই আমাকে তিরস্কার করিয়াছিল। আজিজ আমা-কর্তৃক যে-ছোরায় নিহত হইয়াছিল, সে ছোরাখানি জয়নব বিবির, এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জয়নবকেই নরহত্যার জন্য আসামি করিতে চেষ্টা করিলাম!

আমার জনৈক বন্ধু ব্যারিস্টার ছিলেন, তাঁহাকে আমার পাপকার্যে সহায়তা করিবার জন্য ডাকিলাম। ব্যারিস্টার মি. লতিফ আলমাস আমার অভিসন্ধি অবগত হইয়া খুব উৎসাহের সহিত জয়নবকে আসামি সাজাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে সোলেমানের বাড়ি গিয়া দেখিলেন, জয়নব চিতা সাজাইয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছে! সে

সময় মি. আলমাস তাহাকে রক্ষা করিলেন। পরদিন তাহার আর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। হয়তো সে অগাধ জলে ডুবিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে! পিতা—

রবিনসন হঠাৎ নীরব হইলেন। তিনি ভয়ে কাঁপিতেছিলেন। আবার চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'পিতা, পিতা! আমায় রক্ষা করুন। আপনি কি মনে করেন, আমি মুক্তি পাইব? আহা! না,—আমার মুক্তি কোথায়?'

হোয়াইট অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, 'তুমি নিশ্চয় মুক্তি পাইবে, ঈশ্বর দয়ায় সাগর।' রোগী ক্ষীণ করুণ স্বরে বলিলেন—

'নরহত্যা করিয়া আমার যত পরিতাপ হইতেছে, তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ পরিতাপ জয়নবের জন্য হয়। আমি তাহাকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছি। আমি কেন সে নির্দোষ বালিকার প্রতি অত্যাচার করিলাম?'

হোয়াইট। তবে এখন তুমি কী করিতে চাও? কী করিতে পারিলে তোমার মনে সান্ত্বনা হইবে?

র। আমি চাই—জয়নব জীবিত আছে,ভালো আছে, এই কথা শুনিতে। তাহা হইলে সুখে মরিতে পারি।

হো। তুমি আমাকে যাহা বলিলে, এসব কথা লিখিয়া দিলে জয়নবের উপকার হইতে পারে। লিখিবে?

র। অবশ্য আমি লিখিব। কাগজ কলম দাও।

লিখিবার সরঞ্জাম আনীত হইলে রবিনসন কম্পিতহস্তে লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—লিখিতে না পারিয়া হোয়াইটকে বলিলেন, 'আপনি লিখুন, আমি বলিয়া যাই। পরে আমি স্বাক্ষর করিব।'

তাহাই হইল। সেদিন স্বাক্ষর করা হইল না, কারণ রাত্রি হইয়াছিল। পরদিন দুইজন বিশ্বস্ত উকিল ও ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাকাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রবিনসন স্বাক্ষর করিলেন।

অদ্য রবিনসনের অবস্থা বড় শোচনীয়। তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে। পাপী হউক, পাষণ্ড হউক,—যেই হউক, সে এখন মরিতেছে! ক্রমশ রবিনসনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি হইল—তিনি কেবল এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন আর সময়-সময় বলিতেছেন—'জয়নব, তুমি কোথায়? তোমার প্রতি যে-অত্যাচার করিয়াছি তাহার যথেষ্ট প্রতিফল পাইলাম!' কতক্ষণ পরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কে আছ? তোমরা কেহ জয়নবের সংবাদ বলিতে পার? এ অন্তিমকালে আমাকে শান্তি দিতে পার?'

সি। আপনি যাহা চাহেন, তাহাই পাইবেন। আপনি আরোগ্যলাভ করুন।

র। (বিকট হাস্যে) আরোগ্য লাভ?—আর না। যাহা চাই, তাহাই দিবে? আচ্ছা, জয়নবের সংবাদ দাও দেখি!

সি। শুনুন। আমি নিশ্চয় জানি, জয়নব জীবিত আছে। সুখে নিরাপদে আছে।

র। (পূর্ববৎ হাসিয়া) আহা! পরদুঃখকাতরা বালিকা! তুমি আমাকে ঠকাইবে? অমন মনগড়া দুই-চারি কথা কে না বলিতে পারে?

সি। আপনি কী প্রমাণ চাহেন? সে জয়নব বাঁচিতেই আছে।

র। আমি তাহাকে দেখিতে চাহি।

সি। দেখিলে আপনি চিনিবেন? আপনি তাহাকে কখনও দেখিয়াছেন কি?

র। তাহার কথা শুনিয়াছিলাম, কণ্ঠস্বর চিনিব বলিয়া বিশ্বাস হয়।

সি। ইহাও আপনার ভুল। প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার তাহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা আবার চিনিবেন? তবে চিনিতে পারেন কই?

এবার রোগী বিস্ফারিত-নয়নে সিদ্দিকার মুখপানে চাহিলেন, যেন চিনিতে চেষ্টা

করিতেছেন। পরে বলিলেন, 'তুমি কিরূপে জানো যে তিন বৎসর পূর্বে আমি [illegible] কথা শুনিয়াছিলাম?'

সি। জয়নব আমাকে জানাইয়াছে।

র। (সহসা সিদ্দিকার হাত ধরিয়া) এখন বুঝিলাম—তুমি—তুমি সেই জয়নব। বুঝিয়াছি! বল, তুমি নিজ মুখে বল যে, তুমি জয়নব, তবে আমি হাত ছাড়িব।

সি। যদি এই কথার উপর আপনার শান্তি নির্ভর করে, তবে বলি—আমি সেই অভাগিনী জয়নব।

র। (সিদ্দিকার হাত ছাড়িয়া) আমাকে প্রতারণা করিলে না তো?

সি। আপনার সন্দেহ দূর করিবার জন্য যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।

র। তবে সত্যই তুমি জয়নব। বল, তুমি কিরূপে পলায়ন করিয়াছিলে? আর এখানে কিরূপে আসিলে?

সি। আমি ভ্রাতার ইংরাজি পোশাক পরিয়া ছদ্মবেশে একখানি শাড়ি ও কয়েকশত টাকা একটা হ্যান্ডব্যাগে লইয়া বাহির হই। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের বহির্বাটিতে একটা পালকি উপস্থিত ছিল, তাহাতেই আমি স্টেশনে গেলাম। তাড়াতাড়ি যাইয়া ট্রেন পাইলাম। সেই গাড়িতে নৈহাটিতে আসি। সেখান হইতে হুগলি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল হওয়ার সেইখানে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হই। আমি অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতে করিতে একটা মসজিদের পার্শ্বে আসিয়া পড়ি। সেই পথে তারিণী বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষয়িত্রী,—মিসিস ঊষারানি চ্যাটার্জি, মিসিস হরিমতি ঘোষ ও মিস বিভা চক্রবর্তী যাইতেছিলেন; তাঁহাদিগকে আমার কল্পিতা ভগিনীকে আশ্রয় দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলাম।

হোয়াইট সেই কক্ষের এককোণে দাঁড়াইয়া রোগী ও সেবিকার কথাবার্তা মনোযোগের সহিত শুনিতেছিলেন। সিদ্দিকাকে থামিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—'বলিয়া যান, ইতস্তত করিবেন না। রবিনসন আর বেশিক্ষণ বাঁচিবেন না।'

সি। তাঁহারা আশ্রয়দানে সম্মতা হইলে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতায় গেলাম। ঠিকাগাড়িতে বসিয়া পুরুষ-বেশ পরিবর্তন করিয়া শাড়ি পরিলাম। এইরূপে আমি তারিণী-ভবনে আসিয়াছি। এতকাল ইহারা আমাকে 'সিদ্দিকা' নামে জানিতেন-আজি আমার প্রকৃত পরিচয় জানিলেন।

সিদ্দিকার গল্প শুনিয়া তারিণী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ যুগপৎ বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। এখন তাঁহারা বুঝিলেন, কেন তারিণী-ভবনের কোনো লোক সিদ্দিকার 'ভাই'কে দেখিতে পায় নাই।

র। জয়নব! তুমি আছ, দেখিলাম। এখন আমি সুখে মরিতে পারি। তুমি কিরূপ আশাতীত ঋণ শোধ করিলে! আমি তোমার অশান্তির কারণ হইয়াছিলাম, তুমি আমার শান্তির কারণ হইলে—স্বহস্তে আমার সেবা করিলে! তুমি ধন্য! তুমি বীরবালা! আমি তোমাকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দিব।

সি। আমি আপনার এক পয়সাও লইব না। আপনার অন্তিমকালে শুশ্রূষা করিতে পারিলাম, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। এতদিনে আপনার ঋণ শোধ হইল।

র। (পাদরির প্রতি) পিতা! হোয়াইট! এখন আর পার্থিব চিন্তা নাই। পিতা! নিকটে আসুন। এখন আমার আর কোনো দুঃখ নাই—আর—আমার জন্য প্রার্থনা—

রবিনসন আর কথা কহিতে পারিলেন না। শয্যায় এলাইয়া আর উঠিলেন না—সব শেষ হইয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

সুবর্ণরেখা

তারিণী সদলবলে সুবর্ণরেখা নদীর পুলে বেড়াইতে আসিয়াছেন। অপরাহ্ন চারিটার সময় সেতুর উপর দিয়া ট্রেন যাইবে, ইঁহারা নিচে থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিবেন। পুষ্পুষের কুলিরা বলিয়া গেল যে তাহারা সন্ধ্যা ছয়টায় আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে।

সুবর্ণরেখা এ সময় বর্ষাকালের মতো খরস্রোত না হইলেও তাহার স্রোত এখনও যথেষ্ট বেগবতী। নদী গভীর নহে—সমস্ত নদীর জল 'হরে দরে হাঁটু জল' হইবে, কিন্তু স্রোতের বেগ কী ভীষণ! এ নদী পাহাড়ের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। পাহাড় উচ্চ নহে, বড় বড় শিলাখণ্ড বিশেষ। নদীতল কর্দম ও উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। নদী প্রশস্তও নহে। এই অল্প-পরিসর নদীটুকু কেহ পদব্রজে পার হইতে পারে না বলিয়া ইহার উপর সেতু নির্মিত হইয়াছে। ট্রেনও এই পুলের উপর দিয়া চলে।

তারিণী সেতুর নিম্নে বালির উপর বড় একটা শতরঞ্জি পাতিয়া সকলকে লইয়া বসিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঊষা, কোরেশা ও সিদ্দিকা নদীর জলে নামিলেন। সিদ্দিকা এখন পূর্ববৎ সে গভীর চিন্তামগ্না বিষাদময়ী মূর্তি নহেন। রবিনসনের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার এই শুভ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন তিন সদানন্দা হাস্যময়ী কিশোরী—তাঁহার প্রফুল্লতা, হাসির ফোয়ারা ও স্ফূর্তি দেখে কে! সেতুর অনতিদূরে একখানি বৃহৎ প্রস্তরের উপর বসিলেন। তাঁহার বিলম্বিত চরণযুগলের উপর দিয়া ঊর্মিমালা বহিয়া যাইতে লাগিল। ঊষা ও কোরেশা কিঞ্চিৎ দূরে অপর দুই খণ্ড শিলায় উপবেশন করিলেন।

সায়াহ্ন উপাসনার সময় যৎকালে রাফিয়া ও কোরেশা তারিণীর শতরঞ্জির উপর নামাজ পড়িলেন, সিদ্দিকা সেই শিলাখণ্ডের উপর উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। তারিণী সোৎসুকে দেখিতেছিলেন যে, উচ্ছ্বসিত বীচিমালা আসিয়া সিদ্দিকাকে ভিজাইয়া না দেয়। ঊর্মিমালা 'ধরি ধরি' করিয়াও সিদ্দিকাকে ধরিতে পারিল না।

কুলিরা তখনও আসিল না। অদ্য কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি, শশাঙ্ক বিলম্বে উদিত হইবে। এইসব ভাবনায় তারিণী উদ্বিগ্ন হইলেন। সেই সময় দেখেন, কোথা হইতে লতীফ আসিয়া উপস্থিত। তারিণী সহর্ষে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বসিতে বলিলেন। মাত্র চারি-পাঁচ দিন হইল, তিনি রাঁচি আসিয়াছেন। পুষ্পুষ্ আসে নাই শুনিয়া লতিফ বলিলেন, 'সেজন্য কোনো চিন্তা নাই, আপনারা দুইবারে আমার মোটরে যাইবেন। আর একটু বসুন।'

রাফিয়া ও তারিণীর সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর লতিফও জুতা-মোজা খুলিয়া জলে নামিলেন। তিনি সিদ্দিকার নিকট গেলেন না; কারণ কয়েক মাস হইল, সিদ্দিকা তাঁহার চিঠির উত্তরে যে নিষ্ঠুর পত্র লিখিয়াছেন, তাহা লতীফ অদ্যাপি ভুলেন নাই। তিনি ঊষার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'দিদি! ছেলেটিকে (অর্থাৎ কোরেশার তিন বৎসরের পুত্রটিকে) সাবধানে রাখিবে, এ স্রোতের মুখে পড়িলে আর রক্ষা নাই।'

কোরেশা। এখানে আর ডুবিয়া মরিতে হয় না!

উ। ডুবিবে না সত্য, কিন্তু জলের স্রোত এমন ভীষণ যে শিলাখণ্ডের [illegible] খাইতে খাইতে মরিতে হইবে।

লতিফ বসিবার জন্য স্বীয় ছড়ির সাহায্যে একখণ্ড প্রস্তরের অনুসন্ধান [illegible] করিতে কিরূপে সিদ্দিকার উপবিষ্ট প্রস্তরখণ্ডে আসিয়া বসিলেন, তাহা তিনি [illegible] পারেন নাই। তাঁহারা উভয়ে কল্লোলিনীর মধুর সঙ্গীত শ্রবণে আত্মহারা [illegible] স্থিরদৃষ্টিতে তাহার নৃত্যশোভা দেখিতেছিলেন। এই সুবর্ণরেখা নদীটি তাঁহাদের [illegible] প্রেমের অতি সুন্দর মনোরম উপমা—নদী দিবানিশি অবিশ্রান্ত পাহাড়ের চরণে [illegible] ঠুকিয়া মরিতেছে–আর পাহাড় তাহার তরঙ্গ-প্রেমাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত—চূর্ণ-[illegible] হইয়া শতধা হইতেছে! এই-যে মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ—বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন—[illegible] বড় চমৎকার! বড় চিত্তহারী!!

এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কখন যে শশী গগনে উদিত হইল, তাহা [illegible] জানিতেই পারিলেন না! কোথা হইতে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া সুধাকরকে [illegible] করিল। কিছুক্ষণ পরে লতিফ বলিলেন, 'এই নদীর মতো অনেক বোকা লোক [illegible] পাথরে মাথা ঠুকিয়া মরে!'

প্রসন্নবদনা সিদ্দিকা উত্তর দিলেন, 'আর পাথর বুঝি চূর্ণ হয় না?'

ল। কিন্তু সাধারণ প্রস্তর অপেক্ষা পদ্মরাগ একটু বেশি মজবুত।

'সেইজন্যই তো পদ্মরাগ এখনও টিকিয়া আছে!'

লতিফ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, তারিণী! তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, তারিণী ওরূপ কথা কেন বলিলেন।

তারিণী হয়তো তাঁহার কথাটিও শুনিয়াছেন, ভাবিয়া সিদ্দিকাও অতিশয় লজ্জিত হইলেন।

গগনে পূর্ণচন্দ্র সহসা মেঘমুক্ত হইয়া সকলের মুখের উপর খানিকটা উজ্জ্বল চন্দ্রিমা ঢালিয়া দিল। তারিণী সেই সুযোগে লতিফ ও সিদ্দিকার অপ্রতিভ মুখভাব দেখিয়া আমোদ অনুভব করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'চল পদ্মরাগ, পুষ্‌পুষ্‌ আসিয়াছে।'

তাঁহারা সকলে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া লতিফ ভাবিলেন, তারিণীর সহিত এসময় একটিও কথা না-বলা অভদ্রতা হইয়াছে। তাই তিনি ত্বরিত পদে [illegible] ছিটাইতে ছিটাইতে অগ্রসর হইয়া 'শুনিলাম, মিসিস সেন আপনারা নাকি সেদিন আবার একজন আহত লোক কুড়াইয়া আনিয়াছিলেন।'

তা। হাঁ মি. অটমাস। ঢেঁকির আর অন্য কাজ কী আছে?

ল। ঈশানবাবু বলেন, আপনি যেখানেই যান, হাসপাতাল আপনার সঙ্গে যায়।

তা। এবার আমার সঙ্গে হাসপাতাল নাই; সেই আহত ইংরাজটিকে স্থানীয় হাসপাতালে দিয়াছিলাম। আজি চারিদিন হইল বেচারা মারা গিয়াছেন।

ল। আপনারা প্রত্যহ তাঁহাকে দুই বেলা দেখিতে যাইতেন, এবং আপনার সঙ্গিনীগণ হাসপাতালে গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন।

তা। আপনি এত সংবাদ কোথায় পাইলেন?

ল। সমস্ত রাঁচিময় এ-কথা রাষ্ট্র। ফুলের সৌরভ কি প্রচ্ছন্ন থাকে?

রাফিয়া। (সিদ্দিকার কানে কানে) সেইজন্যে দুষ্ট ভ্রমর পদে পদে অনুসরণ করে

বিশ্বপ্রেমিকা

বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশের সময় তারিণী-ভবনের বাড়ি মেরামত হইয়াছে। এখন জিনিসপত্র যথাস্থানে গুছাইয়া রাখা হইতেছে। অদ্য সিদ্দিকা দুইজন পরিচারিকার সাহায্যে পাঠাগারের একটি আলমারিতে পুস্তক সাজাইয়া রখিতেছেন। বেলা তখন অপরাহ্ন। তাঁহার মাথার উপর হইতে অঞ্চল সরিয়া পড়িয়াছে, আলুয়ায়িত অলকগুচ্ছ বৈদ্যুতিক পাখার গরম বাতাসের তাড়নায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে; কিন্তু সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি একাগ্রচিত্তে তালিকার সহিত পুস্তকগুলি মিলাইয়া লইতেছেন।

তারিণী বসিবার ঘরে কয়েকজন মহিলা-অতিথির অভ্যর্থনায় ব্যস্ত আছেন। এই সময় তাঁহার বালক-ভৃত্য কোনো ভদ্রলোকের আগমন-সংবাদ দিল। তিনি বালককে বলিলেন, 'আফিস কামরা তো বড় অগোছালো রহিয়াছে, ভদ্রলোককে পাঠাগারে বসাও; আমি শীঘ্রই আসিতেছি।'

আদম শরিফ* তদনুসারে অভ্যাগতকে পাঠাগারে লইয়া গেল। তথায় তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনয়নে সিদ্দিকার পুস্তক সাজানো দেখিতে লাগিলেন। পরিচারিকাদ্বয় সিদ্দিকাকে সাবধান করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভদ্রলোকটি তাহাদিগকে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন। সিদ্দিকা এমন তন্ময় ছিলেন যে, তাহাদের মৃদু হাস্য এবং চক্ষুর ইঙ্গিত দেখিতে পান নাই। অবশেষে আগন্তুক বলিলেন,—'সিদ্দিকা, এখন তুমি যোগশিক্ষা করিতেছ নাকি? বড় যে গম্ভীরভাব দেখি!'

সিদ্দিকা চমকিয়া উঠিয়া এবং এস্তভাবে বস্ত্রাঞ্চল সম্বরণ করিয়া, 'এ কি আপনি এখানে! —বসুন!' বলিয়া আবার পুস্তকসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন।

লতিফ। অতিথির অভ্যর্থনা এইরূপেই হয় নাকি?

সিদ্দিকা। (নম্রস্বরে) 'ক্ষমা করিবেন, আমার কাজ শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। আর আপনি তো আমার অতিথি নহেন!

লতিফ এখন সিদ্দিকার প্রকৃত পরিচয় অবগত আছেন। এই সিদ্দিকা—যাঁহাকে তিনি প্রাণতুল্য ভালোবাসেন—তাঁহার সেই ধর্মপত্নী জয়নব। সেইজন্য অদ্য তিনি একটু জোর করিয়া সিদ্দিকার সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইলেন। সিদ্দিকা অগত্যা তাঁহার সহিত 'তুমি' সম্বোধনে কথাবার্তা বলিতে সম্মতা হইলেন। এই যৎসামান্য জয়লাভের পর লতিফ বলিলেন,—'প্রায় আট মাস পরে দেখা হইল, তবু তো তুমি যথোপযুক্ত আগ্রহের সহিত আমায় স্বাগত সম্ভাষণ করিলে না!'

সি। তুমি এতটা আশা করিলে কেন? তুমিই তো একমাত্র স্নেহভাজন বা চিন্তার বিষয় নহ। যাহার হৃদয়ে কেবল একজনের স্থান থাকে, সে তাহাকে ষোলআনা যত্ন দিতে পারে; যাহার চারিজন বন্ধু থাকে, সে প্রত্যেককে চারিআনা দিবে। এইরূপ যাহার প্রেমে যত বেশি অংশী থাকে, তাহার প্রেমের ভাগ প্রত্যেকের জন্য ততই কম হইয়া পড়ে। হৃদয়টি সীমাবদ্ধ, তাহার পরিমাণ বাড়িতে পারে না। তুমি এ

* বালক-ভৃত্যের নাম—'আদম শরিফ'। গাঞ্জামের (মদ্রাজের মুসলমানদের নাম ঐ ধরনের হইয়া থাকে। তত্রত্য জেলেনীদের নাম আরও অদ্ভুত, যথা—'ডাঙাসী'।

বিশ্বপ্রেমিকার নিকট এক পয়সা—না এক পাই পরিমিত স্নেহের অধিক [illegible] পার না। কত 'পথে কুড়ানো' লোকের কথা আমাকে ভাবিতে হয়।

ল। আমি এখন তোমার সেরূপ 'পথে কুড়ানো লোকের' তালিকায় [illegible] যাহা বলিলে, তাহা অপরের পক্ষে খাটে—আমার সম্বন্ধে নহে। আমি তোমার [illegible] —ষোল আনা না হউক,—একটু অধিক যত্নের আশা করি,—না, দাবি করি। তোমার বক্তৃতার উত্তরে বলি, হৃদয় সীমাবদ্ধ হইবে কেন? বিশেষত বিশ্বপ্রেম। হৃদয় সীমাবদ্ধ হইলে বিশ্ব স্থান পাইবে কোথায়?

সি। যে স্থান আছে, তাহাতেই থাকিবে। যেখানে—যে ঘরে—পাঁচটি [illegible] দশজন থাকিত, সেই পাঁচ ঘরে পাঁচশত জনও থাকিবে। এইজন্য স্থান অবশ্য [illegible] হইবে, এবং যত্নের ভাগে টানাটানি পড়িবে।

ল। তর্ক করিতে ইচ্ছুক ছিলে বটে, কিন্তু পারিলে না! না, হৃদয় সীমাবদ্ধ নয়। উহা অনলের মতো, যত বাতি জ্বালাও—সমভাবে জ্বলিবে। যত পতঙ্গ পোড়াইতে পার— পুড়িবে!

সি। (স্মিতমুখে) দগ্ধ পতঙ্গের প্রতি দয়া হয় বটে; কিন্তু হইাও বলি, পতঙ্গের [illegible] কোনো দোষ নাই

ল। দোষ আছে বইকি। সর্বাপেক্ষা প্রধান দোষ এই যে, সে সৌন্দর্যভিখারি-প্রেমে ভিখারি। সুতরাং ভিক্ষুকের লাঞ্ছনাই তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য। সেইজন্যে সে প্রাণদণ্ড প্রায়শ্চিত্ত করে।

সি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু উপায় কী—

বুলবুলে দিলেন প্রভু সুমধুর স্বর,
পতঙ্গের ভাগ্য হল পুড়িয়া মরণ;
দিলেন আমার ভাগে শোক-নিপীড়ন,
*দেখিলেন,—সব হতে যাহা কষ্টকর!**

ল। আর আমার ভাগে দিয়াছেন, মরীচিকার অনুসরণ করা!

সি। যদি জানোই 'মরীচিকা,' তবে বৃথা অনুসরণ কেন? তোমার জীবনে কি অন্য কাজ নাই?

ল। মানুষের মন যদি সুবোধ বালকের মতো যুক্তিতর্কের বশীভূত হইত তবে এ পাপ পৃথিবী হইতে অর্ধেক যন্ত্রণা ঘুচিয়া যাইত। যাহা হউক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখন আমার সিদ্দিকা-লাভে কোনো অন্তরায় নাই।

সি। আবার বৃথা আশা! তা তুমি বাতাসে ঘর বাঁধিতেছ—বাঁধো। যত উচ্চ ত্রিতল প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাও—কর।

ল। আর তোমার ইচ্ছা হইলে আমার অতিসাধের অট্টালিকা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিও।

---

* 'বুলবুল কো দিয়া নালা—পরওয়ানে কো জ্বলনা,
গম;—হাম কো দিয়া,—সব সে যো মুস্কিল নজর আয়া।'

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

সন্ধির চেষ্টা

'শুন পদ্মরাগ, আমি তো তোমার সহিত কৌতুক-পরিহাস করি না, অতি গম্ভীরভাবে বলিতেছি, তুমি সন্ধি করিয়া লও।'

তারিণীর বসিবার ঘরে উষা, সিদ্দিকা ও সৌদামিনী গল্প করিতেছিলেন। রবিবার—অবসরের দিন, সুতরাং তাঁহারা খোশগল্প করিতেছিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে তারিণী 'মুসলমান' নামক দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র দেখিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ইহাদের গল্পে যোগদান করিতিছিলেন। উপরোক্ত কথাগুলি তিনিই বলিলেন।

সিদ্দিকা। এক্ষেত্রে তো যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই, তবে আর 'সন্ধি' কিসের, বড়দিদি?

তারিণী। পূর্বে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল—তোমার বিবাহ, বরপক্ষের দুর্ব্যবহার, তুমি সেসব সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাও। এখন একটি নূতন মানুষ মি. লতিফ আলমাসকে বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন কর।

সি। নূতন-পুরাতন সব একাকার হইয়া গিয়াছে; সংসারধর্মী আমার জন্য নহে। সেই যে সম্পত্তি লিখিয়া না-পাওয়ার জন্য 'পদাঘাতে বিতাড়িত' হইয়াছিলাম, সে অবমাননা কী করিয়া ভুলিব? তাঁহারা আমার সম্পত্তি চাহিয়াছিলেন,—আমাকে চাহেন নাই। আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে, সুযোগ জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না; —তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সে দিন আর নাই। *

আমি আজীবন তারিণী-ভবনের সেবা করিয়া নারীজাতির কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব।

তা। না, না, না! তারিণী-ভবন এতবড় মহামূল্য জীবনের 'বলি' পাইবার উপযুক্ত নহে। সে রাক্ষসী নহে!

সৌদামিনী। তুমি বরং সংসারী হইয়া তারিণী-ভবনের সেবা অধিক পরিমাণে করিতে পারিবে— এই তো তারিণী-বিদ্যালয়ের পুরাতন ছাত্রীগণ,—শাহিদা, রেজিয়া, বানু, তরঙ্গিনী, জ্ঞানদা—ইহারা পূর্ণমাত্রায় তারিণী-ভবনের সেবা করিতেছেন। পরন্তু ইহারা সকলেই স্বামীপুত্র লইয়া লইয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। কেবল বানুর শাশুড়িটা একটু খিটখিটে মেজাজের লোক, কিন্তু বানুর স্বামী একটি রত্নবিশেষ। আমরা তোমার দ্বারা মি. আলমাস-রূপ রত্নের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা করি।

তা। হাঁ, আমরা তাহাই পরম লাভ জ্ঞান করিব। আমাদের কথা রাখ, পদ্মরাগ!

সি। বড় দুঃখের বিষয়, বড়দিদি! আপনিও ঐ কথা বলেন? আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই

* 'মতিচূর' ২য় খণ্ডের 'নারীসৃষ্টি' গল্পের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের [illegible] রাখ তোমার পণ ও তেজ—ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে [illegible] স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।' আর পুরুষসমাজ সগর্বে বলিবেন, [illegible] উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন,—ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের পদতলে পড়িবেই পড়িবে!' আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে। পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।

তারিণী আসন ত্যাগ করিয়া সিদ্দিকার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'ধন্য মেয়ে! ভবিষ্যৎ নারীজাতির কল্যাণের নিমিত্ত এইরূপ আত্মোৎসর্গেরই প্রয়োজন। বাঞ্ছনীয় বিষয় যত মূল্যবান, তাহার জন্য উৎসর্গও ততই মহার্ঘ হওয়া চাই। অবশ্য ঈশ্বর ক্রূর ও বধির নহেন,—সকিনার জীবনপাত, জয়নবের আত্ম-বলিদান কখনও বিফল হইবে না। ভারত মাতা! কে বলে তুই দীনা কাঙালিনী? তোর এ হেন দুহিতারত্ন থাকিতে তুই কিসের ভিখারিনি?'

উষা। এই-যে 'পতি পরম গুরু'—এই ভাবটাই মারাত্মক। পুরুষ যাহাই করুন-না কেন,—অবলা সরলার জন্য 'পতি পরম গুরু পতি বিনে নাই গতি'। কেন বাপু? এতবড় বিশাল ধরণী কি তোমাদেরই একচেটিয়া বাসস্থান?

সৌ। সিদ্দিকার এই মহান আত্মত্যাগের ফলে মুসলমান পুরুষগণ ভবিষ্যতে কোনো 'আকদ'-করা মেয়েকে উপেক্ষা-রূপ পদাঘাত করিবার পূর্বে অন্তত একবার ইতস্তত করিবে! আর বিবাহ যেন সম্পত্তি ও অলঙ্কারের জন্য না হয়। কন্যা পণদ্রব্য নহে যে, তাহার সঙ্গে মোটরগাড়ি ও তেতালা বাড়ি 'ফাউ' দিতে হইবে। বেশ কথা পদ্মরাগ—,

তবে এই অশ্রুধারা
প্লাবিত করিবে ধরা,
সাহারা উর্বরা করি ফলাবে সুফল।

সি। আমি তারিণী-ভবনেরও বদনাম করিব না যে 'যত লক্ষ্মীছাড়ীর দল ঐখানে গিয়া জুটিয়াছে।' আমি চুয়াডাঙায় ফিরিয়া যাইব। আমার অষ্টবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র যতদিন 'সাবালক' না হয়, ততদিন তাহার এবং জমিদারি তত্ত্বাবধান করিব; আর সেইসঙ্গে পতিত মুসলমান-সমাজের ললনাবৃন্দকে জাগ্রত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

সৌ। কিন্তু মি. আলমাস তোমাকে প্রাণের সহিত ভালোবাসেন। তাঁহার জীবনটা অভিশপ্ত করিবে?

সি। তা আর কী করা যায়? (অতি নিম্নস্বরে)—নাহয় প্রতিদানে আমিও তাঁহাকে ভালোবাসিব।

সেই সময় আদম শরিফ আসিয়া লতিফের আগমন-সংবাদ দিল। তারিণী হাসিয়া বলিলেন, 'মি. আলমাস আসিয়াছেন; এখন তোমরা সম্মুখযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা কর।'

উ। কী বল পদ্মরাগ, সম্মুখীন হইতে পারিবে?

সি। সম্মুখ-সমরে সিদ্দিকা পরাঙ্মুখ নহে।

তা। (ভৃত্যের প্রতি) সাহেব কো সালাম দোও।

সৌ। আমি মি. আলমাসের পক্ষাবলম্বন করিব।
উ। আমিও তাঁহার সমর্থন করিব!
তা। তাহা হইলে বেচারি পদ্মরাগ যে একেবারে একেলা হইবে।
সৌ। তুমি উহার পক্ষে থাকিও।
তা। আমি কোনো পক্ষেই থাকিতে পারি না। আমি নিরপেক্ষ।
উ। তবে অদ্য পদ্মরাগের অনল-পরীক্ষা!
সি।

তামাম জাহান যদি হয় একদিকে,
কী করিতে পারে তার আল্লাহ যদি থাকে।'

লতিফ আসিয়া পড়িলেন। যথাবিধি নমস্কার, প্রতি-নমস্কারের পর এদিক-ওদিককার দুই-চারি কথা বলিয়া তারিণী কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। লতিফও এই সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি উষাকে বলিলেন,—

'দিদি! শুনিয়াছি মি. রবিনসনের মৃত্যুকালে তথায় জয়নব উপস্থিত ছিলেন; পরে তিনি কোথায় গিয়াছেন, বল তো।'

উ। জয়নব বিবির সন্ধান আমি কী জানি?

ল। ছি দিদি! 'পথে কুড়ানো' ভাইকে কি ছলনা করতে আছে?

উ। সেইজন্য বাস্তবিক ছোটভাইয়ের মতো কথায় কথায় আবদার কর! এখন তোমার বায়না কোথাকার জয়নবই বিবির সন্ধান বলিতে হইবে!

ল। বড় ভগিনীর মতো আদর কর বলিয়া 'আদুরে' হইয়াছি। লক্ষ্মী দিদিটি আমার! এখন আমার আবদার রক্ষা কর।

সৌ। কিন্তু সে জয়নব বিবির জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

ল। যেহেতু তিনি আমার বিবাহিতা পত্নী।

সি। ওহ! সেইজন্যই তাঁহার খোঁজ রাখেন না!

সৌ। দেখ বোন, সত্যকথা শ্রুতিকটু হইলেও আমি একটা সত্যকথা বলিব। উনি এখন তোমারই খোঁজে ব্যস্ত আছেন, তাই ধর্মপত্নীর সংবাদ রাখেন না!

এ-কথা শুনিয়া লতিফ লজ্জিত হইরেন; সিদ্দিকার বদনমণ্ডলও পদ্মরাগবৎ আরক্ত হইল। লতিফ বলিলেন,—

'দিদি! আর অনুযোগ করিও না, এখন খোঁজ লইতেই আসিয়াছি।'

সৌ। 'খোঁজ লইতে আসা'—তা চুয়াডাঙ্গায় না গিয়া এখানে কেন?

ল। তিনি এখন চুয়াডাঙ্গার বাহিরে।

উ। আর তারিণী-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে!

ল। (সিদ্দিকার দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া) ঠিক তারিণী-বিদ্যালয়ের না হউক, তারিণী-কর্মালয়ের অভ্যন্তরে বটেন।

সৌ। (উচ্চহাস্যে) এ অপবাদ মন্দ নহে—যত লোকের বউ হারাইবে, তাহারা তারিণী-ভবনে খানাতল্লাশি করিতে আসিবে! আমরা কি লোকের বউ-ঝি-চোর?

ল। আমাকে জোনাব আলী নানা বলিয়াছেন—'তারিণী-ভবনে গফুরের স্ত্রী (সকিনা খানম) আছেন, মুজফফরের স্ত্রী (রাফিয়া বেগম) আছেন ; দেখ গিয়া—তোমারটি সেইখানে আছেন।'

উ। তাহা হইলে একবার সদলবলে তারিণী-ভবন আক্রমণ করিয়া দেখ!

ল। তোমরা ধর্মত বল দেখি, জয়নব এখানে নাই কি?

সৌ। এখানে মাত্র কয়েকটি মুসলমান মহিলা আছেন, যথা কারেশাবি, জা'ফরি

ল। আহা। তাঁহাদের পরিচয় তো সকলেরই জানা আছে। এখানে অজ্ঞাতকুলশীল কেবল সিদ্দিকা। লোকে উকিল-ব্যারিস্টারের বদনাম করে যে, তাহারা নাকি সত্যকে মিথ্যা—কালোকে শাদা বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পায়—

উ। বদনাম কেন দাদা, অতি সত্য কথা;এই তো এখনই তুমি সিদ্দিকাকে জয়নব বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছ!

ল। আর তোমরা সমভাবে তাহার বিপক্ষতা করিতেছ! যাহা হউক, সিদ্দিকা আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ অস্বীকার করেন? তাহা যে দিবাকরের ন্যায় সত্য ঘটনা।

উ। আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। জয়নবের সহিত তোমার বিবাহ-ব্যাপার তো তোমার পিতৃব্যের ইচ্ছায় হইয়াছিল—আবার তাঁহার ইচ্ছায় পণ্ড হইয়াছিল; তাহাতে তোমার নিজের কোনো মতামত ছিল না। তবে আর এ বিষয় লইয়া এখন তুমি মাথা ঘামাও কেন?

ল। আমাদের বিবাহ তো পণ্ড হয় নাই—তাহা পণ্ড করাও অপরের ক্ষমতার বাহিরে।

উ। কিন্তু তোমার পিতৃব্যই তো সর্বেসর্বা ছিলেন—তাঁহার সম্মুখে তুমি একটা সাক্ষীগোপাল মাত্র। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার দ্বারাই বিবাহ ভঙ্গ করাইয়া দিতেন

ল। পিতৃব্য কী করিতেন, না করিতেন, সে-কথা লইয়া এখন তর্ক করা বৃথা। ফল কথা, আমাদের বিবাহ অটুট রহিয়াছে।

সি। ঊষা-দি! আমি বলি, তুমি হাতের চুড়িটা ভাঙিবার জন্য দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছ, পদদলিত করিয়াছ,—কিন্তু যদি পরমায়ু-বলে চুড়িটা না-ভাঙিয়া থাকে, তবে আর তাহাকে কুড়াইয়া লইতে চেষ্টা কেন?

ল। ইহা তোমার ভুল—চুড়ি ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই, দুর্ঘটনাবশত হস্তস্খলিত হইয়াছিল; কিন্তু ঊষাদিদির ভাগ্যবলে ভাঙে নাই। এখন তিনি পরম আগ্রহের সহিত উহাকে তুলিয়া লইবেন—ইহাই স্বাভাবিক।

সৌদামিনী সিদ্দিকার মুখের প্রতি চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলে কোনো ভাবান্তর দেখিতে পাইলেন না। তখন মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, 'আশা করি, তোমার আর কোনো উত্তর নাই; সুতরাং 'মৌনং সম্মতি'—'

সি। আইনজ্ঞের সহিত বৃথা তর্কে নষ্ট করিবার মতো সময় আমার নাই—আমি চলিলাম।

ল। 'চলিলাম' কি?—হয় তুমি বিবাহ অস্বীকার কর, নয় ধরা দাও।

সি। (স্মিতমুখে)'ধরা' কি কেহ স্বেচ্ছায় দেয়?

সৌ। তাই-তো ধরিতে পারিলে 'তোমার!' তা ভাই, তুমি আদালতের শরণ লও না কেন? আইন তো চিরদিন তোমাদেরই অনুকূলে।

ল। তাহাতে লাভ কী? আদালতের কৃপায় নাহয় সিদ্দিকার উপর দখল পাইলাম, তাহাতে তো তাঁহাকে পাওয়া হইল না। আমি চাই সিদ্দিকার আভ্যন্তরীণ মানুষটিকে।

উ। সিদ্দিকার ভিতরের মানুষটিকে আজি পর্যন্ত জয় করিতে পারিলে না, তবে আর কী করিলে ভাই?

ল। কী জানো দিদি। দৈব ঘটনাবলি কতকটা আমাদের ব্রিটশ বিচারের মতো—

রামের পাপের জন্য শ্যামকে ভুগিতে হইবে, আর শ্যামের পুণ্যফল ভোগ করিবে কানাই! আমি যে ভুগিতেছি, ইহা আমার স্বীকৃত দোষের জন্য নহে।

সি। মানুষের নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই সবচেয়ে বড় জিনিস নহে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির সম্মুখে নিজের ইচ্ছা এবং স্বার্থকে অনেক সময়ে বলি দিতে হয়।

ল। খোদাতা'লা তোমার মঙ্গল করুন—তোমার মুখে এ-কথা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। এখন তুমি বুঝিয়াছ যে, হামিদের মাতার সহিত বিবাহ—আমার ইচ্ছাকৃত ছিল না। আর তোমাকে উপেক্ষাও আমি করি নাই। আমি তোমাকে পাইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম; দুভার্গ্যবশত সুযোগের সহিত দুর্যোগও আসিল।

সৌ। সে কিরূপ?

ল। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর আমি যখন দুলাভাইকে অর্থাৎ সোলেমান সাহেবকে পত্র লিখিতে বসিলাম, সেই সময় তাঁহার পত্র আগে পাইলাম। তিনি জয়নবকে 'তালাক' দিতে লিখিয়াছিলেন। আমি যতই শান্তির কথা লিখি, তিনি ততই রাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বুবুও (তাহার স্ত্রী) কেবল দীর্ঘপত্র লিখিয়া গালি দিতেছিলেন। দুলাভাই লিখিলেন যে, তাঁহার ভগ্নীরও ইচ্ছা 'তালাক' পাওয়া। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, আমাকে অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং জয়নব বিবির সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়া এ বিষয়ে মীমাংসা করিব। তিনি অনুমতি দিলেন, আমি জয়নবকে পত্র লিখিলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কিছু বক্তব্য নাই ; তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতাজায়ার কৃত নিষ্পত্তিই তাঁহার শিরোধার্য। আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম—এদিকে দুলাভাই তরবারিহস্তে আমাদের বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে প্রস্তুত; ওদিকে জয়নব বলেন, তাহাই তাঁহার শিরোধার্য! শেষে জোনাব আলী নানাকে চুয়াডাঙ্গায় পাঠাইলাম। তিনি প্রায় দুইমাস ধন্না দিয়া দুলাভাইকে অনেক বুঝাইয়া সন্ধিতে সম্মত করাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি যখন সম্মত হইলেন, সেই সময় পাজি রবিনসন তাঁহাকে ও আজিজকে (তাঁহার পুত্র) হত্যা করিল!! তাহার পরবর্তী ঘটনা আমি সেদিন মুঙ্গেরে তোমাদিগকে 'বীরবালা' গল্পে শুনাইয়াছি।

উ। চুয়াডাঙ্গার জয়নবকে উদ্ধার করিতে গিয়াও তা তোমার 'বোকা টিকটিকির' দশা হইয়াছিল। তুমি সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া পালকি লইয়া গেলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে বলিয়া; এদিকে জয়নব তোমারই আনীত পালকিতে পলায়ন করিলেন।

ল। তাই তো, সেসব ঘটনার জন্য কি আমিই দায়ী?

উ। ভাই, আমি তোমাদের বিবাহ-পদ্ধতি বুঝি না,—তুমি রইলে রসুলপুরে, পাত্রী রইলেন চুয়াডাঙ্গায়—অথচ উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল; বিবাহ যদি হইল তবু বরকনের শুভদৃষ্টি বাকি রহিল।

ল। আর 'শুভদৃষ্টি' যদি হইল, তবু মিলন বাকি রহিল!

সৌ। তোমাদের 'শুভদৃষ্টি' আবার কবে হইল?

ল। কারসিয়ঙ্গে।—যেদিন আমি সংজ্ঞা লাভ করিয়া চক্ষু খুলিলাম, সেদিন ইহাকেই দেখিলাম।

সৌ। সে দেখা ধর্তব্য নহে—'শুভদৃষ্টি'র দৃষ্টিতে তুমি কোন্ দিন সিদ্দিককে দেখিয়াছ, তাহাই বল।

লতিফ হাসিলেন, কিছু বলিলেন না।

সৌ। তোমার ভগ্নীপতির হত্যাকারীকে ধরিবার কোনো চেষ্টা হইল না? মি. রবিনসন নির্বিঘ্নে বিচরণ করিতে লগিলেন?

ল। চেষ্টা হয় নাই—কে বলে?' 'সাহেবলোক'কে ধরা তো সহজ ব্যাপার নয়। বুবুকে রসুলপুরে রাখিয়া আমি পুনরায় চুয়াডাঙ্গায় গিয়া রবিনসনের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহের জোগাড় করিতে লাগিলাম। তখন চুয়াডাঙ্গার বাতাস বড় দূষিত ছিল—কেহ রবিনসনের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস করিল না। যাহা হউক, বহু কষ্টে প্রায় দুই বৎসর পরে যখন তাঁহার নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির করাইলাম, তাহার পূর্বেই তিনি রাঁচি যাত্রা করিলেন। আবার রাঁচিতে যেদিন ওয়ারেন্ট পৌঁছিল, রবিনসন তখন মৃত্যুশয্যায়।

সৌ। তারপর তোমার সিদ্দিকা-সমস্যার কী হইল?

ল। তিনি বোধহয় রাফিয়া বেগম, সকিনা খানম প্রভৃতির অভিশপ্ত বিবাহ-জীবনের কাহিনী শুনিয়া সংসারধর্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের কাহিনী অত্যন্ত করুণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি এ জগতে কেহ বিবাহ করিবে না?

উ। তাই তো হিন্দুসমাজে বাল্যবিধবার সংখ্যা অল্প নহে, তবু তো বালিকাদের বিবাহ হইতেছে। স্বয়ং রাফিয়াবু'র কন্যাদ্বয়েরও বিবাহ হইয়াছে।

সৌ। তোমার কী বক্তব্য, পদ্মরাগ?

সি। অভিশপ্ত বিবাহ-জীবনের কাহিনী শ্রবণের বহুপূর্বে আমি যেদিন চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই, সেইদিনই জীবনের গন্তব্যপথ ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। এমনকি, যে দিন ভাইজান নিহত হইলেন, সেইদিনই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে আমার সংসারধর্ম-পালন খোদাতালার অভিপ্রেত নহে।

ল। আমি ইহাই তোমার শেষ উত্তর বলিয়া মানিতে প্রস্তুত নহি। তোমাকে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য আরও একটু সময় দিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিযোগ থাকে তো তাহাও বল। আমার তো একমাত্র অপরাধ—হামিদের মাতাকে বিবাহ করা।

সি। ব্যক্তিগতভাবে তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। তুমি যে গুরুজনের আদেশ পালনের নিমিত্ত নিজের ইচ্ছা ও সুখ বলিদান দিয়াছিলে, সেজন্য আমি তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। আর হামিদের মাতাও এখন জীবিত নাই, সুতরাং সে-কথায় আর প্রয়োজন কী? আল্লাহ জানেন, আমার মনে কোনো বিদ্বেষভাব নাই।

উ। তাহা হইলে তোমরা উভয়ে 'করমর্দন করিয়া বন্ধু হও'।

ল। সিদ্দিকা, স্পষ্ট বল, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কিনা?

সি। না। তুমি তোমার পথ দেখ, আমি আমার পথ দেখি।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

বেলা প্রায় ৪টা, সিদ্দিকা আপনমনে ট্রাঙ্কে জিনিসপত্র গুছাইতেছেন। আগামীকল্য প্রত্যূষে তাঁহাকে দেশে যাইতে হইবে। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তিনি রাফিয়ার কন্যা গওহর বেগমের বাসায় অতিথি হইয়াছেন। সিদ্দিকা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন; বাকি আছেন কেবল

তারিণী। আশ্রমবাসিনী ভগিনীগণ তাঁহাকে স্ব-স্ব স্মৃতিচিহ্ন উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সিদ্দিকার নয়নপল্লব তখনও আর্দ্র ছিল, এমন সময় কে দ্বারে করাঘাত করিল। 'আসুন!' বলিয়া সিদ্দিকা চাহিয়া দেখিলেন, তারিণীর সহিত তাঁহার ভ্রাতৃজায়া রশীদা ও ঊষা আসিয়াছেন।

রশীদা। (সিদ্দিকার মস্তকে হস্তাবমর্শন করিয়া) দেখি তোমার মাথায় জটা আছে নাকি?

তারিণী। আপনি একেবারে জটাধারিণী চাহেন?

র। আমি ইদানীং জয়নুর বিষয় যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে তাহাকে জটাজুটধারিণী সন্ন্যাসিনী বলিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল। জয়নু, তোমার জিনিসপত্র ঠিক হইয়াছে কি? গাড়ি আনিতে বলি?

সি। আপনি আর একটু বসুন; চারিদিকে বেড়াইয়া তারিণী-ভবন ভালো করিয়া দেখুন।

র। আমি দুই ঘণ্টা ধরিয়া খুব 'সয়ের' করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে মিসিস সেনকেও হয়রান করিয়াছি।

তা। আমাদের হাঁটিবার অভ্যাস আছে; আপনিই ক্লান্ত হইয়াছেন।

র। তবে এখন চল জয়নু।

সি। আমি আগামীকল্য প্রাতঃকালে যথাসময়ে আপনার ওখানে হাজির হইব, এখন আমি আপনার সঙ্গে যাইতে পারিব না।

র। অত ভোরে আবার কে তোমাকে লইতে আসিবে?

তা। কাহাকেও আসিতে হইবে না, আমরা সিদ্দিকাকে পৌছাইয়া দিব। ভালু আয়া আপনাদের বাসা চিনে, সে এবং ঈশানবাবু সঙ্গে যাইবেন।

ঊষা। আমিও যাইব। একেবারে স্টেশন পর্যন্ত গিয়া আপনাদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিব।

র। (সিদ্দিকার প্রতি) তুমি যে বিয়ের কনের মতো কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছ! মিসিস সেন, আপনারা স্নেহ-মমতার ডোরে জয়নুকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, সে আর আপনাদের ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তা। এরূপ মনে করা আপনার সৌজন্য। পক্ষান্তরে সিদ্দিকাই আমাদের সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন—

উ। এবং বাঁধিয়া রাখিয়া এখন ছাড়িয়া চলিয়াছেন!

রশীদা প্রস্থান করিলে পর অবশিষ্ট কার্য সমাধা করিয়া সিদ্দিকা তারিণীর নিকট বিদায় গ্রহণের নিমিত্ত গেলেন। ভক্তি ও আবেগভরে তারিণীর পদচুম্বন করিয়া সিদ্দিকা কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তারিণী তাঁহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'তোমরা যাওয়ায় আমি তত দুঃখিত নহি; কারণ আজি যাইতেছ, দুই মাস কি ছয় মাস পরে আবার আসিবে। তুমি-যে সমাজের সমূহ কল্যাণের নিমিত্ত দাম্পত্যজীবন জলাঞ্জলি দিলে, ইহাতেই আমার অধিক দুঃখ হইতেছে। কৃতঘ্ন সমাজ তোমার এ অমূল্য দানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিবে না। সমাজ—সেবা করিতে গেলে আজীবন অভিসম্পাত কুড়াইতে হইবে। এখনও সময় আছে—ঘরে ফিরিয়া যাও পদ্মরাগ!'

সি। না বড়দিদি! আর ফিরিবার উপায় নাই। সেদিন তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছি—

'তুমি তোমার পথ দেখ।'

তা। তবে আশীর্বাদ করি, তোমার এ আত্মত্যাগের ফলে তোমার [illegible] সফল হউক—তুমি চিরসুখী হও।

অতঃপর তারিণী বাষ্পাকুল লোচনে পুনরায় সিদ্দিকার ললাট চুম্বন করিয়া [illegible] বিদায় দিলেন।

সিদ্দিকা 'বিদায়-পর্ব' সমাধা করিয়াছেন বটে, কিন্তু একজনের নিকট বিদায়গ্রহণ [illegible] বাকি। জীবনে আবার তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাইবেন কি না, কে জানে? চুয়াডাঙ্গায় [illegible] আবার আপাতত সিদ্দিকাকে সামাজিক অবরোধপ্রথার বন্দিনী হইতে হইবে, সুতরাং [illegible] সেখানে গেলে দেখা হইবে না। যদি দৈবাৎ অদ্য লতিফ এখানে আসিতেন, তবে শেষ দেখ -জন্মশোধ শেষ দেখা দেখিয়া লওয়া হইত। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্কভা সিদ্দিকা বসিবার ঘরে গেলেন। সে-কক্ষটি তাঁহার স্বহস্তসজ্জিত—তারিণী তাঁহারই [illegible] ইহার সজ্জাভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিলেন না। নিভৃত চিন্তার অনুকূল বলিয়া এই নির্জন।

অন্ধকার কক্ষই তাঁহার নিকট বাঞ্ছনীয় বোধ হইল। তাঁহার স্মরণ হইল, ৪/৫ মাস পূর্বে এই কক্ষে তিনি লতিফকে 'তুমি তোমার পথ দেখ' বলিয়া বিদায় দিয়াছেন তদবধি আর লতিফের সহিত দেখা হয় নাই—হয়তো জীবনে আর দেখা হইবে না সিদ্দিকা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ভ্রাতা বলিয়াছিলেন, 'জয়নু! তুই চিরকুমারী বা বাল-বিধবার ন্যায় জীবন-যাপন করিতে প্রস্তুত হ!'

সিদ্দিকা নিজেকে 'চিরকুমারী' জ্ঞান করিবেন না, কারণ চিরকুমারী নিঃস্ব; তাহার শূন্য হৃদয় অবলম্বনহীন। তদ্রূপ নিঃসম্বল দরিদ্র জীবনভার অতি দুর্বহ। তিনি নিজেকে বিধবা মনে করিবেন, যেহেতু বিধবার স্বামীস্মৃতি-রূপ বহুমূল্য সম্পদ থাকে। পতিধ্যান তাহার জীবনের নিত্যসহচর। তাহা না থাকিলে বিধবা বাঁচিবে কী লইয়া? তীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ সংসারে পতিস্মৃতি তাহার একমাত্র সহায়। সংসারের কশাঘাতে যখন সে ক্ষতবিক্ষত হয়, তখন স্বামীচিন্তাই প্রলেপের মতো তাহার দগ্ধহৃদয় শীতল করে, তাহাই তাহার সান্ত্বনা। দেবর, ভাশুর এবং অপর আত্মীয়স্বজন ছলে-কৌশলে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এই—

সতীর দেবতা পতি, জীবনের সার,
তেঁই যাচি পূজিবারে চরণ তার'—

ভাবটুকু অপহরণ করিতে পারে না। ইহাই বিধবার জীবনসর্বস্ব।

সহসা 'হিঁয়া তসরিফ লাইয়ে' বলিয়া আদম শরিফ আসিয়া বাতি জ্বালিয়া দিল সিদ্দিকা দ্বারদেশে চাহিয়া দেখিলেন, আগন্তুক ব্যক্তি লতিফ। অদ্য অতর্কিতভাবে লতিফের সহিত চারি চক্ষুর মিলন হইল।

'আপ বইঠিয়ে, মাইজি আবি পূজা পাট করতা হায়। পূজা হো জানে সে মাইজি আবি আবেগা' বলিয়া আদম শরিফ লতিফকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল।

লতিফ কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে বলিলেলন, 'সিদ্দিকা, তুমি আজ বুবুর সঙ্গে যাও নাই?'

সি। আমি যাইতেছি, এ সংবাদ তুমি কোথায় পাইলে?

ল। তুমি আমার সংবাদ রাখ না বটে, কিন্তু আমি তোমার সব সংবাদ রাখি। আমি তো তোমার মতো পাষাণ নহি—আমার হৃদয় আছে। হাঁ, ভালো কথা মনে পড়িল

তুমি সেদিন বলিয়াছিলে যে, তুমি তোমার পথ দেখিবে। বেশ, চুয়াডাঙ্গার পথ ব্যতীত আরও কোনো পথ আছে নাকি, এ-কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

সি। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

ল। তবে শুন, আমি তোমাকে অনর্থক বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া কষ্ট দিতে চাহি না। আমি তোমার পথের কণ্টক হইয়া তোমার জীবন বিষাক্ত করিতে ইচ্ছুক নহি। তুমি যাহাতে সুখী হও—সন্তুষ্ট থাকো, তাহাই আমার জীবনের লক্ষ্য। সেইজন্য তোমাকে আমি এখন যথাবিধি ত্যাগপত্র (তালাক) দ্বারা মুক্তি দিতে চাহি।

সি। (কিঞ্চিৎ ব্যস্তভাবে) না, আমি মুক্তি চাহি না। তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ কেন?

ল। (নিম্নস্বরে) দেখ, চক্ষুলজ্জা কিম্বা মিথ্যা লোকলজ্জা ভুলিয়া যাও, তোমার মনের কথা বল।

সি। (কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া) সত্য বলিতেছি, আমি তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহি না।

ল। কেন, ৪/৫ বৎসর পূর্বে যখন দুলাভাই আমাকে তালাকের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন সে-সময় তোমায় ইচ্ছাও তাহাই ছিল।

সি। (সলজ্জভাবে) তখন আমি তোমাকে জানিতাম না যে।

ল। আমার সহিত পরিচয় হওয়ার পরেও এই তো সেদিন তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী হইতে অস্বীকৃতা হইয়াছ—তুমি তোমার পথ দেখিবে, বলিয়াছ।

সি। কিন্তু তোমায় 'তালাক' দিতে বলি নাই তো?

ল। আমি তোমার প্রহেলিকা বুঝি না। তবে আমার জীবন-সঙ্গিনী হইতে আপত্তি করিলে কেন? (সিদ্দিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া স্নেহসিক্ত স্বরে) আমি নীচ স্বার্থপর নহি; বলিয়াছি তো, তোমার সুখ-সৌভাগ্যই আমার বাঞ্ছনীয়। আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। এই মহান উদ্দেশ্যে তোমাকে বন্ধনমুক্ত করিতে চাহিতেছি।

সি। যদি আমার সুখ-সন্তোষই তোমার কাম্য হয় তবে আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হও, আমি তাহাতেই পরম সুখী হইব।

ল। আমাকে এ-কথা বলা বৃথা। আমার আর অন্য বাঞ্ছা নাই; আমি—

'পরান দিয়েছি তারে, তারি তরে রাখিব;
জন্মান্তরে দেখা হলে তারি হাতে সঁপিব।'

আমার সুখশান্তি সম্পূর্ণ তোমার হাতে। তুমি বেশ জানো, তোমাকে পাইলে আমার—

স্বরগ মুকতি পুণ্য কিছু নাহি প্রয়োজন,
জনম-জনম ধরি তোমারেই কামনা।

সি। তোমার সহধর্মিণী হওয়া সহস্রবার বাঞ্ছনীয়; —লক্ষবার বাঞ্ছনীয়। তবু এ সৌভাগ্য আমার জন্য নহে। (সাশ্রুনয়নে যুক্তকরে) আমাকে আর ও-কথা বলিও না।

ল। (ব্যথিতস্বরে) তাহা হইলে আমি এতকাল পৌত্তলিকের ন্যায় কেবল পাষাণ-প্রতিমার পূজা করিলাম? আমার বিদীর্ণ হৃদয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহে—

রমণীরে! বল দেখি, এ জীবনে কখন কী
দারুণ যন্ত্রণা মম উদিয়া স্মরণে,
একবিন্দু অশ্রু তোর ঝরেছে নয়নে?

তদুত্তরে সিদ্দিকা স্বীয় কণ্ঠস্থিত লকেট-হার উন্মোচন করিয়া [illegible]
লতিফ লকেট খুলিয়া দেখেন—তাঁহারই ফটো! তদ্দর্শনে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট [illegible]

সি। এখন দেখিলে, তোমার চেয়েও পৌত্তলিক আছে!

লতিফ কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তন্মুহূর্তে তথায় তারিণী [illegible] সুতরাং আর কিছু বলা হইল না।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

সহযাত্রী

আবার সেই বাষ্পীয়-শকটে সিদ্দিকা। আজি কিন্তু স্বদেশ ছাড়িয়া অজ্ঞাত অপরি বিশাল জগতের তরঙ্গে মিশিতে যাওয়া নহে। অদ্য জননী জন্মভূমির স্নেহময় ক্রো ফিরিয়া যাওয়া। এ যাত্রাতেও সিদ্দিকা নিরানন্দ। তিনি স্বয়ং ভ্রাতৃবধূকে [illegible] লিখিয়াছিলেন, এবং স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত যাইতেছেন, তবু অত্যন্ত ব্যথিত হৃ চলিয়াছেন। এখন সিদ্দিকা যেন স্বর্গ হইতে বিদায় লইলেন। তারিণী-ভবনে [illegible] কখন আসিতে পারিবেন, কে জানে? তাঁহার নীরব যন্ত্রণা বর্ণনাতীত।

ট্রেনে রশীদা, তাঁহার পুত্র, পরিচারিকা এবং সিদ্দিকা ছিলেন। গাড়ি রিজার্ভ ছিল। তখনো গাড়ি ছাড়িতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল, তাই ঊষা তাঁহাদের নি বসিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লতিফ সেই ট্রেনে উঠিলেন, সিদ্দিকা প্রথমে চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—ইহাও কি সম্ভব? সম্ভব না হইলেও তো স লতিফ যে রশীদার সহোদর ভ্রাতা, এ-কথা সিদ্দিকার মনেই ছিল না। ঊষা হইতে নামিয়া যাইবার সময় বলিলেন—

'পদ্মরাগ। মি. আলমাস তোমার সহযাত্রী।'

ট্রেন ছাড়িলে পর রশীদা সিদ্দিকার প্রতি 'ভালোবাসার অত্যাচার' আরম্ভ করিলে তিনি খোকাকে মাঝের বেঞ্চে শয়ন করাইয়া তাহার নিকট আয়াকে বসাইলেন। প সিদ্দিকাকে বলিলেন—

'তারিণী-ভবনের ভগিনীগণ তোমাকে 'পদ্মরাগ' বলিয়া ডাকে কেন? তুমি 'আলমাস-বনিতা', সেইজন্যই কি?'

সি। 'জয়নব' নামের জন্য যেমন আমি দায়ী নহি, সেইরূপ 'পদ্মরাগ' নামের জ নহি।

র। তোমার নাম 'পদ্মরাগ' কে রাখিয়াছে?—লতিফ?

সি। আজ্ঞে না। আমি যেদিন প্রথমে মিসিস সেনের সম্মুখে আনীতা হই, তখন তিনি আমায় 'পদ্মরাগ' বলিয়াছিলেন।

র। তবু আমার বলিতে ইচ্ছা করে—

'পদ্মরাগ-আলমাস-কথা জানিল কী ছলে
নামদাত্রী?'

ভালো কথা, তুমি সেই দারুণ দুর্যোগের দিন আমার সঙ্গে না গিয়া এত বিড়ম্বনা কে করিলে কেন?

। আপনি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সঙ্গে পলায়ন করিলেন বলিয়া আমি আপনার সঙ্গিনী হইতে সাহস করি নাই।

র। আমি সে মুখোশ-পরা অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে যাইবার সময় তবু নিজের ঘরের দুইজন চাকরানি এবং একজন বিশ্বাসী চাকর সঙ্গে লইয়াছিলাম। তুমি তো তাহাও কর নাই—তুমি যে একেবারে একাকিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলে।

সি। আমার তো দিগ্বিজয়ে ইচ্ছা ছিল না—আমার ইচ্ছা ছিল অন্যপ্রকার।

র। কী ইচ্ছা ছিল, শুনি?

সি। আত্মহত্যা করা।

রা। তাহা করিয়া ফেলিলে একরূপ ভালোই হইত—সব লেখা সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইত। অবশ্য, আমি সে পাপকার্যের অনুমোদন করি না। খোদা না করেন, কাহারও যেন সে দুর্মতি না হয়। যাহা হউক, আলমাসের সহিত তোমার 'রু-নোমাই' (বর-কনের শুভদৃষ্টি) কখন এবং কোথায় হইয়াছে?

লতিফ বলিতে যাইতেছিলেন 'গত সন্ধ্যা মিসিস সেনের ড্রয়িংরুমে' কিন্তু বলিলেন না। মৃদুহাস্যে রসনা সংযত রাখিলেন। অতঃপর রশীদা বলিলেন—

'আমার বড় ঘুম পাইতেছে। জয়নু! তুমি ও-পার্শ্বের বেঞ্চে গিয়ে বস, আমি একটু শুই।'

সি। কেন, আপনি গত রাত্রে ঘুমান নাই?

রা। না, জানোই তো, নূতন জায়গায় আমার ঘুম হয় না।

সি। আর এই গাড়ির বেঞ্চখানা বোধহয় আপনার বহু-পরিচিত জায়গা?

র। (সহাস্যে) যা, তর্ক করিস নে! সর এখান হতে।

সিদ্দিকা অগত্যা লতিফের সহিত একাসনে বসিলেন, লতিফ জানালা খুলিয়া বহির্জগতের শোভা দেখিতেছিলেন, অথবা অন্যমনস্কভাবে কেবল চাহিয়াছিলেন। লতিফ জানেন, সিদ্দিকার সহিত বাক্যালাপ করিবার সুবিধা হয়তো আর কখনো পাইবেন না। তবে তাঁহার ভগিনীর অনুকম্পায় প্রাপ্ত এ শেষ সুযোগটা বৃথায় নষ্ট করা অন্যায় হইবে। তাই তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। সিদ্দিকার নিকটবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'সিদ্দিকা, তুমি আর কখনো এ পথে চুয়াডাঙ্গায় গিয়াছিলে?'

সি। আমি এ পথে পূর্বে কোথাও গিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

ল। কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে তোমার কিছু কষ্ট বোধ হইতেছে কি?

সি। কষ্ট কলিকাতার জন্য নহে, কিন্তু তারিণী-ভবন ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হইতেছে।

ল। তা তুমি তো ইচ্ছা করিলে তারিণী-ভবনে আবার যাইতে পার। কিন্তু—

আবেগে লতিফের কণ্ঠরোধ হইল; তিনি আত্মদমন-চেষ্টায় তাড়াতাড়ি জানালার দিকে চাহিলেন। তাঁহার অনুচ্চারিত শব্দ কয়টি মূর্তিমান হইয়া সিদ্দিকার চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল—'কিন্তু আমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না।'

দুঃখের দিন ফুরাইতে চাহে না—সুখের সময় দেখিতে-না-দেখিতে, সুখানুভব করিতে-না-করিতে অনন্তে বিলীন হইয়া যায়। ট্রেনের গতি অদ্য লতিফের নিকট অতিশয়—অতিরিক্ত দ্রুত বলিয়া বোধ হইতেছে। সিদ্দিকাও তাহাই ভাবিতেছিলেন—হতভাগা ট্রেনটা একটু ধীর পদবিক্ষেপে চলিলে ক্ষতি ছিল কি?

রশীদা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন মাত্র, তাঁহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। বসিয়া সিদ্দিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'শুন জয়নু। আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল।'

সি। বলুন।

র। সেই-যে বিপদের সময়, তুমি অন্তর্হিতা হইলে পর, বড় দুঃখে ও ক্ষোভে জোনাব আলী নানার আনীত অলঙ্কারগুলি ফিরাইয়া দিয়াছি, তিনি তাহা ফর্দের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া লইবার সময় সেই লকেট-হারের 'কেস'টা খুলিয়া বলিলেন—'এ তো খালি।' আমি সে-সময় তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিলাম—'তবে হারটা কি গিলিয়া ফেলিয়াছি।' তাহার পর বহুদিন পরে আমার মনে পড়িল যে, লকেট-হার আমি তোমার গলায় পরাইয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর তাহা কী হইল—তুমি কেহ রাখিয়াছিলে, না, আমি অন্যমনস্কভাবে কোথাও ফেলিয়া দিয়াছি,—কিছুই আমার মনে পড়ে না। তুমি এ বিষয়ে কিছু বলিতে পার কি, জয়নু।'

লতিফ চক্ষুভরা 'দুষ্টামি' লইয়া সিদ্দিকার উত্তর শ্রবণের নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিদ্দিকা নিরুত্তর রহিলেন; অধিকন্তু গত সন্ধ্যা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-করিয়া যে-দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লতিফকে লকেট দেখাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সিদ্দিকা অত্যন্ত সঙ্কুচিতা ও লজ্জিতা হইলেন। তিনি কিছুতেই লতিফের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না। লতিফ কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তর শ্রবণের আশায় বঞ্চিত হইয়া মুক্ত-বাতায়ন দিয়া মুখ বাহির করিয়া নিবিষ্টচিত্তে মাঠের দৃশ্য দেখিতেছিলেন বটে, কিন্তু এক-একবার চুরি করিয়া সিদ্দিকার লজ্জানম্র পদ্মরাগবৎ আরক্ত বদনখানি দেখিতেছিলেন, আর হয়তো ভাবিতেছিলেন—

প্রণয়ের পুরস্কার থাকে যদি অভাগার,
এ রোদন পশে যদি বিধাতার শ্রবণে,
জন্মান্তরে পাব আমি এ রমণী-রতনে।'

আহা! 'জন্মান্তর' তো পরের কথা—এখন যে ইহজীবনের দেখা-সাক্ষাৎ ফুরাইয়া চলিল!—ট্রেন চুয়াডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল আর কি! সত্যই চুয়াডাঙ্গা স্টেশন!!

লতিফ সিদ্দিকার হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইলেন। এই তাঁহাদের শেষ দেখা

অবরোধবাসিনী

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

উ ৎ স র্গ - লি পি

এই গ্রন্থখানি
আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা জননী
মোসাম্মৎ রাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরাণী
মরহুমার স্মৃতির-চরণে
ভক্তির সহিত সমর্পিত হইল।

আমার স্নেহময়ী জননী অবরোধ প্রথার অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন। এস্থলে আমার শৈশবের একটি ঘটনা মনে পড়িল। সে সময় কলিকাতা হইতে রঙ্গপুর যাতায়াত করিবার সময় সারা ঘাটে স্টীমারযোগে নদী পার হইতে হইত। একবার আমরা কলিকাতায় আসিতেছিলাম ; আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বয়স তখন মাত্র দুই বৎসর ছিল। সে এবং আমি আম্মাজানের সহিত পাল্কীতে, বন্দী হইলাম। সেই পাল্কী স্টীমারের ডেকে রাখিয়া আমাদিগকে নদী পার করান হইল। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল--বানাতের ওয়াড় ঘেরা রুদ্ধ পাল্কীর ভিতর আমার শিশু ভগিনী 'হোয়া-হোয়া' করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। আম্মাজান প্রাণপণে তাহাকে চুপ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু পাল্কীর নিকট উপবিষ্ট কোন আল্লাহ্‌র বান্দাই ক্রন্দনরতা শিশুকে পাল্কী হইতে বাহির করা প্রয়োজন বোধ করে নাই। ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুস্তকখানি তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন

কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া 'অবরোধবাসিনী' রচিত হইল। পাঠক-পাঠিকাগণ অধিকাংশ স্থলে হাসিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনো কোনো স্থলে তাহাদের মনে সমবেদনার উদ্রেক হইবে এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা 'তাহেরা' মরহুমার অকালমৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-ইনসপেক্টর পরম ভক্তিভাজন জ্ঞানবৃদ্ধ মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বি. এ. এম. এল. সি. দয়া করিয়া 'অবরোধবাসিনী'র ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কারসিয়ঙ্গ ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি; উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি। আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।

হজরত রাবিয়া বসরী বলিয়াছেন, 'ইয়া আল্লা। যদি আমি দোজখের ভয়ে এবাদত করি, তবে আমাকে দোজখে নিক্ষেপ কর; আর যদি বেহেশতের আশায় এবাদত করি তবে আমার জন্য বেহেশত হারাম হউক।' আল্লাহর ফজলে সমাজসেবা সম্বন্ধে আমিও এখন ঐরূপ বলিতে সাহস করি।

আমার তো প্রত্যেকটি লোম গুনাহগার; সুতরাং পুস্তকের দোষ-ত্রুটির জন্য এবার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষম'প্রার্থনা করিলাম না।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

অবরোধ-বাসিনী

আমরা বহুকাল হইতে অবরোধ থাকিয়া থাকিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি; সুতরাং অবরোধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের—বিশেষত আমার কিছুই নাই। মেছোনীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, 'পচা মাছের দুর্গন্ধ ভালো না মন্দ?' সে কী উত্তর দিবে?

এ-স্থলে আমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা পাঠিকা ভগিনীদিগকে উপহার দিব—আশা করি তাঁহাদের ভালো লাগিবে।

এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, গোটা ভারতবর্ষে কুলবালাদের অবরোধ কেবল পুরুষদের বিরুদ্ধে নহে, মেয়েমানুষদের বিরুদ্ধেও। অবিবাহিতা বালিকাদিগকে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং বাড়ির চাকরানি ব্যতীত অপর কোনো স্ত্রীলোকে দেখিতে পায় না।

বিবাহিতা নারীগণও বাজিকর-ভানুমতী ইত্যাদি তামাশাঅলী স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে পরদা করিয়া থাকেন। যিনি যত বেশি পরদা করিয়া গৃহকোণে যত বেশি পেঁচকের মতো লুকাইয়া থাকিতে পারেন তিনিই তত বেশি শরিফ।

শহরবাসিনী বিবিরাও মিশনারি মেমদের দেখিলে ছুটাছুটি করিয়া পলায়ন করেন। মেম তো মেম—শাড়ি পরিহিতা খ্রিস্টান বা বাঙালি স্ত্রীলোক দেখিলেও তাঁহারা কামরায় গিয়া অর্গল বন্ধ করেন।

১

সে অনেক দিনের কথা। রংপুর জিলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ নামক গ্রামের জমিদারবাড়িতে বেলা আন্দাজ ১টা-২টার সময় জমিদার-কন্যাগণ জোহরের নামাজ পড়িবার জন্য ওজু করিতেছিলেন। সকলের ওজু শেষ হইয়াছে, কেবল 'আ' খাতুন নাম্নী সাহেবজাদী তখনো আঙিনায় ওজু করিতেছিলেন। আলতার মা বদনা হাতে তাঁহাকে ওজুর জন্য পানি ঢালিয়া দিতেছিল। ঠিক সেই সময় এক মস্ত লম্বাচৌড়ি কাবুলি স্ত্রীলোক আঙিনায় আসিয়া উপস্থিত! হায়, হায়, সে কী বিপদ! আলতার মা'র হাত হইতে বদনা পড়িয়া গেল—সে চেঁচাইতে লগিল—'আউ আউ! মরদটা কেন আইল!' সে স্ত্রীলোকটি হাসিয়া বলিল 'হেঁ মরদানা! হাম্ মরদানা হায়?' সেইটুকু শুনিয়াই 'আ' সাহেবজাদী প্রাণপণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া তাঁহার চাচিআম্মার নিকট গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, 'চাচিআম্মা! পায়জামা-পরা একটা মেয়েমানুষ আসিয়াছে!', কর্ত্রী সাহেবা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে তোমাকে দেখিয়াছে?' 'আ' সরোদনে বলিলেন, 'হাঁ!' অপর মেয়েরা নামাজ ভাঙিয়া শশব্যস্তভাবে দ্বারে অর্গল দিলেন,—যাহাতে সে কাবুলি স্ত্রীলোক এ কুমারী মেয়েদের দেখিতে না পায়। কেহ বাঘ-ভালুকের ভয়েও বোধহয় অমন করিয়া কপাট বন্ধ করে না।

২

ইহাও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাটনায় এক বড়লোকের বাড়িতে শুভবিবাহ উপলক্ষে অনেক নিমন্ত্রিতা মহিলা আসিয়াছেন। অনেকে সন্ধ্যার সময়ও আসিয়াছেন। তন্মধ্যে হাশমত বেগম একজন। দাসী আসিয়া প্রত্যেক পালকির দ্বার খুলিয়া বেগম

সাহেবাদের হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া যাইতেছে, পরে বেহারাগণ [illegible] সরাইয়া লইতেছে এবং অপর নিমন্ত্রিতার পালকি আসিতেছে। বেহারা 'মামা! সওয়ারি আয়া!' মামারা মন্থর গমনে আসিতেছে। মামা যতক্ষণে বেগমের পালকির নিকট আসিবে ততক্ষণে বেহারাগণ সওয়ারি নামিয়াছে পালকি লইয়া সরিয়া পড়িল। অতঃপর আর একটি পালকি আসিলে মামারা দ্বার খুলিয়া যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাকে লইয়া গেল।

শীতকাল। যত পালকি আসিয়াছে 'সওয়ারি' নামিলে পর সব খালি একপ্রান্তে বটগাছের তলায় জড়ো করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদূরে বেহারাগণ ঘটা করিয়া রান্না করিতেছে। তাহারা বিবাহবাড়ি হইতে জমকালো সিধা পাইয়াছে রাত্রিকালে আর সওয়ারি খাটিতে হইবে না। সুতরাং তাহাদের ভারি স্ফূর্তি—কেহ গল্প গায়, কেহ তামাক টানে, কেহ খেইনি খায়—এইরূপে আমোদ করিয়া খাওয়াদাওয়া করিতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল।

এদিকে মহিলামহলে নিমন্ত্রিতাগণ খাইতে বসিলে দেখা গেল—হাশমত বেগম তাঁহার ছয়মাসের শিশুসহ অনুপস্থিত। কেহ বলিল, ছেলে ছোট বলিয়া হয়তো আসিলেন না কেহ বলিল, তাঁহাকে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছে—ইত্যাদি।

পরদিন সকালবেলা যথাক্রমে নিমন্ত্রিতাগণ বিদায় হইতে লাগিলেন—একে একে খালি পালকি আসিয়া নিজ নিজ 'সওয়ারি' লইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটি 'খালি' পালকি আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার দ্বার খুলিয়া দেখা গেল হাশমত বেগম শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। পৌষ মাসের দীর্ঘ রজনী তিনি ঐভাবে পালকিতে বসিয়া কাটাইয়াছেন।

তিনি পালকি হইতে নামিবার পূর্বেই বেহারাগণ পালকি ফিরাইয়া লইয়া গেল—কিন্তু নিজে তো শব্দ করেনই নাই—পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারা শুনিতে পায়, শিশুকেও প্রাণপণ যত্নে কাঁদিতে দেন নাই—যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পালকির দ্বার খুলিয়া দেখে! কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আর অবরোধবাসিনীর বাহাদুরি কী?

৩

প্রায় ৪০/৪৫ বৎসর পূর্বের ঘটনা। কয়েক ঘর বঙ্গীয় সম্ভ্রান্ত জমিদারের মাতা, মাসি, পিসি, কন্যা ইত্যাদি একত্রে হজ্ব করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ২০/২৫ জন ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছিলে পর সঙ্গের পুরুষ-প্রতুগণ কার্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। বেগম সাহেবাদিগকে একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় পুরুষের হেফাজতে রাখা হয়। সে ভদ্রলোকটিকে লোকে হাজি সাহেব বলিত, আমরাও তাহাই বলিব। হাজি সাহেব বেগম সাহেবাদের ওয়েটিংরুমে বসাইতে সাহস পাইলেন না। তাঁহার উপদেশ মতে বিবি সাহেবারা প্রত্যেকে মোটা মোটা কাপড়ের বোরকা পরিয়া স্টেশনের প্লাটফরমে উবু হইয়া (Squate) বসিলেন; হাজি সাহেব মস্ত একটা মোটা ভারী শতরঞ্জি তাঁহাদের উপর ঢাকিয়া দিলেন। তদবস্থায় বেচারিগণ এক-একটা বোঁচকা বা বস্তার মতো দেখাইতেছিলেন। তাঁহাদিগকে এইরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া হাজি সাহেব এককোণে দাঁড়াইয়া খাড়া পাহারা দিতেছিলেন। একমাত্র আল্লাহ জানেন, হজ্বযাত্রী বিবিগণ ঐ অবস্থায় কয় ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছিলেন—আর ইহা কেবল আল্লাহতালার মহিমা যে তাঁহারা দম আটকাইয়া মরেন নাই।

ট্রেন আসিবার সময় জনৈক ইংরাজ কর্মচারী ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে হর্ষিত সাহেবকে বলিলেন, 'মুন্সি! তোমরা আসবাব হিয়াছে হাটা লো! আভি ন আরেগা—প্লাটফরম পর খালি আদমি রহেগা—আসবাব নেহি রহেগা!' হাজি সাহেব জোড়হস্তে বলিলেন, 'হুজুর, ঐসব আসবাব নাহি—আওরত হায়!" কর্মচারীটি পুনরায় একটা 'বস্তায়' জুতার ঠোকরা মারিয়া বলিলেন, 'হা, হা—এই সব আসবাব হাটা লো।' বিবিরা পরদার অনুরোধে জুতার গুঁতা খাইয়াও টুঁ শব্দটি করেন নাই।

৪

উড়িষ্যার অন্তর্গত রাজকণিকায় একজন ভদ্রলোক চাকুরি উপলক্ষে ছিলেন। বাসায় তাঁহার মাতা, দুইজন ভগিনী এবং স্ত্রী ছিলেন। বর্ষার সময়। তাঁহার বাঙলোয় চারিজন পাখাটানা কুলি পালাক্রমে সমস্ত দিন ও রাত্রি পাখা টানিত। সাহেব ট্যুরে বাহিরে গিয়াছেন, রাত্রিকালে তাঁহার স্ত্রীর কামরায় চাকরানি শুইয়াছেন। তাঁহার ভগিনীগণ অন্য কামরায় ছিলেন।

সে অঞ্চলে গরমের সময় লোকে বেশি বিছানা ব্যবহার করে না। রাত্রিকালে প্রবল বেগে বৃষ্টি হওয়ায় সাহেবের স্ত্রীর শীত বোধ হইল। তবু তিনি চাকরানিকে ডাকিয়া পাখা বন্ধ করিতে বলিলেন না। ক্রমে শীত অসহ্য হওয়ায় প্রথমে তিনি বিছানার চাদরখানি গায়ে দিলেন, তাহাতেও শীত না গেলে তিনি বিছানার দরি (শতরঞ্জি) ও সুজনী তুলিয়া গায়ে দিলেন। কিন্তু হতভাগা পাখা-কুলি আরও জোরে পাখা টনিতে লাগিল। তখন অগত্যা বউ বিবি ঐ দরি চাদর সমস্ত গায়ে জড়াইয়া পালঙ্কের নিচে গিয়া শুইলেন।

পরদিন সকালে একজন চাকরানি কামরায় ঝাঁটা দিতে আসিয়া পালঙ্কের নিচে শাদা একটা কী দেখিয়া দিল ঝাঁটার বাড়ি—ঝাঁটার চোটে তাড়াতাড়ি বউ বিবি পাশ ফিরিলেন। বেচারি চাকরানি যেন মরিয়া গেল!

৫

ই. আই. রেলযোগে কোনো বেহারি ভদ্রলোক সস্ত্রীক পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে লেডির কক্ষে না দিয়া নিজের সঙ্গেই রাখিলেন। তাঁহারা সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট লইয়াছিলেন। বেগম সাহেবা বোরকা পরিয়াই রহিলেন। একসময় সাহেব বাথরুমে থাকিতে ট্রেন কোনো স্টেশনে থামিল। অপর এক যাত্রী কোথাও স্থান না পাইয়া ঐ কক্ষে উঠিয়া অতি সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া একটা জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া রহিলেন। এদিকে পূর্বোক্ত সাহেব বাথরুম হইতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার স্ত্রী অনুপস্থিত! কী করিবেন—তখন চলন্ত ট্রেন! পরবর্তী স্টেশনে আগন্তুক ভদ্রলোকটি নামিয়া গেলেন। আমাদের কথিত সাহেবও নামিয়া স্টেশনের পুলিশে সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অমুক ও অমুক স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে হারাইয়াছে।

বেচারা পুলিশ বিভিন্ন স্টেশনে টেলিগ্রাফ করিল যে, কালো বোরকায় আবৃতা এক মহিলার খোঁজ কর। একজন কনস্টেবল বলিল,'একবার এই গাড়িখানাই ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখি না। যে-বেঞ্চে সাহেব বসিয়াছিলেন, কনস্টেবল সেই বেঞ্চের নিচে কালো একটা কী দেখিতে পাইয়া টানিয়া বাহির করিবামাত্র সাহেব চেঁচাইয়া উঠিলেন,

'আরে ছোড় ছোড়–ওহি ত মেরা ঘর হায়!' পরে জানা গেল সেই নবাগত ভদ্রলোক দেখিয়া ইনি বেঞ্চের নিচে লুকাইয়াছিলেন।

৬

ঢাকা জেলায় কোনো জমিদারের প্রকাণ্ড পাকাবাড়িতে দিনে-দুপুরে অগ্নি লাগিয়াছিল। জিনিসপত্র পুড়িয়া ছারখার হইল—তবু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব আসবাব সরঞ্জাম বাহির করার সঙ্গে বাড়ির বিবিদেরও বাহির করা প্রয়োজন বোধ করা গেল। হঠাৎ তখন পালকি, বিশেষত পাড়াগাঁয়ে একসঙ্গে দুই-চারিটা পালকি কোথায় পাওয়া যাইবে? অবশেষে স্থির হইল যে একটা বড় রঙিন মশারির ভিতর বিবিরা থাকিবেন, তাহার চারিকোণ বাহির হইতে চারিজনে ধরিয়া লইয়া যাইবে। তাহাই হইল —আগুনের তাড়নায় মশারি ধরিয়া চারিজন লোক দৌড়াইতে থাকিল, ভিতরে বিবিরা সমভাবে দৌড়াইতে না পারিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া দাঁত-নাক ভাঙিলেন, কাপড় ছিঁড়িলেন। শেষে ধানক্ষেত দিয়া, কাঁটাবন দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে মশারি ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

অগত্যা আর কী করা যায়? বিবিগণ একটা ধানক্ষেতে বসিয়া থাকিলেন। সন্ধ্যায় আগুন নিবিয়া গেলে পর পালকি করিয়া একে একে তাঁহাদের বাড়ি লইয়া যাওয়া হইল।

৭

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের জনৈক জমিদারের বড়িতে বিবাহ হইতেছিল। অতিথি—অভ্যাগতে বাড়ি গম্‌গম্‌ করিতেছে। খাওয়া-দাওয়ায় রাত্রি ২টা বাজিয়া গিয়াছে, এখন সকলের ঘুমাইবার পালা। কিন্তু চোরচোট্টা—তো ঘুমাইবে না—এই সুযোগ তাহাদের চুরি করার।

সিঁধ কাটিয়া চোর ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। একজন চৌকিদার চোরের সাড়া পাইয়া বাড়ির কর্তাদিগকে সংবাদ দিয়াছে। কর্তারা ছিলেন পাঁচ-ছয় ভাই। তাঁহারা প্রত্যেকে কুঠারহস্তে সে-ঘরটার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন চোরের সন্ধানে। চোরকে পাইলে সে-সময় তাঁহারা কুঠার দিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিতেন। হুঁ—চোরের এতবড় আস্পর্ধা!

ঘরের ভিতর বিবিরা চোরকে দেখিয়া আরও জড়সড় হইয়া চাদর গায়ে দিয়া শুইলেন—একেবারে নীরব, যেন নিশ্বাস ফেলিবারও সাহস নাই। বিশেষত 'বেগানা মরদটা' যেন তাঁহাদের নিশ্বাসের শব্দও না শুনে। চোর নিঃশঙ্কচিত্তে সিন্দুক ভাঙিয়া নগদ টাকা, গহনাপত্র বাহির করিয়া লইল। পরে একে একে প্রত্যেক বিবির হাত-পায়ের গহনা খুলিয়া লইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বিবিরা তাড়াতাড়ি নাক, কান ও গলার অলঙ্কার খুলিয়া শিয়রে রাখিতে লাগিলেন। ইহাতে চোরের বেশ সুবিধাই হইল—সে আর অনর্থক বেগম-খানমদের নাক বা গলা স্পর্শ করিবে কেন? সেই ঘরে একটি ছিল নূতন বউ—সে বেচারি নাকের নথটি তো খুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কানের ঝুমকা প্রভৃতি গহনাগুলি পরস্পরে জড়াইয়া বড় জটিল হইয়া পড়িল—কিছুতেই খোলা গেল না। চোর মহাশয় ভদ্রতার অনুরোধে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করার পর কলম-তারাশ ছুরি দিয়া বউ-বিবির উভয় কান কাটিয়া লইয়া গহনার পুঁটুলিতে ভরিয়া সেই সিঁধ-পথে

পলায়ন করিল।

ঘরের ভিতর এত কাণ্ড হইয়া গেল—বাহিরে পুরুষগণ কুঠারহস্তে চোরের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কিন্তু বিবিরা কেহ টুঁ শব্দ করিলেন না—পাছে 'বেগানা মরদটা' তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনে! চোর নিরাপদে বাহির হইয়া গেলে পর বিবিরা হাউমাউ আরম্ভ করিয়া দিলেন!

পাঠিকা ভগিনী! এইরূপ আমরা অবরোধ-প্রথার সম্মান রক্ষা করিয়া থাকি।

৮

এক বাড়িতে আগুন লাগিয়াছিল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি সমস্ত অলঙ্কার একটা হাতবাক্সে পুরিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন সমাগত পুরুষেরা আগুন নিবাইতেছেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া অলঙ্কারের বাক্সটি হাতে করিয়া ঘরের ভিতর খাটের নিচে গিয়া বসিলেন। তদবস্থায় পুড়িয়া মরিলেন, পুরুষের সম্মুখে বাহির হইলেন না। ধন্য! কুল-কামিনীর অবরোধ!

৯

এক মৌলবী সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং বিধবা অবশিষ্ট ছিলেন। মৌলবী সাহেব কিছু রাখিয়া যান নাই, সুতরাং অতি কষ্টে তাঁহার বিধবা সংসার চালাইতেন। পুত্রের বিবাহের জন্য বহু কষ্টে কতকগুলি অলঙ্কার গড়াইলেন। অলঙ্কারগুলি বেশ ভারী দামের হইল। বিবাহের দুই-তিনদিন পূর্বে সিঁধ কাটিয়া চোর গৃহে প্রবেশ করিল। সে-ঘরে তিনি একমাত্র দাসীসহ শুইয়াছিলেন। চোরের সাড়া পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চুপি চুপি বাঁদীকে জাগাইলেন। চোর ভাবিল, সর্বনাশ—দেই দৌড়।

কিন্তু চোরের সঙ্গীরা বলিল, আচ্ছা, একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখি না কী হয়। হইল বেশ মজা—

বিবি সাহেবার সঙ্কেতমতো দাসী একখানা কাপড় দিয়া তাঁহার খাটের সম্মুখে পরদা টাঙাইয়া দিল। পরে চাবির গোছা দেখাইয়া চোরদিগকে বলিল, 'বাপুসকল! তোমরা এদিকে আসিও না, তোমরা যাহা চাও, আমি সিন্দুক খুলিয়া বাহির করিয়া দিতেছি।' পরে সমস্ত দামি কাপড় ও অলঙ্কার বাহির করিয়া চোরের হাতে দিল। তাহারা গহনা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, 'নথ কই?—সেই সিন্দুকে আছে বুঝি?' কর্ত্রীর সঙ্কেত অনুসারে দাসী বলিল, 'দোহাই! তোমরা এদিকে আসিও না—আম্মা সা'ব কেবল নথটা রাখিয়াছেন যে পরশু দিন বিয়া—একেবারে কোনো গয়না রহিল না-নথটাও না থাকিলে বিয়া হয় কী করিয়া? তা যদি তোমরা চাও, তবে নেও—নথ লও-পরদার এদিকে আসিও না।'

চোরেরা ভারি খুশি হইয়া পরস্পর গল্প করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন রাত্রি তিনটা কি চারিটা। এত সহজে সিদ্ধিলাভ করায় আনন্দের আতিশয্যে তাহারা একটু জোরে কথা কহিয়াছিল। পথে চৌকিদার তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তাড়া করে। সকলে পলাইল। একটি চোর হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় চৌকিদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অগত্যা সে চৌকিদারের সঙ্গে চুরি-করা বাড়ি দেখাইয়া দিতে গেল। ততক্ষণে ভোর হইয়াছে।

চৌকিদার গিয়া দেখে, বিবি সাহেবা তখনো পরদার অন্তরাল হইতে বাহির হন নাই—'যদি ব্যাটারা আবার আসে'—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। তাই চেঁচামেচি করিতে দেন নাই যে শোরগোল শুনিয়া যদি কোনো পুরুষমানুষ ভিতরে প্রবেশ করে! চোরের হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তিনি অবরোধ-প্রথার সম্মান রক্ষা করিলেন।

১০

কোনো জমিদারগৃহিণী ছোটভাইয়ের বউ আনিবার জন্য শ্বশুরবাড়ি গিয়াছেন। একদিন হঠাৎ গিয়া দেখেন নববধূকে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ ভাত খাওয়াইতেছেন। ভাতের বাসনে একটা কাঁচামরিচ ছিল। তিনি সরল-মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমাদের বউ কাঁচা মরিচ খাইতে ভালোবাসে নাকি?' বউয়ের ভাবীজান উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, বড্ড ঝাল খায়।'

পরে তিনি বউ লইয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় আসিলেন। পথে তিন-চারিদিন নৌকায় থাকা হইল। এই সময়ে তিনি যাহা কিছু রান্না করাইতেন, তাহাতেই অতিরিক্ত ঝাল দেওয়াইতেন। আসল কথা এই যে, বউ মোটেই ঝাল খাইতে অভ্যস্ত নহেন। খাইবার সময় কাঁচালঙ্কার খোশবু শুঁকিয়া শুঁকিয়া ভাত খাইতেছিল। তাই ঠাট্টা করিয়া তাঁহার ভাবীজান ঝাল খাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন। ফলে বেচারির প্রাণ লইয়া টানাটানি।

ননদ মহাশয় কাঁচালঙ্কা দিয়া মুড়ি মাখিয়া ভাই-বউকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেন। বউ-এর দুই চক্ষু বহিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িল—মুখ, জিহ্বা পুড়িয়া যাইত—তবু বড় ননদকে মুখ ফুটিয়ে বলেন নাই যে, তিনি ঝাল খান না! ও সর্বনাশ একে নূতন বউ, তাতে বড় ননদ—প্রাণ গেলেও কথা কহিতে নাই!

১১

গত ১৯২৪ সনে আমি আরায় গিয়াছিলাম। আমার দুই নাতিনীর বিবাহ একসঙ্গে হইতেছিল, সেই বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। নাতিনীদের ডাক নাম মঙ্গু ও সবু। বেচারিরা তখন 'মাইয়া খানায়' ছিল। কলিকাতায় তো বিবাহের পাত্র ৫/৬ দিন পূর্বে 'মাইয়া খানা' নামক বন্দিখানায় মেয়েকে রাখে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে ৬/৭ মাস পর্যন্ত এইরূপ নির্জন কারাবাসে রাখিয়া মেয়েদের আধমরা করে।

আমি মজুর জেলখানায় গিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারি না— সে-রুদ্ধ-গৃহে আমার দম আটকাইয়া আসে। শেষে একদিন একটা জানালা একটু খুলিয়া দিলাম। দুই মিনিট পরেই এক মাতব্বর বিবি, 'দুলহিনকো হাওয়া লাগেগী' বলিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া উঠিয়া আসিলাম। আমি সবুদের জেলখানায় গিয়া মোটেই বসিতে পারিতাম না। কিন্তু সে বেচারিরা ছয়মাস হইতে সেই রুদ্ধ কারাগারে ছিল। শেষে সবুর হিস্টিরিয়া রোগ হইয়া গেল। এইরূপে আমাদের অবরোধ-বাস করিতে অভ্যস্ত করা হয়।

১২

পশ্চিমদেশের এক হিন্দুবধূ তাহার শাশুড়ি ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ি ও স্বামীকে ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল

না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হুঁশ হইতেছে।' তিনি আচম্বিতে ফিরিয়ে দেখেন : আ রে! এ কাহার বউ ভাগাইয়া লইয়া তাঁহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে!—প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে—নিজের স্বামীকে সে কখনো ভালো করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে। এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে।

১৩

সম্প্রতিকার (২৮ জুন, ১৯২৯) ঘটনা শুনুন। স্কুলের একটি মেয়ের বাপ লম্বা-চওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে, মোটর-বাস তাঁহার গলির ভিতর যায় না বলিয়া তাঁহার মেয়েকে 'বোরকা' পরিয়া মামার (চাকরানির) সহিত হাঁটিয়া বাড়ি আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাঁহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড় নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের জনৈক শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই :

'অনুসন্ধানে জানিলাম, হীরার বোরকায় চক্ষু নাই (হীরাকা বোরকা মে আঁখ নেহি হ্যয়)। অন্য মেয়েরা বলিল, তাহারা গাড়ি হইতে দেখে, মামা প্রায় হীরাকে কোলের নিকট লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। 'বোরকা'য় চক্ষু না-থাকায় হীরা ঠিকমতো হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল—কখনো হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায়ে ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে। *

দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর—এতটুকু বালিকাকে 'অন্ধ বোরকা' পরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না!

১৪

প্রায় ২১-২২ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। আমার দূর-সম্পর্কীয়া এক মামি-শাশুড়ি ভাগলপুর হইতে পাটনা যাইতেছিল; সঙ্গে মাত্র একজন পরিচারিকা ছিল। কিউল স্টেশনে ট্রেন বদল করিতে হয়। মামানী সাহেব অপর ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহার প্রকাণ্ড বোরকায় জড়াইয়া ট্রেন ও প্লাটফরমের মাঝখানে পড়িয়া গেলেন। স্টেশনে সে-সময় মামানীর চাকরানি ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোক ছিল না। কুলিরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে অগ্রসর হওয়ায় চাকরানি দোহাই দিয়া নিষেধ করিল—'খবরদার! কেহ বিবি সাহেবার গায়ে হাত দিও না।' সে একা অনেক টানাটানি করিয়া তাঁহাকে তুলিতে পারিল না। প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

ট্রেনের সংঘর্ষে মামানী সাহেব পিষিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলেন,—কোথায় তাঁহার 'বোরকা' আর কোথায় তিনি! স্টেশন-ভরা লোক সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই লোমহর্ষণ

* এখনই আষাঢ় মাসের মাসিক 'মোহাম্মদী'তে শ্রীমতী আমিনা খাতুনের লিখিত প্রবন্ধের একস্থলে দেখিলাম—কতক্ষণের জন্য নাক, মুখ, চোখ বন্ধ করিয়া বেড়ানো (এইরূপ পরদায় পরপুরুষের ঘাড়ে পড়া সম্ভবপর)—উহা ইসলামের বাহিরের পরদা।

ব্যাপার দেখিল - কেহ তাঁহার সাহায্য করিতে অনুমতি পাইল না। পরে [illegible] দেহ একটা গুদামে রাখা হইল ; তাঁহার চাকরানি প্রাণপণে বিনাইয়া [illegible] তাঁহাকে বাতাস করিতে থাকিল। এই অবস্থায় ১১ (এগার) ঘণ্টা অতিবাহিত [illegible] পর তিনি দেহত্যাগ করিলেন। কী ভীষণ মৃত্যু!

১৫

হুগলিতে এক বড়লোকের বাড়িতে বিবাহ উপলক্ষে কামরায় অনেক বিবি [illegible] হইয়াছেন। রাত্রি ১২ টার সময় বোধ হইল, কেহ বাহির হইতে কামরার দরজা ঠেলিতেছে; জোরে, আস্তে—নান প্রকারে দরজা ঠেলিতেছে। বিবিরা সকলে ভীত উঠিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিলেন—নিশ্চয় চোর দ্বার ভাঙিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে ও বিবিদের দেখিয়া ফেলিবে! তখন এক জাহাঁবাজ বিবি সমস্ত অলঙ্কার পুঁটলি ফেলিলেন, অবশিষ্ট পুঁটলি বাঁধিয়া চাপা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন। পরে বোরকা পরিয়া দ্বার খুলিলেন। দ্বারের বাহিরে ছিল—একটা কুকুরী! তাহার বাচ্চাদুটি ঘটনাবশতঃ কামরার ভিতর ছিল, আর সে ছিল বাইরে। বাচ্চার নিকট আসিবার জন্য সেই কুকুর দরজা ঠেলিতেছিল।

১৬

বেহার শরিফের এক বড়লোক দার্জিলিং যাইতেছিলেন; তাঁহার সঙ্গে এক ডজন 'মানব-বোঝা' (human-luggage) অর্থাৎ, মাসি, পিসি প্রভৃতি ৭ জন মহিলা এবং ৫ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের ৫ জন বালিকা। তাঁহারা যথাক্রমে ট্রেন ও স্টিমার বদল করিবার সময় সর্বত্রই পালকির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনিহারি ঘাট, সক্রিগলি ইত্যাদিতে পালকি ছিল। বিবিদের পালকিতে পুরিয়া স্টিমারের ডেকে রাখা হইত। আবার ট্রেনে উঠিবার সময় তাঁহাদিগকে পালকিসহ মালগাড়িতে দেওয়া হইত। কিন্তু ই. বি. রেলওয়ে লাইনে আর পালকি পাওয়া গেল না। তখন তাঁহারা ট্রেনের রিজার্ভ করা সেকেন্ড ক্লাসের গাড়িতে বসিতে বাধ্য হইলেন।

শিলিগুড়ি স্টেশনেও পালকি বেহারা পাওয়া গেল না। এতবড় বিপদ—বিবিরা দার্জিলিঙের ট্রেনে উঠিবেন কী করিয়া? অতঃপর দুইটা চাদর চারিজন লোকে দুইদিক ধরিল—সেই চাদরের বেড়ার মধ্যে বিবিরা চলিলেন। হতভাগা পরদাধারী চাকরেরা ঠিক তাল রাখিয়া পার্বত্য বন্ধুর পথে হাঁটিতে পরিতেছিল না। কখনো ডাইনের পরদা আগে যায়, বামের পরদা পিছনে থাকে; কখনো বামের পরদা অগ্রসর হয়, তখন ডাইনের পরদা পশ্চাতে। বেচারি বিবিরা হাঁটিতে আরও অপটু—তাঁহারা পরদা ছাড়িয়া কখনো আগে যান, কখনো পিছে রহিয়া যান! কাহারো জুতা খসিয়া রহিয়া গেল,কাহারো দোপাট্টা উড়িয়া গেল।

১৭

প্রায় ১৪ বৎসর পূর্বে আমাদের স্কুলে একজন লক্ষ্ণৌ নিবাসী শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, নাম আখতর জাহাঁ। তাঁহার কন্যাও এই স্কুলে পড়িত। একদিন তিনি একালের মেয়েদের নির্লজ্জতার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মেয়েদের বেহায়াপনার কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কথায় কথায় নিজের বধূ-জীবনের একটা গল্প বলিলেন : 'এগার

বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ি গিয়া তাঁহাকে এক নির্জনকক্ষে থাকিতে হইত। তাঁহার এক ছোট ননদ দিনে তিন-চারিবার আসিয়া তাঁহাকে প্রয়োজনমতো বাথরুমে পৌঁছাইয়া দিত। একদিন কী কারণে সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সংবাদ লয় নাই। এদিকে বেচারি প্রকৃতির তাড়নায় অধীর হইয়া পড়িলেন। কক্ষে-এ মেয়েকে বড় বড় তামার পানদান যৌতুক দেওয়া হয়। তাঁহার মস্ত পানদানটা সেই কক্ষেই ছিল। তিনি পানদান খুলিয়া সুপারির ডিবেটা বাহির করিয়া সুপারিগুলি একটা রুমালে ঢালিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি সেই ডিবেটা যে-জিনিস দ্বারা পূর্ণ করিয়া খাটের নিচে রাখিলেন, তাহা লিখিতব্য নহে। সন্ধ্যার সময় তাঁহার পিত্রালয়ের চাকরানি বিছানা ঝাড়িতে আসিলে তিনি তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ডিবের দুর্দশার কথা বলিলেন। সে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'থাক, তুমি কেঁদো না; আমি কালই ডিবেটা কালাই (tinning) করাইয়া আনিয়া দিব। সুপারি এখন রুমালেই বাঁধা থাকুক।'

১৮

লাহোরের জনৈক ভুক্তভোগী ডাক্তার সাহেবের রোগিণী দর্শনের বর্ণনা এই—

সচরাচর ডাক্তার আসিলে দুইজন চাকরানি রোগিণীর পালঙ্কের শিয়রে ও পায়ের দিকে একটা মোটা বড় দোলাই ধরিয়া দাঁড়ায় ; ডাক্তার সেই দোলাইয়ের একটু ফাঁকের ভিতর হাত দিয়া রোগিণীর নাড়ি পরীক্ষা করেন।*

এক বেগম সাহেবা নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ফেফড়ার অবস্থা দেখা দরকার ; আমি পিঠের দিক হইতে দেখিয়া লইব। হুকুম হইল, 'স্টেথিসকোপের নল,যেখানে বলেন, চাকরানি রাখিয়া দিবে!' সকলেই জানেন, ফেফড়া বিভিন্ন স্থান হইতে পরীক্ষা করিলে পর রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমি অগত্যা কর্তার হুকুমে রাজি হইলাম। চাকরানি নলটা দোলাইয়ের ভিতরে বেগম সাহেবার কোমরে নেফার (পায়জামার উপরাংশের) কিছু উপরে রাখিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আশ্চর্য হইলাম যে কোনো শব্দ শুনিতে পাই না কেন? দুঃসাহসে ভর দিয়া দোলাই একটু উঠাইয়া দেখিলাম—দেখি কী, নলটা কোমরে লাগানো হইয়াছে! আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।**

১৯

জনৈক রেলপথে ভ্রমণকারীর বৃত্তান্তের সারাংশ—এই স্টেশন টিকিট কেটে মনে মনে একটা হিসেব করলাম। তিনখানা ইন্টার ক্লাসের টিকিটের দরুন দেড়মণ জিনিস নিতে পারব, কিন্তু আমাদের জিনিসপত্তর ওজন করলে পাঁচ মণের কম কিছুতেই হবে না।

---

* আমাকে জনৈক নন-পর্দা মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; (লেডি ডাক্তারের অভাবে পুরুষ) ডাক্তারকে জিহ্বা দেখাইতে হইলে আপনি কী করিবেন? দোলাই ফুটা করিয়া তাহার ভিতর হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া দেখাইবেন নাকি? আমি পাঠিকা ভগ্নীদিগকে ঐ প্রশ্নের এবং আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করি। ডাক্তারকে চোখ, দাঁত এবং কান দেখাইতে হইলে তাঁহারা কী উপায়ে দেখাইবেন ?

** ডাক্তার সাহেবের নিজের ভাষায় শুনুন—'লা হাওলা বেলা কুওৎ! ময় দিক হো কর উঠ আয়া। আর নওয়াব সাহেব পুছতে হেঁ' কে কেয়া পাতা লাগা? 'ময় কেয়া খাক বাতাতা. কে কেয়া পাতা লাগা?'

অনেক ভেবেচিন্তে লগেজ না-করাই ঠিক করলাম। মেয়েদের গাড়ি থেকে তুলে দিলে আর কে চেক করতে আসবে?

* * *

খোকা জিজ্ঞাসা করলে—তোমার সঙ্গে কোনো জ্যান্ত লগেজ আছে না কি?

আবার আছে না কি! একেবারে একজোড়া! একে বুড়ি, তায় আবার খুড়খুড়ে খোকা বল্লে—তবেই সেরেছে!

* * *

যখন ঘুম ভাঙল, তখন বেশ রাত হয়েছে।

অনুমানে বুঝলাম, একটা বড় স্টেশনে গাড়ি থেমে আছে। হঠাৎ মনে হল বহরমপুর হবে হয়তো। দরজাটা খুলে নামতে যাব, এমন সময় মনে হল যেন শুনতে পেলাম, আমারই নাম ধরে কারা ডাকাডাকি করছে—'ও টুনু—টুনু, এ তো বিপদে আজ পড়লাম, টুনু রে!'

একে মেয়েলি গলা, তার ওপর আবার করুণ। আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। দেখলাম, দুই বুড়ি মাটিতে দাঁড়িয়ে মহা কান্নাকাটি শুরু করেছে, আর জিনিসপত্তরগুলোও সব নামানো হয়েছে। চারদিকে তিন চারজন কুলি ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার মেজাজ গরম হয়ে উঠল। টি. টি. সি. অর্থাৎ চেকারগুলো রাত্রিকে মেয়েদের গাড়ি চেক করে-মালপত্তর সব নামিয়ে দেবে এ তো কম অন্যায় কথা নয়। আমি কুলিগুলোকে খুব বকে দিলাম, জিনিস-পত্তর আবার গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। আর একবার কুলিগুলোকে একচোট বকে দিলাম এবং টি. টি. সি-দের নামে যে রিপোর্ট করতে হবে, সেরকমও অনেক কথা বল্লাম।

ঠাকুরমা কেঁদে বল্লেন, 'আরে টুনু, আমরা যে এসে পড়েছি!'

অবশেষে একটা কুলি সাহস করে বলল, বাবু ঘাট আ গিয়া।

আমি ঠাকুরমাকে বললাম—তাহলে টি. টি. সি. চেক করে নামিয়ে দেয়নি—ঘাটে এসে পড়েছ; সে-কথা আমাকে আগে বল্লেই হত, এজন্য কান্নাকাটি কেন?

২০

জনৈক পাঞ্জাবি বেগম সাহেবা নিম্নলিখিত গল্প কোনো উর্দু কাগজে লিখিয়াছেন—

আমরা একটা গ্রামে কিছুকাল ছিলাম। একবার তত্রত্য কোনো সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গিয়া কুমারী মেয়েদের প্রতি যে অত্যধিক জুলুম হইতে দেখিলাম, তাহাতে আমি প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম।

আমরা যথাসময় তথায় পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ির মেয়েরা কোথায়? শুনিতে পাইলাম, তাহারা সকলে রান্নাঘরে বসিয়া আছে। আমি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, কেবল একা আমাকে সেইখানে ডাকিয়া লওয়া হইল। রান্নাঘরে ভয়ানক গরম আর স্থানও অতিশয় অল্প। কিন্তু উপায়ন্তর না-দেখিয়া সেইখানে বসিয়া সেই মজলুম কিন্তু মিষ্টভাষিণী বালিকাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলাম।

একজন দয়াবতী বিবি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, 'তোমরা সাবধানে লুকাইয়া উপরে চলিয়া যাও।'

আমি মনে করিলাম, সম্ভবত পুরুষমানুষদের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা আছে, এই সাবধানে লুকাইয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু পরে জানিলাম, এ পরদা সাধারণ-অভ্যাসের মহিলাদের বিরুদ্ধে ছিল। উক্ত বিবি সাহেবার হুকুমে দুইজন মেয়েমানুষ মোটা চাদর ধরিয়া পরদা করিল, আমরা সেই চাদরের অন্তরাল হইতে উপরে চলিয়া গেলাম।

পরে গিয়া আমি আরো বিপদে পড়িলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, ছাদের উপর আরামে বসিবার কোনো কামরা হইবে, অথবা কমপক্ষে বর্ষাতি চালা হইবে। কিন্তু সেখানে কিছুই ছিল না। একে তো প্রখর রৌদ্র, দ্বিতীয়ত বসিবারও কিছু ছিল না। সমস্ত ছাদ জুড়িয়া অর্ধশুষ্ক ঘুঁটে ছড়ানো ছিল; তাহার দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। বহু কষ্টে একজন চাকরানি একটা খাটিয়া আনিয়া দিল, আমরা অগত্যা তাহাতেই বসিলাম। নিচে বাজনা বাজিতেছিল; উৎসব হইতেছিল। কিন্তু অভাগিনী অনূঢ়া বালিকা কয়টি অপরাধিনীর ন্যায় রৌদ্রে বসিয়া ঘুঁটের দুর্গন্ধে হাঁপাইতেছিল। কেহই ইহাদের আরামের জন্য একটুকু খেয়াল করিতেছিল না।

২১

বঙ্গদেশের কোনো জমিদারের বাড়ি পুণ্যাহের উৎসব উপলক্ষে নাচ-গান হইতেছিল। নর্তকীরা বাহিরে যেখানে বিরাট শামিয়ানার নিচে নাচিতেছিল, সে-স্থানটা বাড়ির দেউড়ির কামরা হইতে দেখা যাইত। কিন্তু বাড়ির কোনো বিবি সে দেউড়ির ঘরে যান নাই। নৃত্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণের সৌভাগ্য লইয়া বিবিরা ধরাধামে আসেন নাই।

জমিদার সাহেবের একটি তিন বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। মেয়েটি দিব্যি গৌরাঙ্গি। তাহাকে আদর করিয়া কেহ বলিত চিনির পুতুল, কেহ বলিত ননীর পুতুল। নাম সাবেরা। ভোরের সময় রৌশনচৌকির ভৈরবী আলাপে নিদ্রিত পাখিরা জাগিরা কলরব আরম্ভ করিয়াছে। সাবেরার 'খেলাইও' (আধুনিক ভাষায় 'আয়া') জাগিয়া উড়িয়াছে। তাহার সাধ হইল, একটু নাচ দেখিতে যাইবে। কিন্তু সাবেরা তখনো ঘুমাইতেছিল। সুতরাং খেলাই সে নিদ্রিতা শিশুকে কোলে লইয়া দেউড়ির ঘরে নাচ দেখিতে গেল।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়! কর্তা সেই সময় বর্হিবাটি হইতে অন্তঃপুরে আসিতেছিলেন। দেখিলেন, সাবেরাকে কোলে লইয়া খেলাই খড়খড়ির পাখি তুলিয়া তামাশা দেখিতেছিল। তাঁহার হাতে একটা মোটা লাঠি ছিল, তিনি সেই লাঠি দিয়া খেলাইকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। খেলাইয়ের চিৎকারে বিবিরা দৌড়িয়া দেউড়িঘরে আসিলেন। এক লাঠি লাগিল সাবেরার ওরুতে। তখন কর্তার ভ্রাতৃবন্ধু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'ছোটসাহেব করেন কী! করেন কী! মেয়ে মেরে ফেলবেন?' প্রহারবৃষ্টি তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। জমিদার সাহেব সক্রোধে কহিলেন, 'হতভাগী নিজে নাচ দেখবি দেখ না, কিন্তু আমার মেয়েকে দেখাতে আনলি কেন?'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিশু তো খেলাইয়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল—সে বেচারি কিছুই দেখে নাই। বাড়িময় শোরগোল পড়িয়া গেল—সাবেরার দুধের মতো শাদা ধবধবে উরুতে লাঠির আঘাতে এক বিশ্রী কালো দাগ দেখিয়া কর্তাও শরমে মরিয়া গেলেন। এইরূপে লাঠির গুঁতায় আমাদের অবরোধ করায় বন্দি করা হইয়াছে।

২২

শিয়ালদহ স্টেশনের প্লাটফরমে ভরা-সন্ধ্যার সময় এক ভদ্রলোক ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারি করিতেছিলেন। কিছু দূরে আর একজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার

পার্শ্বে একগাদা বিছানা ইত্যাদি ছিল। পূর্বোক্ত ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ [illegible] উক্ত গাদার উপর বসিতে গেলেন। তিনি বসিবামাত্র বিছানা নড়িয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ সভয়ে লাফাইয়া উঠিলেন। এমন সময় সেই দণ্ডায়মান ভদ্রলোক আসিয়া সক্রোধে বলিলেন—'মশায়, করেন কী? আপনি স্ত্রীলোকদের মাথায় বসিতে গেলেন কেন?' বেচারা হতভম্ব হইয়া বলিলেন, 'মাফ করবেন মশায়! আঁধারে ভালোমতে দেখিতে পাই নাই, তাই বিছানার গাদা মনে করিয়া বসিয়াছিলাম। বিছানা নড়িয়া ওঠায় আমি ভয় পাইয়াছিলাম যে, এ কী ব্যাপার!'

২৩

অপরের কথা দূরে থাকুক। এখন নিজের কথা কিছু বলি। সবে মাত্র...হইতে [illegible] স্ত্রীলোকদের হইতেও পরদা করিতে হইত। ছাই কিছুই বুঝিতাম না যে, কেন করিব। সম্মুখে যাইতে নাই; অথচ পরদা করিতে হইত। পুরুষদের তো অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ। সুতরাং তাহাদের অত্যাচার আমাকে সহিতে হয় নাই। কিন্তু মেয়েমানুষের অবাধ গতি। অথচ তাহাদের দেখিতে-না-দেখিতে লুকাইতে হইবে। পাড়ার স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ বেড়াইতে আসিত; অমনি বাড়ির কোনো লোক চক্ষুর ইশারা করিত, আমি যেন প্রাণভয়ে যত্রতত্র। কখনো রান্নাঘরে ঝাঁপের অন্তরালে, কখনো কোনো চাকরানির গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা পাটির অভ্যন্তরে, কখনো তক্তপোশের নিচে লুকাইতাম।

বাচ্চাঅলি মুরগি যেমন আকাশে চিল দেখিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহার ছানাগুলি মায়ের পাখার নিচে পলায়, আমাকেও সেইরূপ পলাইতে হইত। কিন্তু মুরগির ছানার তো মায়ের বুকস্বরূপ একটা নির্দিষ্ট আশ্রয় থাকে, তাহারা সেইখানে পলাইয়া যায়। আমার জন্য সেরূপ কোনো নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থান ছিল না। আর মুরগির ছানা স্বভাবতঃ মায়ের ইঙ্গিত বুঝে—আমার তো সেরূপ কোনো স্বাভাবিক ধর্ম (instinct) ছিল না। তাই কোনো সময় চক্ষের ইশারা বুঝিতে না-পারিয়া দৈবাৎ না-পলাইয়া যদি কাহারও সম্মুখীন হইতাম, তবে হিতৈষিণী মুরুব্বিগণ, 'কলিকালের মেয়েরা কী বেহায়া, কেমন বেগয়রৎ' ইত্যাদি বলিয়া গঞ্জনা দিতে কম করিতেন না।

আমার পঞ্চমবর্ষ বয়সে কলিকাতা থাকাকালীন আমার দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধূর [illegible] বাড়ি—বেহার হইতে দুইজন চাকরানি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। তাহাদের 'ফ্রি পাসপোর্ট' ছিল—তাহারা সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত, আর আমি প্রাণভয়ে পলায়মান হরিণশিশুর মতো প্রাণ হাতে লইয়া যত্রতত্র—কপাটের অন্তরালে কি টেবিলের নিচে পলাইয়া বেড়াইতাম। ত্রিতলে একটা নির্জন চিলকোঠা ছিল; [illegible] প্রত্যূষে আমাকে খেলাই কোলে করিয়া সেইখানে রাখিয়া আসিত; প্রায় সমস্ত দিন সেইখানে অনাহারে কাটাইতাম। বোহারের চাকরানিদ্বয় সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিবার পর অবশেষে সেই চিলকোঠারও সন্ধান পাইল। আমার এক সমবয়স্ক ভগিনী-পুত্র, হালু দৌড়াইয়া গিয়া আমাকে এই বিপদের সংবাদ দিল। ভাগ্যে সেখানে একটা ছাপরখাট ছিল, আমি সেই ছাপরখাটের নিচে গিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলাম—ভয়, পাছে আমার নিশ্বাসের সাড়া পাইয়া সেই হৃদয়হীনা স্ত্রীলোকেরা খাটের নিচে উঁকি মারিয়া দেখে! সেখানে কতকগুলি বাক্স-পেটারা, মোড়া ইত্যাদি ছিল। বেচারা হালু তাহার (৬ বৎসর বয়সের) ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া সেইগুলি টানিয়া আনিয়া আমার চারিধার দিয়া আমাকে ঘিরিয়া রাখিল।

আমার খাওয়ার খোঁজখবরও কেহ নিয়মমতো লইত না। মাঝে মাঝে ভাত খেলিতে চিলকোঠায় গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহাকেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলিতাম সে কখনো একগ্লাস পানি, কখনো খানিকটা 'বিন্নি' (খই বিশেষ) আনিয়া দিত। কখনো বা খাবার আনিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসিত না—ছেলেমানুষ তো, ভুলিয়া যাইত। প্রায় চারিদিন আমাকে ঐ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল।

২৪

বেহার অঞ্চলে শরিফ ঘরানার মহিলাগণ সচরাচর রেলপথে ভ্রমণের পথে ট্রেনে উঠেন না। তাঁহাদিগকে বনাতের পরদা-ঢাকা পালকিতে পুরিয়া, সেই পালকি ট্রেনের মালগাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয়। ফল কথা, বিবিরা পথের দৃশ্য কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহারা ক্রকবন্ড চায়ের মতো vacuum টিনে প্যাক হইয়া দেশভ্রমণ করেন। কিন্তু এই কলিকাতার এক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবার উহার ওপরও টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ির বিবিদের রেলপথে কোথাও যাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাদের প্রত্যেককে, পালকিতে বিছানা পাতিয়া, একটা তালপাতার হাতপাখা, এক কুঁজা পানি এবং একটা গ্লাসসহ বন্ধ করা হয়। পরে সেই পালকিগুলি তাঁহাদের পিতা কিম্বা পুত্রের সম্মুখে চাকরেরা যথাক্রমে (১) বনাতের পরদা দ্বারা প্যাক করে; (২) তাহার উপর মোম-জমা কাপড় দ্বারা সেলাই করে; (৩) তাহার উপর খারুয়ার কাপড়ে ঘিরিয়া সেলাই করে; (৪) তাহার পর বোম্বাই চাদরের দ্বারা সেলাই করে;(৫) অতঃপর সর্বোপরি চট মোড়াই করিয়া সেলাই করে। এই সেলাই ব্যাপার তিন-চারিঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়—আর সেই চারিঘণ্টা পর্যন্ত বাড়ির কর্তা ঠায় উপস্থিত থাকিয়া খাড়া পাহারা দেন। পরে বেহারা ডাকিয়া পালকিগুলি ট্রেনের ব্রেকভ্যানে তুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পর, পুনরায় পুরুষ অভিভাবকের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে পালকিগুলির সেলাই খোলা হয়। সেলাই খুলিয়া পালকিগুলি বনাতের পরদা ঢাকা অবস্থায় রাখিয়া চাকরেরা সরিয়া যায়। পরে কর্তা স্বয়ং এবং বাড়ির অপর আত্মীয় এবং মেয়েমানুষেরা আসিয়া পালকির কপাট খুলিয়া মুমূর্ষা বন্দিনীদের অজ্ঞান অবস্থায় বাহির করিয়া যথারীতি মাথায় গোলাপজল ও বরফ দিয়া, মুখে চামচ দিয়া পানি দিয়া, চোখে-মুখে পানির ছিটা দিয়া বাতাস করিতে থাকেন। দুইঘণ্টা বা ততধিক সময়ের শুশ্রূষার পর বিবিরা সুস্থ হন।

২৫

'অবরোধবাসিনী'র ১১ নং প্যারায় লিখিয়াছি যে, আমি গত ১৯২৪ সনে আমার দুই নাতিনের বিবাহোপলক্ষে আরায় গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আরা শহরটায় সেই বাড়িখানা এবং আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমার 'মেয়েকে' অর্থাৎ মেয়ের মৃত্যুর পর জামাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে) সেই কথা বলায় তিনি অতি মিনতি করিয়া আমাকে বলিলেন, 'আম্মা, আপনি যদি দয়া করিয়া শহর দেখিতে চান, তবে আমরাও আপনার জুতার বরকতে শহরটা একটু দেখিয়া লইব। আমরা সাত বৎসর হইতে এখানে আছি, কিন্তু শহরে কিছুই দেখি নাই।' সদ্যপরিণীতা মজু এবং সবুও সকাতরে বলিল, 'হাঁ নানি আম্মা, আপনি আব্বাকে বলিলেই হইবে।'

আমি ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন বাবাজীবনকে একখানা গাড়ি সংগ্রহ করিয়া দিতে বলায়, তিনি প্রতিদিনই অতি বিনীতভাবে জানাইতেন যে, গাড়ি পাওয়া যায় না। শেষের দিন বিকালে তাঁহার ১১ বৎসর বয়স্ক পুত্র আমাদের সংবাদ দিল যে, যদিবা

একটা ভাড়াটে গাড়ি আসিয়াছে, কিন্তু তাহার জানালার একটা পর্দার [illegible] আগ্রহের সহিত বলিল, 'সেখানটায় আমরা পরদা করিয়া লইব [illegible] গাড়ি ফেরত দিও না।' সবু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল, 'ভালোই হইয়াছে [illegible] জানালা দিয়া ভালোমতো দেখা যাইবে।' আমরা যতবারই গাড়িতে উঠিতে [illegible] জন্য ভাড়া দিই, ততবারই শুনি : সবুর করুন, বাহিরে এখনো পরদা হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়িতে গিয়া দেখি, সোবহান আল্লাহ! দুই-তিনখানা বোম্বাইয়ে চাদর [illegible] গাড়িটা সম্পূর্ণ ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। জামাতা স্বয়ং গাড়ির দরজা খুলিয়া দিলেন। [illegible] গাড়িতে উঠিবার পর তিনি স্বহস্তে কাপড় দিয়া দরজা বাঁধিয়া দিলেন। গাড়ি কিছু দূরে [illegible] মজু সবুকে বলিল, 'দেখ এখন ভাঙা জানালা দিয়া!' সেই পরদার এক স্থলে একটা [illegible] ছিল, মজু, সবু এবং তাহাদের মাতা সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, আমি [illegible] সে ফুটা দিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিলাম না।

২৬

আমাদের ন্যায় আমাদের নামগুলি পর্যন্ত পরদানশীনা। মেয়েদের নাম জানা যায় কেবল তাহাদের বিবাহের কাবিন লিখিবার সময়। এক মস্ত জমিদারের তিন কন্যার বিবাহ একই সঙ্গে হইতেছিল। মেয়েদের ডাকনাম— বড় গেন্দলা, মেজো গেন্দলা এবং ছোট গেন্দলা—প্রকৃত নাম কেহই জানে না। তাহাদের সম্পর্কের এক চাচা হইলেন বিবাহ পড়াইবার মোল্লা। কন্যাদের বয়স অনুসারে তিনজন বরের বয়সেরও তারতম্য ছিল। তিনজন বরই বিবাহকেন্দ্রে অনুপস্থিত। আমরা পাঠিকাদের সুবিধার নিমিত্ত বরদিগকে বয়স অনুসারে ১নং, ২নং এবং ৩নং বলিব।

মোল্লা সাহেবের হাতে তিন বর এবং তিন কন্যার নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তিনি যথাসময় বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া ভ্রমবশত বর ও কন্যাদের নাম গোলমাল করিয়া ১নং বরের সহিত ছোট গেন্দলার বিবাহ দিয়া দিলেন; ৩নং বরের সহিত মেজো গেন্দলার বিবাহ দিলেন। এখন ২নং বরের সহিত বড় গেন্দলার বিবাহের পালা। মেজো ও ছোট গেন্দলার বয়স খুব অল্প—১১ এবং ৭ বৎসর, তাই তাহারা কোনো উচ্চবাচ্য করে নাই। কিন্তু বড় গেন্দলার বয়স ১৯ বৎসর; সে লুকাইয়া-ছাপাইয়া মুরুব্বিদের কথাবার্তা শুনিয়া জানিয়াছিল, তাহার বিবাহ হইবে ১নং বরের সহিত। আর বরের নামও তাহার জানা ছিল। সুতরাং ২নং বরের নাম লইয়া মোল্লা সাহেব যখন বড় গেন্দলার 'এজেন' চাহিলেন, সে আর কিছুতেই মুখ খোলে না। মা, মাসির উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও যখন সে কিছু বলিল না, তখন তাহার মাতা আর ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া মোল্লা সাহেবকে বলিলেন, 'হাঁ, গেন্দলা 'হু' বলেছে; বিয়ে হয়ে গেছে, তুমি আর কতকক্ষণ হয়রান হবে।' তিনি বলিলেন, আমরা গেন্দলার মুখের 'হু' শুনি নাই. তবে কি আপনার 'হু' লইয়া আপনারই বিবাহ পড়াইব নাকি? তদুত্তরে কনের মা তাঁহার পিঠে এক বিরাট কিল বসাইয়া দিলেন। অবশেষে গেন্দলা বেচারি 'হু' বলিল কিনা, আমরা সে খবর রাখি না।

এদিকে যথাসময়ে টেলিগ্রাফযোগে ৩০ বৎসর বয়স্ক ১নং বর যখন জানিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে (১৯ বৎসর বয়স্কা বড় গেন্দলর পরিবর্তে) সর্ব কনিষ্ঠা ৭ম বর্ষীয়া ছোট গেন্দলার সহিত, তখন তিনি চটিয়া লাল হইলেন—শাশুড়িকে লিখিলেন কন্যা বদল করিয়া দিতে ; নচেৎ তিনি তাহার বিরুদ্ধে জুয়াচুরির মোকদ্দমা আনিবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

২৭

প্রায় ১০ ১১ বৎসরের ঘটনা। বলিয়াছি তো বেহার অঞ্চলে বিবাহের [illegible]
'মাইয়া খানায়' বন্দি করিয়া মেয়েদের আদমরা করা হয়। কখনো [illegible]
বসিবার মেয়াদ—যদি বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা হইয়া বিবাহের তারিখ পিছাইয়া যায়;
তবে বৎসর কালও হয়; এক বেচারি সেইরূপ ছয়মাস পর্যন্ত বন্দিনী ছিল। তাহার স্নান,
আহার প্রভৃতির বিষয়েও যথাবিধি যত্ন লওয়া হইত না। একেই তো বিহারি লোকেরা
সহজে স্নান করিতে চায় না, তাহাতে আবার 'মাইয়া খানার' বন্দিনী মেয়েকে কে ঘন
ঘন স্নান করাইবে? ঐ সময় মেয়ে মাটিতে পা রাখে না—প্রয়োজনমতো তাহাকে
কোলে করিয়া স্নানাগারে লইয়া যাওয়া হয়। তাহার নড়াচড়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সমস্ত দিন
মাথা গুঁজিয়া একটা খাটিয়ার উপর বসিয়া থাকিতে হয়, রাত্রিকালে সেখানেই শুইতে
হয়। অপরে মুখে তুলিয়া ভাতের গ্রাস খাওয়ায়, অপরে 'অবখোরা' ধরিয়া পানি
খাওয়াইয়া দেয়। মাথার চুলে জটা হয়, হউক—সে নিজে মাথা আঁচড়াইতে পারিবে
না। ফল কথা, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তাহাকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।
যাহা হইক, ছয়মাস অন্তর সেই মেয়েটির বিবাহ হইলে দেখা গেল, সর্বদা চক্ষু বুজিয়া
থাকার ফলে তাহার চক্ষু দুইটি চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

২৮

বহুকালের ঘটনা। বহু পুণ্যফলে আরবদেশীয় কোনো মহিলা কলিকাতায় তশরিফ আনিয়াছিলেন। তিনি ভাঙা ভাঙা উর্দু বলিতে শিখিয়াছিলেন। যখন দলে দলে বিবিরা পালকিযোগে তাঁহার জেয়ারত করিতে আসিতেন, তিনি পালকি দেখিয়া হয়রান হইতেন যে এ 'আজাব' কেন?

একদিন পূর্ববঙ্গের এক বিবি আসিয়াছিলেন। আরবীয়া মহিলা কুশল প্রশ্ন প্রসঙ্গে আগন্তুক বিবির স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরদানকালে বাঙ্গাল বিবি মাথার ঘোমটা টানেন আর বলেন, 'তানি তো বালই আছেন। তানার আবার কী অইবা? তানি তো বালই আছেন।' বেচারি আরবীয়া বিবি বুঝিতেই পারিলেন না যে, স্বামীর কুশল বলিবার সময় ঘোমটা টানার প্রয়োজন হইল কেন?

আরবীয়া বিবি বাঙ্গালার বিবিদের পালকিতে উঠা ব্যাপারটা কৌতুকের সহিত দাঁড়াইয়া দেখিতেন। একদিন এক বোরকাপরিহিতা পালকিতে উঠিলেন, তাঁহার কোলে দুই বৎসরের শিশু, সঙ্গে পানদান, একটা বড় কাঠের বাক্স, একটা কাপড়ের গাঁঠরি এবং এক কূজা পানি। পালকিটার বেতের ছাউনি ভাঙা ছিল, তাহা পূর্বে কেহ লক্ষ করে নাই। বেহারাগণ যখন পালকি তুলিল, অমনি মড় মড় করিয়া পালকির বেত্রাসন ভাঙিতে লাগিল। পালকির দুইপার্শ্বে দুইজন বরকন্দাজ চলিয়াছে—তাহারা শিশুটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেবজাদা, মড়মড় শব্দ করে কী?' কিন্তু পালকি হইতে কোনো উত্তর আসিল না।—একটু পরে গেট পার হইয়া পালকিটা অত্যন্ত হালকা বোধ হওয়ায় বেহারাগণ থমকিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে ভাঙা পালকি গলাইয়া বোরকা-পরা বিবি ছেলেকে আঁকড়িয়া ধরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছেন; গাঁঠরি, পানদান সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কূজা ভাঙিয়া পানি পড়িয়া তিনি ভিজিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তবু মুখে বলেন নাই—'পালকি থামাও!' কলিকাতার রাস্তায় এই ব্যাপার!—বেচারি আরবের বিবি তাড়াতাড়ি চাকরানি পাঠাইয়া বিবিটিকে আনাইয়া বলিলেন, 'বিবি, পালকির এমন তামাশা দেখিবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না!'

একবার আমি কোনো একটি লেডিজ কনফারেন্স উপলক্ষে আলিপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে অভ্যাগতা মহিলাদের নানাবিধ বোরকা দেখিলাম। একজনের বোরকা অদ্ভুত ধরনের ছিল। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের পর তাঁহার বোরকার প্রশংসা করায় তিনি বলিলেন —'আর বলিবেন না—এই বোরকা লইয়া আমার যতো লাঞ্ছনা হইয়াছে!' পরে তিনি সেই সব লাঞ্ছনার বিষয় যাহা বলিলেন, তাহা এই :

তিনি কোনো বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি শাদির নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে (বোরকাসহ) দেখিবামাত্র সেখানকার ছেলেমেয়েরা ভয়ে চিৎকার করিয়া কে কোথায় পালাইবে, তাহার ঠিক নাই। আরো কয়েকঘর বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার স্বামীর আলাপ ছিল, তাই তাহাকে সকলের বাড়িই যাইতে হইত। কিন্তু যতবার যে-বাড়ি গিয়াছেন, ততবারই ছেলেরা সভয় চিৎকার ও কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন। ছেলেরা ভয়ে থরথর কাঁপিত।

তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি-পাঁচজনে বোরকাসহ খোলা মোটরে বাহির হইলে পথের ছেলেরা বলিত, 'ও মা! ওগুলো কী গো?' একে অপরকে বলে, 'চুপ কর! —এই রাত্রিকালে ওগুলো ভূত না হয়ে যায় না।' বাতাসে বোরকার নেকাব একটু-আধটু উড়িতে দেখিলে বলিত—'দেখ্ রে দেখ্! ভূতগুলার শুঁড় নড়ে! বাবা রে! পালা রে!

তিনি একসময় দার্জিলিং গিয়াছিলেন। ঘুম স্টেশনে পৌঁছিলে দেখিলেন, সমবেত জনমণ্ডলী একটা বামন লোককে দেখিতেছে—বামনটা উচ্চতায় একটা ৭-৮ বৎসরের বালকের সমান, কিন্তু মুখটা বয়োঃপ্রাপ্ত যুবকের, মুখভরা দাড়িগোঁফ। হঠাৎ তিনি দেখিলেন, জনমণ্ডলীর কৌতূকপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দিকে। দর্শকেরা সে বামন ছাড়িয়া এই বোরকাধারিণীকে দেখিতে লাগিল!

অতঃপর দার্জিলিং পৌঁছিয়া তাঁহারা আহারান্তে বেড়াইতে বাহির হইলেন, অর্থাৎ রিক্‌শ গাড়িতে করিয়া যাইতেছিলেন। 'মেলে' গিয়া দেখিলেন, অনেক ভিড় ; সেদিন তিব্বত হইতে সেনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য লোকের ভিড়। তাঁহার রিক্‌শখানি পথের একধারে রাখিয়া তাঁহার কুলিরাও গেল তামাশা দেখিতে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখেন, দর্শকেরা সকলেই এক-একবার রিক্‌শর ভিতর উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছে।

তিনি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইলে পথের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিত। দুই-একটা পার্বত্য ঘোড়া তাঁহাকে দেখিয়া ভয়ে সওয়ারসুদ্ধ লাফালাফি আরম্ভ করিত। একবার চায়ের বাগানে বেড়াইতে গিয়া দেখেন, তিন-চারি বৎসরের এক বালিকা মস্ত ঢিল তুলিয়াছে, তাঁহাকে মারিতে!*

একবার তাঁহার পরিচিতা আরও চারি-পাঁচজন বিবির সহিত বেড়াইবার সময় একটা ক্ষুদ্র ঝরনার ধারে কঙ্করবিশিষ্ট কাদায় সকলেই বোরকায় জড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। নিকবর্তী চা-বাগান হইতে কুলিরা দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাদের তুলিল; আর স্নেহপূর্ণ ভর্ৎসনায় বলিল, 'একে তো জুত্তা পরেছ, তার উপর আবার ঘেরাটোপ—এ অবস্থায় তোমরা গড়াইবে না তো কী করিবে?' আহা! বিবিদের কারচুবি কাজ-করা দো-পাট্টা কাদায় লতড়-পতড়, আর বোরকা ভিজিয়া তর-বতর!

---

* বাঙালি ও ওর্ধ্বায় প্রভেদ দেখুন; যৎকালে বাঙালি ছেলেরা ভয়ে চিৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া পালাইত, সে-সময় ওর্ধ্বাশিশু আত্মরক্ষার জন্য ঢিল তুলিয়াছে সে ভয়াবহ বন্যকে মারিতে।

কেবল ইহাই নহে, পথের লোক রোরুদ্যমান শিশুকে চুপ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিত—'চুপ কর, ঐ দেখ মক্কা-মদিনা যায় ঐ! ঘেরাটোপ জড়ানো জুজুবুড়ি—ওরাই মক্কা-মদিনা!!'

৩০

কোনো একটি কুলে শীলে ধন্য সৎপাত্রের সহিত এক জমিদারের বয়োপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ ঠিক হইয়াছিল। কী কারণে, বরের পিতার সহিত কন্যাকর্তার ঝগড়া হওয়ায় বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। ইহাতে পাত্রী যারপরনাই দুঃখিতা হইল।

কন্যার পিতা তাড়াতাড়ি অন্য বর না-পাইয়া এক দুরাচার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে বসিলেন। সে বেচারি তাহার খুড়তাতো ভাইয়ের কু-কীর্তির বিষয় সমস্তই অবগত ছিল—কতদিন সে নিজেই ঐ মাতালটাকে তেঁতুলের শরবত খাওয়াইয়া এবং মাথায় জল ঢালিয়া তাহার মাতলামি দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সুতরাং এই বিবাহে তাহার ঘোর আপত্তি ছিল।

কিন্তু পাত্রী তো মূক—তাহার বাক্‌শক্তি থাকিয়াও নাই। তাহার একমাত্র সম্বল নীরব রোদন। তাই সে কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতামাতার ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁহারা ঐ মাতালের সহিত তাহার বিবাহ দিবেনই দিবেন। এইরূপেই আমাদের কাঠমোল্লাশ্রেণীর মুরুব্বিগণ শরিয়তের গলা টিপিয়া মারিয়া ইসলাম ও শরিয়ত রক্ষা করিতেছেন।

বিবাহসভায় বসিয়া পাত্রী কিছুতেই 'হুঁ' বলিতেছিল না। মাতা, পিতামহী প্রভৃতির অনুনয়, সাধ্যসাধনা, মিষ্ট ভর্ৎসনা—সবই সেই দুই চক্ষের জলে ভাসাইয়া দিতেছিল। অবশেষে একজনে অতর্কিতে কন্যাকে খুব জোরে চিমটি কাটিল; সেই আঘাতে সহসা উঁহু বলিয়া সে কাতরধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই 'উঁহুঁ কে 'হুঁ' বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হইল। সোবহান্ আল্লাহ! জয়, অবরোধের জয়!

৩১

একবার কোনো স্থলে চলন্ত ট্রেনে মেয়েমানুষদের কক্ষে একটা চোর উঠিল। চোর বহাল তবিয়তে একে একে প্রত্যেকের অলঙ্কার খুলিয়া লইল; কিন্তু লজ্জায় জড়সড় লজ্জাবতী অবলা সরলা কুলবালাগণ কোনো বাধা দিলেন না। তাঁহারা সকলে ক্রমাগত ঘোমটা টানিতে থাকিলেন। 'তওবা! তওবা! কাহাঁ সে মর্দুয়া আ গয়া!' বলিয়া কেহ কেহ বোরকার নেকাব টানিলেন। পরে চোর মহাশয় ট্রেনের এলার্মের শিকল টানিয়া গাড়ি থামাইয়া নির্বিঘ্নে নামিয়া গেল।

৩২

তাংনীর জমিদার সাহেবের ডাক নাম—ধরুন—বাচ্চা মিয়া। তাঁহার পত্নীর নাম হাসিনা বানু। হাসিনার পিতার বিশাল সম্পত্তি—অগাধ টাকা। একবার বাচ্চা মিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, 'আমার টাকার দরকার, আজই তোমার পিতার নিকট পত্র লিখাইয়া টাকা আনাইয়া দাও।' যথাসময়ে টাকার পরিবর্তে তথা হইতে মিতব্যয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতার ন্যায় পত্র আসিল।

বাচ্চা মিয়ার শ্বশুর অনেকবার জামাতাকে টাকা দিয়াছেন। [illegible] তাঁহার অরুচি জন্মিয়া গিয়াছে। তাই কন্যাকে টাকা না-পাঠাইয়া উপদেশ [illegible] ইহাতে বাচ্চা মিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীর 'নাইওর' (পিত্রালয়) যাওয়া বন্ধ করিয়া [illegible]

একদিকে পিতামাতা কাঁদেন, অপরদিকে হাসিনা নীরবে কাঁদেন [illegible] সাক্ষাৎ আর হয় না। কিছুকাল পরে হাসিনার ভ্রাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সোজা ভাংনী না গিয়া পথে দুইক্রোশ দূরে পুলচৌক নামক গ্রামে তাঁহার [illegible] বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে ভাংনীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, অপরাহ্নে তথায় যাইবেন।

যাহাতে ভ্রাতা ও ভগিনীতে দেখা না হইতে পারে, সেজন্য বাচ্চা মিয়া এক [illegible] করিলেন। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে, তাঁহাদের লইয়া যাইবার জন্য ফুলচৌকি হইতে লোক আসিয়াছে। হাসিনা স্বামীর চালবাজি জানিতেন, সহসা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি কোনোপ্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অদ্য অপরাহ্নে তাঁহার ভাইসাব আসিবেন।

বাচ্চা মিয়া পুনরায় কহিলেন, 'ভাইসাবের মাথা ধরিয়াছে, তিনি আজ যাইতে পারিবেন না। সেইজন্য খালাআম্মা ইয়ার মাহমুদ সরদারকে পাঠাইয়াছেন আমাদের লইয়া যাইতে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস না কর তো চল দেউড়ি ঘরে গিয়া স্বকর্ণে সরদারের কথা শুন।'

তদনুসারে দেউড়ি ঘরের দ্বারের বাহিরে ইয়ার মাহমুদকে ডাকিয়া আনা হইল। ঘরের ভিতর হইতে বাচ্চা মিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইয়ার মাহমুদ! তুমি এক ফুলচৌকি হইতে আইস নাই?' সে উত্তর করিল, 'হাঁ, হুজুর! আমিই খবর নিয়া আসিয়াছি—' বাচ্চা মিয়া তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া তাহাকে আর বেশি কিছু বলিতে দিলেন না।

হাসিনা হাসিখুশি, মাসিমার বাড়ি যাইতে প্রস্তুত হইলেন! তাঁহার জন্য বানাতের ঘেরাটোপ ঢাকা পালকি সাজিল, তাঁহার বাঁদীদের জন্য খেরুয়ার ওয়াড়-ঘেরা গোটা আষ্টেক ডুলী সজ্জিত। বাচ্চা মিয়ার মেয়ানা (খোলা পালকি বিশেষ) সাজিল। আরদালী, বরকন্দাজ, আসাবরদার সোটাবরদার ইত্যাদিসহ তাঁহারা বেলা ১টার সময় রওনা হইলেন।

পথে যখন হাসিনা বুঝিতে পারিলেন যে, দুইখানা ডিঙি নৌকা জুড়িয়া তার উপর তাঁহার পালকি রাখিয়া নদী পার করা হইতেছে, তখন তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন যে, ফুলচৌকি যাইতে তো নদী পার হইতে হয় না—আল্লা রে, আল্লাহ্! সাব তাঁহাকে এ কোন্ জায়গায় আনিলেন!! পালকিতে মাথা ঠুকিয়া কান্না ছাড়া অবরোধবাসিনী আর কী করিতে পারে?

৩৩

প্রায় ১৮ বৎসর হইল, কলিকাতায় একটা দেড়বৎসর বয়স্ক শিশুর জ্বর হইয়াছিল। তাঁহাদের অবরোধ অতি কঠোর—তাই অতটুকু মেয়েকেও কোনো হি-ডাক্তার দেখিতে পাইবেন না, সুতরাং শি-ডাক্তার আসিয়াছেন। বাড়ি ভরা যে স্ত্রীলোকেরা আছেন তাঁহাদের একমাত্র 'শরাফত' ব্যতীত আর কোনো গুণ নাই। তাঁহারা লেডি ডাক্তার মিস গুপ্তকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মিস গুপ্ত দেখিয়া শুনিয়া রোগী মেয়েকে গরম জলে স্নান করাইতে চাহিলেন।

শি-ডাক্তার মিস গুপ্ত চাহেন গরম জল,—বিবিরা দেখেন একে অপরের মুখ চেয়ে চাহেন ঠাণ্ডা জল, বিবিরা বলেন, 'বাপ রে! ঠাণ্ডা জলে স্নান করালে মেয়ের জ্বর বেড়ে যাবে!' ফল কথা, বেচারি মিস গুপ্ত সেদিন কিছুতেই তাঁহাদিগকে নিজের বক্তব্য বুঝাইতে পারিলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া কর্তার নায়েব সাহেবকে সমস্ত বলিয়া বিদায় হইবার সময় বলিলেন, তিনি এ-বাড়িতে আর আসিবেন না। নায়েব সাহেব অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে ১৬ ফি গছাইয়া দিয়া পরদিন আবার আসিতে বলিলেন।

পরদিন আবার শি-ডাক্তার মিস গুপ্তকে লইয়া বাড়ির গিন্নিদের গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। বেগতিক দেখিয়া নায়েব সাহেব তাঁহার পরিচিতা জনৈকা মহিলাকে আনিয়া মিস গুপ্তের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বীণাপাণি (নায়েব সাহেবের প্রেরিতা সেই বাঙালি মহিলা) আসিয়া দেখেন, লেডি ডাক্তার রাগিয়া ভূত হইয়া আছেন। আর সমবেত বিবিরা দাঁড়াইয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছেন—তাঁহাদের মুখে ধান দিলে খই ফোটে। শেষে মিস গুপ্ত গর্জন করিয়া বলিলেন, 'ময়ঁ তামাসা দেখ্‌নে নেহী আয়ী হোঁ!'

বীণাপাণি চুপি চুপি বিবিদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্যাপার কী? তাঁহারা বলিলেন, বুঝিতে পারি না—তিনি তোয়ালে চাহেন, টব চাহেন, কিন্তু আমরা যাহা দেই, তাহাই দূরে ছুড়িয়া ফেলেন।

পরে তিনি মিস গুপ্তকে তাঁহার বিরক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'দেখুন দেখি! আধঘণ্টার উপর হয়ে এল, এখন পর্যন্ত মেয়েকে স্নান করাবার জন্য কোনো জিনিস পেলুম না।' বীণা সভয়ে বলিলেন, 'উহারা যে জিনিস দেন, তাই নাকি আপনি পছন্দ করেন না?'

মিস গুপ্ত বলিলেন, কী করে পছন্দ করব বলুন দেখি? আমি চাই একটা বাথটাব, তাতে বসিয়ে শিশুকে স্নান করাব, ওঁরা দেন আমাকে এতটুকু একটা একসেরা ডেকচি—কাজেই আমি ছুড়ে ফেলেছি! আপনি বলুন, এতটুকু ডেকচির ভিতর আমি শিশুকে বসাই কী করে? আমি চাই নরম পুরাতন কাপড়, শিশুর গা মুছে দেবার জন্য, ওঁরা দেন আমাকে নূতন খস্‌খসে তোয়ালে—কাজেই আমি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি! আমাকে ঐশ্বর্য দেখান যে, নূতন তোয়ালে আছে! এঁরা মনে করেন যে, এঁরা পীর—তাই everybody should worship them!

শেষে বীণা সমস্ত জিনিস জোগাড় করিয়া দিয়া শিশুকে স্নান করাইতে মিস গুপ্তের সাহায্য করিলেন। তখন রাগ পড়িয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল, বিবিরাও নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

৩৪

শুনিয়াছি বঙ্গদেশের কোনো শরিফ খান্দানের বাড়ির নিয়ম এই যে, বিবাহের সময় কন্যাকে 'হুঁ' বলিয়া এজেন দিতে হয় না। মেয়ের কণ্ঠস্বরের ঐ 'হুঁ' টুকুই বা পরপুরুষে শুনিবে কেন? সেইজন্য বিবাহসভায় মোটা পরদার একদিকে পাত্রীর উকিল, সাক্ষী, আত্মীয়স্বজন এবং বরপক্ষের লোকেরা থাকে, অপরপার্শ্বে কন্যাকে লইয়া স্ত্রীলোকেরা বসে। পরদার নিচে একটা কাঁসার থালা থাকে—থালার অর্ধেক পর্দার এপারে, অপর অর্ধাংশ পরদার ওপারে থাকে।

বিবাহের কলেমা পড়ার পর কন্যার কোনো সঙ্গিনী বা চাকরানি একটা সরোতা (যাঁতি) সেই থালার উপর ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দেয়—যাঁতিটা সশব্দে পুরুষের দিকে গিয়া পড়িলে বিবাহক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়িল। [illegible] আলাপ আছে। একদিন তাঁহার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছি, কিছুক্ষণ পরে তাঁহার [illegible] পুত্র দুষ্টামি করায় তিনি তাহাকে 'হারামি—' বলিয়া গালি দিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। [illegible] পলাইয়া গেলে পর আমি তাঁহাকে বিনা-সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গালি [illegible] দিলেন—ছেলেকে, না ছেলের মাতাকে? তিনি তদুত্তরে সহাস্যে বলিলেন যে, বিবাহের [illegible] যদিও তিনি বয়োপ্রাপ্ত ছিলেন তথাপি কেহ তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করে নাই [illegible] মজলিশে তিনি 'হুঁ' 'হাঁ' কিছুই বলেন নাই; জবরদস্তি তাঁহার শাদি দেওয়া হইয়াছে [illegible] তাঁহার 'সব বাচ্চে হারামজাদে!'

৩৫

মরহুম মৌলবী নজির আহমদ খাঁ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত দিল্লি গদরের [illegible] অবরোধ-বন্দিনী মহিলাদের দুর্দশার বর্ণনা হইতে অংশবিশেষের অনুবাদ এই :

রাত্রি ১০টার সময় আমার ভাইজানকে কাপ্তেন সাহেবের প্রেরিত লোকটি বলিল যে আমরা রাত্রি ২ টার সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিব। আপনাদের বাড়ির নিকটেই [illegible] লাগানো হইয়াছে। অতএব, আপনারা আক্রমণের পূর্বেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন। এ সংবাদ শুনিবামাত্র আমাদের আত্মা শুকাইয়া গেল। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না।

শেষে আমরা পদব্রজে যাত্রা করিতে বাধ্য হইলাম। সেদিনের দুঃখের কথা মনে হইলে এখনো মনে দুঃখ হয়, হাসিও পায়। এক কর্ত্রীসাহেবা সমস্ত ধনদৌলত ছাড়িয়া পানদান সঙ্গে লইয়া চলিলেন। হতভাগীদের মোটেই হাঁটিবার অভ্যাস নাই—এখন প্রাণের দায়ে হাঁটিতে গিয়া কাহারো জুতা খসিয়া রহিয়া গেল, কাহারো ইজারবন্দ পায়ে জড়াইয়া গেল; সেদিন যাঁর পায়জামার পাঁয়চা যত বড় ছিল, তাঁহারই হাঁটিতে তত অধিক কষ্ট হইতেছিল। ভাইজান সে-সময় তিক্তবিরক্ত হইয়া তাঁহাদের বলিতেছিলেন, 'কমবখতিরা আরো দুইখান নয়নসুখের পায়জামা বানাও। লাহোরের রেশমি ইজারবন্দ আরো জরির ঝালর লাগাইয়া লম্বা কর!'

বেচারারা বাজারের পথে চলিলেন; ভাগ্যে রাত্রি ছিল, তাই রক্ষা! অর্থাৎ আমাদের তৎকালীন দুর্গতি দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হয় নাই। আহা রে! সকলের পা ফুলিয়া ভারী হইল যেন এক-একমণ,—দুই পা চলেন আর হোঁচট খান, বারবার পড়েন একজন পথে বসিয়া একবারে এলাইয়া পড়িলেন যে, আর তিনি হাঁটিতে পারিবেন না কেবল পায়ে ব্যথা নয়, আমাদের সর্বাঙ্গে বেদনা হইয়া গেল। বেচারি বিবিদের লাঞ্ছনার অবধি ছিল না।

কিছুদূর যাইয়া দেখি, হাজার হাজার গোরা আর শিখ সৈন্য সারি বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে আমাদের প্রাণ উড়িয়া গেল! আরও চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়িলাম।

অবশেষে বহু কষ্টে কিছুদূর গিয়া ভাইজান চারটা গাধা সংগ্রহ করিলেন। শেষে গাধায় উঠিয়া বিবিরা রক্ষা পাইলেন।

৩৬

শীতকাল। মাঘ মাসের শীত। সেই সময় কোথা হইতে এক ভালুকের নাচওলা গ্রামে আসিল। গ্রামে কোনো নূতন কিছু আসিলে প্রথমে তাহাকে জমিদারবাড়িতে হাজির

দিতে হয়। তদনুসারে ভালুকঅলা জমিদারবাড়িতেই অতিথি হইয়াছে। সকলে দেখে! কিন্তু বাড়ির বউ-ঝি সে নাচ দেখা হইতে বঞ্চিতা।

ছোট ছেলেরা এবং বুড়ি চাকরানিরা আসিয়া গিন্নিদের নিকট গল্প করে,—ভালুকে খেমটা নাচে; থমকা নাচ নাচে। এমন করিয়া ভালুকঅলার সঙ্গে কুস্তি লড়ে; এমন করিয়া পাছাড় ধরে—ইত্যাদি। এইসব গল্প শুনিয়া শুনিয়া কর্তার দুইজন অল্পবয়স্কা পুত্রবধূর সাধ হইল যে, একটু নাচ দেখিবেন। বেশি দূর যাইতে হইবে না, ছোট বউবিবির কামরার উত্তরদিকের জানালার ঝরোকা (খড়খড়ির পাখি) একটু তুলিলেই সুস্পষ্ট দেখা যায়।

যেই বধূদ্বয় ঝরোকা তুলিয়াছেন, অমনি তাঁহাদের চারি বৎসর বয়স্কা ননদ জোহরা দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল যে, সেও দেখিবে। একজন তাহাকে কোলে তুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন। জোহরা কখনো বাড়ির উঠানে নামিয়া কুকুর বিড়াল পর্যন্ত দেখে নাই—এখন দেখিল একেবারে ভালুক! ভালুক কুস্তি লড়িতেছিল, তাহা দেখিয়া জোহরা ভয়ে চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল! ভালুকের নাচ দেখা মাথায় থাকুক—এখন জোহরাকে লইয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

জোহারার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তাহার ভয় গেল না। রাত্রিকালে হঠাৎ চিৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে থরথর কাঁপে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া সুদূর সদর জেলা হইতে বহু অর্থব্যয়ে ডাক্তার আনিতে হইল। ডাক্তার সাহেব সকল অবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শিশু কোনোপ্রকারে ভয় পাইয়াছিল না কি? কথা গোপন থাকে না, জানা গেল ভালুকের নাচ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল।

এদিকে কর্তা সন্ধান লইতে লাগিলেন, জোহরাকে ভালুকনাচ দেখাইল কে? খেলাই আন্না প্রভৃতি সকলে একবাক্যে অস্বীকার করিল যে, তাহারা সাহেবজাদীকে ভালুকের নাচ দেখায় নাই। অবশেষে জানা গেল, বউবিবিরা দেখাইয়াছেন। তখন তাঁহার ক্রোধ চরমে উঠিল। জোহরা মরে মরুক, তাহাতে কর্তার তত আপত্তি নাই, কিন্তু এই-যে বাড়িময় রাষ্ট্র হইল যে, তাহার পুত্রবধূগণ বেগানা মরদের তামাশা দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি এ লজ্জা রাখিবেন কোথায়? ছি! ছি! ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সিভিল সার্জন ডাক্তারও শুনিয়া মৃদু হাসিলেন যে, বউয়েরা ভালুকের নাচ দেখিতে গিয়াছিলেন।

লাজে খেদে ক্রোধে অধীর হইয়া কর্তা বধূদের তলব দিলেন। মাথায় একহাত ঘোমটা টানিয়া শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বধূদ্বয় লজ্জায় অভিমানে থরথর কাঁপিতেছিলেন, (সেই মাঘ মাসের শীতেও) ঘামিতেছিলেন, আর পদতলস্থিত পাথরের মেঝেকে হয়তো বলিতেছিলেন :

'ওমা বসুন্ধরা! বিদর গো ত্বরা--
তোমাতে বিলীন হই!'

তাই তো, পরদানশীনদের ধরাপৃষ্ঠে থাকিবার প্রয়োজন কী? দম্ভ কড়মড় করিয়া—'বউমা'রা শুন তো—' বলিয়াই অতিক্রোধে কর্তার বাকরোধ হইল। তখন তাঁহার 'গোস্বায় অজুদ কাঁপে, আঁখি হইল লাল'—তিনি বউমাদের বিনা লুণে চিবাইয়া খাইবেন, না আস্ত গিলিবেন, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না!

৩৭

একবার পশ্চিম দেশ হইতে ট্রেন হাবড়ায় আসিবার সময় পথে বালী ষ্টেশনে বোরকাধারিণী লোক স্ত্রীলোকদের কক্ষে উঠিল। কক্ষে আরো অনেক স্ত্রীলোক ছিল। ট্রেন ছাড়িলে পরও তাহারা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, তিনজন বোরকার নেকাব (মুখাবরণ) তুলিল না। তখন তাহাদের মনে সন্দেহ হয় যে, ইহারা না জানি কী করিবে। আর তাহারা লম্বাও খুব ছিল। খোদা খোদা করিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে ট্রেন থামিলে যখন মেয়ে টিকেট কালেকটার তাহাদের কামরায় আসিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে ঐ বোরকাধারিণীদের বিষয় বলিল। টিকেট কালেকটার তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে না হইতেই তাহাদের একজন স্ত্রীলোক বিপরীতদিকে ট্রেনের জানালা দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া গেল, তিনি 'পুলিশ পুলিশ' বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে একজনকে ধরিয়া নেকাব তুলিয়া, দেখেন—তাহার মুখে ইয়া দাড়ি—ইয়া গোঁফ! তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'কী আশ্চর্য! বোরকার ভিতর দাড়ি গোঁফ!'

৩৮

আমার পরিচিতা জনৈকা শি-ডাক্তার মিস শরৎকুমারী মিত্র বলিয়াছেন, 'বাবা আপনাদের—মুসলমানদের বাড়ি গেলে আমাকে যা নাকাল হতে হয়! না পাওয়া যায় সময়মতো একটু গরম জল, না পাওয়া যায় এক খণ্ড নেকড়া!'

একবার তাহাকে বহুদূর হইতে একজন ডাকিতে আসিয়া জানাইল যে, বড় বেগমের দাঁতে ব্যথা হইয়াছে। তিনি যথাসম্ভব দাঁতের ঔষধ এবং প্রয়োজন বোধ করিলে দাঁত তুলিয়া ফেলিবার জন্য যন্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দাঁতে বেদনা নহে—প্রসব বেদনা! তিনি এখন কী করেন? ভাগলপুর শহর হইতে জমগাঁও চারি ক্রোশ পথ। এতদূর হইতে আবার সেই একই ঘোড়ার গাড়িতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, কারণ ঘোড়া ক্লান্ত হইয়াছে। জমগাঁও শহরতলী—পাড়াগ্রামের মতো স্থান, সেখানে ঘোড়ার গাড়ি কিম্বা পালকি পাওয়া যায় না।

কোনোপ্রকারে ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিয়া তৎকালীন উপযোগী যন্ত্রপাতি লইয়া পুনরায় জমগাঁও যাইতে যাইতে রোগিণীর দফা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা। মিস মিত্র সে-বাড়ির কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ মিথ্যাকথা বলিয়া তাঁহাকে অনর্থক ডাকা হইল কেন? উত্তরে কর্ত্রী বলিলেন, 'পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারনীকে ডাকিতে হইল. সুতরাং তাহাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কী বলিতাম? তোবা ছিয়া! মর্দুয়াকে ও-কথা বলিতাম কী করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারনী যে, লোকের কথা বুঝেন না!'

৩৯

সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ-কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হজরতা আয়শা সিদ্দিকা নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন; সেইজন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ানো লাফানো ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায়, তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচিকর্ম করিতে থাকিবে—নড়িবে না। এমনকি দ্রুতগতি হাঁটিবেও না।

কোনো এক সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি আট বৎসরের বালিকা একদিন বিকালে ইয়ার্কি আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরে চালে ঠেকানো একটা ছোট মই আছে। তাহেরার (সেই বালিকা) মনে কী হইল, সে অন্যমনস্কভাবে ঐ মইয়ের দুই ধাপ উঠিল। ঠিক সেই সময় তাহার পিতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে মইয়ের উপর দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার হাত ধরিয়া এক হেঁচকাটানে নামাইয়া দিলেন।

তাহেরা পিতার অতি আদরের একমাত্র কন্যা—পিতার আদর ব্যতীত অনাদর কখনো লাভ করে নাই; কখনো পিতার অপ্রসন্ন মুখ দেখে নাই। অদ্য পিতার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ও রূঢ় হেঁচকাটানে সে এত অধিক ভয় পাইল যে, কাঁপিতে কাঁপিতে বেসামাল হইয়া কাপড় নষ্ট করিয়া ফেলিল!

অবেলায় স্নান করাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া এবং অত্যধিক ভয়ে বিহ্বল হইয়াছিল বলিয়া সেই রাত্রে তাহেরার জ্বর হইল। একে বড়ঘরের মেয়ে, তায় আবার অতি আদরের মেয়ে, সুতরাং চিকিৎসার ত্রুটি হয় নাই। সুদূর সদর জেলা হইতে সিভিল সার্জন ডাক্তার আনা হইল। সেকালে (অর্থাৎ ৪০-৪৫ বৎসর পূর্বে) ডাক্তার ডাকা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডাক্তার সাহেবের চতুর্গুণ দর্শনী, পালকি ভাড়া, তদুপরি বত্রিশজন বেহারার সিধা ও পান-তামাক যোগানো সে এক বিরাট ব্যাপার।

এত যত্ন সত্ত্বেও তৃতীয় দিনেও তাহেরার জ্বর ত্যাগ হইল না। ডাক্তার সাহেব বেগতিক দেখিয়া বিদায় হইলেন। পিতার রূঢ় ব্যবহারের নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তর দিয়া তাহেরা চিরমুক্তি লাভ করিল! (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)

৪০

এক ধনীগৃহে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ধুমধাম হইতেছিল। বাড়িভরা আত্মীয়কুটুম্বিনীর হট্টগোল—কিছুরই অভাব নাই। নবাগতদিগের জন্য অনেক নূতন চালাঘর তোলা হইয়াছে। একদিন ভরা সন্ধ্যায় কী করিয়া একটা নূতন খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। শোরগোল শুনিয়া বাহির হইতে চাকরবাকর, লোকজন আসিয়া দেউড়ির ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল, আর বারম্বার হাঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, পরদা হইয়াছে কিনা—তাহারা অন্দরে আসিতে পারে কি না? কিন্তু অন্তঃপুর হইতে কে উত্তর দিবে? আগুন দেখিয়া সকলেরই ভ্যাবাচেকা লাগিয়া গিয়াছে। এদিকে আগুনলাগা ঘরের ভিতর বিবিরা বলাবলি করিতেছেন যে, প্রাঙ্গণে পরদা আছে কিনা—কোনো ব্যাটাছেলে থাকিলে তাঁহারা বাহির হইবেন কী করিয়া?

অবশেষে এক বুড়োবিবি ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'আরে ব্যাটারা! আগুন নিবাইতে আয় না! এসময়ও জিজ্ঞাসা—পরদা আছে কিনা?'

তখন সকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া আগুন নিভাইতে আসিল। কিন্তু আগুনলাগা ঘরের বিবিরা বাহিরে যাইতে গিয়া যেই দেখিলেন, প্রাঙ্গণ পুরুষমানুষে ভরা, অমনি তাহারা পুনরায় ঘরে গিয়া ঝাঁপের অন্তরালে লুকাইলেন। সৌভাগ্যবশত গোটা কয়েক সাহসী তরুণ যুবক বিবিদের টানাহেঁচড়া করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। নচেৎ তাঁহারা সেইখানে পুড়িয়া পসেন্দা কাবাব হইতেন!

৪১

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর গত ১৩৩৫ সনে লিখিয়াছেন :— সেকালের পরদা—আমি যে-সময়কে সেকাল বলিয়াছি তা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগ নয়, কিন্তু সে

আমাদের যৌবনকালের কথা। এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের কথা। ... পরদার যে রকম কঠোর, তথা হাস্যকর ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম, সে সমস্ত আমার চোখের সম্মুখে ছবির মতো জাগিয়া আছে। তারই খুটিনাটির ... বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিব।

সেই সময় একদিন কীজন্য যেন হাবড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমি ... পড়ি। স্টেশনের প্লাটফরমে গিয়ে দেখি কয়েকজন বরকন্দাজ যাত্রীর ভিড় সরাচ্ছ করছে। এগুতে সাহস হল না; হয়তো কোনো রাজা-মহারাজা গাড়িতে উঠবেন, জন্য তার সৈন্য-সামন্ত নিরীহ যাত্রীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে! এই ভেবে ... মহারাজার আগমন প্রতীক্ষায় একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তিন-চার মিনিট হয়ে গেল, রাজা আর আসেন না। শেষে দেখি কিনা ... মশারি আসছেন। মশারির চার কোণা চারজন সিপাহি ধরে ধীরে ধীরে ... আসছেন। আমি তো এ দৃশ্য দেখে অবাক—এ ব্যাপার তো পূর্বে কখনো দেখি ... আমার পাশেই এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এমন ক একটা মশারি যাচ্ছে কেন?' তিনি একটু হেসে বল্লেন, 'আপনি বুঝি কখনো মশ যাত্রা দেখেন নাই? দেখছেন না কত সিপাহি সান্ত্রী যাচ্ছে! বিহার অঞ্চলের কোন ... রাজা না জমিদারের গৃহিণী ঐ মশারির মধ্যে আবরু রক্ষা করে গাড়িতে উঠ যাচ্ছেন। বড়মানুষের বৌ কি আপনার আমার সুমুখ দিয়ে আর দশজনের মতো ... পারেন, তাঁরা যে অসূর্যম্পশ্যা!'

এই বলেই ভদ্রলোকটি হাসতে লাগলেন। আমি এই পরদার বহর দেখে ... সংবরণ করতে পারলাম না। হাঁ, এরই নাম পরদা বটে—একেবারে মশারি যাত্রা

আর একবার কী একটা যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা ছিল। লোকসমা দেখবার জন্য এবং এ বৃদ্ধ বয়সে বলেই ফেলি, গঙ্গাস্নান করে পাপমোচনের জ বটে, বড়বাজারে আদ্যশ্রাদ্ধের ঘাটে গিয়েছিলাম। তখন শীতকাল, স্নানের স অপরাহ্ণ পাঁচটা।

ঘাটে দাঁড়িয়ে লোকসমারোহ দেখছি, আর ভাবছি এই দারুণ শীতের মধ্যে ক করে গঙ্গাস্নান করব। এমন সময় দেখি ঘেরাটোপ আগাগোড়া আবৃত একখানি পাল ঘাটে এল। পালকির চারকোণ ধরে চারজন আরদালি, আর পালকির দুই দ বরাবর দুইটি দাসী। বুঝতে বাকি রইল না যে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণী বা ক বা পুত্রবধূ স্নান করতে এলেন। বড়মানুষের বাড়ির মেয়েরা এমন আড়ম্বর করেই এ থাকেন, তাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নেই।

কিন্তু তারপর যা দেখলাম, হাস্যরসের এবং করুণরসের একেবারে চূড়ান্ত। আ মনে করেছিলাম, গঙ্গার জলের কিনারে পালকি নামানো এবং আরোহিণীরা অবতর করে গঙ্গাস্নান করে আসবেন। কিন্তু আমার সে কল্পনা আকাশেই থেকে গেল দেখলাম বেহারা মায় আরদালি দাসী দুইটি—পালকি নিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেল যেখানে গিয়ে পালকি থামল, সেখানে বোধহয় বুক সমান জল। বেহারারা তখন পালকিখানিকে একেবারে জলে ডুবিয়ে তৎক্ষণাৎ উপরে তুলল এবং তারপরেই পালকি নিয়ে তীরে উঠে এসে, যেভাবে আগমন, সেইভাবেই প্রতিগমন। আমার হাসি এ পালকির গঙ্গাস্নান দেখে; আর মনে কষ্ট হতে লাগল, পালকির মধ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অবস্থা স্মরণ করে। এই শীতের সন্ধ্যায় পালকির মধ্যে মা-লক্ষ্মীরা ভিজে

কাপড়ে হি-হি করে কাঁপছেন। এদিকে তাঁদের স্নান হল, তা তো দেখতেই পেলুম এরই নাম পরদা!

সেন মহাশয় পালকির 'গঙ্গাস্নান' দেখিয়া হাসিয়াছেন। আমরা শৈশবে চিলমারীর ঘাটে 'পালকির ব্রহ্মপুত্রনদের স্নান' শুনিয়া হাসিয়াছি। পরে ভাগলপুরে গিয়া পালকির রেল ভ্রমণের বিষয় শুনিয়াছি।

একবার একটি এয়োদশবর্ষীয়া নববিবাহিতা বালিকার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা বেশ স্পষ্ট মনে আছে। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে জুন মাসে রৌদ্র কিরূপ প্রখর হয়, তাহা সকলেই জানেন।

জুন মাসে দিবা ৮ ঘটিকার সময় সে বালিকা নববধূকে মোটা বেনারসী শাড়ি পরিয়া মাথায় আধহাত ঘোমটা টানিয়া পালকিতে উঠিতে হইল। সেই ঘোমটার উপর আবার একটা ভারী ফুলের 'সেহরা' তাহার কপালে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। পরে পালকির দ্বার বন্ধ করিয়া জরির কাজ-করা লাল বানাতের ঘেরাটোপ দ্বারা পালকি ঢাকা হইল। সেই পালকি ট্রেনের ব্রেকভ্যানের খোলা গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় দগ্ধ ও সিদ্ধ হইতে হইতে বালিকা চলিল তাহার শ্বশুরবাড়ি—যশিদী!!

৪২

সেদিন (৭ জুলাই ১৯৩১ সাল) জনৈক মহিলা নিম্নলিখিত ঘটনা দুইটি বলিলেন : বহু বর্ষ পূর্বে তাঁহার সম্পর্কের এক নানিজান পশ্চিমদেশে বেড়াইতে গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যথাসময়ে টেলিগ্রাফযোগে তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিবার সময় জানাইয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন তুফানে সমস্ত টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছিল এবং কলিকাতার রাস্তায় সাঁতারজল ছিল! সুতরাং এখানে কেহ নানিজানের টেলিগ্রাম পায় নাই এবং হাবড়া স্টেশনে পালকি লইয়া কেহ তাঁহাকে আনিতেও যায় নাই।

এদিকে যথাসময়ে নানিজানের রিজার্ভ-করা গাড়ি হাবড়ায় পৌঁছিল, সকলে নামিলেন, জিনিসপত্রও নামানো হইল; কিন্তু পালকি না-থাকায় নানিজান বোরকা পরিয়া থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই নামিতে সম্মত হইলেন না। অনেকক্ষণ সাধ্যসাধনার পর নানাসাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি এক উপায় বলিয়া দিই, আপনারা আমাকে সেইরূপে নামান।' উপায়টি এই যে, তাঁহার সর্বাঙ্গে অনেক কাপড় জড়াইয়া তাঁহাকে একটা বড় গাঁটরির মতো করিয়া বাঁধিয়া তিন-চারিজনে সেই গাঁটরি ধরাধরি করিয়া টানিয়া ট্রেন হইতে নামাইল। অতঃপর তদবস্থায় তাঁহাকে ঘোড়ার গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হইল।

৪৩

এক বোরকাধারিণী বিবি হাতে একটা ব্যাগসহ ট্রেন হইতে নামিয়াছেন। তাঁহাকে অন্যান্য আসবাবসহ এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার স্বামী কার্যান্তরে গেলেন। কোনো কারণবশত তাঁহার ফিরিয়া আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। এদিকে বিবি সাহেবা দাঁড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া এবং শরীরের কম্পন দেখিয়া ক্রমে লোকের ভিড় হইল। লোকেরা দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার সঙ্গের লোকের নাম বলুন তো, আমরা তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।' তিনি একবার আকাশে সূর্যের দিকে ইশারা করেন আর একবার হাতের ব্যাগ তুলিয়া

দেখান। ইহাতে উপস্থিত লোকেরা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হাসাহাসি বাধাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি হাঁফাইতে হাঁফাইতে সেখানে দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে? ভিড় কেন?' ঘটনা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'উহার নাম 'আফতাব বেগ', তাই আমার বিবি সূর্যের দিকে ইশারা করিয়া দেন আর তাহাকে বেগ (ব্যাগ) দেখাইয়াছেন।

৪৪

জনাব শরফদ্দীন আহমদ বি. এ. (আলিগড়) আজিমাবাদী নিম্নলিখিত ঘটনাত্রয় উর্দু কাগজে লিখিয়াছেন। (আমি তাহা অনুবাদ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।)

যথা :

গত বৎসর পর্যন্ত আমি আলিগড়ে ছিলাম। যেহেতু সেখানকার স্টেশন বিশেষ একরূপ জাঁকজমকে ই. আই. আর. লাইনে অদ্বিতীয় বোধহয়, সেইজন্য আমি প্রত্যহ পদব্রজে ভ্রমণের সময় স্টেশনে যাইতাম। সেখানে অন্যান্য তামাশার মধ্যে অনেকগুলি ১৩শ শতাব্দীর বোরকা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আর খোদা মিথ্যা না বলান, প্রত্যেক বোরকাই কোনো-না-কোনে প্রকার কৌতুকাবহ ছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি ঘটনা এখানে বিবৃত হইল।

প্রথম ঘটনা এই যে, একদিন আমি আলিগড় স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারি করিতেছিলাম, সহসা পশ্চাৎদিক হইতে আমার গায়ে ধাক্কা লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে, এক বোরকাধারিণী বিবি দাঁড়াইয়া আছেন; আর আমাকে শাসাইয়া বলিতে লাগিলেন 'মিয়া দেখে চলেন না?' তাঁহার কথায় আমার প্রবল হাসি পাইল, কারণ তিনি তো আমার পশ্চাতে ছিলেন, সুতরাং দেখিয়া চলা না-চলার দায়িত্ব কাহার, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি তাঁহাকে কেবল এইটুকু বলিলাম, 'আপনি মেহেরবানি করিয়া বোরকার জাল চক্ষের সম্মুখে ঠিক করিয়া নিন' এবং হাসিতে হাসিতে অন্যত্র চলিলাম।

৪৫

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, একদিন আবার আমি কতিপয় বন্ধুর সহিত আলিগড় স্টেশনে তামাশা দেখায় মশগুল ছিলাম। এমন সময় আমাদের সন্নিকটে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, কোনো শিশু আমাদের অতি নিকটে চেঁচাইতেছে কিন্তু এদিক-সেদিক দেখিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার বন্ধুরা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু যেহেতু বোরকা সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাই আমি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। শেষে দেখি কী, এক বোরকাধারিণী বিবি যাইতেছেন, তাঁহারই বোরকার ভিতর হইতে শিশুর রোদনের শব্দ আসিতেছে!

ঘটনা ছিল এই যে, বিবিসাহেবা শিশুকে বোরকার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে গরমে অস্থির হইয়া চিৎকার করিতেছিল। তাই কেহ শিশুকে দেখিতে পায় নাই, কেবল কান্না শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। আমি বন্ধুদের ঐ তামাশা দেখাইয়া দিলাম। আর হাসিতে হাসিতে আমাদের যে কী দশা হইল তাহা আর কী বলিব?

৪৬

আমি পূর্বের ন্যায় আবার একদা আলিগড় স্টেশনের প্লাটফরমে পায়চারি করিতেছিলাম। সম্মুখে এক 'সফেদ গোল' (শাদা দল) আসিতে দেখিলাম। নিকটে আসিলে দেখিলাম, আগে আগে এক প্রবীণ ভদ্রলোক একহাতে পানদান অপরহাতে পাখা লইয়া আসিতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে কয়েকটি বোরকাধারিণী পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া মিলিত হইয়া আসিতেছেন। এই কাফেলাটি অধিক দূরে না যাইতেই এক মালঠেলা গাড়ির সম্মুখীন হইল। উহার সহিত টক্কর খাইয়া এক বিবি যেই পড়িলেন, অমনি সমস্ত পার্টি তাঁহার সহিত গড়াইল।

সন্ধ্যার সময়, গাড়ি আসিতেছিল, যাত্রীদের হাঙ্গামা ছিল—এমতো স্থলে প্লাটফরমের উপর ঐরূপ আশ্চর্য জিনিস পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কে না অগ্রসর হইয়া দেখিবে? অতি শীঘ্র বেশ একটা ভিড় জমা হইল। প্রত্যেকেই ভূপতিতাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল; কিন্তু স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে কে? সঙ্গের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির জন্য আরো দুঃখ হইতেছিল; বেচারা একা, আর এই বিপদ! শেষে আমি বলিলাম, 'হজরত! আপনিই উহাদের তুলুন না; দেখুন তো বিবিদের কোথাও আঘাত লাগে নাই তো?'

বেচারা যখন তাঁহাদের তুলিতে লাগিলেন, আমি দেখিলাম যে বিবিরা আপন আপন বোরকা পরস্পরের বোরকার সহিত বাঁধিয়া লইয়াছিলেন এবং অগ্রবর্তিনীর বোরকার দামন ধরিয়া সকলেই চক্ষু বুজিয়া চলিতেছিলেন। এখন আমার সম্মুখে এই সমস্যা ছিল যে, অগ্রবর্তিনীর বিবি এই মালঠেলা গাড়ি দেখিলেন না কেন যে, এ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল? আমি তাঁহার বোরকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার বোরকার জাল—যাহা চক্ষের সম্মুখে থাকা চাই, তাহা মাথার উপর পিছনে সরিয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বিবিসাহেবা কেবল আন্দাজে হাঁটিয়া আসিতেছিলেন।

এখন অবস্থা এই হইয়া দাঁড়াইল যে, বেচারা 'বড়ে মিয়াঁ' একজনকে উঠাইতে গেলে অপর সকলের উপরই টান পড়ে—সুতরাং প্রথম বিবি আবার সেই টানে 'বড়ে মিয়াঁ'র হাতছাড়া হইয়া যান। এইরূপে অনেক টানাহেঁচড়ার পরে বিবিরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন।

৪৭

কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে :

'কাব্য উপন্যাস নহে, এ মম জীবন,
নাট্যশালা নহে, ইহা প্রকৃত ভবন!'

প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা, আমাদের প্রথম মোটর-বাস প্রস্তুত হইল। পূর্বদিন আমাদের স্কুলের জনৈক শিক্ষয়িত্রী, মেমসাহেবা মিস্ত্রিখানায় গিয়া বাস দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, মোটর ভয়ানক অন্ধকার 'না বাবা! আমি কখনো মোটরে যাব না।' বাস আসিয়া পৌঁছিলে দেখা গেল,—বাসের পশ্চাতে দ্বারের উপর সামান্য একটু জাল আছে এবং সম্মুখ দিকে ও উপরে একটু জাল আছে। এই তিন ইঞ্চি চওড়া ও দেড় ফুট লম্বা জাল দুই-টুকরা না থাকিলে বাসখানা

'এয়ার টাইট' বলা যাইতে পারিত।

প্রথমদিন ছাত্রীদের নূতন মোটরে বাড়ি পৌঁছানো হইল। চাকরানি [illegible] সংবাদ—গাড়ি বড্ড গরম হয়,—মেয়েরা বাড়ি যাইবার পথে অস্থির হইয়াছিল কেহ বমি করিয়াছিল। ছোটমেয়েরা অন্ধকারে ভয় পাইয়া কাঁদিয়াছিল।

দ্বিতীয়দিন ছাত্রী আনাইবার জন্য মোটর পাঠাইবার সময় উপরোক্ত মেমসাহেব মোটরের দ্বারের খড়খড়িটা নামাইয়া দিয়া একটা রঙিন কাপড়ের পরদা ঝুলাইয়া দিলেন। তথাপি ছাত্রীগণ স্কুলে আসিলে দেখা গেল,—দুই-তিনজন অজ্ঞান হইয়াছে, দুই-চারিজনে বমি করিয়াছে, কয়েক জনের মাথা ধরিয়াছে, ইত্যাদি। অপরাহ্ণে মেমসাহেবা বাসের দুই পাশের দুইটি খড়খড়ি নামাইয়া দুই খণ্ড কাপড়ের পরদা দিলেন। এইরূপে তাহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যায় আমার এক পুরাতন বন্ধু মিসেস মুখার্জি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। স্কুলের বিবিধ উন্নতির সংবাদে আনন্দপ্রকাশ করিয়া বলিলেন—'আপনাদের মোটরবাস তো বেশ সুন্দর হইয়াছে! প্রথমে রাস্তায় দেখে আমি মনে করেছি যে আলমারি যাচ্ছে না কি—চারিদিকে একেবারে বন্ধ, তাই বড় আলমারি বলে ভ্রম হয়।

আমার ভাইপো এসে বললো 'ও পিসিমা! দেখ, সে Moving Black Hole (চলন্ত অন্ধকূপ) যাচ্ছে।' তাই তো, ওর ভিতর মেয়েরা বসে কী করে?'

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে চারি-পাঁচজন ছাত্রীর মাতা দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন 'আপকা মোটর তো খোদা কা পানাহ্! আপ লাড়কীয়ো কো জীতে জী কবর মে ভ রহি হয়ঁ।' আমি নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিলাম, কী করি, এরূপ না হইলে তে আপনারাই বলিতেন, 'বেপরদা গাড়ি।' তাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিলেন 'তব কেয়া আপ জান মারকে পরদা করেঙ্গী? কালসে হামারী লাড়কীয়াঁ স্কুল মে নেই আয়েঙ্গী।' সেদিনও দুই-তিনটি বালিকা অজ্ঞান হইয়াছিল। প্রত্যেক বাড়ি হইতে চাকরানির মারফতে ফরিয়াদ আসিয়াছিল যে, তাহারা আর মোটরবাসে আসিবে না

সন্ধ্যার পর চারিখানা ঠিকানারহিত ডাকের চিঠি পাইলাম। ইংরাজি চিঠির লেখক স্বাক্ষর করিয়াছেন, 'Brother-in-Islam' বাকি তিনখানা উর্দু ছিল—দুইখানা বেনামী আর চতুর্থখানায় পাঁচজনের স্বাক্ষর ছিল। সকল পত্রের বিষয় একই—সকলেই দয়া করিয়া আমাদের স্কুলের কল্যাণ কামনায় লিখিয়াছেন যে, মোটরের দুইপার্শ্বে যে পরদা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাতাসে উড়িয়া গাড়ি বেপরদা করে। যদি আগামীকল্য পর্যন্ত মোটরে ভালো ব্যবস্থা না করা যায়, তবে তাঁহারা ততোধিক দয়া করিয়া 'খবিদ' 'পলীদ' প্রভৃতি উর্দু দৈনিক পত্রিকায় স্কুলের কুৎসা রটনা করিবেন এবং দেখিয়া লইবেন, এরূপ বেপরদা গাড়িতে কী করিয়া মেয়েরা আসে।

এ তো ভারী বিপদ,—

'না ধরিলে রাজা বধে,—ধরিলে ভুজঙ্গ!'

রাজার আদেশে এমন করিয়া আর কেহ বোধহয়, জীবন্ত সাপ ধরে নাই। অবরোধ-বন্দিনীদের পক্ষ হইতে বলিতে ইচ্ছা করিল,—

'কেন আসিলাম, হায়! এ পোড়া সংসারে,
কেন জন্ম লভিলাম পর্দানশীন ঘরে!'

ছোটগল্প ও রস-রচনা

প্রেম-রহস্য

কবি বলেন, যাহা সুন্দর মনোহর, মানুষ তাই ভালোবাসে। শৈশবে চন্দ্রমার প্রতি আমাদের অকপট ভালোবাসার ঐ কারণ। শিশু ফুল ভালোবাসে--যেহেতু ফুল অতি সুন্দর। এই নিয়ম অনুসারে যাবতীয় উপন্যাসের নায়িকাই 'সুন্দরী' হইতে বাধ্য হইয়াছে। নহিলে নায়িকা প্রথমে দর্শকের নয়নরঞ্জন, অতঃপর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইতে পারে না।

বলি, যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে ?--অর্থাৎ যদি কোন কুৎসিত বিশ্রী বস্তুকে ভালোবাসে, তবে কি সে কবিসমাজের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে ? তা যদি হয়, হউক। প্রেমিক প্রাণ দিতে কাতর নহে।

প্রেম কি ? এই রহস্য অতি বড় পণ্ডিতেরাও ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, আর তুমি আমি কোন ছার ? তবে আমি এখন জীবনাবর্তের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া এই সুদীর্ঘ ষাট বছরের বহুদর্শিতায় প্রেম সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এইমাত্র বুঝিলাম যে, ও রহস্য দুর্ভেদ্য। যিনি প্রেম সম্পর্কে কিছুটা বিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত 'অন্ধের হস্তী দর্শনের' ন্যায়।--অন্তত আমার ধারণা ঐরূপ।

এস্থলে আমার জীবনের কতিপয় ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান--সকল ধর্মাবলম্বীকেই ভালোবাসিয়াছি। কিন্তু কেন ভালোবাসিয়াছি, আজি পর্যন্ত বুঝি নাই।

আমি কয়েক মাস আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার নিকট উড়িষ্যায় ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বায়ু--পরিবর্তনের নিমিত্ত তথায় গিয়াছিলাম। উড়িষ্যার লোকেরা বড় ভীরু প্রকৃতির। আমাদের বাঙ্গালার ত্রিসীমায়। (বিশেষতঃ আমার ভগ্নিপতির উপস্থিতির সময়) কেহ আসিত না। আসিত কেবল এক জন। প্রেমিকের অগম্য কোন স্থান নাই--প্রেমিকের গিরি লঙ্ঘন করিতে হয়, বিনা নৌকায় দুস্তর সাগর পার হইতে হয়, কত কি করিতে হয়--আর এ 'হাকিমবাবুর' বাসাবাটির নিকট আগমন তো সামান্য ব্যাপার।

প্রত্যুষে উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইলে দেখিতাম একটি বালিকা আমাদের বাঙ্গালার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। আমি নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিতাম; ঘুরিয়া ফিরিয়া যখনই বারান্দায় আসিতাম, দেখিতাম সেই চক্ষু দুটির দৃষ্টি আমার প্রতি।

আমার ভগ্নিপতি অফিসে গেলে পর মধ্যাহ্নে যখন আমরা দুই ভগিনি অলস সময় কাটাইবার জন্য গাঁথন কার্যে নিযুক্ত থাকিতাম, অথবা যখন গল্প করিতে করিতে দিদি তক্তপোষের উপর ঘুমাইয়া পড়িতেন, আর আমি কোন পুস্তক পাঠে রত থাকিতাম, কবিতার ভাবসাগরে নিমগ্ন হইয়া বাহ্য জগৎ ভুলিয়া থাকিতাম--সেই সময় দৈবাৎ মাথা তুলিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতাম, জানালার নিকট বাহিরে চম্পা (সেই বালিকা) আমাকেই দেখিতেছে।

একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন আসিস ?'

চম্পা নত মস্তকে মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, 'তোমহঙ্কু দেখিবাকু', (তোমাকে

দেখিতে)। বলিয়াই আবার শঙ্কিত হইল; সভয়ে আমার মুখ দেখিতে লাগিল। হাসিয়া ফেলিলাম, বালিকা পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য চম্পার কথা শুনিয়া মনে যারপর-নাই আনন্দ হইল। আমাকে সে প্রতিদিন দেখিতে আইসে ভাবিয়া একটু অহঙ্কারও অনুভব করিলাম। মানব হৃদয় বুঝি চিরদিনই প্রেম-ভিখারী (যদিও আমার স্নেহময় আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না তবু) এ অযাচিত প্রেমকণা কাঙ্গালের ধনরত্নলাভে আহলাদিত ও গর্বিত হওয়ার ন্যায়, আমিও অতিশয় পুলকিত হইলাম।

সময় সময় দেখিতাম আমাদের ঝি চাকরেরা চম্পাকে তাড়া দিয়া বলিত, 'এখানে রোজ কী কর্তে আসিস?' সে বিনীতভাবে উত্তর দিত, 'টিকে তাহাকু দেখি যাই' (তাঁহাকে একটু দেখে যাই)। একদিন আয়া তাহাকে অতি কর্কশস্বরে আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই চম্পা চলিয়া গেল। আমার বড় দুঃখ হইল। আয়াকে তাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করায় সে বলিল, 'ও যে জাতে চাঁড়াল, ওর ছায়া মাড়াতে নেই।' তাহার ছায়া মাড়াইলে আয়াকে স্নান করিতে হইত। চম্পা অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া আমি তাহাকে হৃদয়চ্যুত করিতে পারি নাই। সে সুন্দরী ছিল না, বরং অতি কাল কুৎসিত ছিল, তবু আমি তাহাকে দেখিলে সুখী হইতাম।

আমাদের এই বিমল বিশুদ্ধ ভালোবাসা লইয়া দিদিরা আমোদ করিতেন। দিদির এক প্রৌঢ়া ননদ সেখানে ছিলেন; তিনিও আমাদের যথেষ্ট জ্বালাতন করিতেন। তিনি বলিতেন, 'তাহেরা (আমি) চম্পার সহিত আবার মধু-মাস (ঔমভণহবমমভ) যাপন করিতেছে।' সে সময় আমার বিবাহিত জীবনের সপ্তম বৎসর ছিল।

সুখের দিন অস্থায়ী। রবিবারে দুলা-ভাই (আমার ভগ্নিপতিকে আমি আশৈশব দুলা-ভাই বলিয়া ডাকিতাম) আমাদের কক্ষে আসিয়া বসিলেন। আমাদের তিন জনকে অর্থাৎ দিদি, দিদির ননদও আমাকে কাপড় সেলাই লইয়া ব্যস্ত দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'আমারও কিছু করা উচিত।'

দিদি তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন, 'মাফ কর, আমাদের ছুঁচ-কাঁচি নিয়ে টানাটানি করে কাজ নেই।'

দুলা-ভাই। কেন আমি কী তোমাদের চেয়ে আনাড়ি? তাহারা সেদিন আমায় 'য়্যাহ্' বলেছিল, তাই বলে কী সত্যই য়্যাহ্ হয়ে গেলাম?

দিদির ননদ। ডিন, জে. সুইফটের কল্পনা যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া;--হুহনহুম দেশে অশ্বজাতি রাজত্ব করে, আর মানুষ (য়্যাহ্) তাদের অধীনে থেকে শকটবহন করে। ইশ্! কল্পনার আর সীমা নাই।

দিদি। অশ্ব মানুষের উপর প্রভুত্ব করে, এটা আর আশ্চর্যের বিষয় কি, দিদি? আমাদের সত্যিকার জগতে তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা চিরকাল ঘটে আসছে।

দুলা-ভাই। বটে? সে অদ্ভুত ব্যাপার কি?

দিদি। সে অদ্ভুত ব্যাপার এই, যে পুরুষেরা আবহমানকাল পৃথিবীতে আধিপত্য করছে, যৎকালে সৃষ্টি জগতের উৎকৃষ্টতমা জীব নারীজাতি তাদের দাসত্ব-শকট বহন করে থাকে।

সহসা একটা উত্তর যোগাইতে না পারিয়া দুলা-ভাই দিদির দিকে 'কটমট' দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমরা উচ্চ হাস্য করিলাম।

'আমি তোমাদের কর্মশালার কিছু স্পর্শ করিব না--আমি আমার কাজ করি', এই বলিয়া

তিন পকেট হইতে চুরুট বাহির করিলেন। ধূমপান করাটাও একটা মস্ত বড় কাজ কি না দেখিতে পাইলেন। তিনি সকৌতুকে বলিলেন, 'কী ছুঁড়ি! তোর নাম কি? তৎক্ষণাৎ চম্পা পলায়ন করিল। দিদি বলিয়া উঠিলেন,--'আহ্! ওকে তাড়ালে কেন, ও যে তাহেরার সখী।'

এই কথায় একটা হাস্য-তরঙ্গ উঠিল, দুলা-ভাই আমার স্বামীকে দয়ার পাত্র বলিয়া আক্ষেপও করিলেন।

পরদিন চম্পা আর আসিল না। স্বয়ং 'হাকিম বাবু' (দুলা-ভাই 'বাবু' শব্দে আপত্তি করিতেন, কিন্তু গ্রামের লোকেরা কোন মতেই তাঁহাকে 'বাবু' বলিতে ছাড়িত না। 'সাহেব' শব্দ শিখাইয়া দিলে 'সাহেব বাবু' বলিত।) তাহাকে দেখিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহার ভয়ের কারণ। চম্পার অদর্শনে সমস্ত দিন আমার প্রাণটা কেমন অব্যক্ত যাতনায় দগ্ধ হইতেছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনও বালিকা দেখা দিল না। আমি এক একবার উদাস নয়নে জানালার দিকে চাহিলাম--প্রত্যেক বারই চম্পার স্থান শূন্য দেখিলাম।

অপরাহ্নে দুলা-ভাইকে দিদি চা খাওয়াইতেছিলেন। যখন চা ঢালিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার সাত মাসের খোকা পার্শ্বের ঘরে দাঙ্গা আরম্ভ করিল। দেখিতাম, দিদির উপর খোকার প্রভুত্বই অধিক। সুতরাং তিনি আমাকে চা প্রস্তুত করিতে বলিয়া খোকার আদেশ পালন করিতে গেলেন।

দুলা-ভাই আমার চায়ের প্রদত্ত স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 'তাহেরা! আজ তুমি আছ কোথায়?' আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমি কিছু বলিবার পূর্বেই তাঁহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'

দুলা-ভাই। চায়ে চিনি দেওয়া হয় নাই।

তাঁহার দিদি বলিলেন, 'তাহেরা এ কয়দিন চম্পা বিরহে অন্যমনস্কা আছে!'

দুলা-ভাই। কি জান, আপা! তাহেরার অন্যমনস্ক হওয়ার কারণ চম্পা--বিরহ, না আজ ডাকে ব্যারিস্টার সাহেবের পত্র না পাওয়া--তাহা ঠিক বুঝা যায় না!!

আমি অগত্যা সে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলাম।

শেষে মন মানিল না, সন্ধ্যায় চম্পাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে ও তাহার মাতা আসিয়া একেবারে আমার পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল,--'চম্পা পিলা মনুষ্য--হু হু হু!' ব্যাপার দেখিয়া আমি তো অবাক; চম্পা ছেলেমানুষ, সেজন্য তাহার মাতা কাঁদে কেন? পরে বুঝিলাম, 'হাকিম বাবু', স্বয়ং চম্পার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাই তাহাদের বিপদ ও ভয়ের কারণ। লোকগুলি যেমন ভীরু, তেমনই আবার যুক্তিতর্কেরও ধার ধারে না!

একবার আমি একটি ইংরাজবালাকেও ভালোবাসিয়াছিলাম। তিনি শ্বেতাঙ্গী, আমি কৃষ্ণাঙ্গী--এক কথায় বলি, আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক--তাঁহাদের বড়দিনের উৎসব সময়টা প্রায় আমাদের মধুর বসন্তের ন্যায়; আমরা বাসন্তী সন্ধ্যায় মুক্ত ছাদে বসিয়া সদ্যপ্রস্ফুটিত বেল যুথিকার পরিমলবাহী মলয়ানিল উপভোগ করিতে ভালোবাসি আর তাঁহারা পৌষ মাসের দুরন্ত শীতে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে বসিয়া অনল উত্তাপ উপভোগ করিতে ভালোবাসেন। তবু আমাদের উভয়ের হৃদয়ে অকপটে

সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। মিস ডিও ইহা স্বীকার করিতেন।

মিস্ ডির বিরহে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম। তাঁহাকে শেষ বিদায় [illegible] জন্য আমি ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আমি ওয়েটিং রুমে গাড়ি ছাড়িবার [illegible] শুনিলাম; গাড়ি চলিবার শব্দও শুনিলাম,-- তখন মনে হইল যেন ট্রেনখানা [illegible] বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল! তারপর,--মিস্ ডিও আমার মাঝখানে বিশাল সাগরের ব্যবধান রহিয়া গেল।

আবার বলি, এ কেমন প্রেম ? আমার দীর্ঘজীবনের সমুদয় প্রেমকাহিনী বলিবার [illegible] স্থান ও কাল নয়--তবে আর একটিমাত্র ঘটনা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি।

আমি কয়েক বৎসর স্বামীসহ পশ্চিম প্রদেশে ছিলাম। অল্পকাল মধ্যেই প্রতিবেশিনী মহিলাবৃন্দের সহিত আমার আলাপ হইল। বিশেষতঃ একজন প্রবীণা মোসলেম ললনাকে আমি অত্যন্ত ভক্তি করিতাম। তিনিও সুদে আসলে আমার ভালোবাসা প্রত্যর্পণ করিতেন। তাঁহার সহিত এক ধর্ম ব্যতীত অপর অনেক বিষয়ে ঐক্য ছিল না। যথা তাঁহার জন্মভূমি পশ্চিমে, আমার জন্মভূমি পূর্বে (অর্থাৎ বঙ্গদেশে); তিনি আমার অপেক্ষা বয়সে ত্রিশ বৎছরের বড় ছিলেন, তবুও আমরা দুইটি শৈশবসঙ্গিনীর ন্যায় অভিন্নহৃদয় হইয়া উঠিলাম।

পরমেশ্বর মানবের অতি-প্রেম সহ্য করিতে পারেন না; সুতরাং আমার মাননীয়া বন্ধুটি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার অবৈতনিক সেবিকা হইলাম। এখন হইতে তাঁহাকে 'আমার রোগী' বলিব।

জীবনে এই প্রথমবার (আত্মীয় ব্যতীত অপর) রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। পরের সেবায় এত সুখ শান্তি, ইহা পূর্বে জানিতাম না। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে,--তাই আমারও এ সুখ শান্তিটুকু দেখিতে না দেখিতে--প্রাণ ভরে অনুভব করিতে না করিতে--ফুরাইয়া গেল।

আমি অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-মুকুল, আতর, গোলাপজল প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি, এবং বেদানা, কমলালেবু ইত্যাদি জড়বস্তুর আকৃতিতে আন্তরিক প্রেম উপহার লইয়া আমার রোগীর নিকট উপস্থিত হইতাম। কিসে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন, কোন জিনিসটি তিনি ভালোবাসিবেন, এই চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতাম। তাঁহার মনোরঞ্জনই যেন আমার একমাত্র কর্তব্য ও উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার রক্তহীন অধরে ঈষৎ হাস্য দেখিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।

আর আমার রোগীর মানসিক অবস্থা ?--সন্ধ্যা হইলেই (আমি প্রত্যহ সায়াহ্নে এবং দিবা এক ঘটিকার সময় তাঁহার নিকট যাইতাম) তিনি আমার জন্য তাঁহার শয্যার সন্নিকটে আসন প্রস্তুত করাইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতা থাকিতেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার রোগযন্ত্রণা লাঘব হইত। যখন অত্যধিক দুর্বলতায় অবসন্ন হইয়া মুদ্রিত নয়নে পড়িয়া থাকিতেন, তখনও আমি আসিয়াছি শুনিলে চক্ষু খুলিতেন। সেই জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় আনন্দ-কিরণে উজ্জ্বল হইত।

আমার রোগী আবদার করিতেন--ঔষধ খাইবেন না। আমি ঔষধ হস্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার শুষ্ক অধরে হাস্যরেখা প্রকটিত হইত--কপট বিরক্তির সহিত বলিতেন, "আয়ি মুঝে সাতানে কো' (আসিলেন আমার জ্বালাতন করিতে।) কিন্তু ঔষধ তৎক্ষণাৎ সেবন করিতেন। যে পথ্য আর কেহ প্রস্তুত করিলে অখাদ্য হইত, তাহা আমার করস্পর্শে সুস্বাদু হইয়া যাইত। প্রেমের কী আশ্চর্য ক্ষমতা!!

আমার রোগী সেই অন্তিম দশায়ও আমাকে দেখিলেই বসিতে অনুরোধ করিতেন। আমি নমস্কার করিলে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশির্বাদ করিতেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা বেদনা ভুলাইয়া অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য ছোট ছোট গল্প বলিতাম, তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন। তিনি অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন, সেজন্য আমাকে উর্দু গজল (গীতি-কাব্য) গাহিতে হইত। অধিকাংশ গজল তাঁহারই ফরমায়েশ অনুসারে পঠিত হইত।

সেদিন আমার রোগীকে দেখিয়া হতাশ হইলাম। তাঁহার আরোগ্য লাভের শেষ আশাটুকু সেই দিন অন্তর্হিত ছিল। আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলাম, ভাবিতেছিলাম, অদ্য বসন্ত ঋতুর শেষ দিন, এই বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার রোগীও শেষ বিদায় লইতে চলিলেন। সেই রবি, শশী, তারা সবই থাকে, কেবল বসন্তমাধুরী ফুরায়। মানসকর্ণে কোন কবি ও প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলাম,--

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু 'কি হল তোমার
সে সৌন্দর্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন ?'
সহাস্যে উত্তর দিল সে, 'ও প্রিয়তম!'
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা স্রষ্টার।'

বসন্ত তো আবার আসিবে, আসিবে না কেবল আমার রোগী।

ঠিক সেই সময় আমার রোগী অনুরোধ করিলেন,

'গোর-চিহ্নটুকুও বিলুপ্ত হল প্রায়--এই গজলটি গাও তো, তাহেরা।

আমি বিস্মিত হইলাম; তিনি আমার মনোভাব বুঝিলেন কিরূপে ? সে যাহা হউক, এখন রোগীকে কোথায় আশার কথা শুনাইব, না বৈরাগ্যব্যঞ্জক নিরাশার গান গাহিব, বলিব, '(কিছুক্ষণ পর তোমার) গোরের চিহ্ন পর্যন্তও থাকিবে না ?' আর যিনি আজি না হয় দুদিন পরে নিশ্চয় মরিবেন, এরূপ রোগীর পার্শ্বে বসিয়া মৃত্যুগীতি গাওয়াও তো শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। আমি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলাম, ওটা খুব কণ্ঠস্থ নাই। তখন তিনি আমার হাতে একখানি গজলের খাতা দিয়া বলিলেন, 'তবে--

নাই সেকেন্দর কিম্বা দারার কবর,--
মুছে গেছে মানীদের স্মৃতিচিহ্ন কত!
ইত্যাদি পড়।'

আমি বিপদে পড়িলাম, এটাও যে ঐ ধরনের কাব্য। শেষে রোগীর (আবদারই) রক্ষা করা গেল! যদিও--

'মৃত্যুযন্ত্র কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত?'

আবৃত্তিকালে আমার হৃদয় দ্বিধা হইতেছিল। ভাবিয়াছিলাম এইভাবে আরও কিছুদিন কাটিবে। কিন্তু না--।

সেদিন বুধবার সন্ধ্যা। আমার রোগী অদ্য আমাকে চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন না; আমি কাতরে ডাকিলাম, সাড়া দিলেন না। এই অনাদরে (?) আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। আমার চক্ষে জল দেখিলে তাঁহার কন্যা-বধূরা ধৈর্যহারা হইয়া গোল বাধাইবেন, এই ভয়ে অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম। ঐ সময় অশ্রু সম্বরণ কি কঠিন ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কে বুঝিবে ?

আমি তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম, এমন সময় (আমার করস্পর্শে।)

তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল, অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "বাহিনী! আজ বড় [illegible] পড়েছি!" সেই, 'বহিন' শব্দটি কেমন ভালোবাসার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল যে একবার শুনিয়াছে সে আর এ জীবনে ভুলিতে পারে নাই।

বৃহস্পতিবার রাত্রি; আমার রোগীর হস্তপদ শীতল হইয়াছে। আমি সেই প্রকাণ্ড হাত দু'খানি গরম করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিলাম,--আমার সম্মুখেই কি [illegible] তাঁহার প্রাণপাখি উড়িয়া গেল, দেখিতে পাইলাম না।

প্রেমের আলোচনা যতই করি, ততই দেখি উহা দুর্বোধ্য। প্রেমিক-হৃদয় নবনীসম কোমল; আবার পাষাণবৎ কঠিন। কখনও দেখি, প্রেম অতিশয় দৃঢ়, কখনও ভঙ্গপ্রবণ! ইহা শিশুর হৃদয়ে থাকে, প্রবীণ-হৃদয়েও থাকে--বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। প্রেম কি স্বর্গীয় কোন তরুর মতো,--আমাদের হৃদয়ে ক্রমশ শাখা পল্লবে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে? অথবা প্রেম কি কোন ভাষার মতো, রাগরাগিনীর মতো মানবের প্রাণে নানা ছন্দে ঝঙ্কারিত হয়? যাহা হউক, বুঝা গেল না, প্রেমের স্বরূপ কি। বুঝিলে এইমাত্র বুঝি, প্রেমের আদি অন্ত নাই--প্রেম-রহস্য দুর্ভেদ্য!

ভ্রাতা-ভগ্নী

সাধারণত দুই মতের লোক দেখা যায়। একদল উন্নতি চাহে, পরিবর্তন চাহ; অপরদল বলে, 'আমাদের যাহা আছে, তাহাই থাকুক, পরিবর্তনের কাজ নাই!' প্রথমোক্ত দলকে আমরা উদার মতাবলম্বী এবং শেষোক্তকে রক্ষণশীল বা গোঁড়া বলিব। অধিক স্থলে আমাদের ভ্রাতৃগণ উদার মতাবলম্বী এবং ভগ্নীদল রক্ষণশীল হইয়া থাকেন। ক্রমে কালের বিচিত্র গতির আর্বতনে এখন কোনো কোনো স্থলে তাহার বিপরীত অবস্থাও দেখা যায়। অর্থাৎ ভ্রাতা সেই 'সেকেলে গোঁড়া' আর ভগ্নী নববিভায় আলোকিতা।

এ-প্রবন্ধে আমাদের সমাজের কোনো কোনো ক্ষতের উল্লেখ দেখিয়া যেন ভ্রাতৃসমাজ ক্ষুণ্ন না হন; কারণ, বলিয়াছি তো, নালিঘায় অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন।* কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা চিকিৎসা করিতে বসিয়াছি। আমরা কেবল রোগ দেখাইয়া দিতেছি,—যাঁহারা সমাজের হাকিম (সমাজসংস্কারক), চিকিৎসা করিবেন তাঁহারাই।

'আগুন লেগেছে ঘরে,
আমি শুধু এনেছি সংবাদ! সুখনিদ্রা।
দিয়েছি ভাঙায়ে!'

আমাদের কার্য কেবল ঐ পর্যন্ত।

এখন আসুন, পাঠিকা! আমরা এইখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কাজেব, সিদ্দিকা ও সুফিয়ার কথোপোকথন শুনি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, ইহাদের কে রক্ষণশীল এবং কে উদার মতের পক্ষপাতী।

কাজেব যেন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তর্জনগর্জন করিয়া বলিলেন, 'তোমার পত্রের

---

* বিশেষত নানাকারণে বাধ্য হইয়া ঐসকল পুঁতিগন্ধময় দুরারোগ্য ক্ষতের উল্লেখ করা গেল। ভ্রাতৃসমাজই আমাদিগকে ও-সব বলিতে বাধ্য করিয়াছেন। 'শুনালে শুনিতে হয়!'

তাবে বোধ হইতেছিল যে, অনাহারে বিবস্ত্রাবস্থায় নিতান্ত যন্ত্রণার সহিত ভগ্নোদর মাতাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, আর তুমি একমাত্র মায়ের সু-সন্তান কাণ্ডাকাণ্ড (?) জ্ঞানশূন্য হইয়া মায়ের উদ্ধারের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ।

সিদ্দিকা। আমার পত্রের ভাষা একপ্রকার এবং ভাব অন্যপ্রকার ছিল, তাহা জানিতাম না। তোমরা ভাষা ছাড়িয়া কেবল ভাবটা পাঠ করিয়াছ, বেশ! কিন্তু আমি জানি, আমার ভাব, ভাষা, অক্ষর, স্বাক্ষর—সবই আমার নিজের এবং একইপ্রকার। আমি তো আর নিজের ভাব ভ্রাতার ভাষায় কন্যার হস্তাক্ষরে মাতার দ্বারা স্বাক্ষর করাই না! তবে আমার চিঠির ভাব ও ভাষার প্রভেদ হইবে কেন?

কাজেব সিদ্দিকার কথায় উত্তর না দিয়া পূর্ববৎ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—'মায়ের কী এমন কষ্ট হইয়াছে? আজ ২০ বৎসর যাবত এই কুপুত্রেরা মায়ের ভরণপোষণের ভার বহন করিয়া আসিতেছে। এই ১৫ বৎসরের মধ্যে যদবধি তোমার বিবাহ হইয়াছে, তুমিই বা কী এমন স্বর্ণ ঢালিয়া দিয়াছ?'

সিদ্দিকা। আমি স্বর্ণ ঢালিয়া দিব কোথা হইতে, ভাই? আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কি মস্ত জমিদারি ছাড়িয়া মরিয়াছেন?

কাজেব। যদি কিছু করিতেই পার না, তবে আর বৃথা কল্পনা খরচ কর কেন? আর এই এক বৎসরের মধ্যে এত কী পরিবর্তন হইল যে, তুমি এমন বেহায়া বেগয়রতের (লজ্জাহীনার) মতো মামাতো ভাইয়ের নিকট সহসা পত্র লিখিলে?

সি। এই এক বৎসরের মধ্যে মাতার অসুখ বৃদ্ধি হইল; এই এক বৎসরের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত মাতার অন্যত্র যাওয়া আবশ্যক হইল, কারণ ডাক্তার বলিয়াছেন, এ রোগের ঔষধ নাই, কেবল পশ্চিমাঞ্চলে কতকদিন থাকিলেই আরোগ্য হইবেন, তাই, 'কাণ্ডাকাণ্ড' জ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আর মামাতো ভাইকে পত্র লিখা যে 'বেহায়া বেগয়রতের' (নিতান্ত লজ্জাহীনার) কাজ, তাহা জানিতাম না। আমি তো সকলকে সহোদরের মতো জ্ঞান করি। যদি তোমাকে পত্র লিখা দোষণীয় না হয়, তবে তাঁহাকে পত্র লিখিলে দোষ হইবে কেন?

কাজেব। এতদিন যে তুমি তাদৃশ্য সুশিক্ষা পাইয়াছিলে না এবং আজিকাল যেরূপ স্বাধীনতা ও উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহাও করিয়াছিলে না, তখন মায়ের খবরগিরি কে করিত? তখন কী অবস্থা ছিল?

এবার সুফিয়া উত্তর দিলেন, 'যখন তোমরা শিশু ছিলে ও মাতার ভরণপোষণের ভার বহনে অসমর্থ ছিলে, তখন কী অবস্থা ছিল? তোমাদের ন্যায় সুপুত্রের দল যদি জন্মগ্রহণ নাই করিত, তথাপি মাতার দিন কাটিত কি না? তোমরা যেমন বড় হইয়া মাতার ভার লইয়াছ, তদ্রূপ এখন আমরাও বড় হওয়াতে আমাদের কর্তব্য হইয়াছে মাতৃচরণ সেবা করা। মানুষ জন্মিলে তাহার কাজও জন্মে, কেহ না-জন্মিলেও তাহার জন্য জগতের কিছু ঠেকিয়া থাকে না।

কাজেব। যদি এমনই কোনো কষ্ট তোমাদের কল্পনা অনুযায়ী তোমরা গড়াইয়া নিয়া থাকো, তবে যৎকিঞ্চিৎ টাকা দান করিলেই তো হইত! টাকা হইলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, আর টাকা পাইয়া মা আপন খাওয়া পরার যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারিতেন না?

সুফিয়া। ভ্রাতার গৃহে থাকাকালীন মাকে টাকা পাঠাইতাম কিরূপে? গৃহস্বামী টাকা ফেরত দিতেন যে? যে বাটিতে অবলাদের নামের চিঠি মারা যায়, সে বাটিতে কি টাকা নিরাপদে মায়ের হাতে পড়িত? আর, ভাই! টাকা হইলে বাঘের দুধ পাওয়া যায়, এ-কথা

তোমরা বেশ জানো, তাই অবলার হাতে এক পয়সা থাকিতে দাও না! আমার বেশ মনে আছে, কী কী কৌশলে তোমরা মায়ের নিকট হইতে এক-একটি পয়সা দুইয়া লইয়া করিয়া লইতে! সম্ভবত হাতে দু-পয়সা রাখিবার অভিপ্রায়েই স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার ব্যবহার করে। কিন্তু, হায় কপাল! ললনারা কেবল জড় স্বর্ণের বোঝা বহন করেন; অলঙ্কার ভাঙিবার বা বিক্রয়ের ক্ষমতা তাঁহাদের নাই! তোমাদের ইচ্ছামতো তোমরা এক-একটি অলঙ্কার মোচন করিয়া বাঁধা দাও—যাহা ইচ্ছা কর। তোমাদের ৫০ টাকার আবশ্যক হইলে আমাদের ৫০০ টাকার গহনা সুদের চাপায় মারা যায়। বল তো ভাইয়া! মায়ের অতগুলি অলঙ্কারের শ্রাদ্ধ কাহারা করিয়াছে?—তোমরা। পুরুষ প্রভুরা! স্বর্ণভার বহন করে অভাগিনী অবলারা, আর স্বর্ণ ভোগ করে ভাগ্যবান সবলেরা। টাকা হইলে কী না পাওয়া যায়? তাই অন্তঃপুরে বন্দিনীদের হাতে টাকা থাকিতে দেওয়া হয় না!

সি। কিরূপে মাতার হাত খালি করিতে হয়, তাহা পুত্রেরা বেশ জানেন, কিরূপে ধনবতী শাশুড়িকে জব্দ করিয়া তাঁহার সর্বস্ব হস্তগত করিতে হয়, তাহা জামাতারা বেশ জানেন। কিরূপে বিধবা ভগ্নীকে সর্বস্বান্ত করিতে হয়, সে কৌশলও ভ্রাতৃবৃন্দ অবগত আছেন! এমনকি মৃত ভ্রাতার সম্পত্তির শেষ কণাটুকুও করায়ত্ত করিবার জন্য ভ্রাতারা অনেক সময় অসহায়া ভ্রাতৃবধূকে নিকাহ (বিবাহ)-ও করিয়া থাকেন!

কা। ওহ্, বুঝিলাম! মায়ের সেরূপ কোনো কষ্টের জন্য তোমরা অস্থির হও নাই, তোমরা নিজেরা যেরূপ স্বাধীন, মাতাকেও তদ্রূপ স্বাধীনতা দিবার জন্যই বোধকরি এত ব্যস্ত! স্নেহের মাতৃভক্তির মাত্রাটা একটু কম রাখাই ভালো। তোমরা উচ্চশিক্ষা পাইয়াছ বলিয়া তোমাদের পক্ষে অনেক কাজই শোভা পায়, কিন্তু মুসলমান-(সগর্বে) যাহারা মুসলমান শাস্ত্রের নিয়মমতো চলিতে বাধ্য ও তদ্রূপ চালচলনকে ঘৃণা করে না, তাহারা তো সহসা তোমাদের অনুকরণ করিতে অক্ষম!

সি। যাহারা তোমার মতো মুসলমান, তাহারা মুসলমান নামের যোগ্য কি না, পূর্বে তাহার মীমাংসা হওয়া চাই। কেবল গো-মাংস ভক্ষণই মুসলমানের চিহ্ন নহে! তোমার বর্ণিত 'মুসলমান' নামধারী ব্যক্তিরা কোনো মন্দ কাজ করিতে বাকি রাখে নাই; মিথ্যা বলা, পরস্বাপহরণ করা, জাল-জুয়াচুরি করা—নানাপ্রকার অসাধু ব্যবহার করা তো প্রায় তাহাদেরই নিত্যকর্ম। তাহাদের মুসলমান বলিলে পবিত্র 'মুসলমান' শব্দটি কলঙ্কিত হয়।

সুফিয়া। ভাই! তোমার আদর্শ একদল মুসলমান এমন আছেন যে, তাঁহারা কোরান শরিফের এক পৃষ্ঠা দেখিয়াছেন, অপর পৃষ্ঠা দেখেন নাই। তাঁহারা 'সুরা নেসার' ৩৪শ আয়েত দেখিয়াছেন,-'সুরা নূর' ২য় এবং 'সুরা মায়দা'র ৯১ আয়েত দেখেন নাই!!

সি। ঐ 'সুরা নেসা'রই ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ দেখিয়াছেন, শেষাংশ দেখেন নাই।*

---

* (১) সুরা 'নেসার' উক্ত আয়েতের অর্থ এই --'পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাখে, ঈশ্বর তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন বলিয়া' ইত্যাদি।

(২) সূরা 'নূরের' ঐ অংশে কু-পথগামীদের প্রতি একশত কশাঘাতের বিধান আছে।

(৩) সূরা 'মায়দার' ঐ আয়েতের অনুবাদ এই--'মদ্য ও দ্যূত ক্রীড়াতে তোমাদিগের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে ঈশ্বরস্মরণ ও উপাসনা হইতে নিবৃত্ত রাখা শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে নাই, অনন্তর তোমরা কি (সুরাপান হইতে) নিবৃত্ত হইবে?'

(৪) এবং সূরা 'নেসা'র ২৪শ আয়েতের প্রথমাংশ এই--'এবং সধবা নারী (অবৈধ,কিন্তু তোমাদের দক্ষিণহস্ত যাহার উপর অধিকার করিয়াছে, তাহাকে (অর্থাৎ দাসদাসীর দলকে!) তোমাদের সম্বন্ধে লিপি করিয়াছেন;' আর শেষাংশ এই--'এ-সকল ব্যতীত তোমাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে, তোমরা আপন ধন দ্বারা (কাবিন যোগে) সুরক্ষক অব্যভিচারী হইয়া (বিবাহ) অন্বেষণ কর, অনন্তর ... তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত যৌতুকরূপে দান কর।'

সু। ঠিক তাঁহারা করিতে না পারেন, এমন কোনো কু-কাজ নাই—তাঁহারা শব দ্বারা সম্পত্তি লিখাইয়া লইতে পারেন! তাঁহাদের কৌশলে দুই দিনের মৃতদেহ চিরবানবন্দি দেয়!

সি। আর যদি সেই '–' শাখানদীটার বাকশক্তি থাকিত, তবে সে বলিতে পারিত, (২০-৩০ বৎসর পূর্বে) সে কত লোককে গোপনে নরহত্যা করিয়া তাহার গর্ভে শব ডুবাইতে দিয়াছে; আর কত অসহায় ব্যক্তি তাহার তটস্থিত অরণ্যে নৈশ অন্ধকারে প্রাণবায়ু হারাইয়াছে! আর বলিতে পারিত, সে কত হতভাগ্যের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ শুনিয়াছে—

সু। (ভ্রাতার প্রতি) সেই হত্যাকাণ্ডগুলির অধিকাংশই তোমার তথাকথিত মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত!

কা। কোন্ শাখানদীর তীরে নরবলি দেওয়া হইত? আমি তো জানি না!

সি। জানো না? বুকে হাত দিয়া দেখ তো? স্থানটার সুস্পষ্ট পরিচয় দিতে হইবে নাকি? 'গোষ্ঠীর নিকট ফষ্ঠী'* করিতে নাই; এই নীতিবাক্য মনে রাখিও।

সু। যাঁহারা উক্তপ্রকারে 'মুসলমান শাস্ত্রের নিয়ম' প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের অনুকরণ করিবেন কিরূপে?

সি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা তাদৃশ কপটাচারী 'মুসলমান' নহি! গলার জোরে তোমরা আমাদিগকে 'নাস্তিক' 'কাফের'—যাহাই বল না কেন, 'নরহত্যা' বা 'ভ্রূণঘাতক' বলিতে পার না!

কা। (সিদ্দিকার কথায় কর্ণপাত না করিয়া) তোমরা যেমন মক্কা মদিনা বেড়াইতে গিয়া উষ্ট্রারোহন, গর্দভারোহণ—কিছুই বাকি রাখ নাই, মুসলমান অশিক্ষিত কুলরমণীগণের পায়ের জড়তাই আজিও ভাঙে নাই–

সু। (স্বগত) এখন 'মুসলমান রমণীর' পালা! (প্রকাশ্যে) তোমার আদর্শ কতকগুলি অশিক্ষিতা মুসলমান কামিনীর পায়ের জড়তা ভাঙে নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ঐ জড়িত পদে এমন এক-এক লম্ফ দিয়াছেন যে, তাহাতে, তাঁহাদের পদচাপে সমাজের অস্থিপুঞ্জ চূর্ণ হইয়াছে! কেহবা ঐ জড়িত পদে এক লাফে পবিত্র 'জেনানা' ত্যাগ করিয়া কুপথে দাঁড়াইয়াছেন! তাদৃশ অশিক্ষিতা রমণীর প্রশংসা করা তোমাকেই সাজে!

কা। দেখ সুফিয়া! আমাকে বেশি রাগাইও না। মনে রাখিও, মাতাকে বৎসর বৎসর দেশ-বিদেশের হাওয়া খাওয়াইবার জন্য তোমরা দুই ভগ্নী যেরূপ ব্যবস্থা করিতে চাও—মায়ের কু-পুত্র কয়টির—এই অশিক্ষিত বর্বরদের জীবনে অথবা নিতান্তপক্ষে যে কয়দিন তাহাদের তত্ত্বাবধানে মাতা আছেন, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের এ-সাধ পূর্ণ হওয়া কঠিন, বরং অসম্ভব।

সু। মাতাকে তোমরা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে যাইতে দিবে না, বেশ! মাতার অসুখে তোমরা আর ব্যথিত হইবে কেন? প্রবাদ আছে, 'পুত্রের স্নেহ ততদিন পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত সে স্ত্রীলাভ না করে, আর কন্যার স্নেহ কখনো হ্রাস পায় না।' তোমরা এখন স্বত্বাশালী বড়লোক—তোমাদের নিকট মাতা একজন সামান্য 'অবোধ মেয়েমানুষ' বই! এবং তোমাদেরই আশ্রিতা! আর আমাদের জন্য মাতা তুলনা-উপমা-রহিতা—স্বর্গের আশীর্বাদ বিশেষ। এই মাতৃপ্রেম আমাদিগকে ঈশ্বরপ্রেমের নমুনা দেখায়। আমরা মাতৃচরণে চিরকাল শিশু থাকি; চিরকাল তাঁহার চরণছায়ার

* ইহা পূর্ববঙ্গের প্রচলিত কথা।

প্রত্যাশিনী! চিরদিন তাঁহার আশীর্বাদ আকাঙ্ক্ষা করি। তাই [illegible] অনেকদিন বাঁচিয়া থাকুক। আর সে-বার তোমাকে নিতান্ত কাতরভাবে [illegible] 'মাতা অত্যন্ত পীড়িত আছেন। তুমি দেখ গিয়া। ...বৃদ্ধা মাতা কতদিনই বা [illegible] তাহা শুনিয়া তোমার হৃদয় দ্রব হয় নাই, বরং শুষ্ক ভাষায় উত্তর লিখিয়াছিলে [illegible] এখন তহসিলের সময়—এক পদ নড়িবার জো নাই।' ধন্য পুত্রহৃদয়! তোমার [illegible] মৃত্যু কামনা কর, যেহেতু তাহা হইলে মাতার 'ভরণপোষণের ভার' হইতে [illegible] পাইবে! আমরা মাতাকে 'তত্ত্বাবধানে' রাখিব এরূপ আস্পর্ধা করি না। [illegible] মাতৃচরণ সেবা করিতে চাহিয়াছিলাম। আর চাহিয়াছিলাম, ধর্মপরায়ণা পুণ্যবতী জননীকে অপবিত্রা পিশাচীদের সংস্রব হইতে দূরে রাখিতে। ভাই! অন্তঃপুরের [illegible] তো এই যে, সংসারের অপবিত্রতা হইতে কুলললনাবৃন্দকে সুরক্ষিতা রাখা? [illegible] পবিত্র অন্তঃপুরেও যদি পিশাচীদের অবারিত গতি থাকে, তবে কুলবালারা কোথা লুকাইবে? কী তামাশাই হয়, যখন মাতা 'মগরেবের' নমাজ পড়িতে (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা করিতে) দাঁড়ান—আর বৈঠকখানা হইতে সেতার-সংযোগে পিশাচী-কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত তাঁহার কর্ণকুহরে সুধা ঢালিতে থাকে!! আমাদের এখানে মাতা সে কুৎসিত গান শুনিতে পাইতেন না যে! সেইজন্য তোমরা সুপুত্রেরা তাঁহাকে 'তত্ত্বাবধানে' রাখিয়া তাদৃশ সঙ্গীত শ্রবণ হইতে বঞ্চিতা করিতে চাও না। বেশ! বেশ!

কা। তা পুত্র-ভবন পবিত্র হউক, অপবিত্র হউক, মাতা তাহা ত্যাগ করিয়া জামাতৃ-ভবনে থাকিতে পাইবেন না, এ-কথা নিশ্চয় জানিও। পুত্র জীবিত থাকিতে [illegible] জামাতৃ- অন্ন গ্রহণ করিবেন কেন?

সিদ্দিকা। থাক্ জামাতৃ-গৃহে তাঁহার পদধূলি দিবার আবশ্যক নাই। ঈশ্বর-কৃপায় তোমরাই দীর্ঘজীবী হইয়া মায়ের 'অভিভাবক' থাকো।

কা। তোমার পত্র পাঠ করিয়া বাস্তবিকই বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।

সি। (স্বগত) আবার ঐ একই কথা! (প্রকাশ্যে) পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেই বাল্ত যাইত।

কা। পত্র ধ্বংস করিলে কি স্মৃতিও ধ্বংস হইত? বোধহয় আমাদের বংশের উপ খোদাতালার নিতান্তই 'গজব' (ক্রোধ, আক্রোশ বা অভিশাপ) পড়িয়াছে যেজন্য এ বংশে পুত্রগুলি এইরূপ অশিক্ষিত ও বর্বর এবং কন্যাগুলি এক-একটি নক্ষত্র। নচেৎ এই তো হাসে ভাইয়ের পাঁচ-পাঁচটি ভগ্নী অতবড় শহরে বিলাত-ফেরতা এবং সুশিক্ষিতা অবস্থাপন্ন স্বামীর সঙ্গে অনায়াসে প্রকৃত মুসলমানদের ঘরের কুল-কন্যাদের মতো সংসার করিতেছে; আজি একটি মেয়েও সুশিক্ষিতা স্বাধীন * Bright star (উজ্জ্বল নক্ষত্র) সাজে নাই।

সি। হাসেদ ভাইয়ার ভগ্নীরা উজ্জ্বল নক্ষত্র সাজেন নাই, বেশ ভালো কথা। কিন্তু তাঁহাদের বংশের পুত্রেরা বিষদানে পিতৃহত্যা করিয়া এবং কন্যারা গোপনে নানা কাণ্ড করিয়া সমাজে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। যাক ভাই! অন্য লোকের পারিবারিক কথায় আমাদের কাজ নাই—তুমি তাহাদের নাম সগর্বে উল্লেখ করিলে, তাই আমিও দু-কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

কা। (ভগ্নীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া) খোদাতালার নিকট আরাধনা করি যে,

---

* কাজের ক্রোধভরে কথায় কথায় বেচারি বঙ্গভাষার মণ্ডুপাত করিতেছেন। পাঠিকা 'কাতকাণ্ড 'সুশিক্ষিত অবস্থাপন্ন' 'মেয়ে সুশিক্ষিতা (স্ত্রীলিঙ্গ) স্বাধীন (পুংলিঙ্গ)' ইত্যাদি কতই মজার কথা শুনিতে পাইতেছেন!

তনি যেন এই পরিবোরের অশিক্ষিত বর্বর পুরুষগুলিকে অচিরে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, য তাহারাও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝকঝকিতে চক্ষু ধাঁধা হইয়া মুখ ছাপাইয়া না বেড়ায়—

সি। উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঝকঝকিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিবে কেন? চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছিল সেইদিন- যেদিন ফাসেদ ভাইয়ের স্ত্রী ও শ্যালিকাদিগকে মেলায় দেখিয়াছিলে—

সু। আর সেই মেলায় দুলাভাইকে* তাহাদের সম্মুখে দেখিয়া মুখ লুকাইয়াছিলে! একদিকে ফাসেদ ভাই ভাবির * নিকট হইতে দশহাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, অপরদিকে তুমি পলায়নের পথ খুঁজিয়াছিলে! 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে রাত হয়'—দুলাভাইয়ের নিকট তুমি সর্বদা ফাসেদ ভাইয়ের শ্বশুরালয়ের পরদার খুব প্রশংসা করিতে কি না!

কা। (সলজ্জভাবে) এসব আজগুবি কথা তোমরা কোথায় শুনিয়াছ?

সু। দুলাভাই নিজে বলিয়াছে।

কা। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিয়া থাকিবেন।

সি। আর এককথা মনে পড়িল। তুমি যে আমাদের মক্কাশরিফ ভ্রমণের কথা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছ। তাহার উত্তর দিতে ভুলিয়াছিলাম।

কা। প্রত্যেকটা কথার উত্তর না দিলে কি তোমাদের মানহানি হইবে?

সি। মানহানি হইবে না বটে: কিন্তু এখন আর সেদিন নাই যে আমরা তোমাদের চাবুক নীরবে পরিপাক করিব—

সু। বাস্তবিক এখন আর সেদিন নাই!

কা। সুফিয়া! তুমি আর ক্ষীরে লুন দিও না। তোমরা দুইজন—আমি একা।

সু। তুমি একাই আমাদের দুজনের সমান।

কা। হায়! এখন আর সেদিন নাই যে! আচ্ছা সিদ্দিকা! আমাদের চাবুক পরিপাক করিবে না তো কী করিবে? তোমরাও আমাদের চাবুক মারিবে না কি?

সি। না, চাবুক মারিব না—রোদনই করিব; তবে প্রভেদ এই যে, পূর্বে নীরবে রোদন করিতাম, এখন উচ্চকণ্ঠে রোদন করিব, যাহাতে বাহিরের লোকের দয়া উদ্রিক্ত হয়!—যাহাতে জগৎ আমাদের সহানুভূতি করিতে পারে!

কা। বেশ ! কাঁদো—

সি। আমরা তো যাহা হউক, মদিনাশরিফে উষ্ট্রারোহণে 'থপ থপ' করিয়া বেড়াইয়াছিলাম। আর যাঁহারা এদেশের অন্তঃপুরের জানালা হইতে উকিঝুঁকি মারিয়া পথিককে নাকের নোলক, মুখের ঝলক দেখাইয়া থাকেন—শিবিকা ছাড়া একপদ নড়েন না, অথচ মোটা দোহারা পরদায় বড় বড় ছিদ্র করিয়া ফেলেন, তাহারা বুঝি প্রচলিত অবরোধ-প্রথার মানরক্ষা করেন? কেমন?

সু। মনে পড়ে, মৌলবী নইমুদ্দীন সাহেব প্রণীত 'জোন্দাতল মসায়েলে' পাঠ করিয়াছি—'গহনার ঝনঝনিতে আমার নমাজই যেন কেমন কেমন হইল!'

তোমরা মনে কর, গোপনে কোনো কাজ করিলে দোষ হয় না। আর চতুষ্প্রাচীরের ভিতর কয়েদ থাকার সহিত 'মুসলমান শাস্ত্রের' সংশ্রব কী? কোনো মুসলমান-প্রধান দেশেই তো ঈদৃশ অন্তঃপুর প্রথা নাই—এই ভারতে ও-প্রথা হইয়াছে কেবল অবলা পীড়নের উদ্দেশে! মক্কাশরিফে কি শিবিকা আছে? সে দেশে 'উল্টা গাধা' ছাড়া আর

---

* ভগ্নিপতিকে 'দুলাভাই' বলা হয়।

* 'ভাবি' ভ্রাতৃবধূ।

বাহন কই ?

কা। কী বলিলে?-অবরোধ-প্রথা শাস্ত্রের বিধান নহে? তোমরা কোরান দেখাইয়া এ-কথা প্রমাণিত করিতে পার?

সি। অবশ্য পারি। কিন্তু আমাদের কথা প্রমাণের পূর্বে তোমরা প্রমাণিত ভারতের বর্তমান পরদা কোরানশরিফের অনুমোদিত। আমাদের তো কথা দেখাইয়া চুপ করাইতে পার; কিন্তু অক্টোবর মাসের (১৯০৪, খ্রিষ্টাব্দের) 'দি ইংলিশ লেডিজ ম্যাগাজিন' (ভারত ললনার পত্রিকা) দেখ নাই? মাননীয় মীর মহিউদ্দিন সাহেব বাহাদুর ৫০০.০০ টাকা পুরস্কার দিবেন, যদি কেহ অবরোধ-প্রথাকে কোরানশরিফের বিধান বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারেন। প্রকৃত বাহাদুর। ভাই! তুমিই কেন পুরস্কারটা নিতে চেষ্টা কর না? ঐ পত্রিকায় সাজ্জাদ হায়দার সাহেবের এবং মীর্জা আবুল ফজল সাহেবের পরদা মন্তব্যগুলিও দয়া করিয়া পাঠ কর! ঐ কৃত্রিম অন্তঃপুর-বন্ধন মোচন হইলে অবাধে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে। তখন এ শিক্ষার গতিরোধ করা অসম্ভব হইবে।

কা। যদি আমাদের গায়ে জোর থাকে, তবে প্রাণপণে স্ত্রীশিক্ষার গতিরোধ করিব। অন্তত আমার কন্যাদিগকে আমি পড়াইব না। তোমাদের পড়াইয়া যথেষ্ট শিক্ষা পাইলাম। আর না—এ নেড়ামাথা লইয়া বেলতলায় আর যাইব না।

সি। বেলতলায় যাইতে হইবেই! গত কার্তিক মাসের 'নবনূর' পত্রিকায় 'আধুনিক শিক্ষা' দেখ নাই? মাননীয় লেখক ভ্রাতাটি ঠিক বলিয়াছেন, 'ভারতীয় মহিলাকুল ইউরোপিয় শিক্ষালাভে বিষময় ফল' ফলিতে পারে; (আমরা ইহা স্বীকার করি না) কিন্তু নীলকণ্ঠের ন্যায় সে বিষ কণ্ঠে ধারণ করিতে হইবে।' বুঝিলে?

কা। তোমরা এখন স্বাধীনতার চূড়ায় উঠিয়াছ, কাজেই ধরাখানা সরা হেন জ্ঞান আহা! এখন মনে হইলে গা শিহরিয়া ওঠে। যখন তোমাদের সহকারে সেই অন্তঃপুরে মাতাকে এই নিষ্ঠুর ভ্রাতারা কয়েদ রাখিয়াছিল, তখন একটু স্বাধীনতার নিশ্বাস কি সংবাদ লয়, এমন লোকও ছিল না! হায়! এমন দিনও গিয়াছে।

সি। ঠিক তো, সকলেই সুদিন কুদিন চলিয়া যায়–পড়িয়া থাকে না। আমারও মনে হইয়া হৃৎকম্প হয়, যখন পিতার নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া তুমি দারুণ অভিমানে বিষভক্ষণ করিয়াছিলে হায়! তোমারও তেমন দিন গিয়াছে—যেদিন পিতা স্বয়ং গৃহস্বামী ছিলেন, আর তোমরা সকলে তাঁহার অধীন ও আশ্রিত ছিলে! 'আমার বাটি' বলিতে সে-সময় তোমাদের এক ইঞ্চ (কিংবা এক আঙুলি) পরিমাণ ভূমিও ছিল না। কালের বিচিত্র গতি!–

কা। কেন, তোমরা কি এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে? সেই বৃহৎ অট্টালিকা নামত 'পিত্রালয়' ছিল বটে, কিন্তু এই ভ্রাতাদের নিজ ব্যয়ে ও যত্নে রক্ষিত হইত। ধর্ম ও স্বভাব কুকুর-কুকুরীকে শিক্ষা দেয় যে-কোনো অবস্থায় নিজের Benefactor-কে (উপকারি ব্যক্তিকে), ত্যাগ করিও না। কিন্তু ধন্য স্বাধীন চিন্তা! তুমি সকলই অবহেলা করিতে পার।

সু। বিধবা মাতাকে শিশু কন্যাসহ নিজ ব্যয়ে রক্ষা করিয়াছ, ইহার ন্যায় অসাধারণ উপকারের কাজ যেন আর কেহই করে না! পিতা থাকিলে আমরা তোমাদের গলগ্রহ হইতাম কেন? আর 'স্বাধীন চিন্তা' কিসে কুকুরীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা কৃতঘ্ন হইল? তোমাদের ন্যায় মহা অনুগ্রাহকের আমরা কী অপকার করিয়াছি? তোমরা যে অন্নবস্ত্র দিয়া, বাটিতে আশ্রয় দিয়া প্রতিপালন করিয়াছ, সেজন্য সর্বদা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকি; আর কত প্রশংসা চাও? যদি বল তো নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই

বলিয়া ঢোল পিটাই—

*'আমরা বেনিফেকটর ক' ভাই—**
মাতাকে অন্ন দিয়াছি সবাই।
আমাদের গুণের নাইকো তুলা,
শৈশবে ভগ্নীর টিপি নাই গলা!
আমরা মহা-উপকারী ক' ভাই--'!

বাস্তবিক, শিশুকালে আমাদের গলা টিপিয়া পাতকুয়ায় ফেলিয়া দিলেই পারিতে, অন্তঃপুরের ভিতর ফৌজদারি আপদ তো ঢুকিতে পারিত না। পিতৃহীনা অসহায়া কনিষ্ঠাকে প্রতিপালন করিয়াছ, সে-কথা সগর্বে মুখে আনিলে? এই তো আমাদের বালক চাকরটা যাহা কিছু উপার্জন করে, সব ছোটভাই-ভগ্নীকে খাওয়ায়। ইহার পিতামাতা নাই; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও শিশু তিনটিকে অধিক সাহায্য করে না। হেদায়েত এগার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে যাহা উপার্জন করিতেছে, সব ছোটভাই-ভগ্নীর নিমিত্ত ব্যয় করিতেছে। এখন ইহার বয়স ১৬ বছর; এবার কয় মাসের বেতন জমা করিয়া বড় ছুঁড়িটার বিবাহ দিয়াছে। ১৬ বৎসরের বালক যেরূপ আত্মত্যাগ করিতে পারে; এতটা কি তোমরা আমাদের জন্য করিয়াছ? কই, হেদায়েত তো মনে করে না যে, ভগ্নীকে বিবাহ দিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধিলাম' বরং নিজের একটা গুরুতর কর্তব্য সাধন করিয়াছে, এই মনে করে। ইহাকে (কাপড় প্রস্তুত করা ব্যতীত) একটি পয়সা নিজের জন্য ব্যয় করিতে দেখি না। এখন কী এই অসভ্য; অশিক্ষিত , ছোট জাতীয় (জোলা তাঁতি) বালকদের নিকট আমাদের উচ্চবংশজাত, সেন্ট জেভিয়ার কলেজের ছাত্ররা—সুসভ্য (৫০ বৎসরের!) প্রবীণ মিয়াঁ বাবুরা ভদ্রতা শিখিবেন?

কাজেব এখন পুনরায় অন্তঃপুর কয়েদের কথা তুলিলেন,—

'আর এক কথা, তোমরা দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র মাতাকে অন্তঃপুর কয়েদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মামাতো ভাইকে চিঠি না লিখিয়া মেঝো ভাইকে লিখ নাই কেন? তোমরা তো তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি কর, কারণ তিনি বিলাত-ফেরতা—সাক্ষাৎ উদারতার প্রতিমূর্তি!'

সি। তিনি যদি পত্রের উত্তর দিতেন, তবে আর দুঃখ ছিল কী?

কা। হুঁ-! তুমি যেমন বিষমুখী! মুখ নহে—যেন ছুরি, ক্ষুর! ঐ মুখের গুণে কেহ তোমায় দেখিতে পারে না।

সি। সত্য কিঞ্চিৎ কটু শুনায়, তাই বলিয়া মধুমাখা মিথ্যা বলিতে শিখিব না। না, ভাই! মুখের দোষ নহে, অন্য কারণ থাকিতে পারে। বিলাত-ফেরতা লোকেরা অবলার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবেন না, ইহা অসম্ভব। চিঠির উত্তর দিতে শিখেন না, তবে তাঁহারা বিলাতে গিয়া কী শিখেন?

সু। তিনি অবলাকে চিঠির উত্তর পাইবার উপযুক্ত মনে করেন না।

সি। সম্ভবত তাই। কিন্তু আক্ষেপ এই, তাঁহাদের ন্যায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাও স্ত্রীজাতির উপকারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম স্বার্থত্যাগ করিতে চাহেন না।

সু। পরের উপকারের প্রত্যাশাই বা কর কেন? 'বাহুবলই বল'—আত্মনির্ভরতা চাই। যতদিন অভাগিনী যুক্তিজ্ঞানহীনা অবলা সরলাগণ নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে

---

* আমরা বিলাত ফেরতা ক' ভাই
বাহুর বলেতেই সবাই'--এই গানের অনুকরণ।

সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদের উপকার করিতে গেলেও বেশি ফল হইবে

সি। আমি এই বিষয়ে তোমার সহিত একমত হইতে পারি না। অবলা যুক্তিজ্ঞানহীনা নহেন—তাঁহারা বুঝেনও সব; কিন্তু প্রভুদের অত্যাচারে মাথা পারেন না-মাথা তুলিতে অক্ষম বলিয়াই বুঝিয়াও অবোধের ন্যায় নীরব থাকেন সময় সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুদের 'হাঁ'-তে 'হাঁ' মিশাইয়া থাকেন।

কা। প্রভুদের অত্যাচারে মাথা তুলিতে পারে না, এ-কথা বল কেন? বরং তোমা কেহ একটুকু মাথা উঠাইতে আমরা তাঁহাকে আকাশে চড়াইতে চেষ্টা করি পণ্ডিতা রমা কতগুলি সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া দেশটাকে যে তোলপাড় করিয়াছিলেন—*

সি। পণ্ডিতা রমাবাইকে মাথায় তুলিয়াছিল, যেহেতু তিনি তোমাদেরই শিখানো মুখস্ত করিয়াছিলেন। যতদিন তোমাদের পালিতা সারিকা তোমাদেরই শেখানো বলিবে—'পড় বাবা মতীজান,' ততদিন তো তাহাকে আদর করিবেই; মাথায় তুলিবে যেদিন সে 'পড় বাবা মতীজান' না বলিয়া আর কিছু বলে, সেদিন আর নিস্তার কই?

কা। আমরা ললনা-পীড়ন ছাড়া কিছুই করি নাই কী? তাজমহল, মতি মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করি নাই কী?

সি। এক তাজমহলের জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। এখন জিজ্ঞাসা করি, তাজমহলের সংখ্যা কত? কয়টা তাজমহল এ বঙ্গদেশে আছে?

সু। বঙ্গে বহুসংখ্যক প্রপীড়িতা ললনার উদ্দেশে অনেক মহল হইতে পারিত। তবে কথা এই যে, তাদৃশ অসহায়া মহিলাবৃন্দের সমাধির উপর 'অবলা-পীড়নে'র স্মৃতিরক্ষার্থে কোনো 'পয়জার-মহল' নির্মিত হয় নাই!! যাহা হউক, ইহাকে আর কী বলিব, আমাদের বিলাত-ফেরতা মেঝো ভাইও যখন এমন গোঁড়া হইয়াছেন।

সি। বেচারা বিলাত-ফেরতা ভাইয়ের দোষ দিব কী,—তিনি ঐ কোরানশরিফের এক পৃষ্ঠাদর্শী মুসলমানদের দলে মিশিয়া 'শিভালরি' (অবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন) ভুলিয়াছেন! অন্ধভাবে গড্ডালিকা-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন!

সু। তাই বটে। এ-স্থলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই হাসির গানটা আমার মনে পড়ে,—

*'ভেসে যাব যাব হচ্ছি ফাউল ও বিফের বন্যায়'**
এমন সময় দিলেন ঈশ্বর গোটা কত কন্যায়।
ছেড়ে দিলেম পথটা বদলে গেল মতটা
অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরি মতা বদলায়!'

কাজেব। বিলাত-ফেরতাই হও আর আমেরিকা-ফেরতাই হও, দেশ-কালের নিয়ম অনুসারে চলিতেই হইবে। এক-এক দেশের এক-এক পদ্ধতি। এক দেশের রীতি অন্য দেশে চলিবে না। 'ইংলন্ডে প্রতি গৃহে অগ্নিকুণ্ড বারোমাস প্রয়োজন—ভারতে কঠোর শীতকালেও তাহার ততটা আবশ্যক মনে হয় না।'***

সি। তাই নাকি? 'ভারত' অর্থে কেবল কলিকাতা বুঝায় নাকি? দার্জিলিং, সিমলা, মুলতান, কাশ্মির প্রভৃতি দেশে**** 'কঠোর শীতকালেও অগ্নিকুণ্ডের ততটা আবশ্যক মনে হয় না'

কা। শিমলা কাশ্মির শীতপ্রধান স্থান বটে, কিন্তু হিমালয় পর্বতটা ভারতের

* গত কার্তিক মাসের 'নবনূর' দ্রষ্টব্য।
** 'ফাউল ও বিফের বন্যায়,' অর্থাৎ মুরগি ও গো-মাংসের বন্যায়।
*** গত আশ্বিন মাসের 'নবনূর' দ্রষ্টব্য।
**** শিমলা হইতে এ বৎসর (অর্থাৎ ১৩১১ সালে) শীতের জুলুমে লোকে পলায়ন করিয়াছে; কাশ্মীরের পথঘাট তুষারাবৃত।

অন্তর্ভুক্ত নহে।

সি। বটে! যে হিমালয়কে অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই হিমাদ্রিকে—সেই ভারতের আরাধ্য দেবতাকে আজি তুমি বর্বরদোষে ভারত হইতে নির্বাসিত করিলে? আচ্ছা, বৃদ্ধ হিমালয়কে নাহয় তাড়াইলে; কিন্তু আমাদের লাহোর এবং দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি নগরের প্রতি তোমার কী ব্যবস্থা? এগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত কিনা?

কা। ও-সব নগরে ইংলন্ডের মতো শীত হয় না।

সি। ঠিক ইংলন্ডের মতো না হইলেও অগ্নিকুণ্ডের প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বুড়ি খাটিয়ার নিচে 'আঙ্গেটি' (কাঠকয়লার আগুন, তুষ ও ঘুঁটেপূর্ণ হাঁড়ি বিশেষ) রাখিয়া শয়ন করে। একবার ঘুঁটের গন্ধে বিরক্ত হইয়া কোনো বুড়িকে আঙ্গেটি দূর করিতে বলিয়াছিলাম। সে বলিল, 'আমার আঙ্গেটিকে দূর করা যে-কথা, আমাকে এ বাড়ি হইতে তাড়ানোও সেই কথা।' বাস্তবিক শয়নকক্ষে (কেবল কয়লার আগুনের) একটি আঙ্গেটি না রাখিলে ভালোমতে নিদ্রা হয় না—যেন রক্ত পর্যন্ত শীতল হইয়াছে, এইরূপ মনে হয়। তুমি বোধহয় কেবল কলিকাতার শীত (emperature) দেখিয়া সমগ্র ভারতের ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছ!

সু। হাঁ, তাহাই করিয়াছেন। ভাই! তুমি ভুট্টার গাছ দেখিয়াছ? ভুট্টা গাছে নানারঙের ফুল হয়। ইহার পাতা ছাঁটিয়া তোমাদের ইলেকট্রিক পাখার ফলা (blade) প্রস্তুত হয়! আর ইহার গুঁড়ির কাঠে তোমাদের আরাম কেদারা তৈয়ার হয়।

কা। (সহাস্যে) ওগো! তোমরা মহাপণ্ডিত—ভূগোল, খগোল, অদ্ভুদ (উদ্ভিদ) বিদ্যা, রসায়নাদি সমস্ত বিদ্যা তোমাদের কণ্ঠস্থ! তোমাদের মতো পণ্ডিদের সহিত তর্ক করা আমার ভারি অর্বাচীনতা। ক্ষমা কর পণ্ডিত মহাশয়!

সি। কটু বলিলে বা বিদ্রুপ করিলে তর্ক হয় না। যদি তর্কে না পার, যথাবিধি পরাজয় স্বীকার কর।

কা। (সরলভাবে সিদ্ধিকার কথার উত্তর না দিয়া) মহাপণ্ডিতই হও, আর যাহাই হও, তোমরা আমাদের সমতুল্য হইতে পারিবে না—কখনোই না।

সু। সমতুল্য কেন, আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

কা। তা কী হয়? 'মানবের মানসিক বল তাহার brain-এর (মস্তিষ্কের) উপর নির্ভর করে। পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের ব্রেন ওজন ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের ব্রেন অনেক পরিমাণে অধিক।'

সি। তা হউক। বড় বস্তুতে সারভাগ অল্প থাকে। ছোট বস্তু অধিক সারবান হয়। এই দেখ না, রাশিয়া কত বড় মস্ত, আর জাপান কত ক্ষুদ্র—শেষে পোর্ট আর্থার কে লইল? প্রকৃত বীর—প্রকৃত যোদ্ধা কে?

কা। এই রুশ-জাপানের যুদ্ধটা না হইলে তুমি ছোট-বড়র দৃষ্টান্ত কোথায় পাইতে?

সি। দৃষ্টান্তের অভাব হইত?—নিত্য প্রকৃত চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইতেছে! এই দেখ ছোটমরিচ (লঙ্কা) ও বড়মরিচ—একটা ধান মরিচে যত ঝাল হয়, তিনটা বড়মরিচে তত হয় না।

কা। তা? ঝালের পরিমাণ—বিষের পরিমাণ তো তোমাদের ভাগেই বেশি পড়িয়াছে। ক্রূর বুদ্ধি, কূটনীতি, কপটতা, ছলনা—এইসব উপাদানেই তো তোমরা গঠিত। যত দুষ্কর্মের মূল কারণ তোমরা!

সি। হাঁ। যতসব প্রসিদ্ধ ডাকাত আমরাই; যত জালিয়াত, সিঁধেল চোর, রাজদ্রোহী, সব আমরাই! জেলে অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোকই পচে! নমরুদ এবং সুবিখ্যাত তান্তিয়া ভীলও স্ত্রীলোক ছিল!!

কা। দুষ্কর্মে স্ত্রীলোকের হাত প্রকাশ্যে না-থাকুক, মূলে তাহারা থাকে। স্বর্গে তোমরাই আমাদের পতনের পথপ্রদর্শক ছিলে, ট্রয় সমরের তোমরাই নায়িকা, লঙ্কাকাণ্ড তোমাদেরই পদানুসারে ঘটিয়াছিল, কারবালার সে ভীষণ কাণ্ডেও অভিনেত্রী ছিলে'!*

সি। হাঁ, মাবিয়ার কন্যার সহিত হজরত আলীর কন্যার যুদ্ধ হইয়াছিল সেনাপতি ছিলেন হজরতা শহরবানু!!

কা। 'স্ত্রীলোক যে unreasonable (যুক্তিজ্ঞানহীনা) ইহা তাহাদের প্রকৃতি। তোমার প্রতি কথায় যুক্তিহীনতার পরিচয় দাও। পুরুষজাতি স্বভাবতই যুক্তিশক্তিবিশিষ্ট

সু। ঠিক! তাই লঙ্কাকাণ্ডে সীতাদেবীকে অভিনেত্রী বলিয়া তুমি হঠাৎ সব যুক্তিশক্তি ব্যয় করিয়া ফেলিলে! ভাই! একটা উদাহরণ শুন, আমার হাঁপানি রোগ আছে, ডাক্তার আমাকে কলা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মর্তমান কলা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আমি গোটা কত কলার শ্রাদ্ধ করিলাম—অতএব আমার হাঁপানী বৃদ্ধি হইল। এখন বল তো, হাঁপানি বৃদ্ধির জন্য কে দোষী হইল? আমি, না কলা?

কা। তুমি দোষী হইবে, কারণ লোভ সম্বরণ করিতে পার নাই।

সি। দোহাই তোমার যুক্তির!—সব দোষ কলার!! কারণ, কলা সীতাদেবী, সৃষ্টি রাবণ। ভাইয়া! তোমার যুক্তির বলিহারি যাই!!

কা। আচ্ছা, এ-কথা এখন থাকুক। ছোট-বড় সম্বন্ধে আর কী উদাহরণ দিতে পার?

সি। অনেক দিতে পারি;—বঙ্গদেশে বেলফুল বড় বড় হয়, পশ্চিমাঞ্চলে ছোট হয় কিন্তু বঙ্গীয় ফুল (বড় ব্রেন) অপেক্ষা পশ্চিমে ফুলে (ছোট ব্রেনে) গন্ধ বেশি থাকে।

কা। তা থাকিতে পারে, আমি জানি না।

সি। আচ্ছা, বড় লেবু অপেক্ষা ছোট কাগজি লেবু ভালো, এ-কথা স্বীকার কর?

কা। হাঁ, আমরা বাতাবিলেবু, তোমরা কমলালেবু।

সি। অবশ্য! বড় ব্রেন মিছরি, গুড়; ছোট ব্রেন স্যাক্‌সিন, স্যাকারিন!**

কা। আজি যথেষ্ট বকিলাম। এখন উঠি।

সু। কিন্তু তুমি যথেষ্ট পরাজয় স্বীকার কর নাই!

কা। তাহা করিবও না। আমাদের গায়ে জোর বেশি!

ঐ পর্যন্ত বলিয়াই কাজেব প্রস্থান করিলেন।

সুফিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাদের রসনায় জোর বেশি—!'

কাজেব হয়তো তাহা শুনিলেন না।

তবে ভগ্নী পাঠিকা! আমরাও এখন বিদায় হই।

---

* গত আশ্বিন এবং কার্তিক মাসের 'নবনূর' দ্রষ্টব্য।

** 'স্যাক্‌সিন' ও 'স্যাকারিন' অত্যন্ত মিষ্ট চিনি বিশেষ। সাধারণ চিনি অপেক্ষা ইহা ১৬ গুণ (তদপেক্ষাও) অধিক মিষ্ট।

তিন কুঁড়ে

বাল্যকালে গল্প শুনেছিলাম : এক যে ছিলেন রাজা, তাঁর বাড়িতে ছিল তিনজন কুঁড়ে। তারা কোনো কাজ করত না, কেবল দিনরাত শুয়ে থাকত। রাজবাড়ির লঙ্গরখানা থেকে কেউ দয়া করে দুটি-চারটি ভাত এনে দিল, তারা সেইখানে শুয়ে শুয়েই খেয়ে নিত। এইরকমে তাদের অলস জীবন কাটিয়ে দিয়ে তারা কোনোরকমে বেঁচে ছিল। কিছুদিন পরে রাজবাড়ির অন্যান্য চাকররা মনে করল, 'বাহ্, এতো বেশ মজা। এ কুঁড়েরা কোনো কাজ করে না, তবু নিয়মমতো দু-বেলা খেতে পাচ্ছে, তবে আমরা এত খেটে মরি কেন? চল, আজ থেকে আমরাও কুঁড়ে হলুম।' বাস্? এই না বলে তারা সবাই শুয়ে পড়ল।

এদিকে রাজা বাহাদুর দেখলেন, এ তো বড় বিপদ। এখন যে-সমস্ত বাড়িঘর কুঁড়েতে ভরে গেছে। এতগুলি কুঁড়েকে লঙ্গরখানা থেকে কাঁহাতক খাওয়াবেন? আর খাওয়াতে চাইলেও এখন লঙ্গরখানার ভাত রাঁধে কে? সবাই তো 'কুঁড়ে' হয়ে পড়ে আছে। তিনি তখন মন্ত্রীকে ডেকে মন্ত্রণা চাইলেন যে, কী করা যায়? মন্ত্রীমশাই বললেন, 'তাই তো; আমার আসনখানাও আর কেউ ঝেড়েমুছে দিচ্ছে না। (রাজার সিংহাসন তো কেউ মুছতই না, তবে মন্ত্রীমশাইকে চাকররা একটু-আধটু ভয় করত) আচ্ছা মহারাজ! আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি প্রতিকার করছি!'

এই না বলে মন্ত্রীমশাই তখনই একজন খয়েরখাহ চাকরকে হুকুম দিলেন, 'দে বেটা কুঁড়ে-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে!' অমনি বাড়িময় চারিদিকে আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। সেখানে যত কুঁড়ে ঘুমিয়ে ছিল, তারা সবাই ধড়মড় করে জেগে উঠে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করলে। কিন্তু সেই-যে পূর্বের তিন কুঁড়ে ছিল, তারা তখনো উঠল না। যখন তাদের মাথার কাছে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল সেই তীব্র উত্তাপে কাতর হয়ে একজন অপর একজনকে বলল–

১ম কুঁড়ে। দ্যাখ হে ভাই! আজ রবি কত জ্বলে?

২য় কুঁড়ে। কেই আংখি খোলে?

৩য় কুঁড়ে। ঘন ঘন রা' কাড়িস না, বাই বান খেলে।

অবশেষে রাজা যখন দেখলেন যে, এরা হচ্ছে আসল কুঁড়ে-এদের সাহায্য না করলে এরা পুড়ে কাবাব হবে; তখন তিনি লোক-লস্করকে হুকুম দিলেন, ওদের ধরাধরি করে বের করতে। সেপাই-সন্তরীরা তাদের টেনে হিঁচড়ে একটা নিরাপদ পথের ধারে শুইয়ে দিল।

শুনতে পাই, বাঙ্গালা মুল্লুকে নাকি প্রায় পৌণে তিনকোটি মুসলমানের বাস। এঁরা সেই তিন কুঁড়ে—নড়াচড়া, ঝঞ্ঝাফেরা কিছু করেন না; কেবল কুম্ভকর্ণের মতো শুয়ে শুয়ে ঘুম পাড়েন। গত এপ্রিল মাসে যখন কলকাতায়—তথা সারা বাঙ্গালায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন ভীষণ বেগে জ্বলে উঠল, তখন যেখানে যত নকল 'কুঁড়ে' ছিল, তারা সবাই গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে উন্নতির চেষ্টায় লেগে গেল, কিন্তু আমরা তিনকোটি কুঁড়ে সেই পূর্বের মতোই পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছি। 'স্যার' অমুক দয়া করে দু-চারটা চাকুরি জুটিয়ে দিবেন, শেঠ অমুক খয়রাত-ফান্ড থেকে কিছু দান করবেন—তাতেই কোনোরকমে আমাদের দিন কেটে যাবে। তারপর গোনা দিন কয়টা শেষ হলে পরকালে বেহেস্ত তো আমাদের জন্যই রিজার্ভ হয়ে আছে! সেখানে আমরা ছাড়া আর

কে যাবে? চারদিনের দুনিয়া, ইহাকে চায় কে? কোনোমতে ভবনদী অনন্তকালের জন্য অফুরন্ত বেহেস্ত আর অসংখ্য হুরী!!

গত ২৯ নভেম্বর একজন বোম্বাইয়ের মহিলা আমাদের স্কুল দেখতে [illegible] কতক্ষণ এদিক-ওদিক ফিরে দেখার পর তিনি আমায় বললেন, 'মাফ [illegible] আপনাদের বাঙালি মুসলমানদের মতো অকর্মণ্য এবং জুয়াচোর আর কোথাও [illegible] ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির মতওয়াল্লিরা টাকা ভেঙে আত্মসাৎ করেন। এইতে [illegible] ইলেকশনের সময় একজন মোটাগোছের মতওয়াল্লি দশহাজার টাকার মদ কিনে খেলেন ও বন্ধুদের খাওয়ালেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি।—যদি আপনি এই কথা বলছেন, তবে আমাকেও অনুমতি দিন, বোম্বের লোকের কথা কিছু বলি। শেঠ ছোটানি খিলাফত ফান্ডের ১৬,০০,০০০ টাকা—

বোম্বেয়ে মহিলাটি আমার কথায় বাধা দিয়ে শেঠ সাহেবের পক্ষ সমর্থন করে বল্লেন, তাতে আমি বেশ বুঝলুম, শেঠ সাহেব হুজুগে পড়ে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে টাকাগুলো নষ্ট করেছেন। তারপর তিনি পুনরায় মাফ চেয়ে আমাকে জুতা মারতে আরম্ভ করলেন; যথা—

বোম্বেয়ে মহিলা।—দেখুন, আমি নিজের জাতের বড়াই করতে চাই না; তবে বস্তুঘটনার কথা বলছি। এতবড় কলকাতা শহরের বাঙালি মুসলমানদের কয়টা প্রতিষ্ঠান, মোসাফেরখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি আছে? এখানে যা-কিছু আছে, সব বোম্বাইয়ের এই দিল্লিঅলা সওদাগরদের। সবচেয়ে বড় মসজিদটা—যেটাকে বাঙ্গালার গবর্নর বাহাদুর নত-মস্তকে মেনে নিয়েছেন, সেটাও বাঙালিদের নয়। এখানে দশটা এতিমখানা হলেও সব দুঃস্থ গরিবের অভাব মোচন হত না—তবু সে-স্থলে যে একটা মাত্র আছে, তাও বোম্বের লোকদের দ্বারা পরিচালিত। .....কী লজ্জার বিষয়, এই কলকাতার বাঙালি মুসলমান মেয়েদের জন্য এমন একটা বালিকা-স্কুল নাই, যাতে তারা বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভ করতে পারে! এই ধরুন না, আপনাদের এই স্কুলটা—ষোল বৎসর হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত এটাকে না পারলেন হাইস্কুল করতে, না পারলেন বোর্ডিং হাউস খুলতে।*

আমি।—এখানকার মেয়েরা একটু বড় হলেই পরদার অনুরোধে তাদের বাপ-মা স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। হাইস্কুলে পড়বে কে?

বো—ম। মাফ করবেন, অমন কথা বলবেন না। মেয়েরা লরেটো, কনভেন্ট, ডায়োসেসন এবং অন্যান্য অমুসলিম স্কুলে যেয়ে প্রকৃত ধর্মভাবের মাথা খাচ্ছে। এই তো দু-বছর হল, আপনাদের গ্রামের একটি মেয়ে কোনো মুসলমানদের বাড়িতে বা বোর্ডিং হাউসে স্থান না-পেয়ে নিতান্ত দীনভাবে বহু কষ্টে বেথুন কলেজে আশ্রয় নিয়ে বি. এ. পাস করেন। ...আর পরদার কথা বলছেন? পরদার আমাদের বোম্বাইয়ে যথেষ্ট আছে। নাই—বরং আপনাদেরই। সকল রকম অধিকার বঞ্চিতা হয়ে চার দেওয়ালের মাঝখানে বন্দিনী হয়ে থাকার নাম পরদা নয়। আপনারা কোরানশরিফ পড়েন কি? না শুধু তাবিজ (হোমায়েল শরিফ) করে গলায় ঝুলিয়ে রাখেন?

ফল কথা, আমি উক্ত বোম্বেয়ে মহিলার কথা-কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়লুম কিন্তু জানি না, উপরোক্ত কথার খোঁচার আসল তিন (কোটি) কুঁড়ের গায়ের কোথাও একটু আঁচড় লাগবে কিনা!!

---

* আপাতত চল্লিশজন বাঙালি শিক্ষার্থিনী ছাত্রী পাইলে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা স্কুলে বাঙ্গালা শাখা খোলা যাইবে।

পরী ঢিবি

মসুরী পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া এই সুন্দর সুদৃশ্য ক্ষুদ্র পাহাড়টুকুর নাম না শুনিয়াছে, এমন কে আছে? ইহাকে ইংরাজিতে ''Witches Hill' বলে। এই পাহাড়ের ইংরাজি ও দেশী নামে চমৎকার সাদৃশ্য দেখা যায়। 'পরী ঢিবি' শুনিলেই সেই শৈশবকালীন শ্রুত রূপকথার দৈত্য, পরী এবং পরীস্থানের কথা মনে পড়ে। আর 'Witches Hill'-এর অর্থও 'জাদুকরির পাহাড়'। সুতরাং এই নামের কারণ অনুসন্ধান করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতই মনে জাগরূক হয়।

উপরোক্ত ভাবের আবেশে একদিন আমি বন্ধুবর মি. শফিকের সহিত মহা তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তর্কের বিষয় ছিল এই যে, উক্ত উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ে কখনো দৈত্য-পরী অবস্থান করিত কিনা এবং এখনো কি পরীঢিবিতে পরী বাস করে? অনেকক্ষণ তর্কের পর ধার্য হইল যে, আগামীকল্য অতি প্রত্যুষে পরী ঢিবিতে বেড়াইতে যাওয়া হউক এবং এমন কোনো অন্ধকার গুহার অন্বেষণ করা যাউক যদ্দ্বরা পরীস্থানে যাইবার পথ পাওয়া যায়।

পরদিন শফিক ও আমি প্রাতকালে ৫টার সময় পকেট ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে বিভিন্ন টিলা অতিক্রম করিয়া পরীঢিবিতে পরীস্থানের কল্পনা করিতে করিতে রকউড কলেজের সন্নিহিত রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। আকাশ পরিষ্কার ছিল—একখণ্ড মেঘও ছিল না। আমরা এই হাজার দেড় হাজার ফিট উচ্চতায় দাঁড়াইয়া দৈত্যকুলের সম্মুখীন হইতে ও আবশ্যক হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। আমার বন্ধুটি (শফিক) স্বভাবকবি, তিনি পথে কল্পিতা পরীদের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

রকউড কলেজের পশ্চাৎ দিক অতিক্রম করিয়া শেষে আমরা সেই সুউচ্চ পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া পড়িলাম। এই স্থান হইতে খাড়া চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথে ১৫ মিনিট পর্যন্ত উঠিবার পর ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আমরা বিশ্রামার্থে থামিলাম। স্থানটি অতি সুন্দর। চতুষ্পার্শ্বস্থিত দৃশ্যাবলি অত্যন্ত মনোহর। চতুর্দিকে হরিৎ দুর্বাক্ষেত্র দেখা যাইতেছিল—পঞ্চাশ গজ দূরে পাদপ শ্রেণী ছিল। সেখানে গিয়া আমরা গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আমার সিগারেট তখনো খাওয়া শেষ হয় নাই, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ আসিয়া হাত দিয়া আমার চক্ষু ঢাকিল। আমি আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম, 'শফিক! তুমি কী ছেলেমি কর। এইকি তামাশা করিবার—' আমার মুখের কথা শেষ না হইতেই কিছু দূরে শফিকের কণ্ঠস্বর শুনিলাম—'you are a fool শহীদ!' আমাকে 'ফুল' বলা শফিকের উচিত কি অনুচিত তাহা ভাবিবার সময় ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, শফিকও ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে। সর্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি যাহার প্রতি পড়িল, তাহা পঞ্চপরীর একটি গুচ্ছ ছিল—সত্যিকার পরী! ঠিক তেমনই অবয়ব, তেমনই পোশাক—যেরূপ গল্পে পাঠ করিয়াছি এবং ছবিতে দেখিয়াছি। নানাবিধ পরীর গল্পে এবং শেক্সপিয়ারের 'Mid Summer Night's Dream'-এ যাহা পাঠ করিয়াছি—সেই দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে আসিতে বারম্বার চক্ষু রগড়াইয়া ভালো করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, 'হে আল্লাহ! ইহা স্বপ্ন দেখিতেছি, না আমি জাগ্রত!'*

ইতিমধ্যে জনৈকা পরী অগ্রসর হইয়া ইংরাজিতে দুঃখের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, এমন অসাবধানভাবে পরীস্থানের মহারাজা বখত আজম শাহ-এর রাজ্যের উপত্যকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন কেন? আপনারা কী জানেন না যে, আমাদের রাজকুমারী 'মমতাজ গুল'-এর বেড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে? তিনি মহারাজা বখত্ আজম এবং মহারানি 'মিহির গুল'-এর একমাত্র কন্যা।'

আমি ও শফিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে লাগিলাম। ইংরাজি ভাষায় কথা বলে, এ কেমন পরী? আর ইহাদের এশিয়াই নামই বা কেন? হঠাৎ মনে পড়িল, পরীগণ সকল প্রকার ভাষা জানে। আর সম্ভবত আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আমাদের সম্বন্ধে ইহাদের ভ্রান্তধারণা জন্মিয়াছে। আমি শশব্যস্তে টুপি খুলিয়া ইংরাজি ধরনে অভিবাদন করিয়া উত্তর দিলাম—'সুন্দরী মহিলা! আমার বন্ধু মিস্টার শফিক এবং আমি আপনাদের দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি এবং আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম যে, আমরা অজ্ঞাতসারে অনধিকার প্রবেশের অপরাধ করিয়াছি। যদি জানিতাম যে, এ-স্থান কাহারও নিজস্ব, তাহা হইলে কখনোই এদিকে আসিতাম না, যদিও তাহাতে আমরা আপনাদের সহিত আলাপ করিবার সুখে বঞ্চিত থাকিতাম। যদি আপনাদের সঙ্গে রাজকুমারী মমতাজ গুল উপস্থিত থাকিয়া থাকেন, আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধার সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি—যাহা প্রকৃত ভদ্রলোকের করা উচিত।'

প্রথমা পরী উত্তর দিল—'এখন আপনারা এত সহজে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। রাজকুমারী এখানে উপস্থিত নাই; কিন্তু অতি নিকটেই একটা পাহাড়ের উপর বিশেষ একটি সাম্বৎসরিক উৎসব করিতেছেন। আপনাদের উভয়কে তথায় যাইতে হইবে। রাজকুমারী স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা বিবেচনা করিবেন, তাহাই মানিতে হইবে।'

আমরা উভয়ে একবাক্যে বলিয়া উঠিলাম—'রাজি'। শাস্তির ভয় অপেক্ষা পরীদের উৎসব দেখিবার আগ্রহই বলবতী হইয়াছিল।

পরীগণ অগ্রসর হইয়া আমাদের চক্ষে রুমাল বাঁধিতে লাগিল, 'ভদ্রলোকের ন্যায় আপনারা সসম্মানে শপথ করুন যে, পথে যাইবার সময় আপনারা কিছু দেখিতে চেষ্টা করিবেন না।' আমরা তাহাই করিলাম। এখানে আমাদের যাত্রা এইরূপে আরম্ভ হইল যে, এক পরী আমার দক্ষিণ হস্ত এবং অন্য পরী আমার বাম হস্ত ধরিয়াছিল—সম্ভবত এইরূপে দুই পরী শফিককেও ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। আমি কিছুই দেখি নাই—কারণ দেখিবার অনুমতি ছিল না।

আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছিল যে, এ কেমন পরী যে উড়ে না এবং আমাদিগকেও উড়াইয়া না লইয়া পায়ে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। শরতের এই পরিষ্কার আকাশে উড়িতে বেশ লাগিত। কিন্তু কিছু বলিবার সাহস হইল না। কারণ ভয় ছিল যে, কোনোপ্রকার আপত্তি আমাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দিবে। প্রায় দশ মিনিট পরে সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, এখন আমরা রাজকুমারীর উৎসবগৃহের নিকটে আসিলাম।

ক্রমে সঙ্গীতধ্বনি নিকটবর্তী হইলে উভয় পরী—যাহারা মুনকির-নকিরের মতো আমার দক্ষিণ ও বামে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে—আমার চক্ষু হইতে রুমাল খুলিল। দেখিলাম, অতি অপূর্ব দৃশ্য! পঁচিশ-ত্রিশজন পরী নানারঙের পরিচ্ছদে সুশোভিতা হইয়া অতি নিপুণতার

• পরী ঢিবিতে যাত্রার প্রারম্ভে শফিক বলিয়াছিলেন যে, আমরা দৈত্যদের সম্মুখীন হইতে এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলাম। এখন মাত্র পাঁচজন পরীকে দেখিয়াই হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন! দৈত্যের সহিত যুদ্ধ তো অনেক দূরের কথা।

সহিত আধুনিক ইংরাজি নৃত্য 'ফক্সট্রয়েট' নাচিতেছিল। তাহাদের মধ্যে হরিদ্বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া একজন অসামান্য রূপসী বালিকা ছিলেন। তাঁহার মুকুট ছিল, যাহা মরকত-মণি দ্বারা ভূষিত বলিয়া মনে হইল। আলোকরশ্মি সেই মণিমাণিক্য-শোভিত মুকুটে পড়িয়া এক অভিনব আলোকরাজ্য রচনা করিয়াছে। একদিকে তিনচারিজন পরী ধরাসনে বসিয়া বেহালা, সেতার, বাঞ্জো এবং ক্লারিওনেট বাজাইতেছিল।

শফিক ও আমি স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গিনী পরীগণও নৃত্যে যোগদান করিল।

পাঁচ-ছয় মিনিট পর্যন্ত আমরা মুগ্ধনেত্রে ঐ দৃশ্য দেখিবার পর কিয়ৎকাল বিশ্রামের জন্য নৃত্যগীত থামিল। আমাদের সঙ্গে যে-পরীরা আসিয়াছিল, তাহাদের একজন রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার কানে কানে কী বলিল। তিনি মৃদুহাস্যে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—'আপনারা ভারি অন্যায়, এমনকি বড় ভারি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন; ইহার শাস্তিও তদ্রূপ কঠোর হইবে। অর্থাৎ আপনাদিগকে আমাদের সঙ্গে নাচিতে হইবে।'

চার্জ ফ্রেম করা ও সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আমরা উভয়ে কাঠ হইয়া গেলাম! আমাদের জন্য এ শাস্তি বাস্তবিকই কঠোর ছিল। কারণ আমরা নাচিতে জানিলে তো নাচিব! আমি তাড়াতাড়ি সবিনয় করপুটে বলিলাম—'সুন্দরী রাজকুমারী মমতাজগুল! আমার বন্ধু এবং আমি বড় দুঃখিত যে, আমরা নাচিতে জানি না। কিন্তু আমার বন্ধু গানে ওস্তাদ। আপনি যদি অনুমতি করেন, তো আমরা পালাক্রমে গাহিতে পারি।'

আমার কথায় পরীগণ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রাজকুমারী ভালো গান শুনিবার আশায় আমাদিগকে অগ্রিম ধন্যবাদ দিয়া ফেলিলেন। অতঃপর শফিক ও আমি বাদ্যকারিণী পরীদের নিকট গিয়া বসিলাম এবং পালাক্রমে হাফেজ, গালেব, খসরু এবং মীর সাহেবের কয়েকটা গজল গাহিলাম। প্রত্যেকটি গানের সমাপ্তিতে পরীগণ অতি জোরে করতালি দিতেছিল! অবশেষে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং আমি বলিলাম,—'মাননীয়া রাজকুমারী! এখন আমরা বিদায় হই।'

তখন সমস্ত গীত-বাদ্য থামিয়া গেল। রাজকুমারী সুমধুর মৃদুহাস্যে বলিলেন,— 'মেসার্স শহীদ অ্যান্ড শফিক। আমি মমতাজগুল এবং উপস্থিত পরীবৃন্দ আপনাদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনারা অতি সুন্দর গানে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কিন্তু আপনারা কি এখনো রকউড কলেজের ছাত্রীবৃন্দকে এই সুন্দর ছদ্মবেশ ধারণের ও 'ফ্যান্সি ড্রেস পিকনিক,-এর জন্য শুভইচ্ছা (মোবারকবাদ) জ্ঞাপন করিবেন না?' ইহা শুনিয়া সকলে উচ্চহাস্য করিলেন।

দ্বিতীয়বার আমরা পরস্পরের মুখ অবলোকন করিলাম—ইহারা তবে পরী নয়—সত্যিকার মানুষ! পরে আমরাও প্রাণ ভরিয়া উচ্চহাস্য করিলাম। পরে আমি বলিলাম—'আমরা আপনাদিগকে একবার নয়, শত-সহস্রবার মোবারকবাদ জানাইতেছি। আমরা আপনাদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, আমাদের পরীটিবি ভ্রমণকে আপনারা আমাদের আশার অতিরিক্ত মনোরম করিয়া দিলেন।'

পরে আমি যখন আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলাম, তখন তাহারা খুব হাসিলেন। অতঃপর সকলের সহিত করমর্দন করিয়া এবং পুনরায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা বিদায় হইলাম!!*

* কোনো একখানি উর্দু পত্রিকা হইতে অনূদিত।--লেখিকা।

বলিগর্ত
(নির্জলা সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

কলেজ বন্ধ হইয়াছে। গরমের ছুটি। বারান্দায় বসিয়া আছি। হঠাৎ দেখি—কমলা দি হাঁপাইতে হাঁপাইতে সিঁড়ি ভাঙিয়া আসিলেন। কমলা দেবী কংগ্রেস সেবিকা; চরকা ও খদ্দর প্রচার তাঁহার ব্রত। তাঁহার সঙ্গে জাহেদা বিবি নাম্নী একজন মুসলিম মহিলাও আসিয়াছেন। কমলা একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়াই বলিলেন—'সব দেশ ঘুরিয়া করিয়াছি, এখন চল বলিগর্তে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সে আবার কোথায়?'

জাহেদা উত্তর দিলেন, 'সে আমার মামার বাড়ি, মামা নেই, এখন মামাতো ভাইদের রাজত্ব।'

আমি। বেশ তো, খুব সহজেই চরকার প্রচলন করিতে পারিবেন।

কমলা। ও হো! তুমি যত সহজ মনে করিয়াছ, তাহা নয়। সে গ্রাম অত্যন্ত দুর্গম, তাহার উপর সেখানে জাহেদার প্রবেশ নিষেধ।

আমি। তার অপরাধ?

কমলা। আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, একটু লেখাপড়া জানে, খদ্দর পরে, নিরামিষ খায়।

আমি। তাহলে নাইবা গেলে বলিগর্তে। বিশেষত, যাঁর মামাতো ভাই-এর বাড়ি তাঁরই যখন প্রবেশ নিষেধ।

কমলা। তা কী হয়? আমি যে কমলা—সর্বত্র আমার অবারিত দ্বার। বিশেষত ঐ প্রবেশ নিষেধ বলিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। আর তোমাকে আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।

আমি। না ভাই! তোমরাই যাও।

কমলা। আ রে! তুমি না-গেলে আমাদের আমোদ ভালো জমিবে না। চরকা চালাইতে পারিলে মিসিস্ খট্‌খটেদের হাতের তৈরি সূতায় প্রস্তুত প্রথম খদ্দরখান তোমাকে দিব। বলিগর্তের জমিদার খাঁ বাহাদুর কশাই-উদ্দীন খট্‌খটের দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে এখন কলিকাতায় আছেন। চল্ তাঁহার সহিত দেখা করিয়া সব ঠিকঠাক করিয়া আসি। ওঠ বীণা! লক্ষ্মীটি! চল শিগ্‌গির।

অগত্যা আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিস্টার ফর্‌ফরের বাসায় গেলাম। তাঁহার আর দুইটি ভাইও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত আদর-আপ্যায়নে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমি মনে মনে অশ্চর্য হইলাম যে, এত আদর-যত্ন পাইয়াও কেন জাহেদা বিবি বলেন যে, মামাতো ভাই-এর বাড়িতে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। হাঁ, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এই দেওয়ান মিস্টার জাহেরদার ফর্‌ফরে জমিদারের সহোদর এবং অপর দুই ভদ্রলোক তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই। ইঁহারা কেহই জমিদারির অংশ পান নাই, মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

জাহেদা বলিগর্তে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র মি. ফর্‌ফরে প্রাণ খুলিয়া

বলিলেন, —'হাঁ বুবু! চল। তোমার মামার বাড়ি, তুমি আমাদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখ? তুমি যখন বলিবে, আমি স্বয়ং আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব, আমি নিজে না আসিতে পারিলে ইহাদের (ভাইদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) দুইজনের একজনকে পাঠাইয়া দিব। তুমি কখন যাইবে, বল? তুমি যে-মুহূর্তে সংবাদ দিবে, তখনই ইহাদের কেহ আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে।

জাহেদা। ভাই! আমি তো একা যাইব না; এই কমলা দিদি এবং বীণাপাণি দেবীও আমার সঙ্গে যাইবেন। আমাদের সকলের পাথেয়.....

মি. ফরফরে।—কোনো চিন্তা নাই, বুবু! তুমি দ্বিধা-সঙ্কোচ করিও না। চলুন সকলে, আমাদের মাথায় থাকিবেন। আপনাদের দেখিলে ভাইসাহেব অত্যন্ত সুখী হইবেন।

অতঃপর আমরা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মি. ফরফরে স্ব-স্থানে ফিরিয়া গেলেন। তিনি গুপ্তপুর জেলার টাউনে থাকেন। গুপ্তপুর হইতে বলিগর্ত চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে। বলিগর্তে মি. খটখটেকে এখনো আমাদের বিষয় জানানো হয় নাই; জাহেদা মি. ফরফরের সঙ্গেই পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। যাইবার তারিখ ঠিক করিয়া জাহেদা বিবি মি. ফরফরেকে কোনো ভাইকে পাঠাইতে লেখায় তিনি উত্তর দিলেন যে, তাহারা উভয়ে বলিগর্তে চলিয়া গিয়াছে, বকর-ঈদের পূর্বে ফিরিবে না; বিশেষত এসময় দাঙ্গাহাঙ্গামার ভয় আছে। তাই খাঁ বাহাদুর খটখটে কাহাকেও ঘরের বাহির হইতে দিবেন না। জাহেদা যদি অপর কাহারো সহিত গুপ্তপুর যান, তবে তিনি তথা হইতে সহজেই তাঁহাদিগকে বলিগর্তে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। তাঁহারা গেলে খটখটে ভাইসাহেব বড়ই সুখী হইবেন।.....

পরে জাহেদা লিখিলেন যে, পাথেয় পাইলে তাঁহারা রওয়ানা হইতে পারেন। উত্তর আসিল যে, তাঁহার ন্যায় দরিদ্র লোক অত টাকা কোথায় পাইবেন?

তবে খাঁ বাহাদুর খটখটে ইচ্ছা করিলে ৫০০ টাকাও দিতে পারেন। যাহা হউক, জাহেদা ভাবিলেন, বলিগর্তে পৌঁছিলে আর টাকার অভাব হইবে না।

যথাসময়ে আমরা যাত্রা করিলাম। গুপ্তপুর যাইবার পূর্বে পথে বিষ্ণুগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়িতে এক সপ্তাহের জন্য অতিথি হইলাম। বিষ্ণুগঞ্জ হইতে গুপ্তপুর মাত্র ৮-১০ মাইলের পথ। লোকে দৈনিক দুই-তিনবার যাতায়াত করে। বিষ্ণুগঞ্জে অবস্থিতি কালে আমরা জানিতে পারিলাম, মি. ফরফরে নিজকে বড়ই বিপন্ন মনে করিতেছেন; আর আমরা যাহাতে বলিগর্তে যাইতে না পারি, তজ্জন্য প্রাণপণে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লজ্জায় জাহেদা বিবির মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বলিলেন—'কিছুতেই ছাড়িব না—বলিগর্তে নিশ্চয়ই যাইব, যাই আগে গুপ্তপুরে। মি. ফরফরে তাঁহার ভ্রাতার এত প্রশংসা করিয়াছেন—এহেন ধার্মিক সাধক মহাপুরুষকে একবার দেখিতেই হইবে।'

অতঃপর আমরা গুপ্তপুরে গেলাম। কিন্তু জাহেদা বিবি আমাদের লইয়া অন্যত্র গেলেন—মি. ফরফরের বাড়ি যাইতে দিলেন না। দুই-তিনদিন পরে ভদ্রতার অনুরোধে মি. ফরফরে আমাদের বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া দুই দিনের জন্য লইয়া গেলেন। তথায় মি. ফরফরে এবং তাঁহার স্ত্রী ডালিমকড়া আমাদিগকে বলিগর্ত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা এইঃ

এখন বলিগর্তে যাইবার কোনো পথ নাই—খানা, ডোবা ইত্যাদি কাদায় পূর্ণ। জল

প্রচুর নহে বলিয়া নৌকা চলিতে পারে না। পথ শুষ্ক এবং সমতল নহে বলিয়া [illegible] ও মোটর চলিতে পারে না। পথের কোনো স্থান আবার পাহাড়ের মতো উচ্চ। [illegible] গৌরীশঙ্কর আরোহণের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এখন কেহই বলিগর্তে অবতরণের [illegible] করিতে সাহস পায় না। সে অনেক কষ্ট—অনেক কষ্টে জেলে-ডিঙি বা অপর কোনো বাহনে বলিগর্তের পত্রাদি শহরে আইসে। আপনারা পথের অত কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবেন না। আর যদি বহু কষ্ট করিয়া যান, তবে থাকিবেন কোথায়?

খাঁ বাহাদুর খটখটের বিশাল প্রাসাদে ছাগল, গরু, ভেড়া, মুরগি ইত্যাদি থাকে। অঙ্গনে দিনে-দুপুরে সর্প-বৃশ্চিক কিলবিল করে। সন্ধ্যার পরে এক জাতি পতঙ্গ উড়ে -তাহারা এমন দংশন করে—উহ্! হাত-পা ফুলিয়া যায় আর চুলকাইতে চুলকাইতে প্রাণ যায়। খাঁ বাহাদুর মশারির ভিতর বসিয়া ভাত খান—এই তো অবস্থা। আর তিনি স্বয়ং দোতলায় থাকেন। দোতলায় বেশি কামরা নাই যে, আপনাদের স্থান দিতে পারিবেন। তাঁহার তিনজন স্ত্রী তিন সুট ঘর দখল করিয়া আছেন। তাঁহারা সকলেই দোতলায় একরূপ বন্দি অবস্থায় থাকেন। মি. খট্‌খটেকে একটা চেয়ার বসাইয়া বহিবাটিতে লইয়া যাওয়া হয়। চাকরেরা তাঁহাকে চেয়ারে বহিয়াই ইতস্তত লইয়া বেড়ায়—তিনি স্বয়ং কখনো মাটিতে পা রাখেন না, পাছে সাপে কামড়ায়। মি. খট্‌খটে পরম ধার্মিক—দিবানিশি কোরআন, হাদিস, তফসির এবং তস্‌বিহ্ লইয়া থাকেন—জমিদারি না দেখিলেই নয়, তাই অতটুকু সাংসারিক কাজ করেন। মুসলমান ধর্মীয় শাস্ত্রে সুদ প্রদান করা এবং গ্রহণ করা উভয়ই সমান পাপ। দরিদ্র প্রজাবৃন্দ অন্যত্র টাকা ধার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ধার করে। তিনি অতি উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করেন; কারণ শাস্ত্রে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং ধর্ম বিনিময়ে সুদ লইতে হয়; ধর্ম কি এমন শস্তা যে, তাহা অল্পমূল্যে বিক্রয় করা যায়? তাঁহার বাড়ির সকলেই—বাঁদী, গোলাম পর্যন্ত অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক। তাহারা হাদিসের অতি অস্পষ্ট কিম্বদন্তিও অতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। কবে কোন্ কাফের জিহ্বা চাঁচিয়া কুল্লি করিয়াছিল, সেইজন্য সে বাড়ির কেহ মুখ ধুইবার সময় জিভ-ছোলা দ্বারা জিভ্ পরিষ্কার করেন না।

জেহাদের পুণ্য অর্জনের নিমিত্ত তাঁহারা বাড়ির দাসী এবং প্রজাদের ধরিয়া আনিয়া নির্মমভাবে প্রহার করেন। পাঠিকা শুনিয়া আশ্চর্য হইতে পারেন যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আমলেও বহু দেশে 'দাসী' আছে! ঐসব দাসী প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে ক্রীতা হয় নাই; ইহারা দরিদ্র প্রজার ঘর হইতে ছলে-বলে-কৌশলে ধরিয়া আনা দাসী। এইরূপে বাড়ির বিবিগণ বাঁদী মারিয়া এবং খাঁ বাহাদুর প্রজা ঠেঙাইয়া জেহাদের পুণ্য অর্জন করিয়া থাকেন। কালেভদ্রে যদি কোনো দাসী কোনোপ্রকারে পায়খানার নর্দমা গলাইয়া পলায়ন করে, তবে তাহাতে খাঁ বাহাদুর বাঁদী 'আজাদ' (অর্থাৎ মুক্তিদান) করার পুণ্য লাভ করেন।

পুণ্যশ্লোক খাঁ বাহাদুর অবরোধ প্রথারও ঘোর পক্ষপাতী। একবার চিকিৎসার নিমিত্ত তিনি গুপ্তপুরে সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার কিশোরী বিধবা ভগিনী এবং কতিপয় ভাগিনেয়ী আবদার করিল যে, তাহাদিগকে একবার বাড়ির মোটরগাড়িতে করিয়া গুপ্তপুর শহরটা দেখাইয়া আনিতে হইবে। অগত্যা মোটরগাড়িটা মোটা বোম্বাই চাদরে সম্পূর্ণ জড়াইয়া তাহার ভিতর বিবিদের বসাইয়া সমস্ত শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বেচারিগণ আবছায়ার মতো সামান্য সূর্যের আলো

ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পায় নাই। তথাপি মি. খট্‌খটে তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা মোটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়াছ, সেজন্য এখনই আমার সম্মুখে 'তওবা' (অনুতাপ) কর এবং প্রতিজ্ঞা কর জীবনে আর কখনো মোটরে উঠিতে চাহিবে না।'

মি. জাহেরদার ফর্‌ফরে খাঁ বাহাদুর খট্‌খটের সহোদর ভাই কিনা, তাই তিনিও পরম ধার্মিক। শরিয়তের অতি তুচ্ছ কিম্বদন্তিও তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন। তাঁহার মতে মানুষের ফটো তোলা ভয়ানক পাপকার্য। তিনি গুপ্তপুরের একটি অনাথ-আশ্রমের সেক্রেটারি হইয়া বহু পুণ্য (ছোটলোকে বলে বহু টাকা) অর্জন করিতেছেন। আমরা পরস্পরে শুনিতে পাইলাম, একদা তিনি উক্ত অনাথ-আশ্রমে বঙ্গের লাটবাহাদুরকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লাটবাহাদুর বিদায় হইলে পর তাঁহার কতিপয় বন্ধু লাটসাহেবের সহিত তাঁহাদের একটা গ্রুপফটো তোলা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করায় মি. ফর্‌ফরে বলিলেন, 'তাই তো ভাই, এমন প্রয়োজনীয় কথাটা আমাকে একটু পূর্বে স্মরণ করাইয়া দিলে না। সমস্ত কার্যই হইয়া গেল, শুধু এই অত্যাবশ্যক কাজটি বাদ পড়িল। আজ এই মস্ত ভুলটার জন্য আমার কিরূপ আক্ষেপ হইতেছে, তাহা আমি কথায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।' তাঁহার এই উক্তি শ্রবণে জনৈক দুষ্টবুদ্ধি লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া উপস্থিত সমস্ত ভদ্রলোককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এতদিন আমরা জানিতাম যে, আমাদের বন্ধুবর মি. ফর্‌ফরের মতে মানুষের ফটো তোলা বেজায় অমার্জনীয় পাপ। কিন্তু আমাদের সে বন্ধুবরের মতেই দেখিতেছি যে, লাটসাহেবের ফটো তোলায় কোনো পাপ নাই, বরং উহাতে পুণ্যার্জনই হয়।' (সকলের হাস্য) নিমন্ত্রণের দিন লাটসাহেব মি. ফর্‌ফরের কাজের প্রশংসা করিয়া দু-ছত্র লিখিয়া গেলেন। মি. ফর্‌ফরে সেই দু-ছত্রের দম্ভে ফুলিয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়া গেলেন। তিনি শুধু ফুলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বরং তিনি সেই দু-ছত্র লেখা অবলম্বনে একখানি ৮-১০ পেজি বই ছাপাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর সেই বই প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিতে তাঁহার দুইদিন অফিস কামাই হইল। তিনি সকলের নিকট বলিতে লাগিলেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট?....সে তো একজন Petty officer! কমিশনার?... সে তো একজন নগণ্য চাকর। আমি কি উহাদিগকে 'কেয়ার' করি? বরঞ্চ তাহারাই আমার সম্মান করিতে বাধ্য, কারণ আজকাল আমার পত্র-ব্যবহার (Communication) স্বয়ং লাটবাহাদুরের সঙ্গে হয়।' ইত্যাদি।

মি. খট্‌খটে পুরুষের জন্য চারি বিবাহ করা অতি প্রয়োজনীয় 'সুন্নত' মনে করেন; আর হিন্দুয়ানি সকল প্রথাকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু নিজের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহের প্রস্তাবে এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, 'আমরা যখন হিন্দুর দেশে আছি, তখন তাহাদের আচার-নিয়মের সম্মানপ্রদর্শন করিতে আমরা বাধ্য। কোনো সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বিধবার বিবাহ হয় না।' ইত্যাদি।

খাঁ বাহাদুর স্বয়ং তিন স্ত্রীর ভার বহন করিতেছেন; চতুর্থ স্ত্রীর স্থান রিজার্ভ করা ছিল একটি অসামান্য রূপসী জমিদার-কন্যার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত কোনো কোনো দিন তিনি সুরার মত্ততায় বোতল হস্তে গুপ্তপুরের পথে ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। দুষ্ট লোকেরা সেই কথাটুকু উপরোক্ত জমিদারগৃহিণীকে বলিয়া দেয়। ফলে সে বিবাহ ফসকাইয়া গেল। আজ পর্যন্ত তাঁহার চতুর্থা স্ত্রীর পদটা শূন্যই আছে; যেহেতু এখন (তিনি ব্যাধি-ভোগে চলচ্ছক্তিহীন হওয়ায়) আর কোনো 'চোক খাগী' তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত নয়।

খাঁ বাহাদুর খটখটের ভূরি ভূরি গুণের মধ্যে একতম গুণ এই যে, [illegible] বন্দোবস্তি লোক। বর্ষার সময় চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বাজারে সহজপ্রাপ্য [illegible] তিনি পূর্বেই সমস্ত জিনিস পর্যাপ্ত ক্রয় করিয়া রাখেন। ধান এত অধিক পরিমাণে [illegible] থাকে যে, পরে ধানের গাছ গজাইয়া সে গোলাটাই ধানের ক্ষেত হইয়া যায়। [illegible] নারিকেল গাছে দালানের প্রায় প্রত্যেক কামরাই পরিপূর্ণ। আলুর গাছগুলি ক্রমশ [illegible] মি. খটখটের দোতালা পর্যন্ত উঠিয়াছে।

বলিগর্তের 'ডব্লিউ সি' (পায়খানা) সম্বন্ধে ভগিনী ডালিমকড়া (মিসিস ফরফরা) [illegible] বর্ণনা করিলেন, তাহা নিতান্ত রুচি-বিরুদ্ধ বলিয়া তৎসম্বন্ধে আমরা মসি-কাগজ [illegible] করিলাম না।

মি. খটখটে সম্প্রতি আজরাইল নামক জনৈক হাকিমের চিকিৎসাধীন আছেন। [illegible] সাহেব প্রতি সপ্তাহে ২০০ টাকা দর্শনী পাইয়া থাকেন। শুনিয়াছি, এই চিকিৎসার ফল [illegible] বাহাদুর অতি দ্রুতগতি 'মোকাম মাহমুদা' (স্বর্গের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠের) দিকে অ [illegible] হইতেছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার দ্রুত আরোগ্য কামনা করিয়া মিস্টার ও [illegible] ফরফরার নিকট বিদায় লইয়া আসিলাম।

গাড়িতে উঠিতে কমলাদিদি বলিলেন, 'আচ্ছা দাদা! অপেক্ষা করুন। বলিগর্তে যাই [illegible] পথ যদি ধরাধামে না পাই, তবে কিছুকাল পরে আমরা এরোপ্লেন-যোগে আসিয়া একে [illegible] খাঁ বাহাদুর মিস্টার কশাই-উদ্দিন খটখটের দোতালায় ছাদের উপর নামিব।'

পঁয়ত্রিশ মণ খানা

কিছুদিন হইল মাসিক 'সওগাত'-এর কোনো সংখ্যায় 'আশরাফ ও আতরাফ' শীর্ষক এ [illegible] ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবির বিষয় এই যে, আশরাফ ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া আতরাফ [illegible] বলিতেছেন—'তুমি দূরে থাকো, আমার নিকট আসিও না।' আশরাফের এই ব্যবহারে [illegible] রাগ হইল। এতবড় আস্পর্ধা! মানুষকে ঘৃণা! ইচ্ছা হইল, তখনই আশরাফদের বিরু [illegible] জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেই। কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল। অসুবিধা এই যে, [illegible] নিজে আশরাফ-এর তালিকায় নাম লিখাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং জেহাদ ঘোষণা করি [illegible] যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে তবে সে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সম [illegible] সাফ হইয়া যাইবে।

তখন আমার চেষ্টা হইল, আশরাফদের গর্ব খর্ব করিয়া তাহাদিগকে আতরাফের সঙ্গ [illegible] একাসনে বসাইয়া এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করানো যায় কিনা। তাহাতেও ছিল একটা বাধ [illegible] তাহা এই যে, সেরূপ ভোজের আয়োজন করিতে হইলে আমাকে গাঁটের পয়সা খর [illegible] করিতে হয়। আমি স্বয়ং উভয় দলকে নিমন্ত্রণ করিলে তবে তো তাহাদের একাসনে [illegible] বসাইতে পারি? কিন্তু শুকুর আলহামদুলিল্লাহ! একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। ১১ শরিফের দিন (অর্থাৎ রবিউসসানি চাঁদের ১১ তারিখে) মল্লিকপুরে বড় ধুমধামের সহিত মৌলুদ শরিফের ভোজ হইয়া থাকে। মল্লিকপুর কলিকাতা হইতে রেলযোগে মাত্র অর্ধঘণ্টার পথ কলিকাতা হইতে পীর, ফকির, আতরাফ, আশরাফ ইত্যাদিতে ট্রেন বোঝাই করা লোক সেখানে যায়। দিনের সময় মৌলুদ শরিফ শ্রবণ ও বিনাপয়সায় ভোজন আর রাত্রিকালে

আতশবাজি দর্শন—সুতরাং মল্লিকপুর সে-সময় লোকে লোকারণ্য। গত ১১ শরিফের দিন আমিও গেলাম।

মৌলুদ শরিফ শ্রবণের পালা নির্বিঘ্নে নীরবে শেষ হইল—এখন ভোজের পালা। আয়োজনকারী মতওয়াল্লিগণ পাকা মুসলমান—তাঁহারা আতরাফ ও আশরাফ নির্বিশেষে শুধু এক পঙ্‌ক্তিতে নয়—একাসনে, শুধু একাসনেও নয়—এক বাসনে ভোজন করেন। আমার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল! এইরূপ একটা একাকার মিলনের দৃশ্য দেখাই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাহবা! শুধু মেথর-চামারে এবং ভদ্রলোকে নয়—স্ত্রী-পুরুষেও অবাধ মিশামিশি! অবশ্য হিংসুটে আশরাফ ললনাগণ নিজেদের একঘরে করিয়া দোতলায় চিকের অন্তরালে লুকাইয়া ছিলেন।

মন-ভরা ডেগের পর ডেগ নাচিতেছে; বাবুর্চিগণ সকলকে দুইহাতে খানা বিতরণ করিতেছে। তথাপি আতরাফ নরনারী গৃধিনী-শকুনির মতো ডেগের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুহাতে খানা লুট করিতেছে। খানা লুকাইয়া রাখিবার পাত্র—পায়খানার বদনা, পুরাতন টিন ও পরিত্যক্ত মাটির হাঁড়ি! শেষে বাবুর্চিগণ ক্লান্ত হইয়া দোহাই দিল যে, মতওয়াল্লি সাহেবগণ আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহারা ডেগের ঢাকনা তুলিবে না। তাঁহারা আসিয়া পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ডেগ ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাড়াহুড়া খাইয়া পুরুষেরা সরিয়া পড়িল। কিন্তু আতরাফ বীর নারীগণ মতওয়াল্লিদের বগলের নিচ দিয়া যাইয়া যে-কোনো নোংরা বাসনে ডেগের খানা লুটিতে লাগিল। এক-একবার খাদেমগণ তাহাদের বাসন কাড়িয়া লইয়া দূরে ছুড়িয়া ফেলিতেছে—বীরবালা আবার সেই কাদামাখা বাসন কুড়াইয়া লইয়া খানায় ডুবাইয়া দিতেছে।

তাহার পর দোতলার চিকের অন্তরালের দৃশ্য দেখুন। তখন ভরা বর্ষাকাল—সুতরাং কাদার অভাব নাই। আতরাফ কুলকামিনীগণ নোংরা কাদামাখা পায় আশরাফ বিবিদের হাত-পা, কাপড়, বোরকা মাড়াইয়া তাঁহাদের অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহাদের নগ্ন শিশুগণ যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করিতেছে—কিন্তু কেহ একটু আপত্তির 'উঁহুঁ' পর্যন্ত বলিতেছেন না; কারণ অদ্য এমন মোবারক দিন—১১ শরিফ! এক-একবার সিঁড়ির উপর ইতর-ভদ্র—সকলপ্রকার পুরুষমানুষেরা আসিয়া বিবিদের একনজর দেখিয়া যাইতেছে—ইহাতেও কাহাকেও আপত্তি করিতে দেখিলাম না। (বিবাহবাড়িতে এবং মহররমের সময় ইমামবাড়ায় বিবিরা পুরুষদের ধাক্কাধাক্কিও খাইয়া থাকেন, ইহাতে 'মোল্লা-ই-পরদার' অবমাননা হয় না!) অতঃপর ভোজনের পালা। আতরাফ কামিনীগণ যথাসাধ্য পোলাও, কালিয়া, কাবাব, রুটি, জরদা, ফিরনি লুটিয়া লইবার পর এখন উপরে আসিয়া বিবিদের সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া গেল। সকলে একাসনে বসিয়া একই বাসনে বসিয়া খাইবে। বড় বড় সেনীতে মধ্যস্থলে খানিকটা খানা—সেই সেনীর এক-একটির চারিদিকে ঘিরিয়া চার-পাঁচজন করিয়া খাইতে বসিয়াছে। জানি না, ইহা সেই কাদামাখা বাসনের লুটকরা খানার অবিশিষ্ট খানা, না অপর কোনো সদ্য-তৈয়ার খানা ছিল। যাহা হউক, খাওয়া আরম্ভ হইল—ছেলেদের নোংরা হাত, কাহারও নাক বাহিয়া শ্লেষ্মা পড়িতেছে, কাহারও কান বাহিয়া পুঁজ পড়িতেছে, কেহ খাইতে খাইতে হাঁচিতেছে, কেহ কাশিতেছে। সোবহান আল্লাহ! আতরাফ ও আশরাফের কী অপূর্ব মিলন!! ছেলেদের মূত্রত্যাগের বিরাম নাই। এইরূপে হাঁচি ও কাশির মধ্যে খানা খাওয়া শেষ হইল।

শুনিয়াছি, এইরূপ ভোজনের ফলে 'ময়মন' বিবিরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ছয়-সাতমাস রোগ ভোগ করিয়া থাকেন! রোগ ভোগ না করিলেই আশ্চর্যের বিষয় হইত।

অনেকে যে ছয়মাস পরে সারিয়া উঠেন, তাহাও কপালের জোর বলিতে হইবে।

রাত্রি ১১টা পর্যন্ত মিলন-উৎসব এবং আতশবাজি দেখিয়া আমি [illegible] চলিলাম। পথে কয়েকজন মতওয়াল্লি সাহেবের সহিত দেখা হইল; তাঁহারা [illegible] বলাবলি করিতেছিলেন—'দেখিয়ে না, পঁয়ত্রিশ মণ খানা ইসতরেহ সে লুট [illegible] ইসওয়াক্ত হাম লোগোঁকো ওয়াস্তে, এক চাওল বাকি নেহি রহা! আব খানা ফের [illegible] তব হাম লোগোঁকে নসিব হোগা।'

আমি শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া আর অধিক দূর যাইতে পারিলাম না—বসিয়া ছিলাম। মওলা আলীর দরগাহে আসিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িলাম, দরগাহঅলা [illegible] বলিল, 'এটা হোটেল নয়; যাও ইটালি বাজারের বারান্দায় শোও গে।' আমি বলিলাম, বাপু! আমি আর উঠিতে পারিব না—বিশেষত আমার পেটে তখন পঁয়ত্রিশ মণ [illegible] বোঝা; তাহা লইয়া আমি একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছি।' যাহা হউক, দরগাহঅলার [illegible] কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আমি সেইখানে শুইয়া পড়িলাম। মল্লিকপুরের [illegible] ভাবিতে ভাবিতে চাহিয়া দেখি কী—

(১) এক বিরাট মিছিল যাইতেছে; হাতি-ঘোড়া, আসা-বরদার, সোটা-বরদার, [illegible] হাতে সোনার আসা ও সোটা। হাতির উপর জড়াও হাওদা, তাহাতে জরির পোশাক পরা সুপুরুষ ছিলেন; হাতির উপর আরও অনেক জরির পোশাক পরা লোক ছিলেন। (২) তার পর আর এক মিছিল—ইহারা উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় খুব জমকালো পোশাক পরিয়া সওয়ার [illegible] ইহাদের সঙ্গে চাঁদির আসা ও সোটা ছিল। অতঃপর ৩ নং মিছিল, ইহাদের পোশাক শানদার ছিল, ঘোড়াগুলিও দুর্বল (নেহরু-মিছিলের ঘোড়ার মতো) 'মর কটুয়া'! সঙ্গে বরকন্দাজ [illegible] আসা-সোটাও নাই। অনন্তর দেখি (৪) এক ব্যক্তি সামান্য ময়লা পোশাক পরিয়া [illegible] আধমরা ঘোড়ায় চড়িয়া অতি ধীরে ধীরে একা যাইতেছেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর, [illegible] মনে হইল যেন তিনদিনের উপবাসী। (৫) সর্বশেষে দেখি, এক বৃদ্ধ ময়লা ও ছেঁড়া [illegible] পরিয়া পদব্রজে যাইতেছেন—'জীর্ণ-শীর্ণ, রুগ্নকায়, মলিন বদন; শতগ্রন্থি বাসে করি [illegible] আবরণ।' মনে হইল, তিনি কোনো দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ হইতে আসিয়াছেন, [illegible] মাসাধিককাল হইতে অন্ন জোটে নাই। তিনি অতিকষ্টে খালিপায় রেললাইনের বন্ধুর [illegible] চলিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই মল্লিকপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সকলে অদৃশ্য হইলে আমি একজন পথিককে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিল, ১নং মিছিলে গেলেন দেশের যত পীর-মোরশেদ যথা—গাজী, মাদার, সত্যপীর ইত্যাদি। দেশের লোকে তাঁহাদের পূজা করে; দেখ না, এখানে এক দরগাহ, সেখানে এক দরগাহ, তবে প্রথমোক্তদের চেয়ে একটু কম। ৩নং মিছিলে ছিলেন যত পয়গম্বর; তাঁহাদের তো এদেশের লোকে তত মানে না, তাই তাঁহাদের ঘোড়াগুলি দানা পায় না। ৪ নং [illegible] একা যাইতেছিলেন, তিনি ছিলেন আমাদের আখেরি জামানার পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম। তাঁহাকে তো এ-দেশের লোকে মানে না, তাই তিনি খাইতে পরিতে পান না। ৫নং লোকটি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ মিয়া (নাউজ বিল্লাহি মিনহা)। [illegible] বেচারাকে তো আমরা ভুলিয়াও কখনো কখনো মনে করি না, কাজেই তাঁহার এইরূপ দৈন্য। আমি অবাক হইয়া আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতে ছিলাম, এমন সময় আজান-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল—'আল্লাহু আকবর!' আমি জাগিয়া দেখি, সেই বারান্দায় মাটিতে শুইয়াই আছি। তাই তো, মওলা আলী দরগাহে শুইয়া ছিলাম বলিয়া পীর-পয়গম্বরদের স্বপ্নে দেখিলাম!

বিয়ে-পাগলা বুড়ো*

শুনিয়াছি, সারদা বিল পাসের সঙ্গে সঙ্গে 'কচি মেয়ের সহিত বুড়ো বরের বিবাহ নিষিদ্ধ' করিয়া আর একটি বিল পাস হইবার কথা ছিল। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল পাস হইলে কন্যাযাত্রের নামে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হইত কিনা, তাহা অনুমান করা সহজ নহে। তবু দুই-তিনজন বিয়ে-পাগলা বৃদ্ধের বিবাহের ইতিহাস পাঠিকা ভগিনীদের উপহার দিব। আশা করি, ইহা পাঠে তাঁহারা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

১

পূর্ববঙ্গের একটি পল্লিগ্রামে একজন সত্তরবর্ষীয় বর ক্রমে সাতজন বিবিকে নিরাপদ জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিয়া অষ্টমবার বিবাহ করিতে চাহিলেন। গ্রামের দুষ্ট লোকেরা বেচারার দুর্নাম রটনা করিয়াছিল যে, বুড়াটা বউ-খেকো; কাজেই আর কেহ তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত হয় না। মাতবর সাহেব বৃদ্ধ হইলেও বিবিধ খেজাবের কল্যাণে তাঁহার মাথার চুল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও দাড়িগোঁফ কলপরঞ্জিত করিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ মুখশ্রী বেশ সুন্দর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে; বাক্সভরা রুপার গয়না, একটা সোনার সিঁথি এবং হলুদি মাকড়ি, সিন্দুকভরা কাপড়, তবু কোনো হতভাগা তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত নয়।

অবশেষে পাড়ার কতিপয় যুবকের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তাহারা বহু কষ্টে একটি পাত্রী ঠিক করিয়া মাতবর সাহেবকে জানাইল যে, কুমারী মেয়ে পাওয়া গেল না; একটি বাল-বিধবা আছে। বয়স একটু বেশি, ২২-২৩ বৎসর, আর একটু হৃষ্টপুষ্ট লম্বাগোছের মেয়ে। তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'তা ভালোই, কুমারী যখন পাওয়া যায় না, তা আর কী করা।'

ঘটকেরা বলিল, 'বিধবা বটে, তবে পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়াছিল। তদবধি পিতামাতার অন্ন ধ্বংস করিতেছে; এখন মুরুব্বিরা তাহাকে পাত্রস্থ করিতে চায়। যদি আপনি পছন্দ না করেন, তবে এ-সম্বন্ধ ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।'

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি সোৎসাহে বলিলেন, 'না, না, এ-সম্বন্ধ ছাড়া হইবে না। বয়স একটু বেশি হওয়ায় সুবিধাই হইবে, ভালোমতে ঘর-গেরস্তি করিতে পারিবে।'

যথাকালে মাতবর সাহেব বরবেশে বিবাহসভায় উপস্থিত হইলেন। বিবাহ বেশ ঘটা করিয়া হইতেছে। ঘটকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা লইয়া খুব ধুমধামের সহিত আয়োজন করিয়াছে।

কনের সম্পর্কের এক নানি এবং পাড়ার ছেলের দল বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া আচার-পদ্ধতি পালন করিতেছে—এ নিয়ম, সে নিয়ম, নিয়ম আর শেষ হয় না। ছোকরাগুলি মুখ টিপিয়া হাসে, আর ফিসফিস করিয়া নানিবিবির সহিত কথা কহিয়া সেই উপদেশমতো কাজ করে। বরের সম্মুখে বড় মোটা খেরুয়ার পরদা, সেই পরদার অপর পার্শ্ব হইতে স্ত্রীলোকদের চাপা হাসি শোনা যাইতেছে। বর অধীরভাবে শুভদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; বিলম্বের জন্য মনে মনে গ্রাম্য আচার-পদ্ধতির মুণ্ডপাত করিতেছেন। তিনি পার্শ্বপবিষ্ট কনের অলঙ্কারের মৃদু ঝনঝনি শুনিতেছেন; আর সতৃষ্ণ নয়নে কনের দিকে

* অবিকল সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পাত্রীর হাত-পা সব মোটা বানারসী শাড়িতে ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না; কেবল ক্রেপের ওড়নার ভিতর হইতে বাদলা-জড়ানো স্থূল ও সুদীর্ঘ দুটি বেণী দেখা যাইতেছে। চুলের বেণিটা কনের পিঠ বাহিয়া ফরাশের উপর পড়িয়াছে। বৃদ্ধ মনে মনে ভারি সন্তুষ্ট যে, আর কিছু না হইলেও আমার বউ যেন কেশর-রানি! এ গ্রামে এত লম্বা চুল আর কার আছে?

অনেকক্ষণ প্রাণঘাতী ধৈর্যের পর দর্পণ আসিল, এখন শুভদৃষ্টি। অবগুণ্ঠন তুলিবার পর পরদার অপর পার্শ্বস্থিত চাপা হাসি কলহাস্যে পরিণত হইল, এদিকে বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিলেন—বউ-এর মুখে ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ! বউ খিলখিল করিয়া হাসিয়া একটা মাথার পরচুলটা খুলিয়া বরের সম্মুখে রাখিল। হতভম্ব বর তখন দাড়িগোঁফশোভিত কনেকে চিনিলেন যে, সে তাহার সম্পর্কে নাতি কালুমিয়া। সে দন্ত বিকাশ করিয়া বলিল, 'নানাসাহেব, শ্যাষে আপনে আমাইরে বিয়া করলেন?' মাতবর সাহেব অতিক্রোধে কী বলিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া কেবল বলিলেন, 'তোমরা যে এমন নাদান, তা জানতাম না।' তিনি সক্রোধে সেই বাদলা-জড়ানো সুন্দর বেণিটাকে তুলিয়া এক আছাড় দিলেন। পরে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

২

পাটনায় এক ৬৫/৭০ বৎসরের কাজি সাহেব ক্রমাগত কয়েকটি স্ত্রী বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করিতে চেষ্টা করিলেন। এক্ষেত্রে তিনিও 'জরু-খাওকা' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সহজে আর জরু ধরিতে পারিতে ছিলেন না। তাঁহার মেহদী-রঞ্জিত দাড়ির জন্য কোনো সুন্দরীই ধরা পড়িল না।

অবশেষে কয়েকজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপরোক্ত কাজি সাহেবের জন্য ঘটকালি করিবার নিমিত্ত আসরে নামিলেন। কন্যা সহজে পাওয়া যায় না; কারণ শহরে যে কয়টি বিবাহযোগ্য পাত্রী ছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বহু অর্থব্যয়ে একজনের ১০ম বর্ষীয়া কন্যা সংগ্রহ করা গিয়াছে। কন্যাপক্ষকে ছয়-সাতমাস পর্যন্ত অনেক পর্বী-তেহারী দিতে হইল; চাকরদের বখশিশ দিতে হইল।

এই প্রকারের অনেক খরচপত্র, কাণ্ডকারখানার পর কোনো এক শুভদিনে বিবাহের তারিখ ধার্য হইল। যথাকালে বর প্রাঙ্গণে শামিয়ানার নিচে আনীত হইলেন। এই বিবাহসভায় এ রছম সে রছম নানাবিধ মেয়েলি রছম (অর্থাৎ স্ত্রী-আচার) শেষ হইলে পর বর-কনের শুভদৃষ্টি হইবার সময় প্রভাত হইয়া গেল। বর সানন্দে দেখিলেন, বালিকা-বধূর কপালে নানাবিধ রঙের চাঁদ-তারা চুমকি অওটা হইয়াছে, গালদুটি আফসা জড়িত হইয়া ঝকমক করিতেছে। সে কী সুন্দর! বধূর সৌন্দর্য উথলিয়া পড়িতেছে। পাটনার নিয়ম অনুসারে কনেকে একজন মিরিয়াসিন* কোলে তুলিয়া লইয়া বাসরঘরে চলিল, বরে আচকানের সম্মুখের দামনের সহিত কনের বানারসী দোপাট্টার এককোণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল। বর সেই গ্রন্থি ধরিয়া ধীরে ধীরে পাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সহসা পাত্রী মিরিয়াসিনের কোল হইতে লাফাইয়া নামিয়া দিল দৌড়। বেচারা কাজি সাহেবের হাতে কনের ওড়নার কোণের গ্রন্থি ছিল, সুতরাং অগত্যা তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে হইল। দৌড়াইবার নির্দিষ্ট পথ পূর্ব হইতেই ঠিক করা ছিল; তদনুসারে পাত্রী

* মিরিয়াসিন একপ্রকার গায়িকা বিশেষ; ইহারা পুরুষের মজলিশে গীতিবাদ্য করে না। কেবল মেয়েমহলে বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নাচগান করে এবং বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে স্ত্রী-আচার পালন করে।

অলঙ্কারসমূহ ছড়া, মল, খুঙুর, পরিছম, পা-জেব ইত্যাদি ঝুমুর ঝুমুর শব্দে বাজাইতে বাজাইতে পাত্রী চলিল, বাহিরের পুষ্করিণীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া—সেখানে বাগান হইতে করতালি দিয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিল। পরে বাগানে দৌড়াইতে গেল, সেখানে মালীরা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর পাত্রী গেল নহবৎখানায়, সেখানে বাজনাদারেরা তবলা-সারেঙ্গি বাজাইয়া গান করিতেছিল। তাহারা করতালি দিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিল, 'বাহ্ বেটি বাহ্! দৌড়তি হুয়ী দুলহিন তোমহে মোবারক বড়ে মিয়াঁ! আজি ভাগতি হুয়ি দুলহিন তোমহে মোবারক বড়ে মিয়াঁ!!'

চারিদিকে খুব খানিকটা চক্কর দিয়া কনে গিয়া উঠিল কর্তার বৈঠকখানায়। সেখানে অনেক সাহেব-সুবো অভ্যাগত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হাসিয়া আকুল—লুটাপুটি। তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাত্রী একে একে তাহার সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিল। বানারসী শাড়ি দোপাট্টা সব খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল যে, একটি দিব্যকান্তি বালক!! আহা বেচারা কাজি সাহেব!

৩

ভাগলপুরের এক স্টেশন-মাস্টার বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র ইত্যাদি বর্তমানেও পঞ্চমবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখন স্টেশন-মাস্টারের কাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি মুজফফরপুরের অধিবাসী। বহুকাল ভাগলপুরে ছিলেন বলিয়া সেখানকার লোকেরা তাহাকে বিলক্ষণ চিনে এবং তাঁহাকে স্টেশন-মাস্টার বলিয়া ডাকিতেই ভালোবাসে।

মুজফফরপুরে খাঁ সাহেবের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। স্ত্রী-পুত্র সেইখানেই থাকে। তাঁহার প্রথম স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার সময় ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছিল। সুতরাং তাহাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর সময় মেয়েরা বিবাহিত ছিল, কিন্তু ছেলেদের বিবাহ হয় নাই, সুতরাং ছেলেদের বিয়ে-থা দিবার সময় কুটুম্ব সাক্ষাতের সমাদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার জন্য নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিতে হইল।

খাঁ সাহেবের গৃহ যখন বধূ, জামাতা বয়োপ্রাপ্ত পৌত্র, দৌহিত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ; সেই সময় তাঁহার তৃতীয় খানম দেহত্যাগ করিলেন। এবার তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, 'দুই-চার বৎসর পরে পৌত্রের বিবাহ দিয়া বধূ আনিবেন, নিজে আর বিবাহ করিবেন না।' কিন্তু খাঁ সাহেব বলিলেন, 'ঘর সামলাইবে কে? বড়বউ, মেজ, সেজ এবং ছোটবউ এরা তিন-চারি বা ততোধিক সন্তানের মাতা হইয়াছে সত্য; কিন্তু হাজার হউক তবু তাঁহারা ছেলেমানুষ বই তো নয়। এতবড় সংসার দেখিবে কে?' বন্ধুদের সহানুভূতি না পাইয়া শেষে তিনি অতি গোপনে এক দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে পত্নীরূপে ঘরে আনিলেন। বউয়েরা সে-সময় পিত্রালয়ে গিয়াছিল, বাড়িতে কেহ ছিল না।

বউয়েরা বাড়িতে আসিয়া জানিতে পারিল যে, তাহাদের নতুন শাশুড়ি আসিয়াছেন। তাহাদের দেখিয়া শাশুড়ি তাড়াতাড়ি কামরার দ্বারে অর্গল দিলেন। বউয়েরাও আড়ি পাতিয়া রহিল। যেই একবার দ্বার খুলিল, অমনি সেজবউ একেবারে শাশুড়িকে কোলে তুলিয়া আনিয়া বারান্দায় তক্তপোশের উপর বসাইয়া দিল। ছেলেমেয়ের দল দুলাইন দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল, এ বলে 'দুলাইন দাদি', ও বলে 'দুলাইন নানি।'

ফল কথা, চতুর্থা খানম মোটেই ঘর-সংসার দেখেন না, কেবল পৌত্রী-দৌহিত্রীদের

সঙ্গে তাশ খেলে আর গল্প করে। এইজন্য খাঁ সাহেবকে পঞ্চমবার বিবাহ করিতে হইতেছে। পোড়া মুজফফরপরে বিবাহের সুবিধা না হওয়ায় তিনি সহানুভূতি ও সমবেদনা দু-ই পাইলেন।

যথাসময়ে খাঁ সাহেবের বিবাহ হইয়া গেল, শুভদৃষ্টিও হইল। বাসরঘরে পাত্রীকে লইয়া যাওয়ামাত্র তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। সেবাশুশ্রূষার জন্য স্ত্রীলোকেরা আসিয়া ঘিরিয়া বসিল। কাজেই খাঁ সাহেবকে বাহিরে যাইতে হইল।

খাঁ সাহেব কয়েকদিন শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করিয়া শেষে অন্যত্র বাসা লইলেন। ইতোমধ্যে তিনি আর একবারও নববধূকে দেখিতে পান নাই, কারণ সর্বক্ষণ হাকিম ডাক্তার ও স্ত্রীলোকদের ভিড় থাকিত।

অবশেষে স্থির হইল যে, দুলাইনের পারিবারিক হাকিমের চিকিৎসা হইবে। সেজন্য প্রতিদিন সকালে হাকিম সাহেবের নিকট বধূর কারুরা* পাঠাইতে হইবে। চাকর-বাকর ঠিকমতো কথা শুনে না, কারুরা নিয়মমতো হাকিমের নিকট প্রেরিত না-হওয়ায় রোগ বাড়িয়াই চলিয়াছে। অগত্যা খাঁ সাহেব নিজেই প্রতিদিন সকালে আসিয়া কারুরা লইয়া হাকিম সাহেবের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে।

হাকিম সাহেব প্রত্যহ স্মিতমুখে ৫ টাকা দর্শনী লইয়া কারুরা দেখিতেন। আর দুলাইনের আরোগ্য বিষয়ে খাঁ সাহেবকে আশ্বাস দিয়া নানাবিধ দুর্মূল্য ফল—যথা আঙুর, বেদানা, বিহি—বিশেষত যে-সকল ফল তখন ভাগলপুরে পাওয়া যাইত না, তাহারই ব্যবস্থা করিতেন। খাঁ সাহেব জগৎ ছানিয়া সেইসব ফল পথ্য আনাইয়া শ্বশুরবাড়িতে হাজির করিতেন।

এইরূপে প্রায় দুইমাস অতীত হইলে একজন চাকর একটু রুক্ষভাবে খাঁ সাহেবকে বলিল, 'কী আপনি রোজ রোজ কারুরা লইতে আসেন? এখানে আর কারুরা নাই। আমাদের সকলেরই কারুরা পরীক্ষা করা হইয়া গিয়াছে। আর দরকার নাই।' তিনি তবু একবার অন্দরে গিয়া দুলাইনকে দেখিতে চাহিলে, সে বলিল, তাঁহার দুলাইন বলিয়া কোনো পদার্থ এ-বাড়িতে নাই।

এ-কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি আত্মসংযম করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে যে গোন্দম রঙের ভোলি ভোলি পেয়ারি সুরত দেখিয়াছি সে কে?' উত্তর হইল, 'সে বাজারের অমুক নর্তকী ছিল, সেদিন সে ভাড়ায় আসিয়াছিল—চলিয়া গিয়াছে।'

খাঁ সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জনৈক উকিলের নিকট পরামর্শ লইতে গেলেন যে এইসব বেঈমান দাগাবাজদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা করা যায় কিনা। উকিল সাহেব সমস্ত শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'আপনার লাঞ্ছনা যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আদালতে নালিশ করিয়া আরও খানিকটা লাঞ্ছনা কিনিয়া অর্থ নষ্ট করিতে চাহেন কী? আপনি বরং ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরিয়া যান।'

বৃদ্ধ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'জরা খেয়াল করেন কি বাত—মেরা চার হাজার রুপেয়া বরবাদ হুয়া—কোয়ি হাতভি না আয়ি, আওর মালাউন বদ বখতোনে মুঝসে নওকরোঁকো কারুরা তক ঢোলায়া! হু—হু—হু!!

---

* কারুরা—মূত্র। আর যে-কাচের পাত্রে এ জিনিসটা পরীক্ষার নিমিত্ত রাখা হয়,তাহাকে কারুরা বলে। "ঈগেলস্ ক্রেগ্" নামক পর্বত-শিখর হইতে মধ্যাহ্নে (আকাশ নির্মল থাকিলে) প্রাকৃতির সৌন্দর্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি 'কাঞ্চনজঙ্গা' প্রায় সর্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, সুতরাং তাহার দর্শন-লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।

সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

অগ্রন্থিত কবিতা

বাসি ফুল

'পিসিমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল,'
এত বলি আসি ছুটি হাতে দিল ফুল দুটি;
চেয়ে দেখি, আনিয়াছে দুটি বাসি ফুল।

'পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল।'
সকালে কাননে গিয়ে বাসি ফুল কুড়াইয়ে
পিসিমারে দিতে এসে হাসিয়ে আকুল।

'পিসিমা! তোমার তরে আনিয়াছি ফুল।'
শুনে সে বচন-সুধা দূরে গেল তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
স্বর্গ-মর্ত একাকার হয়ে গেল ভুল।

মরি! সে স্বর্গের শিশু মরতে অতুল।—
তাহারে স্মরিয়া তাই আপনা ভুলিয়া যাই,
কোন্ বিধি গড়েছিল সে ননী পুতুল?

কী দিয়ে কে গড়েছিল সে প্রেম-মুকুলে?
ইন্দ্রধনু-বর্ণ দিয়ে চন্দ্রিকা-লাবণ্য নিয়ে
পারিজাত-গন্ধ দিয়ে মানিক অতুল?

ললিত রাগিণী নহে তার সমতুল,—
নহে সুখস্বপ্ন-সম, নহে ধনরত্ন-সম,—
সে তো নহে বসোরার গোলাপ-মুকুল!

তুলনায় উপযুক্ত নহে—সে অতুল!
তার সেই উপহার, কী দিব তুলনা তার?
কোটি কোহিনূর নহে তার সমতুল।

প্রেমের সে উপহার জগতে অতুল।
কোথা পাব সে আদর? কোথা সেই স্নেহ-স্বর,
হৃদয়-জুড়ানো সেই সোহাগ অমূল?

স্নেহের শিশির-মাখা সে বাসি ফুল!
অমিয়া ঢালিয়া বুকে কে আর সহাস্য মুখে
কহিবে, 'পিসিমা! ধর, আনিয়াছি ফুল!'

'পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল।'
সেই কথা পুনরায় শুনিতে পরান চায়,
কোথা সে বালক মোর প্রেমের পারুল?

ভূতলে চামেলি জুঁই নহে অপ্রতুল,—
আছে কত পুষ্পলতা, শুধু নাই সেই কথা—
'পিসিমা! তোমারে দিতে আনিয়াছি ফুল।'

সেই কথা শুনিতে এ পরান ব্যাকুল।
বাজে কী স্বরগ-পুরে গন্ধর্বের বীণা-সুরে
'পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ-ফুল?'

কী দিলে আবার পাব স্নেহের পুতুল?
কোন্ যজ্ঞ-তপস্যায় বাঁচিয়ে সে পুনরায়
হাসিয়ে আমারে দিবে দুটি বাসি ফুল?

সে স্নেহ আদর কেন জগতে দুর্মূল?
রত্ন-প্রসবিনী ধরা বিবিধ রতনে ভরা,
তথাপি মিলে না হেথা দুটি বাসি ফুল।

বিধি সর্বশক্তিমান, নিতান্ত এ ভুল।
নতুবা শকতি তার নাই কেন পুনর্বার
ফিরাইয়ে দিতে মোর সে প্রেম-পুতুল?

বিধি সর্বশক্তিমান, ইহা নহে ভুল;—
নতুবা আর কে পারে সমাহিত করিবারে
অমন স্বরগ-শিশু, বিশ্বে যে অতুল?

পাব না প্রাণের ধন, পাব না সে ফুল।
আর শুনিবে না প্রাণ সে ললিত কণ্ঠতান—
প্রেমের পীযূষ-ভরা রাগিণী মঞ্জুল!

শুধু স্মৃতিকুঞ্জে ফুটে আছে 'বাসি ফুল'
সে মুখের স্মৃতি-সুখ ভরিয়ে রেখেছে বুক,
অঙ্কিত সে চিরতরে, হইবে না ভুল।

শশধর

কী ভাবিছ শশধর! বসি' নীলাসনে?
কী রেখেছ শশধর! হৃদয়ে গোপনে?
লুকাতে পারনি তাহা প্রভূত যতনে, আহা!
দেখা যায় কালো ছায়া ও চাঁদ-বদনে!
কী ভাবিছ শশধর! বসি যোগাসনে?

পুষিছ হৃদয়ে তুমি প্রেমের অনল?
পুড়িয়ে হয়েছে কালো তাই হৃদিতল।
না বুঝে অবোধ নরে কত অনুমান করে,
অথবা অমিয়া ভ্রমে ভীষণ গরল
হৃদয়ে পুরিয়া—মুখে হাসিছে কেবল!
নীরবে দগ্ধ হও, নীরবে যাতনা সও,
নীরবে নীহার-রূপে ঝরে আঁখিজল।
পুষিছ হৃদয়ে শশি, প্রেমের অনল।

দুটি সান্ত্বনার কথা তোমারে যে বলে,
নাই কি এমন কেহ বিশ্ব-ভূমণ্ডলে?
এত তারা আছে, কেহ তোমারে করে না স্নেহ?
তাই তুমি, শশধর! বসিয়া বিরলে,
নিশীথে জুড়াও প্রাণ ভিজি আঁখিজলে!
এ নিঠুর চরাচর শুনে না কাতর স্বর—
ঢালে না করুণাবারি যবে প্রাণ জ্বলে!
দুটি সান্ত্বনার কথা কেহ নাহি বলে।

কী দেখিছ, শশধর! আমার হৃদয়?
তোমারি কলঙ্ক-সম অন্ধকারময়!
শুধু পাপ, তাপ, ভয়, শোকে পূর্ণ এ-হৃদয়,
এ নহে উজ্জ্বল শুভ্র সরলতাময়।
কী দেখিবে, শশধর, এ পোড়া হৃদয়?

এ নহে কোমল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সুনির্মল,—
এ হৃদয়ে স্তরে স্তরে তীব্র হলাহল!
নৈরাশ্য বেদনা শত, কালানল-শিখা কত,
কী করে দেখাব, শশি! তোমা সে-সকল?
এ নহে পবিত্র রম্য স্বচ্ছ সুনির্মল!

তোমার কলঙ্ক, শশি! মুছিবে কেমনে?
যাবে না কলঙ্ক তব কোনো শুভক্ষণে
ও-কলঙ্ক হৃদি পরে রবে যুগ-যুগান্তরে;
তাই বুঝি ভাব সদা বসি যোগাসনে—
আঁধার কালিমা-রেখা মুছিবে কেমনে?

নলিনী ও কুমুদ

নলিনী।

দুর্বল হৃদয় পারে না বহিতে দারুণ যন্ত্রণা হেন;
জীবন-সর্বস্ব হারায়েছি যদি, পরান যায় না কেন?
শরীর-পিঞ্জরে এ প্রাণ-বিহগ থাকিতে চাহে না আর,
এস মৃত্যু! ত্বরা কর বিদূরিত দুঃসহ জীবন-ভার।

কুমুদ।

সখি! কী অপূর্ব শোভা স্বভাবের, দেখ দেখি, খোল আঁখি।

নলিনী।

দেখেছি অনেক, কী দেখিব আর, এখন মরণ বাকি।

কুমুদ।

কৌমুদী-স্নাত বিশ্ব-চরাচর! যেন ডুবিয়াছে সব
রজত-সাগরে। এ পূর্ণিমা-শশী, আ মরি! কী অভিনব!
কোথা বা মালঞ্চে মধুর হাসিছে আনন্দে শতেক ফুল;
সুধাকর প্রেমসুধা পান হেতু ব্যাকুল চকোর-কুল।
কোথা বা অলক ধীরে আসি চাহে ঢাকিতে বিধুর মুখ,
অপ্রতিভ শশী কহিবেন, 'একি!' তাহে মেঘ পাবে সুখ।
আসীন পূর্ণেন্দু তারকা-খচিত নীলাম্বর-সিংহাসনে,
হেরি এ মনোজ্ঞ অপরূপ শোভা কত ভাব হয় মনে!

নলিনী।

দেখ সখি তুমি পরান ভরিয়া বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি;
মম এ নয়ন দৃষ্টিশক্তিহীন, অধর ভুলেছে হাসি।
দগ্ধ হৃদয়ে এখন কেবল মরণ-আকাঙ্ক্ষা জাগে,
সুখ-সাধময় জীবন আমার ছিল কতক্ষণ আগে।
যখন অরুণ দিয়েছিল দেখা জীবন-প্রভাতে মম
সে-সময় মনে হয়েছিল ধরা নন্দনকানন-সম।
শ্যামলা ধরণী পরেছিল দীপ্ত কনক কিরণ-বাস,
শিশির-আপ্লুতা কিশোরী বল্লরী ছড়াত হরীক-ভাস।
পূরব-গগনে বালার্কের বিভা হেরি' নরনারীগণ

নব আশা লয়ে হৃদয়ে নবীন উৎসাহে বাঁধিয়া মন
অদৃষ্টের স্রোতে সন্তরিতে পুনঃ অগ্রসর হয় ভবে।
নিরাশ-যামিনী হইলে প্রভাত আশা কেন নাই হবে?
কলকণ্ঠে পাখি গাহিত হরষে, ফুটিত মুকুল কত;
ফুল্ল সূর্যমুখী হয়েছিল সুখ-সোহাগের ভারে নত।
ভ্রমর-গুঞ্জনে কত-না শুনেছি আশার মোহিনী বাণী,
রচি কল্পনায় প্রসূন-রাজত্ব তাহাতে ছিলাম রানি।
অর্ধ-নিমীলিত নয়নে দেখেছি সুখের স্বপন শত,
ভাবিতাম, ধন্য অবনী ভিতরে কে আছে আমার মতো?

কুমুদ।

এই দেখ সখি! এখনো তো আছে তেমনি উৎফুল্ল ধরা;
তবু কেন তুমি ভাব মন-দুঃখে : প্রকৃতি বিষাদে ভরা?

নলিনী।

ভাস্করের সনে গেছে অস্তাচলে জীবন-আনন্দ মম,
ছিল যে সরসী সুখের আলয়, এবে কারাগার-সম
দিতেছে যন্ত্রণা; এ-জগতে আর থাকিতে বাসনা নাই।
জাগিয়া সহিয়া অশেষ যাতনা এখন ঘুমাতে চাই।

কুমুদ।

আহা! সখি, তুমি পূর্ণিমা-নিশির শোভা দেখে হতে সুখী
পারিলে না, তাই এ সুখ-জগতে তুমি অপ্রসন্ন-মুখী!

নলিনী।

প্রফুল্লতা আসে আপনি আননে হৃদি উল্লসিত হলে,
ডাকিতে হয় না তারে সবিনয়ে; রবি-তাপে যথা গলে
আপনি তুষার, আয়াস করিয়া গলাতে হয় না তারে।
তুমি চাহ বালা, নিরানন্দ জনে ভাসাতে আনন্দ-ধারে;
অয়ি সুখময়ি! বুঝিতে পার না নৈরাশ্য কাহারে বলে;
কেমন সে-জ্বালা যাহাতে আমার নরম অন্তর জ্বলে।

কুমুদ।

তা হলে ভগিনি! চাহি না বুঝিতে তোমার প্রাণের জ্বালা;
ভাবি, শশধরে দিব উপহার কোন্ ফুলে গাঁথি মালা!

নলিনী।

হায় যম! আর কতক্ষণ হবে অপেক্ষা করিতে মোরে?
দেখি, পাই কি না শান্তি-বারিকণা ডুবিলে এ সরোবরে!!

'কুজ্‌ঝটিকা মাত্র নাই গগন-মণ্ডলে;
এসময় কাদম্বিনী কোথা গেছে চলে?
পেয়ে দিব্য অবসর মেঘমুক্ত দিবাকর
সগর্বে আসীন হয়ে সুনীল অম্বরে
ছড়াইছে হাসি হাসি উজ্জ্বল কিরণরাশি,
ভাসাইছে জ্যোতিঃধারে বিশ্ব-চরাচরে!
পেয়ে সে প্রখর কর হাস্যময় চরাচর
কিরণ-ঝলকে যেন হাসিছে পুলকে
জীবজন্তু, নর, দেব ভূলোকে দ্যুলোকে!
এদিকে একটি দুটি বনফুল আছে ফুটি,
ওদিকে চায়ের ফুল মাধুরী ছড়ায়।
বহে মৃদু সমীরণ করে স্নিগ্ধ প্রাণ মন,
বসন্তের গন্ধ যেন তাহে পাওয়া যায়!
সাগর-লহরি-প্রায় স্তরে স্তরে শোভা পায়
ভূধর-তরঙ্গমালা ত্রিদিকে বিস্তৃত;
কেবল দক্ষিণ দেশে অতি অপরূপ বেশে
হরিৎ প্রান্তরখানি রয়েছে নিদ্রিত।
পূর্বের পর্বতখানি আপনারে শ্রেষ্ঠ জানি
গৌরব-গরবে যেন চুম্বিছে গগন!
পশ্চিমের উপত্যকা দাঁড়ায়ে রয়েছে একা
বুকে লয়ে গোটা কত সুরম্য ভবন।
ওকি ও অনেক দূরে উত্তর-গিরির চূড়ে
স্তূপাকার মুক্তা হেন ও কী দেখা যায়?
ও বুঝি কাঞ্চনজঙ্ঘা? তাই তো কাঞ্চনজঙ্ঘা!
কী হেতু 'কাঞ্চন' নাম কে দিল উহায়?
ও তো স্বর্ণবর্ণ নয়, মুক্তা নিভ সমুদয়
ধবল তুষার-স্তম্ভ অতি মনোহর!
মরি! কিবা সমুজ্জ্বল রবি-করে ঝলমল
করে! কত মনোরম প্রাণমুগ্ধকর।
শ্যামল ভূধররাজি যেন গো ভূপতি সাজি
কাঞ্চনে মুকুটরূপে পরেছে মাথায়!
এমন ভূষণ পেয়ে গিরিরাজ ধন্য হয়ে
প্রণমিছে নতশিরে কাঞ্চনের পায়!
নির্মল তুষার গলে কাঞ্চনের পদতলে
বহিছে নীহার-নদী কত না সুন্দর!
কে যাবে ও-হিমদেশে কে কহিবে দেখে এসে

সে কেমন রম্যস্থান—সৌন্দর্য-আকর?
না জানি কতই তাহা বিমল শীতল, আহা!
তাই বলি, ও-কাঞ্চন ভূতলে অতুল,
যশস্বী উহারে পেয়ে হল গিরিকূল।

কিন্তু সেই মহাকবি আঁকিয়া এমন ছবি
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায়?
পরস্পরে তরুলতা কহিছে তাহারি কথা
যেন বলিতেছে : 'বিভূ এই তো হেথায়!'
সেদিকে ফিরালে আঁখি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি
বিভু যেন সয়ে যান মরীচিকা-প্রায়!
কিন্তু সে চরণরেখা সর্বত্রই যায় দেখা,
কুসুম-সৌরভে তাঁর গন্ধ পাওয়া যায়।
(ভাব-চক্ষু আছে যার দেখিতে কি বাকি তার?
সে মুদ্রিতচক্ষে তাঁর দরশন পায়।)
অস্ফুট নীরব স্বরে প্রকৃতি প্রচার করে—
'শিল্পীর মহিমা শিল্প আপনি জানায়!'

'ঈগেলস ক্রেগ' নামক পর্বত-শিখর হইতে মধ্যাহ্নে (আকাশ নির্মল থাকিলে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' প্রায় সর্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে, সুতরাং তাহার দর্শন-লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।

সওগাত

জাগো বঙ্গবাসী।
দেখ, কে দুয়ারে
অতি ধীরে ধীরে করে করাঘাত।

ঐ শুন শুন!
কেবা তোমাদের
সুমধুর স্বরে বলে : 'সুপ্রভাত!'

অলস রজনী
এবে পোহাইল,
আশার আলোকে হাসে দীননাথ।

শিশির-সিক্ত
কুসুম তুলিয়ে
ডালা ভরে নিয়ে এসেছে 'সওগাত'।

আপিল

কারো আছে জমিদারি,
কেহ বা উপাধিধারী—
বাঙালা বিহারে মোরা যত কিছু ধারী—
সকলে মিলিয়া এই আবেদন করি।—

প্রাণে মরি সেও ভালো,
শতবার মৃত্যু ভালো,
লাঙ্গুল-বিরহ কিন্তু সহিতে না পারি!
বোম্বাই নগরে ধাম,
'ভারত সময়' নাম—
শ্বেতাঙ্গ পত্রিকা এক রাগিয়াছে ভারি,
মহাক্রোধে করেছে সে এ হুকুমজারি,—
'যত মূক ভদ্র' পাও,
লাঙ্গুল কাটিয়া দাও।
তা হলে হইবে দণ্ড উচিত সবারি!'

'বোবার অরাতি নাই'—
এই সত্য জানি তাই
নীরব ছিলাম মোরা ল্যাজ-প্রাপ্তগণ।
একি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রপাত—
মৌন দোষে হবে না কী লাঙ্গুল কর্তন!
এস তবে সহচর,
সপ্তমে তুলিয়া স্বর
উচ্চকণ্ঠে করি আজি সবারে জ্ঞাপন,
আমরা করিনি কভু আইন লঙ্ঘন।
কোথা কোন্ দুরাচার
'সিডিশন' পরচার
করে, তার শিরে হোক এই অশনি পতন।
কোথা কে বিদ্রোহী জন,
কর এবে সম্বরণ
লেখনী, রসনা আর স্বরাজ-স্বপন;
করিও না অপব্যয় অমূল্য জীবন।

স্বাক্ষর—

Moderates, who are keeping silence ought to be deprived of their titles.

যত ভূমি-অধিকারী।
যে কটি লাঙ্গুল-ধারী।
যার আছে জমিদারি।
যত সভ্য অনাহারী।

নিরুপম বীর

বিচারক বলে, 'কানাই তোমার
গলায় পড়িবে ফাঁসি!'
শুনি শ্যামলাল বেপরোয়া ভাবে
হাসিল ঘৃণার হাসি।
রাখিতে পরের পরান যে জন
দেয় নিজে বলিদান,
সে কী বিচলিত ফাঁসির আদেশে?
মৃত্যু তুচ্ছজ্ঞান।

এ মর-জগতে কানাইয়ের তুল
কে আছে কোথায় আর?
শ্যামের গরিমা অতুল অতুল
তুলনা নাই যে তার!
মরিয়া কানাই হইবে অমর
সাধ্য কি বধে তারে?
মৃন্ময় দেহ এক শুধু শ্যাম
ছিল বাঁধা সংসারে;
ত্যজি সে পিঁজর চলিল কানাই,
এবে শত কোটি শ্যাম
ভরত-গগনে দেখা দিবে পুনঃ।
(ধন্য তোমার নাম!)

শ্যাম-ঋণ-পাশে রয়েছে যে বাঁধা
সকল বঙ্গবাসী,
অনেক তাদের করিল প্রণতি
শ্যামে কারাগারে আসি।
জগতে শ্যামের বিপুল আদর
হল না বর্তমানে—
যদিও ভকতি নীরব প্রবাহ
বহে বাঙালি প্রাণে।
যত কৃতঘ্ন হোক সংসার

ভারত-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে
জাগরূক রবে নিতি!
বীর সন্তান জাগিয়া প্রভাতে
স্মরিবে কানাই নাম;
প্রাতঃস্মরণীয় কানাই মোদের,
বল বল 'বন্দে শ্যাম!'

প্রভাতের শশী

সুপ্রভাত! কেন শশি! বিষণ্ন বদন
কোন সুগভীর ভাবে হয়েছ মগন ?
সারারাত জেগে এবে নিশাশেষ ভাগে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু মরি! নিষ্প্রভ নয়ন।
মৃদুগতি গেহ পাণে চলেছে অবশ প্রাণে,--
যেতেছে,--চলিতে যেন সরে না চরণ।
এমন নিঃস্বার্থ প্রাণে, কি কোথা কাহার প্রাণে
ঢালে সুধা নিশাকালে করি জাগরণ ?
বুঝিলাম এতক্ষণে কলুষিত এ ভুবন
নাই স্বার্থহীন আর তোমার মতন।
পরেতে ঢালিয়া প্রাণ ভুলিয়াছ আত্মজ্ঞান,
কেবলি পরের তরে কাঁদে তব মন।
উথলে প্রেমের সিন্ধু, বিন্দু বিন্দু শত বিন্দু
অশ্রুধারে ভিজায়েছ কঠিন ভুবন!!

(ওই প্রেম অশ্রুধার হয়ে মুক্তার হার
সাজায়েছে তরুলতা করিয়া যতন!
নৃশংস পরাণী যত, না বুঝে প্রেমের তত্ত্ব
হেন নীহারের পরে ধ.র যে চরণ।)
শশাঙ্ক! হেলায় হাসি, সুবিমল সুধারাশি
অকাতরে ধরণীরে কর বিতরণ,
ইহাতে কি সুখ পাও, কেন অবিরাম দাও ?
প্রতিদানে কভু কিছু কর না গ্রহণ।
প্রণয়ে কলঙ্কী হয়ে প্রেমেরি কলঙ্ক লয়ে
ধরিয়াছ হৃদিপরে কলঙ্ক ভূষণ।
বল কোন দূরদেশে, কোন দেবতার দেশে
যেতেছ বিশ্বাস হেতু করিতে শয়ন ?

তোমার স্রষ্টার কাছে প্রাণের প্রার্থনা আছে,
বলো তাঁরে শুনে যেন মম নিবেদন।
বারেক পাইলে তাঁরে, ধোয়াইব অশ্রুধারে
তাই সেই সুকোমল কমল চরণ।
তাহারি চরণ তরে এ পাপ হৃদয় 'পরে
অধম কিঙ্করী আমি পেতেছি আসন।
আর ভাই শশধর! এই আশীর্বাদ কর,
পরদুঃখে পারি যেন করিতে রোদন,
জাগি দীর্ঘ নিশা শশি! দুঃখীর শিয়রে বসি
ঢালি যেন শান্তি সুধা তোমার মতন।

পরিতৃপ্তি

ধীরে ডুবে যায় রবি কনক বরণ,
ধরণী প্রদোষ ছা'য় ঢাকিল বদন।
রাজার প্রাসাদে আজি অভিনব সেজে সাজি
সমাগত হইয়াছে সভাসদগণ,
পরিষদ চারি ভিতে বসিয়াছে হৃষ্টচিতে
কুতূহলে মহারাজে করিয়া বেষ্টন,--
শারদ পূর্ণিমা রাতে কোটিতারা লয়ে সাথে
নীলিমায় শোভা পায় শশাঙ্ক যেমন।
মনোজ্ঞ এ দৃশ্য মরি, রাজা আসে শোভা করি
রতন খচিত রম্য কনক আসন।
আজি নিশি সুপ্রভাত আসিয়াছে সুসংবাদ
পরাজিত হইয়াছে রাজ-শত্রুগণ।
বিজয় গরবে রাজ হরষে কহিল, 'আজ
সুখের সাগরে মম ডুবিয়াছে মন।
অরি-জয় করিয়াছি, চিন্তা ভয় ত্যজিয়াছি,--
শোক দুঃখ আদি দূর হয়েছে এখন।
বুঝি কেহ সুখী নাই আমার মতন।'
অদূরে (প্রাসাদ পার্শ্বে) বিটপীর ছায়
বোরহান, দাঁড়ায়ে আছে অনাবৃত কায়।
কিছুমাত্র নাই তার,--পরণে বল্কল সার
মাঠে, তরুতলে শুয়ে রজনী কাটায়
যেখানে যা কিছু পায় ফুল্লচিত্তে তাই খায়
কদাচ ভাবে না 'কাল কি খাইব, হায়!'
রাজা যাহা বলেছিল, তাহা শুনে সে কহিল,
'আমি আছি মহাসুখী বিধির কৃপায়।

দিনেকের তরে পেয়ে সুখ তাহে মত্ত হয়ে
কী বলিলে মহারাজ ?--শুনে হাসি পায়!
চিন্তা ভয় অনুক্ষণ আকুলিত করে মন,--
তাই তব সম সুখী নাই এ ধরায় ?
তুমি সুখী একদিন, আমি তুষ্ট চিরদিন
কখন জানি না দুঃখ তোমাদের ন্যায়।
সদানন্দ এ হৃদয় জানে না ভাবনা, ভয়--
সুখের স্বপনসম দিন বয়ে যায়।'
রাজা বলে,'হে ফকির, দেখিয়া বয়ান
তব, ভেবেছিনু দীন তোমার সমান
নাই কেহ এ মহীতে,এবে লজ্জা পাই চিতে
দেখিয়া তোমার তৃপ্তি, তুমি ভাগ্যবান!
তবে এই মুদ্রা ধর, আমারে বাধিত কর
লইয়া আমার এই বস্ত্র মূল্যবান।'
বোরহানা বলিল, 'ভাই! কিছু প্রয়োজন নাই,
দীন আমি কি বা জানি শালের সম্মান ?'
রাজা বলে, 'ক্লেশ পাও শীতে, তবু নাহি চাও
গ্রহণ করিতে কেন এই রাজদান।'
ফকির তখন কয়, 'শুন রাজা মহাশয়,
শীত গ্রীষ্ম মোর তরে একই সমান।
ধন লয়ে কী করিব ? অযতনে ফেলে দিব,--
নাই যে আমার রাজা। রাখিবার স্থান,--
তব শাল, মুদ্রা তাই করি প্রত্যাখ্যান।'
অনেকেই ভাবে তৃপ্তি ধনে মানে হয়,
কিছুতে নাশিতে নারে অতৃপ্তি দুর্জয়!
তৃপ্তি লভিবার তরে এটা সেটা লাভ করে,
ও শুধু মনের ভ্রম আর কিছু নয়।
তৃপ্তি বিধাতার দান, তৃপ্তি দিয়ে যে পরাণ
বিধি তুষিয়াছে--তৃপ্তি সেইখানে রয়।

স্বার্থপরতা

তোমরা যে বল 'পরার্থপরতা'
কী অর্থ সে কথাটার ?
পরের লাগিয়া আজ বিসর্জন--
বলিদান আপনার।
'পরার্থপরতা করে কি পরাণ
দারুণ যাতনাময় ?'

"মহান হৃদয় আত্মবিসর্জনে
সুখী হয় অতিশয়।"
তবে কেন বল 'আত্মবিসর্জন ?'
বল--'সুখ আপনার!'
সকলে কেবল খোঁজে 'আত্মসুখ'--
'স্বার্থহীন' কে আবার ?
স্বার্থপর হেরি বিশ্ব চরাচর
কে আছে 'পরার্থপর'?
এত ছল কেন? সোজা কথা বল,
'সকলেই স্বার্থপর।'
স্বার্থপরতাই প্রচ্ছন্ন যেখানে
পরার্থ তারেই কয়।"
সত্য কথাই বলি, 'পরার্থপরতা"
ও কোন কথাই নয়।
দস্যু অপরের সর্বস্ব লুটিয়া
যথা পুলকিত হবে
দানবীর তথা সর্বস্ব বিলায়ে
পরম আনন্দ লভে।
শুধু বল, রুচি যেমন যাহার
তাঁর সুখ সেই মতো।
কোন রোগী জল দেখি' হয় ভীত
কেহ জলে সুখী কত!
খল সুখী হয় চাতুরী কৌশলে
ফিরে সর্বনাশ তরে,
লোক হিতকর চিন্তায় সুজন
স্বর্গসুখ লাভ করে।
পাষণ্ড নিঠুর দুর্বলে পীড়িয়া
হয় চরিতার্থ, হায়।
দয়াবীর জন মুছা'য়ে পরের
শোকাশ্রু সান্ত্বনা পায়।
শুবরে পোকা যত ভালবাসে শুধু
ঘৃণিত দুর্গন্ধভার।
মধুপ ভ্রমর ভালোবাসে ফুল,
ফুলের অমিয় ধারা।
তাই বলি, রুচি যেমন যাহার
সেইরূপ সুখ তার
সবে স্বার্থপর, 'পরার্থপরতা'
কথা শুধু ছলনার ॥

আহা!
কি শান্তির কোলে নীরবে ঘুমাও রাণি।
তুষার আম্বরে ঢাকি মোহন মূরতিখানি।
নাই কি তোমার রাজ্যে জনতার কোলাহল,
গাহে না কি কলকণ্ঠ মুখর বিহগ দল ?
নাই কি কুসুম তথা,--অলির ঝঙ্কার নাই ?
নির্বিবাদে শিশু হেন নিদ্রিতা রয়েছে তাই।
হিমাদ্রি পর্বত রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি,
তাঁহার দুহিতা তুমি, গুণে যিনি সরস্বতী।
তোমার কটাক্ষে দেবি! মহা মুখ করি হয়,
বারেক দর্শন পেলে চির মূক কথা কয়।
জাগ্রত প্রহরী সম রাশিকৃত নব ঘন
তব রাজ-অন্তঃপুরে ঘিরে থাকে অনুক্ষণ।
জলদ রক্ষক হাতে লয়ে অস্ত্র অনুকার
রক্ষিতেছে দিবানিশি ও পুরীর সিংহদ্বার
হেরিতে তোমারে তাই কত শত ভক্ত এসে
না পেয়ে দর্শন তব ক্ষুণ্নচিত্তে ফিরে দেশে।
আমিও এসেছি রাণি! তোমারে দেখিব বলে,
মাসাধিক কাল হতে আছি তব পদতলে।
কি মনে করিয়া বালা। দিলে মোরে দরশন ?
(চাতকীর পক্ষে যেন বিনা মেঘে বরিষণ।)
হেরিয়া তোমায় ওগো! কি হর্ষে ডুবিল মন
এক মুখে কি প্রকারে করিব তা বরণন।
বিমল অম্বরে এবে একটুকু মেঘ নাই,
যবনিকাখানি যেন উঠিয়া গিয়াছে তাই।
কত ঘুমাইবে দেবি! চেয়ে দেখ আঁখি খুলে
উষা শীর্ষে আরক্তিম অঞ্চল নিতেছে তুলে,
পূরবে বালার্ক হের, (আ মরি কি চমৎকার!)
প্রেরিছে তোমায় রাণি! স্বর্ণকার উপহার।
এখন জাগিলে দেখি হাসিছ মধুর হাসি,
মাখিতেছ বর অঙ্গে কনক-কিরণ-রাশি।
পরি ঐ হৈম ছটা, কি সাজে সাজিলে বালা!
মুক্তানিভ শুক্লাম্বরে তরল সুবর্ণ ঢালা!
হেরি সে অপূর্ব কান্তি মুগ্ধ হল চরাচর,
বলিহারি, যাই আহা! কিবা রূপ মনোহর।
শ্যামল ভূধর শিরে কাঞ্চন মুকুট তুমি,

ধন্য হয় বসুমতী ঐ চারুচরণ চুমি।
তোমার স্রষ্টারে আমি করি শত নমস্কার,
তোমা হেন গিরিকাব্য অতুল রচনা যাঁর।
ধন্য সেই মহাশিল্পী, করি তাঁরে পরণাম,
যাহার কৃপায় মম পূর্ণ হল মনস্কাম।

প্রবাসী রবীণ ও তার জন্মভূমি

রবীণ। সীমান্ত প্রদেশ হতে সীমান্তের পথে
যাইতে হইল দেখা স্বদেশের সাথে
ভাবিয়া মায়ের মুখ উথলি উঠিল বুক,--
চলিলাম নত শিরে না দেখিনু চেয়ে
জননী কহিল তবে সম্মুখীন হয়ে :--
(স্বদেশের উক্তি)
'রবীণ নীরব কেন এতদিন ধরি ?
গাওরে বিহগ, গান প্রাণ মুগ্ধ করি।

বারেক স্বদেশ পানে চাই অনুরাগে,
বিদায় সঙ্গীত গাও বসন্তের রাগে।'
(রবীণের উত্তর)
জননি! করুণ স্বরে কেন ডাক আর
'অনুরাগে, নিজপানে চাহ একবার ?'
ও কথা আবার প্রাণে, অতীতের স্মৃতি আসে
পরাণ গলিয়া চোখে বহে শত ধার।
কি বলিব পোড়া মুখে, বলি কিন্তু বড় দুঃখে
চাহিতে তোমার পানে পারি না যে আর।
এখন হয়েছ তুমি তস্করের লীলাভূমি
আমাদের বাসযোগ্য নহ তুমি আর।
পাথর পাতকী সব এবে অধিবাসী তব,
হৃদয় বিদরে হেরি দুর্গতি তোমার।
কোথা তব ধর্মনীতি, কোথায় সে শান্তি প্রীতি ?
এবে তুমি জনয়িত্রী মায়া ছলনায়।
কেন মা! করুণ স্বরে ডাকিলে আবার ?
বড় জ্বালা মাতঃ বিদেশে এসেছি,
বড় দুঃখে জননী গো। তোমায় ত্যজেছি।
সেই স্নেহপূর্ণ ভোর, বিজন অরণ্য ঘোর,
তেমন মুখর স্থান কোথা কী দেখেছি ?
কি যে সুখ ছিল তায় বলিতে পারি না হায়।
ওই মাতৃকোলে বসে স্বরূপ ভুলেছি।

পেয়ে ঐ মাতৃবুক ভুলেছি বেদনা দুখ,
কুটীরে থাকিয়া মাগো! প্রাসাদ ভেবেছি।
জনম ভূমিরে হায়! সহজে কি ছাড়া যায়?
স্বর্গাধিক গরীয়সী তোমারে জেনেছি।
পাষাণে বাঁধিয়া মন, সেই রম্য তপোবন
তোমার স্নেহের কোল, তবু যে ত্যজেছি।
বড় জ্বালা পেয়ে মাগো! বিদেশ এসেছি।
সেই লতা পাতা ঘেরা ছোট নীড়খানি,
চারদিকে বিভীষণ শ্যাম অরণ্যানী,
খল, দস্যু ও তরস্কর শার্দূলাদি নিশাচর,
নানারূপে নিপীড়ন করিত। জননি!
সেই যে নিঠুর রাতে প্রাণটুকু নিয়ে হাতে
অনিদ্রায় জাগিতাম সারাটি রজনী
অবশেষে যে সময় নিতান্ত অসহ্য হয়,
তখন আসিনু ছাড়ি তোর বুকখানি
সেই লাতা পাতা ঘেরা স্নেহ নীড়খানি
'রবীণ নীরব কেন এতদিন ধরি?'
কি গান গায়িব মাতঃ! প্রাণ মুগ্ধ করি?
সে কোমল ফুল্ল প্রাণে সংসারের বিষবাণে
শত ছিদ্র হইয়াছে--তাই জ্বলে মরি।
এবে দেখি সমুদয় অনল গরলময়,
সুখের সঙ্গীত তাই গিয়াছি বিস্মরি!
সেদিনের সুধাকরে আজি হলাহল করে,
যে সৌন্দর্য্য দেখিতাম আজি আঁখি ভরি,
সে সৌন্দর্য্য নাই ভবে কী হইল? বুঝি তবে
বিগত শৈশব সব লয়ে গেছে হরি।
এখন পরাণ যেন হয়েছে মরুভূ হেন
দুখের সঙ্গীত গায় হৃদি দীর্ণ করি।
শুনি সে করুণ গীতি মনে কি পাইবে প্রীতি,
হইবে কি সুখী মাতঃ! আপনা পাসরি?
রবীণ নীরব তাই এতদিন ধরি?
যাও মাতঃ চলি আর পথ রোধিও না,
নীরবে সরিয়া যাও, কথা কহিও না।
করুণা মমতা রাশি আবার উঠিবে ভাসি
কাজ কি? নিবানো বহ্নি আর জ্বালিও না।
বলিয়ে স্নেহের কথা মরমে দিও না ব্যথা
নিদ্রিত স্মৃতিতে জাগায়ে দিও না।
আমি দীর্ঘশ্বাস আর মুখপানে বার বার
করুণ নয়নে মাগো! পুণ্য চাহিও না।
যাও না নীরবে চলি পথ রোধিও না।

SULTANA'S DREAM

SULTANA'S DREAM

One evening I was lounging in an easy chair in my bed-room and thinking lazily of the condition of Indian womanhood. I am not sure whether I dozed off or not. But, as far as I remember, I was wide awake. I saw the moonlit sky sparkling with thousands of diamond-like stars, very distinctly.

All on a sudden a lady stood before me; how she came in, I do not know. I took her for my friend, Sister Sara.

'Good morning,' said Sister Sara. I smiled inwardly as I knew it was not morning, but starry night. However, I replied to her, saying, 'How do you do?'

'I am all right, thank you. Will you please come out and have a look at our garden?'

I looked again at the moon through the open window, and thougt there was no harm in going out at that time. The men-servants outside were fast asleep just then, and I could have a pleasant walk with Sister Sara.

I used to have my walks with Sister Sara, when we were at Darjeeling. Many a time did we walk hand in hand and talk-light heartedly in the Botanical gardens there. I fancied, Sister Sara had probably come to take me to some such garden, and I readily accepted her offer and went out with her.

When walking I found to my surprise that it was a fine morning. The town was fully awake and the streets alive with bustling crowds. I was feeling very shy, thinking I was walking in the street in broad daylight, but there was not a single man visible.

Some of the passers-by m ade jokes at me. Though I could not understand their Language, Yet I felt sure they were joking. I asked my friend, 'What do they say?'

'The woman say that you look very mannish.'

'Mannish?' Said I, 'What do they mean by that?'

'They mean that you are shy and timid like men.'

'Shy and timid like men?' It was really a joke. I became very nervous, when I found that my companion was not Sister Sara, but a stranger. Oh, What a fool had I been to mistake this lady for my dear old friend, Sister Sara.

She feit my fingers tremble in her hand, as we were walking hand in hand.

'What is the matter, dear, dear?' She said affectionately.

'I feel somewhat awkward', I said in a rather apologising tone, 'as being a purdahnishin woman I am not accustomed to walking about unveiled.'

'You need not be afraid of coming across a man here, Ladyland, free from sin and harm. Virtue herself reigns here.'

By and by I was enjoying the scenery. Really it was very [illegible] mistook a patch of green grass for a velvet cushion. Feeling as if I were walking on a soft carpet, I looked down and found the path covered woth moss and flowers.

'How nice it is', Said I.

'Do you like it?' asked Sister Sara. (I continued calling her 'Sister Sara,' and she kept calling me by my name.)

"Yes, very much; but I do not like to tread on the tender and sweet flowes.'

'Never mind, dear Sultana; Your treading will not harm them; they are street flowers.'

"The whole place looks like a garden,' said I admiringly. 'You have arranged every plant so skilfully.'

'Your Calcutta could become a nicer garden than this, if only your countrymen wanted to make it so.'

'They would think it useless to give so much attention to horticulture while they have so many other things to do.'

'They could not find a better excuse'; said she with smile.

I became very curious to know where the men were. I met more than a hundred women while walking there, but not a single man.

'Where are the men?' I asked her.

'In their proper places, where they ought to be.'

'Pray let me know what you mean by 'their proper places.'

'O, I see my mistake, you cannot know our customs, as your were never here before . We shut our men indoors.'

'Just as we are kept in the Zenana?'

'Exactly so.'

'How funny,' I burst into a laugh. Sister Sara Laughed too.

'But dear Sultana, how unfair it is to shut in the harmless women and let loose the men.

'Why? It is not safe for us to come out of the zenana, as we are naturally weak.'

'Yes, it is not safe so long as there are men about the streets, nor is it so when a wild animal enters a marketplace.'

'Of course not.'

'Suppose, some lunatics escape from the asylum and begin to do all sorts of mischief to men, horses and other creatures, in that case what will your countrymen do?'

'They will try to capture them and put them back into their asylum.'

'Thank you! And you do not think it wise to keep sane people inside an asylum and let loose the insane?'

'Of course not!' said I laughing lightly.

'As a matter of fact, in your country this very thing is done! Men, who do or at least are capable of doing no end of mischief, are let loose and the innocent women shut up in the zenana! How can you trust those untrained men out of doors?'

'We have no hand or voice in the management of our social affairs In India man is lord and master. He has taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the zenana.'

'Why do you allow yourselves to be shut up?'

'Because it cannot be helped as they are stronger than women.'

'A lion is stronger than a man, but it does not enable him to dominate the human race. You have neglected the duty you owe to yourselves and you have lost your natural rights by shutting your eyes to your own interests.'

'But my dear sister Sara, if we do everything by ourselves, what will the man do then?'

'They should not do anything, excuse me; they are fit for nothing. Only catch them and put them into the zenana.'

'But would it be very easy to catch and put them inside the four walls?' said I, 'And even if this were done, would all their business, political and commercial—also go with them into the zenana!'

Sister Sara made no reply. She only smiled sweetly. Perhaps she thought it useless to argue with one who was no better than a frog in a well.

By this time we reached sister Sara's house. It was situated in a beautiful heart-shaped garden. It was a bungalow with a corrugated iron roof. It was cooler and nicer than any of our rich buildings. I cannot describe how neat and how nicely furnished and how tastefully decorated it was.

We sat side by side. She brought out of the parlour a piece of embroidery work and began putting on a fresh design.

'Do you know knitting and needle work?'

'yes, 'we have nothing else to do in our zenana.'

'But we do not trust our zenana members with embroidery!' she said laughing,' as a man has not patience enough to pass thread through a needlehole even!'

'Have you done all this work yourself?' I asked her pointing to the various pieces of embroidered teapoy colths.

'yes.'

'How can you find time to do all these? You have to do the office work as well? Have you not?'

'Yes. I do not stick to the laboratory all day long. I finish my work in two hours.'

'In two hours! how do you manage? In our land the officers, magistrates—for instance, work seven hours daily.'

'I have seen some of them doing their work. Do you think they work all the seven hours?'

'Certainly they do!'

'No, dear Sultana, they do not. They dawdle away their time in smoking. Some smoke two or three choroots during the office time. They talk much about their work, but do little. Suppose one choroot takes half an hour to burn off, and a man smokes twelve choroots daily: then you see, he wastes six hours every day in sheer smoking.'

We talked on various subjects; and I learned that they were not subject to any kind of epidemic disease—nor did they suffer from mosquito-bites as we do. I ws very much astonished to hear that in Lady land no one died in youth except by rare accident.

Will you care to see our kitchen?' She asked me.

With pleasure, said I, and we went to see it. Of course the men had been asked to clear off when I was going there. The kitchen was situated in a beautiful vegetable garden. Every creeper, every tomato plant was itself and ornament. I found no smoke, nor any chimney either in the kitchen,—it was clean and bright; the windows were decorated with flower garlands. There was no sign of coal or fire.

'How do you cook?' I asked.

'With solar heat', She said, at the same time showing me the pipe, through which passed the concentrated sunlight and heat. And she cooked something then and there to show me the process.

'How did you manage to gather and store up the sun heat?' I asked her in amazement .

'Let me tell you a little of our past history then. Thirty years ago, when our present Queen was thirteen years old, she inherited the throne. She was Queen in name only, the prime-minister really ruling the country.

'Our good Queen liked science very much. She circulated an order that all the women in her country should be educated. Accordingly a number of girl's schools were founded and supported by the Government. Education was spread far and wide among women. And early marriage also was stopped. No woman was to be allowed to marry before she was twenty-one. I must tell you that, before this change we had been kept in strict-purdah.'

'How the tables are turned,' I interposed with a laugh.

'But the seclusion is the same,' she said, 'In a few years we had separate Universities, where no men were admitted.

'In the capital, where our Queen lives, there are two Universities. One of these invented a wonderful baloon, to which they attached a number of pipes. By means of this captive baloon which they managed to keep afloat above the cloud-land, they could draw as much water from the atmosphere as they pleased. As the water was incessantly

being drawn by the University people no cloud gathered and the ingenious Lady Principal stopped rain and storms thereby.'

'Really! Now I understand why there is no mud here! said I. But I could not understand how it was possible to accumulate water in the pipes. She explained to me how it was done; but I was unable to understand her, as my scientific knowledge was very limited. However, she went on:—

'When the other University came to know of this, they became exceedingly jealous and tried to do something more extraordinary still. They invented an instrument by which they could collect as much sunheat as they wanted. And they kept the heat stored up to be distributed among other as required.

'While the women were engaged in scientific researches, the men of this country were busy increasing their military power. when they came to know that the famale Unversities were able to draw water from the atmosphere and collect heat from the sun, they only laughed at the members of Universities and called the whole thing 'a sentimental nightmare'!'

'Your achievements are very wonderful indeed! But tell me, how you managed to put the men of your country into the zenana. Did you entrap them first?'

'No.'

'It is not likely that they would surrender their free and open air life of their own accord and confine themselves within the four walls of the zenana! They must have been overpowered.'

'Yes, they have been!'

'By whom?-by some lady-warriors, I suppose?'

'No, not by arms.'

'Yes, it cannot be so. Men's arms are stronger than women's'.

'Then?'

'By brain.'

'Even their brains are bigger and heavier then women's. Are they not?'

'Yes, but what of that? An elephant also has got a bigger and heavier brain than a man has. Yet man can enchain elephants and employ them, according to their own wishes.'

'Well said, but tell me please, how it all actually happened. I am dying to know it!'

'Women's brains are somewhat quicker than men's. Ten years ago, when the military officers called our scientific discoveries a sentimental nightmare,' some of the young ladies wanted to say something in reply to those remarks. But both the Lady-Principals restrained them and said, they should reply, not by word, but by deed, if ever they got the opportunity. And they had not long to wait for that opportunity.'

'How marvellous!' I heartily clapped my hands.

'And now the proud gentlemen are dreaming sentimental themselves.

'Soon afterwards certain persons came from a neighbouring try and took shelter in ours. They were in trouble having committed some political offence. The king who cared more for power than good government asked our king-hearted Queen to hand them over his officers. She refused, as it was against her principle to turn refugees. For this refusal the king declared war against our country.

'Our military officers sprang to their feet at once and marched out meet the enemy.'

'The enemy however, was too strong for them. Our soldiers fought bravely, no doubt, But in spite of all their bravery the foreign army advanced step by step to invade our country.

'Nearly all the men had gone out to fight; even a boy of sixteen had not left home. Most of our warriors were killed, the rest driven back and the enemy came within twenty-five miles of the capital.

'A meeting of a number of wise ladies was held at the Queen's palace to advise and to what should be done to save the land.

'Some proposed to fight like soldiers; others objected and said that women were not trained to fight with swords and guns; nor were they accustomed to fighting with any weapons. A third party regretfully remarked that they were hopelessly week of body.

'If you cannot save your country for lack of physical strength,' said the Queen, try to do so by brain power.

'There was a dead silence for a few minutes. Her Royal Highness said again, 'I must commit suicide if the land and my honour are lost.'

'Then the Lady principal of the second University, (who had graduated sun-heat), Who had been silently thinking during the consultation, remarked that they were all but lost; and there was little hope left for them. There was however, one plan which she would like to try, and this would be her first and last efforts; if she failed in this, there would be nothing left but to commit suicide. All present solemnly vowed that they would never allow themselves to be enslaved, on matter what might happened.'

'The Queen thanked them heartily, and asked the Lady Principal to try her plan.'

'The Lady Principal rose again and said, 'before we go out the men must enter the zenanas. I make this prayer for the sake of purdah.' 'Yes, of course, replied her Royal Highness.'

'On the following day the Queen called upon all men to retire into zenanas for the sake of honour and liberty.

'Wounded and tired as they were, they took that order rather as a boon! They bowed low and entered the zenanas without uttering a

gle word of protests. They were sure that there was no hope for this country at all.

'Then the Lady Principal with her two thousand students marched to the battle-field, and arriving there directed all the rays of the concentrated sun-light and heat towards the enemy.

'The heat and light were too much for them to bear. They all ran away panic-stricken, not knowing in their bewilderment how to counteract that scorching heat. When they fled away leaving their guns and other ammunitions of war, they were burnt down by means of the same sun-heat.

' Since then no one has tried to invade our country any more.'

'And since then your country-men never tried to come out of the zenana?'

'Yes, they wanted to be free. Some of the Police Commissioners and District Magistrates sent word to the Queen to the effect that the Military officers certainly deserved to be imprisoned for their failure; but they never neglected their duty and therefore they should not be punished and they prayed to be restored to their respective offices.

'Her Royal Highness sent them a circular letter intimating to them that if their services should ever be needed they would be sent for, and that in the meanwhile they should remain where they were.

'Now that they are accustomed to the purdah system and have ceased to grumble at their seclusion, we call the system 'Murdana' instead of 'Zenana.'

'But how do you manage' I asked Sister Sara, 'to do without the police or Magistrates in case of theft or murder?'

'Since the `Murdana' system has been established, there has been no more crime or sin; therefore we do not require a police-man to find out a culprit, nor do we went a Magistrate to try a criminal case.'

'That is very good, indeed. I suppose if there were any dishonest person, you could very easily chastise her. As you gained a decisive victory without shedding a single drop of blood, you could drive off crime and criminals too without much difficulty!'

'Now, dear Sultana, will you sit here or come to my parlour? she asked me.

'Your kitchen is not inferior to a queen's boudoir!' I replied with a pleasant smile, but we must leave it now; for the gentlemen may be cursing me for keeping them away from their duties in the kitchen so long.' We both laughed heartily.

'How my friends at home will be amused and amazed, when I go back and tell them that in the far-off Ladyland, ladies rule over the country and control all social matters, while gentlemen are kept in the murdanas to mind babies, to cook and to do all sorts of domestic work; and that cooking is so easy a thing that it is simply a pleasure to cook!'

'Yes, tell them about all that you see here.'

'please let me know, how you carry on land cultivation and [illegible] plough the land and do other hard manual work.'

'our fields are tilled by means of electricity, which supplies [illegible] power for other hard work as well and we employ it for our aerial [illegible] veyances too. We have no rail road nor any paved streets here.'

'Therefore neither streets nor railway accidents occur here,' said I. 'Do not you ever suffer from want of rainwater?' I asked.

'Never since the' water baloon' has been set up. You see the [illegible] baloon and pipes attached thereto. By their aid we can draw as much rain water as we require. Nor do we ever suffer from flood or thunder storms. We are all very busy making nature yield as much as she can. We do not find time to quarrel with one another as we never sit idle. Our noble Queen is exceedingly fond of Botany. it is her ambition to convert the whole country into one grand garden.'

'The idea is excellent. What is your chief food?'

'Fruits.'

'How do you keep your country cool in hot weather? we regard the rainfall in summer as a blessing from heaven.'

'When the heat becomes unbearable, we sprinkle the ground with plentiful showers drawn from the artificial fountains. And in cold weather we keep our room warm with sun-heat.'

She showed me her bathroom, the roof of which was removable. She could enjoy a shower bath whenever she liked by simply removing the roof (which was like the lid of a box) and turning on the tap of the shower pipe.

'You are lucky people!' ejaculated I. 'You know no want. What is your religion, may I ask?'

'Our religion is based on Love and Truth. It is our religious duty to love one another and to be absolutaly truthful. If any person lies, she or he is—'

'Punished with death?'

'No; not with death. We do not take pleasure in killing a creature of God,—specially a human being. The liar is asked to leave this land for good and never to come to it again.'

'Is an offender never forgiven?'

'Yes, if that person repents sincerely.'

'Are you not allowed to see any man, except your own relations?'

'No one except sacred relations.'

'Our circle of sacred relations is very limited to, even first cousins are not sacred.'

'But ours is very large; a distant cousin is as sacred as a brother.'

'That is very good. I see Purity itself reigns over your land. I should like to see the good Queen, who is so sagacious and far-sighted and

who has made all these rules.

'All right,' said Sister Sara.

Then she screwed a couple of seats on to a square piece of plank To this plank she attached two smooth and well-polished balls. When I asked her what the balls were for, she said, they were hydrogen balls and they were used to overcome the force of gravity. The balls were of different capacities to be used according to the different weights desired to be overcome. She then fastened to the air-car two wing-like blades, which, she said, were worked by electricity. After we were comfortably seated she touched a knob and the blades began to whirl, moving faster and faster every moment. At first we were raised to the height of about six or seven feet and then off we flew. And before I could realize that we had commenced moving we reached the Garden of the Queen.

My friend lowered the air-car by reversing the action of the machine, and when the car touched the ground the machine was stopped and we got out.

I had seen from the air-car the Queen walking on a garden path with her little daughter (who was four years old) and her maids of honour.

'Halloo! you here!' cried the Queen addressing Sister Sara. I was introduced to Her Royal Highness and was received by her cordially without any ceremony.

I was very much delighted to make her acquaintance. In course of the conversation I had with her, the Queen told me that she had no objection to permitting her subjects to trade with other countries. 'But', she continued, 'no trade was possible with countries where the women were kept in the zenanas and so unable to come and trade with us. Men, we find, are rather of lower morals and so we do not like dealing with them. We do not covet other people's land, we do not fight for piece of diamond though it may be a thousant-fold brighter than the Koh-i-Noor, nor do we grudge a ruler his Peacock Throne. We dive deep into the ocean of knowledge and try to find out the precious gems, which Nature has kept in store for us. We enjoy nature's gifts as much as we can.'

After taking leave of the Queen, I visited the famous Universities, and was shown over some of their manufactories, laboratories and observatories.

After visiting the above places of interest we got again into the air-car, but as soon as it began moving I somehow slipped down and the fall startled me out of my dream. And on opening my eyes, I found myself in my own bed-room still lounging in the easy-chair!!

প্রবন্ধ

GOD GIVES, MAN ROBS

There is saying, 'Man proposes, God disposes,' but my bitter experience shows that God gives, Man Robs. That is, Allah has made no distinction in the general life of male and female--both are equally bound to seek food, drink, sleep, etc. necessary for animal life. Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on.

Our great Prophet has said 'Talibul Ilm farizatu ala kulli Muslimeen-o-Muslimat', (i. e. it is the bounden duty of all Muslim males and females to acquire knowledge). But our borthers will not give us our proper share in education. About sixty years ago, they were opposed to the study of English even for males ; now they are reaping the harvest to their bitter experience. In India almost all the doors to wealth, health, and wisdom are shut against Muslims on the plea of inefficiency. Some papers conducted by Muslims may or may not admit this-but fact is fact-the Inefficiency exists and stares us in the face! Let me also venture to say that it is so ; for children born of well-educated mothers must necessarily be superior to Muslim children, who are born of illiterate and foolish mothers. The late Lady Shamsul Huda by way of conversation often used to say that the Muslim public abused her husband because he had given certain high posts to Hindus ignoring Muslim claims, but they failed to see their own fault that such and such Muslim gentlemen were really unfit for the posts.

It is an irony of fate that the Hindus, who are bound by their cart-load of Shastras to treat women like slaves and cattle and to get their daughters married before they are hardly above their girlhood, i. e, within ten years of age, are, as a matter of fact, allowing the greatest liberty to their womenfolk and giving them high education. They are trying to get laws passed against child-marriage raising the age to sixteen years though their Pandits are loud in proclaiming the attempt as `unworthy of a Hindu', and they are devising means to popularize widow-marriage, heedless of their Pandits, who quote Shastras saying `not only should a woman refrain from marrying a second time but she should reduce her body by living only on fruits, roots, flowers, etc. after her husband's death.'

On the other hand, while Islam allows every freedom to women (so much so that a woman cannot be given in marriage without her consent o free will, which indirectly prohibits childmarriage) we see people giving away their daughters in marriage at tender ages or

giving them in marriage without their consent. Many a [illegible] bitterly bewails her fate on being compelled to marry a [illegible] whom she knows to be a drunkard or an old man of [illegible] marriage celebration proceeds despote her silent protest. [illegible] called respectable families in our socity take pride in [illegible] window-marriage, no matter whether the window be a girl of [illegible] or a child of seven years of age !

The worst crime which our brothers commit against us [illegible] deprive us of education. There is always some grandfather or [illegible] ly uncle who stands in the way of any poor girl who might wish be deucated. From experience we find that mothers are gener[illegible] willing to educate their girls, but hey are quite helpless when the husbands and other male relations will not hear of girls attending school. May we challenge such grandfathers, fathers or uncles to show the authority on which they prevent their girls from acquiring education? Can they quote from the holy Quran or Hadis any injunction prohibiting women from obtaining knowledge?

We know there are Mussalmans of advanced ideas who are anxious to givr their daughters a good education, but for want of a suitable High school for Muslim girls they cannot have their wishes fulfilled, and so they groan under the wretched social system. Why cannot the public of Calcutta support one ideal school for Muslim girls? Such a High English School with boarding accommodation and hostel, which can supply the demands of all the different classes of people, high and low, is very badly needed in Calcutta. On our part we are willing to convert this school (we mean the Sakhawat Memorial Girls' School) to that ideal one, provided we get public support and money enough to meet the cost of up keep.

EDUCATIONAL IDEALS FOR THE MODERN INDIAN GIRL

From the most ancient times there has existed in India a system of education which though distinct in its characte. stics and ideals from the modern western system has produced great men and earnest seekers after truth. This ancient Indian Education developed in the early period of history the science of grammer and mathematics. It has enabled India to make the mark in the sphere of high philosophy and metaphysics. Conditions of life have changed considerably from those prevalent in those early days and to work out without many essential modifications ancient theories and practices in education is by no means a practical proposition. Yes we must seek the elements of value in our ancient heritage. We must assimilate the old while holding to the now. Thus will we render more beneficial

our present educational system, the great defect of which is that it is an exotric in an alien soil, It is unsuited to our needs and requirements and incapable of developing the distinctive thread of our national thought and culture.

If education is described as the preparation for life or for complete living the Indian educator had formed of it a true and valuable conception. The ancient curriculum was not confined to mere book-learning. It included many more things, Physical development received its due share of attention. In those early days little was known of our vast expenditure on costly buildings. The place of instruction was outdoor under the shade of a tree, in a natural environment which impressed what was learnt all th more deeply on the mind. The student's life was, moreover, one of healthy activity, for he had to work for the teacher in his house and on the field, looking after his cattle and even collecting alms for him. Moral education was similarly not neglected. The period of studentship was a time for vigorous discipline. Rigid rules were laid down for the conduct of the pupils including hygienic, moral and religious precepts and the regulation of good manners. Implicit obedience was expected and obtained from the student by the teacher and there were elaborate rules for the respect due to the latter.

The modern demand is for an education which develops all the faculties, Physical, moral and mental, From what we know of the ancient system of education in this country methods were followed which conduced to the achievement of this aim. Those were days before science was known or had changed the possibilities of existence. Yet in this civilised and advanced generation we must acknowledge the value of Indian methods. The necessity for open air schooling as far as practicable is emphasised by us today. Healthy outdoor sports are recommended to keep up the physique of the student and the value of moral training is endorsed. We are thus advancing in a right direction. What we should recognise, however, is that our educational goal is age old. We are not experimenting with new fancied ideas but are adopting traditions or our ancient system in introducing what we consider are twentieth century educational reforms. Thus progress be accelerated, for the Indian mind is slow to accept innovation but that which is traditional and of proved utility finds ready favour.

Religion is a tremendous force and the chief concerns of all Asiatic people. From start to finish Eastern Philosophy and literature are religious. In India religion has pervaded education as all things else. The very purpose of education in the early ages was religious, namely, to train young Brahmans for their duties in life as priest and teachers of others. Thus the spiritual side of education

was greatly stressed. The idea of educational discipline was extended to the whole of life and the theory of Asrams or stages those of student, house holder hermit and wandering ascetic was developed. The student was first to acquir learning. He was next to enter upon the 2nd stage that of grihasta or house holder. Then after having brought up a family and done his duty in the world he would enter upon the life of a Vanprastha or forest hermit and later become a `Sannyasi' or wandering ascetic. The ancient Brahmanic education was therefore not only a preparation for the life but for a future existence as well.

In this utilitarian age when religion is treated as obsolete and the all engrossing objective ordinarily are personal ambition and the advancement of material prosperity it becomes all the more necessary for us to retain our ancient ideals. We should try as in the post to teach true values and give the students a guidance for all duties and relations of life...the practical duties of life. At a later stage of history in India (as in the Middle age in Europe) a tendency arose to life. The current Philosophy taught the unreality of the world and that the highest wisdom was to...release from worldly fetters. But Islam has disapproved strongly of extreme other worldliness. The Holy quaran has declared against the monastic life, for if all were to forsake the world the bonds of society would soon be broken. In our daily prayers we Muslims beseech Allah saying. `Our Lord grant us good in this world and good in the hereafter.' Our sin should be to hermonise in due proportion the two Purposes, spiritual and secular, in the education we impart. Much can be done in accomplishing this aim by impressing on the girls the excellence of our ancient ideals and of the life of great national heroes.

One of the most notable characteristics of Indian educational ideals is the relation between pupil and teacher. The Indian system knew nothing of a large institution or a large class of pupils taught together. There was usually one teacher for a few pupils from the beginning to the end of his period of studies. Thus individual attention was given. A family relationship sprang up between teacher and pupils which had a high moral effect. `In the most', writes an educationist, `it is the Institution rather than the teacher which is emphasised and it is the school or college which a student regards as his `Alma Mater'. In India it is the teacher rather than the Institution that is prominent and the same affection and reverence which a western student has for his `Alma Mater' is in India bestowed with a life long devotion upon the teacher.' It is not desirable or practicable in this democratic age when a general spread of education should be our aim to abolish large Institution. But we may

with benefit require of the teacher the high responsibility of mould-
ing the character of the pupil by personal influence and example
We must require of our teachers a high intellectual moral and spiri-
tual standard and our aim should be to work for a condition which
shall make such a class of teachers available. The teaching profes-
sion is one of the noblest in the world. Its responsibilities and
opportunities both require to be increased.

The state of the education of women in India has for long cen-
turies been deplorable. In the early Aryan period women held a
position of authority and honor. We are told in the 'Upanashads' of
women who took part in deep discussion on philosophical truths
and the authorship of some Vedic hymn is ascribed to them. Yet
even in the Rigg Veds there are indications that women were com-
ing to be looked down upon as inferior beings who should remain in
subjection to men. Education for women has therefore become
anonymous with us for breaking the barrior of ancient custom which
shut them from learing. When we advocated the education of girls
we generally imply the adoption of western methods and deals in
their training to the exclusion of all that is Indian. This mistake on
our part cannot be too strongly guarded against. We should not fail
to set before the Indian girl the great and noble ideals of women-
hood which our tradition has developed. This ideal was narrow and
circumscribed in the past. We may enlarge and widen it thus
increasing its execllence but what we should avoid is its total
neglect and a tendency to slavish imitations of Western custom and
tradition. In the past. with a few exception our women were not
noted for scholastic attainments. Their sphere was the domestic.
Yet in the obscurity of their lives they conducted their duties with
capacity and considerable amount of .... and care. Their fingers
were toilworn. The cares of family, the effort to advance the happi-
ness of others, these engrossed them. They were loyal and stead-
fast in times of endurance and hardship and proved to be in the
words of the Mahabharata—

'A companion in solitude, a father in advice. A rest in passing
through life's wilderness.'

We should by all means broaden the out-look of our girls and
teach them to modernise themselves. Yet they should be made to
realise that the domestic duties entrusted to them cover a task on
which the welfare of the country depends. They should not fall
behind their illiterate sisters in splendid endurance, heroism and
discipline. We should teach our girls if they are to fulfil their heavy
duties commendably, above all to concentrate on desires and
efforts which are not superficial. We should teach them that the art
of happiness lies just in discipline, that service should be their

watchword, even though that service may not be more than a determination 'not to a by add transient sigh to the sum total of the world's unhappiness.'

In ancient India the arts and crafts were not neglected. The caste system with its many disadvantages, helped to foster them and keep up the standard of work. The dexterity and skill of each particular trade was handed down from father to son. The teaching was by handling and observing real things and unconsiously the boy picked up from his father many secrets of the trade. The encouragement of kings and great nobles was also responsible for the production of really fine work. But in these days the tradition of vocational training has disappeared in India. Parents give no thought to the career which their boy or girl adopted by temperament to adopt, all that they desire being that their child should obtain a hallmark of the University, a degree I feel tempted to quote from a poem by Justice Akbar, which runs thus—

'Tifl men bu a's Keya me bap atwar kee. Dooth to dibbe ka hai, Ta'llm hai sicar kee'

That is, How can the infant get any scent of
its parents' character.
While it is fed on tinned milk and gets educated
by the Government?

The ancient tradition of vocational training (although this training must be given today under changed circumstances) must be revived by active propaganda.

The future of India lies in its girls. The development of its educational system on proper lines is therefore a question of permanent importance. Although India must learn many lessons from the West, to impose on it the western system without modifications to make it suitable to us is a huge mistake. India must retain the elements of good in her age old traditions of thought and methods. It must retain her social inheritance of ideas and emotions, while at the same time by incorporating that which is useful from the West a new educational Practice and tradition may be evolved which will transeend both that of East and the West.

In short, our girls would not only obtain University degrees, but must be ideal daughter, wives and mothers-or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers.

চিঠিপত্র

পত্র ১ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road.
8th Sept. 1915

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

তোমার ১৯শে আগস্টের প্রাণ জুড়ানো চিঠিখানা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। আমার মতো জ্বালাপোড়া মরুভূমি তোমার মধুর স্নেহের যোগ্য নহে। তাই দেখ না, তোমার সরস চিঠিখানা মরুভূমি একেবারে শুষিয়াই লইয়াছিল।

চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট-বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ি, দুই জোড়া ঘোড়া, সইস, কোচম্যান ইত্যাদি-ইত্যাদি সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমতো ঘোড়া মলে কি না তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে! এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনী—ইহার বিনিময় কি, জানিস? বিনিময় হইতেছে "ভাঁড় লিপকে হাত কালা" অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল-ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর। কচি মেয়েরা মা-বাপের কাছে নিজেদের বুদ্ধিমতো যাহা বোঝে, তাহাই বলে। তাহা নিয়া একটু রঙ্গ হয়। এইরূপ সুখে দুঃখে একরকম চলিয়াছে ভালই। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পরদিন দেওয়া হইবে। এখন পড়া তৈরি করিতেছি।

তোমার স্নেহের ভগিনী
রোকেয়া

পত্র ২ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road.
1-4-17

প্রাণাধিকা মেরী,

গতকল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। হাঁ বোন স্কুলের প্রাইজ গত ১৫ই মার্চে হইয়া গিয়াছে। আমি আল্লাহ্ চাহে এবার তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই বোধে যাইব। কিন্তু বোন! তুমি যদি এই মাসের আরম্ভে যাও, তবে পারিব না। কারণ আমাদের স্কুল জুন মাসে বন্ধ হইবে। তুমি যদি ১৫ই বা ১৫ইর পরে যাও, তবে আমার যাওয়া হইবে। আমাকে বিধিমত ছুটির জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। অতএব দয়া করিয়া পত্রপাঠ মাত্রই কিংবা তোমার যাত্রার তারিখ ঠিক হওয়া মাত্রই আমাকে জানাইও। মনে রাখিও লক্ষ্মী বোনটি আমার, ১০ দিনের নোটিশ না পাইলে আমি ছুটি মঞ্জুর করাইতে এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না।

তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ৩ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls, [illegible]
86-A. Lower Circular Road,
5th January 19[illegible]

কল্যাণীয়া মেরী,

খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। আলীগড়ে মাত্র তিনদিন ছিলাম। শহর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিনদিনই সভাসমিতি লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছে।

সেখানে কতো মুসলমান গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে কি আমি মুখ খুলিতে পারি? কেহ তামাসা করিয়া সংবাদপত্রে আমার বক্তৃতার কথা লিখিয়া থাকিবে। আমি শিক্ষিত মহিলাবৃন্দকে দেখিয়া পুণ্য অর্জন করিয়াছি। আমার চক্ষু কর্ণ ধন্য হইয়াছে। মুঐনুন নিসওয়াঁ (অর্থাৎ নারীকুলের সাহায্য) নামে সমিতি গঠনের জন্য জনৈক (সম্ভবতঃ অতি দরিদ্র) মহিলা হাতের আংটি খুলিয়া চাঁদার জন্য দিলেন। আলীগড়ের মেয়ে কলেজ শীঘ্রই দশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবে। আর আমাদের বাংলাদেশ—আহারে! সে কথা না বলাই ভাল। আমি যদি কিছু টাকা পাইতাম (ধর, মাত্র দুই লক্ষ) তবে কিছু করিয়া দেখাইতে পারিতাম। কিন্তু খোদা আমাকে টাকা দেন নাই।

বিল, আমার বাংলাদেশ। যদি কিছু না-ই করিস, তবে দড়ি ও কলসীর সাহায্যে তোর অস্তিত্ব লোপ করিতে পারিস্ তো! সেজন্যও আর বেশি ভাবনা নাই—ম্যালেরিয়া ও কালাআজার সে ভার লইয়াছে। আহা, বুকটা ফাটিয়া যাইতে চায়।

তোমার দুলার চিঠিও পাইয়াছি। তিনিও আমার বক্তৃতার জন্য মোবারকবাদ দিয়াছেন আরে বোরকা ঢাকা অবস্থায় দু'একটি কথা বলিয়াছি কি বলি নাই, তাহারই নাম হইল বক্তৃতা আর ব্যাটারা সব আমার নাম জানিল কিরূপে তাহাও বুঝিতে পারি না। আমি এখানে কাহাকেও বক্তৃতার কথা বলি নাই।

তোমার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ৪ : মরিয়ম রশীদকে

86-A. Lower Circular Road.
Calcutta.
19.8.26

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

অবসর অভাবে তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারি নাই, সেজন্য দুঃখিত হইও না। আমার অবসর নাই বলিয়াই এতদিন মরিতেও সময় পাই নাই। দাঙ্গায় আমরা প্রত্যক্ষ শহীদ হই নাই বটে, কিন্তু পরোক্ষে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতেছি, তন্মধ্যে প্রধান দুইটি এই—(১) অনেক লোক কলকাতা ত্যাগ করায় স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা কমিয়াছে।

(২) সর্হস কোচম্যান, দারওয়ান প্রভৃতি চাকর পাওয়া যায় না।

বোন, বলিলাম তো' মরিবার অবসর পাই না। পূর্ব্বের চেয়ে খাটুনী বাড়িয়াছে বই কমে নাই।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিনী ভগিনী
রোকেয়া

পত্র ৫ : মামলুকুল ফাতেমা খানমকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road, Calcutta.
the 9th Dec. 1926

প্রিয় খানম সাহেবা,

করুণাময় খোদাতালা আপনাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন। আপনার ৪ঠা তারিখের চিঠি পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। শোকর আলহামদোলিল্লাহ্! এখনও জীবিত আছি। আমি স্বয়ং বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হই নাই বটে কিন্তু আমার জনৈক নিকট আত্মীয়ের (অর্থাৎ হাজী এ. কে. গজনবী সাহেবের) ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক পুত্রের বেরি-বেরি রোগে মৃত্যু হওয়ায় মর্মান্তিক যাতনা পাইয়াছি।

আমি আপনার নিকট যেরূপ অপরাধিনী আছি, তাহাতে আপনি যে আমাকে "ভদ্রলোকের" খাতা হইতে খারেজ করেন নাই, ইহা আপনার সৌজন্য ভিন্ন আর কিছু নয়। আপনি আমার জীবনের ইতিহাস চাহিয়াছিলেন,—আমার জীবন? অতি নগণ্য—"কুকুরের কাজ নাই দৌড় ঝুড়া হাঁটা নাই"—আমি সেই নিষ্কর্মা কুকুর। তাই আপনার সে চিঠির উত্তরে আমার ইতিহাস পাঠাই নাই। কিন্তু তবু একটা উত্তর দেওয়া তো উচিত ছিল। সেই জন্যই তো অপরাধিনী আছি।

মিস চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ায় আপনার সিনিয়র পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, শুনিয়া আমার হাসি পাইল! বাস্! এক মিস চৌধুরীর মৃত্যুতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ট্রেনিং স্কুলটা ধ্বংস হইয়া গেল! গোটা ইংরাজ রাজত্বটা যে ধ্বংস হয় নাই, এজন্য খোদাতালার শোকর করিতে ইচ্ছা করে!

আমজাদী বেগমের ঠিকানা

6, Ice Factory Lane
Intally P. O.

আজ তবে আসি। অনেক বাজে বকিলাম। ট্রেনিং স্কুলের বাড়ি বদলান হইয়াছে, এবং পুনরায় মিস মোমগেন আসিবেন, শুনিয়াছি। এ সময় মাত্র তিন জন শিক্ষার্থিনী সেখানে আছে।

সতত আপনার কুশল কামনা করি। ইতি

আপনার খয়েরখাহ্
রোকেয়া খাতুন

পত্র ৬ : কবি খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনকে

২৫-২-২৭

কল্যাণবরেষু,

আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। এই নিন, আপনার জন্য কাজ পাঠাইলাম। ১৫০ কপি "অভিভাষণ" বিভিন্ন জেলায় বিতরণের জন্য পাঠাইয়া দিন। রেজিষ্ট্রি বুক পোষ্টে পাঠাইবেন। যাহা খরচ হয় বিনা সঙ্কোচে আদায় করিয়া লইবেন। বইগুলি আপনার পরিচিত বিশ্বাসী লোকের নিকট বিতরণের নিমিত্ত পাঠাইবেন। অন্যথা না হয়। শ্রীমান শাহাদত হোসেন নিম্নলিখিত শহরে পাঠাইবার ভার লইয়াছেন, যথা ঃ

(১) ঢাকা, (২) চট্টগ্রাম, (ব্রহ্মা) এবং রঙ্গপুর।

আপনি অবশিষ্ট জেলায় পাঠাইবেন।

দোয়া ইতি।

আশীর্ব্বাদিকা
R. S. Hossain

পত্র ৭ : মোহসেনা রহমানকে

Sakhawat Memorial Gir
86-A, Lower Circular
Cal
the 21

আমার স্নেহের মোনা,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন।.... তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি [illegible] কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে চার পাঁচটা টাকা পাঠাতে তা'তে আমি বেশি সুখী হতুম।

এক ব্যক্তি সুদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ক'রে পাঠাচ্ছেন—গত [illegible] [টাকা] পাঠিয়েছিলেন, এবার ৬৯ টাকা ছয় আনা পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার [illegible] লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক।....এই সঙ্গে স্কুলের এখানা রিপোর্ট পাঠাই।

তোমার স্নেহের [illegible]

রোকেয়া

পত্র ৮ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girls' Schoo
86/A, Lower Circular Road
Calcutta
24-3-[illegible]

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

তুমি অমন আদর করে আমাকে যেতে বলেছ। তোমার প্রত্যেকটি কথা স্নেহ মমতায় ভরা ছিল। আত্মীয়-স্বজনের মমতা কি মধুর নিজিস তা আমার মতো আত্মীয়হারা না হওয়া পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না। শুনেছি, লোকে বেহেশতে গিয়েও নাকি আত্মীয়-স্বজনের বিরহে ব্যাকুল হয়।

কিন্তু বোন গ্রীষ্মাবকাশে আমার তো কোথাও যাবার যো নেই। এই যে স্কুল সংক্রান্ত রাশীকৃত Office Work, এগুলো করবে কে? সুতরাং বেহেশ্‌তের নিমন্ত্রণ পেলেও তো [illegible] ছেড়ে যেতে পারব না।

তোমার স্নেহের [illegible]

রোকেয়া

পত্র ৯ : মোহসেনা রহমানকে

86/A, Lower Circular Road
Calcutta
30-4-[illegible]

পরম স্নেহস্পদা মোনা,

করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন...।

এবার গেল নূরী। নূরী যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, সকলের কাছে মাফ চেয়ে গেছে। সকলকে আদাব লিখতে বলে গেছে।

ভগিনী! আমার আশা নৈরাশ্যের কথা আর কি বলব! আমি তো জানিই যে,—

"জীবন এমন ভ্রম কে জানিত রে?"
"ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মতো ভগ্ন দূর্গ প্রকারে।"

আহা! "কেয়া টিড্ডি, কেয়া টিড্ডি কা রান!" কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য মানুষ, তার অন্তর আশা ভরসা! সুতরাং যে কয়দিন বেঁচে আছি খাই দাই—আরাম করি, হাসি খেলি, কাস' আর যদি পারি তো,' প্রাণভরে একটু আল্লাহ্‌কে ডাকি। তা' ছাই ডাকতেও তো পারি না। আমার মতো দুর্ভাগিনী অপদার্থ বোধ হয়, এ দুনিয়ায়, আর একটা জন্মায়নি।

শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি, প্রত্যহ থরইন পরীক্ষা করেছি। পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দুবার মা হয়েছিলুম—তাদের প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারিনি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরটি ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর এই ২২ বৎসর যাবত বৈধব্যের আগুনে পুড়ছি। সুতরাং নূরী আর আমাকে বেশি কি কাঁদাবে? সে তো বোঝার উপর শাকের আঁটি মাত্র ছিল। আমি আমার ব্যর্থ জীবন নিয়ে হেসে খেলে দিন গুণছি। আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের কুশল কামনা করি। তোমরা ভাল থাক, সুখে থাক, তাতেই আমার সুখ। দোয়া ইতি—

তোমার স্নেহের আপা

পত্র ১০ : মোহাম্মদ বাবর আলী খানকে

86/A, Lower Circular Road, Calutta.
26-6-31

সালাম পর আরজ,
শ্রীমতী রাবিয়া খাতুনের পত্রে জানিলাম, সে খোদার ফজলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং এখন এখানে আসিতে চাহে। আগামী সোমবার (২৯শে জুন) স্কুল খুলিবে। দয়া করিয়া মেয়েকে শীঘ্রই লইয়া আসিবেন।

ইতি
বিনীতা
R. S. Hossein

পত্র ১১ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

16.8.31

ভাই সাহেব,
আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। এখানে কলকাতায় ভালভাবে নিশ্বাস নেবারও যেন অবসর পাওয়া যায় না। আপনার চিঠির উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই সাংঘাতিক কাজের চাপে তলিয়ে গেলাম। ১৪ তারিখেই আমাদের মিলাদ শরীফ হল। সেজন্য ১১ই তারিখে আমাকে সব দাওয়াতের চিঠির বিলি-বন্দোবস্ত করতে হল। আর অনাসব দরকারী ব্যবস্থাও করলাম। আর এর সাথে সাথে নিত্যদিনের অফিসের কাজ তো' আছেই। আর সে কাজের চাপ আপনি না থাকার দরুন আমার ওপর দ্বিগুণ পড়েছে।

বহুদিন থেকে আপনাকে আমার ভাই ডাকবার ইচ্ছা। আপনি জানেন, আমার স্নেহময় দুই ভাইকেই আমি হারিয়েছি। তাই এই চিঠিতে আপনাকে আমি ভাই সম্বোধন করলাম।

আমার শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আল্লাহর শোকর যে, দাঁতের ডাক্তার আমার দু'চারটা দাঁত রেখে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু পেটের অসুখ ও কিডনীর গোলমাল আমার এখনো আছে, আর সেজন্য ইনজেকশনও নিচ্ছি।

ভাই সাহেব, আমাদের সমাজের কাছ থেকে আমি সম্মান বা খ্যাতি কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই যে, তাঁরা সত্যিকার মুসলমান হবার জন্য চেষ্টা করুন।

আপনি শুনে খুশী হবেন যে, মি. ইসলামও বলেন যে, তিনি ভুয়ো পর্দা প্রথার [illegible] নন। কিন্তু অনেকেই কথায় ওরকম বলে, কিন্তু কাজে দেখায় না। আমার শুভেচ্ছা [illegible] খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

রোকেয়া

পত্র ১২ : প্রাপক অজ্ঞাত

বাইবেল বলে, 'শরীরে জোর না থাকলে মনের জোরও থাকে না।' কিন্তু আমার শরীরের [illegible] না থাকলেও মনে জোর আজো আছে। কিন্তু সময় নাই। কি করে আমি বিশ্রাম নেব? [illegible] করে আমার ভাবনা কমবে? আল্লাই তো পাক কোরানে বলে দিয়েছেন, "কেউ কারো ভার [illegible] করবে না।" স্কুলের একটা বাড়ি হল না, হেড মিস্ট্রেসের ঠিক নেই। এই দু'টি সমস্যার [illegible] আবার ফরিদপুর ব্যাংক সম্বন্ধে নানা সাংঘাতিক গুজব শুনতে পাচ্ছি। ওখানে আমার [illegible] ২০,৫০০ টাকা রয়েছে। আমার মতো এক গরীব মেয়েলোককে মেরে ফেলবার জন্য এই [illegible] যথেষ্ট নয়?

পত্র ১৩ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

1. Nripendra Lodge
Ghatsila P. O.
Singhbhum-Dist.
B. N. Rly.
10-11-31

ভাই সাহেব,

কলকাতায় থাকতে আপনাকে লিখে উঠতে পারিনি। সেজন্য আপনি আমাকে কি যে ভাবছেন [illegible] কলকাতায় পৌঁছবার পরই নানা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম। অনেক কষ্টে ৮ নভেম্বর কলকাতা [illegible] ছাড়তে পেরেছি। আল্লার শোকর সেদিনই বেলা ৩টায় এখানে পৌঁছলাম, আর পৌঁছার [illegible] সাথেই আমার শরীর মন এতই প্রফুল্ল হয়ে উঠল যে, সন্ধ্যার সময়ই দেড় মাইল হেঁটে বেড়াবার [illegible] মতো জোর গায়ে এসে গেল।

কলকাতায় আমি এত ক্লান্তি বোধ করি যে তা বলতে পারি না। কলকাতা ছাড়া অন্য [illegible] কোন জায়গার আবহাওয়াই যেন আমাকে সয়। এই যেমন, জলপাইগুড়ি পৌঁছে আমি একটুও [illegible] ক্লান্ত হইনি, কিন্তু জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় নেমে মনে হল যেন আধমরা হয়ে গেছি।

আবার পরশুদিন ঘাটশীলায় এলাম বেশ তাজা ভাবেই।

আচ্ছা, আজ এ পর্যন্তই থাক। আশা করি কুশলে আছেন। সালাম ইতি—

রোকেয়া

পত্র ১৪ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

1. Nripendra Lodge
Ghatsila P. O.
14-11-31

ভাই সাহেব,

আমার ১০ তারিখে লেখা চিঠি পেয়েছেন আশা করি। এই সঙ্গে মিসেস খন্দকারকে চিঠি ও "গার্লস হোম" সম্বন্ধে আমার মন্তব্য পাঠালাম। দয়া করে ওগুলো ওঁদের কাছে পৌঁছে দেবেন।

আপনার ওখানে থাকাকালীন যে অডিটের রিপোর্ট দেখতে চেয়েছিলেন, তার কপিও এই সঙ্গে দিলাম। কলকাতায় ফিরে ফরিদপুর ব্যাঙ্কের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে আমাদের ডাইরেক্টরস্ মিটিং-এর গৃহীত প্রস্তাবাবলীর কপি ও সে সম্বন্ধে মন্তব্য যে এই অনুরোধ রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কাজেই টাকা ম্যাচিওর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। অন্যান্য খবর পরে জানাব।

আপনাদের
রোকেয়া

পত্র ১৫ : খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Nripendra Lodge
Ghatsila. P. O.
Singhbhum
B. N. Rly.
28-11-31

ভাই সাহেব,

আমার সব প্রাণখোলা হাসি যেন জলপাইগুড়িতেই রেখে এসেছি। কলকাতা নামা মাত্রই তো সব রকম ঝঞ্ঝাট এসে ঘিরে ধরল। আর এখন দেখছি যে সেগুলো এখান পর্যন্ত আমার পিছে পিছে ধাওয়া করে এসেছে, এই সব ভাবনাচিন্তা আমার গলা টিপে যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছে। এর মধ্যে আবার মি. অলিউল ইসলাম মেদেনীপুরে বদলী হয়ে যাচ্ছেন। সেক্রেটারির ভার গ্রহণের জন্য আর এক জনকে খুঁজছেন তাই এখন। উনি এতদিন কলকাতা থেকে চলে গেলেন নাকি, তাও জানি না। সত্যি করে বলতে গেলে, আমার শরীরটাই শুধু ঘাটশীলায় আছে, কিন্তু মনটা এখন কলকাতায়। দুঃখ লাগছে যে, এই জায়গাটা এখন ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠছে আর আমাকে চলে যেতে হবে। বৃষ্টি বন্ধ হয়েছে, কাদা শুকিয়ে গেছে আর ধান কাটাও হয়েছে। তাই হেঁটে বেড়াতে আরো আরাম পাওয়া যাচ্ছে।

এবার আমার ভক্তিপূর্ণ তসলিম জানিয়ে শেষ করছি।

আপনাদের
রোকেয়া

পত্র ১৬ : মোহসেনা রহমানকে

1. Nripendra Lodge
Vill. Gopalpur
Ghatsila P. O.
Singhbhim.
B. N. Rly.
28-11-31

স্নেহাস্পদা মোনা,

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার ৩০শে অক্টোবরের স্নেহলিপি সথাসময় পেয়েছি। সে সময় নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলাম বলে তোমায় লিখতে পারিনি। সে সব ঝঞ্ঝাটের ফর্দ লিখে তোমার কোমল প্রাণে আর ব্যথা দিতে চাই না। ফল কথা, শেষে ডাক্তারেরা আমাকে সার্জিলিং যেতে বারণ করায় আমি ২৫শে সেপ্টেম্বরে ঘাটশীলায় এসেছি।

কিন্তু অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কতকগুলো কাজের চাপে আমায় কলিকাতায় যেতে হয়েছিল। স্কুলের কতকগুলি জটিল কাগজপত্র নিয়ে জলপাইগুড়ি গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল

ফিরবার পথে হঠাৎ তোমার কাছে যাই। তাই আমিরকে দিয়ে চিঠি (পোঃ কার্ড) [illegible] তোমরা আমিরের জন্য প্রস্তুত থাকতে অথচ তার সঙ্গে আমাকেও ফাও স্বরূপ [illegible] আকাশের চাঁদ হাতে পেতে! কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, তাই আমির বাবাজি [illegible] করলে দেরী করে, আর তোমার উত্তর পেতে অযথা দেরী হয়ে গেল। তবু আমি নিরুপায় [illegible] নামতুম—তোমাদের আশ্চর্য করে দিতুম; কিন্তু আমিয়ের লেগে গেল সর্দী। তোমার ছোট [illegible] কলিকাতায় বোর্ডার মেয়েদের নিয়ে আছেন। উনি আমাদের সঙ্গে না থাকায় সর্বদা [illegible] জন্য আমার ভাবনা থাকে। তাই তাকে নিয়ে রাত্রি সাতটার সময় অচেনা জায়গায় [illegible] ক'রে বেড়াতে সাহস করলুম না। জান তো' ঘর পোড়া গরু আকাশে সিন্দুরে মেঘ দেখে [illegible] পায়। ট্রেনে সমস্ত রাত্রি মনঃকষ্টে আমার ঘুম হল না। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

কলিকাতার হেঙ্গাম কতক পরিমাণে চুকিয়ে আবার ঘাটশীলায় এসেছি। এখানে [illegible] ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা আছে। আগে খোদার মরজি। কলিকাতার হেঙ্গাম [illegible] ছাড়ে নাই ; ভাবনা চিন্তা সঙ্গেই আছে। আমার শরীর এখানে, মন কলিকাতায় আছে [illegible] দেখ বোন! এরূপ অবস্থায় চেঞ্জে এসে আমার কতই উপকার হবে? স্কুলের নিজের বাড়ি [illegible] গেলে, চিন্তা আনেকটা লাঘব হত; তাহলে হয়ত আমার স্বাস্থ্য ভাল হ'ত।

তবু আমি এখানে এসে আল্লাহ্‌র ফজলে অনেকটা ভাল আছি। লোকে শুনলে হাসবে [illegible] এখন কলিকাতার বাতাস আমার মোটে সয় না। সেই যে মাঝে একবার কলিকাতা [illegible] গিয়েছিলুম, তখন আবার অসুখ বেড়েছিল! আর ঘাটশীলায় এসে পৌছামাত্র আল্লাহ্‌র [illegible] ভাল হয়ে গেলুম।

তুমি যদি এণ্ডি পোকা পোষার কোন ব্যবস্থা করে দিতে পার; স্থানীয় লোকেরা এণ্ডি [illegible] পুষতে রাজী হয়, তবে ইনশাআল্লাহ্ নিশ্চয় তোমার ওখানে একবার যেতে চেষ্টা করব।

বোন! তুমি দুঃখ কর না, যদি হায়াত বাকী থাকে তো আবার দেখা হবে। তোমরা সকল আমার স্নেহাশীর্ববাদে এবং আমিরের ভক্তিপূর্ণ আদাব গ্রহণ কর। দোয়া ইতি—

তোমার স্নেহ
জ[illegible]

পত্র ১৭ : মোমেনাতুল ফাতেমাকে

14.12.[illegible]
I. Nripendra Lodge
Ghatsila P.O
Simgbhum
B..N. Rly

স্নেহাস্পদা ভগিনী,

পরম করুণাময় আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। .....এখন এখানে বেড়াইবার বড় আরাম। ধান কাটা হইয়াছে, সেই সব ক্ষেত্রে নরম খড়ের উপর হাঁটিতে কি মজা। প্রাণ ভরিয়া হাঁটি বেড়াই। একা হাঁটিতে ভাল লাগে না, কেবল আপনাদের মনে পড়ে।

আপনি কোলের মেয়েটিকে আর রশীদাকে সঙ্গে লইয়া ভাই সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া যদি দুই চারিদিনের জন্য বেড়াইয়া যান তবে কি মজাই হয়। মানুষের জীবন দুঃখ ও সংগ্রামে ভরা, তারই মধ্যে দুই এক দিন একটু হাসি খুশি পাওয়া যায়, তাহাই পরিমে (যথেষ্ট)। বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম ঃ

"হেসে লও, দু'দিন বই তো নয়,
আছে তো জীবন ভরা দুঃখ।"

কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

ঘাটশীলা আমাকে যেন তাহাই বলিতেছে ঃ
"হেঁটে লও, দু'দিন বই তো নয়,—
আছে তো কলিকাতার বন্দী-খানা!"

তাই বলি, আপনারা আসিয়া দুই চারিদিনের জন্য আনন্দ দিয়া যান। আপনাদের জলপাইগুড়ির বাংলার তুলনায় আমার এ বাসাটুকু একটা গোহালঘর বিশেষ।

আমার ঘাটশীলা-লীলা সম্বরণের আর অধিক দেরী নাই। আল্লাহ্ চাহে এই মাসের ৩০শে তারিখে দিনের ১২টার গাড়িতে রওয়ানা হইব। সুতরাং ২৯শে তারিখ হইতেই ল্যাঞ্চ গুটাইতে (অর্থাৎ সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক করিতে) হইবে।

আপনার পত্রের আশায় রহিলাম ..... আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন।

আপনার স্নেহের আপা
রোকেয়া

পত্র ১৮ :

Sakhawat Memorial Girl's School.
25-4-32

ভাই সাহেব, আপনি ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না যে, আমার শ্রদ্ধেয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যই আমি এ স্কুল আঁকড়ে পড়ে আছি। সরকারের সাথে স্কুল বিষয়ে লিখিত আমার চিঠিপত্রের কথা আপনি মনে করে দেখুন, গভর্ণমেন্ট এই স্কুলের নতুন নামকরণ "Government H.E. School for Muslim Girls" অর্থাৎ মুসলিম বালিকা উচ্চ ইংরেজি সরকারি বিদ্যালয় করতে চেয়েছেন, তাতে আমি সেই মুহূর্তেই রাজী হয়েছি। মরহুম নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী ও সার গজনবী তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামতই নাম পরিবর্ত্তনে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

কিন্তু আমি আমার স্বামীর নামের কাঙ্গাল নই। কারণ আমি জানি তাঁর সত্যিকার স্মৃতি আমার সাথেই রয়েছে ও আমার সাথেই লুপ্ত হয়ে যাবে। আমার মনে পড়ছে ঃ

"মারকুদ কি চাক্কিনে কিস কিসকো পিসা,
জমিন খা গ্যাই লোকতে দাঁ কাইসে, কাইসে,
না হ্যায় করন এ সিকান্দার, না গোর এ দারা,
মিটে নামিওঁ কি নিশান কাইসে কাইসে॥"
"কত রূপ হল কবরেতে লীন
মাটির তলে কাটে শাহানশাদের দিন—
"সিকান্দার দারাউসের গোরের নেই কোন চিন,
সে সব জাগ্রত শক্তি আজ ঘুমায় বিরামহীন।"

[অনুবাদ ঃ মোশকেকা মাহ্মুদ]

চিরকাল আমি স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করেছি, আর আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ্ আমাকে এতে সাহায্য করবেন এবং একমাত্র আল্লাহই আমার ভরসা। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন, কিন্তু আমার আশা যে শিগ্‌গিরই তিনি আমাকে দয়া করবেন।

প্রতিদিন ভোরে আমি পাক কোরানের ২/১ পৃষ্ঠা পড়লে বড় শান্তি পাই। কত সান্ত্বনা রয়েছে এই কথা ক'টিতে, "আমি এ দুনিয়ায় কিছু চাই না, আমার পুরস্কার জমা রয়েছে সারা দীন দুনিয়ার মালেকের কাছে।"

পত্র ১৯ : শামসুন নাহার মাহমুদকে

৮৬ লোয়ার সার্কু...
২২শে ...

স্নেহাস্পদা নাহার,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। গতকল্যকার মিটিংয়ে যেসব রিজলিউশন পাশ হইয়াছে... নকল যদি আইজ দিতে পার তো বেশ হয়। কারণ Asst. D. P. I. দেখতে চাচ্ছেন ... শীঘ্রম।

তুমি আজ ও কাল দুদিন বিশ্রাম করে আগামী পরশু সকালে ৯টা ও ১১টার ম... করে নিশ্চয় এখানে আসিও। হয়ত খোদা তোমাকে দিয়েই আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক... তাই তোমাকে চাই।

তোমার স্নে...
...

পত্র ২০ : মরিয়ম রশীদকে

Sakhawat Memorial Girl's Sch...
162, Lower Circular Ro...

স্নেহাস্পদা মরিয়ম,

আল্লাহ্ তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার ও দুলা মিয়াঁর পত্র যথাসময় পেয়েছি। তুমি তো জ... কোন non purdah স্কুলেও বোর্ডিং এ ব্যাটা ছেলেকে রাখে না; সুতরাং শ্রীমান সেলি... আমরা কি করে রাখতে পারি। দুটির একটি তোমায় করতে হবে—(১) হয়, তুমি মেয়ে... নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাক, সেলিম কোন একটা Messe থাকুক; নয় তোমরা একটা ব... আলাদা থাক—রোজ সেখান থেকে মেয়েরা পড়তে আসবে।

মাশাআল্লাহ্ সেলিম সহ পৃথক বাসায় থাকতে পারবে না কেন ? আমি তো একাই ... বছর ধরে আছি—তা তুমি বলবে যে তুমি বুড় মানুষ। কিন্তু ২২ বছর পূর্বে তো বুড় ছিলুম ... ফল কথা, তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখ। এখন এই উন্নতির যুগে তুমি একটা আলাদা ব... থাকতে সাহস না করলে চলবে কেন ? এই স্কুল বাসার আশপাশে বাসা পাওয়া যেতে পা... কি পরিমাণ ভাড়া দিবে, জানালে বাসা খুঁজতে পারি। আর যদি শ্রীমানকে মেসে রাখতে ... তবে তাও খুঁজে দেখা যেতে পারে।

জনাব চাচিজান ও তোমরা মোবারকবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ শেম্বিলের খোকাকে দীর্ঘজী... করুন। শ্রীমান দুলা মিয়াকে দোয়া জানাই। এই পত্রই তিনিও পড়ে দেখবেন।

দোয়া ই...
তোমার স্নেহের ভ...
রোকে...

পত্র ২১ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Sakhawat Memorial girl's Scho...
86/A, Lower Circular Roa...
Calcutt...
The 30-9-19...

ভাই সাহেব,

স্কুলের নানা জটিল কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকি যে, নিজের বাড়িঘর, বিষয় সম্পত্তির দিকে মোটেই খেয়াল করতে পারি না। ফলে আমার প্রায় দশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে গে...

এতটা লোকসান দেওয়া আমার জন্য কতই মারাত্মক। আমার স্বাস্থ্যও দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। স্কুলের পুরো কাজ ছাড়া অন্যান্য সমিতিরি কিছু কিছু কাজও আমাকে করতে হয়। তাঁরা আমার কোন আপত্তি শুনবে না। আমার অসুস্থতার ওজর মানবে না। কাজেই আমার ছাড়া পাবার উপায় নেই।

পত্র ২২ : শামসুন নাহার মাহমুদকে

শামসুন নাহার মাহমুদকে লিখিত চিঠি (আনুমানিক ১৯২০ সনে)

'তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়া বহুকাল আগের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। একবার রাত্রিবেলা আমরা বিহারের এক জলপথে নৌকাযোগে যাইতেছিলাম। বাহিরে অন্ধকারের কিছুই দেখা যায় না। শুধু নদী তীরের অন্ধকার বনভূমি হইতে, কেয়াফুলের মৃদু সুরভি ভাসিয়া আসিতেছিল। ঠিক তেমনি তোমাকে কখনো দেখি নাই, কিন্তু তোমার সৌরভটুকু জানি।'

পত্র ২৩ : মুজিবর রহমানকে

Feb. 10. 1911

A PROPOSED GIRLS' SCHOOL

To

The Editor of The "Mussalman".

Sir, —Permit the liberty of asking the courtesy of your paper to inform the Mohamedan public that I intend to start a Girl's School in Calcutta in strict observance of Purda at an earliest opportunity possible, which is not only the crying need to the time but the want of which, I believe, is keenly felt by all right thinking men and women.

My beloved husband, the Late Moulvie Sakhawat Hossain, B. A. of the Provincial Executive Service, has bequeathed Rs. 10,000 for female education, the income (Rs. 6,000 annually) of which is at my disposad, I am therefore not only ready to spend that amount but I shall rather be glad to personally conduct the school and am prepared to devote my time, energy, and whatever knowledge I possess, towards its furtherance.

But as the fund in hand is not sufficient to meet the requirements I appeal to the generous Moslem Public to extend their helping hand and thus contribute to the success of the project which deserves the hearty sympathy and prectical patronage of all well wishers of the community.

Mohamedan gentlemen desirous of helping me in my scheme are requested to kindly communicate with me direct, while my Moslem sisters who wish to associate themselves by their cooperation in the movement are invited in my house to discuss the subject, or I shall be glad to call on them should they inform me fo their addresses.

Khatoon

পত্র ২৪ : মোঃ ইসাসীনকে

Sakhawat Memorial Girl's School
13 Wallyull'as Lane
Calcutta the 18th Octr. 191

Sir.

Many thanks for your kind letter dated the 12th inst. The money (Rs 10/-) reached me yesterday. Kindly let me know in whose name shall I Put this sum in the account book.

As regards your girl, I shall be glad to take her charge. We have prepared a prospectus which we expect to get printed shortly. I shall send you a copy when it is ready for distribution.

Our boarding arrangement is not completed yet. Therefore you will have to wait for a month or two. At present only one girls is living with me; she is 8 years old.

I shall send you a formal receipt for the sum of Rs 10/-on hearing from you. Please accept my best thanks for your kind help. I wish there were a few more gentlemen like you, whom I could call friends fo poor helpless women, who are no better than the animals kept imprisoned in zoological garden!

Trusting this will find you in better health and good spiritsi and with best salam.

Yours Truly
R.S. Hossein

পত্র ২৫ : মুজিবর রহমানকে

THE SAKHAWAT MEMORIAI GIRL'S SCHOOL

Jan 1o. 1913

To

The Editor of the "Mussalman"

Sir, I desire to inform the readers of your widely circulated paper that we are going to establish a boarding house attached to the Sahkawat Memorial Cirl's School, for the convenience of the mofussil pupils. At present our school imparts instruction in Urdoo, but we are arrganging to open a separate class for teaching egularly Bengali and English such girls who wish to receive instruction through the medium of these languages.

Upto this time we have got applicatins from 7 girls only and the guardians of these girls are rather pressing hard for their Girl's reception. To start a boarding house with seven girls will be very much inconvenient to us; but we have however, made up our minds

to make a beginning in spite of all inconvenience. We pray to the Almighty God that he may be pleased to further the work we are about to undertake.

[.....] we expected to find some difficulty in getting a suitable grant from Government towards this object, but fortunately for us this was obtained with comparative ease. The Government Contribution was housever, made comtitiomal substantial amount for this purpose, from private sources, and accordingly we set about in collecting subscription from the Mohammedan public. I regret to say that the response to our appeal has not yet been adequate and after about one year's effort we are still short of the amount required for the purchase of the necessary equipage by a sum of Rs. 280. Is this not enough to fill one's soul wiht a deep sense of shame and bitterness?

In this connection I may be exused for mentioning that in order to add something to the Omnibus Fund I advertises in your paper to sell some of my books at a reduced price for month or so. But such is the public spirit and sense of appreciation of our cause by the members of our community that only Rs. 6 worth of books have been sold during the month of Ramzn! the cost price of the whole lot of Indian Law Peports is Rs. 102 and I am offering the books at Rs. 51 only which amount will also go to the same Fund, but even then I have not yet been able to find a purchaser.

These are the people, who can not support a single female school but aspire to have a University. It is no wonder that Government denied us the same because we do not deserve it yet. One may well ask what would be the good of having a University when such an important duty as the education of the females is meglected by the community in this sad manner? Granted that we get a University, what will we do with it while your females remain in the dark? You can not banish all the females from your society nor can you bury your daughters alive like the Arabs of the past.

However, hoping still to get more application for admission in our boarding house, I conclude this.

R. S. Hossein

পত্র ২৬ : মোঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
10-9-13

Dear Sir,
Your letter of the 30th ultimo reached me in time. I am sorry I could not reply to you earliea.

You will agree with me that anything done in a large scale done well. I have been advertising in the papers since 18 long months that I would try to keep boarders if I got applications from girls. But the mufussil people kept silence. Then I prepared myself at least for 6 girls and subsequently removed to a bigger house & purchased some furniture such as iron beds (each costing Rs 20/-) & so on. Six months elapsed but no girl excepting one came. Now I repent the waste of the money which has been done in buying furniture. I woder if my community will be answerable on the day fo Judgment for the waste fo money I suffered for nothing!

No separate establishmen can made for a sinlge girl; therefore the whole burden of the girl falls on me—which I find too heavy. I am not intended (by God) for bringing up children : had I been so, God would have blessed me with my own.

Oh! the responsibility and trouble one suffers with a single girl ! I makes one a regular "কাউয়া হাঁকানি"!

However, every rule has its exeptions. At present there is a good friend livign with me; she is willing to look after your daughter. She is just now urging me to adk you to send your girl here.

I hope you won't misunderstand me and would rather pity me. I believe you would be a sincere friend otherwise I won't have written all thesse things.

Hoping to be excused for any part of my letter which may displease you. There is not single person, who is unfortunate like me.

More on hearing from you.

Yours truly
R.S. Hossein

পত্র ২৭ : মোঃ ইয়াসীনকে

20-9-13

Dear Sir,

You are keeping silence : perhaps you did not like my last letter. But I expected sympathy from you.

Can you kindly remit me any sum whichever you may have realised by the sale of some books? I enclosed herewith Messrs. S.K. Lahiri & Coys letter for your information. Please return it after perusal. They have been writing since 5 long years : and I cannot ask them to wait any more.

Hoping this will find you and yours enjoying good health & prosperity.

Yours truly
R. S. Hossein

পত্র ২৮ : মোঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
30-09-13

Dear Sir,

Many thanks for your very kind letters, received yesterday. These letters worked like some medicine which I required for my soul. Sometimes we yearn to tell somebody of our sorrows and difficulties. I hope you will come to Calcutta soon. I would like to tell you some of my "Ram Kahini".

You need not feel so keenly about me, I do not repent for leaving Bhagalpur, but at times I feel some sort of yearning to see the grave of my husband and the tiny graves of my babies, But never my mind. I am brave enough to bear my cross. For this girls School, and this school alone I left Bhagalpur. And it makes me unhappy when I see this school does not prosper as I wish.

1. 10.13

I could not finsh this letter yesterday, so I take up the writing again today.

"Fortune' anD "misfortun" are seldom in our hands, and not very often, as you say. Failure of a band, for instance, can never be under one's control, but at the same time the poor depositor has to suffer the consequence for no fault of his own. We may very well advise the depositor not to mind his loss! Bu who is to meet his unavoiddable expenses? We cannot expect a hungry peson to be satistied and happy. Can you?

No. I am not unfortunate provided this school works well and I can achieve my literary talents. Onlythe other day I became very happy when I won the first prize in a rhyme competition. There were some undergraduates & graduates and above all some English lady graduates too among the lady competitions. I enclose herewith a copy of my composition, which .....

পত্র ২৯ : মো ঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
11-3-14

Dear Sir,

I got your letter dated the 8th, yesterday eveing. I am sorry you did not get my last letter.

I am really very sorry to learn that you are not keeping well . Life is short, what is the use of pining over this & that? Human life does

not always find smooth paths, but still I think a gentleman of / position need not be disheartened and dissatisfied with life. After life is a very valuable thing and should not be wasted for nothing.

It is a pity you feel so lonely. But I fear your selection was not correct in choosing an ill-fated person like me whose life has been "lost in misadventure", to write to.

Since two months I am suffering from some kind of fever-the fever is not much as the temp. Never rised above 100 but I have become very weak. The weakness seems almost unbearable. I dread pen and paper; don't like even reading. I attend school with great difficulty : speaking to the girls tires me so much that many a time I let them have their own ways. I would very much like to write a nice letter to you, but unfortunately I am unable to do so now.

More after hearing from you. Let me assure you that your letters are always welcome: so please write to me as often as you please. It was very kind of you to select me out of your so many friends; I feel honoured —rather proud of it, though I fear I do not deserve it.

Yours very truly
R. S. Hossein

পত্র ৩০ : মোঃ ইয়াসীনকে

13, European Asylum Lane
Calcutta
9-4-14

My dear Sir,

I am so thankful to your very kind letters dated the 19th & 31st March respectively. Your kind enquiries about me overjoyed me so much that I could not help addressing you as "my dear Sir" and I hope I did no wrong in doing so, You are such a good friend, may God bless you with long life and prosperity. I am so helpless and friendless; even my nearest relatives are so heartless that they do not hesitate in trying to deprive me of my daily food ! In this state of affairs friends like you and Mr Ahmed Ali (the secretary of our School) are blessings of heaven.

Dear friend ! Kinly pray to god to save me from my relatives.

Well, I must stop talking rubbish now. Our prize distribution has been postponed to the end of this month.

I do not get fever now but am dradfully weak. I look 15 years older than my actual age ! I will consult a lady doctor again tomorrow.

Yes, the Prize distribution of Suhrawardi Purdanashini (পর্দানশিনী) Madrassa is over. Have you read all the correspondence and note in the "Mussalman" and "Comradae"?

Yes, God is sufficient for those only, who know how to rely on Him. The difficulty is, that we do not know how to stick to Him. In my opinion I won't care for anything else even if God were not sufficient !

The person about whose death Taifur & Baizid wrote to me was a first .....

পত্র ৩১ : মোঃ ইয়াসীনকে

86A, Lr. Circular Road
Calutta
23-7-15

Dear Sir,

I owe you some apology for not replying to you kind letter earlier. I thought you would be in Calcutta soon & that I would get an opportunity of telling you everything in detail.

I sent a copy of our Annual report & Syllabus for your kind persual. It took a long time & botheration to get the Report printed. I hope one will excuse this unnecessary delay remembering that we are Mohamedans and the job was done by a Mohamedan Press !

I cannot understand why you want to resign your post. Do you find the dept. very wicked ! This world as a whole is wicked but the presence of some people like you is necessary to make oasis in this desert.

Hoping this will find you & yours in good health & spirit.

Can Zeenat smile now ? She will have to learn many things !

Yours Sincerely
R.S. Hossein

পত্র ৩২ : মুজিবর রহমানকে

SAKHAWAT MEMORIAL GIRL'S SCHOOL
Nov. 30, 1917

To
The Editor of The "Mussalman".

Sir,—A certain correspondent by the name Mr. R. Rahman wrote in a letter in your issue of the 25th May last :

"What I regret is that in the capital of a Presidency inhabited by an overwhelming majority of Bengli-speaking people, there is not a single institution for Mussalman girls wehre education is imparted through the medium of Bengali. If any separate school for Bengali speaking Mussalman girls be needed it ought to be stated without delay".

Although it is an axiomtic truth that Bengali is the mother tongue of the people of Bengal, the condition and circumstances of Calcutta are quite different. At least, that is my idea. I have been living in this town for the last seven years at a stretch and during this long period I had occasion to come in contact with good many respectable Mohamedan ladies and I do not remember to have heard Bengali spoken by any of them; even in case where I found broken and miserable Urdu spoken. I started talking with them in Bengali but they preferred to give their replies in Urdu. Many of these ladies, although natives of Bengal, say that they must talk Urdu!

When this school was started in Waliullah Lane in the beginning of 1911 with only 15 or 16 girls, I used to teach English as an additional subject with a view to popularize the institution with the local people, and I made it a practice to explain the meaning of English words in Bengali. Shortly afterwards requests poured on me from the gurdian of puplis to use Urdu as the medium for explaining English.

In the wake of the Sakhawat Memorial School, two or three other girls' school have been established, and in these schools also education is imparted through the medium of Urdu because the guradians prefer Urdu.

For some years past Government is employing a number (I think there are 6 such teachers on Rs. 30/—per month) of peripatetic female, Urdu mistress to teach reading, writing and needlework to the grown up girls and married women of purdanashin Mohamedan families residing in Calcutta. These tutoresses go to the houses of their puplis in "burqa". They also teach Urdu and not Bengali and yet so far I am not aware of any complaint having been made that no provision has been made by Government teaching Bengali-speaking girls in a similar manner. How very difficult it is to secure such Urdu knowing female teachers (and how very in competent they are, when found) may be ascertained if enquires be made at the office of the Inspectress of Schools, in whose hands the appointment of these teachers lies. And yet teachers competent to teach Bengali—well educated teachers in every way though not belonging to the Islamic faith—are to be found everywhere in Calcutta. Why then does Government teach Urdu instad of Bengali if there is really a demand for the latter? It is because the purdanashin Mohamedan girls in Calcutta are not willing to learn Bengali even without payment of fee.

Mr. R. Rahman has expressed his mortification at the want of a Bengali School for Bengali-speaking Mohamedan girls in this wide city of Calcutta. But why is there such a want and who is responsible

for it? Is it not a matter worthy of consideration? It is a law of nature that in course of time a community or country gets what it is in need of. If the Calcutta Moslem public wanted, a Bengali school how is it that one such institution has not come into existence during all these years? It is certainly not for the sake of our personal convenience that we have been teaching Urdu instead of Bengali.

The Omniscient alone knows what difficulty and hardship one has to undergo to conduct an Urdu school, and those who practically do the work also know it. The primary difficulty is want of female teachers and one has to hunt out this wide world with a torch in hand to discover a qualified mistress. Secondly, suitable books are not available at any rate in this side of India. How often have I entreated the Inspectresses of schools to include such books in the list of text books prescribed by Government as could be found on this mortal earth. As the result of my seven years insistence such books are now easily available. Thirdly, Urdu maps, globes and other accessories are not easily available. Besides this, there are a hundred and one other difficulties to contend with. Still we are imparting education in Urdu and can it be said that we are doing so merely in pursuance of a personal whim or sentiment?

Last year, after the annual examinations, when we were making arrangements for holding the Prize Distribution a happy idea struck us, that among other things, a Bengal recitation should be given, and for this I entrusted one of our mistress, Mrs. S—, a Bengali lady, to get some four girls recite a Bengali poem. She accordingly took up this work, but after a week she came up to me and reported that none of the girls could talk Bengali. I said "How is that? Cannot the Calcutta girls talk Bengali?" She said, "Yes, they can in a manner. Just listen to them and judge for yourself." Shortly after only some of those girls who could talk and understand Bengali were selected. After a week Mrs. S.—again reported that although the girls had got the poem by heart their pornounciation was very bad and quite "foreign". I have heard our European sisters talking Bengali with a peculiar accent, but in the case of our girls I found that although their accent was not the same there was however a tinge of foreign tongue in their Bengali. I then made another selection, and took great pains till the day of the distribution of prizes to coach them but could not make them say "কত পাখী" instead of "কোতো পাখী" and "বণিকের বালা" instead of "বণকের বালা".

At the beginning of the current year I started a Bengali class. Only a couple of girls began to read Bengali only, as their guardian had stipulated this condition. They were aged 5 and 6 years

respectively. Eight other girls joined from the Urdu section, object being to learn Bengali as a language, their other subjects study (Geography, History etc.) being continued through the medium of Urdu as before. As the number of Bengali reading girls were I allotted three days in the week for teaching Bengali. When the end of May last the school was closed for the summer Ramzan Vacation there were only 12 students in the Bengali And yet when I read the following in the letter of Mr. R. Rahim "Due provision should be made in the Sakhawat Memorial Girls' School for imparting education through the medium of Bengali" said to myself "Let it be so".

Immediately on the re-opening of the School after the vacation whole time Bengali teacher was searched for and a junior vernacular training passed mistress was at once engaged, she was quite ready to teach all the subjects from the first year infant class up to the sixth standard (Middle Vernacular) in the Bengali branch of the school.

Now please mark. In the Sakhawat Memorial Girls' school we have got a Bengali section, a list of Bengali text-book as prescribed by government and Mrs. J—, a junior training passed female teacher. But what about puplis? "There are your pupil?" She said, "These three girls will read only Bengali throughout the week and those that have got Bengali as optional (সখের বাঙ্গলা) will read only three days in the week". When I went to look at the girls who had taken Bengali as optional I found there were only six instead of ten. I thought myself however that three little girls who were reading Bengali whole time would, like the three legs of a teapoy support the Bengali branch on their study shoulders. A few days after this I learnt that out of these three girls one left Calcutta for the mofassil with her parents.

At present there are only 5 girls left in the batch who took to learning all subjects in Bengali. I have given special instructions to Mrs. J—to teach this trio everything, even needlework, in Bengali. She said, "I don't know English expressions as used incorrectly such as "Ron, fel" (instead of Run, Fell) and incorrect Hindustan terms. The different kinds of sewing are known as "bakhaya, tepchi, turpai, arma," and these are all Urdu expressions. For want of sutable Bengali equivalents of these terms the trio have been put in the general sewing class with the Urdu speaking girls.

But this does not exhaust the list of our worries in connection with our Bengali branch and its teacher in charge, Mrs. J—. As soon as the bell strikes for the school to begin all teachers attend their respective classes. But Mrs. J— comes to and says, "What am I to

do?" "Why, please go and teach Bengali", "one girl has gone to read the Koran and the other is sewing."

Now it has become a part of my daily routine to invent work for Mrs. J—; especially when the Bengali reading trio happens to be absent by chance, there is...difficulty for me. Sometimes the teacher would come and... in the middle of the day. "Please what am I to do?"

"Go and teach Bengali, please."

"I have done that."

"They go and teach writing."

"They have done so."

"Please teach arithmetic in Bengali."

"That has already been done during the first hour."

Mr. R. Rahman further writes in his article, "It is an undeniable fact that more than 99 percent of the Mussalman of Bengali are Bengal speaking, so they have greater claimate that school than the Urdu-Speaking Mussalman....."Liquite agree to this. But now I am constrained to ask, where are the writer's "more than 99 percent Bengail-speaking" girl students? From the above, I think, I have been able to make it clear that so far as Calcutta is concerned how misleading it is to say that 99 percent of the Mohamedan inhabitants are Bengali-speaking. It seems to me that even those Bengali-speaking Mohamedan families that are residing in Calcutta, do not quite appreciate the advantage of school education for their girls. From the experience I have gained during these 7 years I have noticed that Urdu-speaking People are more keen on sending their girls to School and that Bengali-speaking families are less enterprising in this respect.

I have related what success has been attained by our Bengali branch during the past one year. We have at present only three little girls reading Bengali whole time. Now it is my earnest request that Mr. R. Rahman, Mr. Azizur Rahman (belonging to your staff) and other well-wishing gentlemen holding similar views would be good enough to come forward and get students for our Bengali section, for which we are entertaining the services of whole time qualified teacher. Mr. Azizur Rahman himself assured me that he would give us a good many pupils if I were to start a Bengali branch in my school. Now that I have done so, I fail to see why he is unable to act up to his promise. We shall probably be compelled to abolish the Bengali section from next year if we fail to get at least 20 students by the end of this year. It is quite beyond our means to go on paying the salary of the Bengali teacher month after month when there is not sufficient work. We shall be highly obliged to Mr. R. Rahman if he

will be good enough to pay us out of his won pocket the ... spent or rather misspent for the Bengali-speaking students quite at liberty to deduct subsequently Rs. 44, 352/—per mo... e., to say Rs. 448 × 99 times) when he realises the same Government and also to realise monthly from Government 17 ... being 99 times Rs.180, the amount which the Government ... spend on the salary of the peripatetic female Urdu teachers. ... there will be no want of funds for the spread of Bengali education ... Clacutta.

Calcutta **(Mrs. R. S. Hossein**
The 20th Nov. 1917

পত্র ৩৩ : মুজিবর রহমানকে

Dec. 20. 19...

SAKHAWAT MEMORIAL GIRSL' SCHOOL AND
BENGALI TEACHING

To
The Editor of The "Mussalman",

Sir, In your issue of 30th November 1917, you were good enough to publish a letter from me with regards to the teaching of Bengali in this school and a similar letter was published in your contemporary "Mohammadi." I can therefore take it that at any rate the readers of these two Journals were able to know the results of our efforts to impart instruction in Bengali to Mohamedan girls in this city. Now after a lapse of more than a year I am placing before you my further report in connention with the teaching of Bengalii in our school.

Before submitting this report it is necessary to mention one or tww things. I was anxiously waiting to see that my Bengali speaking brethren, especially that patriotic gentleman Mr. R. Rahman whose incisive pen first ventilated this matter in the columns of your paper would place mother Bengal—or at any rate the Bengali Mohamedan comuunity—uner a heavy debt of gratitude by establishing a Bengali Girls' school during this long one year. But where is that school? To our misfortune, it has not come into existence yet.

Although I stated last year we would be obliged to abolish the Bengali section of our school if sufficient girls were not forthcoming, nevertheless we kept the section continuing for a year more. But at the end of the year I find that its condition is still [same]. It is mostly people from the Mufassil who came to Calcutta and after 6 or 9 months are transferred elsewhere, send their girls to our school to be taught in Bengali. Like meteors these girls blaze forth in the

firmament of the school for a few months and then disappear altogether. Now with regard to those girls of the Urdu section who take up Bengali as an optional subject. At first they thought it a good fun to while away some time in the Bengali class trying to pick a smattering of the language, but when at the end of the year they found that they were called upon to give an examination of their knowledge, one by one dropped off.

At present there are only 3.5 pupils in our Bengali section : 3 are whole time Bengali girls and one is a girl from Urdu section learning Bengali as an optional subject. The eldest amongst them being "grown up", will leave school at the end of this session. It is beyond our means to have the responsibility of the Bengali section on our shoulders and to go on paying a mistress month after month for the sake of 2.5 girls only. We have therefore decided to abolish the Bengali branch from the beginning of January next.

R. S. Hossein

Calcutta
The 11th December, 1918.

পত্র ৩৪ : নোটিশ

Feb. 7, 1919

ALL INDIA MUSLIM LANDIES' CONFERENCE

NOTICE : The sixth Session of the All-India Muslim Ladies Conference will be held at Calcutta in Mellyville House, 8, Ripon Street, on the 10th, 11th and 12th February 1919 under the presidency of begum Saheba of Major Khediva Jung Bahadur (Hyderabad). There will be 2 daily sittings i. e. 10 a. m. to 2 p. m. and again from 3 p. m. to 5 p. m. Mohamedan ladies coming from the Mofassil with the object of attending the Conference will be provided with board and residence, free of all charges, at 86A, : Lower Circular Road, viz : the premises of Sakhawat Memorial Girls' School. They will be meet at the railway stations on receiving timely intimation, i.e. at least 24 hours before their arrival. They are requested to place themselves in communication with the undersigned.

Local ladies are requested to attend the conference in large numbers. Invitation card can be [....] on application form.

(Mrs.) R.S Hossein

86, Lower Circular Road
Calcutta
The 27th January, 1919

Feb : 21 '[illegible]

MUSLIMS LADIES' CONEFERENCE ENDS IN A FIASCO
REGRETTABLE INTERFERENCE

We have received the following for publication :

The following is statement of fact connected with sixth annual session of the All India Muslim Ladies' Conference lately held at Calcutta. As it was at my instance that the Conference was invited to Calcutta I think it proper to let the public know what actually took place and why I and my fellow-workers had to stay away from the meetings.

The Anjuman-i-Khawateen Islam, Calucutta, decided at one of its meetings to invite the All-India-Muslim Ladies 'Conference to hold its sixth annual meeting at Calcutta. Accordingly I wrote to the Secretary, Nafis Dulhan Saheba and in reply I was informed that our invitation was accepted. The time at first fixed for holding the Conference during the X'mas week has to be changed on account of the prevalence of influenza. Ater some correspondence it was decided to hold the meeting on the 10th, 11th and 12th of this month. A Reception committee was then formed and Mrs. Abdul Latif Ahmad was elected its President and I its Secretary. As certain things, such as the selection at the site and the construction of the pandal could not be done without the help of the male members of the community a committee of representative Mohamedan gentlemen, interested in the matter, was formed in the middle of January last. At its second meeting held on the 23rd January the Committee carefully considered the question of a site. It was decided that the Conference should be held at a central place, where strict purdah could be ensured and conveyances for the return journey of the ladies attending the meeting could be easily procured. It was also necessary that the site should not be far from the office of the Reception committee at 86A, Lower Circular Road, so that the work of the erection of the pandal and other arrangements for the meeting could be conveniently supervised. Having regard to these requirements the lawn attached to Mrs. Ariff Bham's house, No. 8, Ripon Street, was selected and Mrs. Bham's consent was obtained with some difficulty the following day. I should not omit to mention that the meeting at which the site was selected was attended by some gentlemen of the Surit community and by Shaikh Mahbub ali Saheb, whose wife is one of the Vice Presidents of the Anjuman-i-Khawateen Islam. None of these gentlemen raised any objection to the site selected. Besides at the meeting of the Anjuman-i-Khawateen held shortly after the selection of the above mentined site was duly announced and not even a single member present whispered anything against the proposal or suggested the idea of any objection being raised from any quarter.

2. Six hundred invitation cards were printed and distributed in the 4th and 5th of this month, premises No. 8, Ripon Street being mentioned in it as the place of the meeting. On the 7th instant, two days after the distribution of the cards and three days before the date of the meeting, I received a letter dated the 6th February from Naziri Begum Shaheba (Mrs. Sulaiman Arif) in which she expresed her surprise and regret that the Conference was to have been held at Mrs. Bham's place where some of the members of the Anjuman would not attend. In reply I informed her that no other member had expressed unwillingness to attend even if she had any objection on any personal ground as it was communal affair for which Mrs. Bham had made over her lawn to the Reception Committee to the days on which the meetings would be held there.

3. At 2 p.m. on the 7th February (the day on which Naziri Begum Saheba's letter was received) I received a telegram from Nafis Dulhan Sabeba that she would arrive at the Howrah Station at 4 p. m. that day, accompanied by the President elect, Mrs. Khedive Jung Saheba, and few other ladies. Immediately I went to the station with some other ladies and received Nafis Dulhan Sheba and her party at the 1st class Ladies' Waiting Room. When we were conversing with the ladies and their luggage was being put into hackney carriages Mr. G.H. Ariff came to the station and took away the ladies to his residence at Amratala Lane. Some time before they came here it was arranged by correspondence that Nafis Dulhan Saheba and her companions would stay for a day or two with Mr. Ariff who is a great friend of her husband, Moulvi Habibur Rahman Khan Shirwani Shaeb and then she would come over to stay with me at the school which was converted into a guest house for the time being and Mrs. Khedive Jung Saheba would be the guest of Lady Shamsul Huda. This being the arrangement previously made I raised no objection to the ladies' going to Mr. Ariff's place. I mention this because several ladies have found fault with me permitting Mr. Ariff to take the ladies to his place.

4. On the 8th instant at about 10 a. m. Nafis Dulhan Saheba with a companion of Mrs. Kahdive Jung Saheba and Naziri Begum called upon me at the school and informed me to my utter suprise, that the Conference could not be held at 8th Ripon street as some people had objection to go there. As I was not in a position to say anytihng without consulting the members of the reception Committee it was arranged that Nafis Dulhan Saheba and others would again call in the afternoon to discuss the matter. They accordingly called when many members of the reception Committee previously

proposed to hold the Conference elsewhere. As invitation card ... already been issued and there was no time to make ... arrangements we could not agree to any change of site. Nafis Dul... Saheba, however insisted upon holing the conference elsewher... undertook to make the necessary arrangements herself. the mee... broke up late in the evening without coming to any decision. At ... time of leaving, the companion of Mrs. Kahdive Jung Saheba a... Nafis Dulhan told me that they and their party would come the nex... day to stay with us at our place. On the 9th instant Mrs. Abdul Lat... Ahmad, the Chairman of the Reception Committee, accompanied by me and three other ladies, called at the residence of Mr. G.H. Ariff to fetch Mrs. Khedive Jung saheba, Nafis Dulhan Saheba and others. We were however coldly received and repeatedly told that they were coming over to uor place themselves. When pressed to come with us they gave us to understand that they were going out somewhere and would call in the afternoon. Before they came, there assembled at the school a large number of members of our Anjuman and subsequently the Committee of the gentlemen also met there. On her arrival with her party Nafis Dulhan Saheba informed us that she had already arrange to hold the Conference at the Galstaun Park and had issued notice to thes effect. It was pointed out that her action was wholly unconstitutional, that it was the function of the Reception Committee to select a suitable site and to make the necessary arrangements for holding the Conference, and outraging our feelings. But all our arguments and entreaties were of no avail, Nafis Dulahn Saheba persisted in doing everything in her own way. The meeting broke up after 11 p. m. when Nafis Dulhan Saheba left with her party. It was arranged that our final decision would be communicated to them the next morning. After they left, the matter was again discussed by both the ladies and the gentlemen present, at their prespective meetings and it was concluded that it would be most undesirable as well improper to acquiesce in such arbitrary and unconstitutional proceedings. Accordingly on the following morning a telephonic message was sent to Nafis Dulhan Saheba to the effect that the members of the Reception Committee would not co-operate with her in holding the Conference at the Galstaun Park nor would they attend the meeting.

5. From about 11 a. m. on the 10th instant over 200 Mussalman ladies, who unaware of what had happened, had gone to 8 Ripon Street, called upon me and on knowing all the circumstances Preferred to return home rather than attend the Conference at the Galstaun Park. In order to give some consolation to disappointed

ladies and to explain the deplorable circumstances which prevented us from joining the conference, to those that were unware of the m, it was decided to hold on the 12th instant, under the auspices the local Anjuman-i-Khawateen Islam a general meeting of the Muslim ladies of Calcutta in the pandal at 8, Ripon Street. It was an agreeable surprise to us to find that this meeting was attended by more than six hundred ladies held anywhere in India. Among others the following ladies were present :

Nawab Begum Badurduddin Haidar, Mrs. Abdul Karim, Umme Salma Begum (mother of Lady Shamsul Huda), Mrs. A.K. Fazlul Huq, Mrs. Abdur Rahim Buskh Ellahi, Mrs. Khan Bahadur Daudur Rahman, Mrs. Khan Bahadur Md. Khorsed, Afsar Jahan Begum (sister of prince Mirza Akram Hossein Bahadur), Mrs. Abdul Latif Ahmed, Mrs. Ahmed Zakaria, Mrs. Shamsul Ulama Velayet Hossain, Mrs. Shamsul Ulama Zulfiqur Ali, Mrs. Shamsul Ulama Kamaluddin Ahmed, Mrs. Kabiruddin Ahmed, Mrs. Matloob Ahmed Khan Chaudhry, Mrs. Syed Muhtashem Hossein, Mrs. Abbad, Mrs. Abul Kalam Azad, Mrs. Syeed Abdus Salek, Mrs. Anisuzzaman Khan, Mrs. Syed Fida Ali, Mrs. Musaji Salehji, Mrs. Ahmed Ibrahim Salehji, Mrs. Ebrahim Salehji, Mrs. Md. Elias and Miss Rabia Elias, Mrs. Saleh Md. Daud, Mrs. Mulla Mahumd, Mrs. Ahman Md. Mamsa, Mrs Osman Jamal, Mrs. Abdul Muzaffar Ahmed, Mrs. Hedayet Ali Mrs. Azizul Kader, Mrs. Nashiruddin Ahmed, Mrs. Baker Shirazi, Mrs. Murtaza Shustari, Mrs. Bashir Mirza, Mrs. Aladin Chandoo Mrs. Abdul Ghaffar, Mrs. Derajuddin Ahmed, Mrs. Abu Imam, Mrs. Mokarem, Mrs. Habib Mohamed, Mrs. Shaikh Abduallah (Aligarh), Fatema Arzoo Begum (Bhopal), Momena Begum (Bulandshahar), Sister of Mr. Zahid Suharawardy, Mrs. Aga Md. Karim, Mrs. Qutbuddin Ahmed, Mrs. Ithishm Rasul, Mrs. Abdul Aziz Kahn (Gaya), Mrs. Mirza Md. Khorasani and Mrs. Mirza Mehdi Khorasani.

Does not this unsurprisingly Large attendance of Muslim ladies belonging to the various sections of the community conclusively prove that our arrangement had the hearty approval of the Muslim ladies of Calcutta and there could be no objection to attending any meeting held at Mrs. Bham's Place? In fact the only objection communicated to us either verbally or in writing came from Mrs. Soliman Ariff (Naziri Begum Saheba). This, we have reason to believe was entirely due to family differences between the Ariffs and the Bhams, who were related to one another by marraige. It is very much to be regretted that designing people created so much unpleasntness in order to satisfy some personal grudge. I should not omit to mention that notice of all the meetings of the Anjuman-i- Khawateen at which the arrangements for holding the conference were dicussed

and settled were sent to Naziri Begum Saheba, who is one of the Vice-Presidents of the Anjuman-i- Khawateen but she did not care to attend any of the meetings. Thus she is to blame and not we, for not knowing in time where the conference was to have been held.

At the aforesaid meeting Mrs. Abdul Latif Ahmad occupied the President chair. First of all I read out a statement of what led to our holding aloof from the All-India Muslim Ladies Conference. The business of the meeting was then gone through.

Two resolutoin were adopted at the meeting, the first expressing regret at the death of Suhrawardiya Begum and sympathising with the bereaved family and the second approving the action of the Reception Committee in not participating at the Galstaun Park meeting. Papers were read by some ladies on female education and cognate subjects.

My attention has been drawn to the reports of the proceedings of the meetings of the Conference held at the Galstaun Park published in some of the newspapers. I regret to have to say that the reports are not correct. From information received from most reliable sources it has been ascertained that the first day's meeting was attended by only 15 ladies, of whom several were non-Mussalman. Such being the case is it not most misleading to state at the "spacious pandal erected for the purpose was packed to the full with ladies resident in Calcutta and those who had come from distant parts of India." The attendence at the second day's meeting according to information received from some of those who were present was 25 and at the third day's meeting only 10, though it has been published in the papers that the latter was attended by about 400 ladies. Mrs. Shaikh Abdullah Saheba of Aligarh and Fatema Arzoo Begum Saheba, sister fo Maulana Abul Kalam Azad and Private Secretary of Her Highness the Begum of Bhopal, corroborated statements made by other eye-witness as regard the attendence at the meetings of the conference. It has been stated that when the President elect arrived at the pandal Mrs. G. H. Ariff in a speech in English, welcomed her on behalf of the ladies of Calcutta. May we enquire whether any new reception committee was formed and when and by whom Mrs. Ariff was authorised to play the part of hostess and welcome the visitors on behalf of the ladies of Calcutta? It has been said that purdah arrangements were perfect. If our infromation is correct such arrangements were possible in a place like the Galstaun Park which is overlooked by highly built houses on all sides and inside which there is a three storied building occupied by different people.

In conclusion I wish to make it clear that there was absolutely no objection on public grounds to hold the Conference at 8 Ripon Street and it is our firm conviction that the unfortunate attitude which Mrs. Kahdive Jung and Nafis Dulhan were led to take up was due to the influence and out of difference to the feelings of their hosts, viz. the Ariff family and as outsiders they were not in a positon to guage the public feeling. We were the best judges of the local circumstances and when we assured them that there could be no objection in holding the Conference at the place which we had selected and as events have proved the Muslim ladies of calcutta did not hesitate to attend a meeting in large numbers at that place, they should have been satisfied with our assurance.

Calcutta
The 18th Feb. 1919

(Mrs.) R. S. Hossein
Hon. Secretary
Anjuman-i- Khawateen Islam

পত্র ৩৬ : মুজিবর রহমানকে

April 4, 1919

The Muslim Ladies' Confernce
A Rejoinder

To

The Editor of The "Mussalman."

Sir, —Anent the letter of Nafis Dulhan Saheba published in your last issue I beg to ovserve that she has taken unnecessary pains to prove that the President Mrs. Khedive Jung Bahadur had nothing whatever to do with the change of the site. In my lengthy letter which was published in the "Mussalman" of the 21st February and gist of which appeared in some of the local dailies, nowhere did I say that the aforesaid lady was responsible for the change of site.

It is entirely incorrect on the part of Nafis Dulhan Saheba to assert that she changed the site after due consultaion with me and after I had explicitly informed her that I would have no objection whatever to the change or that the ladies of the Reception Committee approved of the new site. As a matter of fact I or the members of the Reception Committee never agreed to the change of site and it is utterly rediculous for her to say that the ladies of the Reception Committee approved of the new site, because on the evening of the 8th February, i.e. only 2 days previous to the Conference, when she broached the subject she could not mention where her "new site" was to be, it was only on the evening of the 9th she sprung a surprise on us by announcing that she had fixed Galstaun Park for the Purpose, having already issued earlier in the afternoon, without our knowledge.

printed placards to that effect. How absurd her contention is will be evident from the fact that if it were true that I and the Reception Committee had agreed to the change of site, the necessary announcement would have been made over my signture and it passed (sic!) our comprehension why it should have been at all necessay for the notice to be issued over her signature.

Nafis Dulhan Saheba mentions that "the same thing happened at a previous conference at Delhi, where a man of light and leading like Hazikul Mulk Hakim Md. Ajmal Khan immediately and readily changed the proposed site of the meeting as it did not meet with my approval". Possibly the objections against the site originally chosen at Delhi were vaild and hence it had to be changed, but in our case no vaild objections were put forward and we were therefore not bound to comply with unreasonable requests merely to please Mr. Golam Hossein Ariff and his family who were the hosts of Nafis Dulhan Saheba nd her party. It is also possible that Hakim Ajmal Khan Saheb, who had orgainsed the sesison at Delhi in February 1917, was too far accommodating and deferential but she connot expect the same treatment everywhere and others may not care to let her have too much of her own way in all things. I understand similar troubles arose last year also at Lahore but Begum Saheba, the President of the session, managed to smooth over the difficulties by her tact an firmness. Incidentally it may be noted that the above instances furnish a good example of Nafis Dulhan Saheba's meddlesome habit at the eleventh hours or taking the most charitable view of the matter, they show a singular want of care on her part in not instructing local organisers beforehand what requirments ought to be kept in view selecting a site.

In making the asserion that most of the ladies of our Reception Committee took part in the Galstaun Park confernce Nafis Dulhan Saheba is so wide of the mark that she was able to trot out only 3 names, viz. Mrs. Hakam, Mrs. Wahab and Mrs. Rasul, although the committee consisted of 26 members. It is immaterial to our purpose if a few members deserted our camp and joined the other side. It is natureal for some people to be actuated by motive and influenced by considerations other than those of loyalty to one's party or country or nationality. What those motives and influenced by consideration were in the case of the aforesaid ladies it is not my business to say, but this much I can say that they had their ample reward in having their names prominently mentioned in the proceedings which Nafis Dulhan Saheba published in Tahzibun Niswan and probably in other urdu periodical, and they will assuredly have the further pleasure of

finding their names prominently mentioned in the annual Report of the Conference when it is issued in due course. I should mentioned that although Mrs. Hakam was member of the Reception Commintee, the other two ladies were not. Mrs. Wahab was only a volunteer and followed her sister Mrs. Hakam. Mrs. Rasul (who by-the-whay is not to mistaken for the wife of the distinguished and public spirited barrister of that name whose recent death we all deplore) was also a volunteer and was not even a member of the local Anjumani-Khawateen at that time. These two probably were the only seceders out of a band about 40 lady volunteers we had.

I cannot understand why Nafis Dulhan Saheba has chosen to fasten on me the charge of holoding a "counter conference". In the notice issued by me convening a general meeting of the Muslim ladies of Calcutta under the auspices of the local Anjuman Khawateen on the 12th Februry I did not call it a conference and in the proceedings published by me in your paper I did not call it conference. In this meeting which, I repeat, was attended by over 600 Muslim ladies, a resolution was adopted approving the action of the Reception Commitee in joining the Galstaun Park meetings and if indeed it was a fact, as stated by Nafis Dulhan that the ladies of the Reception Committee had approved of the new site, it was the right and proper occasion for any member of the Reception Committee practically all of whom were present there or indeed any one from the audienee to have approved the motion. The unanimous adoption of the resolution effectually prove the hollowness of the claim set up by Nafis Dulhan.

Nafis Dulhan Saheba has a fling at me when she says that by holding the "counter-conference". I had evidently to find some way for accounting satisfactorily for the contribution of RS. 1,500 from Mrs. Abdul Latif Ahmed and other "generous donators" from "many other ladies of Calcutta". As I have said in my previous letter, our arrangement were complete in all respects for which we had already incurred heavy expenditure but everything was spoiled by the unnecessary interference of Nafis Dulhan at the last moment. I had myself very little handling of the money; practically the whole of the expenses were incurred though the hands of the male Mangaing Committee, of which Nawab Nasirul Mamalk Mirza Shujat Ali Baig Khan Bahadur, was the President and Mr Mowdud Rahman, B. A. Bar-at- Law was the secretray. A regular account has been kept of the receipts and disbursements together with vouchers in support of the same and any one is welcome to inspect the same at my office. No one regrets more than myself-it was I who by unremitting labour

raised the necessary funds that all this money should have gone for nothing, and I have no hesitation in laying the responsibility for this fearful wastage of public money on the shoulders of Nafis Dulhan.

In conculsion I would reiterate my conviction that all this trouble was due to the fact that nafis Dulhan Saheba allowed herself to be unduly influnced by her old friends and hosts, Mr. Golam Hossein Ariff and his family, who are not in friendly terms wiht the Bham family at whose place we had arranged to hold the Conference. It is highly to be regretted that the claims of friendship and hospitality should have out-weighed her sense of public duty. She has more than requitted the hospitality she and her [torn] trecieved, by the lavish praise she has bestowed on her hosts in the columns of the Urdu papers in which she has published the detailed proceedings of the Galstaun Park meeting.

Calcutta
The 1st April, 1919

(Mrs.) R.S. Hossein
Hony. Secretary
Anjuman-i-Khawateen Islam

পত্র ৩৭ : মোঃ ইয়াসীনকে

Sakhawat MemorialGirl's School
86A, Lower Cricular Road
Caluctta, the 14th septr. 1919

Dear Sir,

I am in receipt of your kind letter dated the 7th inst. I am extremely sorry that I could not send you a letter of consolation on receipt of your last letter received in April. I am ashamed of myself.

I think your daugther Saeeda is about 15 now. How fast the time passes ! It was only the other day you were trying to put her in this school !

As I do not understand any refined riddle of religion I had better not venture that matter. My late husband avised me not to discuss religion with anybody.

I had been very ill lately. During summer vacation, I went to Ranchi for change. I am still ailing but strong enough to go on with my daily routine work.

The school is not flourishing to my full satisacion. The guardians of the students do not co-operate fully with me.

With blessing to your childern-poor motherless children !

Your sincerely
R. S. Hossein

রোকেয়া কবীর জাতীয় গণগ্রন্থাগার
শাহবাগ, ঢাকা।

পত্র ৩৮ : মোঃ ইয়াসীনকে

(First 2 Pages missing)

So I did not miss my former teacher. This is all know about her.

Thank God, our Prize distribution is succcessfully over. You will certainy get a copy of the report in due course.

Your letter is neither longer nor tiring. I wish it was a little longer.

My feeling towards my relations are very bitter. Fancy they cheated & robbed me when I trusted them blindly. I am thankful that I have no children. I can't forget this amount of money & hope God will not forgive them! They know very well my financial condition, they know too that I am unable to earn a single pice! If God be true , I shall get back the money.

With kindes regards

Very sinceerely yours
R. S. Hossein

পত্র ৩৯ : মৌলভী হামিদুর রহমানকে

Sakhawat Memorial Girls' School
86-A, Lower Circular Road,
Calcutta
The 26th Jan 1924

Sir,

I am in receipt of your letter dated the 22nd instant beg to offer my best thanks to your committee for the honour they have bestowed on me by selecting my humble self to preside at the prize distribution of your Maktab. But at the same time I cannot help saying that I cannot congratulate you on your choice: you should have chosen some lady of high social position

Moulvi Abul Hashem Khan Chowdhury is a distant relation of mine and I know his wife. I shall certainly be very glad to meet the ladies of his family again.

I would request you to kindly fix the date of your prize function early in March next and inform me accordingly. I may spend a couple of days there if necessary.

Thanking you again.

Yours truly,
Sd/R.S. Hossain

পত্র ৪০ : মুজিবর রহমানকে

Monday,

The Mussalman, 20th Anniversary Number, December 6, 1926

Mrs. R. S. Hossain's Letter.

It is a wellknown fact that no nation can rise without the help of its literature and without newspaper no literature can thrive. Maulvi Mujibur Rahman Saheb realised this truth in his heart of hearts long ago and started "The Mussalman" at a time when there was hardly any paper for Muslim interests in Begal and when Bengal itself was in chaos and confusion about the "Partition of Bengal," just like our revered Prophet (on whom be peace), who was born in the dark ages of Arabia to save the human beings at large.

I am a constant reader of "The Mussalman" since the very day of its birth and I am glad to notice that it is going on harmoniously for the same path serving our community, whiout caring ofr favour or fearing frowns. The path chosen by "the Mussalman" is not smooth and strewn with flowers, but full of thorns and rough stumbling blocks. Anybody who has some experince about public work, knows very well how difficult it is to serve one's country specially when the interests of the people clash wih those of their Government's. For a newspaper the task is still harder as it has to face various unfavourable circumstances including uncharitable criticism. Thank God, inspite of all sorts of trouble, "The Mussalman" has victoriously comleted the 20th year of its life. I remember to have said the very thing (that "The Mussalman" neither cares for favour nor fears frowns etc.) 20 years ago; and I believe the old file of the paper may still contain the issue in which my letter was published.

Being an old reader I have every right to congratulate "The Mussalman" most heartily and I hope its worthy editor will be pleased to accept the same. May God grant Maulvi Mujibar Rahman Saheb long life and prosperity to perform the Diamond jubilee of this paper. Amen.

While appreciating most sincerely its service. of 20 long years I must also complain that "The Mussalman" in doing its duty by half i.e. while serving our ship-wrecked community most earnestly it is neglecting the feminine portion of the society. Specially, by God's grace the Sakhawat Memorial Girls' School and the Anjuman-i-Islam Calcutta (started by my humble self ten years ago) have been able to change the mentality of Calcutta a great deal, though indirectly (and why not also directly?) and silenly. The Muslim population of Calcutta may or may not admit it but "Fact is Fact". Sixteen years

ago when the Sakhawat Memorial Girls' School was started there was not a single Muslim girls School in this City of Palaces. In 1914 when we were having the 3rd function of annual Prize distibtion of this School, Miss L. Brock, the then Inspectress of Schools for Presidency and Burdwan Divisions, said in her speech that four years ago (i.e.in 1909) she had tried to start a school for Muslim Girls with the help of (the late) Mr. Justice Sharfuddin but failed. But now the same Calcutta can boast of half-a-dozen Muslim girls schools aided by Government, one Muslim Female Training school, entirely financed by Government and about one dozen Muslim girls schools started by the Corporation of Calcutta. I may be pardoned when I feel proud to say that at least four of there schools Head Mistresses are the ex-pupils of the Sakhawat Memorial Girls School, who are managing those schools satisfactorily. So you see field is now quite ready for traing up the cause of female re-generation.

I now conclude, congratulating the editor of "The Mussalman" again.

Calcutta. **(Mrs.) R. S. Hossain**

পত্র ৪১ : মুজিবর রহমানকে

The Mussalman

Vol. XXV. T. W. Edition Vol VII. Calcutta Thursday, March 5 1931.

The Mussalman, 4 Dec. 1927, Calcutta

Welcome,

I am exceedingly glad to see "The Mussalman" has completed the 21st year of it's existence by fighting out it's way trough many throubles and difficulties. I heartly welcome the anniversary number of this paper. While our community is unable to maintain even a Bengalee paper properly ccndeucted, it is gratify ng to see an English paper, conducted by Muslims, "still going on strong" for long twenty one years.

Such a paper is extremely necessary for one community. I pray for it's long life and prosperity and hope to see it becoming a daily paper by next year. I take this opportunity to congratulate Moulavi Mujibur Rahman most sincerely on his success, and thank him for his self-sacrificing services.

(Mrs.) R. S. Hossein
Sakhawat Memorial
Girsl's School, Calcutta
19.11.27

পত্র ৪২ : খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদকে

Sakhawat Memorial Girls School
86/A Lower Circular Road
Calcutta, the 9.8.1931

Dear Khan Bahadur.

I owe you a thousand apologies for not replying to your kind letter so long, I had another attack of fever & am very very weak. I have not finished with the injection doctors & dentist yet. The meeting could not be held beore the 26th July. Yes, Mr. Waliul Isalm is woknkg as secretary since 5th inst.

We expect the new Hd. mistress from the 17th inst. next of course Dq.

Sir G. told me about your visit when I phoned him. Allow me to wish you every success in life. May Allah grant you long & prosperous life. Amen.

I don't thik you proved a failure as secy. on the other hand you showed me some path as how to proceed with the "beacon". My only complaint against the formen "secres" was that they were pessimist & too cautious while my mind wanted to make a ashing jump! Had they not hold me back tightly perhaps the School could become a High school long ago & also could get a building by this time ! I wanted to fight with the object "বাঁচিলে হইব গাজী, মরিলে শহীদ"—both the results are same to me ! But the secretaries always wanted to be গাজী! Now I have a mind to proceed with the Note, which you prepared so kindly. If we can use this Note properly, it will benefit, not only our school, but the whole Muslim community including "M. a. o." & Suhrawerday girls schools . But I do not know if Hazrat Azrail will allow me to carry on my work further !

Let me copy a resolution passed at the last meetings :

Resolved that the resignation of Khan Bahadur Tasadduq Ahmed as secretary & member of the managing committee of the school be accepted with effect from 16th july 1931 and that thanks of the committee be conveyed to him for his past services to the school.

My sister sends her best salam to you & thanks you for your kind words about her.

I hope you will not forget to see me whenever you happen to come down to Calcutta.

I think I have made pretty compensation for my long silence.

I shall try to write you again by the end of this month, on hearing from you.

With kindest regards.

Yours sincerly.
Roqyiah Khatun

পরিশেষ

পরিশেষ

জীবনপঞ্জি

১৮৮০ জন্ম

বাবা : জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু ১৯১৮)।
মা : রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী (মৃত্যু ১৯১২)।
প্রথম ভাই : মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের।
দ্বিতীয় ভাই : খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের (মৃত্যু ১৯২৪)।
তৃতীয় ভাই : মোহাম্মদ ইসরাইল আবু জাফর সাবের (ছোট বেলায় মৃত্যু)।
প্রথম বোন : করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬)।
দ্বিতীয় বোন : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)।
তৃতীয় বোন : হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেন (১৮৮৩-১৯৬২)।

১৮৮৫ বড় ভাই মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বড় বোন করিমুন্নেসার বাড়িতে ইয়োরোপিয়ান গভর্নেসের কাছে ইংরেজি অক্ষর পরিচয়।

১৮৯৮ বিবাহ

স্বামী : খানবাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন, বি. এ. এম. আর, এ. সি. (১৮৫৮-১৯০৯)
বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী সাখাওয়াত হোসেন।
বিয়ের সময় উড়িষ্যার কনিকা স্টেটের কোর্ট অব ওয়ার্ডসের নিযুক্ত ম্যানেজার। এ বিয়েতে দু'টি কন্যাসন্তানের জন্ম। একজন চার মাস বয়সে ও অন্যজন পাঁচ মাস বয়সে লোকান্তরিত।

১৮৯৯ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন ভাগলপুরের কমিশনারের পার্সোনাল এ্যাসিসট্যান্ট।

১৯০২ সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ।
প্রথম রচনা : পিপাসা (মহরম)।
পত্রিকার নাম : 'নবপ্রভা' (ফাল্গুন ১৩০৮ কলকাতা)।
সম্পাদক : হরেন্দ্রলাল রায় ও জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

১৯০৪ দার্জিলি ভ্রমণ।
মতিচূর (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত (১৫ ডিসেম্বর)।
প্রকাশক : ম্যানেজার, নবনূর কড়েয়া, কলকাতা (১৩১১)।

১৯০৫ প্রথম ইংরেজ রচনা 'Sultana's Dream'।
পত্রিকার নাম : Indian Ladies Magazine (Madras)
সম্পাদক : কমলা মাতমিয়া নাথান ও সরোজিনী নাইডু।

১৯০৭ 'মতিচূরে'র (প্রথম খণ্ড) দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত।
প্রকাশক : শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

১৯০৮ 'Saltana's Dream' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।
প্রকাশক : S. K. Lahiri & Co.
44, College Street, Calcutta।

১৯০৯ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের পরলোক গমন—৩রা মে, কলকাতা। তাঁর পরিবার ভাগলপুরে সমাহিত।

ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের সরকারি বাসভবন 'গোলকুঠি'তে ১লা অক্টোবর সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের চার মেয়ে স্কুলের ছাত্রী—

১. সৈয়দা কানিজ ফাতেমা ২. সৈয়দা আমাতুজ জোহরা ৩. সৈয়দা হাসিনা খাতুন (পরবর্তীকালে হাসিনা মোর্শেদ) ৪. সৈয়দা আহসানা খাতুন।

এসব ছাত্রী কর্তৃক রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপ্পি" বলে সম্বোধন। স্বামীর মৃত্যুর পর ভাগলপুরের কমিশনারের ব্যবস্থায় সৈয়দ শাহ আবদুল মালেকের বাড়িতে অবস্থান। পঞ্চম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।

১৯১০ ছোটবোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে আমীর হোসেন চৌধুরীর জন্ম গ্রহণ—সেপ্টেম্বর।

ভাগলপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে সৈয়দ শাহ অবদুল মালেকের ছোট ভাই সৈয়দ আব্দুস সালেকের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ—৩ ডিসেম্বর।

১৯১১ দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ১৬ মার্চ পর্যায়ে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা আটজন ছাত্রী নিয়ে ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের ভাড়া বাড়িতে।

বাড়ি ভাড়া করার পর এ বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ।

ছাত্রীদের পরিচয়

	ছাত্রীদের নাম	বাবার নাম
১.	আখতারুন্নেসা (সম্প্রতি প্রয়াত)	সৈয়দ আহমদ আলী (স্কুলের সেক্রেটারি)
২.	জোহরা	
৩.	মোনা	মওললনা মোহাম্মদ আলী (বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ)
৪.	রাজিয়া খাতুন	আবদুর রব (স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য)
৫.	জানি বেগম	ড. ওহাব
৬.	সৈয়দা কানিজ ফাতেমা	সৈয়দ আবদুস সালেক
৭.	সৈয়দা সাকিনা	

(এ দুজন কর্তৃক রোকেয়াকে 'স্কুল কি ফুপ্পি' বলে সম্বোধন)

৮. অষ্টম ছাত্রীর পরিচয় অজ্ঞাত।

ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের ১৪ নম্বর রয়েড স্ট্রিটের বাড়িতে এক মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলী সেক্রেটারি নিযুক্ত। স্কুলের নামকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ—২ এপ্রিল।

বার্মা ব্যাংক ফেল হয়ে স্কুলের ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা লোকসান—নভেম্বর।

বোম্বের বাহরামজি মারওয়ানজি মালাবারি ও কলকাতার নওয়াব বদরুদ্দিন হায়দারের কাছ থেকে স্কুলের জন্য আর্থিক সাহায্যলাভ।

১৯১২ মা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানীর পরলোক গমন—কলকাতা।
৪ নম্বর মেডিক্যাল কলেজ রোডে Turkish Relief Fund-এর সভায় বক্তৃতা প্রদান—১৬ ফেব্রুয়ারি।
হিজ হাইনেস দি আগা খানের ৩০০.০০ (তিনশ) টাকা ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান বি. এম. মালাবারির মাধ্যমে।
বাহরামজি মারোয়ানজি মালাবারির লেডি হার্ডিঞ্জ মারফত আবার ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা প্রেরণ
প্রথম মাসিক সরকারি সাহায্য ৭১.০০ (একাত্তর) টাকা বরাদ্দ—১লা এপ্রিল।
ছাত্রীসংখ্যা—২৭।

১৯১৩ বাবা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবেরের পরলোকগমন—পায়রাবন্দ, রংপুর, ৩১ বৈশাখ, ১৩২০।
১৩ নং ইয়োরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে স্কুল স্থানান্তরিত—৯ই মে।
ইংরেজি কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে রূপার শামাদান (মোমবাতি-দান) পুরস্কার লাভ—সেপ্টেম্বর।
ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেওয়া করার জন্য ঘোড়ার গাড়ির অর্ধেক দাম ৭৫০.০০ (সাড়ে সাতশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
ছাত্রীসংখ্যা—৩০

১৯১৪ ছোট লাট পত্নী লেডি কারমাইকেলের ৩০০.০০ (তিনশ) টাকা বিশেষ সাহায্য প্রদান।
বর্ধিত মাসিক সরকারি সাহায্য ৪৪৮.০০ (চারশ আটচল্লিশ) টাকা।
ছাত্রী সংখ্যা—৩৯

১৯১৫ পঞ্চম শ্রেণী শুরু করার পর স্কুল উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে উন্নীত।
৮৬/এ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুল স্থানান্তরিত—২৭ ফেব্রুয়ারি।
দুইটি ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়—প্রথমটা বছরের শুরুতে, দ্বিতীয়টা জুন মাসে।
১৯১৩ সনে প্রাপ্ত সরকারি সাহায্য ৭৫০.০০ (সাড়ে সাতশ) টাকা প্রথম গাড়ির জন্য ব্যয়িত।
ছাত্রীসংখ্যা—৮৪

১৯১৬ তৃতীয় ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়। মওলানা : আবদুল করিমের স্ত্রী আয়শা খাতুনের অর্ধেক দাম ৪৫০.০০ (সাড়ে চারশত) টাকা প্রদান—২১ ফেব্রুয়ারি।
আয়েশা খাতুনকে সভানেত্রী করে এবং নিজে সাধারণ সম্পাদিকা হয়ে 'আঞ্জুমানে কাওয়াতীনে ইসলাম' নামের মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা।
দক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরোজিনী নাইডুর পত্র প্রেরণ—১৬ সেপ্টেম্বর।
ছাত্রী সংখ্যা—১০৫

১৯১৭ বছরের শুরুতে বাংলা ক্লাসের (শাখার) প্রবর্তন।
বড়লাট পত্নী লেডি চেমসফোর্ডের স্কুল পরিদর্শন—৯ জানুয়ারি।
লেডি চেমসফোর্ডের সহায়তায় ষষ্ঠ শ্রেণী আরম্ভ করে মধ্য ইংরেজি স্কুলে পরিণত।
ছোটলাট—পত্নী লেডি কামরাইকেলের মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ—১৫ মার্চ।

আয়েশা খাতুনের সভানেত্রীত্বে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামে'র প্রথম বার্ষিক সভা।
৮৬/এ, লোয়ার সার্কুলার রোডে অনুষ্ঠিত—১৫ এপ্রিল।
ছাত্রী সংখ্যা—১০৭

১৯১৮ 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশনাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'সওগাত' নামের কবিতা রচনা—নভেম্বর।
চতুর্থ ঘোড়াটনা বাসগাড়ি ক্রয়। মূল্যের ১১০৮.০০ (এগারশ আট) টাকার মধ্যে ৫৫০.০০ (সাড়ে পাঁচশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নূর ওম্মেদের জন্ম—(১৫ই ডিসেম্বর)।
ছাত্রী সংখ্যা—১১৪

১৯১৯ ছাত্রীর অভাবে বাংলা শাখা বন্ধ ঘোষণা।
ছাত্রী সংখ্যা—১২৩

১৯২০ কলকাতা টাউনহলে স্বাস্থ্য ও শিশু প্রদর্শনীতে সভানেত্রী নির্বাচিত ও 'শিশু পালন' নামের প্রবন্ধ পাঠ—৬ এপ্রিল। পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য়-প্রকাশিত—কার্তিক, ১৩২৭।
ছাত্রী সংখ্যা—১২৬

১৯২১ দ্বিতীয় ভাই ও ঢাকার অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট হাফেজ খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরের দ্বিতীয় মেয়ে আজিজুন্নেসা উম্মে সাকিনা সুফিয়া খাতুনের বিয়ে উপলক্ষে ঢাকা আগমন ও বেশ কিছুদিন ঢাকায় অবস্থান। পুরনো ঢাকায় অবস্থিত দ্বিতীয় ভ্রাতৃবধুর সে বাড়ি আজো বর্তমান।
ছাত্রী সংখ্যা—১২১

১৯২২ মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত, ১০ মার্চ। প্রকাশক : গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং।
সমাজের পতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসনকল্পে ডাঃ লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠিত 'নারীতীর্থে'র সভানেত্রী।
প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
ছাত্রী সংখ্যা—১১৪

১৯২৩ আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১৫০.০০ (দেড়শ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
ছাত্রী সংখ্যা—১২২

১৯২৪ 'পদ্মরাগ' উপন্যাস প্রকাশিত। প্রকাশক : গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং।
দ্বিতীয় ভাই হাফেজ খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবেরের পরলোক গমন—ঢাকা।
আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ১০০.০০ (একশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
শিউড়ি মুসলিম বালিকা মক্তবের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী।
ছাত্রী সংখ্যা—১২০

১৯২৫ বর্দ্ধিত মাসিক সরকারি সাহায্য ৫৫০.০০ (সাড়ে পাঁচশ) টাকা লাভ— ফেব্রুয়ারি।
পঞ্চম ঘোড়াটানা বাসগাড়ি ক্রয়।
লাইব্রেরির জন্য ৭০০,০০ (সাতশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী (পঞ্চাশ বছর পূর্তি) উপলক্ষে আয়োজিত অল ইন্ডিয়া মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে 'আলিগড় মহিলা সমিতি'র প্রতিনিধি হিসেবে তিনদিনের জন্য আলিগড়ে গমন এবং বোরকা ঢাকা অবস্থায় বক্তৃতা প্রদান করে প্রশংসা লাভ—২৬—২৮ ডিসেম্বর।
ছাত্রী সংখ্যা—১০৪

১৯২৬ বড় বোন করিমুন্নেসার পরলোকগমন—৬ সেপ্টেম্বর।
প্রথম মোটর বাস ক্রয় এবং এ বাবদ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
৪০ জন ছাত্রী পাওয়া গেলে বাংলা শাখা আবার প্রবর্তন করার ইচ্ছা প্রকাশ
ছাত্রী সংখ্যা—১০৯

১৯২৭ ৭ জন ছাত্রী নিয়ে 4 class অর্থাৎ একবনকার ৭ম শ্রেণী শুরু করে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সূচনা।
কিণ্ডার গার্টেন শাখার প্রবর্তন।
ইয়াং ক্রিশ্চিয়ান উইমেনস এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের চতুর্থ দিবসের অধিবেশনের সভানেত্রী হিসেবে ভাষণদান—১৯ ফেব্রুয়ারি। বিভিন্ন নামে এ ভাষণ সাপ্তাহিক 'সত্যাগ্রহী', 'সাহিত্যিক', 'সওগাত' ও 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত।
ছাত্রী সংখ্যা—১২৮

১৯২৮ বর্ধিত মাসিক সরকারি সাহায্য ৭৫০.০০ (সাড়ে সাত শত) টাকা লাভ (মার্চ)।
দ্বিতীয় মোটর বাস ক্রয়। এ বাবদ ৪৭২৫.০০ (চার হাজার সাতশ পঁচিশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ ৭৫০.০০ (সাড়ে সাতশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
লাইব্রেরির জন্য ৫০০.০০ (পাঁচশ) টাকা সরকারি সাহায্য লাভ।
ছাত্রী সংখ্যা—১৪৯ (১২ জন আবাসিক)।

১৯২৯ ছাত্রী সংখ্যা—১৩৩।

১৯৩০ লেডি জ্যাকসনের ২৫০.০০ (আড়াইশ) টাকা সাহায্য প্রদান।
দশম শ্রেণী পর্যন্ত শুরু করে পূর্ণ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত।
বাংলার প্রথম মুসলমান পাইলট মোয়াজ্জেমের সঙ্গে আকাশ ভ্রমণ—২ ডিসেম্বর।
ছাত্রী সংখ্যা—১২৩

১৯৩১ পঞ্চম বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে 'Educational Ideals for the Modern Indian Girls' প্রবন্ধ পাঠ—১৯ ফেব্রুয়ারি। পরে 'দি মুসলমান' পত্রিকায় প্রকাশিত—৫ মার্চ, ১৯৩১।
স্কুল পরিচালনা কমিটির অধিবেশনে সেক্রেটারি খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদ কর্তৃক রোকেয়া রচিত 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' ভাষণ পাঠ—৮ মার্চ। পরে 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।
তিনজন মুসলমান মেয়ের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ।
ছোটবোন হোমায়রা তোফাজ্জল হোসেনের মেয়ে নুর উম্মেদের অকালমৃত্যু—১৮ প্রিল।
সরকারি চাকরির বদলিজনিত কারণে খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদের সেক্রেটারি হিসেবে পদত্যাগ। ৭ জুলাই।
নতুন সেক্রেটারি ওয়ালিউল ইসলামের যোগদান—৫ আগস্ট।

'অবরোধবাসিনী' প্রকাশিত—২৮ অক্টোবর। প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

১৯৩২ ১৬২ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে স্কুল স্থানান্তরিত—জুন।
ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীদের পাশের হার—৭৫%।
শেষ রচনা 'নারীর অধিকার'—৮ ডিসেম্বর, রাত ১১টা। ১৩৬৪/১৯৫৮ মাঘ মাসের 'মাহে'নও পত্রিকায় মরণোত্তর প্রকাশিত।
মহাপ্রয়াণ—৯ ডিসেম্বর, ফজরের আযানের পর।
কায়সার স্ট্রিটের বুআলী কলন্দর মসজিদে জুম্মার নামাজের পর জানাজা অনুষ্ঠিত। জানাজায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ: শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, স্যার আবদুল করিম গজনভী, নবাব কে. জি. এম. ফারুকী, খাজা নাজিমুদ্দিন, ডঃ আর. আহমদ, মৌলভী মজিবর রহমান, খানবাহাদুর তসদ্দক আহমদ, নাবাবজাদা কামরুদ্দি হায়দার, মওলানা আবদুর রহমান, রেজাউর রহমান, খান বাহাদুর তোফাজ্জল আহমদ, আমিন আহমদ।
আত্মীয় মওলানা আবদুর রহমান খানের পারিবারিক কবরস্থান কলকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরের শুখচরে সমাহিত—৯ ডিসেম্বর।
বাংলার গভর্ণর জন এ্যাণ্ডারসনের শোকবাণী প্রেরণ।
দৈনিক পত্রিকাসমূহের পৃষ্ঠায় মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত—১০ ডিসেম্বর।
দি মুসলমানের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ—১১ ডিসেম্বর।
কলকাতা কর্পোরেশনে শোক-সভা।
কলকাতা এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে শোকসভা। উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ও আঞ্জুমানে কাওয়াতীনে ইসলাম। সভানেত্রী : কলিকাতা গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মিসেস সরলা রায় (ডাঃ পি. কে. রায়ের স্ত্রী ও দুর্গামোহন দাসের মেয়ে) ১৫ ডিসেম্বর।
'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' আয়োজিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রাঙ্গণে পৃথক শোকসভা। সভানেত্রী : লেডি আবদুর রহিম। বেনিয়াপুকুর রোড অথবা অন্য কোনো রাস্তার নাম পরিবর্তন করে রোকেয়ার নামে করার জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের নিকট প্রস্তাব পেশ ১৮ ডিসেম্বর।
'মোহাম্মদী'র 'মরহুম মিসেস আর. এস. হোসেন' নামে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ—মাঘ, ১৩৩৯।

১৯৩৫ G. O. No 4404 Edn (s) বলে সরকারের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহন ১৯ ডিসেম্বর।

১৯৩৬ মিস ভারতী চক্রবর্তী প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত—২রা জানুয়ারি।

১৯৩৭ রোকেয়া সংক্রান্ত প্রথম বই শামসুননাহার মাহমুদ রচিত ' রোকেয়া জীবনী' প্রকাশিত—অক্টোবর।

১৯৬৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের নামকরণ—'রোকেয়া হল'—নভেম্বর।

১৯৬৫ রোকেয়া সংক্রান্ত দ্বিতীয় বই শামসুননাহারের পুত্রবধূ ও রোকেয়ার চাচাতো বোনের মেয়ে মোশফেকা মাহমুদ রচিত 'পত্রে রোকেয়া পরিচিত' প্রকাশিত— ফেব্রুয়ারি।

১৯৭৩ আবদুল কাদির—সম্পাদিত 'রোকেয়া—রচনাবলী' প্রকাশিত। এই রচনাবলীতে রোকেয়ার পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রথমবারের মতো উপস্থিাপিত।

১৯৮০ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত। বাংলাদেশ ডাকবিভাগ থেকে দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত।

মতিচূর : প্রথম খণ্ড

মিসেস আর এস হোসেন প্রণীত 'মতিচূর' (প্রথম খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৪ সালে। কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৩৫ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়। মুদ্রক : কটন প্রেস, অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণে লেখা ছিল : 'All rights reserved'. পৃষ্ঠা ৮ + ১০২।

মতিচূর : দ্বিতীয় খণ্ড

মিসেস আর এস হোসেন প্রণীত মতিচূর (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৮ সালে। 'কলিকাতা ৮৬-এ সার্কিউলার রোড, থেকে প্রকাশিত। মুদ্রক : জে. সি. ঘোষ, কটন প্রেস, ৫৭ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। 'Published by the Authoress, 86 A Lower Circular Road, Calcutta'. পৃষ্ঠা ১২ + ২৩২।

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

রোকেয়ার জীবদ্দশায় প্রকাশিত গ্রন্থের বাইরে যে-সব প্রবন্ধ পাওয়া গেছে সেগুলি 'অগ্রন্থিত প্রবন্ধ' শিরোনামে সংকলিত হলো। এখানে প্রবন্ধগুলির স্থান ও কাল নির্দেশ করা গেলো। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলিও চয়ন করা হলো।—

কূপমণ্ডূকের হিমালয় দর্শন। 'মহিলা', কার্তিক ১৩১১।
রসনা-পূজা। 'নবনূর', অগ্রহায়ণ ১৩১১।
ঈদ-সম্মিলন। 'নবনূর', পৌষ ১৩১২।
নারী-পূজা। 'মহিলা', পৌষ ১৩১২; মাঘ ১৩১২; ফাল্গুন ১৩১২।
আশা-জ্যোতিঃ। 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।
মোসলমান কন্যার পুস্তক সমালোচনা। 'মহিলা', ভাদ্র ১৩১৩।
দজ্জাল। 'মহিলা', ভাদ্র ১৩১৪।
সিসেম ফাঁক। 'সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫।
চাষার দুক্ষু। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য পত্রিকা', বৈশাখ ১৩২৮।
এণ্ডি শিল্প। 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা', কার্তিক ১৩২৮।
কাটা মুণ্ডু কথা কয়। 'বঙ্গলক্ষ্মী', মাঘ ১৩৩২।
রাঙ ও সোনা। 'সওগাত', আশ্বিন ১৩৩৩।
বঙ্গীয় নারীশিক্ষা সমিতি [সভানেত্রীর অভিভাষণ]। 'সওগাত', চৈত্র ১৩৩৩। এই অভিভাষণটি 'Bengal Women's Educational Conference—এ (বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে) পঠিত হয়।
লুকানো রতন। 'সওগাত', আষাঢ় ১৩৩৪।
রানী ভিখারিনী 'মাসিক মোহাম্মদী,' পৌষ ১৩৩৫।
বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ। 'সওগাত,' ভাদ্র ১৩৩৩।
সুবেহ্ সাদেক। 'মোয়াজ্জিন', আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৩৭।
৭০০ স্কুলের দেশে। 'সওগাত,' কার্তিক ১৩৩৭।
ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম। 'মাসিক মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

পদ্মরাগ

মিসেস আর এস হোসেন প্রণীত 'পদ্মরাগ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩১ সালে। 'কলিকাতা, ৮৬ এ লোয়ার সারকুলার রোড হইতে গ্রন্থ-রচয়িত্রী কর্তৃক প্রকাশিত'। মূল্য : দেড় টাকা মাত্র। মুদ্রক : লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, এইচ ডি. দত্ত, ৪৪ মদন বড়াল লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণে লেখা ছিল : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। পৃষ্ঠা ১০ + ১৮৮ + ১৪।

অবরোধ-বাসিনী

প্রকাশ : ১৯৩১। প্রকাশক : মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা। উৎসর্গলিপি : এই গ্রন্থখানি/ আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদা জননী/ মোছাম্মৎ রাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী মরহুমার/স্মৃতির চরণে/ ভক্তির সহিত সমর্পিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৫৩। প্রকাশক : মোহাম্মদী বুক হাউস, ৩৩ পাটুয়াটুলি, ঢাকা, পাকিস্তান। প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রচ্ছদশিল্পী : ইসমাইল শহীদুল্লা। মুদ্রক : দি সিটি প্রেস, ১৬/৩ কোর্ট হউস স্ট্রীট, ঢাকা। দাম : এক টাকা আট আনা। পৃষ্ঠা ৮ + ৭০।

ছোটগল্প ও রসরচনা

এই বিভাগে প্রকাশিত গল্প রসরচনার প্রথম প্রকাশের স্থানকাল এখানে উল্লিখিত হলো—

ভ্রাতা-ভগ্নী। 'নবনূর', জ্যৈষ্ঠ ১৩১২।
প্রেম-রহস্য। 'ভারত-মহিলা', শ্রাবণ ১৩১৩।
তিন কুঁড়ে। 'সওগাত', ১৩৩৩।
পরীবিবি। 'সওগাত', কার্তিক ১৩৩৩।
বলিগর্ত্ত। 'নওরোজ', আশ্বিন ১৩৩৪। 'মাসিক মোহাম্মদী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫।
পঁয়ত্রিশ মণ খানা 'মাসিক মোহাম্মদী', চৈত্র ১৩৩৫।
বিয়ে-পাগলা বুড়ো। 'মাসিক মোহাম্মদী', পৌষ ১৩৩৭।

অগ্রন্থিত কবিতা

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের কোনো কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ কালক্রমিক সজ্জিত হল। প্রথম প্রকাশের স্থান-কাল এখানে চিহ্নিত হল।

বাসীফুল। 'নবনূর', ফাল্গুন ১৩১০।
শশধর। 'নবনূর', চৈত্র ১৩১০।
প্রভাতের শশী। 'মহিলা', বৈশাখ ১৩১১।
পরিতৃপ্তি। 'মহিলা', জ্যৈষ্ঠ ১৩১১।
নলিনী ও কুমুদ। 'নবনূর', আষাঢ় ১৩১১।
স্বার্থপরতা। 'মহিলা', আষাঢ় ১৩১১।
কাঞ্চনজঙ্ঘা। 'নবনূর', পৌষ ১৩১১।
কাঞ্চনজঙ্ঘা। 'মহিলা', পৌষ ১৩১১।
প্রবাসী রবিন ও তাহার জন্মভূমি। 'মহিলা', মাঘ ১৩১১।
সওগাত। 'সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫।
আপীল। 'সাধনা', ফাল্গুন ১৩২৮।
নিরুপম বীর। 'ধূমকেতু', আশ্বিন ১৩২৯।

Sultana's Dream

প্রকাশক : এস. কে. লাহিড়ী এন্ড কোং, ৪৪ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য : চারি আনা। প্রকাশক : ১৯২২। উৎসর্গ : আপাজান [করিমুন্নেসা]।

প্রবন্ধ

'God gives Man robs' প্রবন্ধটি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'Educational Ideals for the Modern Indian Girls' প্রবন্ধটি 'দি মুসলমান' পত্রিকায় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-কীর্তি

আবদুল কাদির

আধুনিককালের গোড়ার দিকের বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সাধনা অনেকখানিই প্রতিক্রিয়ামূলক। মীর মশাররফ হোসেন হইতে আরম্ভ করিয়া মিসেস এম. রহমান পর্যন্ত মুসলমানের সাহিত্যচর্চা বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্য কিছু নয়; তবে সে-সাহিত্যে প্রতিবাদ ছাড়াও এমন সৃষ্টি কিছু আছে, যাহাকে অনবদ্য না হইলেও সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা যাইতে পারে। তবু এ-কথা অসত্য নহে যে, সে-সাহিত্যের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণার চাইতেও বড় জিনিস ছিল 'আমরাও আছি' এই মনোভাব। হিন্দু সাধকদের সৃষ্টি-চাঞ্চল্যে সচেতন হইয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টি-মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে একালের প্রথমদিকের মুসলিম সাহিত্যিকরা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মীর মশাররফ হোসেন 'জঙ্গনামা'-র ওপর ভিত্তি করিয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' লেখেন : নবীনচন্দ্রের অনুবর্তিতায় কায়কোবাদ এবং হেমচন্দ্রের অনুভাবে শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক কাব্য-সাধনায় অগ্রসর হন। এই সমস্ত রচনায় বাংলা পরিবেষ্টনের প্রভাব-নৈতিক ও সাংসারিক জীবনের বেদনা—কোনো রূপলাভ করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। 'বঙ্গবিধবা'র হাহাকার মোজাম্মেল হকের অন্তরে অপূর্ব বেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ স্বসমাজের অজ্ঞানতা ও অপ্রেমের খবরদারি তাঁহার মধ্যে বিশেষ-কিছু নাই। আসলে হিন্দু মনীষীরা পর্যাপ্তরূপে যাহা পরিবেশন করিতেছিলেন, মুসলমান সাহিত্যিকরা সে-সবকেই সাহিত্য-সাধনার সহজ উপাদান করিয়া লইয়াছিলেন,—আর অত্যন্ত অনায়াসে মুসলিম সাধনার যাহা পাওয়া যায়, তাহাই নিজেদের চিৎপ্রকর্ষের পরিচয় স্বরূপ, দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কবিচ্যুত এই যে সাহিত্য, ইহার একটা সুফল হইল এই যে, এদেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাহার রসগ্রহণে ও অভিনন্দনে অগ্রসর হইতে বেশি বেগ পাইল না।

অবশ্য সেই সাহিত্যিকরা-যে সমস্যা একেবারে বোঝেন নাই তাহা নহে। কোরবানি সম্পর্কে কথা বলিতে গিয়া মীর মশাররফ হোসেন তাঁর স্বসম্প্রদায়ের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। সহজ সৌন্দর্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবি কায়কোবাদ হিন্দু ও মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক মানুষরূপে না দেখিয়া স্বাভাবিক মানুষরূপে দেখিবার যে-প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তার ফলে স্বসমাজের নিকট হইতে কম গঞ্জনা লাভ করেন নাই। বিশেষত 'সমাজ ও সংস্কারক'-রচয়িতা পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন ও 'অনল-প্রবাহে'র কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'প্যান ইসলাম'—আদর্শের আলোকে নব-উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে গিয়া স্বসমাজের অন্তহীন দুর্গতির দিকেও দৃষ্টি দিয়াছিলেন। অবশ্য এ-কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা যায় যে, সৈয়দ শিরাজী, মৌলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ প্রমুখ সমাজের জন্য কল্যাণায়োজনের চেষ্টায় মৌলানা মনিরুজ্জামানেরই সহযাত্রা। সুদ-সমস্যা, নারী-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, কৃষক-সমস্যা, দেশ মুক্তি, ভাষা-সমস্যা ইত্যাদি নিয়া মৌলানা মনিরুজ্জামান যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিয়াছিলেন—সেকালের সমস্যা-

সাহিত্যে তার রূপরেখা অভিযোগ অভিমানের আবেগ-বাহুল্য নিয়া ফুটিয়া আছে।

ইঁহাদের রচিত সাহিত্যে বৃহত্তর দেশের সমস্যা সম্পর্কে দায়িত্বহীনতা, ধ্যানীর ঔদাসীন্যের চাইতে প্রতিবাদের বিক্ষুব্ধতা, এ-সমস্ত দোষত্রুটিই হয়তো ইহার দিকে দেশবাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বেগম রোকেয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ও বেদনার রসে সাহিত্য-সৃষ্টিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ মুসলমান অন্তঃপুরে এহেন শাণিতবুদ্ধি প্রেমপরায়ণা রুচিসুন্দর প্রতিভার আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার। হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি কবি কায়কোবাদের মতোই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি ছিলেন পরিপার্শ্বের সন্ততি। কোনো মত-বিশ্বাসের অন্ধ-উত্তেজনায় তিনি দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দেন নাই; ইসলামকে তিনি মনুষ্যত্ব-সাধনার এক চমৎকার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম অর্থে তিনি আল্লাহর অনুধ্যানই বুঝিয়াছিলেন। 'পিপাসা'-প্রবন্ধে কারবালা-কাহিনী ব্যাখ্যান করিয়া শেষে বলিয়াছেন : 'এ হৃদয়ের পিপাসা তুচ্ছ বারি-পিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম-পিপাসা। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকলে পিপাসী—ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেম-পিপাসী।'

তাঁহার চারিপাশের যে-সমাজ—অবরোধবন্দিনী নিগৃহীতা নারীসমাজ, তাহারই অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। 'আমাদের এ বিশ্বব্যাপী দাসত্বের কারণ কেহ বলিতে পারেন কি?'—এই প্রশ্নের অন্তরালে যে-দাহ, তাহার তীব্রতা তাঁহার সমস্ত রচনায় সঞ্চারিত হইয়া আছে। নারীবিদ্বেষী শপেনহর বলিয়াছেন : One need only look at a woman's shape to discover that she is not intended for either too much mental or too much physical work. কিন্তু বেগম রোকেয়া বলিয়াছেন—'স্বীকার করি যে, শারীরিক দুর্বলতাবশত নারীজাতি অপর জাতির সাহায্যে নির্ভর করে; তাই বলিয়া পুরুষ প্রভু হইতে পারে না।' The soul of a woman has something obscure and mysterious in it—এই কথা তিনিও যে জানিতেন, তাহা 'কুসুমের সৌকুমার্য হরিণের কটাক্ষ নিদ্রার মোহ ইত্যাদি তেত্রিশটি উপাদানে ললনা নির্মিত হইয়াছে'—উক্তিতেই বুঝা যায়; কিন্তু নারীর সেই আত্মিক প্রকৃতির বিশ্লেষণে অগ্রসর না হইয়া সামাজিক জীবনের ক্রমভঙ্গতার দিকেই তিনি অধিক দৃষ্টি দিয়াছিলেন। 'বাস্তবিক অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন বই আর কিছু নয়'—নারীর এই আত্মার দাসত্ব স্খলনের জন্য তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন : 'অলঙ্কারের টাকা দ্বারা জেনানা-স্কুলের আয়োজন করা হউক।' স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা যথাযোগ্যরূপে হইলেই নারীর উন্নতি অনিবার্য হইবে; তার কুসংস্কারপ্রিয়, রক্ষণশীল অথচ ফ্যাশনবিলাসী, আবেগপ্রধান প্রকৃতি প্রকৃতিস্থতা লাভ করিবে; Complete equality with man makes her quarrelsome, a position of supremacy makes her tyrannical, এই দুর্নাম ঘুচিয়া যাইবে; এই সহজ অথচ সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছিল। 'আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা ও অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি।' সুতরাং পুরুষপ্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর আক্রোশ অশোভন নয়। 'আপনারা মহম্মদীয় আইনে দেখিতে পাইবেন যে, বিধান আছে, পৈতৃক সম্পত্তিতে কন্যা পুত্রের অর্ধেক ভাগ পাইবে; এ নিয়মটি কিন্তু পুস্তকেই সীমাবদ্ধ।' পুরুষ কর্তৃক 'অর্ধাঙ্গি'র দাবি সম্পর্কে

এই উপেক্ষা দেখিয়া তিনি দুঃখ-ক্ষোভে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন—'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব।' অর্থনৈতিক দিক দিয়া নারীর স্বাবলম্বনকেই তিনি মুক্তির অন্যতম উপায় মনে করিয়াছিলেন।

'মতিচূর' ১ম ও ২য় খণ্ড, Sultana's Dream, 'পদ্মরাগ', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থে তাঁর জীবনের ঐকান্তিক স্বপ্ন অভিনব রূপ লাভ করিয়া আছে। 'মতিচূর' ২য় খণ্ডে সৌরজগৎ ,ডেলিশিয়া-হত্যা, জ্ঞান-ফল, নারী-সৃষ্টি, নার্স নেলি, মুক্তি-ফল প্রভৃতি গল্প ও রূপকথা আছে। মেরি করেলির Murder of Delicia উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত গল্পটিতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, পুরুষ-শাসিত সমাজে সভ্যদেশেও নারীর দুঃখের অবধি নাই আর 'নার্স নেলি'তে গৃহের অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি দিতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অন্যান্য গল্পগুলিতে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। 'জ্ঞান-ফল' রূপকথাটি আদম-হাওয়ার কাহিনী নিয়া রচিত; আদি-পুরুষ বলিতেছেন : কী আপদ! আমি রমণীকে রাখিতেও চাহি না, ফেলিতেও পারি না।' তদবধি নারী অভিশাপরূপে পুরুষের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে—তাঁর এই cynical মন্তব্য দুঃসহ বেদনা হইতেই উদ্ভূত।

তাঁর 'Sultana's Dream' ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা—'নারীস্থানের' এক অদ্ভুত পরিকল্পনা। সেখানে নারীর বাহুবলে নয়, মস্তিষ্ক-বলে পুরুষ পরাস্ত। নারী-প্রতিষ্ঠিত সেই স্বপ্ন-সমাজে পুরুষ minor—'মর্দদনা'বাসী। নারীর এবম্বিদ বিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : 'শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কার-রূপ অন্ধকার দূরীভূত হইয়া গেল।'

'মতিচূর' ১ম খণ্ডে 'বোরকা' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : 'অবরোধের সহিত উন্নতির বেশি বিরোধ নাই। ... এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কী? ...অবরোধ-প্রথা স্বাভাবিক নহে—নৈতিক। ....বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে। উন্নতির জন্য অবশ্য উচ্চশিক্ষা চাই। ... পরদা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় না। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব।'

তাঁর 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে ৪৭টি অবরোধ-সম্পর্কিত দুর্ঘটনার উপাদেয় কাহিনী আছে—অতুলনীয় শ্লেষ ও লিপিকুশলতার সঙ্গে তিনি সেগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে নারী-Humourist বিরল, সেদিক দিয়া 'অবরোধবাসিনী' উল্লেখনীয় কিছু নিশ্চয়ই। তিনি পরদা চাহিয়াছেন, কিন্তু তার বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন নাই; বলিয়াছেন : 'ঐ সকল কৃত্রিম পরদা কম করিতে হইবে।' তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দামতার চাইতে এই-যে সংযম ও মমত্ববোধের প্রাচুর্য, তার মূলে রহিয়াছে তাঁর নারীপ্রকৃতি। অবশ্য পরদা বলিতে যে তিনি নারীর সবল ব্যক্তিত্বই বুঝিতেন তার ইঙ্গিত নিম্নোক্ত ছত্রটিতে আছে : 'বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন, তাঁহাদের পরদা নাই কে বলে?'

তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা কিন্তু বলিতেছে : 'আমি আজীবন ... নারীজাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব এবং অবরোধ-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিব। ... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজনোর চরম লক্ষ্য নহে; সংসার ধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।'—সিদ্দিকা গ্রন্থকর্ত্রীর মানস-সৃষ্টি—এক

জ্বলন্ত অগ্নিকণা। এমিয়েল বলিয়াছেন : A woman places her ideal in the perfection of love and a man in the perfection of justice. পুরুষের সমাজ যখন বিচারবিমুখ তখন পুরুষের কাছে চিত্তসমর্পণ করিতে নারীর পরাঙ্মুখ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও সিদ্দিকার এই বিদ্রোহ বা আত্মত্যাগ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই, চিরন্তন নারী-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়—তার প্রমাণ : স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে তবু তার সাশ্রুনয়নে শোনা :

'স্বরগ মুকতি পুণ্য কিছু নাহি প্রয়োজন,
জনম জনম ধরি তোমারেই কামনা।'

পদ্মরাগের 'তারিণী-ভবনের' পরিকল্পনা পাশ্চাত্যের দাতব্য চিকিৎসালয় বা হিন্দুর আশ্রম হইতে ধার করা নয়, এই পুস্তকের পটভূমিতে রহিয়াছে তাঁর জীবনেরই স্বপ্ন। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্বপ্নের কিছু বাস্তব রূপ দিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 'পদ্মরাগে'-র অনেক ঘটনাই তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এ সমস্ত রচনায় সহজ সরল অকৃত্রিম বেদনার যে সাবলীল প্রকাশ, তার ভঙ্গিতে রহিয়াছে তাঁর স্বকীয়তা। মেটারলিঙ্ক 'নারী-প্রসঙ্গে' বলিয়াছেন : Their's are still the divine emotions of the first days, and the sources of their being lie deeper far than ours, in all that was illimitable.

মাসিক মোহম্মদী
মাঘ, ১৩৩৯

দুঃসাহসিকা

গোলাম মোস্তফা

আঁধার রজনী, নিদ্রিত পুরী, নাহি জন-কোলাহল;
মরণ-তন্দ্রা বিছায়েছে তার শিথিল নীলাঞ্চল।
দুর্যোগ-রীতি, নিভিয়া গিয়াছে শিয়রের দীপশিখা;
ঘরে ঘরে আজি জাগিতেছে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা।
এ গভীর রাতে কে তুমি জননী, কল্যাণ-দীপ জ্বেলে
এই বাংলার নিদ-মহলার তিমিরদুয়ারে এলে?
মৃত্যু-মলিন আঁধার কক্ষে করিলে আলোকপাত,
অভয়-মন্ত্র ফুকারি' কণ্ঠে দ্বারে দিলে করাঘাত?
আকুল আবেগে ডাকিয়া কহিলে নিদ্রিত সন্তানে—
'ওরে ওঠ তোরা, ঘুমাস নে আর, জেগে ওঠ নব প্রাণে!
দিবসে আলোর দীপালি জ্বালিয়া রাতে কি ঘুমাবি আজ?
কান পেতে শোন্—বাহিরে বিশ্বে চলিছে কুচকাওয়াজ!
দলে দলে ওই চলে বীরদল জ্বালিয়া মশাল-বাতি।

নব-প্রভাতের আশায় তাহারা পোহাইছে দুখ-রাতি।
তোরাও আয় রে, যোগ দে সে নব-জীবনের সাধনায়,
নিদ্রা মিথ্যা, ভুলিস নে আর মিছে তার ছলনায়!'

সাড়া দিল নাকো কেহ সেই ডাকে—সে আকুল আহ্বানে,
জননী টানিছে একদিকে, আর মরণ ওদিকে টানে!
কেহ জাগে, কেহ জাগিয়া ঘুমায়, কেহ ধীরে মেলে আঁখি,
ধিক্কার দেয় কেহ জননীরে ঘুমঘোরে থাকি থাকি।
সন্তান ভোলে জননীরে, তবু জননী ভোলে কি তায়?
প্রাণ কাঁদে তার স্নেহ-মমতায়—কল্যাণ-কামনায়।
তাই কি জননী বিপুল ব্যথায় ভরিল তোমার প্রাণ?
ভুলে গেলে তুমি আমাদের যত অনাদর অপমান।
শুচিসুন্দর শুভ্রবসনা তপস্বিনীর প্রায়
বসিলে গহন রাতের আঁধারে আলোর তপস্যায়?
ঘুমায় পুত্র, ঘুমায় কন্যা—সজাগ প্রহরী-সম
দরদী জননী শিয়রে জাগিয়া! দৃশ্য এ অনুপম।

জননী তোমার সে-মহাসাধনা বিফল হয়নি আজ,
জেগেছে আমরা, লভেছি চেতনা, পরেছি নূতন সাজ।
এই শুভক্ষণে কোথা তুমি আজ? জেগে দেখি তুমি নাই!
তোমার অভাব সবার হৃদয়ে বেদনা হানিছে তাই।
নয়ন ভরিয়া তোমারে আজিকে দেখিতে পরান চায়,
শত শ্রদ্ধায় সারা প্রাণ আজি লুটাতে চায় ও-পায়।
কুণ্ঠিত অবগুণ্ঠিত ওই বোরকায়-ঢাকা মুখ
খুলে ফেল মা গো! দেখিয়া মোদের ভরে যাক সারা বুক!

আজি আলোকের উৎসব চলে মোদের ভুবন ভরি,
সেই উৎসব-মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরণ করি।
হে চির-দরদী। ওই বুকে তব কোথা পেলে এত ব্যথা?
হেরেমের তুলে কেমনে পশিল আলোকের এ-বারতা?
কণ্টক-ভরা বন্ধুর পথ, তিমির-গহন রাতি,
নিষেধের শত বাধা-বন্ধন , সাথে নাই কেহ সাথী,
তবু সেই পথে বাহির হইলে, ওগো দুঃসাহসিকা!
জাগাতে তোমার প্রিয় সন্তানে, হাতে লয়ে দীপশিখা।
না-চলা পথের অগ্রপথিক, ওগো নারীকুল-রানি!
চির-দুর্জয় সাহসের তব আজিকে ধন্য মানি।
এই-যে অসীম আলোর পিয়াসা এই-যে আত্মত্যাগ,
মুক্তির লাগি এই কুতূহল—এ গভীর অনুরাগ—
ইহারে আমরা সারা প্রাণ দিয়া অভিনন্দিত করি;
এরি লাগি' আজ চিত্তে মোদের গৌরবের ওঠে ভরি!

শাজাহান গেছে রাখিয়া ধরায় প্রেমের 'তাজমহল'—
অমর করিয়া রেখেছে প্রিয়ার বিরহ-অশ্রুজল;
তুমি রেখে গেলে বাংলার বুকে নূতন 'নূরমহল'—
পতির পুণ্য স্মৃতি-মন্দির শুভ্র-সমুজ্জ্বল!
শাজাহান চেয়ে বড় তুমি প্রেমে, পুণ্যে ও গরিমায়,
হার মেনে যায় তাঁহার 'তাজ' যে এ-তাজের তুলনায়!
সে তো সম্রাট, সীমা নামি তরে বিত্ত-সামগ্রীর,
তুমি যে রিক্তা, বুকের রক্তে গড়েছে এ-মন্দির!
বাংলার যদি কোথাও মোদের তীর্থক্ষেত্র থাকে,
সে হবে তোমার এই মন্দির—রেখে গেলে তুমি যাকে।
এইখানে আসি যুগে যুগে মোরা নোয়াব মোদের শির,
তোমার পুণ্যস্মৃতিরে স্মরিয়া ফেলিব অশ্রুনীর।

জননী, তোমারে দেখি নাই মোরা, শুনিয়াছি শুধু বাণী;
শরীরিণী ছিলে, অথবা ছিলে না—আজই বিস্ময় মানি!
মনে হয় যেন তনু-ঢাকা দূর চাতক-পাখির প্রায়
তুমি এসেছিলে মোদের গগনে গান শুনাইতে, হায়!
তুমি যেন কোনো গগন-পারের স্বপন দেশের মেয়ে,
এসেছিলে নেমে ঈদের চাঁদের রজত-তরণী বেয়ে!
ফিরদৌস হতে নিয়ে এসেছিলে নূরের দীপ্তশিখা,
সেই নূর দিয়ে দূর করে গেলে মৃত্যুর মরীচিকা।
মানবীর রূপে তুমি আল্লার মূর্ত আশীর্বাদ;
তুমি না আসিলে ঘুচিবে কি এই জড়তা ও অবসাদ?
হে জননী! চির-অনুপমা তুমি পুণ্যে ও মহিমায়,
তুমি আমাদের খালেদা খানম নব্য এ-বাঙলায়।
চাঁদ সুলতানা তুমি এ-যুগের, অসীম সাহস প্রাণে
একা দাঁড়াইয়া যুঝিয়াছ তুমি আঁধারের অভিযানে।
তাপসী 'রাবেয়া', তারও চেয়ে তুমি সাধনায় যে গো দড়,
ধর্মের চেয়ে জ্ঞানের সাধনা সহস্র গুণ বড়।
তুমি আমাদের নূতন 'খোদেজা'—সর্বপ্রথমা নারী,
আলোর অমিয় পানে করিল যে ভরিয়া হৃদয়-ঝারি!
আজিকে মোদের নব-প্রগতির জয়যাত্রার তালে
পরাইয়া দিলে তুমি রাজটিকা রহিয়া অন্তরালে।
নারীর পরশে পেয়েছিল প্রাণ ইসলাম দুনিয়ায়—
মোরাও লভিব নব প্রাণ তব স্পর্শের মহিমায়।

আজি মনে পড়ে, জীবনের তব অন্ত-সন্ধ্যাবেলা
ব্যোমযানে তুমি উঠেছিলে—করি সব বাধা অবহেলা।
কী খেয়াল তব জেগেছিল মনে, হেরেমবাসিনী নারী,

তব তিরোধানে এখন সে-কথা বুঝিতে আমরা পারি।
শিল্পী যেমন শিল্প রচিয়া দূর হতে চেয়ে দেখে—
তুমি সেই মতো তব কীর্তির নিয়ে এলে ছবি এঁকে!
দেখে এলে অতি-ঊর্ধ্ব হইতে মেলি তব দু-নয়ন—
এসেছে মোদের জাতির জীবনে কতটুকু স্পন্দন।
নব-প্রভাতের অরুণ-আলোর চল-চরণের ধ্বনি
আকাশের পথে কর্ণে তোমার উঠেছিল কি গো রণি?
শুনেছিলে কি গো নবীন যুগের জয়যাত্রার ভেরি,
বুঝেছিলে কি গো—প্রভাতের অধিক নাহিকো দেরি?
পৌঁছায়ে দিয়ে নিখিল জাতিরে প্রভাতের দরজায়
দিবসের আলো না-ফুটিতে তাই চলে গেলে কি গো, হায়!
আজি বাংলার মুসলিম যে গো হয়েছে মাতৃহীন,
বেদনায় শোকে সবার চিত্ত তাই আজি গমগীন।
যাও মাতঃ তব পুণ্য স্মিরিতি চিরকাল রবে মনে,
শক্তিরূপিণী তুমি বিদ্যুৎ জাতির জড়-জীবনে।
নাই বা থাকিলে তুমি দুনিয়ায়, ক্ষতি কি তাহাতে আর?
তুমি বেঁচে রবে মোদের ধেয়ানে অলক্ষে সবাকার।

নব-প্রভাতের অরুণ-আলোকে জাগিব আমরা যবে
মুখর হইবে মোদের ভবন আনন্দ-কলরবে,
বোন এসে যবে মধুর হাসিয়া দাঁড়াবে ভাইয়ের পাশে,
সঙ্গিনী যবে চলিবে সঙ্গে অপূর্ব উল্লাসে,
শীতের কুহেলি-পরদা ঠেলিয়া নব-বসন্ত যবে
আসিবে মোদের জীবনকুঞ্জে অপরূপ গৌরবে,
নব-জীবনের স্পন্দনে যবে ভরে যাবে সারা প্রাণ,
বুলবুল যবে গাহিবে আবার মাতায়ে গুলিস্তান,
সেই পুলকের মাঝারে, জননি, তোমার আমরা পাব,
সেইদিন সবে প্রাণ খুলে মোরা তোমার মহিমা গাব।

মাসিক মোহাম্মদী
মাঘ, ১৩৩৯।
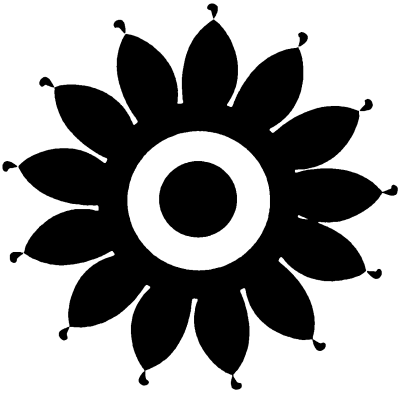
বেগম রোকেয়া রচনাবলী